

সুখায়ুগ





ଦ

ତ

କ

କ

କ

ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ



ভূতসমগ্র । হুমায়ূন আহমেদ

প্রথম খণ্ড



অন্যপ্রকাশ

B=C. 5. 1
Public Library
11th PIN Com No. 11865
11th PIN. Com. M R No. 49659

প্রচ্ছদ	ধুব এয
ফটোগ্রাম	এ, আব, চৌধুরী
কম্পিউটার গ্রাফিক্স	লিটিল এম
প্রকাশক	মাজহারুল ইসলাম অন্যপ্রকাশ ৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন . ৯৬৬৪২৬০. ৯৬৬৪৬৮০ ফ্যাক্স . ৮৮০ ২-৯৬৬৪৬৮১
মুদ্রণ	কালারলাইন প্রিন্টার্স ৬৯/এফ গ্রীনবোড, পাটুপাথ, ঢাকা
মূল্য	৪০০ টাকা

উত্তর আমেরিকা পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক
--------------------------	--------------------------------------

Bhut Samagra First Part	By Humayun Ahmed Published by Mazharul Islam, Anyaprokash Cover Design . Dhruva Eash Price . Tk 400 only ISBN : 984 868 185 X
----------------------------	---

‘ভূত সমগ্র’ ভূত-প্রেতদের
উৎসর্গ করলে কেমন হয় ?

<p>অ ন্য থ কা শ</p> <p>প্রকাশিত</p> <p>লেখকের অন্যান্য বই</p>	<p>আজ আমি কোথাও যাব না</p> <p>চলে যায় বসন্তের দিন</p> <p>নীল মানুষ</p> <p>কুটু মিয়া</p> <p>মৃন্ময়ী</p> <p>তেতুল বনে জোছনা</p> <p>আমিই মিসির আলি</p> <p>বৃষ্টি বিলাস</p> <p>শুভ্র</p> <p>রূপার পালঙ্ক</p> <p>জোছনাত্রয়ী</p> <p>হুমায়ূন আহমেদ-এর হাতে পাঁচটি নীলপদ্ম</p> <p>নির্বাচিত গল্প</p> <p>অঙ্কুর সব উপন্যাস</p> <p>নির্বাচিত কিশোর উপন্যাস</p> <p>কানী ডাইনি</p> <p>আহারে !</p>
---	--

‘আপনি কি ভূত বিশ্বাস করেন ?’

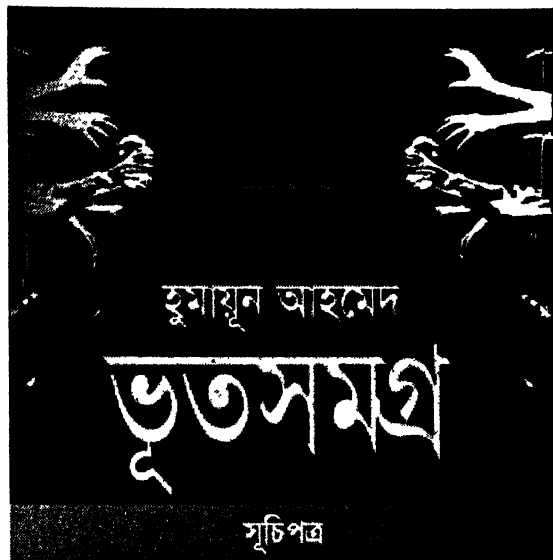
অসংখ্যবার এই প্রশ্নের মুখোমুখি আমাকে হতে হয়েছে। প্রতিবারই আমি বিনয়ের সঙ্গে বলেছি— ‘না ভূত বিশ্বাস করি না।’ পাঠক তখন ভুরু কুঁচকে জানতে চেয়েছেন— “ভূত বিশ্বাস করেন না, তাহলে ভূতের গল্প লিখছেন কেন ?” এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছি— ভূত বিশ্বাস না করলেও ভূতের ভয় বিশ্বাস করি। ভূতের গল্প এই জন্যেই লিখি।

এইসবই হলো কথার পিঠে কথা। মূল ঘটনা অন্য। অতিপ্রাকৃত বিষয়ের প্রতি আমার আগ্রহ প্রবল। জগতের রহস্যময়তা আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। বিশ্বয়ে অভিভূত হয়ে আমি প্রায়ই ভাবি— জগৎ এত রহস্যময় কেন ? জ্ঞানী মানুষরা বলেন, জগৎ রহস্যময় নয়। তুমি তোমার অজ্ঞানতাকে রহস্যের চাদরে ঢাকার চেষ্টা করছ।

আমি জ্ঞানী নই বলেই হয়তো চারদিকে রহস্য দেখতে পাই। আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল— এই বৈজ্ঞানিক সত্য আমাকে শান্ত করে না। আমার জানতে ইচ্ছা করে এটা কেন আলোর গতি হলে, ? কেন এরচে’ বেশি বা এরচে’ কম হলো না ? কসমিক ডিম থেকে বিগ ব্যাং-এর মাধ্যমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হলো, অতি উত্তম কথা, বিগ ব্যাং-এর আগে কী ছিল ? এই প্রশ্নের জবাব নেই। আমরা এমন এক জগতে বাস করছি যে জগতের বেশির ভাগ প্রশ্নেরই কোনো উত্তর নেই। অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে আমার লেখালেখির মূল কারণ একটাই, ‘উত্তর নেই’ জগতের প্রতি আমার তীব্র আকর্ষণ।

হুমায়ূন আহমেদ

নুহাশ পল্লী, গাজীপুর



নি ১১

দেবী ৯১

নিশীথিনী ১৬৫

আয়নাঘর ২৬১

বৃহন্নলা ৩২৩

ভয়ংকর ভুতুড়ে ৩৬১

যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ ৪০১

বোতল ভূত ৪৪৭

আমি এবং আমরা ৪৮৩

বিপদ ৫৫৫



নি

নীলগঞ্জ মডেল হাই স্কুলের সায়েন্স টিচার মবিনুর রহমান, বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (প্রথম শ্রেণী) খুব সিরিয়াস ধবনের মানুষ। বয়স ছত্রিশ/সাঁইত্রিশ, রোগা লম্বা। গলার স্বরে কোনোরকম কোমলতা নেই। ভদ্রলোক এমনভাবে তাকান যাতে মনে হতে পারে যে সমস্ত পৃথিবীর উপর তিনি বিরক্ত। কোনো কারণে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলে তিনি আরাম পাবেন।

এমএসসি পাস করার পব সব মিলিয়ে আঠারোবার তিনি চাকরির ইন্টারভ্যু দিলেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যা ঘটল তা হচ্ছে— তিনি ইন্টারভ্যু দিতে ঢুকলেন, বোর্ডের চেয়ারম্যান বললেন, বসুন।

তিনি বসলেন। বোর্ডের চেয়ারম্যান বললেন, আপনার নাম ?

মবিনুর রহমান সহজ গলায় বললেন, নাম তো আপনি জানেন। এই নামেই ডেকে পাঠালেন। আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন ?

আচ্ছা আপনি যেতে পারেন।

ধন্যবাদ।

তিনি শান্ত মুখে উঠে চলে এলেন।

এ জাতীয় মানুষদের কোনো চাকরি-বাকরি হবার কথা না। তবে মবিনুর রহমান হাল ছাড়লেন না। দু'বছর চেষ্টা কবলেন, প্রাণপণ চেষ্টা। 'ইন্টারভ্যু গাইড' নামের সাতশ একুশ পৃষ্ঠার একটা বই প্রায় মুখস্থ কবে ফেললেন। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব, ন্যাটো চুক্তিভুক্ত দেশের নাম, কোন কোন বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয় নি, আমেরিকান সব প্রেসিডেন্টের নাম এবং বংশ-পরিচয়— পাঠ্য তালিকা থেকে কিছুই বাদ গেল না। খুব ঈশ্বর-বিশ্বাসী না হয়েও মায়ের পীড়াপীড়িতে সিলেটে হযরত শাহজালাল এবং হযরত শাহ পবনাণেব মাজার জিয়াবত কবে এলেন। রাজশাহীতে গিয়ে জিয়ারত করলেন শাহ মখদুমের মাজার এই তিন মহাপুরুষের কল্যাণেই হয়তো বা তিনি নীলগঞ্জ মডেল হাই স্কুলের সায়েন্স টিচার চাকরিটা পেয়ে গেলেন। অবশ্যি এই চাকরি পাওয়ার পেছনে অন্য একটি কারণ থাকতে পারে। এই চাকরির জন্যে তাঁকে ইন্টারভ্যু দিতে হয় নি। কাগজপত্র গাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

যাই হোক, নীলগঞ্জ মডেল হাই স্কুলের চাকরির নিয়োগপত্র এবং দু'কেজি মিষ্টি নিয়ে তিনি কুমিল্লার মতলবে তাঁর মা'কে দেখতে গেলেন। মা তখন রোগে শয্যাশায়ী। মবিনুর রহমানের চাকরির খবরে, একে মোটেই আনন্দিত মনে হলো না। কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, শেষ পর্যন্ত স্কুলমাস্টার ?

মবিনুর রহমান শান্ত গলায় বলেন, স্কুল মাস্টারি খারাপ কিছু না। নাও, মা মিষ্টি খাও।

আমি মিষ্টি খাব না, বাবা। তুই খা।

মিষ্টি না খেলে মনে কষ্ট পাব, মা ।

ভদ্রমহিলা ছেলেকে মনোকষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য মিষ্টি খেলেন । এই মিষ্টিই তাঁর কাল হলো । ভোরবেলা পেট নেমে গেল । সন্ধ্যার মধ্যে মৃত্যু ।

আশেপাশের সবাই সান্ত্বনা দিতে ছুটে এসে দেখে মবিনুর রহমান পাথরের মতো মুখ করে মিষ্টি খাচ্ছে । নিতান্তই অস্বাভাবিক দৃশ্য কিন্তু আসলে তেমন অস্বাভাবিক নয় । মিষ্টিই তার মা'র মৃত্যুর কারণ কি-না এটাই মবিনুর রহমান পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন । দু'কেজি কালোজাম খেয়েও তার যখন কিছু হলো না তখন তিনি মোটামুটি নিশ্চিত হলেন— বয়সজনিত কারণে মৃত্যু হয়েছে । এই মৃত্যুতে খুব বেশি দুর্গন্ধত হবার কিছু নেই । প্রতিটি জীবিত প্রাণীকেই একটা নির্দিষ্ট সময়ের পব মরতে হবে । তবে এই মৃত্যুর মানে পুরোপুরি ধ্বংস নয় । মানুষের শরীরের অযুত, কোটি, নিযুত ফাডোমেন্টাল পার্টিকেলস যেমন— ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন— এদের কোনো বিনাশ নেই । এরা থেকেই যাবে । ছাড়িয়ে পড়বে সারা পৃথিবীতে । কাজেই মানুষের মৃত্যুতে খুব বেশি কষ্ট পাবার কিছু নেই ।

মবিনুর রহমান তাঁর বসতবাড়ি এবং অল্প যা জমিজমা ছিল বিক্রি করে দিয়ে নীলগঞ্জ চলে এলেন । তাঁর সঙ্গে দুই ট্রাংক বই, একটা ম্যাকমিলন কোম্পানির দুরবিন । দুরবিনটা ঢাকা থেকে অনেক দাম দিয়ে কেনা । ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর শখ ছিল ভালো একটা দুরবিন কেনা । টাকার অভাবে কেনা হয় নি । জমি বিক্রির টাকাটা কাজে লাগল । এই সঙ্গে একটা মাইক্রোসকপ কিনতে পারলে হতো । টাকায় কুলালো না ।

নীলগঞ্জ হাই স্কুলে মবিনুর রহমানের আট বছর কেটে গেছে । শুরুতে তাঁকে যতটা বিচিত্র বলে মনে হয়েছিল এখন আর ততটা মনে হয় না । মবিনুর রহমান বদলান নি, আগের মতোই আছেন । ছাত্ররা এবং সহকর্মী শিক্ষকরা তাঁর আচার-আচরণে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এইটুকু বলা যায় । তাঁর আচার-আচরণের সামান্য নমুনা দেয়া যাক ।

তাঁর বুক পকেটে সব সময় একটা গোলাকার নিকেলের ঘড়ি থাকে । নীলগঞ্জে আসার আগে চৌদ্দশ টাকায় ইসলামপুর থেকে এই ঘড়িটা কেনা হয়েছে । সাধারণ ঘড়ি নয়— একের ভেতর তিন । ঘড়ির সঙ্গে আছে স্টপ ওয়াচ এবং একটি অর্দ্রতা মাপক কাঁটা ।

ক্লাসে ঢোকানোর আগে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি ঘড়িতে সময় দেখে নেন । ক্লাস শেষের ঘণ্টা পড়া মাত্র আবার ঘড়ি বের করে সময় দেখেন । তখন যদি তাঁর কপাল কুঁচকে যায় তাহলে বুঝতে হবে ঘণ্টা ঠিকমতো পড়ে নি । দু'এক মিনিট এদিক-ওদিক হয়েছে ।

ক্লাসে ঢুকে প্রথমেই আজকের আবহাওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, যেমন— আজ বাতাসের অর্দ্রতা ৭৭ পারসেন্ট । বৃষ্টিপাত হবার সম্ভাবনা । আবহাওয়া সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী খুব লেগে যায় । তিনি বৃষ্টি হবে বলেছেন অথচ বৃষ্টি হয় নি এমন কখনো দেখা যায় নি ।

তাঁর ক্লাসে ছাত্রদের নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকতে হয় । হাসা যায় না, পেনসিল দিয়ে পাশের ছেলের পিঠে খোঁচা দেয়া যায় না, খাতায় কাটাকুটি খেলা যায় না । মনের ভুলেও কেউ যদি হেসে ফেলে তিনি হতভম্ব হয়ে দীর্ঘসময় তার দিকে তাকিয়ে থেকে

কঠিন গলায় বলেন, সায়েন্স ছেলেখেলা নয়। হাসাহাসির কোনো ব্যাপার এর মধ্যে নেই। সায়েন্স পড়বার সময় তুমি হেসেছ, তার মানে বিজ্ঞানকে তুমি উপহাস করেছ। অন্যায় করেছ। তার জন্যে শাস্তি হবে। আজ ক্লাস শেষ হবার পর বাড়ি যাবে না। পাটিগণিতের সাত প্রশ্নমালার ১৭, ১৮, ১৯ এই তিনটি অঙ্ক করে বাড়ি যাবে। ইচ্ছা ইট ক্লিয়ার ?

মবিনুর রহমান স্কুল থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে দু'কামরার একটা পাকা ঘরে একা বাস করেন। ঘরটি জরাজীর্ণ। ভেঙে পড়তে পড়তেও কেন জানি পড়ছে না। ছোটখাটো ভূমিকম্প কিংবা দমকা বাতাসের জন্যে অপেক্ষা করছে। তাকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হবে বলে মনে হয় না। বাড়িটি সাপেব আড্ডাখানা। বর্ষাকালে যেখানে-সেখানে সাপ দেখা যায়। বাড়ির মালিক কালিপদ রূপেশ্বর স্কুলের দণ্ডরি। সাপের ভয়েই সে পূর্বপুরুষের ভিটায় বাস করে না। সাপের কামড়ে তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী এবং দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর প্রথম সন্তান মারা গেছে। মবিনুর রহমান সেই বাড়িতে সুখেই আছেন। স্বপাক আহাৰ করেন। তাঁকে নিরামিষভোজী বলা চলে। মাছ মাংস খান না। না খাওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে মাছ-মাংস রোধতে জানেন না। তাঁর বাড়িটা রূপেশ্বর নদীর ধারে। শীতকালে এই নদীতে পায়ের পাতাও ভিজে না। বর্ষাকালে কিছু পানি হয়। গত বর্ষায় মবিনুর রহমান দেড় হাজার টাকা দিয়ে একটা নৌকা কিনেছেন। নৌকার কোনো মাঝি নেই। নৌকা ঘাটে বাঁধা থাকে। মাঝে মাঝে তিনি নৌকার ছাদে সারারাত বসে থাকেন। নৌকার ভেতরটাও সুন্দর। ঘরের মতো। দু'দিকে দরজা আছে। বাথরুম আছে। বিছানা বালিশ দিয়ে ভেতরটা চমৎকার গোছানো। মবিনুর রহমানের প্রিয় কিছু বই নৌকায় থাকে। অধিকাংশই গ্রহ নক্ষত্র বিষয়ক বই।

এই জাতীয় আধাপাগল নিঃসঙ্গ মানুষকে সবাই খানিকটা ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখে। মবিনুর রহমানের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয় নি। এই অঞ্চলের মানুষদের প্রচুর ভালোবাসা তিনি পেয়েছেন। এই ভালোবাসা পাবার পেছনের আরেকটি কারণ হচ্ছে, তিনি শিক্ষক হিসেবে প্রথম শ্রেণী। ইতিমধ্যেই অঞ্চলের ডুবো জাহাজ হিসেবে তাঁর খ্যাতি বটেছে। ডুবো জাহাজ নামকরণের রহস্য হচ্ছে তিনি যে খুব ভালো অঙ্ক জানেন এটা বাইরে থেকে বোঝা যায় না।

২

আজ বৃহস্পতিবার, হাফ স্কুল।

সেকেন্ড পিবিয়ডে মবিনুর রহমানের কোনো ক্লাস নেই। তিনি টিচার্স কমন্সরুমে তাঁর নিজের চেয়াবে চুপচাপ বসে আছেন। তাঁর বুক পকেটের ঘড়ি শতকরা আশি ভাগ হিউমিডিটির কথা বলছে। কিন্তু আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটা নেই। ব্যাপারটা ঠিক মিলছে না। মবিনুর রহমানের ভুরু কুঁচকে আছে এই কারণে। কমন্সরুমে আরো কিছু শিক্ষক আছেন। তাঁরা সরকারি ডিএ নিয়ে আলাপ করছেন। এবারের সরকারি সাহায্য এখনো এসে পৌঁছায় নি। মবিনুর রহমান এইসব আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন না। কখনোই করেন না। স্কুলের ধর্ম ও আরবি শিক্ষক জালালুদ্দিন সাহেবের চেয়ার মবিনুর রহমানের চেয়ারের ঠিক পাশেই। পাশাপাশি বসতে হয় বলেই বোধহয় দু'জনের মধ্যে সামান্য সখ্যতা আছে। জালালুদ্দিন সাহেব মবিনুর রহমানকে তুমি তুমি করে বলেন।

তাঁর কথাবার্তা থেকে মনে হতে পারে যে বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর প্রচুর কৌতূহল। তা ঠিক না। কোনো বিষয় সম্পর্কেই তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। ভদ্রলোক কোনো ক্লাসই ঠিকমতো নেন না। আজও ক্লাস শেষ হবার কুড়ি মিনিট আগে বের হয়ে এলেন। মবিনুর রহমানের পাশে বসতে বসতে মধুর গলায় বললেন, তারপর মবিন, তোমার সায়েন্সের খবর কী ?

কোন খবরটা জানতে চান ?

বৃষ্টি হবে কী হবে না ?

বৃষ্টি হবে। হিউমিডিটি ৮০।

জালালুদ্দিন পানের কৌটা খুলতে খুলতে বললেন, বৃষ্টি যে হবে এটা বলার জন্য তোমার সায়েন্স লাগে না। আষাঢ় মাস, বৃষ্টি তো হবেই। পান খাবে না-কি ?

জি-না।

খাও একটা জর্দা দেয়া আছে। আকবরী জর্দা। অতি সুস্বাদু।

আমি পান খাই না।

এমনভাবে তুমি কথাটা বললে যেন পান খাওয়া বিরাট অপরাধ। পান খাওয়া কোনো অপরাধ না। এটা হজমের সহায়ক। দাঁত ভালো থাকে।

জালালুদ্দিন একসঙ্গে দুটো পান মুখে দিলেন, আঙুলের ডগায় চুন নিতে নিতে বললেন, আচ্ছা মবিন, এই যে পানের সঙ্গে আমরা চুন খাই। কেন খাই ? তোমাব সায়েন্স কী বলে ?

আপনি সত্যি জানতে চান ?

অবশ্যই চাই। আরবি পড়াই বলে সায়েন্স জানব না ? সায়েন্সের সঙ্গে এবারিকের তো কোনো বিরোধ নাই।

মবিন শীতল গলায় বললেন, পানের সঙ্গে চুন কেন খাওয়া হয় আমি ব্যাখ্যা করছি। মন দিয়ে শুনুন।

শুনছি। তুমি হাসি মুখে বলো। মুখ এমন শুকনো করে বেখেছ কেন ?

মবিনুর রহমান ক্লাসে বক্তৃতা দেয়ার ঢং-এ বললেন, শুধু শুধু পান চিবুলে দেখাবেন টক টক লাগছে। টক লাগার কারণ হচ্ছে পানে এক ধরনের এসিড বা অম্ল আছে। অম্ল টক স্বাদযুক্ত। চুন হচ্ছে এক জাতীয় ক্ষার। ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড। এই ক্ষার অম্লকে প্রশমিত করে। এই জন্যেই পানের সঙ্গে চুন খেতে হয়।

ও আচ্ছা আচ্ছা। ভালো কথা। অম্ল এবং ক্ষার। ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। অনেকদিন থেকে মনের মধ্যে একটা খটকা ছিল। আচ্ছা, এখন বলো তো দেখি, তেঁতুলের সঙ্গে চুন মিশালে কি তেঁতুলের টক-ধর্ম চলে যাবে ?

মবিনুর রহমান চুপ করে বইলেন। এই বিষয়টা তাঁর জানা নেই। অনুমানের উপর কিছু বলা ঠিক হবে না। বিজ্ঞান অনুমানের উপর চলে না। পরীক্ষা করে তাৎপর্য বলতে হবে।

জালালুদ্দিন পানের পিক ফেলতে ফেলতে বললেন, কী, কথা বলছ না কেন ? কী হবে তেঁতুলের সঙ্গে চুন মেশালে ?

কাল আপনাকে বলব।

কাল কেন ? আজই বলো।

আজ বলতে পারব না। পরীক্ষা করে তারপর বলব।

একদিন যাব তোমার বাড়িতে। তোমার চোঙটা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাব।

দূরবিনের কথা বলছেন ?

হ্যাঁ, দূরবিন। বৃহস্পতির বলয় না-কি দেখা যায়, হেড স্যার বলছিলেন।

হ্যাঁ দেখা যায়। চৈত্র মাসে দেখা যায়। আকাশ পরিষ্কার থাকে। চৈত্র মাস আসুক, আপনাকে দেখাব।

মবিনুর রহমান উঠে পড়লেন। তাঁর ক্লাসের সময় হয়ে গেছে। ঘন্টা পড়বার আগেই ক্লাসের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। দীর্ঘ আট বছরের নিয়ম। এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা ঠিক না।

ক্লাস টেন, সেকশান বি-র সঙ্গে ক্লাস। পড়বার বিষয়বস্তু হচ্ছে আলো। আলোর প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ। বড় চমৎকার বিষয়। আলো হচ্ছে একই সঙ্গে তরঙ্গ এবং বস্তু। কী অসাধারণ ব্যাপার! ক্লাস টেনের ছেলেগুলি অবশ্যই এইসব বুঝবে না, তবে বড় হয়ে যখন বুঝবে তখন চমৎকৃত হবে।

মবিনুর রহমান ক্লাসে ঢুকেই বললেন, আজ বাতাসেব আর্দ্রতা শতকরা আশি। যদিও বাইরে রোদ দেখা যাচ্ছে তবু আমার ধারণা সন্ধ্যানাগাদ বৃষ্টিপাত হবে। এখন তোমরা বলো আলোর গতিবেগ সেকেন্ডে কত ? যারা জানো ডান হাত তোল। যারা জানো না বাঁ হাত তোল।

সাতজন ছেলে ডান হাত তুলল। মবিনুর রহমানের মন খারাপ হয়ে গেল। তাঁর ধারণা ছিল সবাই ডান হাত তুলবে। মাত্র সাতজন ? ছেলেগুলি কি সায়েন্সে মজা পাচ্ছে না ? তা কী করে হয় ?

তুমি বলো, আলোর গতিবেগ কত ?

প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল, স্যার।

ভেরি গুড। এখন তুমি বলো— হ্যাঁ, তুমি ইয়েলো শার্ট তুমি বলো— আলোর গতি কি এর চেয়ে বেশি হতে পারে ?

জি-না স্যার। কেন পারে না ?

এটাই স্যার নিয়ম।

কার নিয়ম ?

প্রকৃতির নিয়ম।

ভেরি গুড। ভেরি ভেরি গুড। প্রকৃতির কিছু নিয়ম আছে যার কখনো কোনো ব্যতিক্রম নেই। ব্যতিক্রম হতে পারে না। যেমন ধর মাধ্যাকর্ষণ। একটা পাকা আম যদি গাছ থেকে পড়ে তা পড়বে মাটিতে। আকাশে উড়ে যাবে না। ইজ ইট ক্লিয়ার ?

জি স্যার।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারক কে ?

নিউটন।

নামটা তুমি এমনভাবে বললে যেন নিউটন হলেন একজন রাম-শ্যাম, যদু-মধু, রহিম-করিম, বজলু-ফজলু। নাম উচ্চারণে কোনো শ্রদ্ধা নেই। শ্রদ্ধার সঙ্গে নাম বলো।

ছাত্রটি মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, মহাবিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন।

মবিনুর রহমান শুকনো মুখে বললেন, একজন অতি শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানীর নাম অশ্রদ্ধার সঙ্গে বলার জন্যে তোমার শাস্তি হবে। ক্লাস শেষ হলে আজ বাড়ি যাবে না। পাটিগণিতের বারো প্রশ্নমালার একুশ এবং বাইশ এই দু'টি অঙ্ক করে বাড়ি যাবে। ইজ ইট ক্লিয়ার ?

ফোর্থ পিরিয়ড শেষ হবার আগেই আকাশে মেঘ জমতে শুরু করল। ঝুম বৃষ্টি নামল ক্লাসের শেষ ঘণ্টার পর। ভাসিয়ে নিয়ে যাবার মতো বৃষ্টি। মবিনুর রহমান টিচার্স কমনরুমে বসে রইলেন। স্কুল ফাঁকা হতে শুরু করেছে। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই সবাই নেমে পড়ছে। পুরা স্কুলে এখন মানুষ আছে তিনজন। দণ্ডুরি কালিপদ, মবিনুর রহমান এবং ক্লাস টেনের হলুদ শার্ট গায়ে দেয়া ছাত্র মফিজ। বারো প্রশ্নমালার অঙ্ক দু'টি সে কিছুতেই কায়দা করতে পারছে না।

মবিনুর রহমান চুপচাপ তাঁর চেয়ারে বসে আছেন। খোলা জানালায় বৃষ্টির ছাঁট আসছে। তিনি তাকিয়ে আছেন বৃষ্টির দিকে। তাঁর মন বেশ খারাপ। গত দশদিন ধরেই রোজ সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি হচ্ছে। দূরবিন নিয়ে আকাশ দেখা হচ্ছে না। বর্ষাকালের মেঘমুক্ত আকাশ দূরবিন দিয়ে দেখার জন্যে খুব ভালো। আকাশে ধুলোবালি থাকে না। অনেক দূরের নক্ষত্রও স্পষ্ট দেখা যায়।

মবিনুর রহমান উঁচু গলায় ডাকলেন, কালিপদ!

কালিপদ ছুটে এলো।

মফিজ নামের ছেলেটাকে দু'টা অঙ্ক করতে দিয়েছিলাম, অঙ্ক হয়েছে কি-না খোঁজ নিয়ে আস।

জি আচ্ছা স্যার।

তুমি স্কুল বন্ধ করে চলে যাও। আমাব প্রাইভেট টিউশ্যানি আছে। সন্ধ্যাবেলা স্কুল থেকে যাব। আমি তালা দিয়ে যাব।

জি আচ্ছা স্যার।

কালিপদ কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে জানাল, ছেলেটির অঙ্ক দু'টা এখনো হয় নি। মবিনুর রহমান তাঁর সামনের ডেস্কের ড্রয়ার থেকে সাদা কাগজ বের করলেন। অতি দ্রুত সেই কাগজে অঙ্ক দু'টি করলেন। কাগজের এক মাথায় লিখলেন— মফিজ, তুমি আরো মন দিয়ে পড়াশোনা করবে। প্রকৃতি তোমাকে যে মস্তিষ্ক দিয়েছে তা প্রথম শ্রেণীর। সেই মস্তিষ্ক ব্যবহার করা তোমার কর্তব্য।

কালিপদ, ছেলেটাকে এই কাগজটা দিয়ে আস। সে যেন দেখে দেখে অঙ্ক দু'টা বোর্ডে করে রাখে।

জি আচ্ছা।

অঙ্ক করা হলে তাকে চলে যেতে বলো।

জি, আচ্ছা। স্কুলঘর এখন পুরো ফাঁকা। মবিনুর রহমান চেয়ার ছেড়ে জানালার পাশে এসে দাঁড়ালেন। ঘড়িতে তখন বাজে ছ'টা। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি দুটা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা— এই চার ঘণ্টা তিনি একইভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাতাসে মাথার চুল না নড়লে তাঁকে মূর্তি বলেই মনে হতো। দীর্ঘ সময় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকায় এই ব্যাপারটা শুধু কালিপদ জানে। সে কাউকে তা বলে নি। মাঝে মাঝে এই মানুষটাকে তার ভয় ভয় করে অথচ মানুষটা ভালো। প্রতি মাসের তিন তারিখে বাড়ি ভাড়া বাবদ একশ টাকা তাকে দিচ্ছে। তবে কালিপদের ধারণা এই বর্ষাকালেই মানুষটা সাপের কামড়ে মারা যাবে। বাড়ি ভাড়া হিসেবে একশ টাকা আসা বন্ধ হতে বেশি দেপি নেই।

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ছ'টায় মবিনুর রহমান এই অঞ্চলের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, স্কুল কমিটির মেম্বর, প্রাক্তন চেয়ারম্যান আফজাল সাহেবের বাড়ির গেট খুলে ভেতরে ঢুকলেন। আফজাল সাহেবের বড় মেয়ে রূপাকে গত ছ'মাস ধরে তিনি পড়াচ্ছেন। রূপা এই বছর এসএসসি দেবে। গত বছর দেবার কথা ছিল, টাইফয়েড হওয়ায় দিতে পারে নি। এবার দিচ্ছে। রূপার ধারণা এবারো সে পরীক্ষা দিতে পারবে না। পরীক্ষার ঠিক আগে চিকেন পক্স কিংবা হাম হবে। মেয়েটি অসম্ভব বুদ্ধিমতী তবে পড়াশোনায় মন নেই। কখনো সময়মতো আসবে না। এমনো হয়েছে তিনি আধঘণ্টা বসে আছেন রূপার দেখা নেই।

আজ অবশ্যি সঙ্গে সঙ্গে চলে এলো। চোখ কপালে তুলে বলল, স্যার এই বৃষ্টির মধ্যে আসছেন। আমি ভাবলাম, আসবেন না।

মবিনুর রহমান বিরক্ত গলায় বললেন, ঝড়বৃষ্টির জন্যে আসি নি এরকম কী কখনো হয়েছে ?

একবার হয়েছে স্যার। মে মাসের দু' তারিখে আপনি আসেন নি। ঝড় হচ্ছিল তাই আসেন নি।

মবিনুর রহমান চুপ করে গেলেন। কথা সত্যি। মে মাসের দু' তারিখে তিনি আসেন নি। মেয়েটা এটা মনে করে রাখবে তা ভাবেন নি। এই মেয়েব অনেক কিছুই তিনি বুঝতে পাবেন না। যেমন, মাঝে মাঝে সে পড়া বন্ধ করে এক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। তিনি বিবক্ত হয়ে যখন ধমক দেন— কী ব্যাপার, পড়ছ না কেন ? তখনো চোখ নামিয়ে নেয় না। ক্লান্ত গলায় বলে, আজ আর পড়তে ভালো লাগছে না, স্যার। আজ আপনি যান। বলেই অতি গভীরের মতো উঠে চলে যায়।

রূপা বলল, স্যার, একটা গামছা এনে দিই। মাথাটা মুছে ফেলুন, মাথা ভিজ়ে গেছে।

অসুবিধা হবে না— তুমি অঙ্ক নিয়ে বস। বারো প্রশ্নমালার একুশ এবং বাইশ এই দুটা অঙ্ক কর তো দেখি পার কি-না।

রূপা নিমিষেই অঙ্ক দুটা করে ফেলল। মবিনুর রহমান মনে মনে বললেন, ভেরি গুড, ভেরি গুড। এই মেয়েটির সঙ্গে বেশিরভাগ কথাই তিনি মনে মনে বলেন।

স্যার, অঙ্ক দুটা হয়েছে ?

হ্যাঁ। আচ্ছা শোন, তোমাদের বাসায় কি তেঁতুল আছে ?

জি স্যার, আছে।

একটা পিরিচে করে সামান্য তেঁতুল আর খানিকটা চুন আন। পান খাওয়ার চুন।
কী করবেন স্যার ?

ছোটখাটো একটা এক্সপেরিমেন্ট। পিরিচটা দিয়ে তুমি অ্যালজেব্রা নিয়ে বস। কাল
করেছিলে দশ প্রশ্নমালা। আজ এগারো।

রূপা উঠে চলে গেল। ফিরতে অনেক দেরি করল। মেয়েটার এই এক অভ্যাস—
একবার উঠে গেলে ফিরতে অনেক দেরি করে। মবিনুর রহমান বিরক্ত মুখে অপেক্ষা
করতে লাগলেন। বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। এবার নিশ্চয় বন্যা হবে। এক বছর পর পর দেশে
বন্যা হচ্ছে। গত বছর হয় নি। এবার তো হবেই।

স্যার, নিন তেঁতুল। খানিকটা লবণও নিয়ে এসেছি। স্যার লবণ লাগবে ?

না। তোমাকে তো লবণ আনতে বলি নি। তুমি অ্যালজেব্রা নিয়ে বস।

মবিনুর রহমান আঙুল দিয়ে ডলে ডলে চুন এবং তেঁতুল মেশাচ্ছেন। রূপা নিঃশব্দে
অঙ্ক করে যাচ্ছে। মবিনুর রহমান এক সময় হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, রূপা অঙ্ক করা বন্ধ কবে
তার দিকে তাকিয়ে আছে। ঘোর-লাগা চোখের দৃষ্টি।

তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, কী ব্যাপার, কী দেখছ ? অঙ্ক কর।

আজ আর করব না, স্যার।

কেন ?

ভালো লাগছে না।

রূপা তাকিয়ে আছে। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছে না। মবিনুর রহমান চুন মেশানো তেঁতুল
খানিকটা জিভে লাগালেন। তিতা তিতা লাগছে। টক ভাব এখনো আছে। অম্ল এবং
ক্ষারের প্রশমন ক্রিয়া পুরোপুরি শেষ হয় নি বলে মনে হচ্ছে। আরো খানিকটা চুন
মেশানো দরকার। এবং একটু বোধহয় গরম করা দরকার।

রূপা !

জি স্যার।

আরেকটু চুন এনে দাও তো!

রূপা উঠে দাঁড়াল। ইতস্তত কবে বলল, আচ্ছা স্যার, আমার মধ্যে কি কোনো
পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন ?

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, কী পরিবর্তন ?

সত্যি লক্ষ্য করেন নি ?

না তো!

প্রথম আমার গায়ে ছিল সবুজ রঙের একটা শাড়ি। এখন একটা ডোরাকাটা শাড়ি।
যখন তেঁতুল আনতে বললেন, তখন শাড়ি বদলালাম।

ও!

সবুজ শাড়িটা ময়লা ছিল তো তাই বদলেছি।

ও আচ্ছা!

চুন নিয়ে রূপা এলো না। একটা কাজের মেয়ে একগাদা চুন দিয়ে গেল। সরু গলায় বলল, আপার মাথা ধরছে আইজ আর পড়ব না।

আচ্ছা।

আম্মা আফনেরে ভাত খাইয়া যাইতে বলছে।

না, ভাত খাব না। চলে যাব। শোন, আমি তেঁতুল আর চুন নিয়ে যাচ্ছি, কেমন? ঘরে বাড়তি ছাতা থাকলে আমাকে একটা ছাতা দাও।

বাড়তি ছাতা ছিল না।

মবিনুর রহমান বাড়িতে ফিরলেন কাকভেজা হয়ে। নদীর পাশ ঘেঁসে বাড়ি ফেরার বাস্তা। নদী ফুলে-ফেঁপে একাকার হয়েছে। কান পাতলেই নদীর ভেতর থেকে আসা হু-হু গর্জন শোনা যায়। খানিকটা ভয় ভয় লাগে। শুধু ভয় না। ভয়ের সঙ্গে এক ধরনের আনন্দও মেশানো থাকে।

মবিনুর রহমান বাড়ি ফিরেই রান্না চড়ালেন। হাঁড়িতে দু'ছটাক আন্দাজ পোলাওয়ার চাল, মুগের ডাল, কয়েক টুকরা আলু এবং তিন চামচ ঘি। অল্প আঁচে অনেকক্ষণ সিদ্ধ হবে। এক সময় অতি সুস্বাদু ঘন স্যুপের মতো একটা জিনিস তৈরি হবে। গরম গরম খেতে চমৎকার লাগবে। ডিম থাকলে ভালো হতো। ডিমটাও ছেড়ে দেওয়া যেত। প্রোটিন কম খাওয়া হচ্ছে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করতে করতে রাত দশটা বেজে গেল। বৃষ্টির বিরাম নেই। মনে হচ্ছে আকাশটা যেন অনেক জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে। মবিনুর রহমান একটা টর্চ এবং ছাতা হাতে ঘরে তালা দিয়ে বের হলেন। আজ রাতটা তিনি নৌকায় কাটাবেন। নৌকায় বিছানা বালিশ সবই আছে। প্রশস্ত পাটাতনে তোশক বিছানো। দু'পাশের দরজা লাগিয়ে নৌকায় শুয়ে থাকলে চমৎকার লাগবে। সারারাত নদীতে বৃষ্টি পড়ার শব্দ শোনা যাবে। বাতাসে নৌকা এপাশ-ওপাশ করবে। চারদিকে থাকবে নিশ্চিন্দ অন্ধকার। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাবে। সেই বিদ্যুৎ চমকে চারদিক আলো হয়ে আবার অন্ধকার হয়ে যাবে।

৩

মবিনুর রহমান নৌকার বিছানায় শোয় মাত্র ঘুমিয়ে পড়লেন। গাঢ় ঘুম, এত গাঢ় যেন মৃত্যুর কাছাকাছি। এই ঘুমের মধ্যেই তিনি অতি বিচিত্র একটি স্বপ্ন দেখলেন। যেন কয়েকজন বুড়ো মানুষ তাঁর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। সবার চেহারা এক রকম। তাকিয়ে থাকার ভঙ্গিও একরকম। সবার মুখেই এক ধরনের প্রচ্ছন্ন হাসি। সেই হাসি একই সঙ্গে কঠিন এবং কোমল। তাঁরা কথা বলতে শুরু করলেন।

সবাই এক সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁদের গলার স্বর এক রকম। সবাই এক সঙ্গে কথা বলার জন্যেই বোধকরি এক ধরনের অস্বাভাবিক রেজোনেন্স তৈরি হচ্ছে। শব্দটা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। শরীরের প্রতিটি কোষ ঝনঝন করে বাজছে। তার চেয়েও বড় কথা, ঘুমের মধ্যেই মবিনুর রহমানের মনে হলো এই বৃদ্ধদের তিনি আগেও স্বপ্ন দেখেছেন।

অতি দূর শৈশবে । যার স্মৃতি অস্পষ্টভাবে হলেও রয়ে গেছে ।

মবিনুর রহমান!

জি ।

তুমি কি মাতৃগর্ভের স্মৃতি মনে করতে পারছ ?

না ।

মাতৃগর্ভে যখন ছিলে তখন চারদিকে ছিল নিশ্চিন্দ অন্ধকার । এখনো কি চারদিকে অন্ধকার নয় ?

হ্যাঁ ।

মাতৃগর্ভে তুমি এক ধরনের তরল পদার্থের উপর ভাসছিলে— যাকে তোমরা বলো এমনোটিক ফ্লুয়িড । এখনো তুমি ভাসছ পানির উপর । দোল খাচ্ছ । খাচ্ছ না ?

জি ।

খানিকটা হলেও মাতৃগর্ভের মতো অবস্থা তৈরি হয়েছে । নয় কি ?

হ্যাঁ, তৈরি হয়েছে । আপনারা কে ?

আমরা হচ্ছি— নি ।

নি ?

হ্যাঁ— নি । আমরা স্বপ্ন তৈরি করি ।

বুঝতে পারছি না ।

এখন বুঝতে না পারলেও আস্তে আস্তে বুঝতে পারবে । আমরা তোমাকে বুঝতে সাহায্য করব । তোমাকে সাহায্য করার জন্যেই আমরা এসেছি । তুমি আমাদেরই একজন ।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না ।

তুমিও একজন নি ।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না ।

তোমার মধ্যে আছে প্রচণ্ড ক্ষমতা । তুমি এই ক্ষমতা ব্যবহার কর ।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না ।

মন দিয়ে শোন— তোমার ভেতর আছে প্রচণ্ড ক্ষমতা । অকল্পনীয় ক্ষমতা । ক্ষমতা ব্যবহার কর । স্বপ্ন দেখ । স্বপ্ন দেখ ।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না ।

মবিনুর রহমান ঘুমের ঘোরেই কাতর শব্দ করলেন, তারপর তলিয়ে গেলেন গভীর ঘুমে । ঘুম যখন ভাঙল তখন চারদিক আলো হয়ে আছে । অনেক বেলা হয়েছে, কড়া রোদ । দীর্ঘ আট বছর পর এই প্রথম মবিনুর রহমানের মনে হলো আজ কুলে না যেয়ে সারাদিন নৌকায় বসে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকলে কেমন হয় ?

নীলগঞ্জ হাইস্কুলের হেড মাস্টার হাফিজুল কবির সাহেব একটা ছোট সমস্যা নিয়ে বিব্রত। সমস্যাটির বয়স সাত মাস। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব সমস্যাই খানিকটা পাতলা হয়। তাঁরটা হচ্ছে না। বরং খানিকটা জোরাল হয়ে উঠছে। ব্যাপারটা এ রকম— ফুড ফর ওয়ার্ক প্রোগ্রামে গত মাসে নীলগঞ্জ হাই স্কুলকে পঞ্চাশ বস্তা গম দেয়া হয়েছিল। তিনি মবিনুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে গম আনতে গেলেন। উপজেলা চেয়ারম্যান সাহেব তাঁকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, একটা সমস্যা হয়েছে হেড মাস্টার সাহেব।

তিনি বললেন, কী সমস্যা ?

পঞ্চাশ বস্তা গম তো আপনাকে দিতে পারছি না। দশ বস্তা নিয়ে যান।

দশ বস্তা ?

হ্যাঁ, দশ। আর ক্যাশ টাকা দিচ্ছি পাঁচ হাজার।

হেড মাস্টার সাহেব বললেন, খাতায় সই করতে হবে পঞ্চাশ বস্তা গম ?

হ্যাঁ। নানান ফ্যাকরা রে ভাই। সাহায্যের গম বারো ভূতে লুটে খাচ্ছে। সংভাবে যে কিছু করব তার উপায় নেই। আপনি তো সবই বুঝেন। বুঝেন না ?

জি, বুঝব না কেন ?

দশ বস্তা গম নিয়ে যান। আর নিতে যদি না চান কোনো অসুবিধা নেই। আমার অন্য প্রোগ্রামে ট্রান্সফার করে দেব। নেবেন, না নেবেন না ?

নিব।

আসুন তাহলে খাতায় সই করুন।

হেড মাস্টার সাহেব বিচক্ষণ লোক। নিজে সই করলেন না, মবিনুর রহমানকে সই করতে বললেন। তিন মাস পর উপর থেকে চিঠি এলো— বিশেষ ব্যবস্থায় নীলগঞ্জ হাই স্কুলকে যে একশ বস্তা গম দেওয়া হয়েছিল তা কীভাবে খরচ হয়েছে ? উন্নয়নের কোন কোন খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা যেন অতি সত্বর জানানো হয়।

হেড মাস্টার সাহেব ছুটে গেলেন উপজেলা চেয়ারম্যানের কাছে। আমতা আমতা করে বললেন, একশ বস্তা গমের কথা কীভাবে এলো স্যার ?

চেয়ারম্যান সাহেব হাই তুলে বললেন, কাগজপত্রে তাই লেখা আছে, আপনি নিজে সই করে নিয়েছেন।

আমি সই করি নি স্যার, মবিনুর রহমান করেছে।

মবিনুর রহমানটা কে ?

আমাদের স্কুলের সায়েন্স টিচার।

তাহলে তো আপনি বেঁচেই গেলেন। তদন্ত কমিটি করে দেন। ব্যাটার চাকরি চলে যাক। সব সমস্যার সমাধান। নুন টিচার নিয়ে নেবেন। বাংলাদেশে সায়েন্স গ্র্যাজুয়েটের কোনো অভাব নেই। আমার এক ভাইস্তা আছে বিএসসি পাস করে ঘুরছে, তাকেও নিতে পারেন।

হেড মাস্টার সাহেব মুখ শুকনো করে বসে রইলেন। উপজেলা চেয়ারম্যান সাহেব চা এবং কেক খাওয়ালেন। কোনো কিছুই তাঁর মুখে রুচল না।

হেড মাস্টার সাহেব তদন্ত কমিটি তৈরির ব্যাপারটা অনেকদিন ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। ডিসট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার 'অতি জরুরি' সিল মেরে চিঠি পাঠিয়েছেন। আর দেরি করা যায় না। হেড মাস্টার সাহেব জালালুদ্দিন সাহেবকে অফিসে ডেকে পাঠালেন। সরু গলায় বললেন, জালাল সাহেব, আপনাকে তো একটা অপ্রিয় দায়িত্ব পালন করতে হয়। একটা তদন্ত কমিটি হচ্ছে, আপনি তার চেয়ারম্যান, তিনজন মেম্বর। আফজাল সাহেব, সেক্রেটারি সাহেব এবং উপজেলা চেয়ারম্যান। আমাদের মধ্যে আপনি সবচে' বয়োজ্যেষ্ঠ এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি— সেই হিসেবে আপনি চেয়ারম্যান।

জালাল সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, কীসের তদন্ত ?

হেড মাস্টার সাহেব গলা পরিষ্কার করতে করতে বললেন, কেলেংকারি ব্যাপার হয়েছে। স্পেশাল পারমিশনে নীলগঞ্জ স্কুলকে একশ বস্তা গম দেয়া হয়েছিল। মবিনুর রহমান সইসাবুদ করে গম নিয়েছে। আমাকে বলেছে দশ বস্তা। আমি তো তাই সরল মনে বিশ্বাস করলাম। মবিনকে অবিশ্বাস করার কি কোনো কারণ আছে ? আপনি বলেন। যাই হোক দু'মাস পর ডিও-র চিঠি পেয়ে আমি তো যাকে বলে খাভারস্ট্রাক, বজ্রাহত।

জালালুদ্দিন হতভম্ব গলায় বললেন, মবিন এই কাজ করেছে আমার বিশ্বাস হয় না। যদি আসমান থেকে ফেরেশতা নেমে এসে বলে— মোবিন গম চুরি করেছে। আমি বিশ্বাস করব না।

বিশ্বাস তো আমিও করি না। করি না বলেই তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান করলাম আপনাকে। আপনি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মবিনকে আজই কিছু বলার দরকার নেই...

অ মার তো মনে হয় আজই কথা বলা দরকার।

দঃকার মনে হলে বলবেন—আপনি হচ্ছেন তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান। আপনি যা ডিসাইড করবেন তাই হবে। থরো ইনকোয়ারি হবে।

আমি কিছুই বুঝছি না। কিছুই না— এমন একজন ভালো মানুষ!

ভালো মানুষ, মন্দ মানুষ চট করে চেনা যায় না জালাল সাহেব। চট করে মানুষ চেনা গেলে কি আর দুনিয়ার আজ এই হালত ? তবে আপনাকে একটা কথা বলি, গোড়া থেকেই কিন্তু এই লোকটাকে আমার পছন্দ না। তারপর যখন দু'মাস আগে নৌকা কিনে ফেলেছে— দুই না তিন হাজার টাকা দাম। নৌকা ঘাটে বাঁধা থাকে তখনো মনে খচ করে উঠল।

জালাল সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। হেড মাস্টার সাহেবের কথা শুনতে তাঁর এখন আর ভালো লাগছে না। টিচার্স কমনরুমে মবিনুর রহমানকে পেলেন না। দীর্ঘদিন পর এই মানুষট' স্কুল কামাই করেছে এবং বেছে বেছে আজকের দিনে। এটা কি পুরোপুরি কোনো কাকতালীয় ব্যাপার ? জালাল সাহেব ক্লাস সিন্ধে ধর্ম পড়াতে পড়াতে হঠাৎ বললেন, সুরা বার্ব ইসরাইলে দু'টা চমৎকার বাক্য আছে— 'মানুষ যেভাবে ভালো চায়, সেভাবেই মন্দ চায়।' মানুষের বড়ই তাড়াহুড়া।' তোমরা এই দুই লাইনের ব্যাখ্যা কর। তোমাদের যা মনে আসে তাই লেখ। আর শোন, কেউ হৈ চৈ করবে না। আমার মন আজ ভালো না। মন অসম্ভব খারাপ। বলতে বলতে জালাল সাহেবের চোখে পানি এসে গেল।

ক'দিন ধরে রোজ বিকেলে আকাশ অন্ধকার করে মেঘ করছে। আজ ব্যতিক্রম। সারাদিন আকাশ ছিল ঘন নীল। মেঘের ছিটোফঁটাও ছিল না। এখন সাড়ে ছ'টার মতো বাজে, এখনো আকাশ পরিষ্কার। গাছের মাথায় মাথায় ঝকঝকে রোদ।

রূপা এই সময় তার মা'র ঘরের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। জানালায় পর্দা দেয়া। পর্দা দেয়া থাকলেও পর্দার ফাঁক দিয়ে অনেক দূর দেখা যায়। ঠিক সাড়ে ছ'টায় রূপার মাস্টার সাহেব তাদের বাড়ির গেটে হাত রাখেন। হাত রাখার আগে পকেট থেকে ঘড়ি বের করে বিরক্ত চোখে তাকান। এই দৃশ্য দেখতে রূপার বড় ভালো লাগে।

তার কী যে হয়েছে! রোজ দুপুরের পর থেকেই এক ধরনের অস্বস্তি। অস্বস্তির সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কা : যদি না আসেন! যতই বিকেল হতে থাকে আশঙ্কা ততই বাড়তে থাকে। এক সময় বুকের ভেতর ধুকধুক শব্দ এত বেশি হয় যে মনে হয় সবাই শুনে ফেলছে। সাড়ে ছ'টার পর অবধারিতভাবে এই শব্দ কমে যায়। নিজে থেকে তখন খুব ক্লান্ত লাগে। সারাদিন খুব পরিশ্রমের কোনো কাজ করলে কাজের শেষে যে রকম ক্লান্তি, অনেকটা সে রকম ক্লান্তি।

এই যে ব্যাপারগুলি তার মধ্যে হচ্ছে এটা কি অন্যায়? অন্যায় তো বটেই, তবে খুব বেশি অন্যায় নিশ্চয়ই না। সে তেমন কিছু তো করে না। স্যার যা পড়তে বলেন পড়ে। যে অঙ্ক করতে বলেন করে। বাড়ির কাজ করে। মাঝে মাঝে অবশ্যি সব কেমন এলোমেলো হয়ে যায়—তখন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। এই সময় শরীরে এক ধরনের ব্যথা বোধ হয়। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়। বমি বমি ভাব হয়। তখন সামনে থেকে উঠে গিয়ে বমি করতে হয়। তবে এই ব্যাপারগুলি ঘনঘন হয় না। ঘনঘন হলে সবার চোখে পড়ত। ভাগ্যিস কিছুদিন পর পর হয়।

রূপা তার স্যারকে গত ছ'মাসে গভীর মনোযোগে লক্ষ করেছে। এত মনোযোগ দিয়ে এর আগে সে কাউকেই লক্ষ করে নি। ভবিষ্যতেও করবে না। কারণ করার প্রয়োজন নেই। রূপার ধারণা এই মানুষটিকে সে যতটা ভালো জানে অন্য কেউ তা জানে না। এমনকি মানুষটা নিজেকে এতটা জানেন না।

মানুষটা কি জানেন যে তিনি মাঝে মাঝে অসম্ভব অন্যমনস্ক হয়ে যান? হ্যাঁ, তা নিশ্চয়ই জানেন। তবে অন্যমনস্ক হবার আগ মুহূর্তে তিনি কী করেন তা-কি জানেন? না, জানেন না। এটা জানে শুধু রূপা। এই মানুষটা যখন বাঁ হাত দিয়ে খুব শান্ত ভঙ্গিতে মাথার চুল ভাঁজ করতে থাকেন তখন বোঝা যাবে তিনি অন্যমনস্ক হতে শুরু করেছেন। অন্যমনস্ক অবস্থায় মানুষটা কী ভাবেন তা রূপার খুব জানার ইচ্ছা।

রোজই ভাবে জিজ্ঞেস করবে। জিজ্ঞেস করা হয় না। শেষ মুহূর্তে লজ্জা লাগে। তবে একদিন সে নিশ্চয় জিজ্ঞেস করবে। হয়তো আজই করবে।

মানুষটা রূপাকে খুবই বাচ্চা মেয়ে বলে মনে করেন। এটা যেমন সত্যি তেমনি এটাও সত্যি রূপা যখন কিছু বলে তখন তিনি খুব আগ্রহ নিয়ে শোনেন এবং রূপার প্রতিটি কথা বিশ্বাস করেন। রূপা প্রচুর মিথ্যা কথা বলে। খুব যে গুছিয়ে মিথ্যা বলে তাও না, অথচ মানুষটা তা বিশ্বাস করেন। রূপার তখন খুব খারাপ লাগে।

একবার রূপা বলল, মশা যে খুব বুদ্ধিমান প্রাণী তা কি স্যার আপনি জানেন ?

তিনি অবাক হয়ে বললেন, জানি না তো! খুব বুদ্ধিমান হবার তো কথা না। ক্ষুদ্র প্রাণীর মস্তিষ্কের পরিমাণ অতি অল্প।

স্যার মস্তিষ্ক অল্প হলেও মশা খুব বুদ্ধিমান। আমি পরীক্ষা করে বের করেছি।

মানুষটা এতে খুব উৎসাহিত বোধ করলেন। তাঁর চোখ চকচক করতে লাগল। মাথা সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে এলো, আবেগশূন্য কণ্ঠস্বরেও খানিকটা আবেগ চলে এলো। তিনি ছেলেমানুষি কৌতূহল নিয়ে বললেন, কী পরীক্ষা ?

রূপার লজ্জা লাগছে। কারণ এখন সে যা বলবে তার পুরোটাই ডাहा মিথ্যা। অনেক ভেবেচিন্তে বের করেছে।

পরীক্ষাটা করেছি আমার মামাতো বোনকে দিয়ে। মামাতো বোনের নাম ইয়াসমিন। আমার দুই বছরের ছোট। সে মশারি খাটিয়ে ঘুমুতে পারে না, তার নাকি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। আমি একদিন লক্ষ করলাম, যখন সে জেগে থাকে তখন মশা খুব কম কামড়ায়। যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন খুব বেশি কামড়ায়। বুদ্ধিমান বলেই তারা অপেক্ষা করে কখন মানুষটা ঘুমিয়ে পড়বে। আরাম করে রক্ত খাওয়া যাবে। ঠিক না স্যার ?

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এমন হেলাফেলা করে হয় না রূপা। আরো সূক্ষ্মভাবে করতে হয়। যেমন ধর, ঘুমুবার আগে ঘণ্টায় ক'টা মশা কামড়াচ্ছে। ঘুমুবার পর কটা। একজনকে দিয়ে পরীক্ষা করলেও হবে না। অনেককে দিয়ে করতে হবে। বুঝতে পারছ কী বলছি ?

জি স্যার।

তবে তোমার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে বুঝতে হবে মশার মনে মৃত্যুভয় আছে। মৃত্যুভয় আছে বলেই জাগ্রত মানুষকে কামড়াচ্ছে না। মৃত্যুভয় বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ। শুধুমাত্র নির্বোধদেরই মৃত্যুভয় থাকে না।

স্যার আমার কিন্তু মৃত্যুভয় নেই। আমি কি নির্বোধ ?

এইসব কথা এখন থাক। ফিজিক্স বইটা খোল তো।

ফিজিক্স পড়তে আমার ভালো লাগে না স্যার।

ফিজিক্স পড়তে ভালো লাগে না ? তুমি এইসব কী বলছ ? খুবই অন্যায় কথা বলছ। তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।

রূপা বিস্মিত হয়ে বলল, কার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব ?

তোমার নিজের কাছে।

আচ্ছা স্যার ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। এবং নিজেকে ক্ষমা করে দিলাম।

বই খোল, থার্ড চেক্টার বের কর— স্থির বিদ্যুৎ।

রূপা নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে থার্ড চেক্টার বের করল। মানুষটা হাত নেড়ে নেড়ে স্থির বিদ্যুৎ বুঝাচ্ছেন। এমনভাবে বুঝাচ্ছেন যেন স্থির বিদ্যুৎ তিনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। রূপা পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে। আবার বমি বমি লাগছে। মাথা

ঘুরছে। কেন এ রকম হয় ? তার কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে ? কী আছে এই মানুষটার মধ্যে, কেন তাকে এত ভালো লাগে ?

ছ'টা চল্লিশ বাজে।

এখনো মানুষটার দেখা নেই। আকাশ পরিষ্কার। ঝড়-বৃষ্টি কিছুই নেই। এ রকম তো হবার কথা নয়। রূপার কেমন যেন লাগছে। গা কাঁপছে, ঘাম হচ্ছে। মাথার ভেতরটা যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। রূপা বারান্দায় এসে দাঁড়াল। তাদের উঠোনে অনেক গাছপালা। গাছপালার জন্যেই রাস্তা দেখা যায় না। রূপার মনে হলো, গেটের কাছে দাঁড়ালেই সে দেখবে লম্বা মানুষটা মাথা নিচু করে দ্রুত আসছেন। দেরি করার জন্যে রূপা আজ কিছু কঠিন কথা শোনাবে। অবশ্যই শোনাবে। ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই আজ দেরি করবেন কেন ?

রূপা গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকে ডিসট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার অনেকখানিই দেখা যায়। রাস্তায় লোকজন আছে কিন্তু ঐ মানুষটা নেই। রূপার মনে হলো খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ করে তারপর যখন সে তাকাবে তখনই মানুষটাকে দেখতে পাবে। অবশ্যই পাবে। সে দীর্ঘ সময় চোখ বন্ধ করে রইল, এক সময় চোখ মেলল। রাস্তা ফাঁকা, কেউ নেই।

সন্ধ্যা মিলাচ্ছে, আকাশ গাঢ় রক্তবর্ণ। রূপা এখনো গেটের বাইরে। রূপার মা এক সময় বারান্দায় এসে বিস্মিত গলায় বললেন, তরসন্ধ্যায় বাইরে কেন রে মা ?

রূপা জবাব দিল না।

আয়, ঘরে আয়।

রূপা ঘরে ঢুকল। রূপাব মা বললেন, তোর কী হয়েছে ? তাকে এমন লাগছে কেন ? চোখ লাল।

রূপা ক্লান্ত গলায় বলল, ম'নে হয় আমার জ্বর আসছে।

কই, গা তো ঠাণ্ডা!

শরীরটা ভালো লাগছে না মা।

যা শুয়ে থাক।

আচ্ছা। স্যার এলে বলবে, মাজ আমি পড়ব না।

বলব।

রূপা ঘর অন্ধকার করে শুয়ে রইল। তার প্রতি মুহূর্তেই মনে হতে লাগল— এই বুঝি স্যার এসেছেন।

স্যাব এলেন না, তবে বাত দশটায় রূপার বড় ভাই রফিক তার স্ত্রী এবং দুই কন্যা নিয়ে খুলনা থেকে বিনা নোটিশে এসে উপস্থিত হলো। সে তিন বছর পর গ্রামের বাড়িতে এসেছে। তার দ্বিতীয় মেয়ে রুবা'বাকে এ বাড়ির কেউ দেখে নি। সেই মেয়ে এখন ফড়ফড় করে কথা বলে। যা দেখছে সে দিকেই ডান হাতের পাঁচ আঙুল বাড়িয়ে বলছে, এটা কী ? বড় মেয়ের নাম জেবা। এই মেয়ে নিঃশব্দবতী, তার মুখে কোনো কথা নেই। রূপার মা ছেলেকে এবং ছেলের বৌকে জড়িয়ে ধরে ক্রমাগত কাঁদছেন। রূপারও অসম্ভব

ভালো লাগছে। সে ভাইয়ের ছোট মেয়েকে কোলে নিয়ে বাগানে হাঁটছে। মেয়েটি এক সময় আকাশের চাঁদের দিকে হাতের পাঁচ আঙুল মেলে বলল, এটা কী ?

রূপা বলল, এটা চাঁদ। দেখেছ কত সুন্দর!

কয়েকটা জোনাকি উড়ে গেল। রুবাবা বলল, এটা কী ?

এর নাম জোনাকি। এরা চাঁদের কণা গায়ে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কী সুন্দর তাই না রুবাবা ?

একটা বাদুড় উড়ে যাচ্ছিল। রুবাবা বলল, এটা কী ?

রফিক এক সময় বারান্দায় এসে দাঁড়াল। তার পেছনে পেছনে বাড়ির সবাই। রফিক তার মাকে বলল, রূপা তো মা পরীর মতো সুন্দর হয়েছে। আশ্চর্য!

ভাইয়ের কথা শুনে রূপার চোখে কেন জানি পানি এসে গেল।

রফিক বলল, এই রূপা! অঙ্ককারে বাগানে ঘুরছিঁস ? সাপখোপ আছে না ?

রূপা হালকা গলায় বলল, অঙ্ককার কোথায় ? দেখেছ না কত বড় চাঁদ। দিনের মতো আলো।

রূপার বাবা বাড়িতে নেই। মামলার ব্যাপারে নেত্রকোনা গিয়েছেন। কয়েকদিন সেখানে থাকবেন। তাঁকে খবর দেবার জন্য রাতেই লোক গেল। একজন গেল ঘাটে। মাছ কিনতে।

ঘাটে বড় বড় মাছ পাওয়া যায়। বেপারিরা ঢাকায় চালান দেবার জন্যে কিনে এনে জড়ো করে।

৬

মবিনুর রহমান নৌকার ছাদে বসে আছেন। নদীতে জোছনা যেন গলে গলে পড়ছে। পৃথিবী তাঁর কাছে এত সুন্দর এর আগে কখনো মনে হয় নি। এই ব্যাপারটাও তাঁর কাছে অস্বাভাবিক লাগছে। পৃথিবীর সৌন্দর্য নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তিনি কবি নন। বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। প্রকৃতির সৌন্দর্যের চেয়ে প্রকৃতির নিয়ম-নীতির সৌন্দর্য তাঁকে অনেক বেশি আকর্ষণ করে। আজ সারাদিন তিনি কিছু খান নি। কারণ ঘবে কোনো খাবার নেই। সব এক সঙ্গে শেষ হয়েছে। হরলিস্কের একটা কৌটায় চিড়া ছিল। মুখ খুলে দেখা গেল পোকা পড়ে গেছে। ডালের টিনে ডাল আছে। দুপুরে একমুঠ ডাল চিবিয়ে খেলেন। নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসার জোগাড় হলো। বিকেল পর্যন্ত তিনি ক্ষিধেয় কষ্ট পেয়েছেন। এখন আর পাচ্ছেন না। ববং এখন মনে হচ্ছে পৃথিবীর সৌন্দর্য দেখতে হয় ক্ষুধার্ত অবস্থায়। ক্ষুধার্ত মানুষের স্নায়ু থাকে তীক্ষ্ণ। আহারে পরিতৃপ্ত একজন মানুষ ভোঁতা স্নায়ু নিয়ে তেমন কিছু বোঝে না।

রাত ন'টার দিকে জালালুদ্দিন এসে উপস্থিত হলেন।

ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে অনেক ডাকাডাকি করলেন। কেউ সাড়া দিল না। সাপেব ভয়ে তিনি ঘরে ঢুকলেন না। নদীর দিকে রওনা হলেন। ঘরে যখন নেই। নৌকায় থাকতে পারে। না-কি সাপের কামড়ে ঘরে মরে পড়ে আছে ?

দূর থেকে জালালুদ্দিনের মনে হলো নৌকার উপর একটা পাথরের মূর্তি বসে আছে। জীবন্ত মানুষ এইভাবে বসে থাকতে পারে না। সামান্য হলেও নড়াচড়া করে। জালালুদ্দিন ডাকলেন, মবিন, এই মবিন!

পাথরের মূর্তি ডাক শুনতে পেল না। জালালুদ্দিনের কেন জানি মনে হচ্ছিল শুনতে পাবে না। চিৎকার করে ডাকলেও এই মানুষ কিছু শুনবে না। গায়ে ঝাঁকি দিয়ে তাকে জাগাতে হবে।

তিনি নৌকায় উঠে এলেন।

মবিনুর রহমান চমকে উঠে বললেন, আপনি!

স্কুলে যাও নাই, খোঁজ নিতে আসলাম। করছ কী?

জ্যোৎস্না দেখছি।

কবি-সাহিত্যিকরা জ্যোৎস্না দেখে বলে শুন— তুমি হলে গিয়ে সায়েন্সের লোক। আজ স্কুলে যাও নাই কেন? শরীর ভালো আছে?

জি, শরীর ভালোই আছে।

শরীর ভালো তো স্কুলে যাও নাই কেন? সারাদিন করেছ কী? ঘরে বসে ছিলে?

জি-না। নৌকায় ছিলাম। কিছু করছিলাম না— এই দৃশ্য-দৃশ্য দেখছিলাম।

কী দৃশ্য দেখছিলে?

সন্ধ্যাবেলা কয়েক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল। দেখতে খুব ভালো লাগল। পাখির ঝাঁকে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস লক্ষ করলাম। সব ঝাঁকে পাখি থাকে বেজোড় সংখ্যা।

এর মধ্যে ইন্টারেস্টিং কী?

খুবই ইন্টারেস্টিং। পাখিদের নিয়ম হচ্ছে এরা সব সময় জোড়ায় জোড়ায় থাকে। একটা পুরুষ পাখির সঙ্গে একটা মেয়ে পাখি থাকবেই। কিন্তু ঝাঁকগুলোয় একটা পাখি আছে সঙ্গীহীন। এর কারণটা কী? আর এই নিঃসঙ্গ পাখিটা পুরুষ না মেয়ে এটাও আমার জানার ইচ্ছা। কীভাবে সম্ভব হবে বুঝতে পারছি না। কীভাবে এটা বের করা যায় বলুন তো:

জালালুদ্দিন কিছু বললেন না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। এই মানুষটিকে তিনি আট বছর ধরে চেনেন। তবু মনে হচ্ছে আট বছরে ঠিকমতো চেনা হয় নি।

মবিন।

জি।

ইয়ে একটা কাজে তোমার কাছে এসেছিলাম।

কী কাজ?

ফুড ফর ওয়ার্ক প্রোগ্রামে তুমি একবার কিছু গম এনেছিলে মনে আছে?

হ্যাঁ— মনে আছে।

কয় বস্তা গম ছিল?

দশ বস্তা।

তোমার পরিষ্কার মনে আছে তো?

মনে থাকবে না কেন, আমি নিজে সই করে আনলাম ।

দশ বস্তাই ছিল ? এর বেশি না ?

বেশি থাকবে কেন ? অবশ্যি বস্তা আমি গুনি নাই । হেডস্যার গুনলেন । আমি শুধু সই করে দিয়েছি ।

হেড স্যার বস্তা গুনেছিলেন ?

এইসব জিঙ্কস করছেন কেন ?

এমনি । এমনি জিঙ্কস করছি । তোমার ঘবে কি চায়ের ব্যবস্থা আছে ?

না, আমি তো চা খাই না ।

চায়ের একটা বাজে নেশা হয়েছে । বিকালে চা না খেলে ভালো লাগে না । আচ্ছা আসছি যখন তোমার চোঙটা দিয়ে আকাশ দেখে ফই । শনির বলয় দেখা যাবে না ?

আজ দেখা যাবে না । চাঁদের আলো খুব বেশি ।

তাহলে থাক । নৌকায় বসে থাকতে তো ভালোই লাগছে । বড় সৌন্দর্য । কোরান মজিদে আল্লাহপাক কী বলেছেন জানো ? সুরা কাহাফ-এর সপ্তম পারায় আছে— পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে আমি সেগুলিকে তার শোভা কবেছি । এই অর্থ ধরলে চন্দ্র হচ্ছে পৃথিবীর শোভা । কি, ঠিক না ?

মবিনুর রহমান জবাব দিলেন না । তার মাথায় চমৎকার একটা চিন্তা এসেছে । যদি পৃথিবীর আনন্দ গতি না থাকত তাহলে পৃথিবীর একদিকে থাকত সূর্যের আলো, অন্যদিকে চির অন্ধকার । তখন যদি চাঁদটার অবস্থান এমন হতো যে, চির-অন্ধকার পৃথিবীতে থাকবে চির-জ্যোৎস্না— তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াতে ? সেই চির জ্যোৎস্নাব জগতের গাছগুলি নিশ্চয়ই অন্যরকম হতো । মানুষগুলিও হতো অন্যরকম । সেই অন্যরকমটা কী রকম ?

জালালুদ্দিন ডাকলেন, মবিন!

মবিন জবাব দিলেন না । তাঁর সমস্ত চিন্তা-চেতনায় আছে চির-জ্যোৎস্নার দেশ । ঠিক এই রকম অবস্থায় মবিনুর রহমান দ্বিতীয় স্বপ্নটা দেখলেন । এই স্বপ্ন জাগ্রত অবস্থায় ঘোরের মধ্যে দেখা । কাজেই তাকে হয়তো স্বপ্ন বলা যাবে না । মবিনুর রহমান স্পষ্ট দেখলেন— অসংখ্য বুড়ো মানুষ তাঁর দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে । তারা এক সঙ্গে বলে উঠল— হচ্ছে, তোমার হচ্ছে । তুমি একজন প্রথম শ্রেণীর নি । তুমি তোমাব প্রচণ্ড ক্ষমতা ব্যবহার কর ।

মবিন! এই মবিন!

জি ।

কী হচ্ছে তোমার, এই রকম কবছ কেন ?

কী করছি ?

গৌ গৌ শব্দ করছিলাম ।

মবিনুর রহমান ক্লান্ত গলায় বললেন, স্বপ্ন দেখছিলাম ।

স্বপ্ন দেখছিলে মানে ? তুমি ঘুমুচ্ছিলে না-কি ?

মবিনুর রহমান বিব্রত গলায় বললেন, ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

৭

রূপার বড় ভাই রফিক খুব আমুদে মানুষ। হৈ চৈ করতে পছন্দ করে। লোকজন জড়ো করে আড্ডা দেয়ায় তার খুব আগ্রহ। সে আসার পর থেকে রূপাদের বাড়িতে প্রচুর লোকজন। আসছে, যাচ্ছে, চা খাচ্ছে। বড় চায়ের কেতলি চুলায় আছেই।

বাড়ি-ভর্তি মানুষ, কিন্তু রূপার অস্থিরতা কমছে না। সে খুব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছে, পারছে না। মনে হচ্ছে এ জীবনে আর কোনোদিনও সে স্বাভাবিক হতে পারবে না। রফিকের এক গল্প শুনে সে খুব শব্দ করে হাসল। রফিক বিস্মিত হয়ে বলল, হাসছিস কেন?

রূপা ক্ষীণ গলায় বলল, হাসির গল্প তাই হাসলাম।

আমি তো মোটেই হাসির গল্প বলি নি। আমাদের এক কলিগের স্ত্রী কীভাবে এ্যাক্সিডেন্ট করে পঙ্গু হয়ে গেছে, সেই গল্প করলাম। এর মধ্যে হাসির তো কিছু নেই।

রূপা চূপ ব'র রইল। ভাইয়ার দিকে চোখ তুলে তাকাতেও এখন তার ভয় ভয় লাগছে। মনে হচ্ছে ভাইয়ার দিকে তাকালেই সে সব কিছু বুঝে ফেলবে।

রূপা!

জি।

তোব কী হয়েছে বল তো?

কিছু হয় নি।

আমার তো মনে হয় কিছু-একটা হয়েছে। তুই কারো কথাই মন দিয়ে শুনছিস না। তোর মধ্যে একটা ছটফটানি ভাব চলে এসেছে। আগে তো তুই এমন ছিলাি না।

মানুষ তো বদলায় ভাইয়া।

অবশ্যই বদলায়-- এমনভাবে বদলায় না! তুই মাকে ডেকে আন তো, মাকে জিজ্ঞেস করি।

তাকে জিজ্ঞেস করার কী আছে?

ডেকে আনতে বলছি, ডেকে আন।

রূপা মাকে ডেকে নিয়ে এলো। নিজ সামনে থাকল না। থাকতে ইচ্ছা করল না। সে লক্ষ করেছে তাকে নিয়ে বাড়িতে ঘনঘন বৈঠক হচ্ছে। বৈঠকে এমন কিছু আলোচনা হচ্ছে যেখানে তার উপস্থিতি কাম্য নয়। সবাই নিচু গলায় কথা বলছে— সে কাছে এলেই থেমে যাচ্ছে। এর মানে কী?

রূপা বাগানে নেমে গেল। সাতটা বাজতে বেশি বাকি নেই। রূপা নিশ্চিত আজ স্যার আসবেনই। আজ ছ'তারিখ। ছ' তারিখ তার জন্যে খুব লাগি। ক্লাস এইটে বৃত্তি পাবার খবর সে পেয়েছিল ছ'তারিখে। মবিনুর রহমান স্যার প্রথম এ বাড়িতে এসেছিলেনও ছ'তারিখে। রূপা লক্ষ করল ভাইয়া মা'র সঙ্গে কথা বলছে এবং আড়চোখে

তাকে দেখছে। রূপা এমন ভাব করল যেন সে বাগানের গাছগুলি দেখছে। যদিও গাছপালার প্রতি তার তেমন মমতা নেই।

বারান্দায় জেবা এসে দাঁড়িয়েছে। সে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রূপার দিকে। এই মেয়েটির চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু আছে যে অস্বস্তি বোধ হয়। মনে হয় এই মেয়েটার দুটা চোখের ভেতরও কয়েকটা চোখ আছে। এক সঙ্গে অনেকগুলি চোখ যেন তাকে দেখে। রূপা জেবার দিকে তাকিয়ে বলল, বাগান দেখবে জেবা ?

জেবা হ্যাঁ-না কিছু বলল না, তবে বাগানে নেমে এলো।

রূপা বলল, এই বাগানের নাম কী জানো ? জংলি বাগান। কোনো যত্ন নেই—গাছপালায় জঙ্গল হয়ে আছে। তাই জংলি বাগান।

জেবা কিছু বলল না। এই মেয়েটা একেবারেই কথা বলে না।

আমাদের এই জংলি বাগান তোমার কাছে কেমন লাগছে জেবা ?

জেবা নিশ্চুপ। যেন সে পণ করেছে কোনো কথা বলবে না। রূপা হাসতে হাসতে বলল, তুমি কি কারো সঙ্গেই কথা বলো না ?

জেবা হাসল। ঠিক হাসিও না। তার ঠোঁট বাঁকাল না, তবে চোখে হাসি ঝিলিক খেলে গেল। সে এবার স্পষ্ট গলায় বলল— তুমি কার জন্য অপেক্ষা করছ ফুপু ?

রূপা চমকে উঠে বলল, কারো জন্যে অপেক্ষা করছি না তো! আমি কারো জন্যে অপেক্ষা করছি এটা তোমার মনে হলো কেন ?

জেবা এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বাগান থেকে উঠে বারান্দায় চলে গেল। রফিক হাসিমুখে বলল, কী মা বাগান ভালো লাগল না ? জেবা জবাব দিল না। রফিক আবার বলল, আমাদের এই বাড়ি তোমার পছন্দ হয়েছে তো মা ? জেবা এ প্রশ্নের উত্তরেও কিছু বলল না। তাকে আরো প্রশ্ন করা হতে পারে এই ভয়েই হয়তোবা বাড়ি ব ভেতরে চলে গেল।

রফিকের মা বললেন, তোর এই মেয়ে বোধহয় আমাদের কাউকে পছন্দ করেছে না। কারো কোনো কথার জবাব দেয় না। রফিক বলল, ও এ রকমই মা। কথা বলার ইচ্ছা হলেই কথা বলবে। ইচ্ছা না হলে বলবে না। খুব সমস্যা করছে। ঢাকায় নিয়ে ডাক্তার দেখাব।

ডাক্তার কী করবে ?

সাইকিয়াট্রিস্ট, ওরা এইসব ব্যাপার জানে। বাচ্চারা থাকবে বাচ্চাদের মতো। ওকে দেখ কেমন বড়দের মতো ভঙ্গি করে ঘুরে। ওর কথা বাদ দাও মা। এখন রূপার ব্যাপারটা বলো। ওর হয়েছে কী ?

কিছু হয় নি তো!

আগেও তো বললে কিছু হয় নি। ভালো করে ভেবে বলো ও কাবো শ্রেম-ট্রেমে পড়ে নি তো ?

কী বলিস তুই।

আজগুবি কোনো কথা বলছি না মা, রূপার ভাবভঙ্গি আমার ভালো লাগছে না বলেই বলছি। শেষটায় বিয়ে ঠিকঠাক হবার পর দেখা যাবে সে বঁকে বসেছে।

এরকম কিছু নাই।

জানো তো ভালোমতো ?

জানি।

কিন্তু আমার ভালো লাগছে না। রূপাকে দেখ কেমন মূর্তির মতো দেখাচ্ছে। আগে তো এ রকম ছিল না।

রফিক ঘরের ভেতরে চলে গেল। ছোট মেয়ে রুবা বা তার স্বরে চিৎকার করছে। সে ছাড়া এই মেয়েকে কেউ সামলাতে পারে না। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এত চিৎকারেও রূপার কোনো ভাবান্তর নেই। যেন সে কিছু শুনছে না। এক ধরনের ঘোরের মধ্যে আছে।

রূপা সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত বাগানে বসে রইল। বাঁধানো বকুল গাছের নিচে বসার ব্যবস্থা আছে।

রফিক বাইরে বেরোতে গিয়ে এই দৃশ্য দেখে বিবক্ত গলায় বলল, এখনো বাগানে বসে আছিস কেন ?

মাথা ধরেছে ভাইয়া। ফ্রেশ বাতাস নিচ্ছি।

বর্ষার সময়, সাপাখোপ বেরোবে। উঠে আয়।

রূপা উঠে এলো। রফিক বিস্মিত হয়ে বলল, তুই কি কাঁদছিলি না-কি ?

কাঁদব কেন শুধু শুধু ?

তোর গাল ভেজা, এই জন্যেই জিজ্ঞেস করছি।

রূপা শাড়ির আঁচলে গাল মুছতে মুছতে বলল, 'হ্যাঁ কাঁদছিলাম। মাথার যন্ত্রণায় কাঁদছিলাম। মাঝে মাঝে এমন যন্ত্রণা হয়। মাথাটা কেটে ফেলে দিতে ইচ্ছা করে।

সে কী! যন্ত্রণা খুব বেশি ?

হঁ।

ডাক্তার দেখিয়েছিস ?

না।

তোদের নিয়ে বড় যন্ত্রণা। অসুখ-বিসুখ হবে, ডাক্তার দেখাবি না ? দেশে ডাক্তার আছে কী জন্যে ? আচ্ছ' আমি বিধুবাবুকে নিয়ে আসব।

কাউকে আনতে হবে না।

যা ঘরে গিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাক। বাতে তোর সাথে আমার কিছু জরুরি কথা আছে।

এখন বলো।

না এখন না। রাতে বলব। এখন একটা কাজে যাচ্ছি। আর শোন, তোর যদি বিশেষ কোনো কথা বলার থাকে যা আমাকে বা মাকে বলতে লজ্জা পাচ্ছিস তাহলে তোন ভাবিকে বলবি।

আমার আবার বিশেষ কী কথা...

থাকতেও তো পারে। এই জন্যেই বলছি।

রূপা নিজের ঘরে এসে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে রইল। তার এখন সত্যি সত্যি মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। অসম্ভব কষ্টও হচ্ছে। আজ ছ' তারিখ, কিন্তু স্যার এলেন না। উনার

কি কোনো অসুখ-বিসুখ করেছে ? মোতালেবকে কি পাঠাবে খোঁজ নিতে ? যদি পাঠায় কেউ কি তা অন্য চোখে দেখবে ? অন্য চোখে দেখার তো কিছু নেই। একটা লোকের অসুখ-বিসুখ হলে খোঁজ নিতে হবে না!

হারিকেন হাতে মিনু ঘরে ঢুকল। কোমল গলায় বলল, তোমার নাকি প্রচণ্ড মাথাব্যথা ?

হ্যাঁ, ভাবি।

মাথায় হাত বুলিয়ে দেব ?

না, তুমি এখন যাও। আমার একা থাকতে ইচ্ছা করছে। কিছুক্ষণ একা থাকলে মাথা ধরাটা কমবে।

এরকম কি তোমার প্রায় হয় ?

হুঁ।

মশারি খাটিয়ে শোও। মশা কামড়াচ্ছে তো।

মশা কামড়াচ্ছে না ভাবি, তুমি যাও, হারিকেন নিয়ে যাও— আলো চোখে লাগছে।

মিনু হারিকেন নিয়ে চলে যেতে যেতে বলল, তোমার স্যার এসেছিলেন। উনাকে বলেছি আজ পড়তে পারবে না। তোমার মাথাব্যথা। তাঁকে চলে যেতে বলেছি।

রূপা উঠে বসল। তার বুক ধক্ধক করছে। মনে হচ্ছে, সে নিজেকে সামলাতে পারবে না। সে কাঁপা গলায় বলল, ভাবি উনি কি চলে গেছেন ?

জানি না। বলেছিলাম তো চা খেয়ে তারপর যেতে। বসেছেন কি-না জানি না।

ভাবি প্লিজ, উনাকে একটু বসতে বলো।

তোমার মাথাব্যথা ?

এখন কমেছে। অনেকখানি কমেছে, জরুরি কিছু পড়া আছে দেখে নিই।

কাল আসতে বলি ?

না ভাবি না।

মিনু হারিকেন হাতে চলে গেল। রূপার অস্বাভাবিক আগ্রহ তাঁর চোখ এড়াল না। অবশ্য সে এটাকে তেমন গুরুত্ব দিল না। এই বয়েসী মেয়েদের আচার-আচরণ কোনো ধরাবাঁধা পথে চলে না। তাদের আগ্রহ ও অনাগ্রহ কোনোটারই সাধাবণত কোনো ব্যাখ্যা থাকে না। এরা চলে সম্পূর্ণ নিজেব খেয়ালে।

মবিন সাহেবের হাতে দু'দিনের পুরনো একটা খবরের কাগজ। তিনি গভীর মনোযোগে খবরের কাগজ পড়ছেন। যে অংশটি পড়ছেন সে অংশ কেউ মন দিয়ে পড়বে না। সংবাদ শিরোনাম সিরাজগঞ্জের ধানচাষীদের কীটনাশকের জন্যে আবেদন। ধানে পামরী পোকা ধরেছে। সেই পোকা বিনষ্ট করা আশু প্রয়োজন ... ইত্যাদি, ইত্যাদি। খবরটা দু'বার পড়বার পর তিনি এখন তৃতীয় বারের মতো পড়ছেন। তাঁব ভুরু কঁচকে আছে। তিনি অপেক্ষা করছেন চায়েব জন্য। অপরিচিত একজন মহিলা তাঁকে বলে গেছেন, বসুন চা খেয়ে যান। তিনি বসে আছেন। চা এখনো আসছে না। রূপার মাথাব্যথা। সে আজ পড়বে না শুনে তিনি খানিকটা স্বস্তি বোধ করছেন। কারণ তাঁর মন ভালো না, পড়াতে ইচ্ছা করছে না। শুধু মন না—শরীরটাও খারাপ। পরপর তিন রাত

ঘুম হয় নি। দিনের বেলা ঘুমোতে চেষ্টা করেন, লাভ হয় না। খানিকটা ঝিমুনির মতো আসে খুটখাট শব্দে ঝিমুনি কেটে যায়। বাজারে এসেছিলেন ঘুমের ঔষুধ কিনতে, ফেরার পথে ভাবলেন রূপার পড়াশোনার খোঁজ নিয়ে যাবেন। একজন শিক্ষক সব সময় যে পড়া দেখিয়ে দেবেন তা তো না। মাঝে মাঝে তার উপস্থিতিই যথেষ্ট।

মবিন সাহেব খবরের এই অংশ তৃতীয়বার পড়া শেষ করে দরজার দিকে তাকালেন। দশ-এগারো বছরের এক বালিকা পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সে চেষ্টা করছে যেন তাকে দেখা না যায়। দেখা যাচ্ছেও না, তবে পর্দার ফাঁক দিয়ে তার উজ্জ্বল চোখ দেখা যাচ্ছে।

মবিন সাহেব বললেন, তুমি কে? মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমি কেউ না।

এ উত্তর মবিন সাহেবের পছন্দ হলো। মেয়েটা ভালোই বলেছে সে কেউ না। হু আর ইউ? আই অ্যাম নো বডি। বাহ্ ভালো তো!

তোমার নাম কী?

জেবা।

জবা? বাহ্ সুন্দর নাম!

জবা না জেবা।

ও আচ্ছা, জেবা। পর্দার আড়াল কেন? কাছে আস গল্প করি।

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে চলে গেল।

মবিন সাহেব খুশিই হলেন। মেয়েটি গল্প করার জন্যে এগিয়ে এলে সমস্যা হতো। তিনি একেবারেই গল্প করতে পারেন না। তাছাড়া এই বয়েসী মেয়েরা কোন ধরনের গল্প শুনতে চায় তাও জানেন না। তিনি চতুর্থ বারের মতো ধান গাছের পোকা বিষয়ে খবর পড়তে শুরু করলেন; কিছুতেই এটা মাথা থেকে সরাতে পারছেন না।

চা নিয়ে রূপা ঢুকল। শুধু চা না— এক বাটি মুড়ি। মুড়ির উপর তিনটা ভাজা শুকনা মরিচ।

স্যার কেমন আছেন?

ভালো।

এতদিন আসেন নি কেন?

মবিন সাহেব জবাব দিলেন না। এতদিন কেন আসেন নি এটা বলতে হলে এক গাদা কথা বলতে হবে। কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। রূপা চেষ্টা করছে খুব স্বাভাবিক থাকতে। তার আচার-আচরণে কিছুতেই যেন ধরা না পড়ে— যে সে এই মুহূর্তে এক ধরনের যোবের মধ্যে আছে। বিশ্বাস পর্যন্ত হচ্ছে না যে স্যার তার সামনে বসে আছেন। মানুষটা চেহারা এত সাধারণ কিন্তু এই সাধারণ চেহারা তার কাছে এত অসাধারণ লাগছে। মনে হচ্ছে তার একটা জীবন সে এই লোকটির দিকে তাকিয়েই কাটিয়ে দিতে পারবে। এক পলকের জন্যেও সে চোখের পাতা ফেলবে না।

স্যার, আজ কিন্তু আমি পড়ব না।

আচ্ছা।

কাল থেকে সিরিয়াসলি পড়া শুরু করব।

আচ্ছা।

কাল আসবেন তো ?

হঁ।

চা খান স্যার। চা ঠাণ্ডা হচ্ছে।

তিনি চায়ে চুমুক দিলেন। রূপা বলল, খুলনা থেকে আমার বড় ভাই এসেছেন।
উনার দুই মেয়ে জেবা এবং রুবাবা। রুবাবা খুব অদ্ভুত নাম না স্যার ?

হঁ।

এই নাম আগে শুনেছেন ?

না।

আমার মেজো ভাই থাকেন চিটাগাং। উনিও বোধ হয় আসবেন। তাঁকেও খবর
দেয়া হয়েছে। সবাই মিলে একটা হৈচৈ-এর ব্যবস্থা হচ্ছে।

মবিন সাহেব ডান হাতে মাথার চুল আঁচড়াবার মতো ভঙ্গি করছেন। এই ভঙ্গি
রূপার চেনা। এর অর্থ তিনি এখন অন্যমনস্ক। অন্য কিছু ভাবছেন।

স্যার, স্যার!

হঁ।

কী ভাবছেন স্যার ?

না মানে তেমন কিছু না— খবরের কাগজে একটা খবর পড়ার পব থেকে খারাপ
লাগছে। মন থেকে বিষয়টা তাড়াতে পারছি না। ধান ক্ষেতে পোকা লেগেছে। চাষীবা
পোকা মারার জন্য কীটনাশক চাচ্ছে। আমাব খুব খারাপ লাগছে।

রূপা বিস্মিত হয়ে বলল, খারাপ লাগার কী আছে ?

মবিনুর রহমান চেয়ারে পা তুলে বসলেন। এই ভঙ্গিটাও রূপার চেনা। এখন তিনি
কঠিন গলায় কিছু কথা বলবেন। তিনি কথা বলা শুরু করলেন।

শোন রূপা, এই পৃথিবীতে অসংখ্য প্রজাতির জন্ম হয়েছে। মানুষ যেমন একটি
প্রজাতি, কীট-পতঙ্গও প্রজাতি। এদের সবার বেঁচে থাকার অধিকার আছে। এদের সঙ্গে
সহাবস্থানের পদ্ধতি বের করা যেতে পারে, এদের হত্যা করা যাবে না। এদের হত্যা
করার আমাদের কোনো অধিকার নেই। আমবা সীমা লঙ্ঘন করছি।

রূপার খুব ইচ্ছে করল বলে— ওদের হত্যা না করলে তো এরা ধান খেয়ে ফেলবে।
তখন আমরা মারা পড়ব। কিন্তু সে কিছু বলল না। তাকিয়ে রইল। তার কথা বলতে
ইচ্ছা করছে না। কথা শুনতে ইচ্ছা করছে। তার চেয়েও যা ভয়ংকর তার ইচ্ছা করছে
এই মানুষটাকে একটু ছুঁয়ে দেখতে।

যাই রূপা।

স্যার একটু বসুন। একটু।

মবিন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন ?

আরেক কাপ চা খান, আমি বানিয়ে নিয়ে আসি।

চা তো একবার খেলাম!

ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। আমি ভালো করে এক কাপ বানিয়ে নিয়ে আসি।
না।

তিনি উঠে পড়লেন। রূপার খুব কষ্ট হচ্ছে। তার ইচ্ছে করছে হাত ধরে জোর করে
তাকে বসিয়ে দিয়ে কঠিন গলায় বলে আপনাকে বসতেই হবে। আপনি যেতে পারবেন
না। আপনি সারারাত এই চেয়ারে বসে থাকবেন। সারারাত আমার সঙ্গে গল্প করবেন।

তা বলা হলো না। কল্পনা এক জিনিস। বাস্তব অন্য। বাস্তবে রূপা তার স্যারকে
এগিয়ে দিল গেট পর্যন্ত। স্যাব চলে যাবাব পরেও গেট ধরে দাঁড়িয়ে রইল। আকাশ
পরিষ্কার, চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোয় চারদিক ঝলমল করছে। এত সুন্দর! পৃথিবী এত
সুন্দর।

বাতের খাবাব শেষ হবাব পর বফিক বলল, রূপা আয়, ছাদে বসে কিছুক্ষণ
গল্পগুজব করি। ছাদ পরিষ্কার ?

হঁ। পাটি দিতে বলব ? না চেয়াব ?

পাটি দিতে বল। আর কয়েকটা বালিশ। তোব ভাবিকেও আসতে বল। ছাদে বসে
চা খেতে খেতে জোছনা দেখি। অসম্ভব সুন্দর জোছনা হয়েছে। অনেকদিন এমন জোছনা
দেখি নি।

তোমাদেব খুলনায় জ্যোৎস্না হয় না ?

হয়। দেখা হয় না। পানের বাটা সঙ্গে নিয়ে আসিস, পান খাব। কাঁচা সুপারি দিয়ে
পান।

ভাইয়া তাকে কী বলবে তা রূপা আঁচ করতে পাচ্ছে। বিয়ের কথা বলবে। এটা
বলাব জন্যে এত ভানতা কেন কে জানে। বলে ফেললেই হয়। অনেকক্ষণ ধরেই তারা
ছাদে বসে আছে। বফিক নানান কথা বলছে। মূল প্রসঙ্গে আসছে না। এক সময় রূপার
ধারণা হলো হয়তো মূল প্রসঙ্গই নেই। হালকা গল্পগুজব কবাব জন্যেই তাকে ডাকা
হয়েছে। মিনু বালিশে মাথা বেখে গুয়ে আছে। ঘুমিয়ে পড়েছে কি-না বোঝা যাচ্ছে না।

বফিক বলল মিনু ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি ?

মিনু সাড়া-শব্দ কবল না। বফিক হালকা গলায় বলল, রূপা তোব ভাবির কাণ্ড
দেখেছিস ? ঘুম দিচ্ছে। এমন চমৎকার জোছনায় ঘুমিয়ে যাওয়া তো রীতিমতো ক্রাইম।
শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

রূপা বলল, আমার নিজেরও ঘুম পাচ্ছে ভাইয়া। কয়েকবার হাই তুলেছি। বফিক
বলল, সবাই যদি ঘুমে কাতর হয়ে থাকে তাহলে বিছানায় গিয়ে গুয়ে পড়লেই হয়। চল
যাই, ফেয়াবওয়েল টু দা মুন।

তুমি কী যেন বলবে বলাছিলে ?

তেমন জরুরি কিছু না। ইট কেন ৫ ফুট। তোব বিয়ের ব্যাপাবে কথা বলব বলে
ভাবছিলাম।

ও!

খুব ভালো ছেলে পাওয়া গেছে। সবদিক মিলিয়ে ছেলে জোগাড় করা তো এখন
ভয়াবহ সমস্যা। ছেলে দেখতে সুন্দর হলে স্বভাব-চরিত্র হয় মন্দ। টাকা-পয়সা থাকলে

বিদ্যা-বুদ্ধি থাকে না। ভালো ছেলে হলে দেখা যায় বোকা ছেলে, মন্দ হবার মতো বুদ্ধি নেই বলে ভালো ছেলে হয়ে দিন পার করেছে। তাছাড়া ভালো ছেলের কনসেন্টও পালে গেছে।

যাকে পেয়েছ সে-কি সব দিকে পারফেক্ট ?

এখন পর্যন্ত তো তাই মনে হচ্ছে। তুই নিজে দেখ।

আমি নিজে কীভাবে দেখব ?

ছেলেটাকে এখানে আসতে বলেছি। জহির চিটাগাং থেকে আসার সময় তাকে নিয়ে আসবে।

ও!

মনে হচ্ছে খুব উৎসাহ বোধ করছিস না। রূপা কিছু বলল না। রফিক সিগারেট ধরতে ধরতে বলল, ছেলেটাকে আমি দেখেছি। কথা বলেছি। আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। চমৎকার ছেলে।

চমৎকার একটা ছেলে আমার মতো একটা গ্রামের মেয়েকে বিয়ে করবে কেন ?

বিয়ে করবে কারণ তুইও চমৎকার একটা মেয়ে। ছেলেটা এখানে আসছে। তোর লজ্জায় লজ্জাবতী হয়ে থাকার কোনো কারণ নেই। তোরা কথাবার্তা বলবি। গল্প করবি। ছেলেটাকে গ্রাম দেখাবি এতে দোষের কিছু নেই। বুঝতে পারছিস আমার কথা ?

পারছি।

কিছু বলবি ?

ভাইয়া, ধর আমার ছেলেটাকে পছন্দ হলো। ছেলেটার আমাকে পছন্দ হলো না। তখন ?

তখন বিয়ে হবে না।

তখন কি আমার খারাপ লাগবে না ?

রফিক কিছু বলার আগেই মিনু বলল, মোটেই খারাপ লাগবে না। কারণ তোমাকে যেই দেখবে সেই পছন্দ করবে। তুমি যে কী সুন্দর হয়েছ তা তুমি নিজেও জানো না।

রূপা বলল, তুমি জেগে ছিলে ?

হ্যাঁ, জেগে ছিলাম। ঘুমের ভান করে দেখতে চাচ্ছিলাম তোমরা ভাইবোনরা কীভাবে কথা বলো।

কীভাবে বলি ?

স্মার্টলি বলো। সহজ স্বাভাবিক। লজ্জা-টজ্জার কোনো বালাই নেই। শুনতে ভালোই লাগল। কে বলবে তুমি জীবন কাটিয়েছ গ্রামে।

রফিক বলল, চল উঠা যাক। আমরাও ঘুম পাচ্ছে।

মিনু বলল, না তুমি আরো খানিকক্ষণ বস। রূপা চলে যাক। আমরা দু'জন খানিকক্ষণ গল্প করি। আর রূপা শোন, জেবা বলছিল সে আজ রাতে তোমার সঙ্গে ঘুমোবে। সে হয়তো তোমার বিছানায় গভীর মুখে বসে আছে। ও তোমার সঙ্গে ঘুমোলে অসুবিধা হবে না তো ?

অসুবিধা কী।

মিনু দুঃখিত গলায় বলল, মাঝে মাঝে জেবা দুঃস্বপ্ন দেখে বিকট চিৎকার করে।
ওর এই ব্যাপারটার সঙ্গে তুমি পরিচিত না। ভয় পেতে পার।

আমি এত সহজে ভয় পাই না ভাবি।

রফিক ইতস্তত করে বলল, জেবার মধ্যে কিছু কিছু পাগলামি ভাব আছে। রূপা,
তুই ওর কোনো কথায় বেশি গুরুত্ব দিবি না। যা বলে মেনে নিবি। ওকে নিয়ে আমরা
একটু সমস্যায় আছি। ঢাকায় নিয়ে ডাক্তার দেখাব।

রূপা বলল, তোমরা শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করছ। জেবা চমৎকার মেয়ে। দেখো
অল্পদিনেই আমি ওকে ঠিকঠাক করে দেব।

জেবা এখনো ঘুমোয় নি।

একটা বালিশ কোলে নিয়ে পা তুলে বিছানায় বসে আছে। মানুষ না, যেন সুন্দর
পাথরের একটা মূর্তি। রূপা বলল, কী-রে এখনো জেগে আছিস? শুয়ে পড়।

জেবা যেমন বসে ছিল তেমনি বসে রইল। শীতল গলায় বলল, ফুপু আমাকে তুমি
করে বলবেন। কেউ আমাকে তুই করে বললে ভালো লাগে না।

রূপা হাসতে হাসতে বলল, আদর করে তুই বলছিলাম। আর বলব না। জেবা,
তুই ছাড়া আর কোন কোন জিনিস তোমার ভালো লাগে না বলে ফেল তো, জেনে রাখি!

কেউ মিথ্যা কথা বললে আমার ভালো লাগে না।

আচ্ছা। ভুলেও আমি তোমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলব না। খুব সাবধানে থাকব।

কেউ গায়ে হাত দিয়ে আদর করলেও আমার ভালো লাগে না।

কখনো তোমাব গায়ে হাত দিয়ে আদর করব না। তোমার কাছ থেকে সব সময়
এক হাত দূরে থাকব। রাতে ঘুমোবার সময় যদি গায়ের সঙ্গে গা লেগে যায় তাতে
অসুবিধা নেই তো?

অসুবিধা আছে।

শোবার সময় রূপা একটা কোল বালিশ এনে দু'জনের মাঝখানে রাখতে রাখতে
বলল, এই কোল বালিশটা হচ্ছে আমাদের সীমানা। একপাশে থাকবে তুমি একপাশে
আমি। এবাব ঠিক আছে জেবা?

হ্যাঁ, ঠিক আছে।

এখন আরাম করে ঘুমোও।

জেবা বলল, আপনাকে আমাব পছন্দ হয়েছে ফুপু।

রূপা হাই তুলতে তুলতে বলল, তোমাকেও আমার পছন্দ হয়েছে। তুমি একটু
অদ্ভুত! তাতে কী! অদ্ভুত মানুষই আমার ভালো লাগে। আমার একজন স্যার আছেন,
তিনিও অদ্ভুত। আমি তাঁকেও খুব পছন্দ করি।

আমি জানি।

কীভাবে জানো?

জেবা অস্পষ্টভাবে হাসল, কিছু বলল না। রূপা বলল, তুমি তো আমার প্রশ্নের
জবাব দিলে না।

আমি সব প্রশ্নের জবাব দিই না।

প্রশ্নের জবাব না দেয়াটা তো অভদ্রতা।

প্রশ্ন করাও তো অভদ্রতা।

তা ঠিক। প্রশ্ন করার মধ্যেও এক ধরনের অভদ্রতা আছে।

জেবা বলল, ফুপু আপনি ইচ্ছা করলে আমার গায়ে হাত দিয়ে আদর করতে পারেন। আমি রাগ করব না।

আচ্ছা, জানা রইল। এখন ঘুমাও।

আর আমি সব সময় আপনার দলে থাকব।

আমার দল মানে ?

জেবা শান্ত গলায় বলল, এ বাড়িতে দুটো দল হবে। আপনার একা একটা দল। আর বাকি সবাব একটা দল। অন্য দলটা চাইবে একটা ছেলের সঙ্গে আপনাব বিয়ে দিতে। আপনি চাইবেন না...।

এই সব তুমি কী বলছ ? এমন সব অদ্ভুত কথা তোমার মাথায় ঢুকল কীভাবে ? বলব না।

জেবা পাশ ফিরল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। রূপার ঘুম এলো না। এগারো বছরের এই বাচ্চা মেয়ে কী বলছে, কোথেকে বলছে ? নিশ্চয়ই বড়দের কথা শুনে শুনে নিজের মনে একটা-কিছু দাঁড়া কবিয়েছে। শিশুদের মনের জগৎ খুব সহজ নয়। নানান জটিল কর্মকাণ্ড সেই জগতে হয়। শিশুবা তার খবর কখনো বড়দেব বলে না।

প্রাতি মাসের তিন তাবিখ নীলগঞ্জ হাইস্কুলের দপ্তরি কালিপদ বাড়ি ভাড়া বাবদ মবিনুর এহমানের কাছ থেকে একশ'টা টাকা পায়। টাকাটা নিতে কালিপদের খুবই লজ্জা লাগে। য় বাড়িতে তার মতো দরিদ্র ব্যক্তি নিজে থাকতে পারে না সেই বাড়ি ভাড়া বাবদ একশ টাকা নেয়া কি অন্যায় না ? বাড়িটি মানুষ বাসের যোগ্য না। একটা মাত্র ঘর কোনো রকমে টিকে আছে। তারও কড়িবরগা ঝুলে আছে। যে কোনো মুহূর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। যদি ঘটে সে কী জবাব দেবে ? লোকে তো তাকেই ধরবে ? হেড স্যাব তাকে জিজ্ঞেস করবেন, কালিপদ তুমি জেনেশুনে এই বাড়ি কী করে ভাড়া দিলে ? থানার বড় দারোগা সাহেবও তাকে থানায় ধরে নিয়ে যেতে পারেন।

ঘর যদি ভেঙে না-ও পড়ে, সাপেব কামড়েও তো মানুষটা মরতে পারে। চাবদিকে সাপ কিলবিল কবছে। তার ছোট মেয়েটা মরল সাপের কামড়ে।

কালিপদ অবশ্য সাপের কথা মবিন স্যারকে বলেছে। তিনি উদাস গলায় বলেছেন, সাপ আছে থাক না। অসুবিধা কী ? সাপদেরও তো বাঁচাব অধিকার আছে। গুরাও একটা প্রজাতি।

সারের কথাবার্তার ঠিক নেই। সাপ আর মানুষ এক হলো! সাপ কি স্কুলে পড়াশে না করে ? বিএ, এমএ পাস করে ?

ত এই সব কথা স্যারকে কে বলবে ? কালিপদের বলার ইচ্ছা করে। সাহসে কুলায় না। সার হচ্ছেন জ্ঞানী মানুষ। জ্ঞানী মানুষের সঙ্গে সে মহামূর্খ দপ্তরি কী কথা বলবে ?

তবে একটা ভালো ব্যাপার হচ্ছে মবিন স্যারের সঙ্গে সব কথা বলা যায়। তিনি চুপ করে শোনে। এমনভাবে শোনে যেন খুব জ্ঞানী একজন মানুষের কথা শুনছেন। হেড স্যারের মতো কথার মাঝখানে ধমক দেন না। কথার মাঝখানে বলেন না— চুপ কর গাধা।

আজ মাসের সাত তারিখ। এ মাসের বাড়ি ভাড়া বাবদ একশ' টাকা কালিপদ এখনো পায় নি। মবিন স্যার স্কুলে আসছেন না। অথচ টাকাটা তার বিশেষ প্রয়োজন। সে ঠিক করল মবিন স্যারের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। টিফিন টাইমে হেড স্যারকে বলে ছুটি নেবে। তার ধারণা ছুটি চাইলে হেড স্যার না বলবেন না। কারণ তাঁর অনেক কাজ সে করে দেয়। গত মাসে হেড স্যার একটা দুধেল গাই কিনেছেন। সেই গাইয়ের জন্য ঘাস কেটে আনা সব দায়িত্ব তার। এই দায়িত্ব সে নিঃশব্দে পালন করে। এমনভাবে করে যে তাকে দেখলে মনে হতে পারে এই দায়িত্ব পালন করতে পেরে সে বিমলানন্দ উপভোগ করছে। অবশ্যি কারো জন্যে কিছু করতে কালিপদের খারাপ লাগে না। ভালোই লাগে। মবিনুর রহমান স্যারের জন্যেও তার সব সময় কিছু করতে ইচ্ছা করে। এখন পর্যন্ত তেমন কিছু করার সুযোগ পায় নি।

টিফিন পিরিয়ডে কালিপদ হেড স্যারের ঘরে ঢুকে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। একজন শ্রমণী মানুষকে নিজ থেকে কিছু বলা মুশকিল। হেড স্যার বললেন, কী ব্যাপার কালিপদ?

কালিপদ মাথা চুলকাতে লাগল।

কিছু বলবে?

একটা কাজ ছিল স্যার।

তোমার আবার কী কাজ? তোমার কাজ তো একটাই। স্কুলের বাবান্দায় হাঁটাইটি করা।

কালিপদের মন খাবাপ হয়ে গেল। স্কুলের শতক কাজ সে করে, তারপরেও কেউ যদি বলে তার কাজ শুধু হাঁটাইটি করা তাহলে মনে লাগারই কথা।

ছুটি চাও না-কি?

জি। টিফিন টাইমে চলে যাব।

টিফিন চাইমে চলে যাব? মামার বাড়ির আদার? স্কুলটা কী তোমার মামার বাংলার ঘর? যাও যাও বিরক্ত করবে না।

কালিপদ হতভম্ব হয়ে বের হয়ে এলো। আজ সকালেও সে হেড স্যারের একগাদা কাজ করেছে। হেড স্যারের গাইয়ের জন্যে ঘাস কেটে দিয়ে এসেছে। পুঁই গাছের জন্যে মাচা বেঁধেছে।

কালিপদ লক্ষ করল তার অসম্ভব বাগ হচ্ছে। রাগ হলেই তার হাত-পা কাঁপতে থাকে। এখনো তার হাত-পা কাঁপছে। বাগ কমানোর জন্য বড় একটা বালতি নিয়ে পানি আনতে রওনা হলো। কাজকর্মে বাস্তব থাকলে বাগ কমে যায়। হেড স্যার হচ্ছেন জ্ঞানী মানুষ, স্কুলের প্রধান। তার উপর রাগ করা উচিত না।

স্কুলের টিউবওয়েলটা নষ্ট। অনেক দূর থেকে পানি আনতে হয়। টিউবওয়েলটা ঠিক করা উচিত। কেউ ঠিক করছে না। সামান্য একটা ওয়াসারের জন্য টিউবওয়েল নষ্ট

হয়ে পড়ে আছে। কালিপদ ঠিক করে ফেলল ময়মনসিংহ যাওয়া হলে সে নিজেই একটা ওয়াসার কিনে আনবে। এতে একটা ভালো কাজ করা হবে। সে তার জীবনে ভালো কাজ কিছুই করে নি। কখন ডাক এসে যাবে কে জানে। চিত্রগুপ্ত খাতা খুলে বসে আছেন। ডাক এলেই হাজিরা দিতে হবে। যমরাজ বলবেন, ওহে কালিপদ, তুমি মর্ত্যধামে ভালো কর্ম কী কী করিয়াছ ? সে তখন বলতে পারবে, স্যার স্কুলের টিউবওয়েলের জন্য একটা ওয়াসার কিনেছি।

ইহা ছাড়া অন্য কোনো সৎকর্ম কি আছে ?

জি-না।

খারাপ কর্ম কী কী করিয়াছ ?

খারাপ কাজ কিছু করি নাই স্যার।

এইটাই কালিপদের একমাত্র ভরসা।

সে খারাপ কিছু করে নি। করবেও না।

কালিপদ পানির ভারি বালতি স্কুলের বারান্দায় রাখতে রাখতে লক্ষ করল যে, তার রাগ কমে গেছে। সে স্বস্তি বোধ করল। রাগ বেশিক্ষণ পুষে রাখা ঠিক না। তাছাড়া হেড স্যার অনায্য কিছু বলেন নি। সত্যি তো স্কুল কি আর তার মামার বাড়ির বাংলা ঘর ?

কালিপদ পানির বালতি রেখে মুড়ি কিনতে গেল। স্যারদের জন্যে টিফিন তৈরি হবে। এক সের মুড়ি, তিন ছটাক বাদাম। মুড়ি বাদাম, পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ দিয়ে মাখানো হবে। খুব ঝাল হতে হবে। শিক্ষকরা টিফিন টাইমে তা খাবেন। তেল মরিচ দিয়ে মুড়ি মাখানো কোনো জটিল কাজ না। বাদামের খোসা ছাড়ানোর কাজটা জটিল। কালিপদের আঙুলে তেমন জোর নেই। ভারী কাজ করতে কষ্ট হয় না। কিন্তু বাদামের খোসা ছাড়ানোর মতো ছোট কাজ করতে কষ্ট হয়।

কালিদেব মন এখন একটু বিষণ্ণ, কারণ কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে একগাদা কঠিন কথা শুনতে হবে। স্যাবরা যখন ঝালমুড়ি খান তখন কালিপদকে অনেক কথা শুনতে হয়।

যেমন—

লবণ দিয়ে তো বিষ বানিয়ে ফেলেছ। এতদিনেও মুড়ি বানানো শিখলে না।

বালি কিচকিচ করছে, ব্যাপারটা কী ? এর মধ্যে খুব কম হলেও এক পোয়া বালি আছে।

ন্যাতাচ্যাতা মুড়ি কোথেকে কিনলে ? মুড়িও চেন না ?

এইসব কথার কোনো জবাব কালিপদ দেয় না। মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। মনে মনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। শুধু দু'জন লোক কখনো তাকে কিছু বলেন না। একজন মবিনুর রহমান, অন্যজন জালালুদ্দিন স্যার। মুড়ির বাটি জালাল স্যারের সামনে রাখা মাত্র তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্ আল্লাহ পাক তোমার ভালো করুন কালিপদ।

আজও তাই বললেন।

কালিপদ বলল, স্যারের শরীর ভালো ?

হ্যাঁ, শরীর ভালো। মনটা ভালো না। শোন কালিপদ, তোমরা জন্য একটা চিঠি আছে।

কালিপদ বিস্মিত হয়ে বলল, চিঠি ?

হুঁ। চিঠি। গতকাল মবিনের কাছে গিয়েছিলাম। সে তোমাকে চিঠি দিয়েছে। চিঠি পড়তে পার ?

জি স্যার, পারি। উনার শরীর কেমন ?

বেশি ভালো না।

মুখ বন্ধ খাম নিয়ে কালিপদ আড়ালে সরে গেল। চিঠি পড়তে পারে কি-না এটা জিজ্ঞেস করায় সে মনে কষ্ট পেয়েছে। ঝুলে চাকবি করে আর সে একটা চিঠি পড়তে পারবে না ? ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছে। বাবা মরে যাওয়ায় আর পড়াশোনা হলো না। জালাল স্যার পুরনো লোক। উনি কেমন কবে এই ভুল করেন ?

কালিপদ টিউবওয়ালের পাশে বসে পরপর চারবার চিঠিটা পড়ল।

কালিপদ,

তুমি খুব লজ্জিত যে যথাসময়ে তোমাকে বাড়ি ভাড়া বাবদ একশ টাকা দিতে পারি নি। আমার মনে ছিল তবু দেয়া হয় নি। শরীর বিশেষ ভালো না বলে ঝুলে যাচ্ছি না। তোমার সঙ্গে দেখাও হচ্ছে না। তোমাব অসুবিধা সৃষ্টি করায় আমি ক্ষমাপ্রার্থী। এখন টাকাটা পাঠালাম।

ইতি

মবিনুর রহমান

কালিপদের চোখে পার্নি এসে গেল। মবিন স্যারের মতো একজন জ্ঞানী লোক বলছেন ক্ষমাপ্রার্থী। সে কে ? সে কেউ না। সে একজন অধ্যম দণ্ডুরি।

কালিপদ ঠিক কবে ফেলল আজ সন্ধ্যায় স্যারকে দেখতে যাবে। খালি হাতে যাবে না। কিছু-একটা নিয়ে যাবে। পাকা পেঁপে, কলা। শরীর বেশি খারাপ দেখলে বাতে থেকে যাবে। যদিও ঐ বাড়িতে থাকতে তার ভয় লাগে। সাপের ভয়। যত ভয়ই লাগুক সে যাবে। হেড স্যারের গাইকে ঘাস এনে দিয়েই রওনা হবে।

সন্ধ্যাব পরপর কালিপদের যা-য়া হলো না। কারণ হেড স্যার হঠাৎ সদরে যাবেন বলে ঠিক করেছেন। তাঁর স্যুটকেস স্টেশন পর্যন্ত দিয়ে আসতে হবে। স্টেশন এখান থেকে পাঁচ মাইলের মতো দূরে।

কালিপদ বিনা বাক্যব্যয়ে স্টেশনের দিকে রওনা হলো।

সদরে যাচ্ছি কেন জানিস না-কি কালিপদ ?

জে না।

ডিইও সাহেব খবর পাঠিয়েছেন। মবিন সাহেবের গম চুরির ব্যাপারে কথা বলতে চান। ঘটনা শুনে উনি খুবই ক্ষিপ্ত। আমাকে বললেন— শুধু চাকরি থেকে ডিসমিস করলে এতবড় অপরাধের শাস্তি হয় না। অপরাধীকে জেলে ঢুকাতে হবে। আমি অবশ্যি বলেছি মানী লোক একটা ভুল করেছে। বাদ দেন। ডিইও সাহেব শুনতে চান না।

কালিপদ কিছু বলল না। গম চুরির কথা সে শুনেছে। একশ বস্তা গম স্কুলে দেয়া হয়েছিল। মবিন স্যার দস্তখত করে এনেছেন। কিন্তু একশ বস্তা না, এনেছেন মাত্র দশ বস্তা। এই নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা হচ্ছে। স্বয়ং ভগবান যদি স্বর্গ থেকে নেমে এসে কালিপদকে বলেন— মবিনুর রহমান গম চুরি করেছে— কালিপদ বিশ্বাস করবে না। তবে তার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কী যায় আসে? সে হলো মুর্থ দণ্ডুরি। স্কুলে ঘণ্টা দেয়া ছাড়া সে কিছুই জানে না।

কালিপদ!

জি স্যার।

মানুষের চেহারা দেখে বুঝা মুশকিল তার ভেতরটা কেমন। মবিনকে দেখ কে বলবে— ভেতরে ভেতরে সে এত বড় শয়তান।

কালিপদ চুপ করে রইল। কথা বলার কোনো অর্থ হয় না।

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। এইটাই নিয়ম। নিয়তি কঠিন জিনিস। নিয়তির হাত এড়ানো মুশকিল। লখিন্দরের নিয়তি ছিল সাপের হাতে মরা। মরল কি-না বল। লোহার ঘর বানিয়ে লাভ হয়েছিল?

ট্রেন এলো রাত দশটায়। আটটায় আসার কথা— দু'ঘণ্টা লেট। এই দু'ঘণ্টা কালিপদ স্টেশনে বসে রইল। হেড স্যারকে বেখে চলে আসা যায় না। মালপত্র তুলে দিতে হবে।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে এগারোটা বেজে গেল। এত রাতে মবিন স্যাবের কাছে যাওয়া ঠিক না। স্যার হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন। অসুস্থ মানুষ সকাল সকাল ঘুমোতে যাবার কথা।

তবু কালিপদ ভাবল, একবার যখন ঠিক করেছে যাবে— যাওয়াই উচিত।

স্যার ঘুমিয়ে থাকলে চলে আসবে। অসুবিধা তো কিছুই নেই।

মবিনুর রহমান ঘুমান নি। তিনি তাঁর দুরবিন ফিট করেছেন। দুরবিন তাক করা হয়েছে 'অনুরাধা' নক্ষত্রের দিকে। প্রাচীন ভারতে 'অনুরাধা' একটি বিশেষ নক্ষত্র। তখন নিয়ম ছিল বিয়ের পর স্ত্রীকে সন্ধ্যাবেলা অনুরাধা নক্ষত্র দেখিয়ে বলতে হবে— 'অনুরাধার' মতো দৃঢ়চিত্ত ও পূত চরিত্রের হও। তারপরই শুধু স্ত্রীকে ঘরে নেয়া যাবে।

আগে নয়।

কালিপদ বলল, স্যার কী করেন?

মবিন সাহেব দুরবিন থেকে চোখ না সরিয়েই বললেন, অনুরাধা নক্ষত্র দেখি। খুব উজ্জ্বল নক্ষত্র। আলো স্থির হয়ে থাকে।

তিনি এমনভাবে কথা বললেন যেন কালিপদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। রাতদুপুরে তার উপস্থিতি হওয়ায় মোটেই বিস্মিত হন নি।

কালিপদ!

জি স্যার।

দেখবে না-কি?

কী দেখব স্যার ?

অনুরাধা নক্ষত্র । দেখ, এইখানে চোখ লাগাও । বাঁ চোখ বন্ধ কর ।

কালিপদ দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থেকেও কিছুই দেখতে পেল না । মবিন সাহেব যখন বললেন, দেখা যাচ্ছে ? কালিপদ শুধুমাত্র তাঁকে খুশি করার জন্য বলল, জি স্যার । বড়ই সৌন্দর্য ।

হ্যাঁ, সুন্দর তো বটেই । বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পুরোটাই সুন্দর । প্রকৃতি অসুন্দর কিছু তাঁর জগতে স্থান দেন নি ।

কালিপদ প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য বলল, আপনার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে স্যার ?

না । রান্না করি নি এখনো ।

আপনি স্যার কাজ করেন, আমি রান্না করে ফেলি ।

আচ্ছা ।

ঘরে তেল মসলা আছে তো স্যার ?

সব আছে । গতকাল বাজার করেছি ।

আপনার শরীর শুনেছিলাম খারাপ ।

না শরীর ঠিক আছে । মানে মানে ঔষধের সব স্বপ্ন দেখি, তখন সব উলট-পালট হয়ে যায় ।

কী দেখেন ?

দেখ কয়েকটা বুড়ো মানুষ । এদের শরীর দেখা যায় না, শুধু মুখ দেখা যায় । এরা এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে ।

দেখতে কেমন স্যান ?

লম্বা মুখ । সামান্য দাড়ি আছে...

বলতে বলতে মবিনুর রহমান অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন । ক্লান্ত গলায় বললেন, কালিপদ ।

জি স্যার ।

রূপাকে আজ পড়াতে যাওয়ার কথা ছিল, যেতে পারি নি । শরীরটা ভালো লাগছে না । কয়েকদিন যাব না । আমি একটা চিঠি লিখে রেখেছি, তুমি মেয়েটাকে দিয়ে এসো । কাল ভোর বেলা দিলেই হবে ।

জি আচ্ছা স্যার ।

চিঠি খুব সাদামাটা—

রূপা, আমি কয়েকদিন আনতে পারব না । তুমি নিজে নিজে পড় । মন

নানান কারণে অস্থির হয়ে আছে । একটু স্থির হলেই আসব ।

চিঠি সাদামাটা হলেও কিছু সাদামাটা নয় । চিঠির উল্টো পিঠে তিনি অসংখ্যবার লিখেছেন— রূপা, রূপা । এব পেছনেও একটা লজিক আছে । বল পয়েন্টের কলমে কালি আটকে যাচ্ছিল, তিনি কলম ঠিক করার জন্যেই রূপা রূপা লিখেছেন । অন্য কিছুও লিখতে পারতেন । লিখেন নি কারণ চিঠিই যেহেতু রূপাকে লিখবেন সেহেতু তার নামই

মনে এসেছে। আবার এও সত্যি যে, এই নামটাই তিনি অসংখ্যবার লিখতে চেয়েছেন। অজুহাত হিসেবে ভাবছেন কলমে কালি আটকে যাচ্ছে বলে অসংখ্যবার রূপার নাম লিখতে হয়েছে। কোনটা সত্যি কে জানে, হয়তো সবটাই সত্যি।

এই বিশেষ চিঠিটি রূপার হাতে আসার আধঘণ্টা আগে মজার একটা ব্যাপার হলো। জেবা এসে বলল, ফুপু, কিছুক্ষণের মধ্যে তুমি এমন একটা কিছু পাবে যে আনন্দে তোমার মরে যেতে ইচ্ছা করবে। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা হবে।

কী পাব ?

কী পাবে তা জানি না, তবে কিছু-একটা পাবে।

রূপা বিরক্ত হয়ে বলল, কী যে অদ্ভুত কথা তুমি বলো।

তার কিছুক্ষণ পর কালিপদ চিঠিটা দিল। রূপার আনন্দে মরে যেতে ইচ্ছা করল। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করল। ইচ্ছা করল পৃথিবীর সব মানুষকে ডেকে বলে— দেখ, তোমরা দেখ, স্যাব কতবার আমার নাম লিখেছেন।

রূপার চোখে পানি এসে গেছে। জেবা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার মুখ ভাবলেশহীন। তবে ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি।

৮

হেড মাস্টার হাফিজুল কবির সাহেব আজ একটু ব্যস্ত। ব্যস্ততার নানাবিধ কারণের একটি হচ্ছে নেত্রকোনা থেকে সিও রেভিনু এসেছেন গম চুরির তদন্তে। ভদ্রলোকের বয়স অল্প। নিতান্তই চেংড়া ধরনের। অল্পবয়স্ক অফিসারবা ঠাণ্ডা মাথায় কিছু ভাবে না। দশজনের কথা শুনতে চায় না। হুট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। গবম গবম কথা বলে। মানী লোকের মান রাখতে জানে না।

হাফিজুল কবির সাহেব যত্নের চূড়ান্ত করছেন। সিও সাহেব স্কুলে পা দেয়ার পরপরই তাঁকে দৈ মিষ্টি দেয়া হয়েছে। চায়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। কালিপদ স্কুলের বারান্দায় কেরোসিন কুকারে চা বসিয়ে দিয়েছে। হাফিজুল কবির সাহেব এক প্যাকেট বেনসন সিগারেট এনে সিও সাহেবের সামনে রেখেছেন। তিনি প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট ধরিয়েছেন। এটা আশার কথা। যদি বলতেন— সিগারেট কেন ? তাহলে চিন্তার ব্যাপার হতো।

সিও সাহেব বললেন, গম চুরির ব্যাপারে আপনারা নিজেরা কোনো তদন্ত করেছেন ?

হেড মাস্টার সাহেব বললেন, জি না স্যার।

করেন নি কেন ?

তদন্ত কর্মটি কবা হয়েছে কিন্তু কর্মটির বৈঠক বসে নি।

বৈঠক বসল না কেন ?

সেটা স্যার আমি বলতে পারি না। আমি কর্মটিতে নেই।

মবিন সাহেবকে কি আপনি সরাসরি জিজ্ঞেস করেছেন ?

কী জিজ্ঞেস করব ? আমি কিছু জিজ্ঞেস করি নি।

গম চুরির বিষয়ে তাঁর কী বলাব আছে তা জানতে চেয়েছেন ?

জি-না ।

জিজ্ঞেস করেন নি কেন ?

মানী লোক । জিজ্ঞেস করতে লজ্জা লাগল ।

ডাকুন, উনাকে ডাকুন । আমি জিজ্ঞেস করি...

উনি স্যার স্কুলে আসেন নি । কয়েকদিন ধরেই আসছেন না ।

আই সি!

লজ্জাতেই বোধহয় আসতে পারছেন না ।

চুরি করবার সময় মনে ছিল না, এখন লজ্জায় মরে যাচ্ছেন । শুনুন হেড মাস্টার সাহেব, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন খুব সিরিয়াসলি ব্যাপারটা নিয়েছে । আপনি জানেন কি-না জার্নি না । জাতীয় দৈনিকে চিঠি ছাপা হয়েছে ।

বলেন কী স্যার!

হেড মাস্টার সাহেব বিস্মিত হবার ভঙ্গি করলেন । চিঠি ছাপার ব্যাপারটা তিনি খুব ভালোমতো জানেন । চিঠি তাঁরই লেখা ; নেত্রকোনা গিয়ে নিজের হাতে পোস্ট করেছেন । সব ক'টা দৈনিকে চিঠি দিয়েছিলেন । শুধু একটাতে ছাপা হয়েছে । হেড মাস্টার সাহেব বললেন, চিঠিতে কী লেখা স্যার ?

সিও সাহেব ব্রিফ কেইস থেকে খবরের কাগজ বের করে এঁগিয়ে দিলেন । বিবস মুখে বললেন, কাগজটা আপনার কাছে রেখে দিন । হেড মাস্টার সাহেব অনেকবার পড়া চিঠি আবারো পড়লেন—

সরিষায় ভূত

নেত্রকোনা নীলগঞ্জ হাই স্কুলে সম্প্রতি গম চুরির এক কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটিয়াছে । উক্ত স্কুলের জনৈক প্রবীণ শিক্ষক স্কুলের জন্য বরাদ্দকৃত ১০০ বস্তা গমের মধ্যে ৯০ বস্তা গায়েব করিয়া দেন । এই ঘটনা অত্র অঞ্চলে তমূল আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছে । যাহাদের হাতে শিশু-কিশোরদের নীতি শিক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত তাহারা যদি চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত হন তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ কী । জনগণের মনে আজ এই প্রশ্ন: আলোড়িত হইতেছে ।

জনৈক অভিভাবক

নীলগঞ্জ হাই স্কুল

হেড মাস্টার সাহেব শুকনো মুখে বললেন, পত্রিকায় খবর কে দিল ?

সিও সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, পত্রিকায় খবর কে দিল এটা নিয়ে চিন্তা করে লাভ কী ? আমবা অ্যাকশন কী নিয়েছি সেটা সত্য কথা । ক্রিমিন্যাল কেইস করা হয়েছে ?

জি-না স্যার । শুধু জিডি এন্ট্রি করেছি ।

কেইস করে দিন । মিস এপ্রোপ্রিয়েশন অব পাবলিক ফান্ড ।

সেটা কি স্যার ঠিক হবে ?

অবশ্যই ঠিক হবে। এই সঙ্গে সাসপেনশন অর্ডার দিয়ে দিন।

সাসপেনশন ?

হ্যাঁ।

স্কুলে স্যার ও-রকম ব্যবস্থা নেই।

ব্যবস্থা নেই, ব্যবস্থা করুন। স্কুলে গভর্নিং বডির মিটিং দিন। মিটিং-এ ডিসকাস করুন।

আপনি বললে অবশ্যই করব।

মনে রাখবেন, বর্তমান সরকার এ-জাতীয় কলেংকারি সহ্য করবে না। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ আমাদেরই তৈরি করতে হবে। পত্র-পত্রিকায় চিঠি ছাপা হয়ে গেছে। জনমত তৈরি হয়ে গেছে। আর অবহেলা করা যায় না।

তা তো বটেই স্যার।

গভর্নিং বডির মিটিং ডাকুন। আজই ডাকুন।

জি আচ্ছা স্যার।

গভর্নিং বডির মিটিং-এ পত্রিকায় ছাপা চিঠি পড়া হলো। হেড মাস্টার সাহেব সিও বেভিনিউ সাহেব যা যা বলে গিয়েছেন সব আবারো বললেন এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কী করি কিছুই বুঝতে পারছি না। প্রাইভেট স্কুল হলেও সরকারি চাপ অগ্রাহ্য করা সম্ভব না। আমরা গভর্নমেন্ট ডিএ নেই। ডিএ বন্ধ হয়ে গেলে স্কুল উঠিয়ে দিতে হবে।

গভর্নিং বডির একজন মেম্বর হলেন রূপার বাবা আফজাল সাহেব। তিনি বললেন, পুরো ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য। মবিনুর রহমান এই কাজ করতে পাবেন না। কোথাও ভুল হয়েছে। অবশ্যই ভুল হয়েছে।

হেড মাস্টার সাহেব বললেন, ভুল হবার কোনো ব্যাপার না। মবিন সাহেব সিগনেচার করে গম নিয়েছেন।

আত্মভোলা মানুষ। তাঁকে প্যাঁচে ফেলে আটকানো হয়েছে। এটা নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না।

গমের দায়িত্ব তাহলে কে নিবে ?

ঘন্টাখানিক আলোচনা কবেও কোনো সিদ্ধান্তে আসা গেল না। আফজাল সাহেব মন খারাপ করে ঘরে ফিরলেন। মবিনুর রহমানকে তিনি অত্যন্ত পছন্দ করেন। তিনি বুঝতে পারছেন মবিনুর রহমান কোনো-একটা চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েছেন। তাঁর ক্ষীণ সন্দেহ হচ্ছে এই চক্রান্তে হেড মাস্টার সাহেবের একটা ভূমিকা আছে। কিন্তু কী ভূমিকা তা ধরতে পারছেন না। মবিনুর রহমানের সঙ্গে হেড মাস্টার সাহেবের কোনো শত্রুতা থাকার কথা নয়। একদল মানুষ আছে যাদের কখনো কোনো শত্রু তৈরি হয় না। মবিনুর রহমান সেই দলের মানুষ। কিন্তু এখানে তিনি কী করে ঝামেলায় জড়িয়ে গেলেন ? এই ঝামেলা থেকে মুক্তি উপায়ই বা কী ?

আফজাল সাহেবের মন-খারাপ ভাব বাসায় এসে কেটে গেল। কী কারণে মন খারাপ তাও পর্যন্ত মনে রইল না। তাঁর মেজো ছেলে জহির এসেছে চিটাগাং থেকে। সঙ্গে তার বন্ধু তানভির। রাজপুত্রের মতো ছেলে। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখতে হয়।

ছেলের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলেই তাঁর মনে হলো যে ভাবেই হোক এই ছেলের সঙ্গে রূপার বিয়ে দিতে হবে। একে কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না। তিনি ঘাটে লোক পাঠালেন ভালো মাছের জন্যে। যাকে পাঠালেন তার উপর ঠিক ভরসা করতে পারলেন না। নিজেই খানিকক্ষণ পর রওনা হলেন। তানভির বলল, চাচা আপনি যাচ্ছেন কোথায় ?

মাছের জন্যে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে ঘাটে খুব ভালো মাছ পাওয়া যায়।

চাচা, আমি কি আপনার সঙ্গে যেতে পারি ?

যেতে চাও ?

অবশ্যই যেতে চাই।

রাস্তায় কিছু খুব কাদা।

তানভির হাসতে হাসতে বলল, আমি খালি পায়ে যাব।

ঘাট থেকে সবচে' বড় চিতল মাছটি কেনা হলো। আফজাল সাহেব মাছের দাম দিতে পারলেন না। তানভির দাম দিল। মজার ব্যাপার হচ্ছে রাতে খাবার সময় তানভির বলল, আমি তো চিতল মাছ খাই না।

আফজাল সাহেব হতভম্ব হয়ে বললেন সে কী! চিতল মাছ খাও না তাহলে কিনলে কেন ? ঘাটে আরে, তো মাছ ছিল!

তানভির হাসতে হাসতে বলল, আমার পরিকল্পনা ছিল সবচে' বড় মাছটি কিনব। তাই কিনেছি। কিনেছি বললেই যে খেতে হবে সে রকম তো কোনো আইন নেই।

তানভির হচ্ছে সেই ধরনের মানুষ যারা আশেপাশের সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পছন্দ করে। এবং অতি সহজেই তা পারে। রাত দশটায় সে ঘোষণা করল— ম্যাজিক দেখানো হবে। বাচ্চারা যারা এখনো ঘুমাও নি চলে এসো। বাচ্চা বলতে জেবা এবং রুবাবা। রুবাবা ঘুমিয়ে পড়েছে। জেবা জেগে আছে। তবে সে কঠিন মুখে বলল, ম্যাজিক আমার ভালো লাগে না। আমি দেখব না। রূপাও বলল, তার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে, সে কিছু দেখবে না।

মিনু বলল, পাগলামি করো না তো রূপা। এসো। এমন চমৎকার একটা ছেলে আর তুমি মুখ শুকনো করে আছ ? কী কাণ্ড! শাড়ি বদলে একটা ভালো শাড়ি পর।

রূপা বলল, বেনারসি পরব ?

বেনারসি তো পরবেই। কয়েকটা দিন পর। আপাতত সুন্দর একটা শাড়ি পর। নীল সিল্কের শাড়িটা পর।

নিজেকে সুন্দর কবে সাজিয়ে দেখতে যাব ?

সাজা তো অপরাধ না।

আমার ইচ্ছে কবছে না। তাছাড়া ভাবি বিশ্বাস কর, আমার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।

এসো তো তুমি। আমাদের তরুণ মর্গজিসিয়ান সাহেব তোমার মাথা ধরা সারিয়ে দেবেন। আর যদি সারাতে না পারেন তাহলে আমার কাছে অ্যাসপিরিন আছে।

গ্রহরা যেমন নক্ষত্রকে ঘিরে রাখে তানভিরকে তেমন সবাই ঘিরে আছে। আসরের মধ্যমণি হয়ে সে বসে আছে নক্ষত্রের মতোই। তার সামনে একটা খবরের কাগজ। এই কাগজ দিয়েই ম্যাজিক দেখানো হবে। আপাতত গল্প-গুজব হচ্ছে। কথক তানভির

একা। বাকি সবাই মুগ্ধ শ্রোতা। রূপা শাড়ি বদলেছে। চুল বেঁধেছে। মিনু খুব হালকা করে রূপার চোখে কাজলও দিয়েছে। তার প্রয়োজন ছিল না। রূপাকে এমনিতেই ইন্দ্রাণীর মতো দেখায়।

তানভিরের গল্প বলার কৌশল চমৎকার। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাচ্ছে এত সহজে যে মাঝে মাঝে মনে হয় সব গল্প বোধহয় সাজানো। নম্বর দেয়া আছে কোন গল্পের পর কোনটি বলা হবে। সে রূপার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘদিনের চেনা মানুষের মতো বলল, রূপা তুমি কি মোনালিসার ছবি দেখেছ ?

রূপা হকচকিয়ে গেল। নিতান্ত অপরিচিত একজন মানুষ পরিচিতের ভঙ্গিতে কথা বললে হকচকিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

দেখেছ মোনালিসার বিখ্যাত ছবি ?

জি।

অরিজিন্যাল নিশ্চয়ই দেখ নি — রিপ্রডাকশান দেখেছ। দেখারই কথা। পৃথিবীর অন্য কোনো ছবি এত খ্যাতি পায় নি। এত লক্ষ কোটি বার অন্য কোনো ছবির রিপ্রডাকশানও হয় নি। বলা যেতে পারে মোনালিসা হচ্ছে এই পৃথিবীর সবচে' খ্যাতনামা মহিলা। অফকোর্স ছবির মহিলা। এখন বলো দেখি এই মহিলার বিশেষত্ব কী ?

চোখ!

উহু, চোখ না। যদিও সবাই চোখ চোখ বলে মাতামাতি করে তবু আমার মনে হয় অন্য কিছু। কী তা-কি জানো ?

না।

মোনালিসার ভুরু নেই। এই জগদ্বিখ্যাত মহিলার জগদ্বিখ্যাত চোখের ভুরু নেই। কী, ব্যাপারটা অদ্ভুত না ?

রূপা কিছু না বললেও মনে মনে স্বীকার করল ব্যাপারটা অদ্ভুত। তানভির হাসতে হাসতে বলল, আমার কথা বোধহয় ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। আচ্ছা, আমি হাতে-নাতে প্রমাণ করে দিচ্ছি। আমার মানিব্যাগে মোনালিসাব পাসপোর্ট সাইজের একটা ছবি আছে।

তানভির মানিব্যাগ থেকে ছবি বের করল। ছবি সবার হাতে হাতে ফিরছে। সবাই চোখ কপালে তুলে বলেছে— তাই তো! তাই তো! রূপাব একটু মন খাবাপ লাগছে। কারণ তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে এই মানুষটির প্রতিটি গল্প সাজানো। সাজানো বলেই মানিব্যাগে মোনালিসার ছবি রেখে দেয়া।

আচ্ছা, এখন শুরু হবে ম্যাজিকের খেলা। এখানে একটা খবরের কাগজ আছে। সবার সামনে কাগজ কেটে আমি দু'খণ্ড করব, তারপর জোড়া দেব।

জাঁহর বলল, আমি কাটতে পারি ? না-কি ম্যাজিসিয়ানকেই কাটতে হবে ?

যে কেউ কাটতে পারবে।

মিনু বলল, রূপা কাটুক, রূপা।

রূপা কাগজ কাটল। কাটা কাগজ রুমাল দিয়ে ঢাকা হলো। রূপা ভেবেছিল রুমাল উঠাবার পর দেখা যাবে কাগজ জোড়া লেগেছে। রুমাল উঠাবার পর দেখা গেল কাগজের টুকরোগুলো নেই। সেখানে সুন্দর একটা কাগজের ফুল। সোবাহান সাহেবের মতো মানুষও চোঁচিয়ে বললেন, অপূর্ব, অপূর্ব! অপূর্ব!!

আসর ভাঙল রাত বারোটায় । রূপা ঘুমোতে গিয়ে দেখল জেবা এখনো জেগে ।
মশারি ফেলে মশারির ভেতর চুপচাপ বসে আছে । রূপা বিস্মিত হয়ে বলল, এখনো
জেগে ?

হঁ ।

কেন ? ঘুম আসছে না ?

না ।

রূপা হালকা গলায় বলল, আমরা সুন্দর ম্যাজিক দেখলাম । তুমি আমাদের সঙ্গে
থাকলে তোমারও ভালো লাগত । এসো এখন ঘুমানো যাক । ঘুমানোর আগে কি পানি
খাবে ? বাথরুমে যাবে ?

না ।

বাতি নিভিয়ে রূপা মশারির ভেতর ঢুকতেই জেবা বলল, ফুপু ঐ লোকটা তোমাকে
পছন্দ করেছে । খুব বেশি পছন্দ কবেছে । এখন সবাই মিলে ঐ লোকটার সঙ্গে তোমাব
বিয়ে দিয়ে দেবে ।

রূপা হালকা গলায় বলল, দিলে দিবে । কী আর করা ।

জেবা রূপার কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বলল, এখন থেকে ঐ বাড়িতে দু'টা দল
হলো । ঐ লোকটার একটা দল । সবাই সেই দলে । আর তোমার একার একটা দল ।
তোমাব দলে শুধু আমি আছি আমি একা ।

রূপা বলল, কী সব অদ্ভুত কথা যে তুমি বলো । এখন ঘুমাও তো ।

জেবা বলল, আমি মোটেও অদ্ভুত কথা বলছি না । আমি যে অদ্ভুত কথা বলছি না
তুমি তাও জানো । খুব ভালো করে জানো ।

রূপা বলল, ঘুমাও তো জেবা । প্রিজ ঘুমানোর চেষ্টা কর!

আম্বা ।

জেবা পাশ ফিরল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল । রূপা ঘুমোতে পারল না ।
রাতজাগা তার অভ্যাস হয়ে গেছে । জেগে থাকতে খাবাপও লাগছে না । তক্ষক ডাকছে ।
গভীর বাতে তক্ষকগুলি অন্যাবকম কবে ডাকে । দিনে তাদের ডাক এক রকম, বাতে অন্য
রকম । স্যারকে একবার জিজ্ঞেস করতে হবে । উনি নিশ্চয়ই চমৎকার কোনো ব্যাখ্যা
দেবেন । স্যারকে একটা ধাঁধাও জিজ্ঞেস করতে হবে । তবে ধাঁধা জিজ্ঞেস করলে উনি
খানিকটা হকচকিয়ে যান এবং এমন অস্থির বোধ করেন যে রূপারই খাবাপ লাগে ।
একবার সে স্যারকে জিজ্ঞেস করল, স্যার বলুন তো এটা কী— আমবাগানে টুপ করে
শব্দ হলো । একটা পাকা আম গাছ থেকে পড়েছে ।

যে দু'জন শুনল সে দু'জন গেল না ।

অন্য দু'জন গেল ॥

যে দু'জন গেল সে দু'জন দেখল না

অন্য দু'জন দেখল ॥

যে দু'জন দেখল সে দু'জন তুলল না

অন্য দু'জন তুলল ।

যে দু'জন তুলল সে দু'জন খেল না

অন্য একজন খেল ॥

স্যার এখন বলুন ব্যাপারটা কী ?

তিনি গভীর চিন্তায় পড়ে গেলেন। করুণ গলায় বললেন— ব্যাপারটা তো মনে হচ্ছে খুব জটিল।

মোটাই জটিল না স্যার। অত্যন্ত সহজ।

তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, জটিল জিনিসের ব্যাখ্যা খুব সহজ হয়। সহজ জিনিসের ব্যাখ্যাই জটিল।

রূপার মনে হলো স্যারের কথাটা তো খুব সত্যি। ভালোবাসা ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ কিন্তু ব্যাখ্যা কি অসম্ভব জটিল না ?

তক্ষক ডাকছে। জেগে আছে রূপা। আজ রাতটাও মনে হচ্ছে তাকে জেগেই কাটাতে হবে।

৯

কিছু-একটা হয়েছে রূপাদের বাড়িতে।

সবার মুখ হাসি হাসি। সবার মধ্যে চাপা উত্তেজনা। বড় ধরনের আনন্দের কোনো ঘটনা এ-বাড়িতে ঘটে গেছে কিংবা ঘটতে যাচ্ছে। তবে এই ঘটনা নিয়ে কেউ আলোচনা কবতে চাচ্ছে না। আলোচনা করতে না চাইলেও রূপার ধারণা সে ব্যাপারটা আঁচ করতে পারছে।

বিকেলে মিনু বলল, রূপা শুনে যাও তো। এসো আমার সঙ্গে।

কোথায় ?

ছাদে।

কোনো গোপন কথা ?

গোপন কথা কিছু না, প্রকাশ্য কথা— ছাদে তোমার চুল বাঁধতে বাঁধতে বলব।

রূপা ছাদে গেল। মিনু তার চুল বাঁধতে বাঁধতে বলল, তানভিব জায়গাটা ঘুরে ফিরে দেখতে চায়। তুমি তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোবে।

এটাই তোমার প্রকাশ্য কথা ?

না এটা প্রকাশ্য কথা না। প্রকাশ্য কথা হলো— তানভির কাল রাতে ম্যাজিকের আসর শেষ হবার পরে তোমাব ভাইয়াকে বলেছে— সে তোমাকে পছন্দ করেছে। শুধু পছন্দ না, অসম্ভব পছন্দ করেছে।

ও আচ্ছা!

ঘটনা এইখানেই শেষ না। আজ ভোরে সে বলেছে, সে এই বাড়িতেই তোমাকে বিয়ে করতে চায়। তারপর বউ নিয়ে চলে যাবে।

এত তাড়া কেন ?

তাড়া না। কথা এমনই ছিল। সে খুব খেয়ালি ছেলে। আমাদের এখানে আসার

আগে তার বাবা তোমার মেজো ভাইকে খবর দিয়ে নিয়ে যান এবং বলেন— আমার ছেলে যদি কোনো মেয়েকে পছন্দ করে ওকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেবে। এই ছেলে বড় যন্ত্রণা করছে। কিছুতেই তাকে বিয়ে করাতে রাজি করানো যাচ্ছে না।

রূপা বলল, বিয়েটা হচ্ছে কবে? আজই না-কি?

মিনু হাসতে হাসতে বলল, তোমার ভাইদের ইচ্ছা আজ সন্ধ্যাতেই মৌলানা ডাকিয়ে বিয়ে দিয়ে দেয়া। তা তো সম্ভব না। সবাইকে খবর দিতে হবে। ছেলের আত্মীয়-স্বজনদের জানাতে হবে। দিন সাতেক তো লাগবেই।

এই সাতদিন আমি ভদ্রলোককে নিয়ে গ্রাম দেখাব, নদী দেখাব?

হ্যাঁ, বন্ধুর মতো পাশাপাশি থাকবে। প্রেম প্রেম খেলবে।

রূপা সহজ গলায় বলল, আচ্ছা।

মিনু বলল, তোমার ভাগ্য দেখে আমার ঈর্ষা হচ্ছে রূপা।

রূপা বলল, আমার নিজেরই ঈর্ষা হচ্ছে, তোমার তো হবেই। আমি বৃশ্চিক রাশির মেয়ে। বৃশ্চিক রাশির মেয়েদের ঈর্ষা না করে উপায় নেই। এরা হয় খুব উপরে উঠবে কিংবা ধুলার সঙ্গে মিশ যাবে। এদের কোনো মধ্যম পস্থা নেই।

কে বলেছে?

রাশিচক্র বলে একটা বই পড়ে সব জেনে বসে আছি।

রূপা অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল। এই হাসি মিনুর ভালো লাগল না। তবে সে সাজগোজ করতে মোটেই আপত্তি করল না। আকাশী রঙের একটা শাড়ি পরল। যা কখনো করে না তাই কবল, মা'র কাছ থেকে চেয়ে গয়না পরল। দীর্ঘ সময় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। জেবা পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। জেবাকে বলল, কেমন দেখাচ্ছে জেবা?

জেবা হাসল। জবাব দিল না।

বলো তো আমাকে ইন্দ্রাণীর মতো লাগছে কি-না?

জেবা এই প্রশ্নেবও জবাব দিল না। আবারো হাসল। যেন সে রূপার ছেলেমানুষিতে খুব মজা পাচ্ছে।

রাস্তায় নেমেই রূপা বলল, আপনি কোন দিকে যেতে চান?

তানভির বলল, যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে যেতে পারি।

নদী দেখবেন? নদী?

অবশ্যই নদী দেখব? বাঙালি ছেলে হয়ে নদী দেখব না, তা-কি হয়!

হাঁটতে হবে কিন্তু।

হাঁটতে হলে হাঁটব। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি ঢাকা থেকে হেঁটে মানিকগঞ্জ গিয়েছিলাম। ননটপ হাঁটা। পথে একবার শুধু একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে চা খেয়েছি। ভালো কথা রূপা, চা ভর্তি একটা ফ্লাস্ক সঙ্গে নিলে হতো না? নদীর তীরে বসে চা খাওয়া যেত।

আমি আপনাকে চা খাওয়ার ব্যবস্থা করব।

কীভাবে করবে ?

আমি যেখানে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি সেখানে আমার এক স্যারের বাসা। স্যারের বাসা থেকে চা বানিয়ে আনব। ঘাটে স্যারের একটা নৌকা আছে। সব সময় নৌকা বাঁধা থাকে। ঐ নৌকায় বসে চা খাব।

ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া।

আপনি নৌকা বাইতে পারেন ?

পারি না, তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি। নৌকা চালানো খুব কঠিন হবার কথা না : নৌকা তো এরোপ্লেন না।

নৌকা চালানো যথেষ্টই কঠিন। এরোপ্লেন চালানোব জন্যে কত যন্ত্রপাতি আছে। বোতাম টিপলেই হলো। নৌকার তো কোনো বোতাম নেই।

তানভিরের কাছে মেয়েটিকে আজ অন্য রকম লাগছে। স্মার্ট একটি মেয়ে যে কথার পিঠে কথা বলতে পারে এবং গুছিয়ে বলতে পারে। মেয়েটি বড় হয়েছে গ্রামে অথচ কত সহজ ভঙ্গিতে হাঁটছে। গল্প করছে। বিন্দুমাত্র আড়ষ্টতা নেই।

রূপা বলল, আমার স্যারকে দেখে আপনি অবাক হয়ে যাবেন।

কেন বলো তো ?

খু। জ্ঞানী মানুষ। সন্ন্যাসীদের মতো। চিরকুমার।

তনভির সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, কিছু কিছু মানুষ আছে টাকা-পয়সাব অভাবে এবং সাহসের অভাবে বিয়ে করতে পারে না। তারা হয়ে যায় চিবকুমার। কিছু কিছু পাগলামি তাদের মধ্যে চলে আসে। এইসব দেখতে আমাদের ভালো লাগে। এর বেশি কিছু না।

স্যারের মধ্যে কোনো পাগলামি নেই। তাঁর একটা টেলিস্কোপ আছে। তিনি এই টেলিস্কোপ দিয়ে রাতের পর রাত তারা দেখেন।

এটাই কি পাগলামি না ? তিনি নিশ্চয়ই এস্ট্রনমার না বা এসট্রো ফিজিসিস্ট না। হিসাব নিকাশ করছেন না, তারাদের গতিপথ বের করছেন না। শখের বসে আকাশ দেখছেন। সেটা তো একবার দেখলেই হয়। রাতের পর রাত হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার প্রয়োজন কী ?

রূপা হেসে ফেলল।

তনভির বিস্মিত হয়ে বলল, হাসছ কেন ?

অপনি কেমন রাগ করছেন তাই দেখে হাসছি। যে মানুষটিকে আপনি এখনো দেখেন নি তাঁর উপর রাগ করছেন কেন ?

তঁর উপর রাগ করছি না। তোমার বিচার-বিবেচনা দেখে রাগ করছি। ভোমাদের মতো মেয়েসী মেয়েদের এই সমস্যা। তারা অতি অল্পতেই অভিভূত। একজন হয়তো কবিতা লেখে। তার মাথাভর্তি লম্বা চুল। ময়লা পাঞ্জাবি পরে উদাস মুখে ঘুরে বেড়ায়। তার এ গতি কবিতা না পড়ে শুধুমাত্র তাকে দেখেই তোমরা অভিভূত হয়ে যাবে। চোখ বড় বড় করে কাঁপা কাঁপা গলায় বলবে, কবি, কবি!

রূপা খিলখিল করে হেসে ফেলল।

তানভিরও হাসল। হাসতে হাসতে বলল, লর্ড বায়রনের কথা তুমি জানো কি-না জানি না। বড় কবি। ইংল্যান্ডের সব তরুণী কবিতা না পড়েই এই মানুষটার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিল। অথচ মানুষটা ছিলেন খোড়া, তিরিক্ষি মেজাজ। কেউ তাঁর দিকে তাকালেই রেগে যেতেন। তিনি বিয়ের দু'ঘণ্টা পর নববধূকে কাছে ডেকে বললেন, এই শোন, তোমাকে আমি কেন বিয়ে করেছি জানো? তোমাকে আমি অসম্ভব ঘৃণা করি বলেই বিয়ে করেছি।

রূপা বলল, বায়রনের কোনো কবিতা কি আপনার জানা আছে?

না। তুমি পড়তে চাইলে জোগাড় করে দেব। অনেক দূর এসে পড়েছি বলে মনে হচ্ছে। আব কতক্ষণ?

ঐ যে ভাঙা বাড়িটা দেখছেন— ঐ টা।

তানভির বিস্মিত হয়ে বলল, এ বাড়ি তো যে-কোনো মুহূর্তে ভেঙে মাথার উপর পড়বে। কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী এই বাড়িতে বাস করতে পারে না। অসম্ভব!

তানভিবার কথা ভুল প্রমাণ করে ভাঙা বাড়ির ভেতর থেকে মবিনুর রহমান বের হয়ে এলেন এবং নিতান্তই সহজ গলায় বললেন, রূপা আস। যেন তিনি রূপার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

রূপা বলল, স্যার ইনি মেজো ভাইয়ের বন্ধু। আমাদের এখানে বেড়াতে এসেছেন। গ্রাম দেখতে বের হয়েছেন।

মবিনুর রহমান বললেন, আসুন, ভেতরে আসুন।

তানভির কিছু বলল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বইল। রূপা বলল, স্যার আপনার নৌকাটা কি ঘাটে আছে?

হঁ। আছে।

আমরা আপনার নৌকায় বসে চা খাব। ঘরে চা পাতা আছে স্যার?

আছে, চা পাতা আছে তবে চিনি নেই। গুড় দিয়ে চা খেতে হবে। তোমরা নৌকায় গিয়ে বস, আমি চা বানিয়ে আচ্ছি।

আপনাকে চা বানাতে হবে না স্যার। আমি বানাব। কোনটা কোথায় আছে আপনি শুধু দেখিয়ে দেবেন।

রূপা চা বানাতে বসল। তানভির মবিনুর রহমানের পাশে একটা চৌকিতে বসল। সে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না। তাব মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে বাড়ির ছাদ ভেঙে মাথায় পড়বে। তবে আরো আগে যে চৌকিতে বসেছে সেই চৌকিও ভেঙে টুকরো টুকরো হবে। মটমট শব্দ করছে।

তানভির বলল, রূপা বলছিল আপনি না-কি টেলিস্কোপ দিয়ে সারারাত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন?

মবিনুর রহমান নিচু গলায় বললেন, এটা আমার একটা শখ। তবে সবদিন দূরবিন নিয়ে বসি না। আকাশ যখন পরিষ্কার থাকে তখন বসি।

কী দেখেন ।

তারা দেখি ?

একই তারা বারবার দেখতে ভালো লাগে ?

জি লাগে । তারা দেখি আর ভাবি ।

কী ভাবেন ?

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কী করে তৈরি হলো তাই ভাবি ।

আপনার এই ভাবনা তো পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানীরা অনেক আগেই ভেবে রেখেছেন ।
বিগ বেংগ-এর ফলে ইউনিভার্সের সৃষ্টি ।

এটা নিয়েই ভাবি । বিগ বেংগের আগে কী ছিল ? অনন্ত শূন্য ছিল ? যদি তাই থাকে
তাহলে তো বিগ বেংগ-এর ফলে ইউনিভার্স সৃষ্টি হতে পারে না ।

অসুবিধা কোথায় ?

তাহলে ধরে নিতে হবে থার্মোডিনামিক্সের প্রথম সূত্র কাজ করছে না । তা তো হয়
না । প্রকৃতি তার নিজের নিয়ম কখনো ভঙ্গ করে না ।

আপনি তা কী করে জানেন ?

কেন জানব না ? আমিও তো প্রকৃতিরই অংশ ।

আপনার দূরবিনটা কি খুব ভালো দূরবিন ?

জি । শনি গ্রহের বলয় পরিষ্কার দেখা যায় । এক রাতে সময় করে আসুন । আপনাকে
দেখাব ।

এখানে আসতে খুব ভরসা পাচ্ছি না । বাড়ির যা অবস্থা । যে কোনো মুহূর্তে ছাদ
মাথার উপর ভেঙে পড়বে বলে মনে হচ্ছে— তাছাড়া আমার কেন জানি মনে হচ্ছে এ
বাড়িতে বিষাক্ত সাপ আছে । ভাঙা বাড়ি সাপদের খুব প্রিয় ।

মবিনুর রহমান সহজ গলায় বললেন, সাপ আছে ঠিকই । দুটো চন্দ্রবোড়া সাপ
পাশের ঘরে থাকে ।

সাপ আপনি টেনেন ? চন্দ্রবোড়া বুঝলেন কী করে ?

অনুমানে বলছি । সব সাপ ডিম দেয় । এই সাপটা সরাসরি বাচ্চা দিয়েছে । একমাত্র
চন্দ্রবোড়াই সরাসরি বাচ্চা দেয় । একত্রিশটা বাচ্চা দিয়েছে ।

বসে বসে গুনেছেন ?

জি না । একদিন বারান্দায় বসে ছিলাম । দেখলাম, সাপটা বাচ্চাগুলি নিয়ে বের
হয়েছে । তখন গুনলাম ।

একত্রিশটা সাপের বাচ্চা । এবং দুটা সাপ নিয়ে বাস করতে আপনার ভয় লাগে না ?

একটু লাগে । রাতে আমি ঘরে থাকি না । নৌকায় ঘুমাই । তবে আমার মনে হয়
ভয়ের কিছু নেই । আমরা সহাবস্থান নীতি গ্রহণ করেছি । আমি ওদের কিছু বলি না ।
ওরাও আমাকে কিছু বলে না । ওরা আমার গায়ের গন্ধ চেনে । আমিও ওদের গায়ের গন্ধ
চিনি । আগেভাগেই সাবধান হয়ে যাই ।

চা তৈরি হয়ে গেছে। মবিনুর রহমান ফ্লাস্ক এনে দিলেন। ফ্লাস্ক-ভর্তি চা নিয়ে তিনি নৌকায় রাত্রিযাপন করেন। তিনি লজ্জিত গলায় বললেন, খাবার-দাবার তো কিছু নেই রূপা। মুড়ি আছে। মুড়ি নিয়ে যাবে ?

হঁ' নিয়ে যাব। আমার খুব ক্ষিধে পেয়েছে।

রূপা, তানভিরকে নিয়ে নৌকায় উঠে খুশি খুশি গলায় বলল, সুন্দর না ?

তানভির বলল, অবশ্যই সুন্দর। নৌকায় বসে চা খাওয়ার এই আইডিয়া অসাধারণ আইডিয়া। আমরা রোজ এখানে আসব। নৌকা চালানো শিখে নেব।

নদীতে কিন্তু খুব স্রোত।

হোক স্রোত। স্রোত কোনো সমস্যা না।

গুড়ের চা কেমন লাগছে ?

অসাধারণ লাগছে। এই পরিবেশে সবকিছুই অসাধারণ লাগে।

আমার স্যারকে আপনার কেমন লাগল ?

ইন্টারেস্টিং ক্যাবেস্টার। তবে এই জাতীয় ক্যারেস্টার আমি আগেও দেখেছি। এরা কিছুটা অদ্ভুত। তবে যতটা না অদ্ভুত মানুষের কাছে তারা নিজেদের তার চেয়েও অদ্ভুত করে তুলে ধরে।

রূপা বলল, স্যাব সম্পর্কে আমি আপনাকে খুব-একটা গোপন কথা বলতে পারি। বলব ?

বলো!

কাউকে কিন্তু বলতে পারবেন না। অসম্ভব গোপন কথা, পৃথিবীর কেউ জানে না। আমি কাউকে বলি নি। শুধু আপনাকে বলব, তবে কথা দিতে হবে আপনি কাউকে বলবেন না।

অবশ্যই আমি কাউকে বলব না।

কথাটা কী জানেন ? স্যাবকে আমি পাগলের মতো পছন্দ করি। সব সময় আমি উনাব কথা ভাবি। রাতের পব বাত আমি ঘুমোতে পারি না। আমি ঠিক করেছি যেভাবেই হোক তাঁকে বিয়ে করব। বাকি জীবন কাটিয়ে দেব তাঁর সেবা করে।

তানভির অবাক হয়ে রূপার দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখ হয়েছে মাছের চোখের মতো। চোখে পলক পড়ছে না।

১০

রাতের খাবার দেয়া হয়েছে।

রূপা বলল, আমি আগে আগে বেশ, নেব। আমার ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে। মিনু বলল, তুমি আমার সঙ্গে খাবে রূপা। সেকেন্ড ব্যাচে।

ভাবি তুমি তো খাও খাও ব্যাচে। রাত এগারোটা বাজে খেতে খেতে।

আজ তুমিও রাত এগারোটায় খাবে। এসো আমার ঘরে। তোমার সঙ্গে খুব জরুরি কিছু কথা আছে।

ক্ষিধেয় তো মরে যাচ্ছি ভাবি ।

মিনু গম্ভীর গলায় বলল, মানুষ এত সহজে মরে না রূপা ।

রূপা মিনুর ঘরে ঢুকল । ভাবি কী বলবেন তা সে আঁচ করতে পারছে । তানভিব সব কিছুই প্রকাশ করেছে । সে নিশ্চয় জনে জনে বলে নি । প্রথমে বলেছে ভাইয়াকে, সেখান থেকে শুনেছে ভাবি, ভাবির কাছ থেকে শুনেছে মা । মার কাছ থেকে বাবা । সবাই অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকে দেখছে । বাবা তখন থেকে বাবান্দায় বসে আছেন । বাবার এমন গম্ভীর মুখ সে এর আগে কখনো দেখে নি ।

মিনু ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল । রূপা বলল, দরজা বন্ধ করছ কেন ভাবি ?

তোমার সঙ্গে যে-বিষয় নিয়ে কথা বলব আমি চাই না তা কেউ শুনুক, এই জনোই দরজা বন্ধ করছি । তুমি পা তুলে আরাম করে বিছানায় শ্বস ।

রূপা তাই করল । মিনু বলল, তুমি তানভির সাহেবকে কী বলেছ ?

অনেক কিছুই তো বলেছি । তুমি কোনটা জানতে চাচ্ছ ?

অনেক কিছু মানে কী ?

অনেক কিছু মানে অনেক কিছু । আমি প্রচুর বকবক করেছি ।

তুমি যে প্রচুর বকবক করেছ তা বুঝতে পারছি । বকবক করতে গিয়ে ভয়ঙ্কর সব কথা বলেছ ।

আমি কোনো ভয়ঙ্কর কথা বলি নি ।

অবশ্যই বলেছ— তুমি কি বলো নি যে ঘাটের মরা ঐ বুড়ো মাস্টার সাহেবের প্রেমে তুমি হাবুড়ু খাচ্ছ ?

বলেছি ।

মিনু ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমি জানি তুমি ঠাট্টা করে বলেছ । আমিও তানভিব সাহেবকে তাই বললাম । কিন্তু রূপা এই জাতীয় ঠাট্টা কবা কী উচিত ? তানভির সাহেব বুদ্ধিমান মানুষ । তাকে যখন বলেছি— রূপা ঠাট্টা করেছে, তিনি একসেপ্ট করেছেন । অন্য কেউ তো তা কববে না ।

রূপা বলল, তোমাদের তানভিব সাহেব মোটেই বুদ্ধিমান নন । বুদ্ধিমান হলে তিনি বুঝতে পারতেন আমি তাঁর সঙ্গে মোটেই ঠাট্টা করি নি ।

কী বলছ তুমি রূপা ?

সত্যি কথা বলছি ভাবি ।

সত্যি কথা বলছ ?

হ্যাঁ, সত্যি কথা বলছি ।

তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে ।

হ্যাঁ ভাবি মাথা খাবাপই হয়েছে । আব কিছু বলবে ?

মিনু বলার মতো কিছু পেল না । অবাধ হয়ে তাকিয়ে রইল । রূপা বলল, তুমি কি আরো কিছু বলবে ?

বলব ।

বলো, আমি শুনছি...।

মিনু কিছু বলতে পারল না, কারণ তার মাথা পুরোপুরি গুলিয়ে গেছে। মাথায় কোনো কিছুই আসছে না। রূপাকে দেখে এখন তার মনে হচ্ছে কিছু বলে লাভ নেই। এই মেয়েটি এখন আর কিছুই শুনবে না। সে বাস করছে অন্য জগতে।

রূপা বলল, ভাবি, আমি এখন যাই। তুমি আমাকে কী বলবে ভেবে ঠিকঠাক করে রাখ। পরে শুনব।

বাইরের ঘরের বারান্দায় তানভির হাঁটাইটি করছে। তার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। বাবান্দা অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। জ্বলন্ত সিগারেটের উঠানামা থেকে বোঝা যায় এখানে একজন মানুষ আছে যে বারান্দার এ-মাথা থেকে ও-মাথায় যাচ্ছে।

কপা বারান্দায় এসে তীক্ষ্ণ গলায় ডাকল, একটু শুনে যান তো! তানভির এগিয়ে এলো। রূপা বলল, আপনাকে বলেছিলাম কাউকে কিছু না বলতে। আপনি সবাইকে বলে বেড়িয়েছেন, তাই না?

তানভির বলল, বলা প্রয়োজন বোধ করেছি বলেই বলেছি।

প্রয়োজন বোধ করলেন কেন?

ভয়ঙ্কর কোনো ভুল কেউ করতে গেলে তাকে ভুল দেখিয়ে দিতে হয়। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হয়।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ, তাই। তোমান বয়স কম। কাজেই তুমি বুঝতে পারছ না তুমি কী বলছ কিংবা কী করছ।

আপনার ধারণা আমি ভয়ঙ্কর একটা ভুল করেছি?

অবশ্যই।

কেউ যদি ইচ্ছা করে ভুল করতে চায় তাকে কি ভুল করতে দেয়া হবে না?

না।

কোনটা ভুল কোনটা শুদ্ধ তা আপনি নিজে জানেন?

সব জানি না। তবে আমার চেয়ে বেশি জানি।

আপনার বয়স আমার চেয়ে বেশি, তাই বেশি জানেন?

বয়স একটা ফ্যাক্টর তো বটেই!

যে গাধা সে আশি বছরেও গাধা থাকে, বয়স কোনো ফ্যাক্টর না।

রূপা, আমি গাধা নই।

তা নন। তবে আপনি খুব বুদ্ধিমানও নন।

খুব বুদ্ধিমান নই তা কেন বলছ?

খুব যারা বুদ্ধিমান তারা তাদের বুদ্ধির ধার অন্যকে দেখাবার জন্যে ব্যস্ত থাকে না। অল্পবুদ্ধির মানুষরাই অন্যদের বুদ্ধির খেলা দেখাতে চায়। অন্যদের চমৎকৃত করতে চায়। বুদ্ধিমানরা তা চায় না। কারণ তারা জানে তার প্রয়োজন নেই।

আমি কী বুদ্ধির খেলা দেখাতে গিয়েছি?

অবশ্যই গেছেন। আপনার কিছু তৈরি গল্প আছে। যে সব গল্প বলে আপনি চমক লাগাবার চেষ্টা করেন। যেমন— মোনালিসার গল্প। গল্প বলার সাজ-সরঞ্জামও আপনার সঙ্গে থাকে। মানিব্যাগে থাকে ছোট্ট মোনালিসার ছবি। এই গল্প আমাদের বলার আগে আপনি শ' খানেক লোককে আগে বলেছেন। সবাই চমৎকৃত হয়েছে।

তুমি হও নি ?

আমিও হয়েছিলাম। কিন্তু যেই মুহূর্তে আপনি মানিব্যাগ থেকে ছবি বের করলেন সেই মুহূর্তেই বুঝলাম মানুষ হিসেবে আপনি খুবই সাধারণ।

তোমার ঐ স্যার বুঝি মানুষ হিসেবে অসাধারণ।

হ্যাঁ। আমার কাছে অসাধারণ।

তোমার কাছে অসাধারণ হলেই সে মানুষ হিসেবে অসাধারণ হবে ? আমার তো ধারণা সে এভারেজ ইন্টেলিজেন্সের একজন মানুষ। দুরবিন নিয়ে কিছু কায়দা-কানুন করছে যা দেখে তোমরা চমৎকৃত হচ্ছ।

রূপা চুপ করে রইল। যদিও তার ইচ্ছা করছে কঠিন কিছু বলে লোকটিকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। কিছু মনে পড়ছে না। তানভির হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে আরেকটি ধরাল। তার ভাবভঙ্গিতে আগের অস্থিরতা নেই। তবে রূপা মেয়েটিকে এখন সে আগেব মতো তুচ্ছ বালিকা হিসেবে অগ্রাহ্য করছে না। সে বুঝতে পারছে এই মেয়েটিব সঙ্গে সাবধানে কথা বলতে হবে।

রূপা!

জি।

পাড়াগাঁয় যারা থাকে তাদের জীবন মোটামুটি নিস্তরঙ্গ। বড় ধরনের কিছু চারপাশে ঘটে না। দুরবিন নিয়ে কেউ উপস্থিত হলে তাকেই মনে হয় গ্যালিলিও। আসলে তার প্রতিভা হয়তো ঐকিক নিয়মে ভালো অঙ্ক করায় সীমাবদ্ধ। কাউকে স্পেসিফিক্যালি মিন করে আমি বলছি না। তুমি রাগ করো না।

আমি রাগ করছি না। ব্যাপারটা সত্যি হলে রাগ হতো। সত্যি না বলেই বাগের বদলে হাসি পাচ্ছে।

তোমার স্যার সম্পর্কে আমি এমন একটা কথা জানি যা শুনলে তুমি হয়তো বাগ করবে।

বলুন।

শুনেছি তিনি গম চুবি করেছেন। স্কুলের বরাদ্দ একশ' মণ গম লোপাট করে দিয়েছে। তার নামে কেস হয়েছে।

কে বলেছে আপনাকে ?

এটা কোনো গোপন ব্যাপার না। আমি তোমার বাবার কাছ থেকেই শুনেছি।

তিনি আপনাকে কখন বললেন, আজ ?

হ্যাঁ।

বাবা খুব ভালো করেই জানেন এটা মিথ্যা। তার পরেও তিনি এটা আপনাকে কেন বলেছেন তা কি আপনি বুঝতে পারছেন ?

না।

জানি বুঝতে পারবেন না। কারণ আপনার এত বুদ্ধি নেই। যদি আপনার খানিকটা বুদ্ধি থাকত তাহলে আপনি বুঝে ফেলতেন যে বাবা এটা আপনাকে বলছেন যাতে আপনার সব রাগ গিয়ে ঐ মানুষটার উপর পড়ে। যাতে আপনি ভাবতে শুরু করেন যে, সব দোষ ঐ চোর মানুষটার। রূপা নামের মেয়েটার কোনো দোষ নেই।

তানভিরের বিশ্বয়ের সীমা রইল না। রূপা মেয়েটি তাকে অভিভূত করে ফেলেছে। গ্রামে বড় হওয়া বাচ্চা একটা মেয়ে এমন গুঁছিয়ে কথা বলছে— আশ্চর্য!

তানভির বলল, এই চেয়ারটায় বস রূপা। মেজাজ ঠাণ্ডা কর, তারপর কথা বলি।

রূপা বলল, আমার মেজাজ খুব ঠাণ্ডা আছে। কেন আমার মেজাজ এত ঠাণ্ডা তা জানেন?

না।

একদিন না একদিন এ-রকম একটা ব্যাপার ঘটবে তা আমি জানতাম। একদিন সবাই জানবে। তুমুল হৈচৈ শুরু হবে। মা ক্রমাগত কাঁদতে থাকবেন। বাবা স্তম্ভিত হয়ে বাবাশ্রমায় ইজি চেয়ারে বসে থাকবেন। এটা আমি জানতাম। এই ঘটনার জন্যে আমার মানসিক প্রস্তুতি ছিল বলেই আমি এত সহজভাবে সব কিছু নিতে পারছি।

তানভির বলল, আমি তাই দেখছি। এবং খানিকটা বিস্মিতও হচ্ছি। তোমার স্যার অসাধারণ কি-না জানি না, তবে তুমি অসাধারণ।

রূপা বাবান্দা থেকে চলে এলো। আসলেই তাব প্রচণ্ড ক্ষিপ্রে পেয়েছে। মনে হচ্ছে এখনো কেউ খায় নি। আজ রাতে কি এ বাড়িতে খাওয়া হবে না? রূপা রান্নাঘরে ঢুকল। রূপাব মা রান্নাঘরে মোড়ায় একা একা বসে আছেন। রূপা বলল, প্রচণ্ড ক্ষিপ্রে পেয়েছে মা। আমাকে ভাত দিয়ে দাও। আজ কী রান্না?

রূপার মা দীর্ঘ সময় মেয়েব দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, বৌমা যা বলল তা-কি সত্যি মা?

হ্যাঁ, সত্যি। এখন তোমরা কী করবে? বাঁট দিয়ে কুপিয়ে আমাকে কুচিকুচি করে নদীতে ফেলে দেবে?

রূপাব মা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, তুই ঠিক কবে বল তো মা ঐ হারামজাদা মাস্টার কি তোর গায়ে হাত দিয়েছে?

রূপা শান্ত গলায় বলল, তুমি আমাকে ছোট করতে চাও, কর। কিন্তু মা উনাকে ছোট করবে না। উনি এসব কিছুই জানেন না।

রূপার মা কেঁদে ফেললেন। কাঁদতে কাঁদতে ভাঙা গলায় বললেন, হারামজাদা জানে না মানে? হারামজাদা ঠিকই জানে। জেনে শুনে সে তোকে জাদু করেছে। তুই হচ্ছিস গাধাব গাধা। মহাগাধা। তুই কিছুই বুঝতে পারিস নি। তোর বাবা ভয়ঙ্কর রাগ করেছে। সে ঐ ছোটলোকটাকে এমন শাস্তি দেবে যে সে তার বাপ-মার নাম ভুলে যাবে।

কী শাস্তি দিবে? খুন করবে?

কথা বলিস না তো। তোর কথা শুনে রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। তুই যা আমার সামনে থেকে।

তিনি শব্দ করে কাঁদতে লাগলেন। রূপা নিজের ঘরে চলে এলো। তার অসম্ভব ভয় লাগছে। বাবা মাস্টার সাহেবকে শাস্তি দেবেন এটা নিশ্চিত। তার অপরাধে শাস্তি পাবে অন্য একজন। কী শাস্তি কে জানে। মেরে ফেলবেন না নিশ্চয়ই। মানুষ এত নিচে নামতে পারে না। চেষ্টা করেও পারে না। স্কুলের চাকরি চলে যাবে। তাঁকে নীলগঞ্জ ছেড়ে চলে যেতে হবে। এটা হলে শাপে বর হয়। সেও স্যারের সঙ্গে চলে যেতে পারে। অনেক দূরে কোথাও। যেখানে কেউ তাকে চিনতে পারবে না। কেউ না।

মিনু এসে ডাকল, খেতে আস রূপা।

রূপা বলল, ক্ষিধা মরে গেছে ভাবি। তোমরা খাও। আমি কিছু খাব না।

তোমার ভাই তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছে, খেয়ে আমার ঘরে আস।

আমি এখন কারো সঙ্গেই কথা বলব না ভাবি। অম্মার প্রচণ্ড মাথা ধবেছে। আমি দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকব।

তোমার ভাই কিছু রাগ করবে।

রাগ যা কবার করেছে। এখন দেখা করতে গেলেও সেই রাগের উনিশ-বিশ হবে না। আমি সকালে কথা বলব।

আফজাল সাহেব রাত এগারোটায় ভাত না খেয়েই জুতা-জামা পরে ঘর থেকে বেরোলেন। রফিক জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি জবাব দেন নি। কথা বলার মতো মানসিক অবস্থা এখন তার নেই। রফিক বলল, আমি কী সঙ্গে আসব বাবা?

তিনি হ্যাঁ-না কিছু বললেন না।

রফিক সঙ্গে চলল। বাবা প্রচণ্ড রেগে আছেন। তাঁর হাই ব্লাড প্রেসার। এ রকম অবস্থায় তাকে একা ছাড়া উচিত না। তাছাড়া আকাশের অবস্থা ভালো না। যেভাবে মেঘ ডাকছে তাতে মনে হয় ঝড়-টড় হবে।

রাস্তায় নেমেই রফিক বলল, যাচ্ছেন কোথায় বাবা?

থানায় যাচ্ছি।

থানায়?

হঁ। ওসি সাহেবকে বলব, ঐ ওওরের বাচ্চাকে কাল যেন কোমরে দড়ি বেঁধে হাজতে নিয়ে ঢোকায়। নীলগঞ্জের সমস্ত মানুষ যেন তাকে দেখে।

ওসি সাহেব কি এটা করবেন?

অবশ্যই করবে। থানার বড় সাহেবরা যে কোনো অন্যায় আগ্রহ নিয়ে করে। আর এটা কোনো অন্যায় না। ব্যাটার বিরুদ্ধে কেইস আছে। গম চুরির কেইস।

রফিক বলল, হাজতে নিয়ে ঢুকানোর আইডিয়াটা মন্দ না বাবা। রূপা যদি শোনে চুরির অপরাধে ব্যাটাকে হাজতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাহলে তার মোহভঙ্গ হতে পারে।

মোহভঙ্গ হোক আর না হোক, হারামজাদাব বিষদাত আমি ভেঙে দেব। ন্যাংটো করে সারা নীলগঞ্জ আমি তাকে ঘুরাব। কুস্তা লেলিয়ে দেব। আমি খেজুরের কাঁটা দিয়ে ঐ কুস্তার চোখ গেলে দিব।

এত উত্তেজিত হবেন না বাবা। আমরা ঠাণ্ডা মাথায় পুরো ব্যাপারটা ট্যাকল করব। খুব ঠাণ্ডা মাথায়।

রূপা ঘুমুতে গেল বৃষ্টি নামার পর। ঝুম বৃষ্টি নেমেছে। মনে হচ্ছে পৃথিবীর ধূয়ে-
মুছে যাবে। রূপেশ্বর নদীতে এবার বান ডাকবে। নিশ্চয়ই ডাকবে। ভাবতেই রূপার
ভালো লাগছে। ডাকুক, ভয়াবহ বান ডাকুক। নীলগঞ্জ ধূয়ে-মুছে যাক রূপেশ্বরের জলে।

বাতি নেভাতেই জেবা ডাকল, ফুপু।

রূপা বলল, হুঁ।

বাড়িতে এখন দুটা দল হয়ে গেছে।

হুঁ, হয়েছে।

তোমার এক দল আর বাকি সবার দল।

রূপা কিছু বলল না। আসলে কোনো কিছুই সে শুনছে না। প্রচণ্ড জ্বরের সময় যেমন
হয় এখন তার তাই হচ্ছে। কোনো কথা পরিষ্কার তার মাথায় ঢুকছে না। এলোমেলো
হয়ে যাচ্ছে। একটু যেন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। চোখ জ্বালা করছে।

জেবা বলল, ওদের দলে এত মানুষ আর তোমার দলে আছি শুধু আমি। দু'জনের
দল— তাই না ফুপু?

হুঁ।

নদীর দিক থেকে শৌ-শৌ শব্দ আসছে। রাত যত বাড়ছে শব্দ ততই স্পষ্ট হচ্ছে।

রূপা বিছানায় উঠতে উঠতে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল, এ বছর রূপেশ্বর নদীতে বান
ডাকবে।

বান ডাকলে কি তুমি খুশি হও ফুপু?

হ্যাঁ হই। জলের তোড়ে ভেসে গেলে খুশি হই। জেবা হাসল। খিলখিল হাসি।
অন্ধকারে তাব হাসি অদ্ভুত শোণাল। মনে হচ্ছে সে হাসি যেন কলকল শব্দে চারদিকে
ছড়িয়ে পড়ছে।

ফুপু।

ফুপু ফুপু করবি না তো। ঘুমো।

একটা কথা বলেই ঘুমিয়ে পড়ব। কথাটা হচ্ছে— কাল সকালটা তোমার জন্যে খুব
কষ্টের হবে। খুব কষ্টের, তবে আমি তো তোমার সঙ্গে থাকব। তুমি সেই কষ্ট সহ্য
করতে পারবে।

তোমাব কথার আগা-মাথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না জেবা। তুমি কি সব সময়
এরকম পাগলের মতো কথা বলো?

আমি কোনোদিনই পাগলের মতো কথা বলি না। কিন্তু সবাই মনে করে আমি
পাগলের মতো কথা বলি।

ঠিক আছে. তুমি ঘুমাও।

ফুপু।

আর একটা কথাও না। ঘুমাও তো।

আমি কী আমার একটা হাত তোমার গায়ে রাখতে পারি?

না।

আচ্ছা আমি ঘুমুচ্ছি। তুমি ঘুমাও।

আমার ঘুম আসবে না।

আসবে। এফুণি আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেব।

রূপা শুয়েছে। বৃষ্টির জন্যেই একটু শীত শীত লাগছে। গায়ে পাতলা চাদর দিতে পারলে ভালো হতো। আলসি লাগছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। ঘুমের মধ্যেই রূপা শুনতে পাচ্ছে, জেবা বলছে— দেখলে ফুপু, আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি। ঘুম! ঘুম!!

নীলগঞ্জ এমনই এক জায়গা যেখানে কখনো নাটকীয় কিছু ঘটে না। কারো বড়শিতে বড় মাছ ধরা পড়লে অনেক দিন সেই মাছ ধরার গল্প হয়। আসরে গল্প হিসেবে মাছেব প্রসঙ্গ আসে— ধরেছিল একটা মাছ, পুব পাড়ার নীলমাধব। একটা জিনিসের মতো জিনিস...

সেই নীলগঞ্জে আজ ভোরবেলা ভয়াবহ এক নাটক হচ্ছে। অচিস্তনীয় একটা ঘটনা ঘটেছে। নীলগঞ্জের মানুষ এতই হকচকিয়ে গেছে যে কিছু বলতে পারছে না। পাশের জনকে ফিসফিসিয়েও কিছু বলছে না। দৃশ্যটা হজম করতে সবারই সময় লাগছে। তাবা অবাক হয়ে দেখছে নীলগঞ্জ স্কুলের স্যার মবিনুর রহমানকে কোমবে দড়ি বেঁধে পুলিশ নিয়ে যাচ্ছে। সবার আগে যাচ্ছেন ওসি সাহেব। তার চোখে সানগ্লাস। সানগ্লাস থাকার কারণে তাঁর মুখের ভাব কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কোমবের দড়ি ধরে যে পুলিশটি যাচ্ছে তাকে খুব বিমর্ষ মনে হচ্ছে। সে হাঁটছে মাথা নিচু করে। মবিনুর রহমানের পেছনেও দু'জন পুলিশ। তারাও মাথা নিচু করে হাঁটছে।

মবিনুর রহমানকে অত্যন্ত বিস্মিত মনে হচ্ছে। এই গবমেও তিনি একটা কোট গায়ে দিয়েছেন। তাঁর হাতে টেলিফোনের বাক্সটা আছে। বাক্সটা কিছুক্ষণ পর পর এ হাতে থেকে ও হাতে নিচ্ছেন।

ওসি সাহেব মবিনুর রহমানকে বললেন, সিগারেট খাবেন?

মবিনুর রহমান বললেন, জি না।

ওসি সাহেব বললেন, আপনার ঐ টেলিফোনটা কনস্টেবলের হাতে দিয়ে দিন। হাঁটতে আপনার কষ্ট হচ্ছে।

কষ্ট হচ্ছে না। এর ওজন বেশি না। থ্রি পয়েন্ট টু কোর্জ।

সাবধানে পা ফেলুন, ভীষণ কাদা।

ওসি সাহেবরা আসামিদের সঙ্গে এই ভঙ্গিতে কথা বলেন না, বিশেষত যে আসামিকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যেতে হয়। এই আসামির বেলায় তিনি কিছু ব্যতিক্রম কবেছেন। শুরুতেই 'আপনি' বলে ফেলেছেন। শুরুতে 'আপনি' না বললে এই যন্ত্রণা হতো না।

এই লোকটা গম চুরির সঙ্গে জড়িত না তা তিনি বুঝতে পারছেন। এটা বোঝার জন্যে এগারো বছর ধরে ওসিগিরি করতে হয় না। লোকটাকে কায়দা করে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। আগে মনে হচ্ছিল পুরো ব্যাপারটার পেছনে আছে হেড মাস্টার হাফিজুল কবির। এখন মনে হচ্ছে আরো অনেকেই আছে। বিশেষ করে আফজাল সাহেব আছেন।

একটা নিরপরাধ লোককে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আফজাল সাহেবের কারণে। তিনি বিশেষ করে বলে দিয়েছেন যেন কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার বাড়ির সামনে নিয়ে নেয়া হয়।

আফজাল সাহেব এই অঞ্চলের অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ। এদের কথা শুনতে হয়। না শুনলে এ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালানো যায় না। বড়দারোগাগিরি সহজ জিনিস নয়। অনেকের মন রেখে চলতে হয়। এমন সব কাজ করতে হয় যার জন্যে মন ছোট হয়ে যায়।

ওসি সাহেব নিজের অস্বস্তি দূর করবার জন্যেই বললেন— আপনার এই যন্ত্র দিয়ে গ্রহ-নক্ষত্র সব দেখা যায় ?

মবিনুর রহমান আন্তরিক ভঙ্গিতে বললেন, সব দেখা না গেলেও অনেক দেখা যায়। যেমন ধরুন শনি গ্রহের বলয় দেখা যায়।

দেখতে কেমন ?

অপূর্ব।

ওসি সাহেব আগ্রহের সঙ্গে বললেন, জিনিসটা একবার দেখলে হয়।

মবিনুর রহমান বললেন, টেলিস্কোপ সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি। আকাশ পরিষ্কার থাকলে আপনাকে দেখাব।

ওসি সাহেব লজ্জিত বোধ কবলেন। মানুষটা তো অদ্ভুত। তার কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে আর সে কী না বলছে তাকে টেলিস্কোপে শনি গ্রহের বলয় দেখাবে। মানুষটাকে এ্যাবেস্ট করতে গিয়েও বিপত্তি। কাউকে এ্যাবেস্ট করে নিয়ে আসা এমন কোনো মজাদার বিষয় নয়। বিশেষ করে যখন জানা থাকে লোকটা নিরপরাধ। হস্তিত্বি ঔখনি বেশি করতে হয়। নিরপরাধ লোকের মনেও এই বিশ্বাস ধরিয়ে দিতে হয় যে সে আসলে নিরপরাধ না। কোনো একটা অপরাধ তার আছে যা সে নিজে তেমন ভালো জানে না। ওসি সাহেবও তাই করলেন। ভয়ঙ্কর মূর্তিতে উপস্থিত হলেন। খসখসে গলায় বললেন, ইউ আর আন্ডার এ্যারেস্ট।

ভদ্রলোক চায়ে পানি গবম কবলিলেন। বিস্মিত গলায় বললেন, কেন বলুন তো ?

গম চুর্বির মামলা— মিস এপ্রোপ্রিয়েশন অব পাবলিক ফান্ড। নব্বই বস্তা গম আপনি চুর্বি করেছেন।

নব্বই বস্তা গম দিয়ে আমি কী কবব ?

আমার সঙ্গে কি রসিকতা করার চেষ্টা করছেন ? নব্বই বস্তা গম দিয়ে আপনি কী করবেন তা জানেন না ? স্ট্রেইট কথা বলুন। বাঁকা কথা বলবেন না।

বাঁকা কথা কী বললাম বুঝতে পারছি না।

বুঝতে না পারলে কথা বলবেন না। শুধু প্রশ্ন কবলেই জবাব দেবেন। নট বিফোর দ্যাট।

জি আচ্ছা।

আপনার ঘরও সার্চ হবে। সার্চ ওয়ারেন্ট আছে। পাশের ঘরে কী আছে ?

দুটা চন্দ্রবোড়া সাপ আছে আর তাদের একত্রিশটা ছানা আছে। সাবধানে যাবেন।

ওসি সাহেবের রাগে গা জ্বলে গেল। লোকটিকে সাদাসিধা ভালোমানুষ মনে হয়েছিল, আসলে সে তা না। খাকি পোশাকের সঙ্গে রসিকতা করতে চায়। যারা খাকি পোশাকের সঙ্গে রসিকতা করতে চায় তাদেরকে চোখে চোখে রাখতে হয়। বুঝিয়ে দিতে হয় যে খাকি পোশাক রসিকতা পছন্দ করে না।

কী বললেন ? চন্দ্রবোড়া সাপ ?

জি।

ভেরি গুড। আমার কিছু চন্দ্রবোড়া সাপই দরকাব।

ওসি সাহেব নিজেই দরজা খুললেন এবং ছিটকে বের হয়ে এলেন। দুটি চন্দ্রবোড়ার একটি তিনি দেখতে পেয়েছেন। সেই দৃশ্য খুব সুখকর নয়। তখনই তিনি ঠিক করেছেন এই আসামির সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে হবে। মবিনুর রহমান যখন বললেন, আমি কি আমার দূরবিনটা সঙ্গে নিতে পারি ?

ওসি সাহেব তৎক্ষণাৎ বললেন, অবশ্যই পারেন। অবশ্যই। সঙ্গে আরো কিছু নিতে চাইলে তাও নিতে পারেন।

না, আর কিছু না। হাজতে কি আমাকে দীর্ঘদিন থাকতে হবে ?

এখন বলা যাচ্ছে না। নির্ভর করে...

কীসেব ওপব নির্ভর করে ?

ওসি সাহেব তার জবাব দিলেন না। তাঁব মন বলছে এই লোকটির সঙ্গে বেশি কথাবার্তায় যাওয়া ঠিক হবে না।

রাস্তায় লোক জমছে। তারা অবাক হয়ে মবিনুর রহমানকে দেখছে। মবিনুর রহমান তাদের দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন। তাঁর সেই তাকানোয় লজ্জা-সংকোচ কিছুই নেই। বিব্রত একটা ভঙ্গি আছে, এর বেশি কিছু না।

কালিপদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে বালতি ভর্তি পানি নিয়ে স্কুলের দিকে যাচ্ছিল। পুলিশের দল দেখে থমকে দাঁড়াল। উঁচু গলায় বলল, কী হইছে ? মবিনুর রহমান বললেন, কেমন আছ কালিপদ ?

আপনেরে কই নিয়া যায় ?

থানায় নিয়ে যাচ্ছে।

কেন ?

আমার বিরুদ্ধে গম চুরির কেইস আছে।

কালিপদ বালতি নামিয়ে মাটিতে বসে পড়ল। পরবর্তী এক ঘণ্টা সে তার জায়গায় বসেই রইল, নড়ল না।

পুলিশের দলটা থামল আফজাল সাহেবের বাড়ির সামনে। ওসি সাহেব বাড়ির গেট খুলে বাইবের বাবান্দায় ঢুকলেন এবং গম্ভীর গলায় ডাকলেন, আফজাল সাহেব আছেন ?

আফজাল সাহেব বের হয়ে এলেন।

ওসি সাহেব বললেন, এক গ্রাস পানি খাওয়াতে পাবেন ?

এদিকে কোথায় এসেছিলেন ?

আসামি নিয়ে থানায় যাচ্ছি।

বসুন চা খেয়ে যান।

চা অবশ্য এক কাপ খাওয়া যেতে পারে।

ওসি সাহেব পুলিশের দলটির দিকে তাকিয়ে বললেন, এ্যাঁই, তোমরা একটু দাঁড়াও। পুলিশের দল মবিনুর রহমানকে নিয়ে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

এরকমই কথা ছিল। আফজাল সাহেব বলে দিয়েছিলেন কোমরে দড়িবাঁধা অবস্থায় মবিনুর রহমানকে গেটের বাইরে দাঁড়া করিয়ে ওসি সাহেব তাঁর বাড়িতে চা নাশতা খাবেন।

ওসি সাহেব এই কাজটিই এখন করছেন। তবে কাজটি করতে তাঁর খুব ভালো লাগছে না। লোক জমছে। অনেক মানুষ জড়ো হয়ে গেছে। মানুষ বেশি জমলেই তারা একসঙ্গে এক জাতীয় চিন্তা-ভাবনা শুরু করে। যার নাম ‘মব সাইকোলজি’। এই চিন্তা হঠাৎ কোন দিকে যাবে বলা মুশকিল। জড়ো হওয়া মানুষগুলি যদি মনে করে কাজটা অন্যায় হয়েছে তাহলে মুহূর্তের মধ্যে ক্ষেপে যাবে। ক্ষেপা জনতা— ভয়ঙ্কর।

রূপা বারান্দায় এসে শান্ত চোখে দৃশ্যটা দেখল। একবার মবিনুর রহমানের দিকে তাকিয়ে সে তাকাল তার বাবার দিকে। তারপর তাকাল ওসি সাহেবের দিকে।

ওসি সাহেব বললেন, আপনার মেয়ে ?

আফজাল সাহেব বললেন, জি। এর নাম রূপা।

ওসি সাহেব বললেন, কেমন আছ মা ?

রূপা বলল, ভালো আছি। আপনি স্যারকে কোমরে দড়ি বেঁধে আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়া করিয়ে রেখেছেন কেন ?

আসামিকে থানায় নিয়ে যাওয়ার এইটাই পদ্ধতি। আসামি যে-ই হোক না কেন তাকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যেতে হবে।

স্যারের বাড়ি থেকে থানায় যাবার রাস্তা তো এটা না। আপনি অনেকখানি ঘুরে আমাদের বাড়ির সামনে এসেছেন। কেউ নিশ্চয়ই এই কাজটা করার জন্যে আপনাকে বলেছে। তাই না ?

ওসি সাহেব আফজাল সাহেবের দিকে তাকালেন।

আফজাল সাহেব কড়া গলায় বললেন, ভেতরে যাও রূপা।

রূপা কয়েক মুহূর্ত বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে ভেতরে চলে গেল।

বাড়ির সামনে লোক বাড়ছে।

ওসি সাহেব চা শেষ না করেই উঠে পড়লেন। ব্যাপারটা আর ভালো লাগছে না। এত লোক জমছে কেন ?

মবিনুর রহমানকে হাজতে ঢোকানোর তিন ঘণ্টার ভেতর থানার চারপাশে দু’তিন হাজার মানুষ জমে গেল। তারা হৈচৈ, চিৎকার কিছুই করছে না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সবাই শান্ত। এই লক্ষণ ভালো না। খুব খারাপ লক্ষণ। এরা থানা আক্রমণ করে বসতে পারে। থানায় আগুন লাগিয়ে দিতে পারে। থানায় টেলিফোন আছে— অতিরিক্ত ফোর্স চেয়ে টেলিফোন করা যায়। কিন্তু টেলিফোন গত এক সপ্তাহ থেকে নষ্ট।

ওসি সাহেব থানার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বললেন, আপনারা সরকারি কাজকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছেন। এর ফলাফল ভালো হবে না। আমরা আসামি ধরে এনেছি। আসামিকে কোর্টে চালান করে দেব। সেখান থেকে জামিন হবে। যান, আপনারা বাড়ি চলে যান। ভীড় বাড়াবেন না।

কেউ নড়ল না।

দুপুর গড়িয়ে গেল। মানুষ বাড়তেই থাকল।

ওসি সাহেব সেকেন্ড অফিসারকে বললেন হেড অফিসে খবর দিতে। আসামিকে ছেড়ে দিলে এখন কোনো লাভ হবে না। হিতে বিপরীত হবে। লোকজন থানায় আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। এই রিস্ক নেয়া যায় না।

সেকেন্ড অফিসার সাহেব থানা ছেড়ে বেরুতে গেলেন, লোকজন তাঁকে ঘিরে ফেলল। নিরীহ গলায় বলল, স্যার কোথায় যান ?

তা দিয়ে আপনি কী করবেন ?

যেতে পারবেন না স্যার।

যেতে পারব না মানে ? এটা কি মগের মূলুক নাকি ?

সেকেন্ড অফিসার ভয়াবহ পুলিশী গর্জন দিতে গিয়েও থেমে গেলেন। লোকজন কেমন যেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। এই দৃষ্টির সঙ্গে তিনি পরিচিত। এই দৃষ্টির নাম - উন্মাদ দৃষ্টি।

জেবা চা খাচ্ছে। পিরিচে করে চা খাচ্ছে।

পিরিচ ভর্তি চা নিয়ে চুকচুক করে চুমুক দিচ্ছে। তাকে কেন জানি খুব আনন্দিত মনে হচ্ছে। রূপা ঘরে ঢুকে জেবাকে দেখল। জেবা বলল, ফুপু আমি চা খাচ্ছি। বলেই খিলখিল করে হাসল। চা খাওয়ার মধ্যে হাসির কী আছে রূপা বুঝতে পারছে না। আসলে এখন সে কিছুই বুঝতে পারছে না। তাব কাছে সবই এলোমেলো হয়ে গেছে।

ফুপু।

কী ?

তুমি চিন্তা কববে না ফুপু, আমি তোমার দলে।

আমি কোনো চিন্তা করছি না। আর শোন, আমি কোনো দল কবছি না।

তোমার স্যারকে নিয়েও তুমি চিন্তা কববে না। আমি ব্যবস্থা করছি।

তুমি ব্যবস্থা করছ মানে ?

সব মানুষ ক্ষেপে যাবে। ওবা থানা আক্রমণ করবে। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেবে। সাংঘাতিক মজাব ব্যাপার হবে।

কী বলছ তুমি ?

আমি কোনো মিথ্যা কথা বলি না ফুপু। সন্ধ্যার মধ্যে ভয়ঙ্কর কাণ্ড শুরু হবে।

জেবা হাসল খিলখিল করে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে খুব আনন্দিত।

নীলগঞ্জ থানার ওসি সাহেব অস্থির বোধ করছেন। দুপুরে তিনি বাসায় ভাত খেতে যান নি। শুধু তিনি কেন, থানার কেউই দুপুরে খায় নি। সেপাইদের সবাইকে রাইফেল হাতে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। ওসি সাহেব বিপদের ভ্রাণ পাচ্ছেন। মানুষ ক্রমেই বাড়ছে। এখন মনে হচ্ছে দূর দূর থেকে মানুষ আসছে। অনেকের হাতেই বর্শা। বর্শা হলো এ অঞ্চলের যুদ্ধাস্ত্র যার স্থানীয় নাম অলংগা। কারো কারো হাতে লম্বা বাঁশের লাঠিও আছে। এখনো সন্ধ্যা হয় নি কিন্তু অনেকেই হারিকেন নিয়ে এসেছেন। মনে হয় তাদের সারারাত জেগে থাকার পারকল্পনা। ওসি সাহেব মবিনুর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। হাজতের দরজা খুলতেই মবিনুর রহমান বিস্মিত গলায় বললেন, এত লোক কেন চারদিকে ?

ওসি সাহেবের প্রথমেই মনে হলো, ব্যাটা সব জেনেশুনে ঠাট্টা করছে। পরমুহূর্তেই মনে পড়ল এই লোক মিথ্যা বলে না। ঠাট্টাও করে না। চন্দ্রবোড়া সাপ নিয়ে সত্যি কথাই বলেছিল।

মবিনুর রহমান আবার বললেন, এত লোক কেন ?

ওসি সাহেব ভুরু কুঁচকে বললেন, জানি না। আপনি কি চা খাবেন ?

জি-না।

সিগারেট ? সিগারেট লাগবে ? আনিয়ে দেব ?

জি-না।

ওসি সাহেব কথা বলার আর কিছু পেলেন না। নিজেব অফিস ঘরের দিকে ফিরে চললেন। লোক আবার বাড়ছে। দ্রুত কোনো একটা বুদ্ধি বেব কবে এদের দূর করতে হবে। ভয় দেখিয়ে দূর কবা যাবে না। একা মানুষ ভয় পায়। জনতা ভয় পায় না। মবিনুর বহমানকে ছেড়ে দিলেও কোনো লাভ হবে না। এরা তাহলে নিজেদের বিজয়ী ভাববে। বিজয়ী মানুষদের জয় উল্লাসও ভয়াবহ হয়ে থাকে। আনন্দেই এরা হয়তো থানা জ্বালিয়ে দেবে। এমন কিছু করতে হবে যাতে মবিনুর বহমানের কোমরে দড়ি বেঁধে হাজতে নিয়ে আসা যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কীভাবে তা সম্ভব ? অতি দ্রুত কিছু ভেবে বের করতে হবে। অতি দ্রুত। এমন কিছু বলতে হবে যাতে সবাই বলে কোমরে দড়ি বেঁধে থানায় আনাব প্রয়োজন ছিল।

ওসি সাহেব তাঁর অফিসে ঢুকেই দেখলেন, নীলগঞ্জ হাই স্কুলের ধর্ম শিক্ষক জালালুদ্দিন বসে আছেন। জালালুদ্দিন সাহেবের মুখ অতিরিক্ত গম্ভীর।

কেমন আছেন জালালুদ্দিন সাহেব ?

জি জনাব, ভালো। আপনাব কাছ থেকে একটা বিষয় জানতে এসেছি।

অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন। এর মধ্যে কী জানতে চান ?

অবস্থা সম্পর্কেই একটা প্রশ্ন। মবিনুর বহমান সাহেবকে আপনারা কোমরে দড়ি বেঁধে হাজতে এনেছেন। কী জন্যে এনেছেন ? গম চুবিব একটা মিথ্যা মামলার কারণে না অন্য কিছু ?

অন্য কিছু।

বলুন শুন।

ওসি সাহেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন— অন্য ব্যাপার। সামান্য কারণে তাঁর মতো লোককে তো এভাবে থানায় আনা যায় না। পুলিশ হয়েছে বলে তো আর আমরা অমানুষ না। মানী লোকের মান আপনারা যেমন বুঝেন আমরাও বুঝি। উনার বিরুদ্ধে অসামাজিক কার্যকলাপের গুরুতর অভিযোগ আছে।

কী বললেন ?

ওসি সাহেব নিজেকে গুছিয়ে নেবার জন্যে কিছুটা সময় নিলেন। সিগারেট ধরালেন। সুন্দর একটা গল্প ফাঁদতে হবে। বিশ্বাসযোগ্য গল্প। সিগারেট টানতে টানতে কঠিন মুখে বললেন— একটা রেপ কেইস হয়েছে। ভিকটিমের জবানবন্দি অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি।

রেপ কেইস ?

জি, রেপ কেইস। এই কারণেই কোমরে দড়ি বেঁধে থানায় এনেছি।

জালালুদ্দিন হতভম্ব মুখে তাকিয়ে আছেন।

ওসি সাহেব এই হতভম্ব দৃষ্টি দেখে খানিকটা সান্ত্বনা পেলেন। মনে হচ্ছে কাজ হবে। জালালুদ্দিন যখন তাঁর কথায় হকচকিয়ে গেছে তখন অন্যরাও যাবে। এই ঘটনায় লোকজন বুঝবে কোমরে দড়ি বেঁধে থানায় আনা উচিত ছিল। বাতাস ঘুরে যাবে। মবের চিন্তা-ভাবনা একদিন থেকে অন্যদিকে অতি দ্রুত ঘুরতে পারে। এখন যা করতে হবে তা হচ্ছে মামলা সাজানো। একটা মেয়ে জোগাড় করতে হবে, যে হবে ফরিয়াদি। তেমন মেয়ে জোগাড় করা কঠিন হবে না। পুলিশের কাছে কোনো কাজই কঠিন নয়।

তানভির বাগানে একা একা বসে ছিল।

রূপা বারান্দায় আসতেই সে ডাকল, রূপা শুনে যাও তো।

রূপা শান্তমুখে বাগানে নামল। তানভির বলল, তোমার স্যারের কাণ্ড শুনেছ ? রফিক ভাই এইমাত্র বলে গেলেন। তিনি বাজার থেকে শুনে এসেছেন। তুমি শুনে চাও ?

না।

না কেন ? একটা মানুষকে ঠিকমতো জানতে হলে তার ভালো-মন্দ সবই জানতে হয়।

আপনার বলার ইচ্ছা খুব বেশি হলে বলুন, শুনব।

জোর করে শুনাতে চাচ্ছি না। তবুও আমি মনে করি তোমার শোনা উচিত। তোমার স্যার একটা মেয়েকে নির্জন বাড়িতে রেপ করেছেন, যে কারণে পুলিশ তাকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেছে।

আপনি কি এটা বিশ্বাস করেন ?

বিশ্বাস না করার তো কিছু দেখছি না। নারীসঙ্গবর্জিত একজন মানুষ নির্জন জায়গায় একা একা থাকে...।

নারীসঙ্গবর্জিত অনেক সাধক মানুষও নির্জন জায়গায় একা একা থাকে।

তোমার ধারণা উনি সাধক মহাপুরুষ ?

হ্যাঁ।

তাহলে তো আর কিছু বলার নেই।

না। আর কিছু বলার নেই।

রূপা বাগান থেকে উঠে এলো। তানভির প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেলল, এই বুদ্ধিমতী শক্ত ধাঁচের মেয়েটিকেই তার বিয়ে করতে হবে। জোর করে হলেও করতে হবে। মেয়েটির মনে সাময়িক যে মোহ আছে তা বিয়ের পর কেটে যাবে। অল্পবয়সের মোহ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এই মোহ অনেকটা শিশুদের হামের মতো, সবারই হবে। আবার সেরে যাবে।

ওসি সাহেবের পরিকল্পনা কাজ করেছে। লোকজন চলে যেতে শুরু করেছে। মানুষ অসত্যকে সহজে বিশ্বাস করে। মবিনুর রহমানের মেয়েঘটিত ব্যাপার তারা বিশ্বাস করেছে। এর নাম ‘মব সাইকোলজি’— এই উত্তর এই দক্ষিণ। মাঝামাঝি কোনো ব্যাপার নেই।

ওসি সাহেব ডাকলেন, কবির মিয়া।

ডিউটির সেন্টি বলল, জি স্যার।

দেখে আস তো মবিনুর রহমান কী করেছে ?

দেখে এসেছি স্যার। উনি ঘুমুচ্ছেন।

হারামজাদা।

হারামজাদা কাকে বলা হলো, কেন বলা হলো কবির মিয়া ঠিক বুঝতে পারল না।

ওসি সাহেব বললেন, লোকজন এখনো আছে ?

কিছু আছে স্যার।

হারামজাদা।

কিছু বললেন স্যার ?

না কিছু বলি নাই। তুমি যাও ডিউটি দাও। আর শোন আমি এখন বেরুব। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত যেন থানা ছেড়ে কেউ না যায়।

ওসি সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়েছে। ভয়ঙ্কর একটা দিন গিয়েছে। বিশ্রামের উপায় নেই। এখন যেতে হবে একটা মেয়ের সন্ধান, যাকে ফরিয়াদি করে মামলা দাঁড়া করানো যাবে। নীলগঞ্জ বাজারে কয়েকঘর পতিতা থাকে। ওদের কাছ থেকেই সংগ্রহ করতে হবে। অল্পবয়সী হলে ভালো হয়। বয়স যত কম হবে ততই ভালো। নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

পাওয়া গেল। সাবিহা বেগম নামের পনেরো বছরের এক বালিকা দু’দিন আগের তারিখে থানায় জি.ডি এন্ট্রি করাল। তার গল্পটি এতকম— সে সকালে বাড়ি যাচ্ছিল। মবিনুর রহমানের বাড়ির কাছ দিয়ে যাবার সময় মবিনুর রহমান তাকে বলল, তুমি কি বাজারে যাও ? সে বলল, হ্যাঁ।

তুমি আমার জন্যে কিছু লবণ কিনে আনবে ? লবণের অভাবে কিছু রাঁধতে পারিছ না। আধা কেজি লবণ আনতে পারবে ?

সে বলল, পারব।

পারব বলল কারণ সে জানে এই পাগল লোকটা একা একা থাকে। স্কুলের শিক্ষক। খুব ভালো মানুষ। আগেও কয়েকবার সে এই মানুষটাকে এটা-ওটা এনে দিয়েছে।

মবিনুর রহমান বলল, আস টাকা নিয়ে যাও। সে টাকা নেবার জন্যে ঘরে ঢুকতেই মবিনুর রহমান দরজা বন্ধ করে দিল। দরজায় খিল দিয়েছিল। সাবিহা কিছু বুঝবার আগেই সে তার হাত ধরল। সাবিহা তখন অনেক চিৎকার করল। কিন্তু তার চিৎকার কেউ শুনল না। তাছাড়া খুব বৃষ্টি হচ্ছিল।

মোটামুটিভাবে বিশ্বাসযোগ্য গল্প।

মিথ্যা গল্প অতি সহজেই বিশ্বাসযোগ্য করা যায়। সমস্যা হয় সত্য গল্প নিয়ে।

জেবার জ্বর এসেছে।

সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ সমস্ত হাত-পা অবশ করে জ্বর এলো। সে দু'বার বমি করে নেতিয়ে পড়ল। তার চোখ রক্তবর্ণ। রফিক ডাক্তার ডাকতে চাইল। সে কঠিন গলায় বলল, না।

রফিক বলল, আচ্ছা থাক, ডাকব না।

রফিকের মা বললেন, এসব কেমন কথা? মেয়ে 'না' বললেই না? জ্বরে হাত-পা পুড়ে যাচ্ছে। তুই ডাক্তারের ব্যবস্থা কর। মেয়ের কথা শুনতে হবে?

রফিক ক্লান্ত গলায় বলল, ওর কথা না শুনে উপায় নেই মা। তুমি বুঝবে না। ওব অম্মে, কিছু করা যাবে না। ও যা বলবে আমাদের তাই করতে হবে।

এটা কোনো কথা হলো?

এটা কোনো কথা না কিন্তু এটাই সত্য।

জেবা বলল, কেউ যেন আমার ঘরে না আসে। দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দাও। দরজা-জানালা বন্ধ করে দেয়া হলো। জেবা ভেতর থেকে সিটকিনি দিয়ে দিল। তার জ্বর আরো বাড়ছে। ঠিকমতো পা ফেলে বিছানা পর্যন্ত যেতে পারছে না। ঘরের ভেতরটা গরম। তার শীত লাগছে। প্রচণ্ড শীত। শীতে তার সারা শরীর ঠকঠক করে কাঁপছে। জেবা বিড়বিড় করে বলল, আমি পারছি না। আমার শক্তি কম। আমি পারছি না। জেবা বিছানায় শুয়ে আছে কুণ্ডুলি পাকিয়ে। তার ঘুম আসছে। প্রচণ্ড ঘুম। ঘুম প্রয়োজন। এই ঘুমের মধ্যেই সে নি'দের দেখা পাবে। 'নি'রা তাকে বলে দেবে কী করতে হবে। কারণ সেও একজন 'নি'। রূপা ফুপুর স্যাবও 'নি'। তাঁর ক্ষমতা অনেক বেশি। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, অথচ তিনি তা জানেন না। 'নি'রা তাঁকে কিছু বলছে না কেন? সে কী তাঁকে বলে দেবে?

ঘুমুচ্ছেন মবিনুর রহমান। ঠিক ঘুম না— তন্দ্রাভাব হয়েছে। হাজতের ছোট্ট ঘবটায় তাঁবে বসার জন্য ইজিচেয়ার দেয়া হয়েছে। তিনি ইজিচেয়ারে চোখ বন্ধ কবে শুয়ে আছেন। কেন জানি তাঁব বেশ ভালো লাগছে। সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। চাবদিকে অন্ধকার। হাজত ঘরের ভেতরে কোনো বাতি নেই। বারান্দায় বাতি আছে। একশ' পাওয়ারের বাতি। ইলেকট্রিসিটি খুব দুর্বল। রাত এগারোটার আগে সবল হবে না। বারান্দার বাতি প্রদীপের আলোর মতো আলো দিচ্ছে। বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ঢালা বর্ষণ হচ্ছে। নদীর দিক

থেকে শৌ-শৌ আওয়াজ আসছে। বোধহয় রূপেশ্বরে আবারো বান ডাকবে। এই নদী প্রতি সাত বছর পর পর যৌবনবতী হয়। দু'কূল ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

মবিনুর রহমান আধো-ঘুম আধো-তন্দ্রায় রূপেশ্বরের গর্জন শুনতে পাচ্ছেন। এক সময় সেই গর্জনে কিছু কথা মিশে গেল। নদীর গর্জন কোলাহলের মতো শুনতে লাগল। এক সঙ্গে অনেকেই যেন কথা বলছে। মবিনুর রহমান ঘুমের মধ্যেই অস্বস্তি বোধ করছেন। চেষ্টা করছেন, জেগে উঠতে পারছেন না। ঘুম আরো গাঢ় হচ্ছে। যে কোলাহল এতক্ষণ শুনছিলেন তা একটি নির্দিষ্ট স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

মবিনুর রহমান।

জি।

মবিনুর রহমান।

জি।

মবিনুর রহমান।

আমি তো জবাব দিচ্ছি। বারবার ডাকছেন কেন?

কী বলছি শুনতে পাচ্ছ?

পাচ্ছি।

আমরা কে মনে আছে?

আপনারা নি'।

হ্যাঁ, তোমার মনে আছে। তুমিও একজন 'নি'।

বুঝিয়ে বলুন।

সবকিছু বুঝিয়ে বলা যায় না।

চেষ্টা করুন।

তুমি স্বপ্ন দেখতে পার।

স্বপ্ন সবাই দেখে।

তোমার স্বপ্ন আর অন্যদের স্বপ্ন এক নয়। অন্যদের স্বপ্ন স্বপ্নই। তোমার স্বপ্ন স্বপ্ন নয়। তুমি যা স্বপ্ন দেখবে তাই হবে।

বুঝতে পারছি না।

মানুষ পৃথিবীতে এসেছে ছয়চল্লিশটি ক্রমোজম নিয়ে। তোমার ক্রমোজম সংখ্যা সাতচল্লিশ। যারা 'নি' শুধু তারাই এই বাড়তি ক্রমোজম নিয়ে আসে।

বাড়তি ক্রমোজমটির কাজ কী?

বাড়তি ক্রমোজমটির জন্যেই তুমি স্বপ্নকে মুক্ত করতে পার। কী অসীম তোমার ক্ষমতা তা তুমি জানো না, ক্ষুদ্র অর্থে তুমি স্রষ্টা।

সব মানুষই স্রষ্টা। সৃষ্টি করাই মানুষের কাজ।

তোমার সৃষ্টির ক্ষমতা অসাধারণ।

অসাধারণ?

হ্যাঁ অসাধারণ। ‘নি’দের জন্ম হয়েছে স্বপ্ন দেখার জন্যে। তারা স্বপ্ন দেখে— নতুন সৃষ্টি হয়। প্রকৃতি তাই চায়।

একদিকে সৃষ্টি মানেই অন্যদিকে ধ্বংস।

হ্যাঁ তাই ঠিক। প্রকৃতি তাই চায়। প্রকৃতি চায় তার জগতে ক্রমাগত ভাঙাগড়াব খেলা চলুক।

কিছুই বুঝতে পাবছি না।

তোমাব কি মনে আছে তুমি একবার চিবজ্যোৎস্নাব একটি জগতের কথা চিন্তা করবেছিলে, মনে আছে ?

আছে।

সেই জগৎ তৈরি হয়েছে। অপূর্ব সেই জগৎ।

আমি কি সেই জগৎ দেখতে পাবি ?

হ্যাঁ পাব। তবে কল্পনায়। তোমাব পৃথিবী যে মাত্রায় আছে, তোমাব জগৎ সেই মাত্রায় নয়।

আমি কি আমার পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি কবতে পাবি ?

পার। তবে ‘নি’দের সাবধান কবে দেয়া হয় যেন এই কাজটি তারা না কবে।

অসুবিধা কী ?

এতে প্রাকৃতিক নিয়মে অসুবিধা দেখা দেয়। প্রকৃতি তাব আইনের ব্যতিক্রম সহ্য কবে না। আইন অমান্যকারীকে প্রকৃতি কঠিন শাস্তি দেয়।

আমি এই পৃথিবীতেই কিছু একটা সৃষ্টি কবে দেখতে চাই প্রকৃতি আমাকে কীভাবে শাস্তি দেয় ?

প্রকৃতির শাস্তি ভয়াবহ। আমবা তোমাকে সাবধান কববাব জন্যেই আজ এসেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমাব ইচ্ছা হবে প্রকৃতির নিয়ম ভাঙতে। সেটি যেন না হয় তাই বলতেই আমাদের আসা। তুমি তোমাব কাজ কব। তোমাব অসীম ক্ষমতা ব্যবহার কব।

আপনাবা চলে যান। আমার কথা বলতে ভালো লাগছে না।

আমরা চলে যাব। তোমাকে সাবধান কবেই চলে যাব।

আমার প্রয়োজনে আব কি আপনাদেব সঙ্গে যোগাযোগ কবতে পাবি ?

হ্যাঁ পার।

ধন্যবাদ। এখন যান।

তুমি যে এখন এক সাময়িক অসুবিধাব মধ্যে আছ তা নিয়ে কি তুমি আলাপ কবতে চাও ?

হাজতবাসেব কথা বলছেন ?

হ্যাঁ।

না। এটা কোনো সমস্যা নয়।

‘নি’দের যাবতীয় সমস্যা থেকে দূরে রাখার সব ব্যবস্থা প্রকৃতি করে রাখে। তোমার বেলাতেও তা করে রেখেছে। তুমি যখন যেখানে ছিলে সেখানেই তোমার পাশে বাখা

হয়েছে দুজন করে অসাধারণ মানসিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ, যারা মানসিকভাবে অন্যদের প্রভাবিত করতে পারে। 'নি'রা প্রকৃতির প্রিয় সন্তান।

বুঝতে পারছি না।

নীলগঞ্জে তোমার দুজন সাহায্যকারী আছে। একজন কালিপদ, অন্যজন জালালুদ্দিন। এদের মানসিক ক্ষমতা অসাধারণ। তারা সব রকম বিপদে তোমাকে সাহায্য করবে। যদিও তারা তা জানে না। তোমাকে সাহায্য করার জন্যে আরো একজন সাহায্যকারীকে আনা হয়েছে। তার নাম জেবা। জেবাও তোমাকে সাহায্য করেছে। 'নি' প্রকৃতির বিশেষ সৃষ্টি। এদের বক্ষা করার সব রকম দায়িত্ব প্রকৃতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে।

এইসব শুনতে আমাব ভালো লাগছে না। ঘুম পাচ্ছে, আমাকে ঘুমুতে দিন।

স্বপ্ন ঝাপসা হয়ে গেল। মবিনুর রহমান গাঢ় ঘুমে তলিয়ে গেলেন। আরেকটি স্বপ্ন দেখলেন। সেই স্বপ্ন অপূর্ব ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ছে আকাশে। তাদের কলকাকলিতে চারদিক মুখরিত। তারা এক আনন্দময় সঙ্গীত সৃষ্টি করছে। আলো আঁধারী এক জগতে তাদের সঙ্গীত মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

হেড মাস্টার সাহেবের গরুর জন্যে জাবনা তৈরি করা হচ্ছে। কালিপদ মাথা নিচু করে কাজটা করছে। হেড মাস্টার সাহেব পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখে-মুখে চিন্তিত ভাব। মবিনুর রহমানের গমের ব্যাপারটা এত দূর গড়াবে তা তিনি ভাবেন নি। এ তো বড়ই যত্নগা হলো।

হেড মাস্টার সাহেব বললেন, গরু কিছু মুখে দিচ্ছে না, ব্যাপার কী কালিপদ?

কালিপদ চোখ তুলে তাকাল। চোখ নামিয়ে নিল না। তাকিয়েই রইল। এ রকম সে কখনো করে না। হেড মাস্টার সাহেব অকারণেই খানিকটা অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন। প্রথম প্রশ্নটি দ্বিতীয়বার করলেন, গরু কিছু মুখে দিচ্ছে না, ব্যাপার কী কালিপদ?

কালিপদ বলল, সেইটা গরুরে জিজ্ঞেস করেন।

হেড মাস্টার সাহেব হতভম্ব হয়ে গেলেন। হারামজাদার এত বড় সাহস! কী কথা বলছে? তারপরেও তাকিয়ে আছে। চোখ নামিয়ে নিচ্ছে না। জুতিয়ে হারামজাদার গাল ভেঙে দেওয়া দরকাব।

কী বলল কালিপদ?

বললাম, গরু কেন খায় না সেইটা গরুরে জিজ্ঞাসা করেন। আমি গরুর ডাক্তার না।

তোমার সাহস অনেক বেশি হয়ে গেছে। তুমি কী বলছ তুমি নিজেও জানো না।

কালিপদ এইবার চোখ নামিয়ে নিয়ে ক্ষীণ গলায় বলল, আমার মাথার ঠিক নাই। নিরপরাধ একটা মানুষের কোমরে দড়ি বাইন্ডা নিয়া গেছে। আমার মাথার ঠিক নাই। কি বলতে কি বলছি, মনে কিছু নিয়েন না।

নিরপরাধ বলছ কেন? তুমি কি জানো না সে একটা মেয়ের সর্বনাশ করেছে? মেয়ের নাম সাবিহা।

এইগুলো দুষ্ট লোকের মিথ্যা রটনা ।

তোমারে কে বলল মিথ্যা রটনা ?

আমি জানি মিথ্যা রটনা । আফনেও জানেন, আফনে জানেন না এমন না । অখনও সময় আছে স্যার ।

কী বললা ?

বললাম অখনো সময় আছে । সময় শেষ হইলে আফসোস করবেন ।

কী বলছ তুমি ?

অতি সত্য কথা বলতেছি । অতি সত্য কথা ।

কালিপদ হাঁটা ধরল । বিস্মিত হেড মাস্টার বললেন, যাও কোথায় তুমি ?

সাবিহা বেগমের কাছে যাই ।

কালিপদ চলে গেছে । হেড মাস্টার সাহেবের পা কাঁপছে । ঠকঠক করে কাঁপছে । অকারণে ভয়ে সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করছে । এরকম কেন হচ্ছে তিনি বুঝতে পারছেন না । পিপাসায় বুক শুকিয়ে কাঠ । তিনি আস্তে আস্তে মাটিতে বসে পড়লেন । হড়হড় করে বমি হয়ে গেল । বমিতে লাল লাল কী দেখা যাচ্ছে । রক্ত না-কি ? হেড মাস্টার সাহেব ক্ষীণ স্বরে বললেন— ইয়া মাবুদ । ইয়া মাবুদ ।

বাজারের একটা ঘরের সামনে কালিপদ দাঁড়িয়ে আছে । অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে । মিষ্টি চেহারার একটা মেয়ে এক সময় বাইরে এসে বলল, কারে চান গো ?

তোমারে চাই । তোমার নাম সাবিহা না ?

হ ।

তুমি মিথ্যা মামলা কেন করছ ?

কালিপদ তাকিয়ে আছে তীব্র দৃষ্টিতে । সাবিহা সেই দৃষ্টি থেকে চোখ ফির্কিয়ে নিতে পারছে না । কালিপদ আবার বলল, কেন তুমি মিথ্যা মামলা করলা ?

ওসি সাহেব বলছেন ।

এখন ওসি সাহেবের কাছে আবার যাও । ওসি সাহেববে বলো— তুমি এইসবেব মধ্যে নাই ।

জি আচ্ছা ।

কখন যাইবা ?

এখনই যাব ।

যাও দিরং করবা না ।

জে-না । আমি দিরং করব না ।

সাবিহারও ঠিক হেড মাস্টার সাহেবের মতো হলো । গা হাত পা কাঁপছে । প্রচণ্ড বমি ভাব হচ্ছে । বুক ধড়ফড় করছে ।

জালালুদ্দিন ওসি সাহেবের বাসায় উপস্থিত হয়েছেন । সমস্ত দিনের ভ্রমবহ ক্লান্তির পর ওসি সাহেব সবে ঘুমুতে গিয়েছেন । রাত বাজে ন'টা । এত সকাল সকাল তিনি

ঘুমুতে যান না। আজ শরীরে কুলুচ্ছে না। এই সময় যন্ত্রণা। ওসি সাহেব বলে পাঠালেন, এখন দেখা হবে না।

জালালুদ্দিন বললেন, এখনই দেখা হওয়া দরকার। ওসি সাহেবের নিজের স্বার্থেই দেখা হওয়া দরকার।

ওসি সাহেব বের হয়ে এলেন। কঠিন গলায় বললেন, কী ব্যাপার?

গম চুরি মামলাটা নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।

আমার সঙ্গে কী কথা?

হেড মাস্টার সাহেব স্বীকার করেছেন যে গম চুরির মামলাটা মিথ্যা মামলা।

কী বললেন?

যা সত্য তাই বললাম। গম চুরি বিষয়ক সব দায়-দায়িত্ব উনি নিয়েছেন। কাজেই মবিনুর রহমান সাহেবকে ছেড়ে দিতে হয়।

উনাকে অন্য কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে। কারণটা আপনাকে বলছি...।

হ্যাঁ বলেছেন। সাবিহা নামের ঐ মেয়ে বলছে যে আপনি তাকে দিয়ে মিথ্যা মামলা কবিয়েছেন।

অনেকক্ষণ ওসি সাহেব কথা বলতে পারলেন না হচ্ছে কী এসব। তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, সে বললে তো হবে না?

হবে। সে বললেই হবে। নীলগঞ্জের সব মানুষ এসে ভেঙে পড়বে থানার সামনে। আপনার মহাবিপদ ওসি সাহেব।

ভয় দেখাচ্ছেন না কি?

না, ভয় দেখাচ্ছি না। যা হতে যাচ্ছে সেটাই আপনাকে বলছি। মানুষ ক্ষেপে গেলে ভয়ঙ্কর হয়ে যায় ওসি সাহেব। ক্ষাপা মানুষ বন্দুক মানে না।

আপনি কি মবিনুর রহমান সাহেবকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছেন? সেটা করা যায়...

শুধু সেটা কবলে তো হবে না। আপনি যে অন্যায় করেছেন তার জন্যে সবার কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা কববেন। কানে ধবে দশবার উঠবোস করবেন।

কী বললেন?

অপমানসূচক একটা কথা বললাম, ওসি সাহেব। খুবই অপমানসূচক কথা। কিন্তু প্রাণে বাঁচতে হলে এ ছাড়া পথ নেই। হেড মাস্টার সাহেবও একই জিনিস কববেন। উনি বাজি হয়েছেন। বুদ্ধিমান লোক তো। বিপদ আঁচ করতে পেরেছেন। আপনার বুদ্ধি কম। আপনি বিপদ টের পাবেন শেষ সময়ে, যখন করার কিছু থাকবে না।

ওসি সাহেব জালালুদ্দিনের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি কম বুদ্ধির মানুষ না তিনি বিপদ টের পাচ্ছেন। ভালোই টেব পাচ্ছেন। তাঁব কপালে ঘাম জমছে। পা কাঁপছে। তৃষ্ণা বোধ হচ্ছে। প্রাচণ্ড বর্ষা ভাব হচ্ছে।

জেবার জুর অসম্ভব বেড়েছে।

জুর ঠিক কত তা বোঝা যাচ্ছে না কারণ তার গায়ে থার্মোমিটার ছুঁয়ানো যাচ্ছে না। সে কাউকেই তার কাছে আসতে দিচ্ছে না।

আফজাল সাহেব রফিককে বললেন, মেয়ে না করছে বলে কেউ তার কাছে যাবে না এটা কেমন কথা ? মাথায় পানি ঢালতে হবে। ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করাতে হবে।

রফিক বলল, কোনো লাভ হবে না বাবা। ওর অনিচ্ছায় কিছু করা যাবে না।

যাবে না কেন ?

আপনি বুঝবেন না বাবা, অনেক সমস্যা আছে।

জুরে তোর মেয়ে পুড়ে যাচ্ছে আর তুই দেখবি না ?

এরকম ভয়ঙ্কর জ্বর তার মাঝে মাঝে হয়, আবার আপনাতেই সারে। ডাক্তার ডাকতে হয় না।

জেবা ক্ষিপ্ত গলায় বলল, তোমরা সবাই এখানে ভীড় করে আছ কেন ? তোমরা যাও। যাও বললাম। আর ঘরে বাতি জ্বালিয়েছ কেন ? বললাম না বাতি চোখে লাগে ? বাতি নিভিয়ে দাও।

বাতি নিভিয়ে রফিক সবাইকে নিয়ে বেব হয়ে এলো। তার মিনিট দশেকের ভেতর জেবা বের হয়ে এলো। সহজ স্বাভাবিক মানুষ। জ্বর নেই। চোখে-মুখে ক্লান্তির কোনো ছোঁয়াও নেই। যেন ঘুমুচ্ছিল, ঘুম থেকে উঠে এসেছে। জেবা বলল, জ্বর সেবে গছে। ফুপু কোথায় ?

রূপা বারান্দাতেই ছিল। সে চোখ তুলে তাকাল। কিছু বলল না। জেবা বলল, ফুপু তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে। আমার সঙ্গে এসো।

জেবা রূপাকে নিয়ে ঘরে ঢুকে গেল। ঘব অন্ধকার। বাতি জ্বালাল। হাসতে হাসতে বলল, তোমার জন্যে খুব ভালো খবর আছে ফুপু।

কী খবর ?

তোমার স্যারকে ওরা ছেড়ে দেবে। ছেড়ে না দিয়ে অবশ্যি উপায়ও নেই। হি-হি-হি।

তুমি কীভাবে জানো ?

যেভাবেই হোক জানি। অনেক রাতে তিনি একা একা বাড়ি ফেবার সময় এই বাড়িতে আসবেন।

তাও তুমি জানো ?

হ্যাঁ, তাও জানি। তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস কবছ না ?

না।

আমি সব সময় সত্যি কথা বলি ফুপু। তবু কেউ আমার কথা বিশ্বাস করে না। তাতে কিছু অবশ্যি যায় আসে না।

তুমি মেয়েটা খুব অদ্ভুত জেবা।

সব মানুষই অদ্ভুত ফুপু। তুমিও অদ্ভুত। পৃথিবীটাও অদ্ভুত।

তুমি একেবারে বড়দের মতো কথা বলছ।

মাঝে মাঝে আমি বড়দের মতো কথা বলি। বড়রা যদি ছোটদের মতো কথা বললে দোষ না হয় তাহলে ছোটরা বড়দের মতো কথা বললে দোষ হবে কেন ? আমি ঘুমুতে যাচ্ছি ফুপু।

রাত এগারোটোর দিকে এ বাড়ির সবাই ঘুমুতে গেল। ঘুমুতে যাবার আগে আফজাল সাহেব রূপাকে ডেকে বললেন, রূপা, তুমি আগামীকাল রফিকের সঙ্গে খুলনা চলে যাবে।

রূপা বলল, আচ্ছা।

ওখানেই থাকবে। পরীক্ষার সময় শুধু এখানে এসে পরীক্ষা দিয়ে যাবে।

আচ্ছা।

তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। এখন কিছুই বলব না। পরে বলব।

আচ্ছা।

তোমার মাকে বলেছি তোমার জিনিসপত্র সব গুছিয়ে দিতে।

ঠিক আছে বাবা।

বাইরে ভালো বৃষ্টি হচ্ছে। বাতাস শৌ-শৌ করছে। সবাই ঘুমিয়ে পড়ছে একে একে। সবার শেষে ঘুমুতে গেল মিনু। সেও ঘুমুতে যাবার আগে রূপার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলল। এমনভাবে বলল যেন কিছুই হয় নি। সব স্বাভাবিক আছে। আগের মতোই আছে।

কপা, আমাদের সঙ্গে যেতে তোমার আপত্তি নেই তো?

আপত্তি হবে কেন? খুলনা আমার খুব যেতে ইচ্ছা করে। আচ্ছা ভাবি, আমাদের ওখান থেকে সুন্দরবন কী অনেক দূর?

না— কাছেই।

আমাকে সুন্দরবন দেখাবে না?

অবশ্যই দেখাব।

সুন্দরবনে ডাকবাংলা আছে? ডাকবাংলায় থাকতে ইচ্ছা করে ভাবি।

ফবেস্টার ডাকবাংলা আছে। তোমার ভাইকে বলে ব্যবস্থা করে দেব।

ঠিক আছে। ভাবি, তুমি ঘুমুতে যাও। খুব রাত অবশ্যি হয় নি। এগারোটা বাজে। তবু কেন জানি মনে হচ্ছে নিশ্চিতি রাত। ওই না ভাবি?

মিনু ঘুমুতে গেল। রূপা নিজের ঘরে ঢুকে সুন্দর করে সাজল। চুল বেণী করল। শাড়ি পাল্টাল। অনেকদিন পর চোখে লাজল পরল।

সে অপেক্ষা করছে। জেবার কথা সে বিশ্বাস করছে। এই মেয়েটা কোনো এক বিচিত্র উপায়ে ভবিষ্যতের কথা বলতে পারে। কপা তাব প্রমাণ পেয়েছে।

মবিনুর রহমানকে ছেড়ে দিয়েছে রাও এগারোটায়।

ওসি সাহেব বললেন, চলুন, আমি আপনাকে পৌছে দিয়ে আসি। মবিনুর রহমান বললেন, না না, পৌছাতে হবে না।

ওসি সাহেব বললেন, আপনি আমার ওপর রাগ করবেন না ভাই। ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা করে দেবেন।

ঠিক আছে। মানুষ মাদ্রেই ভুল করে।

বৃষ্টির মধ্যে যাবেন কী করে ? একটা ছাতা আর টর্চ লাইট দিয়ে দি ।

টর্চ লাইট লাগবে না । ছাতা দিতে পারেন ।

মবিনুর রহমানকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্যে জালালুদ্দিন এবং কালিপদ ছিল । তিনি অনেক কষ্টে তাদের বিদেয় করলেন । তাঁর কেন জানি একা একা বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করছে । থানার সামনে জড়ো হওয়া মানুষজন কেউই এখন নেই । সবাই ভীড় করেছে নদীর তীরে । নদী ভাঙতে শুরু করেছে । এমনভাবে নদী আগে কখনো ভাঙে নি । নদী ভাঙার দৃশ্য একই সঙ্গে ভয়ঙ্কর এবং সুন্দর ।

মবিনুর রহমান ভিজতে ভিজতে এগুচ্ছেন । বৃষ্টি ছাতা মানছে না । বাতাসের কারণেই খুব ভিজছেন । নিজে ভিজছেন তা নিয়ে তিনি চিন্তিত না । টেলিস্কোপটা ভিজে যাচ্ছে এই নিয়েই তিনি চিন্তিত ।

রূপাদের বাড়ির কাছে আসতেই তাঁর মনে হলো তাঁকে যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে— এই খবরটা রূপাদের দিয়ে যাওয়া উচিত । রাত অবশ্যি অনেক হয়েছে, তবু যাওয়া যায় কারণ বাতি জ্বলছে । এখনো কেউ না কেউ জেগে আছে । সম্ভবত রূপাই জেগে আছে । সে অনেক রাত পর্যন্ত জাগে । পড়াশোনা করে ।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতেই তানভির দরজা খুলল । টেলিস্কোপ বগলে মবিনুর রহমান দাঁড়িয়ে । মবিনুর রহমান অপ্রস্তুত গলায় বললেন, ওবা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে । আপনারা চিন্তা করবেন এই ভেবে খবরটা দিতে এলাম । ভালো আছেন ?

জি ভালো আছি ।

তানভির দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে । তার ইচ্ছা নয় মানুষটা ঘরে ঢুকুক । তানভির বলল, রফিক সাহেবের ছোটমেয়েটা অসুস্থ । সবাই তাকে নিয়ে ব্যস্ত । এখন ঘুমুচ্ছে । কাউকে ডাকা যাবে না ।

মবিনুর রহমান বললেন, আপনি খবর দিয়ে দিলেই হবে । বলবেন আমি এসেছিলাম ।

আমি বলব ।

কাল সন্ধ্যায় রূপাকে পড়াতে আসব । বেশ কিছুদিন মিস হলো । আর হবে না ।

কাল আসতে হবে না । রূপা কাল চলে যাচ্ছে ।

কোথায় যাচ্ছে ?

খুলনা যাচ্ছে । রফিক সাহেব সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন ।

এই সময় বেড়াতে যাওয়া কি ঠিক হবে ? পরীক্ষার দেবি নেই ।

সেটা ওদের ব্যাপার । ওরা যা ভালো বুঝে করবে ।

শুধু ওদের ব্যাপার হবে কেন ? আমারও ব্যাপার । আমি ওর শিক্ষক ।

কথাবার্তার এই পর্যায়ে রূপা তানভিরের পেছনে এসে দাঁড়াল । শান্ত গলায় তানভিরকে বলল, আপনি স্যারকে ঘরে ঢুকতে দিচ্ছেন না কেন ? দেখছেন না উনি ভিজছেন ? দরজা ছেড়ে দাঁড়ান ।

তানভির দরজা ছেড়ে দাঁড়াল । রূপা বলল, স্যার ভেতরে আসুন ।

এখন আর ভেতরে আসব না রূপা। তোমাদের খবরটা দিতে এলাম। ওরা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। ভুল করে ধরেছিল। মানুষ মাঝেই ভুল করে। ওসি সাহেব খুব লজ্জা পেয়েছেন। আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বিশিষ্ট ভদ্রলোক।

স্যার আপনি ভেতরে আসুন। আপনাকে আসতেই হবে।

মবিনুর রহমান ভেতরে ঢুকলেন। রূপা বলল, গামছা দিচ্ছি। মাথা মুছে আরাম করে বসুন। আপনি কি রাতে কিছু খেয়েছেন?

হ্যাঁ, ওসি সাহেব তাঁর বাসা থেকে খাবার এনে খাইয়েছেন।

আমি চা এনে দিচ্ছি। আদা চা করে দেব?

দাও। বাসার আর মানুষজন কোথায়? সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি?

জি।

তানভির দাঁড়িয়ে আছে। অপলক দেখছে রূপাকে। মেয়েটা আজ এত সুন্দর করে সাজল কেন? সে কি জানত তার স্যার আসবেন?

রূপা বলল, তানভিরের দিকে তাকিয়ে আপনি আপনার ঘবে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। স্যারের সঙ্গে আমার খুব জরুরি কথা আছে। আমি কাল খুলনায় চলে যাচ্ছি। কথাগুলি স্যাবকে বলে যাওয়া দরকার।

কথাগুলি সকালে বললে হয় না?

না হয় না। আপনাব কাছে হাত জোড় করছি।

মবিনুর রহমান বললেন, আমি না হয় সকালে আসব।

না। আপনি চূপ কবে বসে থাকুন।

তানভির ঘর ছেড়ে বারান্দায় গেল। তার মন বলছে এই দুজনকে এখানে রেখে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হচ্ছে না। ব্যাপারটা অন্যদের জানানো দরকার। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সে একজন বাইরের মানুষ। তার কি উচিত অন্যদের জাগানো? তানভির সিগারেট পরাতে চেষ্টা কবছে। বাবান্দায় প্রবল বাতাস। দেয়াশলাই ধরানো যাচ্ছে না।

মবিনুর রহমান বিস্মিত মুখে বসে আছেন। রূপার মধ্যে খানিকটা পরিবর্তন তিনি লক্ষ্য করছেন। কিন্তু পরিবর্তনের ধরনটা ঠিক ধরতে পারছেন না। মেয়েটাকে সুন্দর লাগছে। অবশ্য সুন্দর মেয়েকে সুন্দর তো লাগবেই।

রূপা তার সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বলল, স্যার আপনি কি এখন বাড়িতে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

নদী নাকি খুব ভাঙছে? আপনার বাড়ি ভেঙে পড়েছে কি-না কে জানে?

গিয়ে দেখি।

রূপা বলল, আমি কিন্তু স্যার আপনার সঙ্গে যাব।

আমার সঙ্গে যাবে মানে?

আপনার সঙ্গে আপনার বাড়িতে যাব। আমি এখন থেকে আপনার সঙ্গে থাকব। মবিনুর রহমান দীর্ঘ সময় মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই মেয়েটাকে এখন

অচেনা লাগছে। একেবারেই অচেনা। যেন কোনোদিন এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় নি।

আমার সঙ্গে থাকবে কীভাবে?

কীভাবে তা জানি না। আমি থাকব।

আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না রূপা।

আপনি সব কথা বুঝেন আর আমার সামান্য কথা বুঝেন না?

না কিছু বুঝতে পারছি না।

আমি এখন আপনার সঙ্গে যাব। গিয়ে যদি দেখি আপনার বাড়ি নদীতে তলিয়ে গেছে তাহলে নৌকায় রাতে থাকব। অবশ্য এই অবস্থায় নৌকায় থাকা খুব বিপদজনক হবে। তাই না স্যার?

মবিনুর রহমান হতভম্ব হয়ে গেলেন। তাঁর মনে হতে লাগল পুরো ব্যাপারটা স্বপ্নে ঘটছে। মাঝে মাঝে তিনি যেমন অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন এও তেমন কোনো অদ্ভুত স্বপ্ন।

স্যার।

বলো।

সবচে ভালো হয় যদি আমরা দুজন এই জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই যাতে কেউ আমাদের খুঁজে বের করতে না পারে।

মবিনুর রহমান থেমে থেমে বললেন, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে রূপা। তুমি কী বলছ নিজেও জানো না। তুমি খুলনায় যাও। বাইরে গেলে ভালো লাগবে।

স্যার, আপনার ধারণা আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

কিছু একটা গুণগোল তো অবশ্যই হয়েছে। আমি উঠি, কেমন?

বাড়ি যাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

যদি অনেক বাতে একা একা আপনার বাড়িতে উপস্থিত হই আপনি কী করবেন? আমাকে এখানে এনে দিয়ে যাবেন?

অবশ্যই দিয়ে যাব।

রূপা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। দেখতে দেখতে তার চোখ ভিজে উঠল। মবিনুর রহমান উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর ইচ্ছা করছে এই পাগলী মেয়েটার মাথায় হাত দিয়ে দু'একটা সাদ্ব্ধনার কথা বলতে। তা বোধহয় ঠিক হবে না। এ কী ভয়াবহ সমস্যা! সমস্যার ধরন এখনো তাঁর কাছে পরিষ্কার নয়। এই মেয়ে কী চায় তার কাছে?

রূপা যাই।

রূপা কিছু বলল না। চেয়ার ছেড়ে উঠেও দাঁড়াল না। মবিনুর রহমান বাবান্দায় এসে দেখেন তানভির দাঁড়িয়ে আছে। তিনি নিচু গলায় বললেন, আমি যাচ্ছি। আপনি রূপাব দিকে একটু লক্ষ রাখবেন। ও বড় ধরনের কোনো সমস্যার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে বলে আমরা ধারণা। আপনি লক্ষ রাখবেন রূপা যেন রাতে বাড়ি থেকে বের না হয়।

তানভির কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

মবিনুর রহমান অসহায় বোধ করছেন। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, আপনি বরং

রূপার বাবা-মাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলুন। ওদের বলুন মেয়েটার দিকে লক্ষ রাখতে।

লক্ষ রাখা হবে। আপনি আপনার বাড়িতে যান। রূপাকে নিয়ে আপনার ভাবতে হবে না।

মবিনুর রহমান বাড়িতে এসে পৌঁছেছেন। নদী আশেপাশের পুরো অঞ্চল ভেঙে দ্রুতগতিতে এগুচ্ছে— আশ্চর্য তার বাড়িটি ঠিকই আছে। নৌকাও বাঁধা আছে। তিনি জানতেন কিছু হবে না। প্রকৃতি তাঁকে রক্ষা করবে। তিনি একজন ‘নি’। তাঁকে সব রকম সমস্যা থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব প্রকৃতির। তিনি প্রকৃতির প্রিয় সন্তান।

ভেবেছিলেন রাতে নৌকায় ঘুমুবেন। নৌকা যেভাবে দুলছে তাতে তা সম্ভব না। তিনি নিজের ঘরেই ঘুমুতে এলেন। যাবার সময় দরজা বন্ধ করে তালা দিয়ে গিয়েছিলেন, এখন তালা খোলা। কেউ ঘরে ঢুকেছিল নিশ্চয়ই। ঘরের জিনিসপত্র যেমন ছিল তেমনি আছে। যে এসেছিল সে কোনো কিছুতেই হাত দেয় নি।

চায়ের তৃষ্ণা হচ্ছে। তিনি চুলায় কেতলি বসিয়ে দিলেন। নদীর শো-শো শব্দের সঙ্গে স্টোভের শো শো শব্দ মিশে অন্য এক ধরনের শব্দ হচ্ছে। চুলার সামনে বসে থাকতে থাকতে তাঁর হঠাৎ মনে হলো, পৃথিবী শব্দময় হলে কেমন হতো? যদি এমন একটি জগৎ থাকত যেখানে সবই শব্দময়। গাছ অনবরত শব্দ করে যাবে। একেক গাছ থেকে একেক ধরনের শব্দ আসবে। পাথর থেকে শব্দ হবে। বড় পাথরের এক ধরনের শব্দ, ছোট পাথরের এক ধরনের শব্দ। মানুষের শব্দে যেমন ঘ্রাণ থাকে তেমনি শব্দও থাকবে। কারোর গা থেকে আসবে মধুর সঙ্গীতময় শব্দ। কাবো গা থেকে আসবে বিরজিকর শব্দ। এ রকম একটি জগতে রূপার গা থেকে কেমন শব্দ আসবে? নূপুরে ছটফটে ধরনের শব্দ?

ভাবতে ভাবতেই তাঁর এক ধরনের ঘোবের মতো হলো। তিনি বিচিত্র সব শব্দ শুনতে লাগলেন। কেরোসিনের স্টোভ থেকে শো-শো শব্দ ছাড়াও স্টোভের নিজস্ব শব্দ আসছে। পানি ভর্তি গ্লাস থেকে এক ধরনের শব্দ আসছে, আবার কেতলির ফুটন্ত পানি থেকে অন্য ধরনের শব্দ। কী ‘আশ্চর্য’ তিনি ঘোরের মধ্যেই শুনলেন—

হচ্ছে তোমার হচ্ছে! এই তো তুমি জগৎ তৈরি করেছ। শব্দময় জগৎ। অপূর্ব! অপূর্ব!!

আপনারা কি ‘নি’?

হ্যাঁ আমরা ‘নি’। আমরা তোমার ক্ষমতায় বিস্মিত।

আমি তাহলে একটি শব্দময় জগৎ তৈরি করেছি?

হ্যাঁ করেছ।

আমি আপনাদের এই বসিকতাব বোঝার অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না। পৃথিবী সব সময়ই শব্দময়। শব্দের উৎপত্তি কম্পনে। প্রতিটি বস্তুর নিজস্ব কম্পনাংক আছে। সেই অর্থে প্রতিটি বস্তুই শব্দময়।

অবশ্যই প্রতিটি বস্তু শব্দময়। কিন্তু তুমি কল্পনা করেছ এমন মানুষের যারা এই শব্দ ধরতে পারে। সেই অর্থে তোমার জগৎটি নতুন।

কোথায় সেই জগৎ ?

সেই জগতের অবস্থান তোমার মধ্যেই তবে ভিন্ন মাত্রায় বলেই তোমার ধরা-
ছোঁয়ার বাইরে। তুমি আরো ভাব। কল্পনাকে আরো ছড়িয়ে দাও। নতুন নতুন জগৎ সৃষ্টি
কর।

তাতে আমার লাভ ?

তুমি সৃষ্টির আনন্দ পাচ্ছ। এই আনন্দই তোমার লাভ।

যে সৃষ্টি আমি দেখছি না সেই সৃষ্টিতে কোনো আনন্দ থাকার কথা নয়।

তুমি কি কোনো আনন্দই পাচ্ছ না ?

না।

তুমি যখন শব্দময় জগতের কথা ভাবছিলে তখন কি আনন্দ পাও নি ?

পেয়েছি।

সেই আনন্দ কি অসম্ভব তীব্র ছিল না ?

হ্যাঁ ছিল।

ঐটিই তোমার লাভ। শব্দময় জগতের কথা ভাবতে ভাবতে তোমার নিজের জগৎও
হয়ে গেল শব্দময়। সেই অভিজ্ঞতা কেমন ছিল ?

বিচিত্র!

শুধু বিচিত্র ? আর কিছু না ? আনন্দে কি তখন তোমার শরীর ঝনঝন করছিল না ?
করছিল।

তোমার কল্পনা যতই উন্নত হবে তোমার আনন্দের পরিমাণ হবে ততই তীব্র।
আমরা গভীর আশ্রয় নিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছি।

কেন ?

কারণ তোমার আনন্দ আমাদেরও আনন্দ। আমরাও তো 'ন' তোমার জন্যে থেকেই
আমরা তোমার ওপর লক্ষ রাখছি। তোমার প্রতিটি কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করছি।

প্রতিটি কার্যকলাপ ?

হ্যাঁ, প্রতিটি কার্যকলাপ। তুমি যেন নীলগঞ্জ আস সে জন্যে সব ব্যবস্থা করা
হয়েছে। তুমি যাতে এই ভাঙা বাড়িতে এসে উঠ সেই ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কাবণ
তোমার ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যে নির্জন একটি বাড়ি প্রয়োজন ছিল।

তাই বুঝি ?

হ্যাঁ তাই। তুমি টেলিস্কোপের কথাই চিন্তা করে দেখ। একটি প্রথম শ্রেণীর
এন্ট্রোনমিক্যাল টেলিস্কোপ তুমি ব্যবহার করছ। 'টেলিস্কোপটি তুমি কিনেছ একটি পুরানো
ফার্নিচারের দোকান থেকে। তুমি সেখানে গিয়েছিলে ইজিচেয়ার কিনতে। মনে আছে ?

আছে। তাহলে কি আপনারা বলতে চান সব কিছুই পূর্ব নির্ধারিত ?

হ্যাঁ।

রূপা মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয়ও কি পূর্ব নির্ধারিত ?

হ্যাঁ পূর্ব নির্ধারিত। বিশেষ প্রয়োজনেই রূপাকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

কী প্রয়োজন ?

তুমি যে সব জগৎ তৈরি করছ সেসব জগতের মানুষ তোমার মতোই আবেগশূন্য ।
তীব্র আবেগের সঙ্গে তোমার পরিচয়ের প্রয়োজন হয়েছে সে কারণেই, যাতে তোমার
জগতের মানুষদের তুমি অন্য রকম করে তৈরি করতে পার ।

আপনারা কি ভবিষ্যৎ বলতে পারেন ?

পারি না । আবার এক অর্থে পারি ।

রূপা এখন কি করবে বলতে পারেন ?

না, পারি না । প্রকৃতি খানিকটা অনিশ্চয়তা রেখে দেয় । রূপা ঝড়-বৃষ্টির রাতে
এখানে ছুটে আসতে পারে, আবার আসতে নাও পারে, আবার অন্য কিছু করতে পারে ।

তাহলে অনিশ্চয়তা সামান্য বলছেন কেন ? অনেকখানি অনিশ্চয়তা ।

হ্যাঁ, অনেকখানি ।

আপনারা বলছেন 'নি'-রা প্রচণ্ড ক্ষমতাসম্পন্ন । এই অনিশ্চয়তা তারা দূর করতে
পারে না ।

না । অনিশ্চয়তা প্রকৃতিরই নিয়ম । প্রকৃতি তার নিজের নিয়ম ভঙ্গ করে না ।

মবিনুর রহমানের ঘোর কেটে গেল । কেতলিতে পানি টগবগ করে ফুটছে । তিনি
চা বানিয়ে খেলেন । হাওয়ার বেগ আরো বাড়ছে । তুমুল বর্ষণ । ধুপধুপ শব্দে নদী ভাঙতে
ভাঙতে এগুচ্ছে । যে হারে এগুচ্ছে তাতে মনে হয় আজ রাতের মধ্যেই নদী তাঁর বাড়ি
গ্রাস করে নেবে । তিনি তেমন চিন্তিতবোধ করছেন না । বরং ভালোই লাগছে । তিনি রাত
দুটোর দিকে ঘুমুতে গেলেন । চাদর মুড়ি দিয়ে সবে শুয়েছেন । হাত বাড়িয়েছেন
হারিকেনের সলতা কমিয়ে দেবার জন্যে । এমন সময় দরজায় প্রবল ধাক্কার শব্দ হলো ।
তিনি বললেন, কে ?

বাইরে থেকে তানভিরের গলা শোনা গেল ।

দরজা খুলুন মাস্টার সাহেব ।

কী ব্যাপার ?

দরজা খুলুন । তারপর বলো ।

তিনি দরজা খুললেন । তানভির একা নয় । রূপার দুই ভাই— রফিক এবং জহিরও
তার সঙ্গে এসেছে । রফিক কঠিন গলায় বলল, রূপা কি আপনার এখানে ?

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, না তো!

আপনি কী সত্যি কথা বলছেন মাস্টার সাহেব ?

মিথ্যা বলার প্রয়োজন কখনো বোধ করি নি । রূপাকে কী পাওয়া যাচ্ছে না ?

না ।

তানভির বলল, আমরা আপনার নৌকাটা একটু দেখব । নৌকা কী ঘাটে বাঁধা
আছে ?

থাকার কথা । আসুন যাই ।

নৌকা বাতাসের প্রবল ঝাপ্টায় উলট পালট খাচ্ছে । যে কোনো মুহূর্তে দড়ি ছিঁড়ে

যাবে। রফিক বলল, আপনি রাতে আমাদের বাড়ি গিয়েছিলেন তখন রূপা আপনাকে কি বলেছে ?

আমার এখানে আসতে চেয়েছিল, আমি নিষেধ করেছিলাম।

তিনজনই ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। জহির হিসহিস করে চাপা গলায় বলল, রূপার যদি কিছু হয় তাহলে আমি আপনাকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করব। কেউ আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না। কেউ না।

তারা তিনজন বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ছুটতে ছুটতে যাচ্ছে।

মবিনুর রহমান একা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অন্ধকার রাতে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টিতে ভিজতে তাঁর ভালো লাগছে। চোখের সামনে নদী। নদীর জল, সমুদ্রের জলের মতোই অন্ধকারে জ্বলছে। অদ্ভুত লাগছে তাকিয়ে থাকতে। তাঁর ভালো লাগছে। এক ধরনের তীব্র আনন্দবোধ করছেন।

সমস্ত রাত তিনি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলেন। ভোরবেলা প্রবল জ্বর নিয়ে ঘবে ফিরলেন। হাত-পা অবশ হয়ে আছে। ভেজা কাপড় বদলাবার শক্তিও নেই। তিনি ভেজা কাপড়েই বিছানায় শুয়ে পড়লেন। জ্বর বাড়তেই থাকল। জ্বরের ঘোবে বেশ কয়েকবার তাঁর মনে হলো অসংখ্য বুড়ো মানুষ তাঁর দিকে তাকিয়ে মিনতির সঙ্গে বলছে— তুমি অসম্ভব ক্ষমতাসম্পন্ন একজন ‘নি’। তোমার অকল্পনীয় ক্ষমতা। কিন্তু তুমি সীমা লঙ্ঘনের চেষ্টা করবে না। প্রকৃতি সীমা লঙ্ঘনকারীকে সহ্য করে না। প্রকৃতি কাউকে সীমা লঙ্ঘন করতে দেয় না। কাউকেই না। তোমাকেও দেবে না।

ভোববেলায় সূর্য উঠার আগেই কালিপদ এলো মবিনুর বহমান সাহেবের খোঁজ নিতে। সে আগেই আসত, মহা সমস্যায় পড়ে আসতে পারে নি। সমস্যা তার একা ব না, সবার সমস্যা। নদী ভাঙতে ভাঙতে এগুচ্ছে। অতি দ্রুত এগুচ্ছে। লোকজন সরিয়ে দিতে হচ্ছে। বাজারের পুরোটাই চলে গেছে নদীর ভেতর। ঘটনা ঘটেছে অন্ধকার রাতে। লোকজন বুঝতেই পারে নি এত দ্রুত নদী এগুবে। ছ’সাত জন মানুষ মারা গেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। শুধু একজনের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে। আফজাল সাহেবের মেয়ে রূপা। তার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। অন্য কারো কোনো চিহ্নই এখনো পাওয়া যায় নি।

কালিপদ এসেছে ছুটতে ছুটতে, ভয়াবহ আতঙ্ক নিয়ে। হয়তো দেখবে মবিনুর রহমান স্যারের শোনা চিহ্নই নেই। সে দূর থেকে বিশ্বয়ের সঙ্গে দেখল— নদীর এই অংশটি মোটামুটি শান্ত। ভাঙা বাড়ি এখনো টিকে আছে। ঘাটে নৌকা বাঁধা। মনে হচ্ছে নদী খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিয়ে এগুচ্ছে।

ঘরে ঢুকে কালিপদ দেখল মবিনুর রহমান ভেজা কাপড়ে কুণ্ডল পাকিয়ে বিছানায় পড়ে আছেন। তাঁর চোখ রক্তবর্ণ। হাত-পা কাঁপছে।

কালিপদ বলল, কী হইছে স্যার ?

মবিনুর রহমান জড়ানো গলায় বললেন, কে ?

স্যার আমি কালিপদ।

তুমি কেমন আছ কালিপদ ?

আপনের কী হইছে স্যার ?

জ্বর আসছে বলে মনে হয় ।

কালিপদ দ্রুত ঘরের জিনিসপত্র গুছাচ্ছে । মানুষটাকে সরিয়ে দিতে হবে । রাগী নদী কাউকে ক্ষমা করে না । যে কোনো মুহূর্তে এখানে চলে আসবে ।

স্যার ।

হু ।

এইখানে থাকা যাবে না স্যার ।

অসুবিধা হবে না । কালিপদ তুমি চলে যাও ।

আমি স্যার যাব না । আপনাকে না নিয়ে আমি যাব না ।

মবিনুব রহমান ক্ষীণ গলায় বললেন, একটা খবর নিয়ে আস । রূপা মেয়েটাকে পাওয়া গেছে কি-না জেনে আস ।

কালিপদ ভেবে পেল না দুঃসংবাদ স্যারকে দেয়া যাবে কি-না । শরীরের এই অবস্থায় কি দুঃসংবাদ দেয়া যায় ? তবে মানুষটা খুব শক্ত । এবং রূপাকে যে পাওয়া যাচ্ছে না তাও এই মানুষটা জানে ।

কালিপদ ।

জি ।

খবর নিয়ে আস ।

খবর স্যার জানি । উনার লাশ পাওয়া গেছে । বাঁকখালির কাছে । পরনে নীল শাড়ি । গা ভবত গয়না ।

ও আচ্ছা ।

তাদের বাড়ির সবাই খুব কানতেছে ।

মবিনুব রহমান চোখ বন্ধ করে ফেললেন । এই খবর শোনার জন্যে তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন বলে ভেবেছিলেন । এখন মনে হচ্ছে তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত না । নিজেই একা লাগছে । মনে হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড গ্রহে তিনি যেন একা জেগে আছেন । বিশাল একটা গ্রহ— গাছ-পালা, ফুল-ফল, নদী, সাগর... কিন্তু একটিমাত্র মানুষ । দ্বিতীয় প্রাণী নেই । কল্পনা করতে ভালো লাগছে ।

তিনি একজন 'নি' । বলা হয়েছে অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন 'নি' । সৃষ্টির আদিতে ঈশ্বর বললেন— 'হও' । জগৎ তৈরি হলো শূন্য থেকে । এই জগৎ কোথায় ছিল ? ছিল ঈশ্বরের কল্পনার । 'নি'রাও কল্পনা থেকে জগৎ সৃষ্টি করতে পারে । অন্তত তাঁকে সে রকমই বলা হয়েছে ।

রূপাকে কি তিনি সৃষ্টি করতে পারেন না ? এই জগতেই কি তা সম্ভব ?

মবিনুব রহমান উঠে বসলেন । এক ধবনের ঘোরে তাঁর শরীর আচ্ছন্ন । রূপা মেয়েটির প্রতি প্রচণ্ড রকম আবেগ তিনি বোধ করছেন । এই আবেগ এই তীব্র আকর্ষণ কোথায় লুকিয়ে ছিল ।

কালিপদ বলল, আপনে স্যার চলেন । নদী ভাঙতেছে ।

তিনি কিছুই শুনছেন না। তাঁর সমস্ত চিন্তা-চেতনা কেন্দ্রীভূত। রূপার কথা ভাবছেন গভীরভাবে ভাবছেন। তাঁর সমস্ত শরীর থরথর কবে কাঁপছে। তিনি কল্পনায় দেখছেন রূপা বসে আছে নৌকায়। রূপার গায়ে হালকা নীল রঙের শাড়ি। হাত ভর্তি কাঁচের চুড়ি। পান খেয়ে সে ঠোঁট লাল করেছে। গুনগুন করে গান গাইছে। নৌকায় গাদা করে রাখা বইপত্র গুলিয়ে রাখছে।

মবিনুর রহমান এখন আর চারপাশের কিছু স্পষ্ট দেখতে পারছেন না। সব ধোঁয়াটে হয়ে গেছে। কালিপদ ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকছে, তিনি সেই ডাক শুনতে পাচ্ছেন না। এর মধ্যেও তিনি স্পষ্ট শুনলেন—

মবিনুর রহমান! মবিনুর রহমান।

তিনি জবাব দিলেন না। তাঁকে ডাকছে ‘নি’ রা। অসংখ্য বৃদ্ধের মুখ এখন তিনি দেখতে পারছেন। তারা সবাই ভয়ানক উদ্ভিগ্ন।

মবিনুর রহমান। মবিনুর রহমান।

বলুন।

তুমি এসব কী করছ? তুমি সীমা লঙ্ঘন করছ। তুমি মেয়েটিকে এই জগতেই সৃষ্টি করার চেষ্টা করছ। এই চেষ্টা তুমি করতে পার না।

আমি পারি। আমি একজন ‘নি’। নি’দের ক্ষমতা অসাধারণ।

প্রকৃতি সীমা লঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করে না।

হে প্রকৃতি সীমা বেঁধে দেয় তাকেও আমি পছন্দ করি না।

তুমি বিরাট ভুল করেছ মবিনুর রহমান। এই পৃথিবীতে দীর্ঘদিন পর পর একজন ‘নি’ আসে। তুমি এসেছ। কল্পনাতেই ক্ষমতা তোমাকে দেয়া হয়েছে। এই ক্ষমতার অপব্যবহার করবে না।

আমি কথা বলতে চাচ্ছি না।

রূপাকে তোমার প্রয়োজন নেই।

কে বলল প্রয়োজন নেই।

আমরা বলছি।

তোমরা বললে তো হবে না। আমার প্রয়োজন আমি বুঝব। আমি এই মেয়েটিকে আমার জগতেই তৈরি করব।

মবিনুর রহমান।

আমাকে ডাকাডাকি করে কোনো লাভ হবে না। আমি আমার প্রচণ্ড ক্ষমতা অনুভব করছি। প্রতিটি রক্ত কণিকায় অনুভব করছি। আমি সেই ক্ষমতার পুরোটা ব্যবহার করব।

মবিনুর রহমান কিছুক্ষণের জন্যে বাস্তবে ফিরে এলেন। কালিপদ চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

কালিপদ!

জি।

একটু বাইরে গিয়ে দেখ তো নৌকায় কি কাউকে দেখা যায় ?

কালিপদ ঘর থেকে বের হয়ে চমকে উঠল। সে ছুটে নদীর কাছে এলো। নদী ভাঙতে শুরু করেছে। ভয়ঙ্কর গর্জন হচ্ছে নদীতে। নৌকা দুলছে কাগজের নৌকার মতো। আশ্চর্য ব্যাপার, নৌকার ভেতর কাকে যেন দেখা যায়। কালিপদ বলল, কে কে ? কেউ জবাব দিল না কিন্তু কালিপদ স্পষ্ট শুনল কেউ-একজন যেন গুনগুন করে গান গাইছে। মিষ্টি মেয়েগলা।

কালিপদ আবার ডাকল— কে ? নৌকার ভেতরে কে ? আশ্চর্য, কথা বলে না। মানুষটা কে ?

মবিনুর রহমান বের হয়ে এলেন। কালিপদের দিকে তাকিয়ে বললেন— তুমি চলে যাও কালিপদ। এক্ষুণি যাও। এক্ষুণি।

মবিনুর রহমানের গলায় এমন কিছু ছিল যে কালিপদ ভয় পেয়ে ছুটে চলে গেল। সে দৌড়াতে দৌড়াতে যাচ্ছে। একবারও পেছন ফিরে তাকাচ্ছে না।

নদী ভাঙতে ভাঙতে এগুচ্ছে মবিনুর রহমানের দিকে। তিনি তা দেখেও দেখছেন না। মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছেন। তাকিয়ে আছেন নৌকার দিকে। আকাশ ঘন কৃষ্ণবর্ণ। মেঘের পর মেঘ জমাচ্ছে। ভয়াবহ দুর্যোগের আর দেরি নেই।

মবিনুর রহমান উঁচু গলায় ডাকলেন— রূপা, রূপা!

নৌকার ভেতর থেকে কাঁচের চুড়ির শব্দ হচ্ছে। নীল শাড়ির আভাস খানিকটা পাওয়া গেল। ফর্সা চুড়ি পরা হাত এক পলকের জন্যে বের হয়ে এলো। মবিনুর রহমান চোখ বন্ধ করে আছেন। তিনি তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করবেন।

তিনি জানেন প্রকৃতি এই অনিয়ম সহ্য করবে না। নদী কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁকে গ্রাস করবে। তিনি আবার ডাকলেন— রূপা, রূপা!

রূপা নৌকায় ভেতর থেকে বের হয়ে এলো।

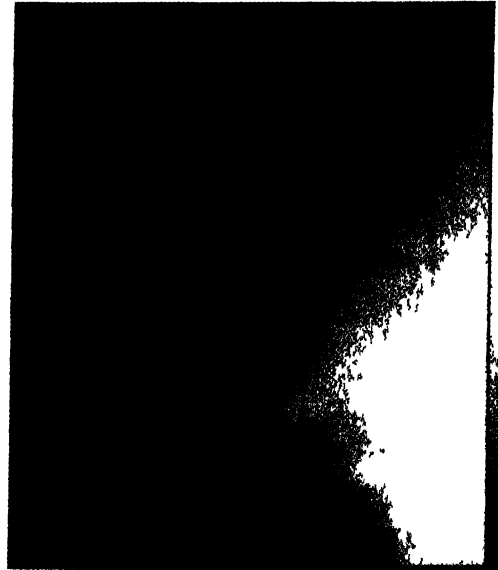
তিনি কোমল গলায় বললেন, কেমন আছ রূপা ?

রূপা বলল, স্যার আমার ভীষণ ভয় লাগছে।

নদী এগুচ্ছে। নদীর জল ফুলেফেঁপে উঠছে। মবিনুর রহমান দাঁড়িয়ে আছেন।

রূপা আবার বলল, স্যাব আমার ভয় লাগছে। খুব ভয় পাচ্ছি স্যার।

মবিনুর রহমান হাসলেন। তাঁর পায়ের নিচের মাটি কাঁপছে। প্রকৃতি আর তাঁকে সময় দেবে না। তাতে কিছু যায় আসে না। তিনি হাসিমুখে রূপার দিকে তাকিয়ে আছেন।



দেবী

১৯৭৩

১৯৭৩

মাঝরাতের দিকে রানুর ঘুম ভেঙে গেল।

তার মনে হলো ছাদে কে যেন হাঁটছে। সাধারণ মানুষের হাঁটা নয়, পা টেনে-টেনে হাঁটা। সে ভয়ানক গলায় ডাকল, এই, এই। আনিসের ঘুম ভাঙল না। বাইরে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। অল্প-অল্প বাতাস। বাতাসে জামগাছের পাতায় অদ্ভুত এক রকমের শব্দ উঠছে। রানু আবার ডাকল, এই, একটু ওঠ না। এই।

কী হয়েছে?

কে যেন ছাদে হাঁটছে।

কী যে বলো! কে আবার ছাদে গাঁটবে? ঘুমাও তো!

প্রিজ, একটু উঠে বসো। আমার বড় ভয় লাগছে।

আনিস উঠে বসল। প্রবল বর্ষণ শুরু হলো এই সময়। ঝমঝম করে বৃষ্টি। জানালার পর্দা বাতাসে পতপত করে উড়তে লাগল। হঠাৎ দেখল, জানালার শিক ধরে খালি গায়ে একটি রোগামতো মানুষ দাঁড়িয় আছে। মানুষটির দুটি হাতই অসম্ভব লম্বা। রানু ফিসফিস করে বলল, ওখানে কে?

কোথায় কে?

ঐ যে জানালায়।

আহ, কী যে ঝামেলা কর! নারকেল গাছের ছায়া পড়েছে।

একটু বাতিটা জ্বালাও না!

রানু, তুমি ঘুমাও তো।

আনিস শোবার উপক্রম করতেই ছাদে বেশ কয়েক বার থপথপ শব্দ হলো। যেন কেউ একজন ছাদে লাফাচ্ছে।

রানু চমকে উঠে বলল, কীসের শব্দ হচ্ছে?

বানর। এ জায়গায় বানর আছে। কালই তো দেখলে ছাদে লাফালাফি করছিল।

আমার বড় ভয় করছে। একটু উঠে গিয়ে বাতি জ্বালাও না। পায়ে পড়ি তোমার।

আনিস বাতি জ্বালাল। ঘড়িতে বাজে দেড়টা। ছাদে আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। তবু রানুর ভয় কমল না। সে কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল। আনিস বিরক্ত স্বরে বলল, এ-রকম কবছ কেন?

কেন যেন অন্যরকম লাগছে আমাব। একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি।

কী স্বপ্ন?

দেখলাম আমি যেন...

কথার মাঝখানে হঠাৎ রানু থেমে গেল। কে যেন হাসছে। ভারি গলায় হাসছে। রানু কাঁপা স্বরে বলল, হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছ? কে যেন হাসছে।

কে আবার হাসবে! বানরের শব্দ। কিংবা কেউ হয়তো জেগে উঠেছে দোতলায়।

আনিস লক্ষ করল, রানু খুব ঘামছে। চোখ-মুখ রক্তশূন্য। বালিশের নিচ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। দেশলাই জ্বালাতে-জ্বালাতে বলল, কী স্বপ্ন দেখছিলে?

দিনের বেলা বলব।

কী যে সব কুসংস্কার তোমাদের! এখনো ভয় লাগছে?

হ্যাঁ।

ভয়টা কীসের? চোর-ডাকাতে, না ভূতের?

বুঝতে পারছি না।

ঠিক আছে, বাতি জ্বালানোই থাক। বাতি জ্বালিয়েই ঘুমাব আজকে। এখন বলো দেখি, কী স্বপ্ন দেখলে?

দিনের বেলা বলব।

আহ, বলো না! বললেই ভয় কেটে যাবে।

রানু আনিসের বাঁ হাত শক্ত করে চেপে ধরল। থেমে-থেমে বলল, দেখলাম, একটা ঘরে আমি শুয়ে আছি। একটা বেঁটে লোক এসে ঢুকল। তারপর দেখলাম, সে আমার শাড়ি টেনে খুলে ফেলার চেষ্টা করছে।

আনিস শব্দ করে হাসল।

রানু বলল, হাসছ কেন?

হাসব না? এটা কি একটা ভয় পাওয়ার স্বপ্ন?

তুমি তো সবটা শোন নি।

সবটা শুনতে হবে না। পরে কী হবে তা আমার জানা। তুমি যা দেখেছ তা হচ্ছে একটা সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসি। যুবক-যুবতীরা এ রকম স্বপ্ন প্রায়ই দেখে।

আমি দেখি না।

তুমিও দেখ। মনে থাকে না তোমার।

আমি স্বপ্ন খুব কম দেখি। যা দেখি তা সব সময় সত্যি হয়। তোমাকে তো বলেছি অনেকবার।

আনিস চুপ করে রইল। রানু এই কথাটি প্রায়ই বলে। বিয়ের রাতে প্রথমবার বলেছিল। আনিস সেবারও হেসেছে। রানু অবাক হয়ে বলেছে, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না, না?

নাহ্।

আমি আপনার গা ছুঁয়ে বলছি, বিশ্বাস করুন আমার কথা।

রানু এমনভাবে বলল, যেন আনিসের বিশ্বাসের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। আনিস শেষ পর্যন্ত হাসিমুখে বলল, ঠিক আছে বিশ্বাস করলাম, এখন দয়া করে আপনি-আপনি করবে না। রানু ফিসফিস করে বলল, আপনার সঙ্গে যে আমার বিয়ে হবে সেটাও আমি জানতাম।

এটাও স্বপ্নে দেখেছিলে?

হুঁ। দেখলাম, একটি লোক খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পেটের কাছে একটা মস্ত কাটা দাগ। লোকটিকে দেখেই মনে হলো, এর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। আমি তাকে বললাম, কেটেছে কীভাবে? আপনি বললেন, সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছিলাম।

আনিস সে রাতে দীর্ঘক্ষণ কোনো কথা বলতে পারে নি। তার পেটে একটা কাটা দাগ সত্যি-সত্যি আছে, এই মেয়েটির সেটা জানার কথা নয়। তবে সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে কাটে নি। জামগাছ থেকে পিছলে পড়ে কেটেছে। ব্যাপারটা কাকতালীয়, বলাই বাহুল্য। মাঝে-মাঝে এমন দু-একটা জিনিস খুব মিলে যায়। তবুও কোথায় যেন একটা ক্ষীণ অস্বস্তি থাকে।

বাইরে বৃষ্টি খুব বাড়ছে। ঝড়টুড় হবে বোধহয়। শৌ-শৌ আওয়াজ হচ্ছে জানালায়। একটি কাচ ভাঙা। প্রচুর পানি আসছে ভাঙা জানালা দিয়ে, শীত-শীত করছে।

রানু, চল ঘুমিয়ে পড়ি।

সিগারেট শেষ হয়েছে?

হ্যাঁ।

বিছানায় ওঠামাত্র প্রবল শব্দে বিদ্যুৎ চমকাল। বাতি চলে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। শুধু এ-অঞ্চল নয়, সমস্ত ঢাকাই বোধকরি অন্ধকার হয়ে গেল। আনিস বলল, ভয় লাগছে রানু? হ্যাঁ।

আচ্ছা, হাসির গল্পটল্ল কর। এতে ভয় কমে যায়। বলো একটা গল্প।

তুমি বলো।

আনিস দীর্ঘ সময় নিয়ে একজন পাদ্রি, তিনটি ইহুদি ও তিনটি মেয়ের গল্প বলল। গল্পের এক পর্যায়ে শ্রোতাকে জিজ্ঞেস করতে হয়— পাদ্রি তখন কী বলল?

এর উত্তরটি হচ্ছে পাঞ্চ লাইন। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস কবল না রানু। সে কি শুনছে না? আনিস ডাকল, এই রানু, এই! বানু কথা বলল না। বাতাসেব ঝাপ্টায় সশব্দে জানালার একটি পাল্লা খুলে গেল। আনিস বন্ধ করবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই রানু তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁপা গলায় বলল, তুমি যেও না। খবরদার, যেও না।

কী আশ্চর্য, কেন?

একটা-কিছু জানালার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

কী যে বলো!

প্লিজ, প্লিজ।

বানু কেন্দে ফেলল। ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, তুমি গন্ধ পাচ্ছ না?

কীসেব গন্ধ?

কর্পূরের গন্ধের মতো গন্ধ।

এটা কি মনের ভুল? সূক্ষ্ম একটা গন্ধ যেন পাওয়া যাচ্ছে ঘরে। বনবান কবে আরেকটা কাচ ভাঙল। রানু বলল, ঐ জিনিসটা হাসছে। শুনতে পাচ্ছ না? বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আনিস কিছু শুনতে পেল না।

তুমি বসো তো। আমি হারিকেন জ্বালাচ্ছি।

না, তুমি আমাকে ধরে বসে থাক ।

আনিস অস্বস্তির সঙ্গে বলল, তুমি ঐ জানালাটার দিকে আর তাকিও না তো!

আনিস লক্ষ করল, রানু থরথর করে কাঁপছে, ওর গায়ের উত্তাপও বাড়ছে। রানুকে সাহস দেবার জন্যে সে বলল, কোনো দোয়া-টোয়া পড়লে লাভ হবে ? আয়াতুল কুরসি জানি আমি । আয়াতুল কুরসি পড়ব ?

রানু জবাব দিল না । তার চোখ বড়-বড় হয়ে উঠেছে । মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে নাকি ? শ্বাস ফেলছে টেনে-টেনে ।

এই রানু, এই ।

কোনোই সাড়া নেই । আনিস হারিকেন জ্বালাল । রান্নাঘর থেকে খুটখুট শব্দ আসছে । ইঁদুব, এতে সন্দেহ নেই । তবু কেন জানি ঝালো লাগছে না । আনিস বারান্দায় এসে ডাকল, রহমান সাহেব, ও রহমান সাহেব ।

রহমান সাহেব বোধহয় জেগেই ছিলেন । সঙ্গে-সঙ্গে বেরোলেন ।

কী ব্যাপার ?

আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ।

কী হয়েছে ?

বুঝতে পারছি না

হাসপাতালে নিতে হবে নাকি ?

বুঝতে পারছি না ।

আপনি যান, আমি আসছি । এক্ষুণি আসছি ।

আনিস ঘরে ফিরে গেল । মনের ভুল, নিঃসন্দেহে মনের ভুল । আনিসের মনে হলো, সে ঘরের ভেতর গিয়ে দাঁড়ানোমাত্র কেউ-একজন যেন দরজার আড়ালে সরে পড়ল । বোগা, লম্বা একটি মানুষ । আনিস ডাকল, রানু । বানু তৎক্ষণাৎ সাড়া দিল, কী ?

ইলেকট্রিসিটি চলে এলো তখনই । তাব কিছুক্ষণের মধ্যেই রহমান সাহেব এসে উপস্থিত হলেন । উদ্ভিগ্ন স্বরে বললেন, এখন কেমন অবস্থা ? বানু অবাক হয়ে বলল, কীসের অবস্থা ? কী হয়েছে ?

রহমান সাহেব অবাক হয়ে তাকালেন । আনিস বলল, তোমার শরীর খারাপ করেছিল, তাই গুঁকে ডেকেছিলাম । এখন কেমন লাগছে ?

ভালো ।

রানু উঠে বসল । রহমান সাহেবের দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে বলল, এখন আমি ভালো ।

রহমান সাহেব তবুও মিনিট দশেক বসলেন । আনিস বলল, আপনি কি ছাদে দাপাদাঁপ গুনেছেন ?

সে তো রোজই গুনি । বাঁদরের উৎপাত ।

আমিও তাই ভাবছিলাম ।

খুব জ্বালাতন করে । দিনে-দুপুরে ঘর থেকে খাবারদাবার নিয়ে যায় ।

তাই নাকি ?

জি। নতুন এসেছেন তো! কয়েক দিন যাক, টের পাবেন। বাড়িঅলাকে বলেছিলাম খ্রিল দিতে। তা দেবে না। আপনার সঙ্গে দেখা হলে আপনিও বলবেন। সবাই মিলে চেপে ধরতে হবে।

জি, আমি বলব। আপনি কি চা খাবেন নাকি এক কাপ ?

আরে না না! এই রাত আড়াইটার সময় চা খাব নাকি, কী যে বলেন! উঠি ভাই। কোনো অসুবিধা দেখলে ডাকবেন।

ভদ্রলোক উঠে পড়লেন। রানু চাপা স্বরে বলল, এই রাত-দুপুরে ভদ্রলোককে ডেকে আনলে কেন ? কী মনে করলেন উনি!

তুমি যা শুরু করেছিল! ভয় পেয়েই ভদ্রলোককে ডাকলাম।

কী করেছিলাম আমি ?

অনেক কাণ্ড করেছ। এখন তুমি কেমন, সেটা বলো।

ভালো।

কী রকম ভালো ?

বেশ ভালো।

ভয় লাগছে না আর ?

নাহ্।

রানু বিছানা থেকে নেমে পড়ল। সে বেশ সহজ ও স্বাভাবিক। ভয়ের কোনো চিহ্নও নেই চোখে-মুখে। শাড়ি কোমরে জড়িয়ে ঘরের পার্শ্ব সরাবার ব্যবস্থা করছে।

সকালে যা করবার করবে। এখন এসব রাখ তো।

ইস্, কী অবস্থা হয়েছে দেখ না!

হোক, এসো তো এদিকে।

রানু হাসি-হাসি মুখে এগিয়ে এলো।

এখন আর তোমার ভয় লাগছে না ?

না।

জানালার পাশে কে যেন দাঁড়িয়ে ছিল বলেছিলে ?

এখন কেউ নেই। আর থাকলেও কিছু খায় আসে না।

আনিস দ্বিতীয় সিগারেটটা ধরাল। হালকা গলায় বলল, এক কাপ চা করতে পারবে ?

চা, এত রাতে!

এখন আর ঘুম আসবে না, কর দেখি এক কাপ।

রানু চা বানাতে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পানি ফোটার শব্দ হলো। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে ঝমঝম করে। রানু একা-একা রান্নাঘরে। কে বলবে এই মেয়েটিই অল্প কিছুক্ষণ আগে ভয়ে অস্থির হয়ে গিয়েছিল! ছাদে আবার ঝুপঝুপ শব্দ হচ্ছে। এই বৃষ্টির মধ্যে বানর এসেছে নাকি ? আনিস উঠে গিয়ে রান্নাঘরে উঁকি দিল। হালকা গলায় বলল, ছাদে বড় ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে। রানু জবাব দিল না।

আনিস বলল, এই বাড়িটা ছেড়ে দেব।

সস্তায় এরকম বাড়ি আর পাবে না।

দেখি পাই কিনা।

চায়ে চিনি হয়েছে তোমার ?

হয়েছে। তুমি নিলে না ?

নাহ্, রাত-দুপুরে চা খেলে আমাব আর ঘুম হবে না।

রানু হাই তুলল। আনিস বলল, এখন বল তো তোমার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত।

কোন স্বপ্নের কথা ?

ঐ যে স্বপ্ন দেখলে! একটা বেঁটে লোক।

কখন আবার এই স্বপ্ন দেখলাম ? কী যে তুমি বলো!

আনিস আর কিছু বলল না। চা শেষ করে ঘুমোতে গেল। শীত-শীত করছিল। রানু পা গুটিয়ে বাচ্চা মেয়ের মতো শুয়েছে। একটি হাত দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে আনিসকে। তার ভারি নিঃশ্বাস পড়ছে। ঘুমিয়ে পড়েছে বোধহয়। জানালায় নারকেল গাছের ছায়া পড়েছে। মানুষের মতোই লাগছে ছায়াটাকে। বাতাসে গাছের পাতা নড়ছে। মনে হচ্ছে মানুষটি হাত নাড়ছে। ঘরের ভেতর মিষ্টি একটা গন্ধ। মিষ্টি, কিন্তু অচেনা।

আনিস রানুকে কাছে টেনে আনল। রানুর মুখে আলো এসে পড়েছে। কী যে মায়াবতী লাগছে! আনিস ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল। ওদের বিয়ে হয়েছে মাত্র ছ' মাস। আনিস এখনো অভ্যস্ত হয়ে ওঠে নি। প্রতি রাতেই রানুর মুখ তার কাছে অচেনা লাগে। অপরূপ রূপবতী একটি বালিকা বালিকা মুখ, যাকে কখনো পুরোপুরি চেনা যায় না। আনিস ডাকল, রানু, রানু। কোনো জবাব পাওয়া গেল না। গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন রানু। আনিসের ঘুম এলো না। শুয়ে-শুয়ে ঠিক কবে ফেলল, রানুকে ভালো একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যেতে হবে। অফিসের কমলেন্দু বাবু এক ভদ্রলোকের কথা প্রায়ই বলেন, খুব নাকি গুণী লোক। মিসির সাহেব। দেখালে হয় একবার মিসির সাহেবকে।

রানু ঘুমের ঘোরে খিলখিল করে হেসে উঠল। অপ্রকৃতিস্থ মানুষের হাসি শুনতে ভালো লাগে না, গা ছমছম কবে।

২

ভদ্রলোকের বাড়ি খুঁজে বেব করতে অনেক দেরি হলো। কাঁঠালবাগানের এক গলির ভেতর পুরনো ধাঁচের বাড়ি। অনেকক্ষণ-কড়া নাড়বাব পব অসম্ভব বোগা এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। বিরক্ত মুখে বললেন, কাকে চান ?

মিসির সাহেবকে খুঁজছি।

তাকে কী জন্য দরকার ?

জি, আছে একটা দরকার। আপনি কি মিসির সাহেব ?

হ্যাঁ। বলেন, দরকারটা বলেন।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে সমস্যার কথা বলতে হবে নাকি ? আনিস অস্বাভাবিক বোধ করতে লাগল। কিন্তু ভদ্রলোকের ভাবভঙ্গি এ-রকম যে, বাইরেই দাঁড় করিয়ে রাখবেন, ভেতরে

চুকতে দেবেন না। আনিস বলল, ভেতরে এসে বলি ?

ভেতরে আসবেন ? ঠিক আছে আসুন।

মিসির সাহেব যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় দরজা থেকে সরে দাঁড়ালেন। ঘন অন্ধকার।
তিন-চারটা বেতের চেয়ার ছাড়া আসবাবপত্র কিছু নেই।

বসুন আপনি।

আনিস বসল। ভদ্রলোক বললেন, আজ আমার শরীর ভালো না। আলসার আছে।
ব্যথা হচ্ছে এখন। তাড়াতাড়ি বলেন কী বলবেন।

আমার স্ত্রীর একটা ব্যাপারে আপনার কাছে এসেছি। আপনার নাম শুনেই এসেছি।
আমার নাম শুনে এসেছেন ?

জি।

আমার এত নামডাক আছে, তা তো জানতাম না! স্পেসিফিক্যালি বলুন তো কার
কাজে শুনেছেন ?

আনিস আমতা-আমতা করতে লাগল। ভদ্রলোক অসহিষ্ণু স্বরে বললেন, বলুন, কে
বলল ?

আমাদের অফিসের এক ভদ্রলোক। কমলেন্দু বাবু। আপনি নাকি তাঁর বোনের
চিকিৎসা করেছিলেন।

ও আচ্ছা, চিনেছি, কমলেন্দু। শোনে, আমি কিন্তু ডাক্তার না, জানেন তো ?

জি স্যার, জানি।

আচ্ছা, আগে এক কাপ চা খান, তাবপর কথা বলব। রুগীটি কে বললেন ?
আপনার স্ত্রী ?

জি।

বয়স কত ?

ষোল-সতের

বলেন কী! আপনার বয়স তো মনে হয় চল্লিশের মতো, ঠিক না ?

আনিস শুকনো গলায় বলল, আমার সাঁইত্রিশ।

এ-রকম অল্পবয়সী মেয়ে বিয়ে করেছেন কেন ?

এটা আবার কেমন প্রশ্ন! আনিসের মনে হলো, কমলেন্দু বাবুর কথা শুনে এখানে
আসাটা ঠিক হয় নি। ভদ্রলোকের নিজেরই মনে হয় মাথার ঠিক নেই। একজন
অপরিচিত মানুষকে কেউ এ-রকম কথা জিজ্ঞেস করে ?

বলুন বলুন, এ-রকম অল্পবয়সী মেয়ে বিয়ে করলেন কেন ?

হয়ে গেছে আর কী!

বলতে চান না বোঝা যাচ্ছে। ঠিক আছে, বলতে হবে না। চা'র কথা বলে আসি।
চা খেয়ে তারপর গুরু করব।

ভদ্রলোক আনিসকে বাইরে বসিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। তারপর আর আসার
নামগন্ধ নেই। আট-ন বছরের একটি বাচ্চা মেয়ে এক কাপ দারুণ মিষ্টি সর-ভাসা চা

দিয়ে চলে গেল। তারপর আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। দেখতে-দেখতে সন্ধ্যা হয়ে যায়।
আনিস বেশ কয়েকবার কাশল। দু'বার গলা উঁচিয়ে ডাকল, বাসায় কেউ আছেন ?
কোনো সাড়া নেই। কী ঝামেলা!

কমলেন্দু বাবু অবশ্য বারবার বলে দিয়েছেন— এই লোকের কথাবার্তার ঠিকঠিকানা
নেই। তবে লোকটা অসাধারণ। আনিসের কাছে অসাধারণ কিছু মনে হয় নি। তবে
চোখের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ। এইটি অবশ্য প্রথমেই চোখে পড়ে। আর দ্বিতীয় যে জিনিসটি
চোখে পড়ে, সেটি হচ্ছে তার আঙুল। অস্বাভাবিক লম্বা-লম্বা সব ক'টা আঙুল।

এই যে, অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম।

না, ঠিক আছে।

ঠিক থাকবে কেন ? ঠিক না।

লোকটি এই প্রথমবার হাসল। থেমে-থেমে বলল, আলসার আছে তো, ব্যথায়
কাহিল হয়ে গিয়ে ছিলাম। অমনি ঘুম এসে গেল।

আমি তাহলে অন্য একদিন আসি ?

না, এসেছেন যখন বসুন। চা দিয়েছিল ?

জি।

বেশ, এখন বলুন কী বলবেন।

আনিস চুপ করে রইল। এটা এমন একটা ব্যাপার, যা চট করে অপরিচিত কাউকে
বলা যায় না। ভদ্রলোক শান্ত স্বরে বললেন, আপনার স্ত্রীর মাথার ঠিক নেই, তাই তো ?

জি-না স্যার, মাথা ঠিক আছে।

পাগল নন ?

জি-না

তাহলে আমার কাছে এসেছেন কেন ?

মাঝে-মাঝে সে অস্বাভাবিক আচরণ করে।

কী রকম অস্বাভাবিক ?

ভয় পায়। মাঝে-মাঝেই এ রকম হয়।

ভয় পায় ? তার মানে কী ? কীসের ভয় ?

ভূতের ভয়।

ঠিক জানেন, ভয়টা ভূতের ?

জি-না, ঠিক জানি না। মনে হয় এ-রকম।

ভদ্রলোক একটি চুরুট ধরিয়ে খকখক কবে কাশতে-কাশতে বললেন, বর্মা থেকে
আমার এক বন্ধু এনেছে, অতি বাজে জিনিস।

আনিস কিছু বলল না। তবে এই ভদ্রলোকের স্টাইলটি তার পছন্দ হলো। ভদ্রলোক
অবলীলায় অন্য একটি প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। এবং এমনভাবে কথা বলছেন, যেন
আগের কথাবার্তা তাঁর কিছুই মনে নেই।

এরকম চুরুট চার-পাঁচটা খেলে যন্ত্রা হয়ে যাবে। আপনাকে দেব একটা ?

জি-না

ফেলে দিতে মায়া লাগে বলে খাই। খাওয়ার জিনিস না। অখাদ্য। তবে হাভানা চুরুটগুলি ভালো। হাভানা চুরুট খেয়েছেন কখনো ?

জি না।

খুব ভালো। মাঝে-মাঝে আমার এক বন্ধু আমাকে দিয়ে যায়। ভদ্রলোক চুরুটে টান দিয়ে আবার ঘর কাঁপিয়ে কাশতে লাগলেন। কাশি থামতেই বললেন, এখন আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। যথাযথ জবাব দেবেন।

জি আচ্ছা।

প্রথম প্রশ্ন, আপনার স্ত্রী কি সুন্দরী ?

জি।

বেশ সুন্দরী ?

জি।

আপনার স্ত্রী কখন ভয় পান— রাতে না দিনে ?

সাধাবণত রাতে। তবে একবার দুপুরে ভয় পেয়েছিল।

ভয়টা কী রকম সেটা বলেন।

মনে হয় কিছু একটা দেখে।

সব বাব একই জিনিস দেখেন, না একেকবার একেক রকম ?

এটা আমি ঠিক বলতে পারছি না।

এই সময় কি তিনি কোনো রকম গন্ধ পান ?

আমি ঠিক বলতে পারছি না।

যখন সুস্থ হয়ে ওঠেন, তখন কি তার ভয়ের কথা মনে থাকে ?

বেশির ভাগ সময়ই থাকে না, তবে মাঝে-মাঝে থাকে।

আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই খারাপ ?

জি।

উনি প্রথম কখন ভয় পেয়েছিলেন, বলতে পারেন ?

জি-না। তবে খুব ছোটবেলায়।

প্রথম ভয়ের ঘটনাটা আমাকে বলুন।

আমি সেটা জানি না।

আপনি অনেক কিছুই জানেন না মনে হচ্ছে। আপনার স্ত্রীকে একদিন নিয়ে আসুন।

আনিস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমি তাকে আনতে চাই না।

বেন চান না ?

সে খুব সেনসেটিভ। সে যদি টের পায় যে, তার এই অস্বাভাবিকতা নিয়ে আমি লোকজনের সাথে আলাপ করছি, তাহলে খুব মন খারাপ করবে।

দেখুন ভাই, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা না বলে কিছুই করা যাবে না। আপনার স্ত্রী অসুস্থ এবং আমার মনে হচ্ছে এই অসুখ দ্রুত বেড়ে যাবে। আপনি তাঁকে নিয়ে আসবেন।

আনিস উঠে দাঁড়াল। ক্ষীণ স্বরে বলল, আপনাকে কত দেব ?

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বললেন, কমলেন্দু বাবু কি আপনাকে বলেন নি আমি ফিস নিই না ? এ কাজটি আমি শখের খাতিরে করি, বুঝতে পারছেন ?

জি, পারছি।

তবে আপনি যদি ভালো গোলাপের চারা পান, তাহলে আমাকে দিতে পারেন। আমার গোলাপের খুব শখ। সব মিলিয়ে ত্রিশটি ডিফারেন্ট ভেরাইটির চারা আমার কাছে আছে। একটা আছে দারুণ ইন্টারেস্টিং, ঘাসফুলের মতো ছোট সাইজের গোলাপ।

তাই নাকি ?

জি। ওরা বলে মাইক্রো রোজ। হল্যান্ডের গোলাপ। কড়া গন্ধ। দেখবেন ?

আরেক দিন দেখব। আজ দেরি হয়ে গেছে, আমার স্ত্রী একা থাকে।

ও, তাই নাকি ? শোনেন, একা তাকে রাখবেন না। কখনো যেন মেয়েটি একা না থাকে। এটা খুবই জরুরি।

রাস্তায় নেমে আনিসের মন খারাপ হয়ে গেল। খামোকা সময় নষ্ট। লোকটি তেমন কিছু জানে না। কমলেন্দু বাবু যে-সব আধ্যাত্মিক শক্তি-টঙ্কির কথা বলেছেন, সে-সব মনে হয় নেহায়েতই গালগল্প। তবে লোকটির কথাবার্তা বেশ ফোর্সফুল। রানুকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একবার এনে দেখালে হয়। ক্ষতি তো কিছু নেই।

তাছাড়া ভদ্রলোক খুব সম্ভব ফ্যালনাও নন। ক্লিনিক্যাল সাইকিয়াট্রির টিচার। একবারে কিছু না জেনে তো কেউ মাষ্টারি করে না। কিছু নিশ্চয়ই জানেন। মানুষের চেহারা দেখে কিছু অনুমান করাটাও ঠিক না।

৩

আনিস অফিসে চলে গেলে রানুর খুব একলা লাগে। কিছুই করার থাকে না। গোছানো আলনা আবার নতুন করে গোছায়। বসার ঘরের বেতের সোফা ঝাড়ন দিয়ে ঝাড়ে। শোবার মেঝে ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে মুছতে-মুছতে চকচকে করে ফেলে, তবু সময় কাটে না। এক সময় তেতলার বারান্দায় গিয়ে বসে। এ-বাড়ির ছোট বারান্দাটি তার খুব পছন্দ। গ্রিল দেওয়া বারান্দাটি গোলাকার। এখানে বসে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। সামনেই একটা মেয়েদের স্কুল। টিফিন টাইমে মেয়েগুলোর কাণ্ডকারখানা দেখতে এমন মজা লাগে! রানু প্রায় সারা দুপুর বারান্দাতেই বসে থাকে। একা-একা ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগে না। কেমন যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। একটু যেন ভয়ভয়ও লাগে।

অবশ্য যখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামতে থাকে, তখন ভয়ভয় ভাবটা কমে যায়। বিকেলবেলা বাড়িঅলার মেয়ে দুটি তাদের ভেতরের দিকের বাগানে বসে মজা করে চা খায়। চা খেতে-খেতে দুজনেই খুব হাসাহাসি করে। একেক দিন ওদের বাবাও সঙ্গে বসেন, রানুর দেখতে বেশ লাগে।

ছোট মেয়েটির সঙ্গে রানুর কিছু দিন আগে আলাপ হয়েছিল। বেশ মেয়েটি! খুব স্মার্ট। দেখতেও সুন্দর। একদিন দুপুরে রানু বারান্দায় এসে বসেছে, মেয়েটি এসে উপস্থিত। মুখে চাপা হাসি। হাতে কী-একটা বই। এসেই বলল, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি।

কী কথা ?

আপনি সারাদিন বারান্দায় বসে থাকেন কেন ?

সারাদিন কোথায় ? দুপুরবেলায় বসি। কিছু করার নেই তো, একা-একা লাগে।

তা ঠিক। বসব আপনার এখানে ? আজ আমি কলেজে যাই নি। বোটানি প্র্যাকটিক্যাল ছিল আজকে।

মেয়েটি খুব সহজভাবে বলল। ঘন্টাখানেকের মধ্যে একগাদা কথা বলল। তারপর যাবার সময় হঠাৎ বলল, আবেকটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

কর।

আপনি এত সুন্দর কেন ? যে আমার চেয়েও সুন্দরী, তাকে আমার ভালো লাগে না।

রানু কী বলবে ভেবে পেল না। মেয়েটি হাসতে-হাসতে বলল, আমাদের ক্লাসের মেয়েদেব কী ধারণা জানেন ? তাদের ধারণা, আমি হিচ্ছি বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা। ওদেব একদিন এনে আপনাকে দেখিয়ে দেব।

ঠিক আছে, দিও। আরেকটু বসো। চা খাবে ?

না, চা আমি বেশি খাই না। বেশি চা খেলে গায়ের রঙ ময়লা হয়ে যায়।

মেয়েটি যেমন ছুঁ করে এসেছিল, তেমনি ছুঁ কবে নিচে নেমে গেল। বেশ লাগল রানুর। নতুন বাসাটা তার ভালোই লাগছে। পুরনো ঢাকায় হলেও বেশ নিরিবিলি। মালিবাগের বাসাটার মতো নয়। নিঃশ্বাস নেবার জায়গা ছিল না সেখানে। পাশ দিয়ে বাতদিন রিকশা যাচ্ছে, গাড়ি যাচ্ছে। জঘন্য! এই বাসাটা ভেতরের দিকে। বাড়িঅলা ভদ্রলোকও বেশ ভালোমানুষ। প্রথম দিনেই আনিসকে বলেছেন, আমার বাড়ি ভাড়া দেবার দবকার নেই। টাকার জন্যেই তো বাড়ি ভাড়া। টাকা যথেষ্ট আছে। তবু দু'ঘর ভাড়াটে রাখি। কারণ এত বড় বাড়িতে মানুষ না-থাকলে ভালো লাগে না। কবরখানা-কবরখানা ভাব চলে আসে। তবে সবাইকে আমি বাড়ি ভাড়া দিই না। আপনাকে দিচ্ছি, কারণ আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে।

ভাড়াও খুব কম। মাত্র ছয় শ' টাকা। তিন-রুমের এত বড় একটা বাড়ি ছয় শ' টাকায় পাওয়া ভাগে র ব্যাপার। বানু এখানে এসে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। তার সবচেয়ে পছন্দ হয়েছে বাথরুম। বড় একঝকে একটা বাথরুম। বাসাটা রানুর খুব পছন্দ হয়েছিল। আনিস যখন বলল, কী, নেব ? পছন্দ হয় ?

হয়।

ভালো করে ভেবে বলো নেব কিনা। দুদিন পর যদি বলো পছন্দ না, তাহলে মুশকিলে পড়ব। মালিবাগের বাসাটা ভালো ছিল। শুধু-শুধু বদলালাম।

এই বাসাটাও ভালো।

রানু খুব খুশি মনে নতুন বাসা সাজাল। নিজেই পরদা কিনে আনল, সারা রাত জেগে সেলাই করল। তার উৎসাহের সীমা নেই।

বুঝলে রানু! সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকবে। অন্যদের বাসায় যাবে-টাবে। একা একা থাকার অভ্যেসটা ভালো না। যাবে তো ?

যাব।

একা থাকলেই মানুষের মধ্যে নানান রকম প্রবলেম দেখা যায়, বুঝলে ? সব ভাড়াটেদের সঙ্গে খাতির রাখবে।

ভাড়াটে তো মাত্র একজন।

ঐ ওনার বাসাতেই যাবে। বাড়িঅলার বাসায়ও যাবে।

আচ্ছা যাব।

রানু অবশ্যি যায় নি কোথাও। তার ভালো লাগে না। অন্যদের মতো সে কারো সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারে না। অন্যদের সামনে কেমন যেন আড়ষ্ট লাগে। বারান্দার বেতের চেয়ারটাতে বসে থাকতেই বেশি ভালো লাগে। দুপুরটাই যা কষ্টের। দুপুরটা কেটে গেলেই অন্যরকম একটা শান্তি লাগে।

কিন্তু আজকের দুপুরটা দীর্ঘ। কিছুতেই আর কাটছে না। বারান্দায় বসে থাকতেও ভালো লাগছে না। মেয়েদের স্কুলটাও কী কারণে যেন বন্ধ। চারদিক চূপচাপ। বড্ড ফাঁকা। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলে কেমন হয় ?

ঘরের ভেতরটা কেমন যেন অন্যরকম। রানু ভেতরে ঢুকে জানালার পর্দা ফেলে দিল। অনেকখানি অন্ধকার হয়ে গেল। অন্ধকার ও চূপচাপ। আর তখন স্পষ্ট গলায় কেউ ডাকল— রানু, রানু। কয়েক মুহূর্ত রানু নড়ল না। অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু যে ডেকে উঠেছে, সে দ্বিতীয়বার আর ডাকল না।

রানুর এ-রকম চারদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে একজন অশরীরী কেউ ডেকে ওঠে। অসংখ্য বার শুনেছে এই ডাক। কে সে! কোথেকে আসে সে! রানু ফিসফিস করে বলল, কে ? কোনো জবাব পাওয়া গেল না।

ফেঁ তুমি ?

জানালার পরদাটা শুধু কাঁপছে। বিকেল হয়ে আসছে। রানু ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। নিচের বাগানে বাড়িঅলার বড় মেয়েটি হাঁটছে। নীলু বোধহয় ওর নাম। এই মেয়েটি তার বোনের মতো নয়। গম্ভীর। কথাবার্তা প্রায় বলেই না। তবুও ওকে দেখলেই রানুর মনে হয়— মেয়েটি বড় ভালো। মায়াবতী মেয়ে।

রানু দেখল— বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মেয়েটি একা-একা বসে আছে। তার ইচ্ছা হলো নিচে নেমে ওর সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু সে গেল না।

৪

নীলু দু'বার বিজ্ঞাপনটা পড়ল। বেশ একটা মজার বিজ্ঞাপন।

কেউ কি আসবেন ?

আমি একজন নিঃসঙ্গ মানুষ। স্ত্রীর মৃত্যুর পর একা জীবন-যাপন করছি। সময় আর কাটে না। আমার দীর্ঘ দিবস ও দীর্ঘ রজনীর নিঃসঙ্গতা কাটাতে কেউ আমাকে দু'লাইন লিখবেন ?

জিপিও বক্স নম্বর ৭৩

দৈনিক পত্রিকায় এরকম বিজ্ঞাপন দেবার মানে কী ? সাপ্তাহিক কাগজগুলিতে

এইসব থাকে; ছেলেছোকরাদের কাণ্ড। এই লোকটি নিশ্চয় ছেলেছোকরা নয়। বুড়ো-হাবড়াদের একজন।

বাবা, এটা পড়েছ ?

নীলু জাহিদ সাহেবের হাতে কাগজটা গুঁজে দিল।

বাবা, এই বিজ্ঞাপনটি পড় তো!

জাহিদ সাহেব নিজেও ক্র কৃষ্ণিত করে দু'বার পড়লেন। তাঁর মুখের ভঙ্গি দেখে মনে হলো বেশ বিরক্ত হয়েছেন।

পড়েছ ?

ইঁ, পড়লাম।

কী মনে হয় বাবা ?

কী আবার মনে হবে ? কিছুই মনে হয় না। দেশটা রসাতলে যাচ্ছে। খবরের কাগজঅলারা এইসব ছাপে কীভাবে!

নীলু হাসিমুখে বলল, ছাপাবে না কেন ?

দেশটা বিলাত-আমেরিকা নয়, বুঝলি ? আর ভালো করে পড়লেই বোঝা যায়, লোকটার একটা বদ মতলব আছে।

কই, আমি তো বদ মতলব কিছু বুঝছি না।

জাহিদ সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, দেখিস, তুই আবার চিঠি লিখে বসবি না।

নীলু মুখ নিচু কবে হাসল।

হাসছিস কেন ?

এমনি হাসছি।

চিঠি লিখবার কথা ভাবছিস না তো মনে মনে ?

উঁহু।

নীলু মুখে উঁহু বললেও মনে মনে ঠিক কবে ফেলল, শুছিয়ে একটা চিঠি লিখবে। দেখা যাক না কী হয়। কী লেখে লোকটি।

রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে সে সত্যি একটা চিঠি লিখে ফেলল। মোটামুটি বেশ দীর্ঘ চিঠি।

জনাব,

আপনার বিজ্ঞাপনটি পড়লাম। লিখলাম কয়েক লাইন। এতে কি আপনার নিঃসঙ্গতা কাটবে ? আমার বয়স আঠার। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী। আমরা দু'বোন। আমার ছোট বোনটির নাম বিলু। সে হলিক্রস কলেজে পড়ে। আমরা দু'বোনই খুব সুন্দরী। এই যা, এটা আপনাকে লেখা ঠিক হলো না। তাই না ? নাকি সুন্দরী মেয়েদের চিঠি পেলে আপনার নিঃসঙ্গতা আরো দ্রুত কাটবে ?

নীলু

চিঠিটি লিখেই তার মনে হলো যে, এরকম লেখাটা ঠিক হচ্ছে না। চিঠির মধ্যে

একটা বড় মিথ্যা আছে। সে সুন্দরী নয়। বিলুর জন্যে কথাটা ঠিক, তার জন্যে নয়। নীলু ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে দ্বিতীয় চিঠিটি লিখল।

জনাব,

আমার নাম নীলু। আমার বয়স কুড়ি। আপনার নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্যে আপনাকে লিখছি। কিন্তু চিঠিতে কি কারো নিঃসঙ্গতা কাটে? আপনার বয়স কত, এটা দয়া করে জানাবেন।

নীলু

দ্বিতীয় চিঠিটিও তার পছন্দ হলো না। তার মনে হলো, সে যেন কিছুতেই গুছিয়ে আসল জিনিসটি লিখতে পারছে না। রাতে শুয়ে শুয়ে তার মনে হলো, হঠাৎ করে সে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ছে কেন? চিঠি লেখারই বা কী দরকার? সে নিজেও কি খুব নিঃসঙ্গ? হয়তো বা। এ বাড়িতে আর দুটিমাত্র প্রাণী। বিলু আর বাবা। বাবা দিন-রাত নিজের ঘরেই থাকেন। মাসের প্রথম দিকের কয়েকটা দিন বাড়িভাড়ার টাকা আদায়ের জন্যে অল্প যা নড়াচড়া করেন। তারপর আবার নিজের ঘরেই বন্দি। আর বিলু তো আছে তার অসংখ্য বন্ধুবান্ধব নিয়ে। শুধু মেয়েবন্ধু নয়, তার আবার অনেক ছেলেবন্ধুও আছে।

মহানন্দে আছে বিলু। তবে সে একটু বাড়িবাড়ি করছে। কাল তার কাছে একটি ছেলে এসেছিল, সে রাত আটটা পর্যন্ত ছিল। এ-সব ভালো নয়। নীলু উঁকি দিয়ে দেখেছে, ছেলেটি ফরফর করে সিগারেট টানছে। হাত নেড়ে নেড়ে খুব কথা বলছে। আর বিলু হাসতে-হাসতে ভেঙে পড়ছে। ভাত খাওয়ার সময় নীলু কিছু বলবে না বলবে না করেও বলল, ছেলেটা কে রে?

কোন ছেলে?

ঐ যে রাত আটটা পর্যন্ত গল্প করলি?

ও, সে তো রুবির ভাই! মহা চালবাজ। নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভাবে, আসলে মহা গাধা।

বলতে-বলতে খিলখিল করে হাসে বিলু।

মহা গাধা হলে এতক্ষণ বসিয়ে রাখলি কেন?

যেতে চাচ্ছিল না তো কী করব?

বলতে বলতে বিলু আবার হাসল। বিলু এমন মেয়ে, যার ওপর কখনো রাগ করা যায় না। নীলু কখনো রাগ করতে পারে না। মাঝে মাঝে বাবা দু'একটা কড়া কথা বলেন। তখন বিলু রাগ করে খাওয়া বন্ধ করে দেয়। সে এক মহা যন্ত্রণা! একবার রাগ করে সে পুরো দু'দিন দরজা বন্ধ করে বসে ছিল। কত সাধাসাধি, কত অনুরোধ! শেষ পর্যন্ত মগবাজারের ছোট মামাকে আনতে হলো। ছোট মামা বিলুর খুব খাতিরের মানুষ। তার সব কথা সে শোনে। তিনি এসে যখন বললেন, দরজা না খুললে মা আমি কিন্তু আর আসব না। এই আমার শেষ আসা— তখন দরজা খুলল। এরকম জেদি মেয়ে।

নীলুর কোনো জেদ-টেন নেই। কালো এবং অসুন্দরী মেয়েদের জেদ কখনো থাকে না। এদের জীবন কাটাতে হয় একাকী।

নীলু বাতি নিভিয়ে ঘুমোতে চেষ্টা করল। ছোটবেলায় বাতি নেভানোর সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম আসত, এখন আর আসে না। অনেক রাত পর্যন্ত এপাশ-ওপাশ করতে হয়।

পাশের খাটে টেবিলল্যাম্প জ্বালিয়ে চোখের ওপর একটা গল্লের বই ধরে আছে বিলু। অনেক রাত পর্যন্ত পড়বে। পড়তে-পড়তে হঠাৎ এক সময় ঘুমিয়ে পড়বে, বাতি নেভাবে না। মশারি ফেলবে না। নীলুকেই উঠে এসে বাতি নেভাতে হবে, মশারি ফেলতে হবে।

বিলু ঘুমো, বাতি নেভা।

একটু পরে ঘুমাব।

কী পড়ছিস?

শীর্ষেন্দুর একটা বই। দারুণ!

দিনে পড়িস। আলো চোখে লাগছে।

দিনে আমার সময় কোথায়? তুমি ঘুমাও-না!

নীলু ঘুমোতে পারল না। শুয়ে-শুয়ে তাকিয়ে রইল বিলুর দিকে। দিনে দিনে কী যে সুন্দর হচ্ছে মেয়েটা! একই বাবা-মা'র দু'মেয়ে— একজন এত সুন্দর আর অন্যজন এত অসুন্দর কেন? নীলু ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

আপা?

কী?

দারুণ বই, তুমি পড়ে দেখ।

প্রেমের?

হ্যাঁ। প্রেমের হলেও খুব সিরিসাস জিনিস। দারুণ!

তাই নাকি?

হুঁ, একজন খুব রূপবতী মেয়ের গল্প।

তোব মতো একজন?

দূর, আমি আবার সুন্দর নাকি? আমাদের তিনতলার ভাড়াটের বৌটির মতো বলতে পার। রানু নাম, দেখেছ?

না তো, খুব সুন্দরী?

ওবে বাপ, দারুণ! হেমা মালিনীর চেয়েও সুন্দরী।

তুই মেয়েটিকে একবার আসতে বলিস তো আমাদের বাড়িতে! দেখব।

বলব। তুমি নিজে একবার গেলেই পার। মেয়েটা ভালো। কথাবার্তা খুব ভদ্র। ওর বরকে দেখেছ, আনিস সাহেব?

হুঁ।

ঐ লোকটা বোকা ধরনের। বোকাম মতো কথাবার্তা। আমাকে আপনি-আপনি করে বলে।

কলেজে পড়িস, তোকে আপনি বলবে না?

ফ্রক-পরা কাউকে এরকম একজন বুড়ো মানুষ আপনি বলবে নাকি?

বুড়ো নাকি ?

চল্লিশের ওপর বয়স হবে ।

মেয়েটার বয়স কত ?

খুব কম । চৌদ্দ-পনের হবে ।

বিলু বাতি নিভিয়ে দিল এবং নিমিষেই ঘুমিয়ে পড়ল । নীলু জেগে রইল অনেক রাত পর্যন্ত । কিছুতেই তার ঘুম এলো না । ইদানীং তার ঘুম খুব কমে গেছে । রোজই মাঝরাত না হওয়া অবধি ঘুম আসে না ।

রানু চুলায় ভাত চড়িয়ে বসার ঘরে এসে দেখে বাড়িঅলার বড় মেয়েটি ঘরের ভেতর ।

না জিজ্ঞেস করেই ঢুকে পড়লাম ভাই । আমার নাম নীলু ।

আসুন, আসুন । আপনাকে আমি চিনি । আপনি বাড়িঅলার বড় মেয়ে । আজ ইউনিভার্সিটি যান নি ?

উঁহ । আজ ক্লাস নেই । আপনার সঙ্গে গল্প করতে এলাম । কী করছিলেন ?

ভাত রান্না করছি ।

চলুন, রান্নাঘরে গিয়ে বসি । বিলুর কাছ থেকে আপনার খুব প্রশংসা শুনি । বিলুর ধারণা, আপনি হচ্ছেন হেমা মালিনী ।

রানু অবাক হয়ে বলল, হেমা মালিনীটি কে ?

আছে একজন । সিনেমা করে । সবাই বলে খুব সুন্দর । আমাব কাছে সুন্দর লাগে না । চেহারাটা অহঙ্কারী ।

রানু মুখ টিপে হাসতে হাসতে বলল, সুন্দরী মেয়েটা তো অহঙ্কারীই হয় ।

আপনিও অহঙ্কারী ?

রানু হাসতে হাসতে বলে, হ্যাঁ । কিন্তু আমাকে আপনি আপনি বলতে পাববেন না । তুমি করে বলতে হবে ।

নীলু লক্ষ করল মেয়েটি বেশ বোগা, কিন্তু সত্যিই রূপসী । সচরাচর দেখা যায় না । চোখ দুটি কপালের দিকে ওঠানো বলে— দেবী প্রতিমাব চোখের মতো লাগে । সমগ্র চেহারায় খুব সূক্ষ্ম হলেও কোথাও যেন একটি মূর্তি মূর্তি ভাব আছে ।

কী দেখছেন ?

তোমাকে দেখছি ভাই । তোমার চেহারায় একটা মূর্তি মূর্তি ভাব আছে ।

রানু মুখ কালো করে ফেলল । নীলু অবাক হয়ে বলল, ও কী ! তুমি মনে হয় মন খারাপ করলে ?

না, মন খারাপ করব কেন ?

কিন্তু এমন মুখ কালো করলে কেন ? আমি কিন্তু কমপ্রিমেন্ট হিসেবে তোমাকে বলেছি । তোমার মতো সুন্দরী মেয়ে আমি খুব বেশি দেখি নি । তবে একবার একটি বিহারি মেয়েকে দেখেছিলাম । আমার ছোটমামার বিয়েতে । অবশ্য সে মেয়েটি তোমার মতো রোগা ছিল না । ওর স্বাস্থ্য বেশ ভালো ছিল ।

আপনি কি একটু চা খাবেন ?

তুমি আমাকে আপনি করে বলছ কেন ? তোমার কি মনে হয় আমার বয়স অনেক বেশি ?

না, তা মনে হয় না।

তুমিও আমাকে তুমি বলবে। আর তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে আমি মাঝে-মাঝে তোমার কাছে আসব।

রানু চায়ের কাপ সাজাতে-সাজাতে মৃদু স্বরে বলল, আমাকে মূর্তি-মূর্তি লাগে, এটা বললে কেন ?

নীলু অবাক হয়ে বলল, এমনি বলেছি। টানাটানা চোখ তো, সে জন্যে। তুমি দেখি ভাই রাগ করেছে।

একটা কারণ আছে নীলু। তোমাকে আমি একদিন সব বলব, তাহলেই বুঝবে। চায়ে কতটুকু চিনি খাও ?

তিন চামচ।

নীলু অনেকক্ষণ বসল, কিন্তু কথাবার্তা আর তেমন জমল না। রানু কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। কিছুতেই মন লাগাতে পারছে না। সহজ হতে পারছে না। নীলু বেশ কয়েকবার অন্য প্রসঙ্গ আনতে চেষ্টা করল। ভাসা-ভাসা জবাব দিল রানু। এবং একসময় হালকা স্বরে বলল, আমার একটু অসুখ আছে নীলু।

কী অসুখ ?

মাঝে-মাঝে আমি ভয় পাই।

ভয় পাই মানে ?

রানু মাথা নিচু করে বলল, ছোটবেলায় একবার নদীতে গোসল করতে গিয়েছিলাম, তারপব থেকে এ-রকম হয়েছে।

কী হয়েছে ?

রানু জবাব দিল না।

বলো, কী হয়েছে ?

অন্য একদিন বলব। আজ তুমি তে মার কথা বলো।

আমার তো বলার মতো কোনো কথা নেই।

তোমার বন্ধুদের কথা বলো।

আমার তেমন কোনো বন্ধুও নেই। আমি বলতে গেলে একা একা থাকি। অসুন্দরী মেয়েদের বন্ধুটুকু থাকে না।

রঙ খারাপ হলে মানুষ অসুন্দর হয় না নীলু।

আমি নিজে কী, সেটা আমি ভালোই জানি।

নীলু উঠে পড়ল। রানু বলল, আবার আসবে তো ?

আসব। তুমি তোমার ভয়ের কথাটথা কী বলছিলে, সেইসব বলবে।

বলব।

নীলু পাঠাবে না পাঠাবে না করেও চিঠিটি পাঠিয়ে দিল। কিন্তু তার পরপরই দৃষ্টিভঙ্গির সীমা রইল না। কে জানে, বুড়ো-হাবড়া লোকটি একদিন হয়তো বাসায় এসে হাজির হবে। দারুণ লজ্জার ব্যাপার হবে সেটা। নিতান্তই ছেলেমানুষি কাজ করা হয়েছে। চার-পাঁচ দিন নীলুর খুব খারাপ কাটল। দারুণ অস্বস্তি। বুড়োমতো কোনো মানুষকে আসতে দেখলেই চমকে উঠত, এটিই সেই লোক নাকি? যদি সত্যি সত্যি কেউ এসে পড়ে, তাহলে সে ভেবে রেখেছে বলবে— এই চিঠি তো আমার নয়। অন্য কেউ তামাশা করে এই ঠিকানা দিয়েছে। আমি এ-রকম অজানা-অচেনা কাউকে চিঠি লিখি না।

কেউ অবশ্যি এলো না। দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ কেটে গেল। চিঠিরও কোনো উত্তর নেই। লোকটি হয়তো চিঠি পায় নি। ডাকবিভাগের কল্যাণে আজকাল তো বেশিরভাগ চিঠিই প্রাপকের হাতে পৌঁছায় না। এতে ক্ষতি যেমন হয়, লাভও তেমনি হয়। কিংবা হয়তো এমন হয়েছে, ঐ লোক অসংখ্য চিঠি পেয়ে পছন্দমতো চিঠিগুলোর উত্তর দিয়েছে। নীলুর তিন লাইনের চিঠি তাব পছন্দ হয় নি। সে হয়তো লম্বা-লম্বা চমৎকার সব চিঠি পেয়েছে। ইনিয়িং বিনিয়িং অনেক কিছু লেখা সব চিঠিতে।

দশ দিনের মাথায় নীলুর কাছে চিঠি এসে পড়ল। খুবই দামি একটা খামে চমৎকাব প্যাডের কাগজে চিঠি। গোটা গোটা হাতেব লেখা। কালির রঙ ঘন কালো। মাখন-রাঙা সে কাগজে লেখাগুলো মুক্তার মতো ফুটে আছে। এত সুন্দব হাতেব লেখাও মানুষের হয়! চিঠিটি খুবই সংক্ষিপ্ত।

কল্যাণীয়াসু,

তোমার চমৎকাব চিঠি গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়েছি। একজন ব্যক্তি মানুষের আবেদনে তুমি সাড়া দিয়েছ— তোমাকে ধন্যবাদ।
খুব সামান্য একটি উপহার পাঠালাম। প্রিজ, নাও।

আহমেদ সাবেত

উপহারটি সামান্য নয়। অত্যন্ত দামি একটি পিওর পারফিউমের শিশি।

নীলু ভেবে পেল না, এই লোকটি কি সবাইকে এ-রকম একটি উপহার পাঠিয়েছে? যারাই চিঠির জবাব দিয়েছে তারাই পেয়েছে? কিন্তু তাও কি সম্ভব? নাকি নীলু একাই চিঠির জবাব দিয়েছে? নীলুর বড় লজ্জা করতে লাগল। সে পারফিউমের শিশিটি লুকিয়ে রাখল এবং খুব চেষ্টা করতে লাগল সমস্ত ব্যাপার ভুলে যেতে। সে চিঠিটি কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিল জানালা দিয়ে। কেন এমন একটা বাজে ঝামেলায় জড়াল?

কিন্তু দিন সাতেক পব নীলু আবার একটি চিঠি লিখল। একটি বেশ দীর্ঘ চিঠি। সেখানে শেষের দিকে লেখা— আপনি কে, কী করেন, কিছুই তো জানান নি। আপনার বিজ্ঞাপনটিও দেখছি না। তার মানে কি এই যে আপনার নিঃসঙ্গতা এখন দূর হয়েছে?

নীলু বেশ কিছু দিন অপেক্ষা করল চিঠির জবাবের জন্যে। কিন্তু কোনো জবাব এলো না। কেন জানি নীলুর বেশ মন খারাপ হলো। আবেকটি চিঠি লেখার ইচ্ছা হতে লাগল। কিন্তু তাও কি হয়? একা-একা সে শুধু চিঠি লিখবে? তার এত কী গরজ পড়েছে?

দুপুর-রাতে আনিসের ঘুম ভেঙে গেল। হাত বাড়াল অভ্যেসমতো। পাশে কেউ নেই। আনিস ডাকল, রানু, রানু। কোনো সাড়া নেই। বাথরুম থেকে একটানা পানি পড়ার শব্দ হচ্ছে। বাথরুমে নাকি? আনিস উঁকি দিল বাথরুমে— কেউ নেই। কোথায় গেল! আনিস গলা উঁচিয়ে ডাকল, রানু। বসার ঘর থেকে ক্ষীণ হাসির শব্দ এলো। বসার ঘর অন্ধকার। রানু কী সেখানে একা-একা বসে আছে নাকি?

আনিস বসার ঘরে ঢুকে বাতি জ্বলেই সঙ্গে-সঙ্গে বাতি নিভিয়ে ফেলল। রানু বসার ঘরের ছোট টেবিলে চুপচাপ বসে আছে। তার গায়ে কোনো কাপড় নেই।

এই রানু!

উঁ।

কী হয়েছে? তোমার কাপড় কোথায়?

খুলে ফেলেছি। বড্ড গরম লাগছে।

আনিস এসে রানুর হাত ধরল। হিমশীতল হাত। একটু-একটু যেন কাঁপছে।

এসো রানু, ঘুমোতে যাই।

আমার ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না। তুমি যাও।

কাল আমবা একজন ডাক্তারের কাছে যাব, কেমন?

কেন?

তোমার শরীর ভালো না রানু।

আমার শরীর ভালোই আছে।

না, তুমি খুব অসুস্থ। এসো আমার সঙ্গে। কাপড় পরে ঘুমোতে এসো।

বানু কোনো আপত্তি করল না। সঙ্গে-সঙ্গেই উঠে এলো। কাপড় পরল এবং বাধ্য মেয়ে বমতো বিছানায় শুয়ে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। জেগে রইল আনিস। রানুর শরীর দ্রুত ঋণাত্মক হচ্ছে, আগে তো এ-বকম কখনো হয় নি! মিসির আলি-টালি নয়, বড় কোনো ডাক্তারকে দেখা, না দবকাব।

খুটখুট করে শব্দ হচ্ছে রান্নাঘরে। ইঁদুরের উপদ্রব। তবু কেন জানি শব্দটা অন্যরকম মনে হচ্ছে। যেন কেউ হাঁটছে রান্নাঘরে। থপথপ শব্দও হলো কয়েক বার। আনিস বলল, কে? রান্নাঘরের শব্দটা হঠাৎ থেমে গেল। আনিস বলল, কে? কে? মনের ভুল নাকি? আনিস যেন স্পষ্ট শুনল, রান্নাঘর থেকে কেউ-একজন বলল, আমি। স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ আওয়াজ। মেয়েলি স্বর। নাকি রানুই বলছে ঘুমের ঘোরে? এটাই হয়েছে। রানুবই গলা।

আনিস হাত বাড়িয়ে রানুকে কাছে টানল। রানু বলল, হাতটা সরিয়ে নাও গরম লাগছে। তার মানে কি বানু জেগে ছিল এতক্ষণ?

রানু!

উঁ।

তুমি কি জেগে ছিলে?

হ্যাঁ ।

আমি যখন বললাম কে কে, তখন কি তুমি বলেছ, আমি ?

হ্যাঁ, বলেছি ।

কিন্তু তুমি জবাব দিলে কেন ? তোমাকে তো কিছু জিজ্ঞেস করি নি । আমি জানতে চাচ্ছিলাম রান্নাঘরে কেউ আছে কিনা ।

রানু ফিসফিস করে বলল, আমি তো রান্নাঘরেই ছিলাম । আমি রান্নাঘর থেকেই জবাব দিয়েছি ।

আনিস চুপ করে গেল । বিছানায় উঠে বসে পরপর দুটি সিগারেট শেষ করল । বাথরুমে গিয়ে বাতি জ্বালিয়ে রেখে এলো । রান্নাঘরের বাতিও জ্বালিয়ে দিয়ে এলো । থাকুক, সারা রাত বাতি জ্বালানো থাকুক ।

রানু!

কী ?

কাল তুমি আমার সঙ্গে একজন ডাক্তারের কাছে যাবে, কেমন ?

ঠিক আছে, যাব ।

ডাক্তার সাহেব যা-যা জানতে চান, সব বলবে ।

রানু জবাব দিল না । মনে হলো সে ঘুমিয়ে পড়েছে । শান্ত নির্বিঘ্ন ঘুম । কিন্তু রান্নাঘরে আবার শব্দ হচ্ছে । আনিসের মনে হলো সে স্পষ্ট চুড়ির টুনটুন শব্দ শুনেছে । কাচের চুড়ির আওয়াজ । আনিস কয়েকবার ডাকল, কে, কে ওখানে ? কেউ কোনো জবাব দিল না । বাথরুম থেকে একটানা জল পড়ার শব্দ আসছে । বাড়িঅলাকে বলতে হবে কল ঠিক করে দিতে । একজন কাজের মানুষ রাখতে হবে । পুরুষমানুষ নয়, মেয়েমানুষ— যে রাত-দিন থাকবে । আত্মীয়স্বজন কাউকে এনে রাখলে ভালো হতো । কিন্তু আনিসের তেমন কোনো আত্মীয়স্বজন নেই, যারা এখানে এসে থাকবে । আনিসেব ঘুম এলো শেষরাতের দিকে ।

মিসির সাহেবের সঙ্গে তারা প্রায় দু'ঘণ্টা সময় কাটাল ।

রানু খুব সহজ-স্বাভাবিক আচরণ করল । এর প্রধান কৃতিত্ব সম্ভবত মিসির সাহেবের । তিনি খুব আন্তরিক ভঙ্গিতে কথাবার্তা বললেন । এক পর্যায়ে রানু বলল, আপনি আমাকে তুমি করে বলবেন, আমি আপনার মেয়ের বয়সী ।

মেয়ের বয়সী হলে কী, আমার তো মেয়ে নেই । বিয়েই করি নি ।

রানু কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না । ভদ্রলোক সেটি লক্ষ করলেন ।

তুমি কিছু বলতে চাচ্ছিলে ?

জি-না ।

কিছু বলতে চাইলে বলতে পার ।

না, আমি কিছু বলব না ।

মিসির সাহেব চায়ের ব্যবস্থা করলেন। চা খেতে-খেতে নিতান্তই সহজ ভঙ্গিতে বললেন, আনিস সাহেব বলেছিলেন, তুমি যা স্বপ্নে দেখ তা-ই সত্যি হয়।

হঁ।

যা স্বপ্নে দেখ তা-ই হয় ?

শুধু স্বপ্ন না, যা আমার মনে আসে তা-ই হয়।

বলো কী!

আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না, না ?

বিশ্বাস হবে না কেন ? পৃথিবীতে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার আছে। পৃথিবীটা বড় অদ্ভুত।

বলতে বলতে মিসির আলি ড্রয়ার খুলে চৌকা ধরনের চারটি কার্ড বের করলেন। হাসিমুখে বললেন, রানু এই কার্ডগুলোতে ডিজাইন আঁকা আছে। আমি একেকটি টেবিলের ওপর রাখব, ডিজাইনগুলি থাকবে নিচে। তুমি না দেখে বলতে চেষ্টা করবে।

রানু অবাক হয়ে বলল, না দেখে বলব কীভাবে ?

চেষ্টা করে দেখ। পারতেও তো পার। বলো দাঁখ এই কার্ডটিতে কী আঁকা আছে ? কী আশ্চর্য, কী করে বলব ?

আন্দাজ কর। যা মনে আসে তা-ই বল।

একটা এস চিহ্ন আছে। ঠিক হয়েছে ?

তা বলব না। এবার বলো এটিতে কী আছে ?

খুব ছোট-ছোট সার্কেল।

ক'টি, বলতে পাববে ?

মনে হচ্ছে তিনটি। চারটিও হতে পারে।

মিসির সাহেব কার্ডগুলি ড্রয়ারে রেখে সিগারেট ধরালেন। তাঁকে কেমন যেন চিন্তিত মনে হতে লাগল। আনিস বলল, ও কি বলতে পেরেছে ? মিসির সাহেব তার জবাব না দিয়ে বললেন, বানু, এবার তুমি শুনো, প্রথম ভয়টা তুমি কীভাবে পেলে। সবকিছু বলবে, কিছুই বাদ দেবে না, আমি তোমাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করছি।

রানু চুপ কবে রইল।

তুমি নিশ্চয়ই চাও, তোমার অসুখটা সেরে যাক। চাও না ?

চাই।

তাহলে বলো। কোনোকিছু বাদ দেবে না।

রানু তাকাল আনিসের দিকে। মিসিব আলি বললেন, আনিস সাহেব, আপনি না হয় পাশের ঘরে গিয়ে বসেন। ঐ ঘরে অনেক বইপত্র আছে, বসে-বসে পড়তে থাকুন। ন্যাশনাল জিওগ্রাফির কারেন্ট ইস্যুটা আছে, গতকালই এসেছে।

রানু বলতে শুরু করল। মিসির আলি শুনতে লাগলেন চোখ বন্ধ করে। একটি প্রশ্নও জিজ্ঞেস কবলেন না। মাঝখানে একবার শুধু বললেন, পানি খাবে ? তৃষ্ণা পেয়েছে ? রানু মাথা নাড়ল। তিনি পানির জগ এবং গ্লাস নিয়ে এলেন। শান্ত স্বরে বললেন, চোখে-মুখে

পানি দিয়ে নাও, ভালো লাগবে। রানু সে-সবকিছুই করল না। শান্ত ভঙ্গিতে বসে রইল। কথা বলতে লাগল স্পষ্ট স্বরে।

রানুর প্রথম গল্প

আমার বয়স তখন এগারো-বারো বৎসর। আমি মধুপুরে আমার এক চাচার বাড়িতে বেড়াতে গেছি। চাচাতো বোনের বিয়েতে। চাচাতো বোনটির নাম হচ্ছে অনুফা। খুবই ভালো মেয়ে। কিন্তু চাচা বিয়ে ঠিক করেছেন একটা বাজে ছেলের সঙ্গে। ছেলের প্রচুর জায়গা-টায়গা আছে, কিন্তু কিছুই করে না। দেখতেও বাজে, দাঁত উঁচু, মুখে বসন্তের দাগ। দারুণ বেঁটে। অনুফা আপার এই নিয়ে খুব মন-খারাপ। প্রায়ই এই নিয়ে কাঁদে। আমি তাকে সান্ত্বনা-টান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করি। কিন্তু আমি নিজে একটি বাচ্চা মেয়ে, তাকে কী সান্ত্বনা দেব? তবে আমার সঙ্গে অনুফা আপার খুব ভাব ছিল। আমাকে অনেক গোপন কথাটিখা বলত।

যাই হোক, গায়ে-হলুদের দিন খুব রঙ খেলা হলো। আমাদের ওদিকে রঙ খেলা হচ্ছে— উঠোনে কাদা ফেলে তাতে গড়াগড়ি খাওয়া। সারাদিন রঙ খেলে কাদা মেখে সবাই ভূত হয়ে গেছি। ঠিক করা হলো সবাই মিলে নদীতে গোসল সেরে আসবে। চাচা অবশ্যি আপত্তি করলেন— মেয়েছেলেরা নদীতে যাবে কী?

চাচার আপত্তি অবশ্যি টিকল না। আমরা মেয়েরা সবাই দল বেঁধে নদীতে গোসল করতে গেলাম। বাড়ি থেকে অল্প কিছু দূরেই নদী। আমরা প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ জন মেয়ে, খুব হৈচৈ হচ্ছে। সবাই মিলে মহানন্দে পানিতে ঝাঁপাঝাঁপি করছি। সেখানেও খুব কাদা ছোড়াছুড়ি শুরু হলো। ঠিক তখন একটা কাণ্ড হলো, মনে হলো একজন কে যেন আমাব পা জড়িয়ে ধরেছে। নির্ঘাত কেউ তামাশা করছে। আমি হাসতে-হাসতে বললাম— অ্যাঁই, ভালো হবে না। ছাড় বলছি, ছাড়। কিন্তু যে পা ধরেছে সে ছাড়ল না, হঠাৎ মনে হলো সে টেনে আমার পায়জামাটা খুলে ফেলতে চেষ্টা করছে। তখন আমি চিৎকার দিলাম। সবাই মনে করল কোনো-একটা তামাশা হচ্ছে। কেউ কাছে এলো না। কিন্তু ততক্ষণে আমার পায়জামাটা খুলে ফেলেছে আব, আর...। [এই সময় মিসির সাহেব বললেন, বুঝতে পারছি তারপর কী হলো।]

সবার প্রথম অনুফা আপা ছুটে এসে আমাকে ধরলেন, তারপর অন্যরা ছুটে এলো। যে আমার পা জড়িয়ে ধরেছিল, সে আমাকে শক্ত করে চেপে ধরে গভীর জলের দিকে টেনে নিতে লাগল। তারপর আমার কিছু মনে নেই।

জ্ঞান হবার পর শুনেছি ওরা আমাকে বহু কষ্টে টেনে পাড়ে তুলেছে এবং দেখেছে একটা মরা মানুষ আমাকে জড়িয়ে ধরে বেখেছে। ঐ মরা মানুষটাকে গ্রামের লোকেরা নদীর পাড়ে মাটি চাপা দিয়েছিল। সেইসব কিছুই অবশ্যি আমি দেখি নি, শুনেছি। কারণ আমার কোনো জ্ঞান ছিল না। চাচা আমার চিকিৎসার জন্যে আমাকে ঢাকা নিয়ে এসেছিলেন। সবাই ধরে নিয়েছিল আমি বাঁচব না। কিন্তু বেঁচে গেলাম। এইটুকু আমার প্রথম ভয়ের গল্প।

রানু গল্প শেষ করে পুরো এক গ্লাস পানি খেল। মিসির আলি সাহেব বললেন, ঐ লোককে তুমি দেখ নি?

জি-না ।

গ্রামের অন্যরা তো দেখেছে, কী রকম ছিল দেখতে ?

আমি জানি না, কাউকে জিজ্ঞেস করি নি । কেউ আমাকে কিছু বলে নি ।

এরপর কি তুমি কখনো তোমার চাচার বাড়ি গিয়েছিলে ?

জি-না, কখনো যাই নি ।

আরেকটা কথা তুমি বলছিলে । ঐ লোকটি তোমার পায়জামা টেনে খুলে ফেলতে চেষ্টা করছিল । তোমাকে যখন টেনে তোলা হলো তখন কি পায়জামা পরনে ছিল ?

জি-না, ছিল না ।

মিসির আলি সাহেব সিগারেট ধরিয়ে নিচু গলায় বললেন, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে কোনো একটি জিনিস তুমি আমাকে বলে নি । কিছু-একটা বাদ দিয়ে গেছ ।

রানু জবাব দিল না ।

যে-জিনিসটা বাদ দিয়েছ, সেটা আমার শোনা দরকাব । সেটা কী, বলবে ?

অন্য আরেক দিন বলব ।

ঠিক আছে, অন্ত একদিন শুনব । তোমাকে আসতে হবে না, আমি গিয়ে শুনে আসব ।

রানু কিছু বলল না । মিসির আলি সাহেব কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে থেকে হঠাৎ বললেন, যখন তুমি একা থাক, তখন কি কেউ তোমার সঙ্গে কথা বলে ?

হ্যাঁ ।

মিসির আলি খুব উৎসাহ বোধ কবলেন ।

ব্যাপারটা শুঁছিয়ে বলো ।

মাঝে-মাঝে কে যেন আমাকে নাম ধবে ডাকে ।

পুরুষদের গলায় ?

জি-না । মেয়েদের গলায় ।

শুধু ডাকে, অন্য কিছু বলে না ?

জি-না ।

এবং যে ডাকে তাকে কখনো দেখা যায় না ।

জি-না ।

এটা প্রথম কখন হয় ? অর্থাৎ প্রথম কখন শুনলে ? নদীর ব্যাপারটা ঘটার আগেই ?

হুঁ ।

কত দিন আগে ?

আমার ঠিক মনে নেই ।

আচ্ছা ঠিক আছে, আজ এই পর্যন্তই ।

রানুরা উঠে দাঁড়াল । মিসির আলি ভারি গলায় বললেন, আবার দেখা হবে । রানু কিছু বলল না । আনিস বলল, আমরা তাহলে যাই ?

আচ্ছা, ঠিক আছে ।

মিসির আলি ওদের রিকশা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন। ওরা রিকশায় উঠবার সময় তিনি হঠাৎ বললেন, রানু! যে তোমার পা জড়িয়ে ধরেছিল, ওর নাম কী ?

ওর নাম জালালউদ্দিন।

কী করে জানলে, ওর নাম জালালউদ্দিন ?

রানু তাকিয়ে রইল, কিছু বলল না। মিসির আলি সাহেব বললেন, ঠিক আছে, পরে কথা হবে।

রিকশায় ওরা দুজনে কোনো কথা বলল না। আনিসের একবার মনে হলো, রানু কাঁদছে। সে সিগারেট ধরিয়ে সহজ স্বরে বলল, ভদ্রলোককে তোমার কেমন লাগল রানু ?

ভালো। বেশ ভালো লোক। উনি আসলে কী করেন ?

উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পার্ট-টাইম টিচার। ক্লিনিক্যাল সাইকিয়াট্রি পড়ান। খুব জ্ঞানী লোক।

ইউনিভার্সিটির টিচাররা এমন রোগা হয়, তা তো জানতাম না! আমার ধারণা ছিল তাঁরা খুব মোটাসোটা হন।

রানু শব্দ করে হাসল। আনিস বলল, আজ বাইরে খাওয়া-দাওয়া করলে কেমন হয় ?

শুধু-শুধু টাকা খরচ।

তোমার গিয়ে রান্না চড়াতে হবে না। চল না, কিছু পয়সা খরচ হোক।

কোথায় খাবে ?

আছে আমার একটা চেনা জায়গা। নানরুটি আর কাবাব। কী বলো ?

৬

মিসির আলি সাহেব দেখলেন তাঁর ঘরের সামনে চাবটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কোনো টিউটোরিয়াল ক্লাস আছে নাকি ? আজ বুধবার, টিউটোরিয়াল ক্লাস থাকার কথা নয়। তবে কে জানে হয়তো নতুন রুটিন দিয়েছে। তিনি এখনো নোটিশ পান নি।

এই, তোমাদের কী ব্যাপার ?

মেয়েগুলো জড়সড় হয়ে গেল।

কী, তোমাদের সঙ্গে কোনো ক্লাস আছে ?

জি-না স্যার।

তাহলে কী ? কিছু বলবে ?

স্যার, নোটিশ-বোর্ডে আপনি একটি নোটিশ দিয়েছিলেন, সেই জন্যে এসেছি।

কীসের নোটিশ ?

তিনি ভুরু কঁচকালেন। মেয়েগুলো মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

কী নোটিশ দিয়েছিলাম ?

স্যার, আপনি লিখেছেন— কারো এক্সট্রাসের্গার পারসেপশনের ক্ষমতা আছে কিনা আপনি পরীক্ষা করে বলে দেবেন।

মিসির আলি সাহেবের সমস্ত ব্যাপারটা মনে পড়ল। মাস দুয়েক আগে এ রকম একটা নোটিশ দিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু এই প্রথম চারজনকে পাওয়া গেল, যারা উৎসাহী এবং সব ক'টি মেয়ে। মেয়েগুলো রোগা। তার মানে কি অকন্টের ব্যাপারে রোগা মেয়েরাই বেশি উৎসাহী? তিনি মনে-মনে একটা নোট তৈরি করলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর মনে হলো বিষয়টি ইন্টারেস্টিং। একটা সার্ভে করা যেতে পারে।

এসো তোমরা। ঘরে এসো। তোমরা তাহলে জানতে চাও তোমাদের ইএসপি আছে কিনা?

মেয়েগুলো কথা বলল না। যেন একটু ভয় পাচ্ছে। মুখ সবারই শুকনো।

বসো তোমরা। চেয়ারে আরাম করে বসো।

ওরা বসল। মিসির আলি সাহেব একটা সিগারেট ধরালেন। নিচু গলায় বললেন, সব মানুষের মধ্যেই ইএসপি কিছু পরিমাণ থাকে। টেলিপ্যাথির কথাই ধর। তোমাদের নিজেদেরই হয়তো এ-বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। সহজ উদাহরণ হচ্ছে, ধর একদিন তোমাদের কারো মনে হলো আজ অমুকের সাথে দেখা হবে। যার সঙ্গে দেখা হবার কথা মনে হচ্ছে, সে কিন্তু এখানে থাকে না। থাকে চিটাগাং। কিন্তু সত্যি-সত্যি দেখা হয়ে গেল। কী, হয় না এরকম?

মেয়েগুলো কথা বলল না। এর মধ্যে একজন রুমাল দিয়ে কপাল মুছতে লাগল। মেয়েটি ঘামছে। নার্ভাস হয়ে পড়ছে মনে হয়। নিশ্চয়ই ব্লাড-প্রেসার বেড়ে গেছে। মিসির আলি বিস্মিত হলেন, নার্ভাস মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন, এই বিষয়ের চর্চা এখনো বিজ্ঞানের পর্যায়ে পড়ে না। বেশির ভাগ সিদ্ধান্তই অনুমানের ওপর। তবে আমেরিকায় একটি ইউনিভার্সিটি আছে— ডিউক ইউনিভার্সিটি। ওরা কিছু-কিছু এক্সপেরিমেন্টাল কাজ শুরু করেছে। মুশকিল হচ্ছে, ফলাফল সবসময় রিপ্রিডিউসিবল নয়।

মিসির আলি সাহেব ড্রয়ার খুলে দশটি চৌকো কার্ড টেবিলে বিছালেন। হাসিমুখে বললেন, পরীক্ষাটি খুব সহজ। এই কার্ডগুলোতে বিভিন্ন রকম চিহ্ন আছে। যেমন ধর ক্রস, স্কয়ার, ত্রিভুজ, বিন্দু। জানাটতে কী আছে সেটা অনুমান করতে চেষ্টা করবে। দু-একবার কাকতালীয়ভাবে মিলে যাবে। তবে ফলাফল যদি স্ট্যাটিসটিক্যালি সিগনিফিকেন্ট হয়, তাহলে বুঝতে হবে, তোমাদের ইএসপি আছে। এখন এসো দেখি, কে প্রথম বলবে? তোমার কী নাম?

নীলুফার।

হ্যাঁ নীলুফার, তুমিই প্রথম চেষ্টা কর। যা মনে আসে তা-ই বলো।

আমার কিছু মনে আসছে না।

তাহলে অনুমান করে বলো।

মেয়েটি ঠিকমতো বলতে পারল না। তার সঙ্গীরাও না। মিসির আলি হাসতে-হাসতে বললেন, নাহ্ তোমাদের কারো কোনো ইএসপি নেই। ওরা যেন তাতে খুশিই হলো। মিসির আলি গম্ভীর গলায় বললেন, না থাকাই ভালো। আধুনিক মানুষদের এ-সব থাকতে নেই। এতে অনেক বকম জটিলতা হয়।

কী জটিলতা ?

আছে, আছে।

বলুন না স্যার।

মিসির আলি লক্ষ করলেন, নীলুফার নামের মেয়েটিই কথা বলছে। স্পষ্ট সতেজ গলা।

অন্য আরেক দিন বলব! আজ তোমরা যাও।

নীলুফার বলল, এমন কিছু কি স্যার আছে, যা করলে ইএসপি হয় ?

লোকজন বলে, প্রেমে পড়লেও এই ক্ষমতাটা অসম্ভব বেড়ে যায়। আমি ঠিক জানি না। তোমরা যদি কেউ কখনো প্রেমে পড়, তাহলে এসো, পরীক্ষা করে দেখব।

কথাটা বলেই মিসির আলি অপ্রস্তুত বোধ করলেন। ছাত্রীদের এটা বলা ঠিক হয় নি। কথাবার্তায় তাঁর আরো সাবধান হওয়া উচিত। এ রকম হালকা ভঙ্গিতে কথা বলা ঠিক হচ্ছে না।

স্যার, আমরা যাই ?

আচ্ছা ঠিক আছে, দেখা হবে।

মিসির আলি নিচের টিচার্স লাউঞ্জে চা খেতে এলেন। বেলা প্রায় তিনটা। লাউঞ্জে লোকজন নেই। পলিটিক্যাল সায়েন্সের রশিদ সাহেব এক কোণায় বসে ছিলেন। তিনি অস্পষ্ট স্বরে ডাকলেন, এই যে মিসির সাহেব, অনেক দিন পর মনে হয় এলেন এদিকে। চা খাবেন ?

হঁ।

কে যেন বলছিল, আপনি নাকি ভূতে-ধরা সারাতে পাবেন। ঠিক নাকি ?

জি-না। আমি ওঝা নই।

রাগ করলেন নাকি ? আমি কথাব কথা বললাম।

না, রাগ করব কেন ?

আচ্ছা মিসির আলি সাহেব, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন ?

না।

রশিদ সাহেব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

আত্মা, আত্মায় বিশ্বাস করেন ?

না ভাই, আমি একজন নাস্তিক।

আত্মা নেই— এই জিনিসটা কি প্রমাণ করতে পাবেন ? কী কী যুক্তি আছে আপনার হাতে ?

মিসির আলি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। রশিদ সাহেব বললেন, আত্মা যে আছে, এর পক্ষে বিজ্ঞানীদের কিছু চমৎকার যুক্তি আছে।

থাকলে তো ভালোই। বিজ্ঞানীরা জড়জগৎ বাদ দিয়ে আত্মা-টাত্মা নিয়ে উৎসাহী হলেই কিন্তু ঝামেলা। রশিদ সাহেব, আমার মাথা ধরেছে। এ নিয়ে আর কথা বলতে চাই না। কিছু মনে করবেন না।

মিসির আলি চা না খেয়েই উঠে পড়লেন। তাঁর সত্যি-সত্যি মাথা ধরেছে। প্রচণ্ড ব্যথা। বড় রকমের কোনো অসুখের একটা পূর্বলক্ষণ।

৭

নীলু ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে এসে দেখে তার বিছানার ওপর চমৎকার একটি প্যাকেট পড়ে আছে। ব্রাউন কাগজে মোড়া প্যাকেটে গোটা-গোটা করে তার নাম লেখা। নীলুর বুক কেঁপে উঠল, বিলুর চোখে পড়ে নি তো? বিলুর খুব খারাপ অভ্যাস আছে, অন্যের চিঠি খুলে-খুলে পড়বে। হাসাহাসি করবে।

নীলু দরজা বন্ধ করেই প্যাকেটটি খুলল। ছোট্ট চিঠি, কিন্তু কী চমৎকার করেই না লেখা :

কল্যাণীয়াসু,

ইচ্ছা করেই তোমাকে আমি কম লিখি। তোমার চিঠি পড়ে পড়ে খুব মায়া জন্মে যায়। এ বয়সে আমার আর মায়া বাড়াতে ইচ্ছে করে না। মায়া বাড়ালেই কষ্ট পেতে হয়। আরেকটি সামান্য উপহার পাঠালাম। গ্রহণ করলে খুব খুশি হব।

আহমেদ সাবেত

উপহারটি বড় সুন্দর! নীল রঙের একটি ডায়েরি। অসম্ভব নরম প্লাস্টিকের কভার, যেখানে ছোট্ট একটি শিশুর ছবি। পাতাগুলো হালকা গোলাপি। প্রতিটি পাতায় সুন্দর সুন্দর দু'লাইনের কবিতা। ডায়েরিটির প্রথম পাতায় ইংবোজিতে লেখা :

I wish I could be eighteen again

A.S

পড়তে গিয়ে কেন জানি নীলুর চোখে জল এলো। একজন সম্পূর্ণ অজানা অচেনা মানুষের জন্যে মন কেমন করতে লাগল। লোকটি দেখতে কেমন কে জানে? সুন্দর নয় নিশ্চয়ই। বয়স্ক মানুষ, হয়তো চুলটুল পেকে গেছে। তাতে কিছু যায় আসে না। মানুষের বয়স হচ্ছে তার মনে। মন যত দিন কাঁচা থাকে, তত দিন মানুষের বয়স বাড়ে না। এই লোকটির মন অসম্ভব নরম। শিশুর মতো নরম। নীলুর মনে হলো এই লোকটি স্বামী হিসেবে অসাধারণ ছিল। তার স্ত্রীকে সে নিশ্চয়ই সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছে।

নীলু বাতের বেলা দরজা বন্ধ করে দীর্ঘ একটা চিঠি লিখল— আপনি এমন কেন? নিজের কথা তো কিছুই লেখেন নি। অথচ আমি আমার সমস্ত কথা লিখে বসে আছি। তবু মনে হয় সব বুঝি লেখা হলো না। অনেক কিছু বুঝি বাকি রয়ে গেল। আপনি আমাকে এত সুন্দর-সুন্দর উপহার দিয়েছেন, কিন্তু আমি তো আপনাকে কিছুই দিই নি। আমার কিছু একটা দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু আমি তো জানি না আপনি কী পছন্দ করেন। আচ্ছা, আপনি কি টাই পরেন? তাহলে লাল টকটকে একটা টাই আপনাকে দিতে পারি। জানেন, পুরুষ মানুষের এই একটি জিনিসই আমি পছন্দ করি। কিন্তু হয়তো আপনি টাই পরেন না, টিলেঢালা ধরনের মানুষদের মতো চাদর গায়ে দেন। আপনার সম্পর্কে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে। একদিন আসুন না আমাদের বাসায়, এক কাপ চা খেয়ে যাবেন।

জানেন, আমি খুব ভালো চা বানাতে পারি। অন্য কেউ চা বানিয়ে দিলে আমার বাবা খেতে পারেন না। সব সময় আমাকে বানাতে হয়। গত রোববারে কী হলো, জানেন ? রাত তিনটেয় বাবা আমাকে ডেকে তুলে বললেন— মা, এক কাপ চা বানা তো, বড্ড চায়ের ভৃক্ষা পেয়েছে।

আপা, দরজা বন্ধ করে কী করছ ?

নীলু অপ্রস্তুত হয়ে দরজা খুলল। বিলু দাঁড়িয়ে আছে। সন্দেহজনকভাবে তাকাচ্ছে। কী করছিলে ?

বিছু করছিলাম না।

বিলু বিছানায় এসে বসল, আপা, তোমার মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছি।

কী পরিবর্তন ?

অস্থির-অস্থির ভাব। লক্ষণ ভালো না আপা। বলো তো কী হয়েছে ?

কী আবার হবে ? তোর শুধু উল্টোপাল্টা কথা।

কিছু একটা হয়েছে আপা। আমি জানি।

কী যে বলিস!

আমার কাছে লুকোতে পারবে না আপা। আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া মুশকিল।

য' ভাগ, পাকামো করিস না।

বিলু গেল না। কাপড় ছাড়তে-ছাড়তে বলল, রানু আপাকেও আমি বললাম তোমার পরিবর্তনের কথা। তারও ধারণা, তুমি কারো প্রেমে পড়েছ।

হঁ, আমার তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই। তাছাড়া প্রেমটা আমার সঙ্গে করবে কে ? চেহাবার এই তো অবস্থা।

খারাপ অবস্থাটা কী ? রঙটা একটু ময়লা। এছাড়া আর কী ?

নীলু ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল।

নিঃশ্বাস ফেলছ কেন আপা ? নিজের চেহাবা সম্পর্কে তোমার এমন খারাপ ধারণা থাকা উচিত না। সবাই তো আর রানু আপার মতো হয় না, হওয়া উচিত নয়।

উচিত নয় কেন ?

সুন্দরী মেয়েদের অনেক রকম প্রবলেম থাকে।

কী প্রবলেম ?

রানু আপার মাথা খারাপ— সেটা তুমি জানো ?

কী বলছিস এ-সব ?

কিছু বলছি। আকবরের মা একদিন দুপুরে কী জন্যে যেন গিয়েছিল, শোনে রানু আপা নিজের মনে হাসছে এবং কথা বলছে।

তাই নাকি ?

হঁ। রহমান সাহেবের স্ত্রী বললেন, একদিন নাকি আনিস সাহেব গভীর রাতে রহমান সাহেবকে ডেকে নিয়ে গেলেন তার স্ত্রীর খুব অসুখ, এই কথা বলে। রহমান সাহেব গিয়ে দেখেন অসুখ-টসুখ কিছু নেই, দিব্যি ভালো মানুষ।

নীলু মৃদু স্বরে বলল, রানুর মতো সুন্দরী হলে আমি পাগল হতেও রাজি
বিলু হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, কথাটা ঠিক বলেছ আপা।

রানু প্রসঙ্গে পাওয়া সব তথ্য লিখে রাখবার জন্যে মিসির আলি সাহেব মোটা একটা খাতা
কিনে এনেছেন। খাতাটির প্রথম পাতায় লেখা—

একজন মানসিক রোগীর পর্যায়ক্রমিক মনোবিশ্লেষণ। দ্বিতীয় পাতায় কিছু ব্যক্তিগত
তথ্য যেমন—

নাম : রানু আহমেদ।

বয়স : সতের বৎসর (রূপবতী)

বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিতা (তের মাস আগে বিয়ে হয়)

স্বাস্থ্য : রূগণা।

ওজন : আশি পাউন্ড।

স্বামী : আনিস আহমেদ। দি জেনিথ ইন্টারন্যাশনালের ডিউটি

অফিসার। বয়স ৩৭, স্বাস্থ্য ভালো।

তৃতীয় পাতার হেডিং হচ্ছে— ‘অডিটরি হেলুসিনেশন।’ এর নিচে লাল কালি দিয়ে
একটা বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন আঁকা। এই পাতায় অনেক কিছুই লেখা হয়েছে, আবার
কাটাকুটি করা হয়েছে। যেন মিসিব আলি সাহেব মনস্তত্ত্ব করতে পারছেন না কী
লিখবেন। দু’টি লাইন শুধু পড়া যায়। লাইন দু’টির নিচে লাল কালি দিয়ে দাগ দেয়া।

মেয়েটিশ অডিটরি হেলুসিনেশন হচ্ছে : সে একা থাকাকালীন গুনতে
পায় কেউ যেন তাকে ডাকছে।

পরের কয়েক পাতায় রানুর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয়
লেখা। এ পাতাগুলি পড়লেই বোঝা যায়, মিসির আলি নামের এই লোকটির স্মৃতিশক্তি
অসাধারণ। অতি তুচ্ছ ব্যাপারগুলোও লেখা আছে। যেমন, এক জায়গায় লেখা—
মেয়েটি বেশ কয়েকবার শাড়ির আঁচল টেনেছে। দু’বার শব্দ করে আঙুল ফুটিয়েছে।
আমি লক্ষ্য কবলাম মেয়েটি পানি খেল মাথা নিচু করে। বেশ খানিকটা নিচু করে। যেন
পানি পান করার ব্যাপারটি সে আড়াল করতে চায়।

নদীতে গোসলের গল্পটি লেখা আছে। গল্পের শেষে বেশকিছু প্রশ্ন করা আছে।
যেমন—

- একজন মৃত মানুষ পানিতে ভেসে থাকবে। ডুবে থাকবে না। গল্পে
মৃত মানুষটির ডুবে-ডুবে চলার কথা আছে। এরকম থাকার কথা
নয়।
- পাজিমা খুলে ফেলার কথা আছে। কিশোরীরা সাধারণত শক্ত গিট
দিয়ে পাজিমা পরে। গিট খুলতে হলে ফিতা টানতে হবে। এ
মানুষটি কি ফিতা টেনেছিল, না পাজিমাটাই টেনে নামিয়েছে?
- মৃত লোকটির কি কোনো পোস্টমর্টেম হয়েছিল?
- তার আনুমানিক বয়স কত ছিল?

- প্রথম অসুস্থতার সময় কি মেয়েটি ঘুমের মধ্যে কোনো কথাবার্তা বলত ? কী বলত ?
- মেয়েটি বলল লোকটির নাম জালালউদ্দিন। কীভাবে বলল ? লোকটির নাম তো জানার কথা নয়। নাকি পরে শুনেছে ?
- জালালউদ্দিন জাতীয় নামের কারো সঙ্গে কি এই মেয়েটির পূর্বপরিচয় ছিল ?

প্রশ্নের শেষে তিনটি মন্তব্য লেখা আছে। মন্তব্যগুলো সংক্ষিপ্ত। প্রথম মন্তব্য— মেয়েটি যে-ঘটনার কথা বলেছে, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। দ্বিতীয় মন্তব্য— এই ঘটনা অন্য যে-সব ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করেছে তাদের সঙ্গে প্রথমে আলাপ করতে হবে। দ্বিতীয় মন্তব্যটি লাল কালি দিয়ে আন্ডারলাইন করা ও পাশে লেখা— অত্যন্ত জরুরি। তৃতীয় মন্তব্য— মেয়েটির অবশ্যই কিছু পরিমাণ এক্সট্রাসেন্সরি পারসেপশন আছে। সে কার্ডের সব ক’টি চিহ্ন সঠিকভাবে বলতে পেরেছে। আমি এরকম আগে কখনো দেখি নি। এই বিষয়ে আমার ধারণা হচ্ছে, মানসিকভাবে অসুস্থ রোগীদের এই দিকটি উন্নত হয়ে থাকে। আমি এর আগেও যে ক’টি অসুস্থ মানুষ দেখেছি, তাদের সবার মধ্যেই এই ক্ষমতাটি কিছু পরিমাণে লক্ষ করেছি। দি জার্নাল অব প্যারাসাইকোলজির তৃতীয় ভল্যুমে (১৯৭৩) এই প্রসঙ্গে রিভিউ পেপার আছে। অথর জন নান এবং এফ টলম্যান।

৮

সোহাগী হাইস্কুলের হেডমাস্টার সাহেব দারুণ অবাক হলেন। রানুর ব্যাপারে খোঁজখবর করার জন্যে এক ভদ্রলোক এসেছেন— এর মানে কী ? অত দিন আগে কী হয়েছিল, না- হয়েছিল, তা কি এখন আর কারো মনে আছে ? আর মনে থাকলেও এইসব ব্যাপার নিয়ে এখন ঘাঁটাঘাঁটি করাটা বোধহয় ঠিক নয়। কিন্তু যে ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁকে মুখের ওপর না বলতেও বাধছে। ভদ্রলোক হাজার হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। মানী লোক। তা ছাড়া এত দূর এসেছেন, নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। মুখে বলছেন রানু অসুস্থ এবং তিনি রানুর একজন চিকিৎসক। কিন্তু এটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। কারণ মাসখানেক আগেই রানুকে তিনি দেখে এসেছেন। কিছুমাত্র অসুস্থ মনে হয় নি। আজ হঠাৎ এমন কী হয়েছে যে ঢাকা থেকে এই ভদ্রলোককে আসতে হলো ?

রানুর কী হয়েছে বললেন ?

মানসিকভাবে অসুস্থ।

আমি তো সেদিনই তাকে দেখে এলাম।

যখন দেখেছেন তখন হয়তো সুস্থই ছিল।

কী জানতে চান আপনি, বলেন।

নদীতে গোসলের সময় কী ঘটেছিল, সেটা বলেন।

সে-সব কি আর এখন মনে আছে ?

ঘটনাটা বেশ সিরিয়াস এবং নিশ্চয়ই আপনাদের মধ্যে বহুবার আলোচিত হয়েছে, কাজেই মনে থাকার কথা। আপনার যা মনে আসে তাই বলেন।

হেডমাস্টার গম্বীর স্বরে ঘটনাটা বললেন। রানুর গল্পের সঙ্গে তাঁর গল্পের কোনো অমিল লক্ষ করা গেল না। শুধু ভদ্রলোক বললেন, মেয়েরা গোসল করতে গিয়েছিল দুপুরে, সন্ধ্যায় নয়।

পায়জামা খোলার ব্যাপারটি বলেন। পায়জামাটা কি পাওয়া গিয়েছিল ?

আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না।

রানু বলছিল, নদীতে গোসল করবার সময় সেই মরা মানুষটি তার পায়জামা খুলে ফেলে।

আরে না না, কী বলেন!

ওর পরনে পায়জামা ছিল ?

হ্যাঁ, থাকবে না কেন ?

আপনার ঠিক মনে আছে তো ?

মনে থাকবে না কেন ? পরিষ্কার মনে আছে। আপনি অন্য সবাইকেও জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।

ঐ মরা মানুষটি সম্পর্কে কী জানেন ?

কিছুই জানি না রে ভাই। থানায় খবর দিয়েছিলাম। থানা হচ্ছে এখান থেকে দশ মাইল। সেই সময় যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো ছিল না। থানাঅলারা আসে দু'দিন পরে। লাশ তখন পচে-গলে গিয়েছে। শিয়াল-কুকুর কামড়াকামড়ি করছে। থানাঅলারা এসে আমাদের লাশ পুতে ফেলতে বলে। আমরা নদীর ধারেই গর্ত করে পুতে ফেলি।

আচ্ছা, ঐ লাশটি তো উলঙ্গ ছিল, ঠিক না ?

জি-না ঠিক না। হলুদ রঙের একটা প্যান্ট ছিল আর গায়ে গেঞ্জি ছিল।

মিসির সাহেবের ভুরু কুঞ্চিত হলো।

আপনার ঠিক মনে আছে তো ভাই ?

আরে, এটা মনে না থাকার কোনো কারণ আছে ? পরিষ্কার মনে আছে।

লাশটি কি বুড়ো মানুষের ছিল ?

জি না, জোয়ান মানুষের লাশ।

আর কিছু মনে পড়ে ?

আর কিছু তো নেই মনে পড়ার।

আপনার ঐ মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে চাই, অনুফা যার নাম। শুনেছি ওর শ্বশুরবাড়ি কাছেই।

হরিণঘাটায়। আপনি যেতে চান হরিণঘাটা ?

জি।

কখন যাবেন ?

আজকেই যেতে পারি। কত দূর এখান থেকে ?

পনের মাইল। বেবিটাক্সি করে যেতে পারেন।

রাতে ফিরে আসতে পারব ?

তা পারবেন।

বেশ, তাহলে আপনি আমাকে ঠিকানা দিন।

দেব। বাড়িতে চলেন, খাওয়া-দাওয়া করেন।

আমি হোটেল থেকে খেয়েদেয়ে এসেছি।

তা কি হয়! অতিথি মানুষ, আসুন আসুন।

ভদ্রলোক বাড়িতে নিয়ে গেলেন ঠিকই, কিন্তু বড়ই গম্ভীর হয়ে রইলেন।

মাথার ওপর হঠাৎ এসে পড়া উপদ্রবে তাঁকে যথেষ্ট বিরক্ত মনে হলো। ভালো করে কোনো কথাই বললেন না। অকারণে বাড়ির একজন কামলার ওপর প্রচণ্ড হিংসিত্ব শুরু করলেন।

কিন্তু অনুফার বাড়িতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার ঘটল। মেয়েটি আদর-যত্নের একটি মেলা বাধিয়ে ফেলল। মিসির আলি অবাক হয়ে দেখলেন, মেয়েটির স্বামী সন্ধ্যাবেলাতেই জাল নিয়ে পুকুরে নেমে গেছে। অনুফা পরিচিত মানুষের মতো আদুরে গলায় বলল, রাতে ফিরবেন কি— কাল সকালে যাবেন। লোকজন মিসির আলিকে দেখতে এলো। এরা বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ। মেয়েটিও মনে হয় বেশ ক্ষমতা নিয়ে আছে। সবাই তার কথা শুনছে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তাঁকে গোসলের জন্যে গরম পানি করে দেওয়া হলো। একটা বাটিতে নতুন একটা গায়ে মাথার সাবান। মোড়কটি পর্যন্ত ছেঁড়া হয় নি। বাংলাঘরে নতুন চাদর বিছিয়ে বিছানা করা হলো। মেয়েটির বৃদ্ধ স্বামীর একটি ফর্সী লুঙ্গাও এনে দিলেন এবং বারবার বলতে লাগলেন, খবর না দিয়ে আসার জন্যে ঠিকমতো খাতির-যত্ন করতে না পেলে তিনি বড়ই শরমিন্দা। তবে যদি কালকেব দিনটা থাকেন, তবে তিনি হরিণঘাটার বিখ্যাত মাগুর মাছ খাওয়াবেন। খাওয়াতে না পারলে তিনি বাপের ব্যাটা না— ইত্যাদি ইত্যাদি।

মিসির আলির বিশ্বয়ের সীমা রইল না। তিনি সত্যি-সত্যি একদিন থেকে গেলেন। মিসির আলি সাহেব এরকম কখনো করেন না।

৯

রানু মৃদু স্বরে বলল, ভেতরে আসব ?

এসো রানু, এসো।

গল্প করতে এলাম।

খুব ভালো করেছে।

নীলু উঠে গিয়ে রানুর হাত ধরল। রানু বলল, তুমি কাঁদছিলে নাকি, চোখ ভেজা। নীলু কিছু বলল না। রানু বলল, এত কীসের দুঃখ তোমার যে দুপুরবেলায় কাঁদতে হয় ?

তোমার বুঝি কোনো দুঃখ-টুঃখ নেই ?

উহু। আমি খুব সুখী।

রানু হাসতে লাগল। নীলু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, তুমি বলেছিলে, একটা খুব অদ্ভুত কথা আমাকে বলবে।

বলেছিলাম নাকি ?

হ্যাঁ। আজ সেটা বলতে হবে। তারপর আমি আমার একটা অদ্ভুত কথা বলব।

রানু হাসতে লাগল।

হাসছ কেন রানু ?

তোমার অদ্ভুত কথাটা আমি জানি, এই জন্যে হাসছি।

কী আবেলতাবোল বলছ! তুমি জানবে কী ?

জানি কিন্তু।

নীলু গম্ভীর হয়ে বলল, জানলে বলো তো।

তোমার একজন প্রিয় মানুষ তোমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছে। ঠিক না ?

নীলু দীর্ঘ সময় কোনো কথাবার্তা বলল না। রানু বলল, কি ভাই, বলতে পারলাম তো ?

হ্যাঁ, পেরেছ।

ও কি বাসায় আসবে ?

বলব তোমাকে ' তাব আগে তুমি বলো, তুমি কী করে জানলে ? বিলু তোমাকে বলেছে ? কিন্তু বিলু তো কিছু জানে না।

আমাকে কেউ কিছু বলে নি।

তাহলে তুমি জানলে কী করে ?

আমি স্বপ্ন দেখেছি।

স্বপ্ন দেখেছি মানে ?

নীলু, মাঝে-মাঝে আমি স্বপ্ন দেখি। সেগুলি ঠিক স্বপ্নও নয়। তবে অনেকটা স্বপ্নের মতো। সেগুলি সব সত্যি। গত রাতে স্বপ্নে দেখলাম, তুমি একটি চিঠি পেয়ে খুব খুশি। সেই চিঠিতে একটি লাইন লেখা আছে, যার মানে হচ্ছে— তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে বা এই রকম কিছু।

এসব কি তুমি সত্যি-সত্যি বলছ রানু ?

হ্যাঁ। কবে তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হবে ?

আজ বিকেলে। আমি নিউ মার্কেটের পাইয়ের দোকানের সামনে একটা সবুজ রুমাল হাতে দাঁড়িয়ে থাকব। তিনি আমাকে খুঁজে বের করবেন।

বাহ, খুব মজার ব্যাপার তো।

বানু হাসতে লাগল। এক সময় হাসি থামিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, শুধু গল্প-উপন্যাসেই এসব হয়। বাস্তবে এই প্রথম দেখছি। তোমার ভয় করছে না ?

ভয় করবে কেন ?

তোমার কিন্তু নীলু ভয় করছে। আমি বুঝতে পারছি। বেশ ভয় করছে। করছে না ? নাহ্।

রানু ইতস্তত করে বলল, ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পার। আমি দূরে থাকব।

থাক, দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।

মনে হলো নীলু রানুর কথাবার্তা সহজভাবে নিতে পারছে না। তার চোখ-মুখ গম্ভীর। রানু বলল, কী নেবে?

না। আমার একা যাবার কথা, একাই যাব।

আর যদি গিয়ে দেখ, খুব বাজে ধরনের একটা লোক। তখন কী করবে?

বাজে ধরনের লোক মানে?

অর্থাৎ যদি গিয়ে দেখ দাঁত পড়া, চুল পাকা এক বুড়ো?

তোমার কি সেরকম মনে হচ্ছে?

রানু মাথা দুলিয়ে হাসল, কিছু বলল না। নীলুকে দেখে মনে হলো রানুর ব্যবহারে সে বেশ বিরক্ত হচ্ছে। দুটো বাজতেই সে বলল, এবার তুমি যাও, আমি সাজগোজ করব।

এখনই? চারটা বাজতে তো দেরি আছে।

তোমার মতো সুন্দরী তো আমি না। আমাকে সময় নিয়ে সাজতে হবে।

রানু উঠে পড়ল। নীলু সত্যি সাজতে বসল। কিন্তু কী যে হয়েছে তাব, চোখে পানি এসে কাজল ধুয়ে যাচ্ছে। আইল্যাশ পরার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু একা-একা পরা সম্ভব নয়। অনেক বেছেটেছে একটা শাড়ি পছন্দ কবল। সাদার ওপর নীলের একটা প্রিন্ট। আগে সে কখনো পরে নি।

নীলু মা, কোথাও যাচ্ছ নাকি?

নীলু তাকিয়ে দেখল— বাবা।

কোথাও যাচ্ছ গো মা?

একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। তোমার কি চা লাগবে?

হলে ভালো হতো। থাক, তুই ব্যস্ত।

চা বানাতে আর কয় মিনিট লাগবে! তুমি বসো, আমি বানিয়ে আনছি।

নীলুর বাবা চেয়ার টেনে নীলুর ঘরেই বসলেন।

চা কি চিনি ছাড়া আনব বাবা?

না, এক চামচ চিনি দিস। একটু আধটু চিনি খেলে কিছু হবে না।

নীলু চা নিয়ে এসে দেখে বাবা ঝিমুচ্ছেন। ঝিমুনিরও বেশি, প্রায় ঘুমাচ্ছেন বলা চলে। বাবা যেন বড় বেশি দ্রুত বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন। বড় মায়া লাগল নীলুর।

বাবা, তোমার চা।

কোনো বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছিস মা?

নীলু খানিক ইতস্তত করে বলল, তোমাকে আমি পরে বলব বাবা।

সন্ধ্যার আগেই আসবি তো?

হ্যাঁ, বাবা।

গাড়ি নিয়ে যাবি?

না, গাড়ি নেব না।

নিয়ে যা না। ড্রাইভার তো দিনরাত বসে বসেই মায়না খায়।

বাবা, আমি গাড়ি নেব না।

নীলুর সাজ শেষ হলো ঠিক সাড়ে তিনটায়। আয়নায় তাকিয়ে নিজেকে তার পছন্দই হলো। যে-মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছে, সে বেশ রূপসী। তার মায়া-কাড়া দু'টি চমৎকার চোখ আছে। কিশোরীদের মতো ছোট একটি চিবুক। ভালোই তো! এরকম একটি মেয়েকে পুরুষরা কি ভালোবাসে না? নাকের কাছে মুক্তোর মতো কিছু ঘামের বিন্দু। নীলু তার সবুজ রুমাল দিয়ে সাবধানে ঘাম মুছে ফেলল। তারপর উঠে এলো তিনতলায়।

রানু, রানু।

রানু যেন তৈরি হয়েই ছিল। সে বেরিয়ে এলো সঙ্গে সঙ্গে।

তুমি যাবে বলেছিলে আমার সঙ্গে। চল।

চল।

রানু তালা লাগাল। নীলু মৃদু স্বরে বলল, তুমি জানতে আমি আসব?

হ্যাঁ, জানতাম।

সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করল। কারো দেখা পাওয়া গেল না। এক সময় নীলু বলল, এখন চলে যেতে চাও রানু?

আরো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। তোমাব তো এখনো যেতে ইচ্ছা করছে না।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে না থেকে চল হাঁটি।

তারা বেশ কয়েকবার নিউ মার্কেট চক্কর দিয়ে ফেঁাল। কেউ এগিয়ে এসে বলল না, তোমাদের মধ্যে নীলু কে?

রানু, তোমার কি হাঁটতে টায়ার্ড লাগছে?

না।

রানু, তুমি তো অনেক কিছু বুঝতে পার, তাই না?

মাঝে-মাঝে পারি।

লোকটি এসেছে কিনা বুঝতে পারঃ না?

না নীলু, পারছি না। আমি সব সময় পারি না।

রানু লক্ষ করল, নীলুর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। সে তার সবুজ রুমাল দিয়ে চোখ চেপে ধরল।

রানু গাঢ় স্বরে বলল, কাঁদে না নীলু।

কান্না এলে কী করব?

মনটা শক্ত কর ভাই। পৃথিবীটা খুব ভালো জায়গা নয়।

লোকজন তাকাচ্ছে ওদের দিকে। রানু নীলুর হাত ধরে বাইরে নিয়ে এলো। বেশ অস্বস্তিকর অবস্থা।

তার প্রায় চার দিন পর নীলু একটি চিঠি পেল।

প্রিয় নীলু

ঐদিন তোমাকে দেখলাম। তুমি তো ভারি মিথ্যুক! কেন বললে তুমি দেখতে সুন্দর নও? তোমাকে বর্ষার জলভারে নত আকাশের মতো লাগছিল। আমি ছুটে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তোমার বান্ধবীকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছি। কথা ছিল একা আসবে। তাই নয় কি?

শুধু আমরা দু'জন থাকব। আমাকে দেখে যদি তোমার কথা বলতে ইচ্ছে করে, তাহলে কোনো একটি রেষ্টুরেন্টে বসে দু'জনে চা খেতে-খেতে গল্প করব। আর যদি তোমার আমাকে পছন্দ না হয়, তাহলে তুমি তোমার সবুজ রুমালটি তোমার হ্যান্ডব্যাগে লুকিয়ে ফেলবে।

তোমাকে কিছুই বলতে হবে না। আমি মন খারাপ করব ঠিকই, কিন্তু বিদায় নেব হাসিমুখে, এবং আর কোনো দিনই তুমি আমাকে দেখবে না। তবে নীলু, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, আমাকে তুমি অপছন্দ করবে না। এরকম মনে করার কোনোই কারণ নেই, তবু মনে হচ্ছে। খুব সম্ভব উইশফুল থিংকিং। না মেয়ে?

নীলু চিঠিটি সমস্ত দিনে প্রায় একশ'বার পড়ল এবং প্রতিবারই তাব কাছে নতুন মনে হলো। রাতে সে অদ্ভুত সুন্দর একটি স্বপ্ন দেখল— যেন পূর্বনো আমলের একটি পালতোলা জাহাজে সে বসে আছে। জাহাজের পালটি গাঢ় সবুজ বঙের। প্রচণ্ড বাতাস দিচ্ছে। বাতাসে জাহাজ ছুটে চলেছে বিদ্যুৎগতিতে। নীলুর একটু ভয়ভয় লাগছে, কারণ জাহাজে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। নীলু এক সময় বলল, আমাব ভয় লাগছে এই জাহাজে। আর কেউ কি আছে? সঙ্গে সঙ্গে একটি ভারি পুরুষালি গলা শোনা গেল, ভয় নেই নীলু। আমি আছি। স্বপ্ন এত সুন্দর হয়।

নীলুর ঘুম ভেঙে গেল। বাকি বাত সে আর ঘুমোতে পাবল না। বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বিলু জেগে উঠে বলল, কী হয়েছে রে আপা?

নীলু ভেজা গলায় বলল, পেট ব্যথা করছে। এখন একটু কম। তুই ঘুমো।

১০

অনুফার কাছ থেকে নতুন কিছু জানা গেল না। সেও খুব জোর দিয়ে বলল, বানুব পবনে পায়জামা ছিল এবং মৃত লোকটির পরনেও কাপড় ছিল।

আপনি লোকটিকে দেখেছেন?

হ্যাঁ। কিন্তু আপনি করে বলছেন কেন? মুরকি মানুষ আপনি। আমি আপনার মেয়ের বয়েসী।

লোকটিকে কেমন দেখলে বলো তো!

চাচা, আমার কিছু মনে নেই। সেই সময় আমি ঘোরের মধ্যে ছিলাম। পরদিন আমার বিয়ে।

হ্যাঁ, তা আমি জানি। লোকটিকে নদীর পারে পুঁতে রাখা হয়, তাই না ?

জি। তারপর অনেক দিন কেউ ওদিকে যেত না। সবাই বলাবলি করত, রাতে কী জানি দেখতে পায়।

কী দেখতে পায় ?

ছায়া-ছায়া কী নাকি দেখে। তবে এইসব সত্যি না চাচা। সব মনগড়া।

তাই নাকি ?

জি। ভূতপ্রেত বলে কিছু নেই।

মিসির আলি বড়ই অবাক হলেন। গ্রামের কোনো মেয়ে এইভাবে চিন্তা করে না। এতটা মুক্তচিন্তা তাদের থাকার কথা নয়। মিসির আলি বললেন তুমি পড়াশোনা কত দূর করেছ ?

চাচা, আমি আইএ পড়ার সময় আমার বিয়ে হয়। তারপর আর পড়াশোনা হয় নি। গ্রামে বিয়ে হয়েছে তো! পড়াশোনা করাব আমার খুব শখ ছিল।

মানুষের সব শখ মেটা উচিত নয়। একটা কোনো ডিসস্যাটিসফেকশন থাকা দরকার।

কেন ?

তাহলে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে। সব শখ মিটে গেলে বেঁচে থাকার প্রেরণা নষ্ট হয়ে যায়। যে-সব মানুষের শখ মিটে গেছে, তারা খুব অসুখী মানুষ।

অনুফা চুপ করে রইল। মিসির আলি মৃদু স্বরে বললেন, এবার রানুর কথা বলো।

কী কথা জানতে চান ?

সব কথা।

ও খুব অদ্ভুত মেয়ে। ও মানুষের ভবিষ্যৎ বলতে পারে।

কীভাবে বলে ?

তা জানি না, তবে বলতে পারে। একবার কী হয়েছে, শোনেন। আমি আর ও গল্প করছি, সে হঠাৎ গল্প থামিয়ে বলল— কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের বাড়িতে শ্রীপুরের খালারা বেড়াতে আসবেন। আর সত্যি-সত্যি তাঁরা এলেন।

এটা তো এমনিতেও হতে পারে। মানুষ বেড়াতে আসে না ?

তা আসে। কিন্তু শ্রীপুরের খালা পাঁচ বছর পর প্রথম এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের কী একটা ঝগড়া চলাছিল।

ও, তাই নাকি ?

জি। আবেক গল্প বলি শোনেন, তখন আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে রানুদের ওখানে বেড়াতে গিয়েছি— না, এটা আপনাকে বলা যাবে না।

বলা যাবে না কেন ?

গল্পটা ভালো না।

অনুফার স্বামীকেও মিসির আলি সাহেবের বেশ লাগল। গোয়ারগোবিন্দ ধরনের লোক। স্ত্রীর খুবই অনুগত। সে মিসির আলিকে নিয়ে প্রচুর ঘুরল। লোকটির যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তিও দেখা গেল। মধুপুর থানার ওসি সাহেব ওর কথাতেই পুরনো ফাইলপত্র ঘেঁটে দেখালেন যে, একটি মরা লাশ পাওয়ার খবরের এফআইআর করা হয়েছিল। তখন ওসি ছিলেন ব্রজগোপাল হালদার, তাঁর নোটে লেখা—

একটি কলেরায় মৃত মানুষের লাশ (৩০/৩৫) মধুপুরের নিমশাশা গ্রামে পাওয়া যায়। লাশটির পচন ধরে গিয়েছিল। প্রাথমিক পরীক্ষার পর আমি লাশটি পুঁতিয়া ফেলিবার নির্দেশ দিই। লাশটির কোনো পরিচয় জানা যায় নাই।

মিসির আলি বললেন, কলেরায় মৃত, এটা বোঝা গেল কী করে ?

ওসি সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, সেটা আমি কী করে বলব ? রিপোর্ট তো আমাব লেখা না। ব্রজগোপাল বাবুকে জিজ্ঞেস করেন। তিনি জানবেন।

তাঁকে কোথায় পাওয়া যাবে ?

পুলিশ ডাইরেক্টরেটে খোঁজ করেন। তবে এইসব খোঁজাখুঁজির কোনো অর্থ নেই। দশ বৎসর আগের ঘটনা মনে করে বসে আছেন নাকি ? পুলিশকে আপনারা কী মনে করেন বলেন তো ?

ঘটনাটা অস্বাভাবিক। সে জন্যই হয়তো তার মনে থাকবে।

একটা ডেড বডি পাওয়া গেছে পানিতে, এর মধ্যে আপনি অস্বাভাবিক কী দেখলেন ? বাংলাদেশে প্রতিদিন কয়টা ডেড বডি পাওয়া যায় জানেন ?

জি-না, জানি না।

পুলিশের লাইনে ডেড বডি পাওয়াটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা, বুঝলেন ?

মিসির আলি মধুপুরে আরো একদিন থাকলেন। দেখে এলেন, যে জায়গায় লোকটিকে পোঁতা হয়েছিল সেই জায়গা দেখার মতো কিছু নয়। ঘন কাঁটাবন হয়েছে, যার মানে হচ্ছে এই জায়গাটিকে বেশ কিছু দিন লোকজন ভয়ের চোখে দেখেছে। হাঁটাচলা বন্ধ করে দিয়েছে নিশ্চয়ই।

মিসির আলি অনেকের সঙ্গেই কথা বললেন— যদি নতুন কিছু পাওয়া যায়। নতুন কোনো তথ্য, যা কাজে লাগবে। কিন্তু কিছুই জানা গেল না। দশ বৎসর দীর্ঘ সময়। এই সময়ে মানুষ অনেক কিছু ভুলে যায়।

মধুপুর থেকে তিনি গেলেন রানুদের আদি বাড়িতে। সেখানে যাবার তাঁর একটি উদ্দেশ্য, খুঁজে দেখা— জালালউদ্দিন নামে কাউকে পাওয়া যায় কিনা। এই লোকটিকে পাওয়া খুবই প্রয়োজন।

আনিস লক্ষ করল, রানু ইদানীং বেশ স্বাভাবিক। এর প্রধান কারণ বোধহয় বাড়িঅলার দু'টি মেয়ে। ওদের সঙ্গে সে বেশ মিলেমিশে আছে। গল্পের বই আনছে।

ভালোমন্দ কিছু রান্না হলেই আত্মহ করে নিচে নিয়ে যাচ্ছে। বাড়িঅলাদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা আনিসের পছন্দ নয়। বাড়িঅলাদের সে সব সময় শত্রুপক্ষ বলেই মনে

করে। কয়েকবার ভেবেছিল বলবে মেলামেশাটা কমাতে। না-বলে ভালোই হয়েছে, এতে যদি অসুখটা চাপা পড়ে তো ভালোই।

কাজের একটি ছেলে পাওয়া গেছে— জিতু মিয়া। এই ছেলেটিও রানুকে বেশ ব্যস্ত রাখছে। ছেলেটির বয়স দশ-এগার, তবে মহাবোকা। কোনো কাজই করতে পারে না। করার আশ্রয়ও নেই। রানু ক্রমাগত বকাঝকা করেও কিছু করাতে পারে না। তবে তার সময় বেশ কেটে যায়।

সন্ধ্যাবেলা সে আবার জিতু মিয়াকে নিয়ে পড়াতে বসে। জিতু ঘুমঘুম চোখে পড়ে ‘স্বরে অ স্বরে আ’। এই পড়াটি গত এক সপ্তাহ ধরে চলছে। জিতু মিয়া কিছুই মনে রাখতে পারছে না। কিন্তু তাতে রানুর উৎসাহে ভাটা পড়ছে না।

আনিস একদিন ঠাট্টা করে বলেছে, তুমি দেখি একে বিদ্যাসাগর বানিয়ে ফেলছ! রানু তাতে বেশ রাগ করেছে। গম্ভীর হয়ে বলেছে, ঠাট্টা করছ কেন? বিদ্যাসাগর তো একদিন হতেও পারে।

অবশ্য অদূর-ভবিষ্যতে তেমন কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। ভবিষ্যৎ-বিদ্যাসাগর রোজ রাতেই পড়তে-পড়তে ঘুমিয়ে পড়ছে, এবং রানু প্রেটে খাবার বেড়ে প্রতি রাতেই প্রাণান্ত চেষ্টা চালাচ্ছে। এতটা বাড়াবাড়ি আনিসের ভালো লাগে না। কিন্তু সে কিছু বলে না। থাকুক একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত।

এর মধ্যে একদিন আনিস গিয়েছিল মিসির আলি সাহেবের কাছে। ভদ্রলোক বেশ কিছু দিন ঢাকায় ছিলেন না। সবে ফিরেছেন। তাঁর চোখ হলুদ, গা হলুদ। আনিস অবাধ হয়ে বলেছে, হয়েছে কী আপনার?

জন্ডিস। জন্ডিস বাধিয়ে বসেছি।

বলেন কী!

ইনফেকটাস হেপাটাইটিস। লিভারের অবস্থা কাহিল রে ভাই! আপনার স্ত্রী কেমন আছেন?

ভালো।

আর ভয়টয় পাচ্ছেন না?

জি-না।

খুব ভালো খবর। আমি একটু সুস্থ হলেই যাব আপনার বাসায়।

জি আচ্ছা।

আমি কিছু খোঁজখবর পেয়েছি। মনে হয় আপনার স্ত্রীর সমস্যাটি ধরতে পেরেছি!

তাই নাকি?

হ্যাঁ, একটু ভালো হলেই এ নিয়ে কথা বলব।

রানু মিসির আলি সাহেবের জন্ডিসের খবরে খুবই মন-খারাপ করল।

আহা, বেচারী একা-একা কষ্ট করছে। চল একদিন দেখে আসি। যাবে?

ঠিক আছে, যাব একদিন।

কবে যাবে? কাল যাবে?

এত ব্যস্ত হচ্ছে কেন ? জন্ডিস যখন হয়েছে, তখন বেশ কিছু দিন থাকবে । একদিন দেখে এলেই হবে ।

আমি এই অসুখের ভালো ওষুধ জানি । অড়হড়ের পাতার রস । সকালবেলা এক গ্লাস করে খেলে তিনদিনে অসুখ সেরে যাবে ।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ । আমার দাদা এই ওষুধটা দিতেন । তুমি কিছু অড়হড়ের পাতা ঐ লোকটিকে দিয়ে এসো না ।

ঢাকা শহরে আমি অড়হড়ের পাতা কোথায় পাব ? কী যে বলো !

খুঁজলেই পাবে । জংলা গাছ সব জায়গায় হয় ।

আনিস যথেষ্ট বিরক্ত হলো । রানুর এই একটা প্রবলেম— কোনো একটা জিনিস মাথায় ঢুকলে ওটা নিয়েই থাকবে । আনিস বলল, আচ্ছা, দেখি ।

দেখাদেখি না, তুমি খুঁজবে । আর শোন, কাল তো তোমার অফিস নেই, চল ওনাকে দেখে আসি ।

এত ব্যস্ত কেন ? ভদ্রলোক তো আর পালিয়ে যাচ্ছেন না ।

রানু থেমে থেমে বলল, আমি অন্য একটা কারণে যেতে চাই ।

কী কারণ ?

ভদ্রলোক আমার সম্পর্কে খোঁজখবর করার জন্যে মধুপুর গিয়েছিলেন, কী খোঁজ পেলেন জানতে ইচ্ছা করছে ।

মধুপুরের খবর পেলে কীভাবে ? স্বপ্নে ?

না, স্বপ্নটপ্প না । অনুফা চিঠি দিয়েছে ।

কবে চিঠি পেয়েছ ?

গতকাল ।

আনিস চুপ করে গেল । রানু তার নিজের চিঠিপত্রের কথা আনিসকে কখনো বলে না । বিয়ের পর রানু তার আত্মীয়স্বজনের যত চিঠিপত্র পেয়েছে তার কোনোটিই সে আনিসকে পড়তে দেয় নি । এ নিয়ে আনিসের গোপন ক্ষোভ আছে ।

কী, আমাকে নিয়ে যাবে ?

আমি আগে গিয়ে দেখি ভদ্রলোকের অবস্থা কেমন ।

মিসির আলিকে পাওয়া গেল না । বাড়িতে তার এক ছোট ভাই ছিল, সে বলল, ভাইয়াকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । অবস্থা বেশি ভালো না । বিলরুবিন নাইন পয়েন্ট ফাইভ । লিভার খুবই ড্যামেজড ।

১১

মিসির আলি হাসপাতালে এসেছেন একগাদা বই নিয়ে । তার ধারণা ছিল বই পড়ে সময়টা খুব খারাপ কাটবে না । কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে রকম হয় নি । ডাক্তাররা বই পড়তে নিষেধ করেন নি, কিন্তু দেখা গেল বই পড়া যাচ্ছে না । কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই মাথার ভেতর ভোঁতা এক ধরনের যন্ত্রণা হয় । যন্ত্রণা নিয়ে বই পড়ার কোনো মানে হয় না । তবু

তিনি মৃত্যুবিষয়ক একটি বই পড়ে ফেললেন এবং মৃত্যু ব্যাপারটিতে যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করতে লাগলেন। তার স্বভাবই হচ্ছে কোনো বিষয় একবার মনে ধরে গেলে সে বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্ত পড়াশোনা করতে চেষ্টা করেন।

মৃত্যু সাবজেক্টটি তার পছন্দ হয়েছে, কিন্তু এ বিষয়ে পড়াশোনা করতে পারছেন না। বইপত্র নেই। ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে কিছু থাকার কথা, কিন্তু আনাবেন কাকে দিয়ে? তাকে কেউ দেখতে আসছে না। তিনি এমন কোনো জনপ্রিয় ব্যক্তি নন যে তার অসুস্থতার খবরে মানুষের ঢল নামবে। তাছাড়া অসুস্থের খবর তিনি কাউকে জানান নি। হাসপাতালে ভর্তি হবার ইচ্ছাও ছিল না। কিন্তু ঘরে দেখাশোনার লোক নেই। কাজের মেয়েটি তিনি মধুপুর থাকাকালীন বেশকিছু জিনিসপত্র নিয়ে ভেগে গেছে। এমন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ছাড়া উপায় কী?

বিকেলবেলা তাঁর কাছে কেউ আসে না। সবারই আত্মীয়স্বজন আসে দেখতে, তার কাছে কেউ আসে না। এই সময়টা তিনি চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকেন এবং এখনো মানুষের সঙ্গ পাবার জন্যে তার মন কাঁদে দেখে নিজের কাছেই লজ্জিত বোধ করেন।

আজ সারাদিন মিসির আলিব খুব খারাপ কেটেছে। তার রুমমেট ছাব্বিশ বছরের ছেলেটি সকাল ন'টায় বিনা নোটিশে মারা গেছে। মৃত্যু যে এত দ্রুত মানুষকে ছুঁয়ে দিতে পারে তা তার ধারণাতেও ছিল না। ছেলেটা ভোরবেলায় নাশতা চেয়েছে, তার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্তাও বলেছে। তিনি জিজ্ঞেস কবেছেন, আজ কেমন আছ?

আজ বেশ ভালো।

লিভার ব্যথা করছে না?

নাহ, তবে তলপেটের দিকে একটা চাপা ব্যথা আছে।

খুব বেশি?

না, খুব বেশি না। আপনি এটা কী বই পড়ছেন?

এটা একটা সায়েন্স ফিকশন— 'ফ্রাইডে দি থার্ডি'। বেশ ভালো বই। তুমি পড়বে? জি-না। ইংবেজি বই আমাব ভালো লাগে না। বাংলা উপন্যাস পড়ি।

কাব লেখা ভালো লাগে; এ দেশেব— মানে বাংলায়, কার লেখা তোমার পছন্দ? নিমাই ভট্টাচার্য।

তাই নাকি?

ছেলেটি আর জবাব না দিয়ে কাতবাত্তে থাকে। সকাল সাড়ে আটটায় বলল, একজন ডাক্তার পাওয়া যায় কিনা দেখবেন? তিনি অনেকক্ষণ বোতাম টিপলেন, কেউ এলো না। শেষ পর্যন্ত নিজেই গেলেন ডিউটি রুমে। ফিবে এসে দেখেন ছেলেটি মবে পড়ে আছে।

মৃত্যুর সময় পাশে কেউ থাকবে না, এব চেয়ে ভয়াবহ বোধহয় আর কিছু নেই। শেষ বিদায় নেবার সময় অন্তত কোনো একজন মানুষকে বলে যাওয়া দরকার। নিঃসঙ্গ ঘর থেকে একা-একা চলে যাওয়া যায় না। যাওয়া উচিত নয়। এটা হৃদয়হীন ব্যাপার।

এত দিন যে-ছেলেটি ছিল, এখন আর সে নেই। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই তার সমস্ত চিহ্ন এ-ঘর থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বিছানায় নতুন বালিশ ও চাদর নিয়ে গেছে—

হয়তো সন্ধ্যার মধ্যে কোনো নতুন পেশেন্ট এসে পড়বে।

মিসির আলি সমস্ত দিন কিছু খেতে পারলেন না। বিকেলের দিকে তার গায়ে বেশ টেম্পারেচার হলো। প্রথমবারের মতো মনে হলো একজন-কেউ তাকে দেখতে এলে খারাপ লাগবে না। ভালোই লাগবে। কেউ না-এলে একজন রোগী হলেও আসুক, একা-একা এই কেবিনে রাত কাটানো যাবে না। ঠিক এই সময় ইতস্তত ভঙ্গিতে রানু এসে ঢুকল।

আপনি ভালো আছেন?

না, ভালো না। তুমি কোথেকে?

বাসা থেকে। ইস! আপনার এ কী অবস্থা!

অবস্থা খারাপ ঠিকই। আনিস সাহেব কোথায়?

ও আসে নি, আমি একাই এলাম। ওর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়েছি।

বসো তুমি। ঐ চেয়ারটায় বসো। ফ্লাস্কে চা আছে। খেতে চাইলে খেতে পার।

উঁহু, চা-টা খাব না। আপনার কাছে একটা খবর জানতে এসেছি।

কোন খবরটি?

মধুপুরে গিয়ে আপনি কী জানলেন?

তেমন কিছু জানতে পারি নি।

তবু যা জেনেছেন তা-ই বলুন। আমার খুব জানতে ইচ্ছা করছে। অনুফা লিখেছে, আপনি নাকি হাজার-হাজার মানুষকে নানারকম প্রশ্ন করেছেন।

মিসির আলি হাসলেন।

হাসলে হবে না, আমাকে বলতে হবে।

প্রথম যে-জিনিসটি জানলাম— সেটি হচ্ছে, তুমি অনেকগুলো ভুল তথ্য দিয়েছ।

আমি কোনো তথ্য দিই নি।

তুমি নিজে হয়তো জান না সেগুলো ভুল। যেমন পায়জামা খোলার ব্যাপারটি— এ-রকম কোনো কিছু ঘটে নি।

রানু চোখ লাল করে বলল, ঘটেছে।

না রানু ঘটে নি। এটা তোমার কল্পনা। তাছাড়া তুমি উলঙ্গ একটি ডেড বডির কথা বলেছ— সেটাও ঠিক না।

কিন্তু আমি জানি, এগুলো ঠিক।

না রানু। এইসব তুমি নিজে ভেবেছ এবং আমার ধারণা এ-জাতীয় স্বপ্ন তুমি মাঝে-মাঝে দেখ। দেখ না?

কী রকম স্বপ্নের কথা বলছেন?

মিসির আলি কয়েক মুহূর্তে ইতস্তত করলেন। স্পষ্ট গলায় বললেন, তুমি প্রায়ই স্বপ্ন দেখ না— একজন নগ্ন মানুষ তোমার কাপড় খোলার চেষ্টা করছে?

রানু উত্তর দিল না। মাথা নিচু করে থাকল।

বলো রানু। জবাব দাও।

হ্যা, দেখি।

কখনো কি ভেবে দেখেছ এ-রকম স্বপ্ন কেন দেখ ?

না, ভাবি নি।

আমি ভেবেছি এবং কারণটাও খুঁজে বের করেছি। আজ সেটা বলতে চাই না, অন্য একদিন বলব।

না, আপনি আমাকে আজই বলেন।

মিসির আলি ফ্লাস্ক থেকে চা ঢাললেন। শান্ত স্বরে বললেন, চা খেতে-খেতে শোন। চায়ে ক্যাফিন আছে। ক্যাফিন তোমার নার্ভগুলোকে অ্যাকটিভ রাখবে।

রানু চায়ের পেয়ালা নিল, কিন্তু চুমুক দিল না। মাথা নিচু করে বসে রইল। মিসির আলি ঠাণ্ডা গলায় বলতে লাগলেন, রানু তোমাকে নিয়ে এই গল্পটি আমি তৈরি করেছি। তুমি মন দিয়ে শোন। তুমি যখন বেশ ছোট— নয়, দশ বা এগার বছর বয়স, তখন একজন বয়স্ক লোক তোমাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নির্জন কোনো জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল। তোমাদের গ্রামে এরকম একটা নির্জন জায়গার খোঁজে আমি গিয়েছিলাম। সেখানে জঙ্গলের কাছে একটা ভাঙা বিষ্ণুমন্দির দেখেছি। মনে হয় ঐ জায়গাটাই হবে। কারণ সাপের ভয়ে ওখানে কেউ যেত না। রানু, তুমি কি আমার কথা শুনছ ?

শুনছি।

তারপর সেই বয়স্ক মানুষটি মন্দিরে তোমাকে নিয়ে গেল।

আমাকে কেউ নিয়ে যায় নি। আমি নিজেই গিয়েছিলাম। ঐ মন্দিরে খুব সুন্দর একটি দেবীমূর্তি আছে। আমি ঐ মূর্তি দেখার জন্যে যেতাম।

তারপর কী হয়েছে, বলো।

রানু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তীব্র স্বরে বলল, আমি বলব না, আপনি বলুন।

মিসির আলি শান্ত স্বরে বললেন, ঐ লোকটি তখন টেনে তোমার পায়জামা খুলে ফেলল।

রানুর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

ঐ লোকটির নাম ছিল জালালউদ্দিন।

রানু কিছু বলল না। মিসির আলি বললেন, তোমাব অসুখ শুরু হলো সেদিন থেকে। তোমার মনের মধ্যে ব্যাপারটি গেঁথে গেল, পরবর্তী সময়ে গোসলের সময় যখন মরা মানুষটি তোমার পায়ে লেগে গেল, তখন তোমার মনে পড়ল মন্দিরের দৃশ্য। বুঝতে পারছ ?

রানু জবাব দিল না।

অসুখের মূল কারণটি আলায় নিয়ে এলেই অসুখ সেরে যায়; এ-জন্যেই আমি এটা তোমাকে বললাম। তুমি নিজেও এখন গোড়া থেকে সমস্ত ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা করবে। তোমার অসুখ সেরে যাবে।

রানু মৃদু স্বরে বলল, আপনি কি ঐ লোকটির সঙ্গে কথা বলেছেন ?

বলেছি।

ও কী বলেছে ?

ডেমন কিছু বলে নি।

না, বলেছে, আপনি আমাকে বলতে চাচ্ছেন না। এতটা যখন বলেছেন, তখন বাকিটাও বলুন।

রানু তীব্র চোখে তাকাল। মিসির আলি বললেন, দেখ রানু, আমি খুবই যুক্তিবাদী মানুষ। অলৌকিক কোনো কিছুতে বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি সব কিছুরই একটি ব্যাখ্যা আছে। জালালউদ্দিন যা বলেছে, তাও নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করা যায়।

ব্যাখ্যা পরে করবেন। আগে বলুন, সে কী বলেছে।

সে বলেছে, হঠাৎ সে দেখে মূর্তিটি ছুটে এসে তোমার মধ্যে মিলিয়ে গেছে। তোমার গা থেকে আগুনের হালকা বেরোচ্ছে। জালালউদ্দিন কখন ছুটে পালিয়ে যায়।

আপনি জালালউদ্দিনের কথা বিশ্বাস করেন না ?

না। ওর মনে পাপবোধ ছিল। মন্দিরটির নিয়ে মূর্খ মানুষদের মনে অনেক বকম ভয়-ভীতি আছে। তা থেকেই সে একটা হেলুসিনেশন দেখেছে। তুমি নিজে তো কিছু দেখ নি।

না।

তাহলেই হলো। জালালউদ্দিন কী দেখেছে না-দেখেছে, সেটা তার প্রবলেম, তোমার নয়।

রানু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, কিন্তু একটা জিনিস কি জানেন ? ঐ ঘটনার পব থেকে আমি অসম্ভব সুন্দর হয়ে গেলাম।

মিসির আলি শব্দ করে হাসলেন। হাসতে-হাসতে বললেন, সুন্দর তুমি সব সময়ই ছিলে। ঘটনাটি ঘটেছে তোমার বয়ঃসন্ধিতে। বয়ঃসন্ধির পর মেয়েদের রূপ খুলতে শুরু করে। এখানেও তাঁই হয়েছে।

কিন্তু ঐ দেবীমূর্তিটিকে এর পর আর খুঁজে পাওয়া যায় নি।

তুমি কিন্তু খুব ছেলেমানুষের মতো কথা বলছ বানু। মূর্তিটি চুরি গেছে, কেউ নিয়ে পালিয়ে গেছে, ব্যস।

মূর্তিটি চুরি যায় নি।

তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস কর না— একটা পাথরের মূর্তি তোমার মধ্যে ঢুকে আছে ? কী, কব ?

রানু তীব্র কণ্ঠে বলল, আমার দিকে ভালো কবে তাকিয়ে বলুন, আমাকে কি অনেকটা মূর্তির মতো দেখায় না ?

না, রানু, মূর্তির মতো দেখাবে কেন ? অসম্ভব রূপবতী একটি তরুণী— এর বেশি কিছু না। তোমার মতো রূপবতী মেয়ে এ-দেশেই আছে এবং তারা সবাই রক্ত-মাংসের মানুষ।

রানু উঠে দাঁড়াল। মিসির আলি বললেন, চলে যাচ্ছ রানু ?

হ্যাঁ।

অসুখ সারলে তোমাদের ওখানে একবার যাব।

না, আপনি আসবেন না। আপনার আসার কোনো দরকার নেই।

রানু ঘর ছেড়ে চলে গেল। মিসির আলি ক্ষীণস্বরে বললেন, ভেরি ইন্টারেস্টিং। তার দ্রুত কুণ্ঠিত হলো। তিনি ব্যাপারটি ঠিক বুঝতে পারছেন না। যতটা সহজ মনে হয়েছিল এখন ততটা মনে হচ্ছে না। তিনি মৃত্যুবিষয়ক বইটি আবার পড়তে শুরু করলেন। সাবজেক্টটি তাকে বেশ আকর্ষণ করেছে। ফ্যাসিনেটিং টপিক।

১২

গভীর রাতে আনিস জেগে উঠল। শুনশান নীরবতা চারদিকে। রানু হাত-পা ছড়িয়ে বাচ্চা মেয়ের মতো ঘুমোচ্ছে। জানালার আলো এসে পড়েছে তার মুখে। অদ্ভুত সুন্দর একটি মুখ। শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। আনিস ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে উঠে পড়ল। বাথরুমে যেতে হবে।

বাথরুমে পানি জমে আছে। পাইপ জ্যাম হয়ে গেছে। বাড়িঅলাকে বলতে হবে। আনিস নোংরা পানি বাঁচিয়ে সাবধানে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেই শুনল ঝুমঝুম করে শব্দ হচ্ছে। নূপুর বাজছে যেন। এর মানে কী? মনের ভুল কি? মনের ভুল হবার কথা নয়। বেশ বোঝা যাচ্ছে নূপুর পায়ে দিয়ে ঝুমঝুম করতে-করতে কেউ একজন এ ঘর-ও ঘর করছে। শব্দটা অনেকক্ষণ ধরেই হচ্ছে। মনের ভুল হবার কথা নয়।

বাথরুমের দরজা খুলতেই শব্দটা চট করে থেমে গেল। শুধু একটা তীব্র ফুলের গন্ধ আনিসকে অভিভূত করে ফেলল। একটু আগেও তো এ-বকম সৌরভ ছিল না। আনিসের মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। বিশ্বয়ের ঘোর অবশ্যি বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। আনিসের মনে পড়ল একতলার বাগানে হান্সাহেনার প্রকাণ্ড একটা ঝাড় আছে। বাতাসের ঝাপটায় ফুলের গন্ধই উড়ে এসেছে বাবান্দায়। আনিস কিছুক্ষণ একা একা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল— নূপুরের শব্দ আবার যদি পাওয়া যায়।

দোতলার একটা বাচ্চা ছেলে শুধু কাঁদছে। তার মা তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করছে। একটা ঝিকশা গেল টুনটুন করে। বাস, আর কিছু শোনা গেল না।

শোবার ঘরে রানু ঘুমোচ্ছে। মড়ার মতো। জানালা খোলা। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে ঘরে। আনিস জানালা বন্ধ করতে গিয়ে শুনল, রান্নাঘর থেকে জিতু মিয়া সাড়াশব্দ দিচ্ছে। কান্না চাপার আওয়াজ।

জিতু মিয়া।

জিতু ফাঁপয়ে উঠল। আনিস রান্নাঘরে ঢুকে বাতি জ্বালাল। জিতু মশারির ভেতর জবুথবু হয়ে বসে আছে।

জিতু, কী হয়েছে রে?

কিছু হয় নাই।

বসে আছিস কেন?

ঘুম আহে না।

স্বপ্ন দেখেছিস?

জিতু মাথা নাড়ল ।

কী স্বপ্ন ?

একজন মাইয়া মানুষ পাকের ঘরে হাঁটতে আছিল ।

এই দেখেছিস স্বপ্নে ?

স্বপ্নে দেখি নাই । নিজের চোখে দেখলাম ।

দূর ব্যাটা, অন্ধকারে তুই মানুষ দেখলি কীভাবে ? যা, ঘুমো ।

জিতু শুয়ে পড়ল । আনিস বলল, ভয়ের কিছু নেই, আমি জেগে আছি, ঘুমো তুই ।
আচ্ছা ।

আর শোন, রান্নাঘরে বাতি জ্বালানো থাকুক ।

আচ্ছা ।

জিতু শুয়ে পড়ল । কিছুক্ষণের মধ্যেই তার নিঃশ্বাস ভারি হয়ে এলো । আনিস একটি সিগারেট ধরাল । ঘুম চটে গেছে । তাকে এখন দীর্ঘ সময় জেগে থাকতে হবে । এক পেয়ালা চা খেতে পারলে মন্দ হতো না । রাত তো বাজে প্রায় সাড়ে তিনটা । বাকি রাতটা তার জেগেই কাটবে মনে হয় । সিগারেট টানতে ভালো লাগছে না । পেটের ভেতর পাক দিয়ে উঠছে ।

ঘুমের মধ্যে রানু শব্দ করে হাসল । আনিস মৃদু স্বরে ডাকল, এই রানু । রানু খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, কী ?

জেগে আছ নাকি ?

হ্যাঁ ।

কী আশ্চর্য, কখন জাগলে ?

অনেকক্ষণ । তুমি বাথরুমে গেলে । বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকলে ।

আমাকে ডাকলে না কেন ?

শুধু-শুধু ডাকব কেন ?

আনিস সিগারেট টানতে লাগল । রানু বলল, বড্ড গরম লাগছে । জানালা বন্ধ করলে কেন ?

গরম কোথায় ? বেশ ঠাণ্ডা তো !

আমার গরম লাগছে । ফ্যানটা ছাড় না ।

এই ঠাণ্ডার মধ্যে ফ্যান ছাড়ব কী, কী যে বলো !

রানু ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তুমি যখন বাথরুমে ছিলে তখন কি নৃপুরের শব্দ শুনেছ ?

আনিস ঠাণ্ডা স্বরে বলল, না তো, কেন ?

না, এমনি । আমি শুয়ে-শুয়ে শুনছিলাম ।

ঘুমাও রানু ।

আমার ঘুম আসছে না ।

ঘুম না এলে উঠে বসো, গল্প করি । চা খাওয়া যেতে পারে, কী বলো ?

রানু উঠে বসল কিন্তু জবাব দিল না। আনিস দেখল রানু কোন ফাঁকে গায়ের কাপড় খুলে ফেলেছে। ক্লান্ত স্বরে বলল, বড্ড গরম লাগছে। তুমি আমার দিকে তাকিও না। প্লিজ!

এইসব কী রানু? ঘরে একটা বাচ্চা ছেলে আছে।

কী করব, বড্ড গরম লাগছে। তুমি বরং রান্নাঘরের বাতি নিভিয়ে সব অন্ধকার করে দাও।

না, বাতি জ্বালানো থাক।

আনিস দ্বিতীয় সিগারেট ধরাল। রানু বলল, আমাদের গ্রামে একটা মন্দির আছে, তার গল্প এখন শুনবে না?

আহ, মন্দির-ফন্দিরের গল্প এখন শুনব না।

আহ, শোন না! আমার বলতে ইচ্ছে করছে। আমি যখন খুব ছোট, তখন একা একা যেতাম সেখানে।

কী মন্দির? কালীমন্দির?

নাহ, বিষ্ণুমন্দির বলত ওরা। তবে কোনো বিষ্ণুমূর্তি ছিল না। একটি দেবী ছিল। হিন্দুরা বলত রুক্মিনী দেবী।

তুমি মন্দিরে যেতে কী জন্যে?

এমনি যেতাম। ছোট বাচ্চা পুতুল খেলে না?

কী করতে সেখানে?

দেবীমূর্তির সাথে গল্পগুজব করতাম। ছেলেমানুষি খেলা আর কী!

বলতে-বলতে রানু খিলখিল কবে হেসে উঠল, আনিস স্পষ্ট শুনল সঙ্গে-সঙ্গে ঝমঝম করে কোথাও নূপুর বাজছে। রানু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, শুনতে পাচ্ছ?

কী শুনব?

নূপুরের শব্দ শুনছ না?

আনিস দৃঢ় স্বরে বলল, না। তুমি ঘুমাও রানু।

আমার ঘুম আসছে না।

শুয়ে থাক। তুমি অসুস্থ।

রানু ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ, আমি অসুস্থ।

তোমাকে খুব বড় ডাক্তার দেখাব আমি।

আচ্ছা।

এখন শুয়ে থাক।

রানু মৃদু স্বরে বলল, আমি ঐ দেবীকে গান গেয়ে শোনাতাম।

ঐ সব অন্য দিন শুনব।

আজ রাতে আমার বলতে ইচ্ছে করছে।

আনিস এসে রানুর হাত ধরল। গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। আনিস অবাক হয়ে বলল, তোমার গা তো পুড়ে যাচ্ছে!

হুঁ, বড্ড গরম লাগছে। ফ্যানটা ছাড়বে ?

আনিস উঠে গিয়ে জানালা খুলে দিল। ঘর ভর্তি হয়ে গেল ফুলের গন্ধে। আর তখনি রানু অত্যন্ত নিচু গলায় গুনগুন করে কী যেন গাইতে লাগল। অদ্ভুত অপার্থিব কোনো-একটা সুর যা এ-জগতের কিছু নয়। অন্য কোনো ভুবনের। রান্নাঘর থেকে জিতু ডাকতে লাগল, ও ভাইজান, ভাইজান!

আনিস রানুকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে গায়ের চাদর টেনে দিল। জিতুকে বলল, এ ঘরে যেন না আসে। তারপর নেমে গেল নিচে, বাড়িঅলার মেয়েটিকে খবর দিয়ে আসতে।

নীলু এলো সঙ্গে সঙ্গে। আনিস দেখল রানু শিশুর মতো ঘুমাচ্ছে। জিতু মিয়া শুধু জেগে আছে। কাঁদছে ব্যাকুল হয়ে। নীলুর সঙ্গে তার বাবাও আসছেন। তিনি অবাক হয়ে বললেন, হয়েছেটা কী ? আনিস ভাঙা গলায় বলল, বুঝতে পারছি না, কেমন যেন করছে।

কী করছে ?

আনিস জবাব দিল না। নীলু বলল, বাবা, তুমি শুয়ে থাক গিয়ে, আমি এখানে থাকি। রাত তো বেশি নেই। ভদ্রলোক কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নিচে নেমে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, হাসপাতালে নিতে হলে বলবেন, ড্রাইভারকে ডেকে তুলব।

‘জি আচ্ছা।

রানু বাকি রাতটা ঘুমিয়ে কাটাল। একবারও জাগল না। নীলু সারাক্ষণ তাব পাশে রইল। আনিসের সঙ্গে তার কথাবার্তা কিছু হলো না। আনিস বসার ঘরের সোফায় বসে ঝিমুতে লাগল।

১৩

মিসির আলি লোকটির ধৈর্য প্রায় সীমাহীন। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই তিনি দ্বিতীয় দফায় রানুদের গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তার সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এক ভদ্রলোক, জয়নাল সাহেব। উদ্দেশ্য রুকমিনী দেবীর মন্দির সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।

জয়নাল সাহেব মন্দির দেখে বিশেষ উল্লসিত হলেন না। তিন শ’ বৎসরের বেশি এর বয়স হবে না। এ রকম ভগ্নস্তুপ এ দেশে অসংখ্য আছে। মিসির আলি বললেন, তেমন পুরনো নয় বলছেন ?

না রে ভাই। ইটের সাইজ দেখলেই বুঝবেন। ভেঙে টেঙে কী অবস্থা হয়েছে দেখেন!

যত্ন হয় নি। মন্দির যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি হয়তো মারা গেছেন কিংবা তার উৎসাহ মিইয়ে গেছে।

গ্রামের লোকজনের কাছ থেকে অল্প কিছু তথ্য পাওয়া গেল— পালবাবুদের প্রতিষ্ঠিত মন্দির। পালরা স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তার পরপরই তাদের ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হয়। তিন-চার বছরের মধ্যে পালরা নির্বংশ হয়ে পড়ে। দেবীকে তুষ্ট করার জন্যে তখন এক রাতে কুমারী বলির আয়োজন করা হয়। বারো বছরের একটা

কুমারীকন্যাকে অমাবস্যার রাত্রিতে মন্দিরের সামনে বলি দেওয়া হয়। দেবীর তুষ্টি হয় না তাতেও। পাথরের মূর্তি এত সহজে বোধহয় তুষ্টি হয় না। তবে গ্রামের মানুষেরা নাকি বলি দেওয়া মেয়েটিকে এর পর থেকে গ্রামময় ছুটোছুটি করতে দেখে। ময়মনসিংহ থেকে ইংরেজ পুলিশ সুপার এসে মন্দির তালাবন্ধ করে পালদের দুই ভাইকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যান।

পালবা অত্যন্ত ক্ষমতাবান ছিল। কাজেই ছাড়া পেয়ে এক সময় আবার গ্রামে ফিরে আসে। কিন্তু মন্দির তালাবন্ধই পড়ে থাকে।

ইতিহাস এইটুকুই। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মূর্তি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা গেল না। দু-এক ঘর নিম্নবর্ণের হিন্দু যারা ছিল, তারা বিশেষ কিছু বলতে পারে না। হরিশ মণ্ডল বলল, বাবু, আমরা কেউ ঐদিকে যাই না। ঐ মন্দিরে গেলে নির্বংশ হতে হয়, কে যাবে বলেন?

আপনি তো শিক্ষিত লোক, এইসব বিশ্বাস করেন?

করি না, কিন্তু যাইও না।

মূর্তিটা আপনি দেখেছেন?

আমি দেখি নাই, তবে আমার জ্যাঠা দেখেছে।

তিনি কি নির্বংশ হয়েছেন?

না, তাব তিন ছেলে। এক ছেলে নান্দিনা হাইস্কুলের হেডমাস্টার।

মূর্তিটা কেমন ছিল বলতে পারেন?

স্বেতপাথরের মূর্তি। কৃষ্ণনগরের কারিগরের তৈরি। একটা হাত ভাঙা ছিল।

মূর্তি নাকি হঠাৎ উধাও হয়েছে?

কেউ চুরিটুর কবে নিয়ে বিক্রি করে ফেলেছে। গ্রামে চোরের তো অভাব নেই। এ-রকম একটা মূর্তিতে হাজারখানেক টাকা হেসেখেলে আসবে। সাহেবরা নগদ দাম দিয়ে কিনবে।

আচ্ছা, একটা বাচ্চা মেয়েকে যে বলি দেওয়া হয়েছিল, সে নাকি অমাবস্যার রাত্রে ঘুরে বেড়ায়?

বলে তো সবাই। চিৎকার কবে কাঁদে। আমি শুনি নাই। অনেকে শুনেছে।

অমাবস্যার রাত্রে একটা পাঁচ-ব্যাটার টর্চ আর একটা মোটা বাঁশের লাঠি নিয়ে মন্দিরের চাতালে বসে রইলেন। তিনি কিছুই শুনলেন না। শেয়ালের ডাক শোনা গেল অবশ্য। শেষ রাত্রে দিকে প্রচণ্ড বাতাস বইতে লাগল। বাতাসে শিস দেবার মতো শব্দ হলো। সে-সব নিতান্তই লৌকিক শব্দ। অন্য জগতের কিছু নয়। রাত শেষ হবার আগে-আগে বর্ষণ শুরু হলো। ছাতা নিয়ে যান নি। মন্দিরের ছাদ ভাঙা। আশ্রয় নেবার জায়গা নেই। মিসির আলি কাকভেজা হয়ে গেলেন।

ঢাকায় ফিবলেন প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে। ডাক্তার পরীক্ষা করে শুকনো মুখে বললেন, মনে হচ্ছে নিউমোনিয়া। একটা লাংস এফেকটেড, ভোগাবে।

মিসির আলিকে সত্যি-সত্যি ভোগাল। তিনি দীর্ঘ দিন শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন।

বইপাড়াতে এ সময় লোকজন তেমন থাকে না। আজ যেন আরো নির্জন। নীলু একা-একা কিছুক্ষণ হাঁটল। তার খুব ঘাম হচ্ছে। বারবার সবুজ ক্রমালটি বের করতে হচ্ছে। চারটা দশ বাজে। চিঠিতে লিখেছে সে চারটার মধ্যেই আসবে, কিন্তু আশেপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। নীলু অবশ্যি কারো মুখের দিকে তাকাতেও পারছে না। কাউতে তাকাতে দেখলেই বুকের মধ্যে ধক করে উঠছে।

নীলু একটা বইয়ের দোকানে ঢুকে পড়ল। গল্পের বই তার তেমন ভালো লাগে না। ভালো লাগে বিলুব। বিলুর জন্যে একটা কিছু কিনলে হয়। কিন্তু কী কিনবে? সবই হয়তো ওর পড়া। ঐ দিন শীর্ষেন্দুর কী-একটা বইয়ের কথা বলছিল। নামটা মনে নেই।

আচ্ছা, আপনাদের কাছে শীর্ষেন্দুর কোনো বই আছে?

জি-না। আমরা বিদেশী বই রাখি না।

নীলু অন্য একটা ঘরে ঢুকল। শুধু-শুধু দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। সে একটা কবিতার বই কিনে ফেলল। অপরিচিত কবি, তবে প্রচ্ছদটি সুন্দর। একটি মেয়ের ছবি। সুন্দর ছবি। নামটি সুন্দর— প্রেম নেই। কেমন অদ্ভুত নাম। প্রেম নেই আবার কী? প্রেম থাকবে না কেন?

দাড়িঅলা একজন রোগা ভদ্রলোক তখন থেকেই তার দিকে তাকাচ্ছে। লোকটির কাঁধে একটি ব্যাগ। এই কি সে! নীলুর মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। নীলু বইয়ের দাম দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এলো। তার পেছনে ফেরারও সাহস নেই। পেছনে ফিরলেই সে হয়তো দেখবে বুড়ো দাড়িঅলা গুটিগুটি আসছে।

না, লোকটি আসছে না। নীলুর মনে হলো, ভয়ানক মোটা এবং বেঁটে একজন কে যেন তাকে অনুসরণ করছে। তার দিকে তাকাচ্ছে না, কিন্তু আসছে তার পিছুপিছু। নীলুর তৃষ্ণা পেয়ে গেল। বড্ড টেনশান। বাড়ি ফিরে গেলে কেমন হয়? কিন্তু বাড়ি ফিবতে ইচ্ছে করছে না। নীলু ঘড়ি দেখল, পাঁচটা পাঁচ। তার মানে কি যে সে আসবে না? কথা ছিল নীলু থাকবে ঠিক এক ঘন্টা।

সে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। ভালোই হয়েছে। দেখা না-হওয়াটাই বোধহয় ভালো। দেখা হবার মধ্যে একটা আশাভঙ্গের ব্যাপার আছে। না-দেখার রহস্যময়তাটাই না হয় থাকুক। নীলু ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল।

নীলু।

নীলু দাঁড়িয়ে পড়ল।

একটু দেরি হয়ে গেল। তুমি ভালো আছ নীলু?

চকচকে লাল টাই-পবা যে-ছেলেটি হাসছে, সে কে? লম্বা স্বাস্থ্যবান একটি তরুণ। ঝলমল করছে। তার লাল টাই উড়ছে। বাতাসে মিষ্টি ঘ্রাণ আসছে। সেন্টেব গন্ধ। পুরুষ মানুষের গা থেকে আসা সেন্টের গন্ধ নীলুর পছন্দ নয়। কিন্তু আজ এত ভালো লাগছে কেন?

চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছ কেন? কিছু বলো।

আপনি বলেছিলেন আপনি বুড়ো।

আমরা সবাই কিছু-কিছু মিথ্যা বলি। আমাকে নীলু নামের একটি মেয়ে লিখেছিল, সে দেখতে কুৎসিত।

লোকটি হাসছে হা হা করে। এত সুন্দর করেও মানুষ হাসতে পারে। নীলুর এক ধরনের কষ্ট হতে লাগল। মনে হতে লাগল সমস্তটাই একটা সুন্দর স্বপ্ন, খুবই ক্ষণস্থায়ী। যেন এক্ষুণি স্বপ্ন ভেঙে যাবে। নীলু দেখবে সে জেগে উঠেছে, পাশের বিছানায় বিলু ঘুমাচ্ছে মশারি না ফেলে। কিন্তু সে-রকম কিছু হলো না। ছেলেটি হাসিমুখে বলল, কোথাও বসে এক কাপ চা খেলে কেমন হয়? খাবে?

নীলু মাথা নাড়ল— সে খাবে।

তুমি কিন্তু সবুজ রুমালটি ব্যাগে ভরে ফেলছ। আমি যেতে ঠিক সাহস পাচ্ছি না।

নীলু অস্বাভাবিক ব্যস্ত হয়ে রুমাল বের করতে গেল। একটা লিপস্টিক, একটা ছোট চিরুনি, কিছু খুচরো পয়সা গড়িয়ে পড়ল নিচে। ছেলেটি হাসিমুখে সেগুলো কুড়োচ্ছে। নীলু মনে-মনে বলল— যেন এটা স্বপ্ন না হয়। আর স্বপ্ন হলেও যেন স্বপ্নটা অনেকক্ষণ থাকে। নীলুর খুব কান্না পেতে লাগল।

নিউ মার্কেটের ভেতর চা খাওয়ার তেমন ভালো জায়গা নেই। ওরা বলাকা বিল্ডিংয়ের দোতলায় গেল। চমৎকার জায়গা! অন্ধকার-অন্ধকার চারদিক। পরিচ্ছন্ন টেবিল। সুন্দর একটি মিউজিক হচ্ছে।

চায়ের সঙ্গে কিছু খাবে নীলু?

নাহ্।

এরা ভালো সমুচা করে। সমুচা দিতে বলি? আমাব খিদে পেয়েছে। কী, বলব? বলুন।

ছেলেটি হাসল। নীলুর খুব ইচ্ছা কবছিল, জিজ্ঞেস করে— হাসছ কেন তুমি? আমি কি হাস্যকর কিছু করেছি? কিন্তু নীলু কিছু বলল না। ছেলেটি হাসতে-হাসতে বলল, আসলে আমি বিজ্ঞাপনটা মজা করবার জন্যে দিয়েছিলাম, কেউ জবাব দেবে ভাবি নি।

আমি ছাড়া কেউ কি লিখেছিল?

তা লিখেছে। মনে হচ্ছে এ দেশের মেয়েদের কাজকর্ম বিশেষ নেই। সুযোগ পেলেই ওরা চিঠি লেখে। এই কথা বললাম বলে তুমি আবার রাগ করলে না তো?

নাহ্।

ওউ। আমি কিন্তু শুধু তোমার চিঠির জবাব দিয়েছি। অন্য কারোর চিঠির জবাব দিই নি। আমার কথা বিশ্বাস করছ তো?

করছি।

বেয়াবা চায়েব পট দিয়ে গেল। ছেলেটি বলল, দাও, আমি চা বানিয়ে দিচ্ছি। ঘরে বানাবে মেয়েবা, কিন্তু বাইরে পুরুষেরা— এ-ই নিয়ম।

নীলু লক্ষ করল, ছেলেটি তার কাপে তিন চামচ চিনি দিয়েছে। নীলু একবার লিখেছে সে চায়ে তিন চামচ চিনি খায়। ছেলেটি সেটা মনে রেখেছে। কী আশ্চর্য!

চায়ে এত চিনি খাওয়া কিন্তু ভালো না।

নীলু কিছু বলল না।

এর পর থেকে চিনি কম খাবে ।

নীলু ঘাড় নাড়ল ।

তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে রইল । নীলু একবার বলল, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, উঠি ?

ছেলেটি বলল, আরেকটু বসো, আমি বাসায় পৌঁছে দেব, আবার সঙ্গে গাড়ি আছে ।
নীলু আর কিছু বলল না ।

একটু দেরি হলে তোমাকে আবার বাসায় বকবে না তো ?

নাহ্ বকবে না । আমি মাঝে-মাঝে অনেক রাত করে বাসায় ফিরি ।

সেটা ঠিক না নীলু । শহর বড় হচ্ছে, ক্রাইম বাড়ছে । ঠিক না ?

হ্যাঁ, ঠিক ।

ঐ দিন কী হলো জানো— আমার পরিচিত এক মহিলার কান থেকে টেনে দুল নিয়ে গেছে, রক্তারক্তি কাণ্ড!

আমি বাইরে গেলে গয়না-টয়না পরি না ।

না-পর্যাই উচিত । আচ্ছা নীলু, তুমি কি আজ তোমার বাবার সঙ্গে আমাকে আলাপ করিয়ে দেবে ?

আপনি যদি চান, দেব ।

আমি নিশ্চয়ই চাই । তুমি কি চাও ?

চাই, বলতে গিয়ে নীলুর চোখ ভিজে উঠল । ছেলেটিকে এখন কত-না পরিচিত মনে হচ্ছে! সে যদি এখন হাত বাড়িয়ে নীলুর হাত স্পর্শ করে, তাহলে কেমন লাগবে নীলুর ? ভালোই লাগবে । কিন্তু ছেলেটি অত্যন্ত ভদ্র । সে এমন কিছুই করবে না ।

নীলু, আমি তোমার জন্যে একটা উপহার এনেছিলাম । কিন্তু তার আগে বলো, তুমি কী এনেছ ? তুমি বলেছিলে লাল টাই আনবে । ভুলে গেছ, না ?

না, ভুলব কেন ?

আমি তোমার জন্যেই লাল টাই পরে এসেছি । যদিও লাল রঙ আমার পছন্দ নয় । আমার পছন্দ হচ্ছে— নীল ।

নীল আমারও পছন্দ ।

তবে হালকা নীল, কড়া নীল নয় ।

নীলু এই প্রথম অল্প হাসল । হালকা নীল তার নিজেরও পছন্দ । ছেলেটি হাসতে-হাসতে বলল, আমার সবচে' অপছন্দ হচ্ছে সবুজ রঙ । কিন্তু দেখ, আজ সবুজ রঙটাও খারাপ লাগছে না ।

তারা উঠে দাঁড়াল সাড়ে আটটায় দিকে । হেঁটে-হেঁটে এলো নিউমার্কেটের গেটে । ছোট্ট একটা হোন্ডা সিভিক সেখানে পার্ক করা । ছেলেটি ঘড়ি দেখে বলল, রাত কি বেশি হয়ে গেল নীলু ?

না, বেশি হয় নি ।

তোমার বাবা দুশ্চিন্তা না-করলে হয় । আমি চাই না আমার জন্যে কেউ বকা খাক । অবশ্যি এক-আধ দিন বকা খেলে কিছু যায়-আসে না, কী বলো ?

নীলু হাসল। ছেলেটিও হাসল। মার্জিত হাসি।

সরাসরি বাসায় যাবে, নাকি যাবার আগে আইসক্রিম খাবে? ধানমণ্ডিতে একটা ভালো আইসক্রিমের দোকান দিয়েছে।

আজ আর যাব না।

ঠিক আছে, চল বাসায় পৌঁছে দিই।

ছেলেটি নীলুকে তাদের গেটের কাছে নামিয়ে দিল। নীলুর খুব ইচ্ছে করছিল তাকে বসতে বলে, কিন্তু তার বড্ড লজ্জা করল। বিলু নানান প্রশ্ন শুরু করবে।

১৫

স্যার, ভেতরে আসব?

এসো। কী ব্যাপার?

মিসির আলি মেয়েটিকে ঠিক চিনতে পারলেন না। তিনি কখনো তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের চিনতে পারেন না।

স্যার, আমার নাম নীলু, নীলুফার।

ও, আচ্ছা।

মিসির আলি পরিচিত ভঙ্গিতে হাসলেন। কিন্তু নামটি তার কাছে অপরিচিত লাগছে। এও এক সমস্যা। কারো নাম তিনি মনে রাখতে পারেন না। তার ঙ্গ কুণ্ঠিত হলো। নামে মনে না-করতে পারার একটিই কারণ—মানুষের প্রতি তার আগ্রহ নেই। আগ্রহ থাকলে নাম মনে থাকত।

স্যার, আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন? আমি সেকেন্ড ইয়ারের। এক দিন এসেছিলাম আমরা চার বন্ধু।

ও হ্যাঁ। এসেছিলে তোমরা। মনে পড়েছে। আজ কী ব্যাপার?

মেয়েটি ইতস্তত করতে লাগল। তার মানে কী? কমবয়েসী মেয়েদের তিনি এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেন। তরলমতি মেয়েরা মাঝে-মাঝে অনেক অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা করে বসে।

তোমার কী ব্যাপার, বলো।

স্যার, আমি ঐ ইএসপির টেস্টটা আবার দিতে চাই।

একবার তো দিয়েছি। আবার কেন?

মিসির আলি বিস্মিত হলেন। এই মেয়েটির মতিগতি তিনি বুঝতে পারছেন না। স্যাব, আমার মনে হয়, এবার পরীক্ষা করলে দেখা যাবে—আমার ইএসপি আছে।

এ-রকম মনে হবার কারণ কী?

মেয়েটি উত্তর না দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। লক্ষণ ভালো নয়। মিসির আলি গম্ভীর গলায় বললেন, এখন আমি একটু ব্যস্ত আছি। অন্য একদিন এসো।

মেয়েটি তবুও কিছু সময় দাঁড়িয়ে রইল।

তুমি কি অন্য কিছু বলতে চাও?

জি-না স্যার। আমি যাই। স্নামালিকুম।

মিসির আলি গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। এ মেয়েটিকে প্রশ্ন দেওয়া ঠিক হবে না।
এরা সহজেই একটা ঝামেলা বাধিয়ে দিতে পারে। এ-রকম সুযোগ দেওয়া ঠিক না।

বারোটায় একটা ক্লাস ছিল। মিসির আলি গিয়ে দেখলেন কোনো ছাত্র-ছাত্রী নেই।
কোনো স্ট্রাইক হচ্ছে কি? এ-রকম কিছু শোনেন নি। সামনে হয়তো টার্ম পরীক্ষা আছে।
টার্ম পরীক্ষা থাকলে ছাত্ররা দল বেঁধে আসা বন্ধ করে দেয়। মিসির আলি ক্রুঁচকে খালি
ক্লাসে মিনিট পাঁচেক বসে রইলেন। গত রাতে অসুস্থ শরীরে এই ক্লাসটির জন্যে
পড়াশোনা করেছেন। এ-অবস্থা হবে জানলে সকাল-সকাল শুয়ে পড়তে পারতেন।
ছাত্রশূন্য একটি ক্লাসে তিনি খাতাপত্র নিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে আছেন— হাস্যকর দৃশ্য।
অনেকেই করিডোর দিয়ে হাঁটবার সময় তাকে কৌতূহলী হয়ে দেখল। পাগল-টাগল
ভাবছে বোধহয়। মিসির আলি উঠে পড়লেন।

আজকের দিনটিই শুরু হয়েছে খারাপভাবে। একটি কাজও ঠিকমতো হচ্ছে না।
মিসির আলি ক্রমেই বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। তার কপালের মাঝখানে ব্যথা শুরু
হলো। এই উপসর্গটি নতুন। ব্লাড-প্রেসাব-ক্রিসার হয়েছে বোধহয়। ডাক্তার দেখাতে
হবে।

তিনি বাড়ি ফিরলেন তিনটার দিকে। এই অসময়েও বসার ঘরে কে যেন বসে
আছে। সমস্ত দিনটিই যে খারাপ যাবে, এটা হচ্ছে তার প্রমাণ। গ্রামের বাড়ি থেকে
টাকাপয়সা চাইতে কেউ এসেছে নির্ঘাত।

কে?

জি, আমি আনিস।

আনিস সাহেব, আপনি এই সময়ে! অফিস নেই?

ছুটি নিয়ে এলাম।

ব্যাপার কী?

রানুর শরীরটা বেশি খারাপ। ভাবলাম, আপনার সঙ্গে দেখা কবে যাই।

ভালোই কবেছেন। বসেন, চা-টা দিয়েছে?

জি, চা খেয়েছি। আপনার ভাই ছিলেন এতক্ষণ।

বসুন, আমি কাপড় ছেড়ে আসি।

লোকটি জড়সড় হয়ে বসে আছে। মিসিব আলি লক্ষ করলেন, তার চোখেব নিচে
কালি পড়েছে। তার মানে রাতে ঘুমাতে পাবছে না। এ রকম হওয়াব কথা নয়। মিসিব
আলি চিন্তিত মুখে ভেতবে ঢুকলেন। তার ফিবে আসতে অনেক সময় লাগল।

এখন বলেন, ব্যাপাবটা কী?

আনিস ইতস্তত করে বলল, ভূতপ্রেত বলে সত্যি কিছু আছে?

এই কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

আনিস মুখ কালো করে বলল, অনেক রকম কাণ্ডকারখানা হচ্ছে। আমি কনফিউজড
হয়ে গেছি।

অর্থাৎ এখন ভূতপ্রেত বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন?

আনিস চুপ করে রইল।

এর কারণটা বলেন, শুনি।

নানারকম শব্দ হয় ঘরে।

তাই নাকি? আপনি নিজে শোনেন?

জি, শুনি। গন্ধও পাই, ফুলের গন্ধ।

আপনি পান, না আপনার স্ত্রী পান?

রানু প্রথম পায়, তারপর আমি পাই।

মিসির আলি চুরুট ধরালেন। আনিস বলল, গত রাতে ঘরের মধ্যে কেউ যেন নূপুর পায়ে হাটছিল।

এই নূপুরের শব্দ প্রথম কে শোনে? আপনার স্ত্রী?

জি।

তারপর আপনাকে বলার পর আপনি শুনতে পান।

জি।

আনিস সাহেব এটাকে বলা হয় ইনডিউসড অডিটরি হেলসিনেশন। আপনার মন দুর্বল। আপনার স্ত্রী যখন বলেন শব্দ শুনতে পাচ্ছেন, তখন আপনিও তা শুনতে থাকেন। ব্যাপারটি আপনার মনোজগতে। আসলে কোনো শব্দ হচ্ছে না।

আনিস দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, আপনি যদি একবার আসেন আমাদের বাসায়, আপনি নিজেও শুনবেন।

না ভাই, আমি শুনব না। আমি খুব শক্ত ধরনের মানুষ। খুবই যুক্তিবাদী লোক আমি।

আপনি আসেন-না একবার।

ঠিক আছে, যাব।

কবে আসবেন? আজ আসতে পারবেন?

আমি কাল-পরশুর মাপ্য একবার যাব।

আমাদের বাড়িঅলার খুব সুন্দর ফুলের বাগান আছে। প্রচুর গোলাপও আছে। বিকেলের দিকে গেলে সেটাও দেখতে পারবেন।

মিসির আলি কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, বড় ফুলের বাগান?

জি।

আনিস সাহেব, এমন কি হতে পারে না, বাতাসে নিচের বাগান থেকে ফুলের সৌরভ ভেসে আসে, সেই সৌরভকে আপনি একটি আধ্যাত্মিক রূপ দেন? হতে পারে?

পারে, কিন্তু শব্দটা?

কোনো একটা ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আছে। মস্তিষ্ক খুব অদ্ভুত জিনিস, আনিস সাহেব। সে আপনাকে এমন সব জিনিস দেখাতে বা শোনাতে পারে, যার আসলে কোনো অস্তিত্ব নেই। আপনি কি উঠছেন?

জি।

আচ্ছা ঠিক আছে, যান। আমার নিজেরও মাথা ধরেছে। দুটো প্যারাসিটামল খেয়েছি, লাভ হচ্ছে না। জ্বরও আসছে বলে মনে হয়। শরীরটা গেছে। বেশি দিন বাঁচব না।

১৬

পত্রিকা খুলে নীলু অবাক হলো। সেই বিজ্ঞাপনটি আবার ছাপা হয়েছে। কথাগুলো এক। জিপিও বক্স নম্বরও ৭৩। শিরোনামটিও আগের মতো— কেউ কি আসবেন? এর মানে কী? নীলুব ধারণা ছিল, এই বিজ্ঞাপনটি আর কোনো দিন ছাপা হবে না। এর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু এখন তা মনে হচ্ছে না। নীলুর ইচ্ছা হলো দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ কাঁদার। সে মুখ কালো করে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বারান্দায় তার জন্যে একটা বড় ধরনের চমক অপেক্ষা করছিল। মিসির আলি সাহেব দাঁড়িয়ে। তিনি বললেন, এখানে কি আনিস সাহেব থাকেন?

স্যার আপনি? আমাকে চিনতে পেরেছেন?

ও ইয়ে, তুমি। আমার ছাত্রী। কোন ইয়ার?

থার্ড ইয়ার স্যার। নীলু আমার নাম। নীলুফার।

ও আচ্ছা। নীলুফার— তোমাদের তেতলায় আনিস সাহেব থাকেন নাকি?

জি।

তাঁর কাছে এসেছি। উঠবার রাস্তা কোন দিকে?

নীলু তাঁকে সঙ্গে করে তিনতলায় নিয়ে গেল।

ফেরবাব পথে আমাদের বাসা হয়ে যাবেন স্যার। যেতেই হবে।

আচ্ছা দেখি।

দেখাদেখি না স্যার, আপনি আসবেন।

আনিস ঘবে ছিল না। রানু তাঁকে নিয়ে বসাল। সে খুবই অবাক হয়েছে। মিসিব আলি বললেন, খুব অবাক হয়েছেন মনে হচ্ছে?

আপনি-আপনি কবে বলছেন কেন?

ও আচ্ছা, তুমি-তুমি কবে বলতাম, তাই না? ঠিক আছে। এখন বলো, আমাকে দেখে অবাক হয়েছে?

হ্যাঁ।

খুব অবাক হয়েছে?

জি। আপনি আসবেন ভাবতেই পারি নি।

মিসির আলি সিগারেট ধরিয়ে হাসিমুখে বললেন, তুমি তো শুনেছি সব কিছু আগে বলে দিতে পার, এটি তো পারার কথা ছিল।

রানু থেমে-থেমে বলল, আপনি লোকটি বেশ অদ্ভুত!

তাই নাকি?

হ্যাঁ। আপনার যুক্তিও খুব ভালো, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়।

বিশ্বাস করলেই পার। আনিস সাহেব কখন আসবেন ?

এসে পড়বে।

আমাকে একটু চা খাওয়াও। আর শোন, তোমাদের একটা কাজের ছেলে আছে নাকি ? ওকে পাঠাও তো আমার কাছে।

ওকে কী জন্যে ?

কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব।

মিসির আলি : কী নাম ?

জিতু : জিতু মিয়া।

মিসির আলি : দেশ কোথায় ?

জিতু : টাঙ্গাইল।

মিসির আলি : শুনলাম দু'একদিন আগে তুমি নাকি রাতের বেলা কী একটা দেখে ভয় পেয়েছ ?

জিতু : জি, পাইছি।

মিসিব আলি : কী দেখেছ ?

জিতু : পাকের ঘবে একজন মেয়েমানুষ। হাঁটাচলা করতাকে।

মিসিব আলি : সুন্দরী ?

জিতু : জি, খুব সুন্দর!

মিসিব আলি : রান্নাঘরে তো বাতি জ্বালানো ছিল ?

জিতু : জি না।

মিসির আলি : অন্ধকারে তুমি মানুষ কীভাবে দেখলে ?

জিতু : নিশ্চুপ।

মিসির আলি : আচ্ছা জিতু মিয়া, তুমি যাও। শোন, এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে এসো আমার জন্যে। ক্যাপস্টান। নাও, টাকাটা নাও।

জিতু মিয়া চলে গেল। রানু ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ইউনিভার্সিটির সব মাস্টাররাই কি আপনার মতো বুদ্ধিমান ?

না। আমার নিজের বুদ্ধি একটু বেশি। আচ্ছা, এখন যে খুটখাট শব্দ শোনা যাচ্ছে, এই শব্দটার কথাই কি আনিস সাহেব আমাকে বলেন ?

রানু জবাব দিল না। মিসির আলি কান পেতে শুনলেন।

শব্দটা তো বেশ স্পষ্ট। রান্নাঘর থেকে আসছে না ?

হঁ।

এই শব্দটার কথাই আনিস সাহেব বলেন, তাই না ?

বোধহয়। আপনি রান্নাঘর দেখবেন ? আপনি যাওয়ামাত্রই শব্দ থেমে যাবে।

শব্দটা বেশিরভাগই রান্নাঘরে হয় ?

জি।

ইঁদুর-মারা কিছু বিষ ছড়িয়ে দিও, আর শব্দ হবে না। ওটা ইঁদুরের শব্দ। রান্নাঘরে খাবারের লোভে ঘোরাঘুরি করে। সে জন্যেই শব্দটা বেশি হয় রান্নাঘরে। বুঝলে ?

হঁ।

যুক্তিটা পছন্দ হচ্ছে না মনে হয়।

যুক্তি ভালোই। আরেক কাপ চা খাবেন ?

নাহ্, এখন উঠব। আনিস সাহেব মনে হয় আজ আর আসবেন না।

না, আপনি আরেকটু বসুন। আপনাকে একটা গল্প বলব।

আজ আর না, রানু। মাথা ধরেছে।

মাথা ধরলেও আপনাকে শুনতে হবে। বসুন, আমি চা আনছি। প্যারাসিটামল খাবেন ?

ঠিক আছে।

চা আসবার আগেই আনিস এসে পড়ল। তার অফিসে নাকি কী একটা ঝামেলা হয়েছে। দশ হাজার টাকার একটা চেকের হিসাবে গণ্ডগোল। চেকটা ইস্যু হয়েছে আনিসের অফিস থেকে। আনিসের চোখে-মুখে ক্লান্তি। মিসির আলি বললেন, আপনি বিশ্রাম-টিশ্রাম করেন। আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না। আমি রানুর কাছ থেকে একটা গল্প শুনব।

কী গল্প ?

জানি না কী গল্প। ভয়ের কিছু হবে।

রানু বলল, না, ভয়ের না। তুমি গোসল-টোসল সেরে এসে চা খাও।

আমি গল্পটা শুনতে পারব না ?

নাহ্। সব গল্প সবার জন্যে না।

আনিসের কপালে সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়ল। সে কিছু বলল না। ঝৎঝৎ করে ঢুকে পড়ল। রানু তার গল্প শুরু করল খুব শান্ত গলায়। মিসির আলি তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

রানুর দ্বিতীয় গল্প

আমার তখন মাত্র বিয়ে হয়েছে। সপ্তাহখানেকও হয় নি। সেই সময় এক কাণ্ড হলো।

আমার বিয়ে হয়েছিল শ্রাবণ মাসের ছ'তারিখে। ঘটনাটা ঘটল শ্রাবণ মাসের চৌদ্দ তারিখ। সকালবেলা আমার এক মামাশ্বশুর এসে ওকে নিয়ে গেলেন মাছ মারতে। নৌকায় করে মাছ মারা হবে। নৌকা বড় গাঙ দিয়ে যাবে সোনাপোতা বিলে। বড়শি ফেললেই সেখানে বড় বড় বোয়াল মাছ পাওয়া যায়। বর্ষাকালের বোয়ালের কোনো স্বাদ নেই জানেন তো ? কিন্তু সোনাপোতার বোয়ালে বর্ষাকালেই নাকি সবচেয়ে বেশি তেল হয়।

দুপুরের পর থেকেই হঠাৎ করে খুব দিন খারাপ হলো। বিকেল থেকে বাতাস বইতে লাগল। আমরা সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ওরা আর ফেরে না। সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হলো প্রচণ্ড ঝড়। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল।

আমাদের বাড়িটা হচ্ছে কাঠের। কাঠের দোতলা। আমি একা-একা দোতলায় উঠে গেলাম। দোতলার কোণার দিকের একটা ঘরে আজেবাজে জিনিস রাখা হয়।

স্টোররুমের মতো। কেউ সেখানে যায়-টায় না। আমি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে কাঁদতে শুরু করলাম। তখন হঠাৎ একটি মেয়ের কথা শুনতে পেলাম। মেয়েটি খুব নিচুস্বরে বলল— সোনাপোতার বিলে ওদের নৌকা ডুবে গেছে। কিছুক্ষণ আগেই ডুবেছে। এটা শোনার পর আমি অজ্ঞান হয়ে যাই।

মিসির আলি বললেন, এইটুকুই গল্প ?

হ্যাঁ।

গল্পের কোনো বিশেষত্ব লক্ষ্য করলাম না।

বিশেষত্ব হচ্ছে, সেদিন সন্ধ্যায় ওদের সত্যি-সত্যি নৌকাডুবি হয়েছিল। এর কোনো ব্যাখ্যা আছে আপনার কাছে ?

আছে। ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল, কাজেই তোমার মনে ছিল অমঙ্গলের আশঙ্কা। অবচেতন মনে ছিল নৌকাডুবির কথা। অবচেতন মনই কথা বলেছে তোমার সঙ্গে। মানুষের মন খুব বিচিত্র রানু। আমি উঠলাম।

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। রানু তাঁক্ষ কণ্ঠে বলল, একতলার নীলু নামের যে মেয়েটি আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে, সে আপনার জন্যে বারান্দায় অপেক্ষা করছে। যাবার সময় ওর সঙ্গে আপনার দেখা হবে।

মিসির আলি বিস্মিত হয়ে বললেন, তাতে কী!

রানু বলল, নীলু এই মুহূর্তে কী ভাবছে তা আমি বলতে পারব। ওকে জিজ্ঞেস করলেই দেখবেন আমি ঠিকই বলেছি। আমি অনেক কিছুই বলতে পারি।

নীলু কী ভাবছে ?

নীলু ভাবছে একজন অত্যন্ত সুপুরুষ যুবকের কথা।

সেটাই তো স্বাভাবিক। একজন অবিবাহিত যুবতী একজন সুপুরুষ যুবকের কথাই ভাবে। এটা বলার জন্যে কোনো অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার দরকার হয় না, রানু।

মিসির আলি নেমে গেলেন। নীলু সত্যি-সত্যি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। সে খুব অনুরোধ করল যাতে স্যাব এক কাপ চা খেয়ে যান। কিন্তু মিসির আলি বসলেন না। তাঁর প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। প্যারাসিটামল কাজ করছে না। সারাজীবন তিনি এত ওষুধ খেয়েছেন যে ওষুধ তাঁর ওপর এখন আর কাজ করে না। খুব খারাপ লক্ষণ।

১৭

নীলুর বাবা বারান্দায় বসেছিলেন। নীলুকে বেরোতে দেখে তিনি ডাকলেন, নীলু, কোথায় যাচ্ছ মা ?

একটু বাইরে যাচ্ছি।

কিন্তু এইটুকু বলতেই নীলুর গলা কেঁপে গেল। গাল লাল হলো। তিনি তা লক্ষ্য করলেন। বিস্মিত গলায় বললেন, বাইরে কোথায় ? নীলু জবাব দিল না।

কখন ফিরবে মা ?

আটটা বাজার আগেই ফিরব।

গাড়ি নিয়ে যাও।

গাড়ি লাগবে না। তোমার কিছু লাগবে বাবা, চা বানিয়ে দিয়ে যাব?

না, চা লাগবে না। একটু সকাল-সকাল ফিরিস মা। শরীরটা ভালো না।

সকাল-সকালই ফিরব।

বিকেলের আলো নবম হয়ে এসেছে। সব কিছু দেখতে অন্য রকম লাগল নীলুর চোখে। নিউ মার্কেটের পরিচিত ঘরগুলিও যেন অচেনা। যেন ওদেব এক ধরনের রহস্যময়তা ঘিরে আছে।

কেমন আছ নীলু?

নীলু তৎক্ষণাৎ তাকাতে পারল না। তার লজ্জা করতে লাগল। তার ভয় ছিল আজ হয়তো সে আসবে না। প্রিয়জনের দেখা তো এত সহজে পাওয়া যায় না।

আজ তুমি দেরি করে এসেছ। পাঁচ মিনিট দেরি। তোমার তার জন্যে শাস্তি হওয়া দরকার।

কী শাস্তি?

সেটা আমরা চা খেতে খেতে ঠিক করব। খুব চায়ের পিপাসা হয়েছে।

কোথায় চা খাবেন?

এইখানে কোথাও। আর শোন নীলু, চা খেতে খেতে তোমাকে আমি একটা কথা বলতে চাই। খুব জরুরি কথা।

এখন বলুন। হাঁটতে-হাঁটতে বলুন।

নাঃ। এই কথা হাঁটতে হাঁটতে বলা যায় না। বলতে হয় মুখোমুখি বসে। চোখেব দিকে তাকিয়ে।

নীলুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল। নিঃশ্বাস ভারি হয়ে এলো। সে কোনোমতে বলল, ঠিক আছে, চলুন কোথাও বসি।

কী বলতে চাই তা কি বুঝতে পারছ?

নাহ্।

বুঝতে পারছ, নীলু। মেয়েবা এইসব জিনিস খুব ভালো বুঝতে পারে।

নীলুর গা কাঁপতে লাগল। অন্য এক ধরনের আনন্দ হচ্ছে। অন্য এক ধরনের সুখ। মনে হচ্ছে পৃথিবীতে এখন আর কেউ নেই। চারিদিকে সীমাহীন শূন্যতা। শুধু তাবা দু'জন হাঁটছে। হেঁটেই চলেছে। কেমন যেন এক ধরনের কষ্টও হচ্ছে বুকেব মধ্যে।

ওলা একটি রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসল।

চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবে?

না।

খাও না! কিছু খাও।

সে বয়কে ডেকে কী যেন বলল। নীলু শুনতে পেল না। কোনো কিছুতেই তার মন বসছে না। সব তার কাছে অস্পষ্ট লাগছে।

কী নীলু, কিছু বলো। চুপ করে আছ কেন ?

কী বলব ?

যা ইচ্ছা বলো।

নীলু ইতস্তত করে বলল, আপনি ঐ বিজ্ঞাপনটা আবার দিয়েছেন কেন ?

সে হাসল শব্দ করে।

দেখেছ বিজ্ঞাপনটা ?

হ্যাঁ।

মন-খারাপ হয়েছে ?

নীলু কিছু বলল না।

বলো, মন-খারাপ হয়েছে ?

হ্যাঁ।

সে আবার শব্দ করে হাসল। তার পর ফুর্তিবাজের ভঙ্গিতে বলল, আমি পত্রিকার অফিসে টাকা দিয়ে রেখেছিলাম। কথা ছিল প্রতি মাসে দু'বার করে ছাপবে। তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর তার আর প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সেটা বলা হয় নি। আগামী কাল বন্ধ করে দেব। এখন খুশি তো ?

নীলু জবাব দিল না।

বলো, এখন তুমি খুশি ? এইভাবে চুপ করে থাকলে হবে না, কথা বলতে হবে। বলো, তুমি খুশি ?

হুঁ।

সে আরেক দফা চাষের অর্ডার দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। খানিকক্ষণ দু'জনেই কোনো কথা বলল না। বাইরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। পৃথিবী বড় সুন্দর গ্রহ। এতে বেঁচে থাকতে সুখ আছে।

নীলু!

হুঁ।

তোমাকে যে কথাটি আমি বলতে চাচ্ছিলাম সেটি বলি ?

বলুন।

দেখ নীলু, সারা জীবন পাশাপাশি থেকেও এক সময় একজন অন্যজনকে চিনতে পারে না। আবার এমনও হয়, এক পলকের দেখায় একে অন্যকে চিনে ফেলে। ঠিক না ?

নীলু জবাব দিল না।

বলো, ঠিক না ?

হ্যাঁ।

তোমাকে প্রথম দিন দেখেই...

সে চুপ করে গেল। নীলুর চোখে জল এলো।

নীলু, আজ যদি তোমাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, তাহলে তোমার আপত্তি আছে ?

নীলু ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। জবাব দিল না। সে মুখ ঘুরিয়ে বসেছিল। সে তার চোখের জল তাকে দেখাতে চায় না।

বলো নীলু, আপত্তি আছে ?

আমাকে আটটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে।

আটটার আগেই আমরা বাড়ি ফিরব। এসো উঠি।

সে নীলুর হাত ধরল। ভালোবাসার স্পর্শ, যার জন্যে তরুণীরা সারা জীবন প্রতীক্ষা করে থাকে।

১৮

রানু আজ অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম যখন ভাঙল তখন দিন প্রায় শেষ। আকাশ লালচে হতে শুরু করেছে। সে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। নিচের বারান্দায় বিলু হাঁটছে একা-একা। রানুর কেমন জানি অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। যেন কোথাও কিছু একটা অস্বাভাবিকতা আছে, সে ধরতে পারছে না। নিচে থেকে বিলু ডাকল, রানু ভাবি, চা খেলে নেমে এসো, চা হচ্ছে।

চা খাব না।

আস না বাবা! ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার বলব। কুইক।

রানু নেমে গেল। তার মাথায় সূক্ষ্ম একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। কিছুই ভালো লাগছে না। বমিবমি ভাব হচ্ছে।

বারান্দায় নীলুর বাবাও ছিলেন। ওপর থেকে তাকে দেখা যায় নি। তিনি নরম স্বরে বললেন, এখন তুমি কেমন আছ মা ?

জ্বি, ভালো।

আমি আনিস সাহেবকে বলেছি বড় একজন ডাক্তার দেখাতে। পিজির একজন প্রফেসর আছেন, আমার আত্মীয়, তাকে আমি বলে দেখতে পারি। তুমি আলাপ করো আনিসের সাথে, কেমন ?

জ্বি, করব।

বিলু বলল, বাবা ঘরে গিয়ে তুমি চা খাও। তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে। আমরা দু'জন বাগানে বসি। ভদ্রলোক চলে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে।

রানু বলল, নীলু কোথায় ?

ওর এক বন্ধুর বাড়ি গেছে।

বন্ধুর বাড়ি যাওয়া এমন কোনো ব্যাপার নয়, তবু কেন জানি রানুর বুকে ধক করে একটা ধাক্কা লাগল। ভোঁতা এক ধরনের যন্ত্রণা হতে লাগল মাথায়। বিলু বলল, বানু ভাবি, তোমাকে একটা গোপন কথা বলছি। টপ সিক্রেট, কাউকে বলবে না।

না বলব না।

ইভেন নীলু আপাকেও নয়। কারণ কথাটা তাকে নিয়েই।

ঠিক আছে কাউকে বলব না।

নীলু আপা ডুবে-ডুবে জল খাচ্ছে। আজকে সকালে টের পেয়েছি।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। নীলু আপার ট্রাক ঘাঁটতে গিয়ে আবিষ্কার করেছি। জনৈক ভদ্রলোক দারুণ সব রোমান্টিক চিঠি লিখেছে নীলু আপাকে। খুব লদকা-লদকি।

বিলু হাসল। রানু কিছু বলল না। তার মাথার যন্ত্রণাটা ক্রমেই বাড়ছে।

দু-একটা চিঠি পড়ে দেখতে চাও ?

না, না। অন্যের চিঠি।

আহ পড় না, কেউ তো জানতে পারছে না। আমরা ব্যাপারটা টপ সিক্রেট রাখব, তাহলেই তো হলো।

না বিলু, আমি চিঠি পড়ব না।

পড়ব না বললে হবে না। পড়তেই হবে। দাঁড়াও আমি নিয়ে আসছি। যে আলো আছে তাতে দিব্য পড়তে পারবে।

বিলু ঘর থেকে চিঠি নিয়ে এলো। রানু চিঠিটি হাতে নিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিলু অবাক হয়ে বলল, কী হয়েছে ?

না, কিছু হয় নি।

এরকম করছ কেন ?

মাথা ধরেছে। বড্ড মাথা ধরেছে।

প্যারাসিটামল এনে দেব ? তুমি চিঠিটা পড়ে আমাকে বলো ভদ্রলোক সম্পর্কে তোমার কী ধারণা।

রানু চিঠি পড়ল। বিলু বলল, বলো, তোমার কী মনে হয় ?

রানু কিছু বলল না। এক হাতে মাথার চুল টেনে ধরল।

তোমার কী হয়েছে ?

বড্ড শরীর খাবাপ লাগছে। আমি এখন যাই।

চা খাবে না ?

না। বিলু নীলু কখন ফিরবে— বলে গেছে ?

না। সন্ধ্যার আগে আগেই ফিরবে বোধহয়। তোমার কি শরীর বেশি খারাপ লাগছে ?

হ্যাঁ।

তা হলে যাও, শুয়ে থাক গিয়ে।

রানু ওপরে উঠে এলো। ঘব অন্ধকার। বাতি জ্বালাতে ইচ্ছে হলো না। শুয়ে পড়ল বিছানায়। আনিস আজ ফিরতে দেরি করবে। তার অফিসে কী সব নাকি ঝামেলা হচ্ছে ? রানু ডাকল, জিতু— জিতু মিয়া। কেউ সাড়া দিল না। জিতু কি বাসায় নেই ? জিতু— জিতু। কোনো উত্তর নেই। জিতু মিয়া ইদানীং বেশ লায়েক হয়েছে। রানু কিছু বলে না বলেই হয়তো বিকেলে খেলতে গিয়ে সন্ধ্যা পার করে বাড়ি ফেলে। বকাঝকা তার গায়ে লাগে না।

রান্নাঘরে খুটখুট শব্দ হচ্ছে। ইঁদুর। নিশ্চয়ই ইঁদুর। তবু রানু বলল, কে ? খুটখুট শব্দ থেমে গেল। ইঁদুর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সেই গন্ধটা আবার পাওয়া যাচ্ছে।

কড়া ফুলের গন্ধ । রানুর ইচ্ছে হলো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে । রানু দুর্বল গলায় ডাকল, জিতু, জিতু মিয়া! আর ঠিক তখন কে একজন ডাকল, রানু রানু! এই ডাক বানুর চেনা । এই জীবনে সে অনেকবার শুনেছে । তবে এটা কিছু নয় । প্রফেসর সাহেব বলছেন, অডিটরি হেলুসিনেশন । আসলেই তাই । এছাড়া আর কিছু নয় ।

রানু! রানু!

কে ? তুমি কে ?

রানুর মনে হলো কেউ একজন যেন এগিয়ে আসছে । তার পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে । ছোট-ছোট পা নিশ্চয়ই । হালকা শব্দ । পায়ে কি নৃপুর আছে ? নৃপুর বাজছে ?

রানু ।

রানু চোখ বন্ধ করে ফেলল । এসব সত্য নয়, চোখেই ভুল । রানু দুর্বল গলায় বলল, তুমি কে ?

আমাকে তুমি চিনতে পারছ না ?

না ।

কিশোরীর গলায় মৃদু হাসি শোনা গেল ।

তাকাও রানু । তাকালেই চিনবে ।

আমি চিনতে চাই না ।

তোমার বন্ধু নীলুর খুব বিপদ রানু । একদিন তোমার যে বিপদ ঘটতে যাচ্ছিল, তাব চেয়েও অনেক বড় বিপদ ।

দরজায় ধাক্কা পড়ছে । জিতু এসেছে বোধহয় । রানু তাকাল, কোথাও কেউ নেই । ফুলের গন্ধ কমে আসছে । জিতু মিয়া বাইরে থেকে ডাকল, আশ্বা, আশ্বা । রানু উঠে দরজা খুলল ।

আপনেনব কী হইছে ?

কিছু হয় নি ।

বানু এসে শুয়ে পড়ল । তার গায়ে প্রচণ্ড জ্বর । সে বিছানায় ছটফট করতে লাগল । কখন আসবে আনিস ? কখন আসবে ?

জিতু!

জি ।

নিচে গিয়ে দেখে আয় তো— নীলু ফিবেছে নাকি ।

জিতু ফিরে এসে জানাল, এখনো আসে নি । বানু একটি নিঃশ্বাস ফেলে ঘাড়ি দেখল, আটটা বাজতে চার মিনিট বাকি । কখন আসবে আনিস ?

১৯

সারাটা পথ নীলু চুপ করে রইল । একবার সে বলল, কী ব্যাপার, এত চুপচাপ যে ? নীলু তারও জবাব দিল না । তার কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না । সে আছে একটা ঘোবের মধ্যে ।

গান শুনবে ? গান দেব ?

নীলু মাথা নাড়ল । সেটা হাঁ কী না, তাও স্পষ্ট হলো না ।

কী গান শুনবে ? কান্দি মিউজিক ? কান্দি মিউজিকে কার গান তোমার পছন্দ ?
নীলু জবাব দিল না ।

আমার ফেবারিট হচ্ছে জন ডেনভার । জন ডেনভারের রকি মাউন্টেন হাই গানটা
শুনেছ ?

না ।

খুব সুন্দর ! অপূর্ব মেলাওডি !

সে ক্যাসেট টিপে দিতেই জন ডেনভারের অপূর্ব কণ্ঠ শোনা গেল, ক্যালিফোর্নিয়া
রকি মাউন্টেন হাই ।

কেমন লাগছে নীলু ?

ভালো ।

শুধু ভালো না । বেশ ভালো ।

সেও জন ডেনভারের সঙ্গে শুনশুন করতে লাগল । নীলুর মনে হলো, ওর গানের
গলাও তো চমৎকার ! একবার ইচ্ছে হলো জিজ্ঞেস করে— গান জানেন কিনা । কিন্তু সে
কিছু জিজ্ঞেস করল না । তাব কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না । গাড়ি কোন দিক দিয়ে কোথায়
যাচ্ছে তাও সে লক্ষ্য করছে না । একবার শুধু ট্র্যাফিক সিগনালে গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে
রইল । একজন ভিথারি এসে ভিক্ষা চাইল । সে ধমকে উঠল কড়া গলায় । তারপর আবার
গাড়ি চলল । নীলু ফিসফিস করে বলল, কটা বাজে ?

সাতটা পঁয়ত্রিশ । তোমাকে আটটার আগেই পৌঁছে দেব ।

আপনার বাড়ি মনে হয় অনেক দূর ?

শহর থেকে একটু দূরে বাড়ি করেছি । কোলাহল ভালো লাগে না । ‘ফার ফ্রম দি
ম্যাডিং ফ্রাউড’ কাব লেখা জানো ?

নাহ্ ।

টমাস হার্ডির । পড়ে দেখবে চমৎকার ! অথচ ট্র্যাজেডি হচ্ছে, টমাস হার্ডিকেই
নোবেল পুরস্কার দেয়া হয় নি । তুমি তার কোনো বই পড়েছ ?

না ।

পড়ে দেখবে । খুব রোমান্টিক ধরনের রাইটিং ।

গাড়ি ছুটে চলেছে মিরপুর রোড ধরে । হঠাৎ নীলু বলল, আমার ভালো লাগছে না ।

কী বললে ?

আমার ভালো লাগছে না, আমি বাসায় যাব ।

সে তাকাল নীলুর দিকে । একটি হাত বাড়িয়ে ক্যাসেটের ভল্যুম বাড়িয়ে দিল ।
গাড়ির গতি কমলো না ।

আমি বাসায় যাব ।

আটটার সময় আমি তোমাকে বাসায় পৌঁছে দেব ।

না, আজ আমি কোথাও যাব না । প্লিজ গাড়িটা থামান ! আমি নেমে পড়ব ।

কেন ?

আমার ভালো লাগছে না। প্রিজ!

সে তাকাল নীলুর দিকে। নীলু শিউরে উঠল। এ কেমন চাউনি! যেন মানুষ নয়, অন্য কিছু।

প্রিজ, গাড়িটা একটু থামান!

কোনো রকম ঝামেলা না করে চূপচাপ বসে থাক। কোনো রকম শব্দ করবে না।

আপনি এ রকম করে কথা বলছেন কেন?

গাড়ির গতি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। ঝড়ের গতিতে পাশ দিয়ে দুটো ট্রাক গেল। লোকটি তার একটি হাত রাখল নীলুর উরুতে। নীলু শিউরে উঠে দরজার দিকে সরে গেল। লোকটি হাসল। এ কেমন হাসি।

গাড়ি থামান। আমি চিৎকার করব।

কেউ এখন তোমার চিৎকার শুনবে না।

আপনি কেন আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?

আমি ভয় দেখাচ্ছি না।

আমি আপনাকে বিশ্বাস করে গাড়িতে উঠেছি।

আরো কিছুক্ষণ থাক। বেশিক্ষণ নয়, এসে পড়েছি বলে।

কী করবেন আপনি?

তেমন কিছু না।

নীলু এক হাতে দরজা খুলতে চেষ্টা করল। লোকটি তাকিয়ে দেখল কিন্তু বাধা দিল না। দরজা খোলা গেল না। নীলু প্রাণপণে বলতে চেষ্টা করল, আমাকে বাঁচাও। কিন্তু বলতে পারল না। প্রচুর ঘামতে লাগল। প্রচণ্ড তৃষ্ণা বোধ হলো।

২০

আনিস এলো বাত সাড়ে আটটায়। ঘর অন্ধকার। কারো কোনো সাড়াশব্দ নেই। রানু বাতিটাটি নিভিয়ে অন্ধকারে বসে আছে। জিতু মিয়া মশারি খাটিয়ে শুয়ে পড়েছে।

রানু, কী হয়েছে?

রানু ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, তুমি এত দেরি করলে!

কেন, কী হয়েছে?

নীলুর বড় বিপদ।

আনিস কিছু বুঝতে পারল না। অবাক হয়ে তাকাল। রানু থেমে-থেমে বলল, নীলুর খুব বিপদ।

কীসের বিপদ? কী বলছ তুমি?

রানুর কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। সে গুছিয়ে কিছু বলতে পারছে না।

রানু, তুমি শান্ত হয়ে বসো। তারপর ধীরেসুস্থে বল— কী ব্যাপার। কী হয়েছে নীলুর?

ও একজন খারাপ লোকের পাল্লায় পড়েছে। লোকটা ওকে মেরে ফেলবে।

রানু ফোঁপাতে লাগল। আনিস কিছুই বুঝতে পারল না। নীলুর বাবার সঙ্গে কিছুক্ষণ আগেই তার কথা হয়েছে। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেছেন, কী, এত দেরি যে? যার মেয়ের এত বড় বিপদ, সে এরকম স্বাভাবিক থাকবে কী করে?

আনিস বলল, ওরা তো কিছু বলে না!

ওরা কিছু জানে না। আমি জানি, বিশ্বাস কর— আমি জানি।

আমাকে কী করতে বলো?

আমি বুঝতে পারছি না। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

জিনিসটা কি তুমি স্বপ্নে দেখছ?

না। কিন্তু আমি দেখছি।

কী দেখেছ?

আমি সেটা তোমাকে বলতে পারব না।

তুমি যদি চাও আমি নিচে গিয়ে ওদের বলতে পারি। কিন্তু ওরা বিশ্বাস করবে না।

রানু চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। ওর শরীর অল্প-অল্প করে কাঁপছে। আনিস বলল, নাকি মিসির আলি সাহেবের কাছে যাবে? উনি কোনো একটা বুদ্ধি দিতে পারেন। যাবে?

রানু কাঁপা গলায় বলল, তুমি নিজে কি আমার কথা বিশ্বাস করছ?

হ্যাঁ করছি।

একতলার বারান্দায় বিলু বসে ছিল। ওদের নামতে দেখেই বিলু বলল, ভাবি, নীলু আপা এখনো ফিরছে না। বাবা খুব দুশ্চিন্তা করছেন।

বানু কিছু বলল না।

তোমরা কোথায় যাচ্ছ ভাবি?

রানু তারও কোনো জবাব দিল না। রিকশায় উঠেই সে বলল, আমাকে ধরে রাখ, খুব ভালো লাগছে।

আনিস তার কোমর জড়িয়ে বসে রইল। রানুর গা শীতল। রানু খুব ঘামছে। জ্বর নেমে গেছে।

২১

রানু চোখ বড় বড় করে বলল, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না— তাই না?

মিসির আলি চুপ করে রইলেন।

আগে আপনি বলুন— আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করছেন?

বিশ্বাসও করছি না, আবার অবিশ্বাসও করছি না। তুমি নিজে যা সত্যি বলে মনে করছ, তাই বলছ। তবে আমি এত সহজে কোনো কিছু বিশ্বাস করি না।

কিন্তু যদি সত্যি হয়, তখন?

মিসির আলি সিগারেট ধরিয়ে কাশতে লাগলেন।

বলুন, যদি আমার কথা সত্যি হয়, যদি মেয়েটা মারা যায়?

মিসির আলি শান্ত স্বরে বললেন, ঠিক এই মুহূর্তে কী করা যায়, তা তো বুঝতে পারছি না। মেয়েটি কোথায় আছে, তা তো তুমি জানো না। নাকি জানো?

না, জানি না।

ছেলেটির নামধামও জানো না ?

ছেলেটি দেখতে খুব সুন্দর। আমার এ রকম মনে হচ্ছে।

এই শহরে খুব কম করে হলেও দশ হাজার সুন্দর ছেলে আছে।

আমরা কিছুই করব না ?

পুলিশের কাছে গিয়ে বলতে পারি একটি মেয়ে হারিয়ে গেছে এবং আশঙ্কা করা যাচ্ছে দুই লোকের খপ্পরে পড়েছে। কিন্তু তাতেও একটা মুশকিল আছে, ২৪ ঘণ্টা পার না হলে পুলিশ কাউকে মিসিং পারসন হিসেবে গণ্য করে না।

রানু আবার বলল, কিছুই করা যাবে না ?

মিসির আলি গম্ভীর মুখে সিগারেট টানতে লাগলেন। তিনি লক্ষ করলেন রানুর চোখ-মুখ শক্ত হয়ে উঠেছে। সে ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলছে।

রানু, তুমি যদি ঐ লোকটির কোনো ঠিকানা কোনোভাবে এনে দিতে পার, তাহলে একটা চেষ্টা চালানো যেতে পারে।

ঠিকানা কোথায় পাব ?

তা তো রানু আমি জানি না। যেভাবে খবরটি পেয়েছ, সেইভাবেই যদি পাও। রানু উঠে দাঁড়াল। মিসির আলি সাহেব বললেন, যাচ্ছ নাকি ?

হ্যাঁ, বসে থেকে কী করব ?

নীলুদের সব ক'টি ঘরে আলো জ্বলছে। রাত প্রায় এগারোটা বাজে। নীলুর বাবা পাথরের মূর্তির মতো বাগানের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। রানুদের চুকতে দেখে এগিয়ে এলেন। কিন্তু কিছু বললেন না। রানু মাথা নিচু করে তিনতলায় উঠে গেল। নীলুদের ঘবে ঘনঘন টেলিফোন বাজছে। দু'টি গাড়ি এসে থামল। মনে হয় ওরা খুঁজতে শুরু কবেছেন। পুলিশের কাছে নিশ্চয়ই লোক গিয়েছে। নীলুর বাবা অস্থির ভঙ্গিতে বাগানে হাঁটছেন।

২২

ছোট্ট একটি ঘর। কিন্তু দু'শ' পাওয়ারের একটি বাতি জ্বলছে ঘবে। চারদিক ঝলমল করছে। লোকটি একটি চেয়ারে বসে আছে। নীলু লোকটির মুখ দেখতে পাচ্ছে না, কারণ লোকটি বসে আছে তার পেছনে। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাবার কোনো উপায় নেই। মাঝে মাঝে দূরের রাস্তা দিয়ে দ্রুতগামী ট্রাকের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। নীলু থেমে থেমে বলল, আপনি কি আমাকে মেরে ফেলবেন ?

কেউ কোনো জবাব দিল না।

আমি আপনাব কোনো ক্ষতি করি নি। কেন আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন ? প্লিজ আমাকে যেতে দিন। আমি কাউকে কিছু বলব না। কেউ আপনার কথা জানবে না।

পেছনে চেয়ার একটু নড়ে উঠল। ভারি গলায় লোকটি কথা বলল, কেউ জানলেও আমার কিছু যায়-আসে না।

কেন আপনি এরকম করছেন ?

আমি একজন অসুস্থ মানুষ। মাঝে মাঝে আমাকে এরকম করতে হয়।

আপনি কি আমাকে মেরে ফেলবেন ?

কোনো জবাব পাওয়া গেল না। লোকটি হাত বাড়িয়ে বাতি নিভিয়ে দিল। চারদিকে ঘন অন্ধকার। নীলু চাপা স্বরে ডাকল, মা, মাগো!

চুপ করে থাক, কথা বলবে না।

কেন এরকম করছেন আপনি ?

আমি একজন অসুস্থ মানুষ। পৃথিবীতে কিছু অসুস্থ মানুষ থাকে।

আপনি কি আমার মতো আরো অনেক মেয়েকে এইভাবে ফাঁদ পেতে এনেছেন ?

কোনো জবাব পাওয়া গেল না। লোকটি এগিয়ে এসে নীলুর গায়ে হাত রাখল। এই কি সেই ভালোবাসার স্পর্শ ? নীলু ডাকল, মা, মাগো!

চুপ করে থাক।

আপনি মানুষ, না অন্য কিছু ?

বেশিব ভাগ সময়ই আমি মানুষ থাকি, মাঝে মাঝে অন্যরকম হয়ে যাই।

লোকটি শব্দ কবে হাসল। কী কুৎসিত হাসি! ঘরে একটুও বাতাস নেই। দম বন্ধ হয়ে আসছে। নীলু প্রাণপণে তাব একটা হাত ছুটিয়ে আনতে চেষ্টা করছে। যতই চেষ্টা করছে দড়িগুলো ততই যেন কেটে-কেটে বসে যাচ্ছে।

কেন, কেন আপনি এরকম করছেন ?

বলেছি তো নীলু! অনেকবার বললাম তোমাকে। আমি অসুস্থ।

কী করবেন আপনি ?

অন্যদের যা করেছি তাই করব।

কী করেছেন অন্যদের।

লোকটি হেসে উঠল। নীলু কাতর স্বরে বলল, আপনি দয়া করুন, আমি আপনার পায়ে পড়ি। প্লিজ। আমি আপনার কথা কাউকে বলব না।

তা কি হয় ?

বিশ্বাস করুন। আমি আমার কথা বাখি। কাউকে আমি আপনার কথা বলব না।

লোকটি ফিরে যাচ্ছে। নীলু কি নেচে যাবে ? লোকটি কি তাকে ছেড়ে দেবে ? নীলু গুঁহিয়ে চিন্তা করতে পারছে না। সব কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। লোকটি দ্রয়ার খুলল। ঘর অন্ধকার, নীলু কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু সে নিশ্চিত জানে, তার একটি হাতে ধাবালো কিছু একটা আছে। ক্ষুরাণী কিছু। লোকটি সেটি বাঁ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। আসবে, সে এক সময় এগিয়ে আসবে তার কাছে। খুব কাছে কোথাও রিকশার টুনটুন শোনা গেল। নীলু প্রাণপণে চেষ্টা, বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও। কিন্তু গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরোল না।

১৩

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রানুর অবস্থা খারাপ হতে লাগল। বারবার বলতে লাগল— উফ, বড্ড গরম লাগছে। আনিস সমস্ত দরজা-জানালা খুলে দিল, ফ্যান ছেড়ে দিল, তবু তার গরম কমলো না। বান কাতর স্বরে বলল, তুমি আমাকে ধরে থাক, আমার বড্ড ভয় লাগছে।

এই তো আমি তোমাকে ধরে আছি। কীসের এত ভয়, রানু ?

আমার সামনে ঐ লোকটি বসে আছে— আমি স্পষ্ট দেখছি। ওর হাতে একটা ক্ষুর।

রানু ফোঁপাতে শুরু করল। ওকে ডাক্তারের কাছে নেওয়া উচিত। যত তাড়াতাড়ি নেওয়া যায় ততই ভালো। আনিস ডাকল, জিতু— জিতু মিয়া! কিন্তু জিতু মিয়ার ঘুম ভাঙল না। রানু বলল, তুমি আমাকে একা রেখে কোথাও যেতে পারবে না। আমার বড় ভয় লাগছে।

কোনো ভয় নেই রানু।

লোকটি ক্ষুর হাতে বসে আছে। তবু তুমি বলছ ভয় নেই ?

এইসব তোমার কল্পনা। এসো, তোমার মাথায় একটু পানি দিই ?

তুমি কোথাও যেতে পারবে না। ঐ লোকটি এখন উঠে দাঁড়িয়েছে। তুমি আমাকে শক্ত করে ধরে থাক। আরো শক্ত করে ধর।

আনিস তাকে জড়িয়ে ধরে বসে রইল। রানু ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, আমি তোমাকে একটা কথা কখনো বলি নি। একবার একজন লোক আমাকে মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিল।

রানু, এখন তোমাকে কিছুই বলতে হবে না। দয়া করে চুপ করে থাক।

না, আমি বলতে চাই।

সকাল হোক। সকাল হলেই শুনব।

মাঝে মাঝে আমার মনে হয় একজন কেউ আমার সঙ্গে থাকে।

রানু, চুপ করে থাক।

না, আমি চুপ কবে থাকব না। আমার বলতে ইচ্ছে করছে। যে আমার সঙ্গে থাকে, তার সঙ্গে আমি অনেকবার কথা বলেছি। কিন্তু আজ সে কিছুতেই আসছে না।

তার আসার কোনো দরকাব নেই।

তুমি বুঝতে পারছ না, তার আসাব খুব দরকাব।

রাত দেড়টার দিকে নিচ থেকে বিলুর কান্না শোনা যেতে লাগল। অনেক লোকজনের ভিড়। কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। বানু বলল, বিলু কাদছে। বড় খারাপ লাগছে আমার।

রানু, তুমি একটু গুয়ে থাক। আমি জিতুকে ডেকে দিচ্ছি।

তুমি কোথায় যাবে ?

আমি একজন ডাক্তার নিয়ে আসব। আমার মোটেই ভালো লাগছে না।

তুমি আমাকে ফেলে রেখে কোথাও যেতে পারবে না।

রানুর কথা জড়িয়ে যেতে লাগল। এক সময় বিছানায় নোঁতয়ে পড়ল। আনিস ছুটে গেল ডাক্তার আনতে। বড় রাস্তার মোড়ে একজন ডাক্তারের বাসা আছে। ডাক্তার সাহেবকে পাওয়া গেল না। আনিস ফিরে এসে ঘরে ঢোকবার মুখেই তীব্র ফুলের গন্ধ পেল। ঘরের বাতি নেভানো। কে নিভিয়েছে বাতি ? আনিস ঢুকতেই রানু বলল, ও এসেছে।

কে ? কে এসেছে ?

তুমি গন্ধ পাচ্ছ না ?

আনিস এগিয়ে এসে রানুর হাত ধরল। গা ভীষণ গরম। রানু বলল, ও নীলুর কাছে যাবে।

রানু, শুয়ে থাক।

উঁহু, শোব কীভাবে? ও একা যেতে ভয় পাচ্ছে। আমিও যাব ওর সঙ্গে। ও আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

বলতে-বলতে রানু খিলখিল করে হাসল।

আনিস বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকল, রহমান সাহেব, রহমান সাহেব! ভাই একটু আসুন, আমার বড় বিপদ।

রহমান সাহেব ঘরে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী বেরিয়ে এলেন। তিনি অবাক হয়ে বললেন, কী হয়েছে?

আপনি একটু আসুন, আমার স্ত্রী কেমন করছে।

ভদ্রমহিলা সঙ্গে সঙ্গে এলেন। এবং ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে বললেন, নূপুরের শব্দ না? রানু কিশোরী মেয়ের গলায় খিলখিল করে হাসল।

কী হয়েছে ওনার?

আপনি একটু বসুন ওর পাশে। আমি ডাক্তার নিয়ে আসি।

আনিস ছুটে বেরিয়ে গেল। ফুলের সৌরভ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল। রানু হাসিমুখে বলল, আমার সময় বেশি নেই, ঐ লোকটি এগিয়ে আসছে।

কোন লোক?

আপনি চিনবেন না। না চেনাই ভালো।

ভদ্রমহিলা রানুর হাত ধরলেন। উত্তাপে গা পুড়ে যাচ্ছে। তিনি কী করবেন ভেবে পেলেন না।

আনিস ডাক্তার নিয়ে ফেরার আগেই রানু মারা গেল।

২৪

ঘব অন্ধকার। কিন্তু চোখে অন্ধকার সয়ে আসছে। আবছা মতো সব কিছু দেখা যায়। বাড়িটা কোথায়? শহর থেকে অনেক দূরে কি? কোনো শব্দ নেই। কত রাত এখন? বাড়িতে এখন ওরা কী করছে? বিলু কি ঘুমিয়েছে মশারি ফেলে? না, না— আজ কেউ ঘুমায় নি, আজ সবাই ছোট্টাছুটি করছে। সবাই খুঁজছে নীলুকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো পুলিশের গাড়ির শব্দ শোনা যাবে। বাবা এসে বলবেন— কোনো ভয় নেই মা-মণি।

চেয়াব নড়াব শব্দ হল। লোকটি কি উঠে দাঁড়িয়েছে? তার হাতে ওটা কী? নীলু মনে মনে বলল, বাবা, আমি একজন অসুস্থ লোকের হাতে আটকা পড়েছি, আমাকে বাঁচাও। আমার আর মোটেও সময় নেই বাবা। তোমাদের খুব তাড়াহাড়ি করতে হবে।

লোকটি এগিয়ে আসছে। পেছন থেকে সে খুব ধীর গতিতে এগিয়ে এলো সামনে। এখন নীলু আবছাভাবে লোকটির মুখ দেখতে পাচ্ছে। কী সুন্দর একটি মুখ! নীলু বিড়বিড় করে বলল, প্রিজ, দয়া করুন। লোকটি অদ্ভুত শব্দ করল। এটি কি হাসির শব্দ? নীলুর গা গোলাচ্ছে। নীলু চিৎ হয়ে থাকা অবস্থাতেই মুখ ভর্তি করে বমি করল। দুঃস্বপ্ন,

সমস্তটাই একটা দুঃস্বপ্ন। এক্ষুণি ঘুম ভেঙে যাবে। আর নীলু দেখবে— বিলু বাতি জ্বালিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। তার বুকের ওপর একটা গল্পের বই। এখানে যা ঘটছে, তা সত্যি হতেই পারে না!

লোকটি তার পাশে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াল। নীলু চাপা গলায় বলল, আমার গায়ে হাত দেবেন না প্লিজ। লোকটি হেসে উঠছে শব্দ করে। আর ঠিক তখনই নূপুরের শব্দ শোনা গেল। যেন কেউ একজন এসে ঢুকেছে এ ঘরে।

লোকটি ভারি গলায় বলল, কে, কে ওখানে? তার উত্তরে অল্পবয়সী একটি মেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। লোকটি চোঁচাল, কে, কে? কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। শুধু ঘরের শেষ প্রান্তের একটা জানালা খুলে ভয়ানক শীতল একটা হাওয়া এসে ঢুকল ঘরে। সে হাওয়ায় ভেসে এলো অদ্ভুত মিষ্টি একটা গন্ধ।

নীলুর মনে হলো একটি মেয়ে যেন নূপুর পায়ে দিয়ে তার চারপাশ দিয়ে ঘুরতে শুরু করেছে। ঘুরতে-ঘুরতে একবার মেয়েটি তাকে স্পর্শ করল, আর তক্ষুণি নীলুর মনে হলো— আর কোনো ভয় নেই।

নীলু দেখল, লোকটি ক্রমেই দেয়ালের দিকে সরে যাচ্ছে। একবার সে চাপা স্বরে বলল, তুমি কে? মিষ্টি একটি হাসি শোনা গেল তখন। ফুলের গন্ধ আরো তীব্র হলো। অন্য কোনো ভুবন থেকে ভেসে এলো নূপুরের ধ্বনি। লোকটি গা ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, এসব কী হচ্ছে! কে, এখানে কে? কেউ তার কথার জবাব দিল না। একটি দুষ্ট মেয়ে শুধু হাসতে লাগল। ভীষণ দুষ্ট একটি মেয়ে। তার পায়ে নূপুর। তাব গায়ে অপার্থিব এক ফুলের গন্ধ। মেয়েটি এবার দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে লোকটির দিকে। লোকটির কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল। এইসব কী? কে, কে? তার উত্তরে সমস্ত ঘরময় মিষ্টি খিলখিল হাসি ঝমঝম করতে লাগল। লোকটি চাপা গলায় বলে উঠল, আমাকে বাঁচাও। বাঁচাও। দুষ্ট মেয়েটি আবার হাসল, যেন খুব একটা মজার কথা।

পরিশিষ্ট

থার্ড ইয়ার অনার্সের এই ক্লাসটি মিসির আলি সাহেবকে দেওয়া হয়েছে। সাইকোলজি ফিফ্থ পেপার। মিসিব আলি হাসিমুখে ক্লাসে ঢুকলেন। তার মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। রানু বসে আছে সেকেন্ড বেঞ্চে। তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। তিনি মেয়েটির দিকে তাকালেন এবং তাকিয়ে রইলেন। মনে হলো, মেয়েটির চোঁটের কোণায় হাসি লেগে আছে। মিসির আলি কাঁপা গলায় বললেন, তোমার নাম কী?

মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। স্পষ্ট স্বরে বলল, আমার নাম নীলু। নীলুফার। বোল নাথার থার্ড টু।

আমি একটি মেয়েকে চিনতাম। তুমি দেখতে অবিকল তার মতো।

নীলুফার শান্ত স্বরে বলল, আমি জানি।

মিসির আলি সাহেব কপালের ঘাম মুছলেন! সমস্ত ব্যাপারটি ভুলে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে বললেন, আমি তোমাদের পড়াব ফিফ্‌থ পেপার। খুব ইন্টারেস্টিং একটি টপিক—

রানুর মতো দেখতে মেয়েটি তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। মেয়েটির মুখে মৃদু হাসি।



निमीशिनो

মিসির আলির ধারণা ছিল, তিনি সহজে বিরক্ত হন না। এই ধারণাটা আজ ভেঙে যেতে শুরু করেছে। ঠিক এই মুহূর্তে তিনি অসম্ভব বিরক্ত। যে রিকশায় তিনি উঠেছেন, তার সিটটা ঢালু। বসে থাকা কষ্টের ব্যাপার। তার চেয়েও বড় কথা, দু'মিনিট পরপর রিকশার চেইন পড়ে যাচ্ছে।

এখন বাজছে দশটা তেইশ। সাড়ে দশটায় থার্ড ইয়ার অনার্সের সঙ্গে তাঁর একটা টিউটরিয়াল আছে। এটা কোনোক্রমেই ধরা যাবে না। যে-হারে রিকশা এগুচ্ছে, তাতে ইউনিভার্সিটিতে পৌছতে তাঁর আরো পনের মিনিট লাগবে। একালের ছাত্ররা এতক্ষণ তাদের টিচারদের জন্যে অপেক্ষা করে না।

মিসির আলি তাঁর বিরক্তি ঢাকবার জন্যে একটা সিগারেট ধরালেন। ঠিক তখন পঞ্চমবারের মতো রিকশাব চেইন পড়ে গেল। রিকশাওয়ালার ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে চেইন পড়ার ব্যাপারটায় সে আনন্দিত। গদাইলশকরী চালে সে নামল এবং সামনের চাকাটা তুলে ঝাঁকাঝাঁকি করতে লাগল।

চেইন পড়ে গেলে কেউ চাকা তুলে ঝাঁকাঝাঁকি করে বলে তাঁর জানা ছিল না। রুক্ষ গলায় বললেন, এরকম করছ কেন?

রিকশাওয়ালা জবাব দিল না। গরম চোখে তাকাল এবং মিসির আলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে একটা বিড়ি ধরাল। মিসির আলি রাগ সামলাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কুড়ি থেকে এক পর্যন্ত উল্টো দিকে গুনলেন। জীবনানন্দ দাশের 'মনে হয় একদিন' কবিতার প্রথম চার লাইন মৃদু স্বরে আওড়ালেন। মিসির আলির ধারণা, কিছু কিছু কবিতা মানুষের অস্থিরতা কমিয়ে দেয়। 'মনে হয় একদিন' এমন একটি কবিতা।

কিন্তু আজ তাঁর রাগ কমছে না। রিকশাওয়ালা কঠিন মুখ করে নির্বিকার ভঙ্গিতে বিড়ি টানছে। মিসির আলির দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না।

মিসির আলি নিজেকে সামলাবার জন্যেই ভাবতে লাগলেন— তিনি নিজে যদি সিগারেট ধরাতে পারেন, তাহলে এই লোকটি পারবে না কেন? জুন মাসের প্রচণ্ড গরমে বেচারী ক্লান্ত ও বিরক্ত। একজন ক্লান্ত ও বিরক্ত মানুষের নিশ্চয়ই বিশ্রাম করার অধিকার আছে। তিনি হালকা গলায় বললেন, নাম কী তোমার?

সামসু।

বাড়ি কোথায় তোমার সামসু?

বাড়ি-ঘর নাই।

দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার। সামসু রিকশা চালাও। ক্লাস মিস হবে।

সামসু কোনো পান্তাই দিল না। রাস্তার পাশে পেছাব করতে বসে গেল। তার বসার ভঙ্গি থেকেই বোঝা যাচ্ছে সে সহজে উঠবে না, বসেই থাকবে। এই লোকটি কি কোনো অজ্ঞাত কারণে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করছে?

মিসির আলি রিকশা থেকে নেমে পড়লেন। পাঁচ টাকা ভাড়া ঠিক করা ছিল, তিনি ছ'টাকা দিলেন। সহজ স্বরে বললেন, নাও, ভাড়া নাও। আমি হেঁটে চলে যাব।

সাধারণত রিকশাওয়ালাদের সবচেয়ে ময়লা ন্যাতন্যাতে নোটগুলো দেয়া হয়। মিসির আলি তাকে দিয়েছেন কচকচে নতুন নোট। এটা তিনি করলেন এই আশায়, যাতে সামসু নামের এই উদ্ধত যুবকটি তাঁর আচরণের জন্যে লজ্জিত বোধ করে।

এরকম কাণ্ডকারখানা মিসির আলি সাহেব করে থাকেন। একবার বাসে তাঁর পাশে সুখী-সুখী চেহারার এক বুড়ো বসল। দু'জনের সিট। কিন্তু বুড়ো অকারণে পা ফাঁক করে তাকে চাপ দিতে লাগল। বিশ্রী কাণ্ড। মিসির আলি খানিকক্ষণ চাপ সহ্য করলেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললেন, আপনার বোধহয় অল্প জায়গায় বসার অভ্যেস নেই, আপনি বরং একাই এখানে আরাম করে বসুন।

মিসির আলি ভেবেছিলেন, লোকটি এতে লজ্জিত ও বিব্রত হবে। সে-রকম কিছু হলো না। লোকটি নির্বিকার ভঙ্গিতে দু'জনের জায়গা দখল করে পা দোলাতে লাগল। এরা অসুখী মানুষ। নিজেদের ব্যক্তিগত যন্ত্রণা এরা অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে। ঢাকা শহরে অসুখী মানুষের সংখ্যা এত দ্রুত বাড়ছে কেন ভাবতে ভাবতে মিসির আলি দ্রুত হাঁটতে লাগলেন। মাথার ওপর জুন মাসের গনগনে আকাশ। রাস্তাঘাট তেতে উঠেছে। বাতাসের লেশমাও নেই। এবছর অসম্ভব গরম পড়েছে। এই অসহ্য গরমে রিকশাওয়ালারা মানুষ টানে কীভাবে কে জানে! মিসির আলি সামসু নামের উদ্ধত যুবকটির জন্যে এক ধরনের মায়া অনুভব করলেন।

ক্লাস ফাঁকা। আসমানি রঙের জামদানি শাড়ি পরা একটি মেয়ে শুধু সেকেন্ড বেঞ্চে বসে আছে। মেয়েটির মাথায় ঘোমটা। এটা একটা নতুন ব্যাপার। ইউনিভার্সিটির মেয়েরা মাথায় ঘোমটা দেয় শুধু আজানের সময়।

মিসির আলি চুকতেই মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। তিনি অপ্রস্তুত স্বরে বললেন, দেব কবে ফেলালাম। সবাই চলে গেছে নাকি?

জি স্যার।

তুমি বসে আছ কেন? তুমি কেন ওদের সঙ্গে গেলে না?

মেয়েটি মৃদু স্বরে বলল, স্যার, আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না?

হ্যাঁ চিনতে পারছি। তোমার নাম নীলু।

জি।

তুমি তো এই ক্লাসের নও।

জি না।

তাহলে?

আমি স্যার আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বসে আছি। আমি কুটিনে দেখেছি আর আপনার এখানে ক্লাস।

মিসির আলি ভুরু কুঁচকে বললেন, তোমার কি বিয়ে হয়েছে? মাথায় ঘোমটা, তাই বললাম। নতুন বিয়ে হওয়া মেয়েরা প্রথম দিকে ঘোমটা পরে।

আমার বিয়ে হয় নি।

ও আচ্ছা ।

আপনার সঙ্গে আমার খুব একটা জরুরি কথা আছে স্যার ।

বলো ।

আমি স্যার অনেকটা সময় নিয়ে কথাটা আপনাকে বলতে চাই । আমি কি স্যার আপনার বাসায় যেতে পারি ?

বাসায় আমার কিছু ঝামেলা আছে ।

তাহলে স্যার, আপনি কি আমাদের বাসায় একটু আসবেন ? আমার খুব দরকার । ঠিক আছে, যাব ।

আমাদের বাসার ঠিকানা কি আপনার মনে আছে ? একবার গিয়েছিলেন আমাদের বাসায় । আমাদের বাসার দোতলায় আপনার একজন পরিচিত মহিলা থাকতেন । রানু নাম ।

আমার মনে আছে ।

স্যার, আপনি কি আজই আসবেন ? আমার খুব দরকার ।

মিসির আলি তাকিয়ে রইলেন মেয়েটার দিকে । এই মেয়ের নাম নীলু, কিন্তু কোনো-এক বিচিত্র কারণে তাকে অবিকল রানুর মতো দেখাচ্ছে ।

স্যার, আপনি কি আজই যাবেন ?

ঠিক আছে রানু ।

আমার নাম কিন্তু স্যার নীলু ।

মিসির আলি লক্ষ করলেন, মেয়েটা হাসছে । যেন তাকে রানু বলায় সে খুশি । এটাই যেন আশা করছিল ।

আমাদের বাসার ঠিকানা কি লিখে দেব ?

লিখে দিতে হবে না । আমাব মনে আছে ।

আসবেন কিন্তু স্যার ।

আসব । আমি আসব ।

যাই স্যার, স্নামালিকুম ।

নীলু উঠে দাঁড়াল । এত সুন্দর মেয়েটি! শ্যামলা গায়ের রঙ । চোখে-মুখে তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই । কিন্তু তবু এমন মায়া জাগিয়ে তুলছে কেন ? মিসির আলি লজ্জিত বোধ কবলেন । তাঁর বয়স একচল্লিশ । এই বয়সের একজন মানুষের মনে এ জাতীয় তরল ভাব থাকা উচিত নয় । তাছাড়া এই মেয়েটি তাঁর ছাত্রী ।

মিসির আলি শূন্য ক্লাসে দীর্ঘ সময় বসে রইলেন । একসঙ্গে বেশ কয়েকটা জিনিস নিয়ে তিনি ভাবছেন । মেয়েটির মাথায় ঘোমটা কেন ? এই মেয়েটি দীর্ঘদিন ধরেই ক্লাসে আসছে না কেন ? মেয়েটি চলে যাবার সময়ও একটা অস্বাভাবিক আচরণ করেছে । সোজাসুজি হেঁটে গেছে, একবারও পেছন ফিরে তাকায় নি । মেয়েরা সাধারণত পেছন ফিরে তাকায় ।

সবচেয়ে রহস্যময় ব্যাপারটি হচ্ছে, একটি মৃতা মেয়ের ছাপ আছে নীলুর মধ্যে ।

যেভাবেই হোক আছে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে না।

তিনি সিগারেট ধরালেন।

প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে না— কথাটা কি সত্যি? তাঁর মনে হলো, সত্যি নয়। প্রকৃতির কাজই হচ্ছে নানান রকম রহস্য সৃষ্টি করা। মানুষের কাজ হচ্ছে সেই রহস্যের কুয়াশা সরিয়ে দেয়া। এমন একদিন কি আসবে যখন কেউ বলবে না— দেয়ার আর মেনি থিংস ইন হেভেন অ্যান্ড আর্থ...।

আরে মিসির আলি সাহেব না? এখানে কী করছেন? একা-একা ক্লাসে বসে আছেন কেন?

তিনি দাড়িওয়ালা এই লোকটাকে চিনতে পারলেন না। হাতে রেজিস্ট্রি খাতা, কাজেই অধ্যাপক হবেন। মুখখানা হাসি-হাসি। পান খেয়ে দাঁত লাল করে ফেলেছেন। পান-খাওয়া লোকজন কি কিছুটা নম্র স্বভাবের হয়? মিসির আলির মনে হলো পান এবং স্বভাবের ভেতরে কোনো-একটা সম্পর্ক আছে। তিনি যে ক'জন পানবিলাসী লোককে চেনেন, তাদের সবাই সদালাপী।

কী, কথা বলছেন না কেন? কিছু ভাবছেন নাকি?

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। শান্ত ও নরম স্বরে বললেন, জি না, কিছু ভাবছি না।

আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না?

জি না।

দাড়িওয়ালা অধ্যাপক অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। মিসির আলি বিব্রত বোধ করলেন। কাউকে 'চিনতে পারছি না' বলা তাকে প্রায় অপমান করার শামিল। বিশেষ করে অধ্যাপক শ্রেণীর মানুষরা এ ব্যাপারে খুব স্পর্শকাতর।

সত্যি চিনতে পারছেন না?

জি না। আমার একটা প্রবলেম আছে, কিছুই মনে থাকে না।

মাসখানেক আগে আমি আপনার কাছে একজন রোগী নিয়ে গিয়েছিলাম— ফিরোজ নাম। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র।

ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আপনি ফিরোজের দুলাভাই।

হ্যাঁ দুলাভাই।

এবং আপনার নাম হচ্ছে নাজিমুদ্দিন। হিষ্টি ডিপার্টমেন্ট।

এই তো চিনতে পারছেন।

চিনতে পারছি এসোসিয়েশন থেকে। একটা মনে পড়লে, অন্যগুলো মনে পড়তে থাকে। এসোসিয়েশন অব আইডিয়াস।

ফিরোজ তো অনেকখানি ইমপ্রভ করেছে। এত অল্প সময়ে যে আপনি এতটা করবেন, আমরা কেউ কল্পনাও করি নি। দারুণ ব্যাপার!

মিসির আলি কিছু বললেন না। ফিরোজ আজ বিকেলে তাঁর কাছে আসবে। প্রতি সোমবার ফিরোজের সঙ্গে তাঁর একটি সেশন হয়। অথচ নীলুকে বলে রেখেছেন, আজ যাবেন তাদের বাসায়। তাঁর কাজকর্ম ইদানীং এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে কেন? বয়স বাড়ছে।

মিসির আলি সাহেব ।

জি ?

চলুন, লাউঞ্জে বসে চা খাওয়া যাক ।

চলুন ।

আপনি এত গম্ভীর হয়ে আছেন কেন ? কী ভাবছেন এত ?

কিছু ভাবছি না ।

তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন । দীর্ঘনিঃশ্বাসটি কেন ফেললেন, এই নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলেন । অকারণে তো কেউ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে না । সবকিছুর পেছনেই কারণ থাকে । এই জগতে কার্যকারণ ছাড়া কিছুই হয় না । সবই লজিক । জটিল লজিক । জটিল কিন্তু অশ্রুত । লজিকের বাইরে এক চুলও কারো যাবার ক্ষমতা নেই ।

২

গত দু'মাস ধরে ফিরোজ প্রতি সোমবারে মিসির আলির কাছে আসে । পাঁচটার সময় আসে, থাকে সাতটা পর্যন্ত । আজ কী মনে করে তিনটার সময় চলে এসেছে । মিসির আলি তখনো ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরেন নি । তাঁর কাজের মেয়ে হানিফা দরজা খুলে দিল । সে দবজা খুলল ভয়ে-ভয়ে । ফিবোজের দিকে তাকালেই তার বুক টিপটিপ করে । বড় ভয় লাগে ।

স্যার কি আছেন. হানিফা ?

জি না ।

আজ একটু সকাল-সকাল এসে পড়েছি । আমি বসি, কেমন ?

জি আইচ্ছা ।

তুমি আমাকে এক গ্লাস লেবুর শরবত খাওয়াতে পার ? প্রচণ্ড গরম ।

হানিফার বয়স দশ । কিন্তু সে খুবই চটপটে । মিসির আলি সাহেব তাকে অল্পদিনের মধ্যেই বর্ণপরিচয় করিয়েছেন । পড়াশোনার ব্যাপারে তার অসম্ভব আগ্রহ । মেয়েটি এমনিতেও চটপটে । সে বড় এক গ্লাস শরবত বানাল । তিন টুকরা বরফ ছেড়ে দিল । দ্রুত করে শরবতের গ্লাস এবং আরেক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি নিয়ে এলো । সে দেখেছে শরবত খাবার পরপরই সবাই পানি খেতে চায় ।

ফিরোজ অবশ্যি উল্টোটা করল । পানি খেল প্রথমে । তারপর বেশ সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল, তুমি আমাকে ভয় পাও কেন হানিফা ?

ভয় পাই না তো ।

পাও, খুবই ভয় পাও । ভয় পাওয়ার কিছু নেই । আমি এখন সেরে গেছি । পুরোপুরি না সারলেও অসুখটা আর নেই । চোঁচামেঁচি হেঁচৈ কিছুই করি না । ঠিক না ?

জি ঠিক ।

এখন দেখ না— সবাই একা-একা ছেড়ে দেয় । আগে ছাড়ত না ।

হানিফা কিছু বলল না ।

ফ্যানটা ছেড়ে দাও।

হানিফা ফ্যান ছেড়ে দিল। ফিরোজ ভারি গলায় বলল, এই গরমে সুস্থ মানুষই পাগল হয়ে যায়। আর আমি তো এমনিতেই পাগল।

হানিফার বুকের ভেতর ধক করে উঠল। বলে কী এই লোক! বাড়িতে আর কেউ নেই। গুনশান নীরবতা। হানিফার ইচ্ছা করতে লাগল, বাড়ির বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে।

হানিফা।

জি?

আমাকে ভয় লাগছে।

জি।

ভয়ের কিছু নেই। আমি সেরে গেছি। ঠিক আছে— তুমি যাও। আমি বসে থাকব চুপচাপ।

হানিফা রান্নাঘরে চলে গেল। কী মনে করে সে রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। কেন জানি দারুণ ভয় করতে লাগল তার।

ফিরোজ বসে আছে চুপচাপ। তার চোখ ঈষৎ লাল। খুব সৃষ্ণভাবে হলেও তার মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা লক্ষ করা যায়। ছেলেটিব বয়স বাইশ, অত্যন্ত সুপুরুষ। চিবুক এবং ঠোঁট কিশোরীদের মতো। বড় বড় চোখ, পাতলা নাক। তাকে দেখলে মনে হয়, মেয়ে বানাতে গিয়ে প্রকৃতি কী মনে করে শেষ মুহূর্তে তাকে পুরুষ বানিয়েছে, এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কিছু কাঠিন্য ঢেলে দিয়েছে।

ফিরোজের সমস্যাটা শুরু হয় এইভাবে— সে দু'বছর আগে জানুয়ারি মাসে তাব এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল। যাবার উদ্দেশ্য ছিল একটাই— গ্রাম দেখা। ফিরোজ কখনো গ্রাম দেখে নি।

বন্ধুর বাড়ি ময়মনসিংহের মোহনগঞ্জে। চমৎকার একটা জায়গা। ভোরবেলায় আকাশের গায়ে নীলাভ গারো পাহাড় দেখা যায়। চারদিকে ধু-ধু প্রান্তর, বর্ষা আসামাত্র যা পানিতে ডুবে যায়। সেই পানি সমুদ্রের মতো গর্জন কবতে থাকে। অল্প বাতাসেই সমুদ্রের মতো বিশাল ঢেউ ওঠে।

এখন অবশ্যি শুকনো খটখট করছে চারদিকে। তবু ফিরোজ মুগ্ধ হয়ে গেল। সবচেয়ে মুগ্ধ হলো বন্ধুর বাড়ি দেখে। বিশাল এক দালান। সিনেমাতে পুবনো আমলের জমিদার বাড়ির মতো বাড়ি। একেকটি ঘর এত উঁচু এবং এত বিশাল যে, কথা বললেই প্রতিধ্বনি হয়।

ফিরোজের বন্ধুর নাম আজমল চৌধুরী। সে তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাড়ি দেখাল। অতিথিদের থাকবার জায়গা। নায়রীদের থাকবার জায়গা। কুয়োটলা। বাড়ির পেছনের সারদেয়াল, যেখানে পূর্বপুরুষদের কবর আছে। ফিরোজের বিশ্বয়ের সীমা রইল না। কী কাণ্ড! সে মুগ্ধ কণ্ঠে বলল, এ তো হলস্থূল ব্যাপার রে আজমল! তোরা রাজা-মহারাজা ছিলি— তা তো কোনোদিন বলিস নি।

এখন কিছুই নেই। দালানটাই আছে, আর কিছুই নেই। সেই দালানই ভেঙে ভেঙে

পড়ছে। আরেকটা ভূমিকম্প হলে গোটা দালানই ভেঙে পড়ে যাবে। তাছাড়া খুব সাপের উপদ্রব।

বলিস কী!

এখন ভয় নেই কোনো। সব সাপ হাইবারনেশনে চলে গেছে। গরমের সময় ভয়াবহ কাণ্ড হয়।

কোনো ব্যবস্থা করতে পারিস না?

আজমল কঠিন স্বরে বলল, এর একটামাত্র ব্যবস্থাই আছে, সব ছেড়ে-ছুড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া।

এত চমৎকার ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি, বলিস কী?

চলে যাব। এখানে থাকলে মারা পড়তে হবে। তিনটা মাত্র মানুষ আমরা। আমি, মা আর আমার ছোটবোন। এত বড় বাড়ি দিয়ে আমি কবব কী? জঙ্গল হয়ে গেছে চারদিকে, দেখছিস না?

দু'দিন থাকার পরিকল্পনা নিয়ে ফিরোজ গিয়েছিল, কিন্তু পঞ্চম দিনেও সে ফেবার কথা কিছু বলল না।

বড় আনন্দে সময় কাটতে লাগল। গ্রাম যে এত ইন্টারেস্টিং হবে, তা তার ধারণার বাইরে ছিল। শুধু একটি খটকা লেগে থাকল তার মনে। আজমলের বোনের সঙ্গে তার দেখা হলো না, যদিও মেয়েটি এই বাড়িতেই থাকে। মেয়েটির নাম— নাজ। আজমলের মা প্রায়ই তাঁর মেয়েকে চিকন গলায় ডাকেন, ও নাজ, ও নাজ। তার উত্তরে মেয়েটি ক্ষীণ স্বরে সাড়া দেয়। মেয়েটির সাড়া শব্দ এইটুকুই। ফিরোজ একবার ভেবেছিল, আজমলকে তাব বোনের কথা জিজ্ঞেস করে। শেষ পর্যন্ত তা করা হয় নি। প্রাচীনপন্থী একটি পরিবার, হয়তো কিছু মনে করে বসবে। এদের হয়তো কঠিন পর্দার ব্যাপার আছে।

ষষ্ঠ দিন সন্ধ্যায় মেয়েটির সঙ্গে ফিরোজের দেখা হয়ে গেল। ফিরোজ অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। দম ভাঙল সন্ধ্যাবেলা। চাবদিক অন্ধকার। ঘরে আলো দিয়ে যায় নি। ফিরোজ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমেই হকচকিয়ে গেল। সতের-আঠার বছরের একটি মেয়ে দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার এক হাতে একটি হারিকেন। হারিকেনের আলো পড়েছে মেয়েটির মুখে। এই মুখ কি কোনো মানবীর মুখ? অসম্ভব! পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত রূপ কি এই মুখে আঁকা নয়? ফিরোজ চোখ ফিরিয়ে নিতে চাইল— পারল না। সে তাকিয়েই রইল।

মেয়েটি বলল, আমি নাজনীন।

কিছু-একটা বলতে হয়। ফিরোজ বলতে পারল না। কোনো কথা তার মনে এলো না। এই অসম্ভব রূপবতী মেয়েটিকে সে কী বলবে?

ভাইয়া বাজারে গেছে, এসে পড়বে। আপনি বড় ঘরে বসুন— চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ফিরোজ বড় ঘরের দিকে রওনা হলো আচ্ছন্নের মতো, এবং সে মনে করতে পারল না মেয়েটির গায়ে শাড়ি ছিল, না সালোয়ার-কামিজ ছিল। মেয়েটির চুল কি বেগি-বাঁধা ছিল, না খোলা ছিল। তার মুখটি কি গোলাকার, না লম্বাটে। কিছুই মনে নেই। শুধু মনে

আছে একটি ভুলি দিয়ে আঁকা মুখ সে দেখে এসেছে। যে-শিল্পী ছবিটি এঁকেছেন তাঁর বাস এ পৃথিবীতে নয়— অন্য কোনো ভুবনে।

রাতে খাবার সময় আজমল সহজ স্বরে বলল, নাজের সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে, তাই না ? নাজ বলছিল।

ফিরোজ কিছু বলল না। আজমল বলল, ও কিছুতেই তোর সামনে আসতে চাচ্ছিল না। দেখাটা সে জন্যেই এমন হঠাৎ হয়েছে।

আসতে চাচ্ছিল না কেন ?

লজ্জা। ওর পোলিওতে একটা পা নষ্ট। এই লজ্জায় সে কারো সামনে পড়তে চায় না।

আজমলের মুখ কঠিন হয়ে গেল। সে রুক্ষ স্বরে বলল, পৃথিবীর সমস্ত লজ্জা তার মধ্যে। শুধু তোর সামনে কেন, কারো সামনেই সে যায় না।

সমস্ত রাত ফিরোজ এক ফোঁটা ঘুমোতে পারল না। এত কষ্টের রাত তার জীবনে আসে নি। এবং ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটল পরদিন দুপুরে।

ফিরোজ একা-একা শিয়ালজানি খালের পাড় ধরে হাঁটতে গেল। এবং তাব এক ঘণ্টার মধ্যেই চার-পাঁচজন লোক তাকে ধরাধরি করে নিয়ে এলো। তার চোখ লাল টকটক করছে। দৃষ্টি উদ্ভাস্ত। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে। কথাবার্তা অসংলগ্ন। মাঝে-মাঝে বিকট স্বরে চৈচিয়ে উঠছে এবং দৌড়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করছে।

আজমল এবং তার মা হতভম্ব। নাজনীন সমস্ত ব্যাপার দেখে অনবরত কাঁদছে। বাড়ি ভর্তি হয়ে গেছে মানুষে। নানান জল্পনা-কল্পনা। খাবাপ বাতাস লেগেছে। জ্বীনে ধরেছে। কালির আছর হয়েছে।

ফিরোজকে নিয়ে আসা হলো ঢাকায়। সারিয়ে তুললেন মিসির আলি সাহেব। সেই সারানোর ব্যাপারটা সাময়িক। কিছুদিন সুস্থ থাকে, আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। লোকজনদের গলা টিপে ধরতে চায়। জিনিসপত্র ভেঙে একাকার করে।

তবে এখন অবস্থা অনেক ভালো। অসুস্থতার সময় আগের মতো ভায়োলেন্ট হয় না। চুপ করে থাকে। কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলে না। খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে অন্ধকার ঘরে বসে থাকে। ঘর থেকে শুধু বিড়বিড় শব্দ শোনা যায়। যেন সে কারো সঙ্গে কথা বলছে।

যখন সে সুস্থ থাকে, তখন তার অসুস্থ অবস্থার কথা বিশেষ মনে থাকে না। মিসির আলি সাহেব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যা বের করেছেন, তা খাতায় লিখে রেখেছেন। লেখা হয়েছে ফিরোজের জবানিতে।

অসুস্থতার বিবরণ

সারা রাত নানান কারণে আমার ঘুম হয় নি। শেষ রাতের দিকে একটু ঘুম এলো। তাও অল্প কিছুক্ষণের জন্যে। ছুটির সময় বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে দেখি, আজমল একটা চাদর গায়ে দিয়ে আমবাগানে রোদের জন্যে অপেক্ষা করছে। চট করে রোদ উঠবে

মনে হলো না। কারণ খুব কুয়াশা। আমি লক্ষ করেছি, আটটা-
নটার আগে এ অঞ্চলে সূর্যের দেখা পাওয়া যায় না।

আজমল আমাকে দেখে বলল, আজ এত সকাল-সকাল উঠলি যে ? চোখ লাল
কেন ? রাতে ঘুম হয় নি ?

হয়েছে।

চা খাবি এক কাপ ? নাশতা হতে দেরি হবে। চাল কোটা হচ্ছে, পিঠা হবে। সময়
লাগবে।

চা এক কাপ খাওয়া যায়।

চা খেতে খেতে পাখি শিকার নিয়ে কথা হলো। এখান থেকে প্রায় মাইল চারেক
দূরে পুকইরা বিলে নাকি খুব হাঁস নামছে। শেষ রাতে উঠে গেলে প্রচুর পাওয়া যাবে।

আমি হাঁস মারার ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দেখলাম, কিন্তু আজমলের কাছ থেকে
কোনোরকম সাড়া পাওয়া গেল না। অথচ এখানে যার সঙ্গেই দেখা হয়, সে-ই জিজ্ঞেস
করে পাখি শিকার করতে এসেছি কিনা। আজমলের এরকম অনাগ্রহের কারণ নাশতা
খাবার সময় টের পাওয়া গেল। এদের পাখি মাবার কোনো বন্দুক বর্তমানে নেই। একটা
দোনলা উইনস্টন গান ছিল। অর্থনৈতিক কারণে বিক্রি করে ফেলতে হয়েছে। শিকারের
প্রসঙ্গ উঠতেই এই কারণে আজমল মন খাবাপ করেছে। আমার নিজেরও তখন একটু
খাবাপ লাগল। শিকারের প্রসঙ্গটা না তুললেই হতো।

রোদ উঠল দশটাব দিকে। আমি ভেবেছিলাম আজমলের সঙ্গে বাজারের দিকে
যাব। কিন্তু আজমল বলল, তুই থাক, আমি দেখি একটা বন্দুকের ব্যবস্থা করা যায়
কিনা।

আমি বললাম, বন্দুকের ব্যবস্থা করার কোনো দরকার নেই। শিকারের দিকে আমার
কোনো ঝোক নেই।

আজমল আমার কোনো কথা শুনল না। সে অসম্ভব জেদি। আমাকে রেখে চলে
গেল। আমার তেমন কিছু করাও নেই। শিয়ালজানি খাল ধরে উত্তর দিকে হাঁটতে শুরু
করলাম।

এ অঞ্চলে হিন্দু বসতি খুব বেশি। এদের ঘর-দুয়া খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেখতে
ভালো লাগে। তবে অনেক বাড়ি-ঘর দেখলাম ফাঁকা। আজমলের কাছে শুনেছি, অনেক
হিন্দু পরিবার একান্তরের যুদ্ধে কোলকাতা গিয়ে আর ফিরে আসে নি। বেশ কিছু মারা
পড়েছে পাকিস্তানি আর্মির হাতে। এদের ঘর-বাড়ি ফাঁকা। বড় বড় ঘাস জন্মেছে।
জনমানবশূন্য বাড়ি-ঘর দেখতে কেমন যেন ভয় ভয় লাগে। গা ছমছম করে।

আমি ঠিক করলাম বাড়ি ফিরে যাব। চড়চড় করে রোদ উঠছে। পানির তৃষ্ণা হচ্ছে।
হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে এসেছি। যে জায়গাটায় আছি, তা অসম্ভব নির্জন। আমি
বিশাল একটা বকুল গাছের নিচে দাঁড়লাম খানিকক্ষণ। তখনই ব্যাপারটা ঘটল। গরগর
একটা শব্দ শুনলাম গাছে। যেন কেউ গাছের ডাল নাড়াচ্ছে। আমি চমকে গাছের দিকে
তাকাতেই রক্ত হিম হয়ে গেল।

দেখলাম গাছের ডালে একজন মানুষ বসে আছে। খালি গা। পরনে একটা প্যান্ট।

চোখে গোল্ড রিম একটা চশমা। লোকটি রোগা এবং দারুণ ফর্সা। মুখের ভাব অত্যন্ত রুক্ষ। সে সাপের মতো সরসর করে নেমে এলো। একজন মানুষ গাছ থেকে নেমে আসার মধ্যে তেমন অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু আমার শরীর কাঁপতে লাগল। ঘামে গা চটচটে হয়ে গেল। লোকটির দৃষ্টি অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ। চশমার কাচের আড়ালেও তার চোখ চকচক করছে। সে এক পা এক পা করে এগিয়ে এলো আমার দিকে। আমার প্রচণ্ড ইচ্ছা করছিল ছুটে পালিয়ে যেতে। কিন্তু আমার পা যেন মাটিতে লেগে গেছে। নড়বার সামর্থ্য নেই। লোকটির কাছ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবারও ক্ষমতা নেই। সে এগিয়ে এলো আমার দিকে, তারপর একটা চড় বসিয়ে দিল। এর পরের ঘটনা আমার আর কিছুই জানা নেই।

মিসির আলি সাহেব তাঁর ছোট ছোট অক্ষরে প্রচুর নোট লিখেছেন। প্রায় পঁচিশ পৃষ্ঠার একটি বিশ্লেষণী প্রবন্ধও আছে ইংরেজিতে লেখা। কিছু পয়েন্টস আছে আন্ডারলাইন করা। দু'একটি পয়েন্ট এরকম—

১. ফিরোজের গল্পে বেশ কিছু মজার ব্যাপার আছে। সে চশমা-পরা একটি লোককে নেমে আসতে দেখল খালি গায়ে। কিন্তু তার পরনে আছে প্যান্ট। যে লোকটি চশমা এবং প্যান্ট পরে, সে খালি গায়ে থাকে না। লুঙ্গি পরা একটি লোক খালি গায়ে নেমে এলে বাস্তব চিত্র হতো। ফিরোজ দেখেছে একটি অবাস্তব চিত্র। অবাস্তব চিত্রগুলো আমরা দেখি স্বপ্নে। ফিরোজ কি একটি স্বপ্নদৃশ্যের বর্ণনা করছে?
২. ফিরোজ বলেছে লোকটির পবনে ছিল প্যান্ট। কিন্তু প্যান্টেব বঙ কী, তা সে বলতে পারছে না। তার মানে কি এই যে, প্যান্টের কোনো রঙ ছিল না। স্বপ্নদৃশ্য সব সময় হয় সাদা-কালো। স্বপ্ন বর্ণহীন। অবশ্যি সে একটি রঙ স্পষ্ট উল্লেখ করছে। সেটি হচ্ছে চশমাব ফ্রেমের রঙ। সে বলেছে গোল্ড রিম চশমা। অর্থাৎ সে সোনালি রঙ দেখতে পাচ্ছে, স্বপ্ন দৃশ্যে যা সম্ভব নয়।
৩. তার গল্পের কোথাও সে নাজনীন প্রসঙ্গ উল্লেখ করে নি। আমার মনে হচ্ছে, ফিরোজের সমস্ত ব্যাপারটায় নাজনীনের একটি ভূমিকা আছে। অসুস্থ হবার আগের রাত সে অনিদ্রায় কাটিয়েছে। অনিদ্রার মূল কারণ রূপবতী একটি মেয়ে। আমি লক্ষ্য করেছি, আমার সঙ্গে কথাবার্তার সময়ও সে এই প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যায়। কেন যায়?
৪. সে তার গল্পে বলেছে, সে একটি বকুল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু যে-গাছের নিচে সে দাঁড়িয়ে ছিল, সেটা একটা বট গাছ। ফিরোজ বকুল গাছ এবং বট গাছের পার্থক্য জানবে না, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সে গাছের নিচে আসার আগেই একটি ঘোরের ভেতর ছিল বলে আমার ধারণা। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস বকুল গাছ প্রসঙ্গে তার কোনো একটি পীড়াদায়ক স্মৃতি আছে। (পরে

বকুল গাছ প্রসঙ্গে আরো তথ্যাদি আছে।)

৫. ফিরোজের চশমা-পরা লোকটি ছিল ফর্সা, রোগা ও লম্বা, যার চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই বর্ণনা আজমলের বেলায়ও খাটে। এই ছেলেটি অসম্ভব ফর্সা, রোগা এবং লম্বা। সে অবশ্য চশমা পরে না, মেডিকেল কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়বার সময় তার চশমা ছিল। এবং সেটা ছিল গোল্ড রিম চশমা। সেই সময় ফিরোজ এবং আজমল ছিল রুমমেট।

ফিরোজ প্রসঙ্গে ইংরেজিতে কিছু নোটস আছে। নোটসগুলোর বঙ্গানুবাদ দেয়া হলো—

বকুল গাছ বিষয়ে কয়েকটি কথা

আমার প্রাথমিক অনুমান ছিল বকুল গাছ প্রসঙ্গে ফিরোজের একটি পীড়াদায়ক স্মৃতি আছে। অনুমান মিথ্যা নয়। আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পারি ফিরোজরা এক সময় সিলেটের মীরাবাজারে থাকত। তার বাসা থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে একটি বকুল গাছ ছিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খুব ভোরবেলায় বকুল ফুল কুড়াতে যেত।

ফিরোজের বয়স তখন আট বছর। সে তার বড় বোনের সঙ্গে এক ভোরবেলায় ফুল কুড়াতে গিয়ে একটি অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখল। একটি নগ্ন যুবতীর মৃতদেহ দড়িতে ঝুলছে। এটি একটি হত্যাকাণ্ড। মেয়েটিকে মেরে দড়িতে ঝুলিয়ে দিয়েছে।

অল্প বয়স্ক একটি শিশুর কাছে নগ্ন নারীদেহ এমনিতেই যথেষ্ট অস্বাভাবিক। সেই দেহটি যদি প্রাণহীন হয়, তাহলে তা সহ্য করা মুশকিল।

ফিরোজ অসুস্থ হয়ে পড়ল। প্রবল জ্বর এবং ডেলিরিয়াম। শৈশবে এই দৃশ্য ফিরোজের মস্তিষ্কের নিউরোনে জমা আছে, তা বলাই বাহুল্য।

মিসির আলি সাহেব বাড়ি ফিরলেন পাঁচটা বাজার কিছু পরে। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। ক্ষণেক্ষণে বিদ্যুৎ চমকচ্ছে। অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। ঝাঁকে-ঝাঁকে কাক উড়ছে আকাশে। ঝড় হবে সম্ভবত। পশু-পাখিরা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের খবর আগে আগে পায়।

ঘরে ঢুকে যে দৃশ্যটি দেখলেন, তার জন্যে মিসির আলির মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। ফিরোজ বসে আছে মূর্তির মতো। তার হাতে একটা লোহার রড। সে শক্ত হাতে রড চেপে ধরে আছে। এত শক্ত করে চেপে ধরে আছে যে, তার হাতের আঙুল সাদা হয়ে আছে। চামড়ার নিচের শিরা নীল হয়ে ফুলে উঠেছে।

রড সে পেল কোথায়? এই প্রশ্নটির উত্তর পরে ভাবলেও হবে। ঠিক এই মুহূর্তে তাঁকে বুঝতে হবে, ফিরোজ এরকম আচরণ কেন করেছে। তিনি সহজ স্বরে বললেন, একটু দেরি করে ফেললাম। তুমি কি অনেকক্ষণ হয়েছে এসেছ নাকি?

ফিরোজ জবাব দিল না। তার চোখ টকটকে লাল। নিঃশ্বাস ভারি। কী সর্বনাশের কথা! মিসির আলি প্রাণপণে চেষ্টা করলেন স্বাভাবিক থাকতে।

বুঝলে ফিরোজ, খুব ঝড়-বৃষ্টি হবে। আকাশ অন্ধকার হয়েছে মেঘে। তোমার হাতে ওটা কি লোহার রড নাকি?

হঁ।

লোহার রড নিয়ে কী করছ? দাও রেখে দিই।

না।

চা-টা কিছু খেয়েছ?

ফিরোজ কোনো জবাব দিল না। তার দৃষ্টি তীব্র ও তীক্ষ্ণ।

সিগারেট খাবে? নাও একটা সিগারেট ধরাও।

আশ্চর্যের ব্যাপার, ফিরোজ রড ছেড়ে দিয়ে হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিল। মনে হচ্ছে একটা ভয়াবহ বিপর্যয় এড়ানো গেছে। সিগারেট শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে এটা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। সিগারেট শেষ হতে লাগবে তিন মিনিট। তিন মিনিট যথেষ্ট দীর্ঘ সময়।

তোমার জ্বর নাকি ফিরোজ?

ফিরোজ জবাব দিল না। মিসির আলি তার কপালে হাত দিলেন। গা ঠাণ্ডা হয়ে আছে। মিসির আলি বললেন, হঁ, বেশ জ্বর তো। একটা ট্যাবলেট খেয়ে নাও, জ্বরটা কমবে।

তিনি ড্রয়ার খুলে একশ' মিলিগ্রাম লিব্রিয়ামের ট্যাবলেট বের করলেন। অত্যন্ত কড়া ঘুমের ওষুধ। কোনো রকমে খাইয়ে দিতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে কাজ কববে। সেন্ট্রাল নার্সাস সিস্টেমে গিয়ে ধরবে। মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহের পরিমাণ কমে আসবে। উত্তেজিত অংশগুলোর উত্তেজনা দ্রুত হ্রাস পাবে। লিব্রিয়াম একটি চমৎকার ওষুধ।

নাও ফিরোজ, খেয়ে নাও।

ফিরোজ কোনো রকম আপত্তি ছাড়াই ওষুধ খেয়ে ফেলল। রক্তে ওষুধ মেশবার জন্যে সময় দিতে হবে। বেশি নয়, অল্প কিছু সময়। এই সময়টা গল্পগুজবে আটকে রাখতে হবে।

চা খেলে কেমন হয় ফিরোজ? বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে চা-টা জমবে মনে হয়। খাবে?

হঁ খাব।

বসো, আমি চা নিয়ে আসছি। কিংবা এক কাজ কর। শুয়ে পড় সোফায়— আবাম কর।

মিসির আলি বেরিয়ে এলেন। শোবার ঘরের দরজা লাগিয়ে এলেন বারান্দায়। এখন তিনি নিশ্চিন্ত বোধ করছেন। ফিরোজকে বারান্দায় এলে দরজা ভেঙে আসতে হবে। এটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এর মধ্যেই লিব্রিয়াম তাব কাজ করতে শুরু করবে।

মিসির আলি ডাকলেন, হানিফা, হানিফা।

হানিফা রান্নাঘরের দরজা খুলে বের হয়ে এলো। ভয়ে আতঙ্কে তার মুখ সাদা হয়ে গেছে। সে কাঁপছে থরথর করে।

কী হয়েছিল হানিফা ?

হানিফা কিছু বলতে পারল না। আতঙ্ক এখনো তাকে ঘিরে আছে। মিসির আলি সাহস দেবার জন্যে হানিফার মাথায় হাত রাখলেন। হানিফা ক্ষীণ স্বরে বলল, এই লোকটা একটা লোহার শিক লইয়া আমারে মারতে আইছিল।

তারপর ?

আমি দরজা বন্ধ কইরা বইসা ছিলাম। তারপর শুনি সে কার সাথে যেন কথা কইতেছে!

কার সাথে কথা বলছে ?

অন্য একটা মানুষ।

তুমি দেখেছ অন্য কোনো মানুষ ?

জি না, কিন্তু কথা শুনিছি। মোটা গলা।

ঠিক আছে এখন যাও, ভালো করে এক কাপ চা বানাও। ভয়ের কিছু নেই।

হানিফা চা বানাতে গেল। মিসির আলি লক্ষ করলেন, মেয়েটির পা এখনো কাঁপছে। চা বানাতে বানাতে ঠিক হয়ে যাবে। ভয় থেকে মুক্তি পাওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে, কোনো-একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকা।

মিসির আলি ঘড়ি দেখলেন। দশ মিনিট পার হয়েছে। লিব্রিয়াম নিশ্চয়ই তার কাজ শুরু করেছে। বসার ঘর থেকে কোনো সাড়াশব্দ আসছে না। এখন নিশ্চিন্তে সেখানে যাওয়া যায়।

তিনি বসাব ঘরে ঢুকলেন। ফিরোজ লোহার রড হাতে বসে আছে। অসুখের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তাঁর শিরদাঁড়া দিয়ে একটা শীতল শ্রোত বয়ে গেল। তিনি শুকনো গলায় বললেন, চা বানাতে বলে এসেছি। চা চলে আসবে।

ফিরোজ চাপা গলায় বলল, আজ আপনার একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা করবার কথা।

মিসির আলির মাকে ওঠা উচিত, কিন্তু তিনি চমকে উঠলেন না। তিনি জানেন, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় মানুষের টেলিপ্যাথিক সেন্স প্রবল হয়ে ওঠে। ফিরোজের এখন সেই অবস্থা। সে ব্যাখ্যার অতীত কোনো-একটি উপায়ে তাঁর মস্তিষ্কের বায়োকোরেন্ট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করছে।

একটি মেয়ের সঙ্গে আপনার দেখা করবার কথা না ?

হ্যাঁ, কথা আছে।

তার কাছে গেলে আপনার বিপদ হবে।

কী করে বুঝলে ?

আমাকে বলে গেছে।

কে বলে গেছে ? ঐ চশমাপরা লোক ?

হ্যাঁ।

মিসির আলি লক্ষ করলেন ফিরোজের চোখের পাতা ঘনঘন পড়তে শুরু করেছে।
REM— র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট। লিব্রিয়াম কাজ করতে শুরু করেছে।

তিনি সহজ স্বরে বললেন, শোন ফিরোজ, আমি আমার সারা জীবনে আমার নিজের লাভ-ক্ষতির দিকে তাকাই নি। আমি ঐ মেয়েটির কাছে যাব।

ফিরোজ ঘুমিয়ে পড়ল।

বাইরে গাড়ি হর্ন দিচ্ছে। ফিরোজকে যাবার জন্যে গাড়ি পাঠিয়েছেন তার বাবা-মা।

মিসির আলি ড্রাইভারকে নিয়ে ধরাধরি করে ঘুমন্ত ফিরোজকে গাড়িতে তুলে দিলেন। ড্রাইভারকে বললেন, ও অসুস্থ। আজ রাতটা ওকে ভালাবন্ধ করে রাখতে হবে। সকালবেলা আমি ওকে দেখতে যাব। আর শোন, ও রাতে বিড়বিড় করে কথা-টখা বলবে। একটা ক্যাসেট রেকর্ডারের ব্যবস্থা করতে বলবে, যাতে ওর সমস্ত কথাবার্তা রেকর্ড হয়ে যায়। এটা খুব দরকার।

ড্রাইভার শুকনো মুখে তাকিয়ে রইল। মিসির আলি ঘরে পা দিতেই মুম্বলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। সেই সঙ্গে বাতাস। এরকম দুর্যোগের রাতে নীলুর কাছে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। মিসির আলি ছোট নিঃশ্বাস ফেললেন।

ফিরোজের ব্যাপারে তাঁর মনটা খারাপ হয়ে গেছে। ইঠাৎ এরকম হবে কেন?

৩

বহু খোঁজাখুঁজি করেও মিসির আলি নীলুদের বাড়ি বের করতে পারলেন না। তাঁর কাছে কোনো ঠিকানা নেই। তিনি ইচ্ছা করেই ঠিকানা রাখেন নি। না রাখাটা বোকামি হয়েছে। কাঁঠালবাগানের যে-অঞ্চলে লাল রঙের দোতলা বাড়ি থাকার কথা, সেখানে লাল রঙের কোনো বাড়িই নেই।

কয়েকটি পান-বিড়ির দোকানদারকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন— লাল রঙের দোতলা বাড়ি, ভেতরে ফুলের বাগান আছে। ওরা যখন শুনল তিনি ঠিকানা জানেন না এবং বাড়ির মালিকের নামও জানেন না, তখন খুবই অবাক হয়ে গেল।

ঢাকা শহরে ঠিকানা দিয়াও বাড়ি পাওন যায় না, আফনে আইছেন ঠিকানা ছাড়া। কেমন লোক আফনে!

মিসির আলির নিজেরও মনে হলো, কাজটা বুদ্ধিমানের মতো হয় নি। স্মৃতির উপর বিশ্বাস করতে নেই। স্মৃতি হচ্ছে প্রতারক। নানানভাবে সে মানুষকে প্রতারণা করে।

অন্য কোনো মানুষ হলে এতক্ষণ খোঁজাখুঁজি বন্ধ করে বাড়ি চলে যেত। কিন্তু তিনি ভিন্ন ধরনের মানুষ। কোনো-একটি বিষয় শেষ না দেখে তিনি ছাড়েন না। কাজেই সকাল দশটার সময় তাঁকে দেখা গেল একটা রিকশা ঠিক করতে। ঘণ্টা হিসাবে চুক্তি। এক ঘণ্টা সে মিসির আলিকে নিয়ে কাঁঠাল বাগানের বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরবে। তিনি বাড়ি বের করতে চেষ্টা করবেন।

মিসির আলির কোলে রসমালাইয়ের একটা হাঁড়ি। কী মনে করে যেন তিনি এক সের রসমালাই কিনে ফেলেছেন। ছাত্রীর বাড়িতে খালি হাতে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু এখন মিষ্টির হাঁড়িটা একটা উপদ্ৰবের মতো লাগছে। মিসির আলির কেন যেন মনে হচ্ছে, যে-কোনো মুহূর্তে হাঁড়ি ভেঙে তার সমস্ত শরীর মাখামাখি হয়ে যাবে।

রিকশাওয়ালাটা বুড়ো এবং চালাক। খুব কম পরিশ্রমে সে এক ঘণ্টা পার করতে চায়। রিকশা চলছে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে। মিসির আলি বললেন, বুড়ো মিয়া, আপনি এই যে আস্তে আস্তে রিকশা চালাচ্ছেন, এতে কিন্তু আপনার কষ্ট বেশি হচ্ছে। প্রতিবারই নতুন করে মোমেন্টাম দিতে হচ্ছে। কিন্তু আপনি যদি জোরে চালাতেন, তাহলে মোমেন্টামের জন্যে বল দিতে হতো একবার। বাকি সময়টা শুধু ফ্রিকশন কাটানোর জন্যে অল্প কিছু বল লাগত।

বুড়ো রিকশাওয়ালাকে এই জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কিছুমাত্র অনুপ্রাণিত করতে পারল না। তার রিকশার গতি আরো শ্রুত হয়ে গেল।

মিসির আলি ভাবতে চেষ্টা করলেন, যে বাড়িতে আগে একবার এসেছেন, সে-বাড়িটি এখন খুঁজে না পাওয়ার পেছনে কী কী কারণ থাকতে পারে। অনেকগুলো কারণ হতে পারে। পরবর্তী সময়ে হয়তো লাল রঙের দালানটিকে সাদা রঙ করা হয়েছে। দোতলা ছিল, তিনতলা করা হয়েছে। ফুলের বাগান নষ্ট করে ঘর তোলা হয়েছে। কিংবা এ-ও হতে পারে যে, মস্তিষ্কের যে-অংশ বস্তুজগতের আবস্থানিক বিষয়গুলোর বিশ্লেষণ করে নিউরোন স্মৃতিকক্ষে জমা রাখে— তার সেই অংশ কাজ করছে না।

মিসির আলি হঠাৎ লক্ষ করলেন, তাঁর রসমালাইয়ের হাঁড়ি দু'খণ্ড হয়েছে। সমস্ত গায়ে, রিকশার সিটে এবং নিচে রসে মাখামাখি। এই অবস্থায় নীলুর বাসা খোঁজার কোনো মানে হয় না। অথচ এক ঘণ্টা পার হতে এখনো পনের মিনিট বাকি। পনের মিনিট আগে রিকশা ছেড়ে দেবারও প্রশ্ন ওঠে না। তিনি রিকশাওয়ালাকে ছায়ায় নিয়ে রিকশা দাঁড় করাতে বললেন।

রসে মাখামাখি হয়ে তিনি পনের মিনিট রিকশার সিটে বসে রইলেন। মিষ্টির লোভে তাঁব মাথার ওপর কাক ডাকতে লাগল। দু'-একটা সাহসী কাক ছৌঁ মেরে মেরে রসগোল্লার টুকরা ঠোঁটে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে। বুড়ো রিকশাওয়ালা অবাক হয়ে তাঁকে দেখছে। সে তার জীবনে এমন বিচিত্র যাত্রী খুব বেশি পায় নি। মিসির আলি বললেন, পনের মিনিট পার হলেই আমি চলে যাব, বুঝলেন?

রিকশাওয়ালা; মাথা নাড়ল— সে বুঝেছে।

আজ গরম সে-রকম নেই। কাল রাতে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় আজ একটা শীতল ভাব আছে। তাছাড়া রাস্তাঘাট ঝকঝক করছে। গাছপালায় সতেজ ভাব। কচুরিপানার মতো হালকা বেগুনি ফুল ফুটে আছে জারুল গাছে। কী চমৎকার যে লাগছে দেখতে! এই ফুলগুলোর জন্যেই চারদিকে একটা কোমল ভাব চলে এসেছে।

মিসির আলি বাসায় ফিরলেন এগারটার সময়। বাসায় এক ফোঁটা পানি নেই। একটার দিকে বাড়িওয়ালা কল ছাড়বে। তাব আগে গোসলের কোনো সম্ভাবনা নেই। রসমালাইয়ের রস সারা গায়ে মেখে বসে থাকতে হবে।

তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। হানিফাকে চা বানাতে বলে ফিরোজের ফাইল খুলে বসলেন। এই ফাইলটিতে লেখা— ফিরোজ/মোহনগঞ্জ। মোহনগঞ্জে ফিরোজের অভিজ্ঞতা এবং মোহনগঞ্জ প্রসঙ্গে যাবতীয় খবরাখবর এখানে আছে। তিনি মোহনগঞ্জের

বিভিন্ন লোকজনের কাছে যে-সব চিঠিপত্র লিখেছেন, তার কপি এবং সেইসব চিঠিপত্রের জবাবও এখানে আছে।

মিসির আলি পাতা উন্টাতে লাগলেন। প্রথম চিঠিটি নাজনীনকে লেখা। তারিখ দেয়া আছে ১৭.০৬.৮৫, প্রায় এক বছর আগে লেখা চিঠি। আজ হচ্ছে ১০.০৬.৮৬। মিসির আলি নিজের লেখা চিঠির উপর চোখ বোলাতে লাগলেন।

নাজনীন,

কল্যাণীয়াসু, আমার ভালোবাসা নাও। পরিচয় দিয়ে নিচ্ছি— আমি মিসির আলি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিষয়ের একজন অধ্যাপক। ফিরোজ খান নামের একজন মানসিক রোগীর চিকিৎসার দায়িত্বে নিয়োজিত। তাকে চিকিৎসা করা হচ্ছে মেডিস্টিক সাইকোথেরাপি পদ্ধতিতে। এই রোগীকে তুমি চেনো। ও তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিল এবং সে অসুস্থ হয়ে পড়ে তোমাদের বাড়িতেই। শোন নাজনীন, মানসিক রোগের উৎপত্তি মনে। মানুষের মন বিচিত্র জিনিস। সমগ্র নক্ষত্রপুঞ্জ যে রহস্য ও জটিলতা আছে, তার চেয়েও অনেক বেশি রহস্যময় মানুষের মন। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে সেই রহস্যের জট খুলতে চেষ্টা করি। প্রায় সময়ই তা সম্ভব হয় না। ফিরোজের বর্তমান যে অবস্থা, তার কারণ অনুসন্ধান করতে তোমার সাহায্য প্রয়োজন। একটি অসুস্থ ছেলের সাহায্যে তুমি কি এগিয়ে আসবে না? আমি যা জানতে চাই, তা হচ্ছে— ফিরোজের সঙ্গে তোমার ক'বাব দেখা হয়েছে এবং কী কী কথা হয়েছে। কোনো কিছু বাদ না দিয়ে আমাকে জানাবে। আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন তথ্যও অর্থবহ হতে পারে। আমার শরীরটা বিশেষ ভালো না। শরীর একটু ভালো হলে তোমাদের বাড়িটা দেখতে যাব। এই ব্যাপারে তোমারই বড় ভাই আজমলের সাথে কথা হয়েছে। আদর ও ভালোবাসা নাও।

মিসির আলি

চিঠির উত্তর তিনি এক সপ্তাহের ভেতর পেয়ে গেলেন। তিনি মুগ্ধ হলেন চিঠি পড়ে। সহজ এবং আন্তরিক ভঙ্গিতে লেখা চিঠি। হাতের লেখা বড় সুন্দর। তার চিঠির অংশবিশেষ এরকম—

‘ভাইয়া যে তার বন্ধুকে নিয়ে বেড়াতে আসবে, তা আমি জানতাম। গরমের ছুটির সময় এসে বলে গিয়েছিল। ভাইয়া সেই কলেজে পড়ার সময় থেকে তার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে বেড়াতে আসে। আমাদের বাড়িটা বিশাল। ভাইয়া তার বন্ধুদের এই বাড়ি দেখিয়ে মুগ্ধ করতে চায় বলেই আমার ধারণা।

যাই হোক, ভাইয়ার বন্ধুরা এলে আমার খুব ভালো লাগে। বাড়িতে একটা উৎসব উৎসব ভাব থাকে। ভাইয়ার মেজাজ থাকে খুব খারাপ (আপনি বোধহয় জানেন না, ভাইয়া খুব রাগী)।

এবার যখন ফিরোজ ভাই বেড়াতে এলো— আমার মোটেও ভালো লাগে নি। কারণ ভাইয়ার এই বন্ধুকে এখানে নিয়ে আসার পেছনে একটি উদ্দেশ্য ছিল, যা আমার পছন্দ হয় নি। ভাইয়া চাচ্ছিল, আমি তার বন্ধুর সঙ্গে গল্প-টল্প করি, চা-টা বানিয়ে দিই। এবং তা করলেই তার বন্ধু আমাকে পছন্দ করে ফেলবে। আমার শারীরিক ক্রটি তার চোখে পড়বে না। আমার একটি ভালো বিয়ে হবে। ভাইয়ার ধারণা, তার এই বন্ধু পৃথিবীর সেরা মানুষদের একজন।

মা'র কাছ থেকে এসব শুনে আমার খুব মন খারাপ হলো। একটি ছেলেকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বিয়ে করতে হবে কেন? বিয়েটা কি এতই জরুরি? আমি ভাইয়াকে ডেকে নিয়ে বললাম, আমি কখনো, কোনো অবস্থাতেই তোমার এই বন্ধুর সামনে যাব না। ভাইয়া চোখ লাল করে বলল, যেতেই হবে। আমি শান্ত গলায় বললাম, এটা নিয়ে তুমি যদি জোর খাটাও, আমি তাহলে মরে যাব। ভাইয়া চুপ করে গেল। আমি শান্ত ধরনের মেয়ে। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই ভয়ঙ্কর জেদি। ভাইয়া তা খুব ভালোই জানে। সে আমাকে ঘাঁটল না। আমি ভেতরের বাড়িতে থাকতে লাগলাম। ভুলেও বাইরে পা বাড়াই না। তবু একদিন সন্ধ্যায় দেখা হয়ে গেল। ফিরোজ ভাইকে দেখে মনে হলো, তিনি খুব অবাক হয়েছেন। আমি হকচকিয়ে গিয়েছি। নিজেকে সামলে নিয়ে কোনোমতে বললাম, বড় ঘরে গিয়ে বসুন, সেখানে চা দেয়া হবে।

এই বলে আমি চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েছি। পোলিওর জন্যে আমার এক পায়ে কোনো জোর নেই, কাজেই উল্টে পড়ে গেলাম। ফিরোজ ভাই আমাকে টেনে তুললেন। এটাই স্বাভাবিক। এতে লজ্জা বা অপমানের কিছুই নেই। কিন্তু আমি রেগে গেলাম এবং কঠিন গলায় বললাম, হাত ছাড়ুন।

তিনি পাংশুবর্ণ হয়ে গেলেন। আমার হাত ছেড়ে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন।

মিসির আলি এই চিঠিটা বেশ অনেকবার পড়েছেন এবং প্রতিবারই তাঁর মনে হয়েছে, চমৎকার একটি চিঠি। আন্তরিক এবং কোনো ভান নেই। একজন মানুষ সবচেয়ে বেশি ভান করে তার চিঠিতে। যে এই ভানের উপরে উঠে আসতে পারে, তাকে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে হয়।

সুন্দরী একটি মেয়ের মনটাও বোধহয় সুন্দর হয়।

মিসির আলি অন্যমনস্কভাবে খাতার পাতা উল্টাতে লাগলেন। এখনো পানি আসে নি। আজ কি বাড়িওয়ালা তার পানির পাম্পটি খুলবে না? ওদের নিজেদের কি পানির দরকার হয় না? দুপুরের খাওয়া-দাওয়ায়ও একটা ব্যবস্থা করতে হয়। রান্নাবান্না কিছু হয় নি। হানিফা জুরে কাতর। কালকের ঘটনায় বেচারি বেশ ভয় পেয়েছে। সকালে একশ' এক জ্বর ছিল, এখন একশ' দুই। দুটি প্যারাসিটামল কিছুক্ষণ আগেই খাওয়ানো

হয়েছে। জ্বর কমে যাওয়া উচিত, কিন্তু কমছে না। বিকেল নাগাদ না কমলে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

তিনি খাতাপত্র গুছিয়ে উঠলেন। উঁকি দিলেন হানিফার ঘরে। হানিফার জন্যে তিনি একটি ঘর দিয়েছেন। এই ঘরে ছোট্ট একটি খাট আছে, পড়ার চেয়ার-টেবিল আছে, একটি আলনা আছে। এই মেয়েটি কখনো কল্পনাও করে নি, কোনোদিন এতগুলো জিনিস তার হবে।

হানিফা, তোর জ্বর কেমন রে ?

ভালো।

মিসির আলি কপালে হাত দিয়ে চমকে উঠলেন।

ভালো কোথায় ? অনেকখানি জ্বর তো! মাথায় পানি ঢালতে হবে।

হানিফা জ্বরতপ্ত চোখে তাকিয়ে রইল। এই লোকটিকে সে বুঝতে পারছে না। একজন কাজের মেয়ের জন্যে কেউ এতটা দরদ দেখায়, না দেখানো উচিত ?

হানিফা।

জি ?

জ্বর খুব বেশি। জ্বর নামাতে হবে। পানি তো বোধহয় এক ফোঁটাও নেই।

জি না।

যাই, বাড়িওয়ালাকে পাম্প ছাড়তে বলি।

বলেন।

গিরোজদেব বাড়ি থেকে কেউ এসেছিল ?

জি না।

টেলিফোন করে একটা খোঁজ নিতে হয়। কী বলিস হানিফা ?

জি নেন।

হানিফা চোখ বন্ধ করে ফেলল। তার জ্বর বোধহয় বাড়ছে। চোখ ছোট ছোট হয়ে এসেছে। চোখের সাদা অংশ কেমন ঘোলাটে দেখাচ্ছে। মিসিব আলি চিন্তিত মুখে বাড়িওয়ালার উদ্দেশে রওনা হলেন।

বাড়িওয়ালা করিম সাহেব বাসাতেই ছিলেন। পানি এখনো ছাড়া হয় নি শুনে তিনি খুব হৈচৈ করতে লাগলেন। বারবার বললেন, এই সামান্য কাজের জন্যে আপনি নিজে আসলেন প্রফেসর সাহেব— বড় লজ্জায় ফেললেন আমাকে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

মিসিব আলি সাহেব বললেন, একটা টেলিফোন করা যাবে কবির সাহেব ?

একটা কেন, একশটা করা যাবে। যখন ইচ্ছা তখন করা যাবে। দরকাব হলে ট্রান্সল করবেন— খুলনা ময়মনসিংহ ববিশাল। টেলিফোনের বিল আবদুল করিমকে কিছু করতে পারবে না, বুঝলেন প্রফেসর সাহেব ? ওরে, টেলিফোনটা প্রফেসর সাহেবকে এনে দে। আর দেখ ঠাণ্ডা পেপসি বা সেভেন আপ কিছু আছে কিনা।

শিছু লাগবে না।

আপনি না বললেই হবে নাকি ? আপনার একটা ইজ্জত আছে না ? ছয় মাসে এক

বছরে একবার আসেন। আমি বলতে গেলে রোজই বসে থাকি আপনার ওখানে। আপনি ফ্যানটার নিচে ঠাণ্ডা হয়ে বসেন তো দেখি।

মিসির আলি বসলেন। বাড়িওয়ালা করিম সাহেব মিসির আলিকে একটু বিশেষ রকম স্নেহ করেন। গত দু'বছরে তিনি প্রতিটি ফ্ল্যাটের ভাড়া তিন দফায় বাড়িয়েছেন, শুধু প্রফেসর সাহেবের ভাড়া এক পয়সাও বাড়ে নি। কেন বাড়ে নি কে জানে?

ফিরোজের মাকে টেলিফোনে পাওয়া গেল। তাঁর কাছ থেকে যে-সমস্ত তথ্য জানা গেল, সেগুলো হচ্ছে— ফিরোজ ভালো আছে, সুস্থ এবং স্বাভাবিক। তার ঘরে একটি মাইক্রোফোন বসিয়ে ঘরের যাবতীয় শব্দ টেপ করা হয়েছে। টেপগুলো তিনি সন্ধ্যাবেলা পাঠাবেন।

ফিরোজের মা চিন্তিত স্বরে বললেন, আপনি অসুস্থ বলেছিলেন কেন? আমরা খুব ভয়ে ভয়ে রাতটা কাটলাম। আপনার ওখানে সে কিছু করেছিল নাকি?

না, তেমন কিছু করে নি। একটু উদ্ভ্রান্ত মনে হচ্ছিল। ফিরোজ কি আছে ঘরে?

হ্যাঁ আছে। কথা বলবেন?

বলব। দিন ওকে।

ফিরোজের গলা শান্ত ও স্বাভাবিক।

কেমন আছ ফিরোজ?

ভালো।

কী করছিলে?

কিছু করছিলাম না। একটা উপন্যাস নিয়ে বসেছিলাম।

কার উপন্যাস?

জন স্টেইনবেক। নাম হচ্ছে গিয়ে আপনার, সুইট থার্সডে। স্যার, আপনি পড়েছেন এটা?

গল্প-উপন্যাস আমি পড়ি-টড়ি না। একজন লেখকের বানানো দুঃখ-কষ্টের বিবরণ পড়ে কী হয় বলো? এমনিতেই আমাদের চারদিকে প্রচুর দুঃখ-কষ্ট আছে।

স্যার, আপনাকে বইটা পড়তেই হবে। আমার পড়া শেষ হলেই আপনাকে দিয়ে আসব।

আচ্ছা ঠিক আছে। শোন ফিরোজ।

বলুন।

কাল রাতে তোমার কেমন ঘুম হয়েছিল?

ভালো।

কী রকম ভালো?

খুব ভালো। এক ঘুমে রাত পার করেছি। কী জন্যে জিজ্ঞেস করছেন স্যার?

এমনি জানতে চাচ্ছি। কোনো স্পেসিফিক কারণ নেই। তুমি কি কাল রাতে কোনো স্বপ্ন দেখেছ?

জি না স্যার ।

চট করে না বলে দিও না । চিন্তা করে তারপর বলো ।

এবার ফিরোজ সময় নিল জবাব দেয়ার আগে ।

একটা স্বপ্ন দেখেছি । আর ওটা তো আমি প্রায়ই দেখি ।

কোনটা ?

ঐ যে, ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিচ্ছি, তারপর দেখি কোনো প্রশ্নের উত্তর জানি না ।

এটা ছাড়া আর কোনো স্বপ্ন দেখ নি ?

জি না ।

শোন ফিরোজ, এছাড়াও যদি অন্য কোনো স্বপ্নের কথা মনে পড়ে, আমাকে জানিও ।

জি আচ্ছা ।

তুমি কি আজ সন্ধ্যার দিকে একবার আসবে ?

না স্যার, আজ আসব না । বইটা শেষ করব ।

শ্রমের উপন্যাস নাকি ?

ফিরোজ লাজুক স্বরে বলল, হঁ ।

টেপগুলো পরীক্ষা করতে করতে রাত তিনটা বেজে গেল । প্রথম চাবটি টেপে তেমন কিছু নেই । একবার শুধু কিছুক্ষণের জন্যে আহ্ উহ্ শব্দ । সেটা স্বপ্ন দেখার জন্যে, কিংবা বেকায়দা অবস্থায় শোয়ার জন্যে । তবে শেষ টেপটিতে মিসির আলির জন্যে বড় ধরনের বিস্ময় অপেক্ষা করছিল ।

তিনি বিচিত্র একটি কণ্ঠস্বর শুনলেন সেখানে । তীক্ষ্ণ, তীব্র । হাই ফ্রিকোয়েন্সি । কথাগুলো এরকম—

অপরিচিত কণ্ঠস্বর : হঁ হঁ ফিরোজ! ফিরোজ... (অস্পষ্ট)

ফিরোজের কণ্ঠস্বর : না । না । উঁহ না ।

অপরিচিত : লোহার রডটা কোথায় ?

ফিরোজ : জানি না, আমি জানি না ।

অপরিচিত : (অস্পষ্টভাবে কিছু বলল । নিঃশ্বাসের শব্দ ।)

ফিরোজ : না । না । না ।

অপরিচিত : লোহার রড । রড ।

ফিরোজ : না । না ।

অপরিচিত : (অস্পষ্টভাবে কিছু কথা । হাসির শব্দ ।)

মিসির আলি অসংখ্যবার এই অংশটি বাজিয়ে বাজিয়ে শুনলেন । অস্পষ্ট অংশগুলো উদ্ধার করতে পারলেন না । অপরিচিত যে-কণ্ঠস্বর শুনছেন, তা ফিরোজেরই কণ্ঠস্বর । এটি তার একটি দ্বিতীয় সন্তা । সেকেন্ড পারসোনালিটি । ফিরোজকে পুরোপুরি সুস্থ করতে হলে তার দ্বিতীয় সন্তাটিকে ভালোভাবে বুঝতে হবে ।

হানিফা ছটফট করছে। তার জ্বর কমে নি। এখন একশ' দুইয়েরও কিছু বেশি। মিসির আলি চিন্তিত বোধ করলেন। রাত দশটার দিকে জ্বর অনেক কম ছিল। নিরানব্বই পয়েন্ট পাঁচ। এখন এত বাড়ল কেন ?

হানিফা জেগে আছে। কিন্তু কোনো রকম সাড়াশব্দ করছে না। মিসির আলি কোমল গলায় বললেন, খারাপ লাগছে নাকি রে বেটি ?

না।

মাথার যন্ত্রণা আছে ?

আছে।

বেশি ?

জি।

মাথা টিপে দেব ?

হানিফা লজ্জিত স্বরে বলল, জি না।

না কেন ? আরাম লাগবে। তার আগে মাথায় পানি ঢেলে জ্বরটা কমাতে হবে।

তিনি বাথরুমে ঢুকলেন পানির বালতির খোঁজে। তাঁর নিজের শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না। মাথা ভার ভার লাগছে। বমি-বমি লাগছে। শুয়ে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু একটি বাচ্চা মেয়ে জ্বরে ছটফট কববে, আর তিনি শুয়ে থাকবেন— এটা হয় না।

হানিফার এ বাড়িতে আসার ইতিহাস বেশ বিচিত্র। গত বছর জুলাই মাসের দিকে একবার বেশ বড় একটা ঝড় হলো। রাত একটায় জেগে উঠে দেখেন, দড়ামদুডুম শব্দে জানালার পাট আছড়ে পড়ছে। বৃষ্টির ছাটে ঘর ভেসে যাচ্ছে। ইলেকট্রিসিটি নেই। চারদিক অন্ধকার। মোটামুটি একটি ভয়াবহ অবস্থা। তিনি জানালা বন্ধ করতে গিয়ে দেখলেন আট ন' বছরের একটা বাচ্চা একা-একা দেয়াল ঘেঁসে বসে আছে।

কে রে তুই ?

মেয়েটি ভয় পাওয়া স্বরে বলল, আমি।

এখানে কী করছিস ?

ঘুমাইতছি।

জেগে জেগে ঘুমাচ্ছিস নাকি ?

মেয়েটি জবাব দিল না।

বাপ-মা কোথায় ?

বাবা-মা নাই।

আত্মীয়স্বজন কেউ নেই ?

না।

তুই কি এরকম একা-একা মানুষের বারান্দায় ঘুমোস নাকি ?

মেয়েটি জবাব দিল না। মিসির আলি বললেন, ভয় লাগছে না তোর ?

না।

বলিস কী! নাম কী তোর ?

হানিফা ।

আয়, ভেতরে আয় । ইস, ভিজ়ে জবজবে হয়ে গেছিস তে'!

মিসির আলি হ্যারিকেন জ্বালিয়ে তাকালেন মেয়েটির দিকে । ছেলেদের মতো ছোট ছোট করে কাটা চুল । আদুরে একটা মুখ ।

তোর বাপের নাম কী ?

জানি না ।

বলিস কী! মা'র নাম ?

জানি না ।

তোর হাতে কী ? মুঠোর ভেতর কী আছে ?

হানিফা মুঠি খুলল । ভাংতি পয়সা ।

ভিক্ষা করে পেয়েছিস ?

ইঁ ।

মিসির আলি গুনলেন । দু'টাকা ত্রিশ পয়সা । এই বিশাল পৃথিবীতে আগামীকাল এই মেয়েটি যাত্রা শুরু করবে— দু'টাকা ত্রিশ পয়সা, একটা নোংরা ফ্রক এবং একটা তালি দেওয়া প্যান্ট নিয়ে । কোনো মানে হয় ?

তিনি একটি শুকনো লুঙ্গি বের করলেন । গম্ভীর গলায় বললেন, কাপড় বদলে এটা পরে ফেল । নিউমোনিয়া বাধাবি তো । ঐ ঘরে একটা বিছানা আছে, ওখানে গিয়ে শুয়ে থাক ।

মিসির আলি ভেবেছিলেন, সকাল হলেই সে চলে যেতে ব্যস্ত হয়ে যাবে । একবার যাযাবর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে গেলে বন্ধন আব ভালো লাগে না । কিন্তু হানিফা সকালবেলা চলে যাবার কোনো রকম লক্ষণ দেখাল না । এমনভাবে ঘুবে বেড়াতে লাগল, যেন এইটি তার ঘরবাড়ি ।

হানিফার প্রতি সমাজের যে দায়িত্ব ছিল, মিসির আলি তা পালন করেছেন । নিজেই তাকে পড়তে শিখিয়েছেন । যোগ-ভাগ-গুণ শিখিয়ে নিয়ে গেছেন স্কুলে ভর্তি কবাবার জন্যে । কেউ ভর্তি করাতে রাজি হয় নি । এত বড় মেয়েকে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি করানো সম্ভব নয় । তিনি হানিফাকে বলেছেন, ঠিক আছে, তুই ঘরে বসেই পড়াশোনা চালিয়ে যা । যথাসময়ে প্রাইভেটে তাকে দিয়ে ম্যাট্রিক দেওয়াব । আমি নিজে তো সব সময় দেখতে পারি না । একজন মাস্টার বেখে দেব ।

শেষ রাতের দিকে হানিফার জ্বর কমে এলো । শরীর ঘামতে লাগল । সে বিড়বিড় করে নানান কথা বলতে লাগল । মেয়েটির বিড়বিড় করে বলা কথাগুলো থেকেই মিসির আলি বড় ধরনের একটি আবিষ্কার করলেন । তাঁর বিশ্বয়ের সীমা রইল না ।

এই প্রসঙ্গে যথাসময়ে বলা হবে ।

সাইকোলজি বিভাগের সভাপতি ড. সাইদুর রহমানের মেজাজ সকাল থেকেই খারাপ। মেজাজ খারাপের প্রধান দুটি কারণের একটি হচ্ছে— সুইডেনে একটি কনফারেন্সে তাঁর যাবার খুব শখ ছিল, কিন্তু আমন্ত্রণ আসে নি। তিনি চেষ্টা তদবিরের তেমন কোনো ক্রটি করেন নি। যেখানে একটা চিঠি দেয়া দরকার, সেখানে তিনটি চিঠি দিয়েছেন। প্রফেসর নোয়েল বার্গকে বাংলাদেশের হস্তশিল্পের নমুনা হিসাবে একটি চটের ব্যাগ পাঠিয়েছেন, যেটা কিনতে তাঁর তিনশ' টাকা লেগেছে। রাজশাহীতে তৈরি খুব ফ্যান্সি ধরনের ব্যাগ। প্রফেসর নোয়েল বার্গ একটি চিঠিতে ব্যাগের জন্যে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, কিন্তু বহু প্রতীক্ষিত নিমন্ত্রণের চিঠি পাঠান নি।

সাইদুর রহমান সাহেবের মেজাজ খারাপের দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে— মিসির আলি সংক্রান্ত সমস্যা। মিসির আলি লোকটিকে তিনি মনেপ্রাণে অপছন্দ করেন। পার্টটাইম টিচার হিসেবে মিসির আলির অ্যাপয়েন্টমেন্টের বিপক্ষে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। লাভ হয় নি। অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে। এবং অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় ভাইস-চ্যান্সেলর সাহেব বলেছেন, কোনো পোস্ট অ্যাডভারটাইজ হওয়ামাত্র তাঁকে নেয়া হবে। সাইদুর রহমান সাহেব গত দু'বছরে কোনো পোস্ট অ্যাডভারটাইজড হতে দেন নি। এডহক ভিত্তিতে একজনকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন।

তাঁর ধারণা ছিল এডহক অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্যে মিসির আলি হৈচৈ করবেন। কিন্তু মিসির আলি কিছুই করেন নি। এটাও একটা রহস্য। এই লোকটির কি জীবনে উন্নতি করবার কোনোরকম ইচ্ছা নেই, না তার সবটাই ভান?

মিসির আলির ওপর আজ ভোরবেলায় তাঁর রাগ চরমে উঠেছে। কারণ তিনি দেখেছেন, সুইডেন থেকে মিসির আলির নামে একটি খাম এসেছে। তাঁর ধারণা, এটা কনফারেন্সের নিমন্ত্রণপত্র। কারণ প্রেরকের নামের জায়গায় প্রফেসর নোয়েল বার্গের নাম আছে। প্রফেসর নোয়েল বার্গ হচ্ছেন কনফারেন্সের আস্থায়ক।

সাইদুর রহমান সাহেব অফিসে খোঁজ নিলেন— মিসির আলি এসেছেন কি না। জানা গেল তিনি এসেছেন। কাজেই সুইডেনের সেই খাম নিশ্চয়ই খোলা হয়েছে। সাইদুর রহমান সাহেব হেড ক্লার্ককে বললেন, মিসির আলি সাহেবের সঙ্গে যদি দেখা হয়, তাহলে বলবেন, আমি খোঁজ ব'হিলাম।

জি আচ্ছা স্যার।

তাকে তো খুঁজেই পাওয়া যায় না। ডিপার্টমেন্টে আসেন না নাকি?

ক্লাস না থাকলে আসেন না।

গতকাল এসেছিলেন?

জি, গতকাল এসেছিলেন। এফ-জন ছাত্রীর ঠিকানা খুঁজে বের করবার জন্যে খুব হৈচৈ করলেন।

তাই নাকি?

জি স্যার। নীলুফার ইয়াসমিন। সে দেড় বছর ধরে ইউনিভার্সিটিতে আসে না, এখন

তার ঠিকানা খোঁজার জন্যে যদি অফিসের সব কাজকর্ম বন্ধ রাখতে হয়, তাহলে তো মুশকিল।

কাজকর্ম বন্ধ রাখতে হবে কেন ? এসব পার্সোনাল কাজের জন্যে তো অফিস না। আপনি স্ট্রেইট বলে দেবেন।

জি আচ্ছা স্যার।

তাছাড়া একজন টিচার ছাত্রীর ঠিকানার জন্যে ব্যস্ত হবে কেন ? এসব ঠিক না। নানান রকমের কথা উঠতে পারে।

মিসির আলি ভেবেই পেলেন না, ইউনিভার্সিটির একজন ছাত্রীর ঠিকানা বের করা এত সমস্যা হবে কেন ? অফিসে নেই। অফিস থেকে বলা হলো, সমস্ত রেকর্ডপত্র ডিন অফিসে। ডিন অফিসে গিয়ে জানলেন রেকর্ডপত্র আছে রেজিস্ট্রার অফিসে। রেজিস্ট্রার অফিসে যে কেরানি এসব ডিল করে, দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করেও তার দেখা পাওয়া গেল না। সকালবেলা সে নাকি এসেছিল। চা খেতে গিয়েছে। মিসির আলি রেজিস্ট্রার অফিসের ক্যান্টিনেও খুঁজে এলেন। দেখা পাওয়া গেল না। আবার আসতে হবে আগামীকাল।

ডিপার্টমেন্টে ফিরে এসে শুনলেন— সাইদুর রহমান সাহেব তাঁকে খোঁজ করেছেন। মিসির আলি বিস্মিত হলেন। সাইদুর রহমান সাহেব তাঁকে পছন্দ করেন না। বড় রকমের প্রয়োজনেও তাঁর খোঁজ করেন না। আজ করছেন কেন ?

স্নামালিকুম স্যার।

ওয়ালাইকুম সালাম।

আপনি কি আমার খোঁজ করছিলেন ?

বসুন মিসির আলি সাহেব। আছেন কেমন ?

ভালো।

মিসির আলি বসলেন।

কী জন্যে ডেকেছিলেন ?

তেমন কিছু না।

সাইদুর রহমান সাহেব সিগারেট ধরালেন। সুইডেনের চিঠির প্রসঙ্গ তুলবেন কিনা বুঝতে পারলেন না। তুললেও এমনভাবে তুলতে হবে, যাতে এই লোক বুঝতে না পারে, তিনি এই ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী।

মিসির আলি বললেন, স্যার, আপনি কি কিছু বলবেন ?

তেমন ইম্পর্টেন্ট কিছু না। সুইডেনের কনফারেন্সের খবর কিছু জানেন ? মানে আমার যাবার কথা ছিল। পেপারের অ্যাবস্ট্রাক্ট পাঠিয়েছিলাম প্রফেসর নোয়েলের কাছে।

মিসির আলি সহজ গলায় বললেন, আমি ওদের ইনভাইটেশন পেয়েছি। পেপার দেবার জন্যে বলেছে।

তাই নাকি ?

সাইদুর রহমান সাহেব নিভে গেলেন। টেনে টেনে বললেন, যাচ্ছেন কবে নাগাদ ?
এক সপ্তাহের ভেতরই তো রওনা হওয়া উচিত ?

আমি যাচ্ছি না স্যার।

কেন ?

আমার কাজের মেয়েটি অসুস্থ।

সাইদুর রহমান সাহেব নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। কাজের মেয়ে অসুস্থ। এই জন্যে সে সুইডেন যাবে না। বন্ধ উন্মাদ নাকি!

কাজের মেয়ে অসুস্থ, সেই কারণে যাচ্ছেন না ?

ওটা একটা কারণ। তাছাড়া অন্য একটি কারণ আছে।

জানতে পারি ?

নিশ্চয়ই পারেন। আমি একজন রোগীর মনোবিশ্লেষণ করছি। এই মুহূর্তে আমার পক্ষে বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়।

সত্যি বলছেন ?

মিসির আলি অবাক হয়ে বললেন, মিথ্যা বলব কেন ?

আপনি কি আপনার ডিসিশন ওদেরকে জানিয়েছেন ?

আজই তো মাত্র চিঠি পেলাম।

তবু আপনার উচিত ইমিডিয়েটলি আপনার ডিসিশন ওদের জানানো। হয়তো ওদের কোনো অলটারনেট ক্যানডিডেট আছে।

স্যার, আপনার কি সেখানে যাবার ইচ্ছা ? ইচ্ছা থাকলে বলেন।

বলব মানে, আপনি কী করবেন ?

নোয়েল আমার বন্ধুমানুষ। ইংল্যান্ডে আমরা একসঙ্গে ছিলাম। আমার তিনটা পেপার আছে, যেখানে নোয়েল হচ্ছে একজন কো-অথর। আপনার বোধহয় চোখে পড়ে নি।

সাইদুর রহমান সাহেবেব মুখ তেতো হয়ে গেল। তিনি বিরক্ত স্বরে বললেন, সুইডেন কি একটা যাওয়ার মতো জায়গা ? আছে কী সেখানে বলুন ? দেখার কিছু আছে ? কিছুই নেই। একটা ফালতু জায়গা।

দেখাদেখিটা তো ইম্পর্টেন্ট নয়। সেমিনারটাই প্রধান। সারা পৃথিবী থেকে জ্ঞানীশুণীরা আসবেন।

এসব কচকচানি শুনে কোনো লাভ হয় ? কোনোই লাভ হয় না। শুধু বড় বড় কথা।

এটা ঠিক বললেন না। সেখানে যারা আসবেন, তাঁরা কথার চেয়ে কাজ অনেক বেশি করেন। বিশেষ করে এমন কিছু লোক আসবেন, যাদের দেখলে পুণ্য হয়।

আপনিও তো ওদের নিমন্ত্রিত, তাই মানে বলতে চাচ্ছেন, আপনাকে দেখলেও পুণ্য হবে ?

মিসির আলি একটু হকচকিয়ে গেলেন। পর মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, তা হবে। আপনি অনেকক্ষণ আমাকে দেখলেন। অনেক পুণ্য করলেন। উঠি স্যার ?

ড. সাইদুর রহমান বহু কষ্টে রাগ সামলালেন। মনে-মনে এমন কিছু গালাগালি দিলেন, যা তাঁর মতো অবস্থার ব্যক্তির কখনো দিতে পারে না। এর মধ্যে একটি গালি ভয়াবহ।

৫

বছরখানেক হলো নীলুর বাবা জাহিদ সাহেবের স্বাস্থ্য দ্রুত ভাঙতে শুরু করেছে। এমন কিছু অসুখ তাঁকে ধরেছে, যা শুধু কষ্টকর নয়, অত্যন্ত বিরক্তিকর। কিছুই হজম হয় না। পানি মেশানো দুধ, লেবুর রস দিয়ে বার্লি, এক স্লাইস রুটি বা শিং মাছের মশলাবিহীন ঝোল— কিছুই না। ডাক্তার প্রায় সবই দেখানো হয়েছে। ডাক্তাররা বলেছেন, লিভার কাজ করছে না। ডাক্তারদের শুকনো ধরনের কথাবার্তা, ইতস্তত ভাবভঙ্গি থেকে তাঁর ধারণা হয়েছে— অসুখটা জটিল। হয়তোবা লিভার ক্যানসার-ট্যানসার বাধিয়ে বসেছেন। ডাক্তাররা সরাসরি তাঁকে কিছু বলেন না। তিনিও জিজ্ঞাসা করতে ঠিক সাহস পান না। নীলুর সঙ্গে এই নিয়ে আলাপ করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু নীলু তাঁর সঙ্গে তেমন কোনো কথাবার্তা বলে না। তিনি কিছু একটা বলতে শুরু করলে মন দিয়ে শোনে, কিন্তু কথার মাঝখানে এমন একটি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে বসে যে, তাঁর ধারণা হয় নীলু আসলে কিছু শুনছে না। শুধু তাকিয়েই আছে।

নীলুকে ইদানীং তিনি ভয় করেন। যে-নীলু তাঁর সঙ্গে থাকে, তাকে তাঁর নিজের মেয়ে বলে কখনো মনে হয় না। এ যেন একটি অচেনা মেয়ে— যাকে কোনোদিনই ঠিক চেনা যাবে না।

অবশ্য নীলু তাঁর সঙ্গে একেবারেই যে কথাবার্তা বলে না, তা নয়। কথাবার্তা বলে। এসে জিজ্ঞেস করে, চা লাগবে বাবা ? এই পর্যন্তই। তিনি যদি বলেন লাগবে, তাহলে সে উঠে গিয়ে চা বানিয়ে কাজের ছেলেটিব হাতে পাঠিয়ে দেবে। যদি বলেন লাগবে না, তাহলে চুপ করে যাবে। দ্বিতীয় কোনো কথা বলবে না।

জাহিদ সাহেব আজকাল তাঁর দ্বিতীয় মেয়েটির অভাব অনুভব করেন। সে পাশে থাকলে বাসার অবস্থা হয়তো আরেকটু স্বাভাবিক হতো। বিলুব বিয়েটা তিনি ভালো দিতে পারেন নি। অথচ তখন মনে হয়েছিল, কী চমৎকার একটি ছেলে! তিনি বারবার জিজ্ঞেস করেছেন, তুমি দেশে চলে আসবে তো বাবা ? বিদেশে সেটল করবে না তো ? আমি আমার মেয়েকে দেশান্তরী করতে চাই না। আমি একা মানুষ, আমি চাই আমার দুটি মেয়ে আমার আশেপাশেই থাকবে।

বিলুর বর হাসিমুখে বলেছে, বিদেশে সেটল করব কেন ? কী আছে ওখানে ? মানুষ হিসেবে কোনো দাম আছে আমাদের ? আমি বছরখানেক থাকব। কিছু টাকা-পয়সা জমিয়ে দেশে ফিরব। মাথা গুঁজবার মতো একটা বাড়ি তো কিনতে হবে।

জাহিদ সাহেব ছেলের কথা বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু এখন জানতে পেরেছেন, সে মনটানাতে একটা বাড়ি কিনেছে। যে-ছেলে দেশে চলে আসবে, সে নিশ্চয় বিদেশে বাড়ি কেনে না। তাছাড়া, বিলু সুখী হয় নি বলে তাঁর ধারণা। বিলুর চিঠিপত্রে অবশ্য কিছু লেখা থাকে না। চিঠিগুলো প্রাণহীন। যেন লেখার জন্যেই লেখা। দায়িত্ব পালনের চিঠি।

একজন সুখী মেয়ের চিঠিতে থাকবে আনন্দের ছবি। সে তার বরের কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখবে। খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে উচ্ছ্বাস থাকবে। সে-সব কিছু থাকে না। বাবা হিসেবে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারেন নি। সৎপাত্র মেয়েকে বিয়ে দিতে পারেন নি। অথচ ছেলেটিকে সত্যি সত্যি তাঁর পছন্দ হয়েছিল। ভদ্র ছেলে। চমৎকার কথাবার্তা। দারুণ শার্প। সেই সঙ্গে রসিক। খাওয়ার টেবিলে একবার সে এক গল্প শুরু করল। এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে এক ভণ্ড তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেছে। হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়েছে তর্কযুদ্ধ দেখতে। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মঞ্চে বসে আছেন। ভণ্ড পণ্ডিত ঢুকল এবং গম্ভীর হয়ে বলল— ‘ফুন ফুনাফুন?’ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তিনি তাঁর সারা জীবনে ‘ফুন ফুনাফুন’ বলে কিছু শোনেন নি। এর মানে কী, তা তাঁর জানা নেই।

ভারি মজার গল্প। জাহিদ সাহেব গল্প শুনে হাসতে হাসতে বিষম খেলেন। নীলুর মতো গম্ভীর মেয়েও হেসে ফেলল। এই কি সেই ছেলে?

জাহিদ সাহেব আজকাল বেশির ভাগ সময়ই বারান্দায় বসে এইসব কথা ভেবে ভেবে কাটান। দু’তিনটে পত্রিকা তাঁর হাতের কাছে থাকে, সে-সব পড়া হয় না। পনের খণ্ড মুক্তিযুদ্ধের দলিল কিনেছেন। শখ ছিল গোড়া থেকে পড়বেন, তা পড়তে পারছেন না। ইচ্ছা করে না। মাঝে মাঝে শুধু অষ্টম খণ্ডে চোখ বুলিয়ে যান। অষ্টম খণ্ড হচ্ছে অত্যাচার ও নির্যাতনের কাহিনী। পড়তে পড়তে তাঁর বুক হুহু করে।

আজও তাই করছিলেন। হঠাৎ লক্ষ করলেন, নীলু তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। নীলু নিঃশব্দে চলাফেরা করে। হঠাৎ উপস্থিত হয়ে চমকে দেয়। জাহিদ সাহেব বললেন, কী খবর মা?

কোনো খবর নেই বাবা।

কোথাও বেরুচ্ছিস?

না।

নীলু বসল তাঁর পাশের চেয়ারে। তিনি লক্ষ করলেন, নীলু বেশ সাজগোজ করেছে। কপালে টিপ। সুন্দর একটি শাড়ি। সোঁপায় ফুল পর্যন্ত দিয়েছে। জাহিদ সাহেব বললেন, তোর স্যার তো আর এলেন না।

উনি এসেছিলেন। বাড়ি চিনতে পারেন নি। রিকশা করে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে দু’বার গেলেন।

ভুই দেখেছিস?

নীলু কিছু বলল না। সে দেখে নি। না দেখেই বলেছে। খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু জাহিদ সাহেব জানেন অস্বাভাবিক হলেও এটা সত্যি। নীলু না দেখেই অনেক কিছু বলতে পারে। কেমন করে পারে, তা তিনি জানেন না। জানতে চানও না। নীলুর এই অস্বাভাবিক ক্ষমতাকে তিনি ভয় করেন।

কোনোদিন ভোরবেলায় নীলু এসে বলে, বাবা, আজ তোমার দিনটি ভালো যাবে। আজ বিলুর চিঠি পাবে।

তিনি হাসতে চেষ্টা করেন, কিন্তু হাসি ঠিক আসে না।

চিঠির সঙ্গে ছবিও পাবে। সুন্দর সুন্দর ছবি পাঠিয়েছে বিলু।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

নীলু হাসে। এই নীলু আগের নীলু নয়। এই নীলুকে তিনি চেনেন না।

জাহিদ সাহেব বললেন, তোর স্যার এসেছিলেন, তাঁকে ডেকে ঘরে আনলি না কেন ?

উনি নিজেই খুঁজে বের করবেন। আমাদের এই স্যার কোনো জিনিসই মাঝপথে ছেড়ে দেন না।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। খুব মেথডিকেল মানুষ। তোমার সঙ্গে তো বাবা উনার একবার দেখা হয়েছিল।

আমার মনে নেই।

নীলু হাসতে হাসতে বলল, স্যারটা খুব আনইমপ্রেসিভ। তাঁর কথা মনে না থাকারই কথা।

জাহিদ সাহেব নীলুর গলায় এক ধরনের আবেগ অনুভব করলেন। এই আবেগের কারণ কী ? তিনি প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বললেন, খুব গরম পড়েছে এবছর।

নীলু বলল, প্রতি বছর গরমের সময় তুমি এই কথাটা বলো। আবার শীতের সময় বলো— এ বছর মারাত্মক শীত পড়েছে। বলো না বাবা ?

বলি বোধহয়।

আমরা বেঁচে থাকি বর্তমানকে নিয়ে। অতীতের কথা আমাদের কিছু মনে থাকে না।

কথাটা কি ঠিক ? না, ঠিক নয়। কিছু কিছু অতীত তার কালো সিল শক্ত করে বসিয়ে দেয়, কিছুতেই তা তুলে ফেলা যায় না। নীলুর বিয়ের চেষ্টা করতে গিয়ে তিনি প্রথম তা লক্ষ করলেন। যে-কোনো আলাপ অল্প কিছুদূর এগুনোর পরই বরপক্ষের লোকজন জানতে পেরে যায়, তাঁর এই মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল একটি বাড়িতে। যে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, সে একজন ভয়াবহ খুনি। কিন্তু কাউকেই তিনি বিশ্বাস করাতে পারেন নি যে, সেই খুনি নীলুকে স্পর্শ করতে পারে নি। কোনো-এক রহস্যময় কারণে তার মৃত্যু হয়েছিল। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে ডাক্তার অবশ্য লিখেছিল— মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে মৃত্যু। কিন্তু জাহিদ সাহেব তা বিশ্বাস করেন না। তিনি জানেন মৃত্যুর কারণ অমীমাংসিত এবং রহস্যময়।

সেই রহস্য তাঁর মেয়েকে এখনো ঘিরে আছে। তিনি তা চান না। তিনি তাঁর মেয়ের জন্যে একটি সহজ স্বাভাবিক জীবন চান। একটি ছোট্ট সুখী সংসার। দুটি শিশু— তিনি যাদের হাত ধরে পার্কে বেড়াতে যাবেন। বাদাম কিনে দিবেন। একজন হঠাৎ পড়ে গিয়ে ব্যথা পাবে। তিনি কোলে নিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করবেন। তাই দেখে অন্যজনের হিংসা হবে। তাকেও কোলে নিতে হবে। কেউ তখন আর কোল থেকে নামতে চাইবে না। বড় ঝামেলায় পড়ে যাবেন তিনি।

তাঁর চিন্তায় বাধা পড়ল। নীলু হেসে উঠল খিলখিল করে। পুরনো দিনের নীলুর মতো। জাহিদ সাহেব অবাক হয়ে বললেন, হাসছিল কেন ?

তুমি কী অদ্ভুত সব কল্পনা কর বাবা!

নীলু হাসতে হাসতে উঠে চলে গেল। জাহিদ সাহেব স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। এ কোন নীলু? এই ভয়ঙ্কর ক্ষমতার উৎস কী?

৬

মিসির আলি হানিফাকে পিজিতে ভর্তি করিয়ে দিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, মেয়েটি একা-একা থাকতে ভয় পাবে। কিন্তু হানিফা ভয় পেল না।

থাকতে পারবি তো?

হঁ।

অনেক রকম পরীক্ষা-টরীক্ষা করবে ডাক্তাররা। ভয়ের কিছু নেই।

আমি ভয় পাই না।

তিনি ভেবে দেখলেন, মেয়েটির ভয় না পাওয়ারই কথা। যে জীবন গুরু করেছে রাস্তায়, তার আবার ভয় কীসের?

হানিফা।

জি?

আমি দু'দিনের জন্যে ঢাকার বাইবে যাব। মোহনগঞ্জ যাব। তুই থাকতে পারবি তো?

পাবব।

দু'দিন পরই এসে পড়ব। এর মধ্যে ডাক্তাররা পরীক্ষা-টরীক্ষা যা করবার করবেন। তাছাড়া আমি আমাদের বাড়িওয়ালাকে বলে যাব, তিনি খোঁজখবব করবেন।

খোঁজখববের দরকার নাই।

দরকার থাকবে না কেন? দরকার আছে। যাই তাহলে, কেমন?

জি আচ্ছ।

মিসির আলি বিমর্ষ মুখে বের হয়ে এলেন। মেয়েটির অসুখ তাঁকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছেন ডাক্তারের পরামর্শে। ডাক্তারের ধারণা, হার্টসংক্রান্ত কোনো সমস্যা। ইসিজি টেস্টিং করাতে হবে। হার্ট-বিট খুবই নাকি ইররেগুলাব।

তাঁর ট্রেন রাত ন'টায়। তিনি ঠিক করলেন, রওনা হবার আগে পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলে যাবেন। পুলিশ কমিশনার সাজ্জাদ হোসেন তাঁর কলেজ জীবনের বন্ধু। খুব-একটা পরিচয় তখন ছিল না। এখন হয়তো চিনতেই পারবে না। তবু পুরনো পরিচয়ের সূত্র টানা যেতে পারে। গরজটা যখন তাঁর।

সাজ্জাদ হোসেন তাঁকে চিনলেন। শুধু যে চিনলেন তাই নয়, উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। জড়িয়ে-টড়িয়ে ধরে একটা কাণ্ড করলেন। পুলিশের লোকদের মধ্যে এতটা আবেগ থাকে, তা মিসির আলি ভাবেন নি। তাঁর ধারণা ছিল, দিন-রাত ক্রাইম নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে এরা আবেগশূন্য হয়ে পড়ে। সেটাই স্বাভাবিক।

সাজ্জাদ হোসেন বললেন, ফ্যানটার নিচে আগে আরাম করে বস, তারপর বল কী দরকারে এসেছিস। পুলিশের কাছে কেউ বিনা প্রয়োজনে আসে না।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। পুলিশ এবং ডাক্তার— এই দু'ধরনের মানুষের কাছে কেউ বিনা প্রয়োজনে যায় না। এখন তুই বল, কী ব্যাপার ? আত্মীয়স্বজন কাউকে পুলিশে ধরেছে ?

না, সে-সব কিছু না।

নে, সিগারেট নে। নিশ্চিন্তে থা। ঘুসের পয়সায় কেনা নয়। নিজের কষ্টে উপার্জিত রোজগার থেকে কেনা। হা হা হা!

মিসির আলি সিগারেট ধরালেন। সাজ্জাদ বললেন, বিয়ে-টিয়ে করেছিস ?

না।

জানতাম করবি না। তুই হচ্ছিস একটা অড-বল। আমি বিয়ের পাট চুকিয়েছি আট বছর আগে। বাচ্চা-কাচ্চা কিছু হয় নি। হবেও না।

সাজ্জাদ হোসেনের চোখে-মুখে ক্ষণিকের জন্য একটা ছায়া পড়ল। কিন্তু তিনি তা নিমেষেই কাটিয়ে উঠলেন। হাসি মুখে বললেন, জেসমিন চোখুরী।

মিসির আলি চিনতে পারলেন না। সাজ্জাদ হোসেন অবাক হয়ে বললেন, সত্যি চিনতে পারছিস না ? ও তো টিভিতে অভিনয় করে। মারাত্মক! তাকে কেউ চেনে না, এটা তো আমি ভাবতেই পারি না।

টিভি নেই আমার বাসায়।

বলিস কী! বাসায খাট-পালঙ্ক আছে তো ? নাকি মেঝেতে পাটি পেতে ঘুমাস ? হা হা হা। এখন বল তোর সমস্যা।

আমার একটি কাজের মেয়ে আছে— হানিফা।

জিনিসপত্র নিয়ে ভেগে গেছে ?

না, তা না। আমি এই মেয়েটির অতীত ইতিহাস খুঁজে বের করতে চাই। সেটা কীভাবে করা সম্ভব, তাই জানাব জন্যে তোব কাছে আসা।

পাস্ট হিস্ট্রি জানতে চাস কেন ?

মেয়েটি জানে না, তার বাবা-মা কে। আত্মীয়স্বজন কে কোথায়, তাও বলতে পাবে না। জ্ঞান হবার পর থেকেই সে দেখেছে যে, সে ভাসছে। আমি ওর বাবা-মাকে ট্রেস করতে চাই।

সাজ্জাদ হোসেন গম্ভীর স্বরে বললেন, খামোখা চেষ্টা করছি। কিছুই ট্রেস কবা যাবে না। সম্ভবত জন্ম হয়েছে বেশ্যাপত্নীতে। তারপর হারিয়ে গেছে সেখান থেকে।

আমার তা মনে হয় না।

কেন মনে হয় না ?

মিসির আলি তার জবাব না দিয়ে বললেন, আমার মনে হয় মেয়েটির শৈশব কেটেছে বিদেশে।

চোখ নীল ? রক্ত চুল ?

না। মেয়েটি বাঙালিই, কিন্তু বাবা-মা হয়তো বিদেশে ছিলেন।

কেন বলছিস এসব ? তোর লজিক কী ?

মিসির আলি আরেকটা সিগারেট ধরালেন। এবং থেমে থেমে বললেন, হানিফা মেয়েটি গত পরশু রাতে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রচণ্ড জ্বর। জ্বরের ঘোরে সে বিড়বিড় করে বলছিল— ‘ইট হার্টস ইট হার্টস।’

সাজ্জাদ হোসেন তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলেন। মিসির আলি বলে চললেন, আমার মনে হয়, খুব ছোটবেলায় মেয়েটি যখন অসুস্থ ছিল, তখন সে তার মাকে বলত— ‘মামি, ইট হার্টস।’ পরশু রাতে প্রচণ্ড জ্বরের মুখে অতীতের চাপা-পড়া কথাগুলো বের হয়ে এসেছে। অবচেতন মন সেই সময় সক্রিয় হয়ে ওঠে। এ জাতীয় ব্যাপারগুলো ঘটে।

সাজ্জাদ হোসেন শুধু বললেন, ভেরি ইন্টারেস্টিং!

মিসির আলি বললেন, হারিয়ে যাওয়া ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে বাবা-মা নিশ্চয়ই থানায় ডায়েরি করান। সেখান থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না ? ধর, আমি যদি জানতে চাই, পাঁচ থেকে আট বছর আগে কোন কোন বাচ্চা নিখোঁজ হয়েছিল— জানা যাবে কি ?

না, এত পুরনো রেকর্ডপত্র কে বের করবে বল ? এটা তো ইংল্যান্ড আমেরিকা না যে, সব কম্পিউটারে তোকানো আছে, বোতাম টিপলেই বেরিয়ে আসবে।

পুরনো রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা নেই ?

নতুন রেকর্ড রাখারই জায়গা নেই, আর পুরনো রেকর্ড! একটা মিসিং পার্সন ব্যুরো আছে, সেখানে কোনো কাজ হয় না। তাছাড়া সেন্ট্রাল ইনফরমেশন রাখার কোনো ব্যবস্থা আছে বলে আমার মনে হয় না। প্রতিটি থানাও আলাদা আলাদাভাবে খোঁজ করতে হবে। সেটা একটা বিশাল ব্যাপার।

বিশাল হলেও নিশ্চয়ই অসম্ভব না।

কিছুটা অসম্ভবও।

তোর পক্ষে কিছু করা সম্ভব না ?

সাজ্জাদ হোসেন গম্ভীর হয়ে বইলেন। মিসির আলি বললেন, আমি নিজে সমস্ত পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারি।

সেটা মন্দ না, শুধু আইডিয়া।

না, আইডিয়াটা খুব শুভ নয়।

নয় কেন ?

অন্য এক সময় বলব, কেন নয়। আজ উঠতে হবে। ময়মনসিংহ যাচ্ছি একটা জরুরি কাজে। ফিরে এসে তোর সাথে যোগাযোগ করব।

মিসির আলি উঠে পড়লেন।

ফিরোজরা ধানমণ্ডির যে বাড়িটিতে থাকে, তাকে বাড়ি না বলে রাজপ্রাসাদ বলা যেতে পারে। বিশাল একটি দোতলা বাড়ি। বাড়ির চারপাশে জেলের মতো উঁচু পাঁচিল। গেটে বড় বড় করে লেখা— ‘কুকুর হইতে সাবধান।’ গেটটি চব্বিশ ঘণ্টাই বন্ধ থাকে। বন্ধ গেট ডিঙিয়ে ভেতরে ঢোকা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারণ দারোয়ান একজন আছে, যে প্রায় কখনোই গেটের কাছে থাকে না। আর থাকলেও ভান করে যে, কলিং বেলের শব্দ শুনতে পায় নি।

পৃথিবীর প্রায় সব জায়গাতেই বিশাল বাড়িগুলো জনশূন্য হয়ে থাকে। এ বাড়িতেও তাই। তিনটি প্রাণী এ বাড়িতে বাস করে। ফিরোজ এবং তার বাবা ও মা। বাড়ির কাজকর্ম দেখাশোনার জন্যে দশজনের একটা বাহিনী আছে। তবে রাতে তারা এ বাড়িতে ঘুমায় না। বাড়ির পেছনেই হোটেল ঘরের মতো চার-পাঁচটা রুমের একটা টিনের হাফ-বিল্ডিং আছে। এরা রাতে সেখানে থাকে। মূল বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা হচ্ছে কলিং বেল। রাতের বেলায় প্রয়োজন হলে কলিং বেল টিপে এদের ডাকা হয়। সে প্রয়োজন সাধারণত হয় না।

ফিরোজের অসুখের পর অবস্থা খানিকটা বদলেছে। তার ঘরের সামনের বারান্দায় রহমতের শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। কাদেরের মাকেও মূল বাড়ির একতলায় থাকতে দেয়া হয়েছে। তবে এ ব্যবস্থা সাময়িক।

ফিরোজের বাবা ওসমান সাহেবের বয়স প্রায় ষাট। ফিরোজ তাঁর তিন নম্বর ছেলে। ফিরোজের আগে দু’টি ছেলে যথাক্রমে ন’বছর এবং এগার বছর বয়সে মারা যায়। দু’টি মৃত্যুই অস্বাভাবিক। বড় ছেলে মারা যায় পিকনিক করতে গিয়ে। স্কুলের সব ছেলেরা দল বেঁধে গিয়েছিল সালনায়। পিকনিক শেষ করে সবাই ফিরে এলো, কেউ লক্ষ্যই করল না একটি ছেলে কম। সালনার পুকুরে সে ভেসে উঠেছিল।

ওসমান সাহেবের মধ্যম ছেলেটি মারা গেছে রোড অ্যাক্সিডেন্টে। সে রাস্তা পার হবার সময় আচমকা দৌড় দেয় নি বা হঠাৎ কোনো ট্রাকের সামনে গিয়ে পড়ে নি। সে হাঁটছিল ফুটপাথ ধরেই। কিন্তু সিমেন্টের বস্তা বোঝাই একটি ট্রাক সেই ছুটির দিনের সকালে ফুটপাথে উঠে গিয়েছিল।

যে পরিবারের দু’টি ছেলে অপঘাতে মারা যায়, সেই পরিবারের বাবা-মা সাধারণত ভেঙে পড়েন। এই পরিবারটির ক্ষেত্রে সেরকম কিছু ঘটে নি। ওসমান সাহেব অত্যন্ত শক্ত ধরনের মানুষ। কোনো কারণে বিচলিত হওয়া তাঁর স্বভাবের মধ্যেই নেই। তাঁর স্ত্রী ফরিদা স্বামীর এই গুণ কিছু পরিমাণে পেয়েছেন। বড় বড় ঝড়-ঝাপটাতে মোটামুটি স্থির থাকতে পারেন।

ফিরোজের ভয়াবহ বিপর্যয়েও তাঁরা স্বামী-স্ত্রী স্থির ছিলেন। ধৈর্য হারান নি। ফরিদা একবার শুধু বলেছিলেন, আমাদের ওপর কারোর অভিশাপ আছে। আর তাতেই ওসমান সাহেব এমন ভঙ্গিতে তাকিয়েছিলেন যে, তিনি দ্বিতীয়বার এ জাতীয় কথা বলেন নি। স্বামীকে তিনি বেশ ভয় পান। তাঁর ইচ্ছা ছিল ফিরোজকে চিকিৎসার জন্যে বিদেশে নিয়ে যান। তাও সম্ভব হয় নি ওসমান সাহেবের জন্যে। তিনি বারবার জোর দিয়ে বলেছেন,

আমি আমার বন্ধ উন্মাদ ছেলেকে বিদেশে নিয়ে যাব না। কিছুটা সুস্থ হোক, তারপর নিয়ে যাব।

ফরিদা বলেছিলেন, চিকিৎসা যে করছে, সে তো ডাক্তার না। একজন ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করাও। ভদ্রলোক মাস্টার মানুষ, উনি কী চিকিৎসা করবেন?

যদি কেউ কিছু করতে পারে, উনিই পারবেন। ধৈর্য ধর।

তিনি ধৈর্য ধরলেন। ধৈর্য ধরা বিফলে যায় নি। ফিরোজ এখন সুস্থ। ভয়াবহ একটা স্তর সে পার হয়েছে। ওসমান সাহেবের ধারণা, ফিরোজ এখন পুরোপুরি ভালো। সহজ-স্বাভাবিক মানুষ। কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো পড়াশোনা শুরু করবে। এখন তাকে নিয়ে বাইরে যাওয়া যায়। পাহাড়ের উপরে কোনো ঠাণ্ডা জায়গায়। হাতের কাছেই আছে নেপাল। প্লেনে যেতে তেতাল্লিশ মিনিট লাগে। ওসমান সাহেব ঠিক মনস্থির করতে পারছেন না। এখনো হয়তো ফিরোজকে নিয়ে বাইরে বেরুবার মতো অবস্থা হয় নি। মিসির আলি সেরকমই বলেছেন। মিসির আলির মতের সঙ্গে তিনি একমত নন। তবু তাঁকে অগ্রাহ্য করার সাহস হয় না। হয়তো আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। ততক্ষণে বর্ষা শুরু হবে। তিনি শুনেছেন, বর্ষায় নেপাল দর্শনীয় নয়। দিনরাত টিপটিপ করে বৃষ্টি। হোটেলের ঘরেই বন্দি জীবন-যাপন করতে হবে।

ওসমান সাহেব একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। তিনি অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। এটা একটা নতুন ব্যাপার। তাঁর জীবনে ধৈর্যের অভাব কোনোদিন ছিল না। তিনি সমস্ত জটিলতাকে সহজভাবে গ্রহণ করেন। এখন কি তা পারছেন না? ওসমান সাহেব চুরুট ধরিয়ে ক্লাস্ত গলায় ডাকলেন, ফরিদা, ফরিদা।

ফরিদা পাশের ঘরেই ছিলেন। তিনি ঘরে ঢুকলেন।

ফিরোজ কেমন আছে আজ?

ভালো।

কী করছে?

ভেতরের বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে আছে।

শুধু শুধু বসে আছে?

না, কী যেন করছে। ডাকব?

ডাক।

ফরিদা ডাকতে গেলেন। এবং ফিরে এলেন কাউকে না নিয়ে।

ফিরোজ ঘুমাচ্ছে।

দুপুর এগারটায় কীসের ঘুম?

ওসমান সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। যদিও বিরক্ত হবার কোনোই কারণ নেই। জুন মাসের দুপুরবেলায় কারো চোখে ঘুম জড়িয়ে আসাটা অন্যায্য নয়। তাঁর নিজেরই ঘুমঘুম পাচ্ছে।

ফরিদা বললেন, তোমার কী হয়েছে? এমন রেগে কথা বলছ কেন?

রেগে কথা বলছি নাকি ?

হঁ। বেশ কয়েক দিন থেকেই লক্ষ করছি অল্পতেই ইউ আর লুজিং ইণ্ডর টেম্পার।
তোমার ব্লাড প্রেসার কি বেড়েছে ?

না।

চেক করিয়েছ ?

না।

চেক না করিয়ে কীভাবে বলছ, বাড়ে নি ? আমার তো মনে হয় বেড়েছে।
শঙ্খবাবুকে ডাকি ?

কউকে ডাকতে হবে না। তুমি তোমার নিজের কাজ কর।

আমার আবার কী কাজ যে করব ?

ওসমান সাহেব বুঝতে পারছেন, তাঁর মেজাজ খারাপ হতে শুরু কবেছে। অসম্ভব
খারাপ। এই মুহূর্তে তা চেক করা উচিত। রাগ সামলাবার কী-একটা পদ্ধতি যেন
পড়েছিলেন বইয়ে। পায়ের নখের দিকে তাকিয়ে এক থেকে কুড়ি পর্যন্ত গোনা। কিন্তু
তাঁর পায়ে জুতো। তিনি পায়ের নখের দিকে তাকাতে পারছেন না।

ফরিদা বললেন, তুমি এরকম করছ কেন ?

কী রকম করছি ?

অস্বাভাবিক আচরণ করছ।

তাই নাকি ?

হঁ, তাই। আজ দশটায় তোমার বোর্ড মিটিং ছিল। কোনো কাবণ ছাড়াই তা
ক্যানসেল করেছ। এবং...

ব'লা, কী বলতে চাও— থেমে গেলে কেন ?

গোশ কিছুদিন থেকেই তুমি কোনো কাজকর্ম দেখছ না।

তাতে কিছুই আটকে নেই ফরিদা। আমি বিশ্রাম করছি। আমি ক্লান্ত। আমার মতো
বয়সেব একটি মানুষের ক্লান্ত হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

ফরিদা ওসমান সাহেবের চেয়াবে বসলেন। চেয়ারের দু' হাতলে নিজেব হাত তুলে
দিলেন। বসার ভঙ্গি অনেকটা সিংহাসনে বসাব মতো। ওসমান সাহেব তাঁর স্ত্রীর বসার
এই ভঙ্গিটির সঙ্গে পরিচিত। এভাবে বসা মানেই ফরিদা যুক্তি দিয়ে কিছু বলবে। সে
যুক্তিগুলো কিছুতেই ফেলে দেয়া যাবে না। ওসমান সাহেব বললেন, ব'লো, তুমি কী
বলবে

ফরিদা সহজ কিন্তু দৃঢ় স্ববে বললেন, গত তিন-চার দিন ধরে তুমি এবকম আচরণ
করছ এবং আমার মনে হয় ফিরোজের কোনো-একটা ব্যাপার তোমাকে এফেক্ট করেছে।
সেটা নী ?

কিছুই না। ফিরোজের কোনো ব্যাপার নয়। ফিরোজ এখন সুস্থ।

ন, সে পুরোপুরি সুস্থ হয় নি।

ফরিদার কণ্ঠ তীব্র ও তীক্ষ্ণ। ওসমান সাহেব কিছু বললেন না। তিনি ভালো করেই

জানেন, গত তিনদিন ধরে ফিরোজ খুবই অসুস্থ। তাঁর ধারণা, এই তথ্যটি তিনি একাই জানেন। এখন বুঝতে পারছেন, এ ধারণা সত্য নয়।

ফরিদাও সেটি জানে।

ওসমান সাহেব ক্লাস্ত গলায় বললেন, আমার জন্যে এক কাপ চা দিতে বলো।

ফরিদা উঠলেন না। তিনি জানেন, ওসমান সাহেবের চায়ের পিপাসা হয় নি। আলোচনার মোড় ফেরাবার জন্যেই চায়ের প্রসঙ্গটা টেনে আনা। ওসমান সাহেব বললেন, আজ বোধহয় বৃষ্টি হবে। বৃষ্টি খুব দরকার।

এই কথাটিও শুধু শুধু বলা। মেঘ-বৃষ্টি-রোদ নিয়ে ওসমান সাহেব কখনো মাথা ঘামান না, তাঁর এত সময় নেই।

ফরিদা।

বলো।

ফিরোজের বর্তমান অবস্থাটা তুমি জানো?

জানি।

কখন জানলে?

চাবদিন আগে।

আমাকে বলো নি কেন?

তুমিও তো জানতে। তুমিও তো আমাকে কিছু বলো নি।

বাড়ি ব অন্যরা জানে?

জানি না। অন্যরা জানে কিনা জিজ্ঞেস করি নি। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা কবে নি।

মিসির আলি সাহেব জানেন? তাঁকে কিছু বলে?

না, আমি কিছু বলি নি।

আমার মনে হয় তাঁকে ব্যাপারটা জানানো উচিত।

উচিত হলে জানাও।

আরো আগেই জানা উচিত ছিল। তাই না ফরিদা?

ফরিদা কোনো জবাব না দিয়ে উঠে গেলেন। তাঁর মাথা ধবেছে। তিনি খানিকক্ষণ শুয়ে থাকবেন। রোজ দুপুরবেলায় তাঁর মাথা ধরে। ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকতে হয়।

ওসমান সাহেব বারান্দায় উঁকি দিলেন। ফিবোজ ইজিচেয়ারে ক্লাস্ত ভঙ্গিতে ঘুমাচ্ছে। নিশ্চিন্ত আরামের ঘুম। কে বলবে তাব এত বড় সমস্যা আছে।

সমস্যাটি ওসমান সাহেব তিনদিন আগে প্রথম লক্ষ করেন। রাত নটার দিকে রোজকাব রুটিন মতো তিনি ফিবোজের ঘরে ঢুকলেন। ফিবোজ হাসি মুখে বলল, কী খবর বাবা?

কোনো খবর নেই। এলাম খানিকক্ষণ গল্পগুজব করতে। বেড-টাইম গসিপিং।

বসো।

কী করছিস?

কিছু করছি না। পড়ছি।

কী পড়ছিস ?

গল্প উপন্যাস এইসব, সিরিয়াস কিছু নয়।

মাঝে মাঝে অবশ্যি গল্প-উপন্যাসও বেশ সিরিয়াস হয়।

তা হয়। তবে আমি পড়ি হালকা জিনিস। এখন পড়ছি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস—
'নৌকাডুবি'।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস হালকা জিনিস! বলিস কী তুই ?

বেচারি নোবেল প্রাইজ পেয়েছে বলেই যে তাঁকে ভারি ভারি উপন্যাস লিখতে হবে,
তেমন তো কোনো কথা নেই।

ফিরোজ হাসতে শুরু করল। সহজ স্বাভাবিক হাসি। একজন অসুস্থ মানুষ এরকম
ভঙ্গিতে হাসতে পারে না। ওসমান সাহেব নিজেও হাসলেন এবং ঠিক তখনই একটা
জিনিস লক্ষ করলেন। ফিরোজের বিছানার উপর প্রায় আড়াই হাত লম্বা একটা লোহার
রড পড়ে আছে।

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, লোহার রডটা এখানে কেন ?

ফিরোজ তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না।

কে রেখেছে এটা এখানে ?

আমি।

কেন ?

এমনি।

এমনি মানে ? বিছানার উপর কেউ লোহার রড রাখবে কেন ? ব্যাপারটা কী ?

ওসমান সাহেব লক্ষ করলেন, ফিরোজের মুখ কেমন যেন কঠিন হয়ে আসছে।
চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। জ্বলজ্বল করছে।

দে আমার কাছে, বাইরে রেখে আসি।

না।

না মানে ? এটা দিয়ে তুই কী করবি ?

ফিরোজ গম্ভীর গলায় বলল, বাবা তুমি এখন যাও, আমি ঘুমাব।

তুই ঘুমাবি, ভালো কথা, কিন্তু লোহার রড পাশে নিয়ে ঘুমাতে হবে কেন ?

ঘুমালে অসুবিধা কী ?

অসুবিধা কিছুই নেই। কিন্তু সবকিছুর একটা কারণ আছে। তুই কারণটা আমাকে
বল।

না, বলব না।

ওসমান সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। ফিরোজের চোখ লাল হয়ে উঠছে।
কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ভারি ভারি নিঃশ্বাস ফেলছে। ওসমান সাহেবের মনে হলো—
সামথিং ইজ রং। সামথিং ইজ ভেরি রং।

ফিরোজ।

জি ?

রড পাশে নিয়ে ঘুমানোর কারণটা আমাকে বল। প্রিজ। তুই একটি বুদ্ধিমান ছেলে। কারণ নেই, এমন কিছু তোর পক্ষে করা সম্ভব নয়।

ফিরোজ টেনে টেনে বলল, ও আমাকে রাখতে বলেছে।

কে রাখতে বলেছে?

ঐ লোক।

কোন লোক? তার নাম কী?

নাম জানি না।

লোকটা কে?

খালি গায়ের একটা লোক। কালো প্যান্ট পরা, চোখে চশমা। সোনালি ফ্রেমের চশমা।

ওসমান সাহেব কিছুই বুঝতে পারলেন না। কার কথা বলছে সে?

ফিরোজ বলল, মিসির আলি স্যারকে ঐ লোকের কথা আমি বলেছি। উনি চেনেন।

আই সি।

সে আমাকে বলেছে, লোহার রড সব সময় সঙ্গে রাখতে। যদি না রাখি, সে রাগ করবে।

এই ব্যাপারগুলো কি তুমি মিসির আলি সাহেবকে বলেছ?

জি না।

বলো নি কেন?

ঐ লোক আমাকে বলেছে এটা না বলতে।

আই সি।

বাবা, তুমি চলে যাও। আমার ঘুম পাচ্ছে।

মাত্র সাড়ে ন'টা বাজে। এখনই ঘুম পাচ্ছে কী? আরেকটু বসি। গল্প করি তোর সঙ্গে।

গল্প করতে ইচ্ছা কবছে না। তুমি এখন যাও।

তিনি চলে এলেন, কিন্তু সারারাত তাঁর ঘুম হলো না। তাঁর মনে হতে লাগল— দরজায় একটা তালা লাগিয়ে রাখা উচিত, যাতে ফিরোজ কিছু বুঝতে না পারে। কিন্তু তালা লাগানোর সাহস তাঁর হলো না। তালা লাগানোর ব্যাপারটা ফিরোজকে আরো এফেক্ট করবে। ভালোর চেয়ে মন্দ হবে বেশি।

ওসমান সাহেব ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকা ফিরোজের দিকে তাকিয়ে আছেন। কী নিশ্চিন্তেই না ঘুমাচ্ছে সে। কে বলবে সে অসুস্থ। কত সহজ, কত স্বাভাবিক ঘুমাবার ভঙ্গি। কোলের উপর একটা বই। সুনীল পঙ্গোপাধ্যায়ের— ‘স্বপ্ন লজ্জাহীন’। উপন্যাসটি কেমন কে জানে। সুনীলের কোনো বই তিনি পড়েন নি।

গল্প-উপন্যাস তাঁর পড়া হয়ে উঠে না।

ফিরোজ ঘুমের মধ্যেই নড়ে উঠল। ওসমান সাহেব মৃদু স্বরে ডাকলেন, ফিরোজ।

ফিরোজ জবাব দিল না। তার পায়ের কাছে ভারি লোহার রডটি আছে। রডটির মাথা বেশ ধারাল। বারবার সেখানে চোখ আটকে যায়।

ওসমান সাহেব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তাঁর বারবার মনে হচ্ছে, এই লোহার রডটি ভয়ঙ্কর কোনো কিছুর জন্যে অপেক্ষা করছে।

মিসির আলির সঙ্গে দেখা হওয়ার দরকার। তিনি নাকি ঢাকায় নেই। কোথায় গিয়েছেন কেউ বলতে পারে না। কবে ফিরবেন, তাও কারো জানা নেই।

৮

মোহনগঞ্জ স্টেশনে মিসির আলি নামলেন রাত সাড়ে সাতটায়। গায়ে প্রবল জ্বর। মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা। চোখ মেলতে পারছেন না— এরকম অবস্থা। তাঁর নিজের বোকামির জন্যে এটা হয়েছে।

শ্যামগঞ্জ পর্যন্ত ট্রেনে প্রচণ্ড ভিড় ছিল। কামরায় লেখা— ‘পঁচিশ জন বসিবেন’। বসেছে পঞ্চাশ জন। আরো পঞ্চাশ জন দাঁড়িয়ে। অসম্ভব গরম। বাথরুমের খোলা দরজা দিয়ে আসছে উৎকট দুর্গন্ধ। বারবার মিসির আলির নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। নরক-যন্ত্রণা বোধ হয় একেই বলে। যাত্রীদের মধ্যে একজন রোগী আছে, যে কিছুক্ষণ পরপর গৌ-গৌ শব্দ করছে। সেই শব্দ শুনে মনে হয়, এক্ষুণি বোধ হয় তার প্রাণবিলোম হবে। ভয়াবহ অবস্থা!

মিসির আলি শ্যামগঞ্জ নেমে পড়লেন। খোলা জায়গায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বুক ভর্তি করে নিঃশ্বাস নেবেন, এ আশায়। ট্রেন ছাড়ার সময় হঠাৎ মনে হলো— ছাদে বসে গেলে কেমন হয়? অনেকেই তো যাচ্ছে। বাতাসের অভাব হবে না সেখানে। গ্রামের ভেতর দিয়ে ট্রেন যাবে, টাটকা বাতাস পাওয়া যাবে। তিনি ছাদে উঠে পড়লেন।

ছাদের অবস্থা বেশ ভালো। চমৎকার হাওয়া। মিসির আলি নিজেকে ধন্যবাদ দিলেন, ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্তটি নেবার জন্যে।

সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল না। হিরণপুর আসবার আগেই আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল। প্রবল বাতাস বইতে শুরু করল। ধরবার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। তাঁর মনে হতে লাগল, যে-কোনো মুহূর্তে তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে চম্বা খেতে ফেলবে। জীবনের ইতি হবে সেখানেই। বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে বর্ষণ। বৃষ্টির ফোঁটা সূঁচের মতো গায়ে বিধছে। আর কী ঠাণ্ডা! যেন বরফের চাই থেকে গলে গলে পড়ছে।

একটা ভালো অভিজ্ঞতা। কিন্তু এই অভিজ্ঞতার কথা অন্যকে বলার মতো সুযোগ কি আব হবে? মিসির আলি বাতাসের ঝাপটা সামলাবার চেষ্টা করছেন। ছাদের উপরে বসা মানুষগুলোর কেউ কেউ আজান দিতে শুরু করেছে। আল্লাহকে খুশি করার একটা চেষ্টা। আল্লাহ খুশি হলেন কিনা বোঝা গেল না— ঝড়-বৃষ্টি কিছুই কমল না, তবে ড্রাইভার ট্রেন দাঁড় করিয়ে ফেলল। ছাদের উপরে বসে-থাকা অসহায় মানুষগুলোর আজানের শব্দ নিশ্চয়ই তাঁর কানে গিয়েছে। আজানের ধ্বনি একেবারে বৃথা যায় নি।

ঝড় আধ ঘণ্টার মতো স্থায়ী হলো। এবং পরের কুড়ি মিনিটের মধ্যে মিসির আলির গায়ের তাপ হ্রাস করে বাড়তে লাগল। মোহনগঞ্জ স্টেশনে নেমে তাঁর মনে হলো, প্রাটফরমেই শুয়ে পড়েন।

স্যার, আপনি কি মিসির আলি ?

হু।

আমি চৌধুরী বাড়ি থেকে আপনাকে নিতে এসেছি স্যার।

ও আচ্ছা।

আপনি কোন ট্রেনে আসবেন সেটা বলেন নাই, আমি সকাল থেকে সব ক'টা ট্রেন দেখছি।

খুব কষ্ট দিলাম— না ?

জি স্যার, তা দিলেন।

মিসির আলি হেসে ফেললেন। বেশ ছেলেটি। বুদ্ধিমান এবং স্মার্ট। কথাবার্তায় কোনো গ্রাম্য টান নেই।

কী কর তুমি ?

এখানকার কলেজে স্যার বিএ পড়ি। চৌধুরী বাড়িতে থাকি।

নাম কী তোমার ?

জহুরুল হক।

জহুরুল হক সাহেব, চল বওনা হওয়া যাক।

চলুন। আপনার মালপত্র কোথায় ?

মালপত্র কিছুই নেই। একটা হ্যান্ডব্যাগ ছিল, সেটা বাতাসে উড়ে গেছে।

বাতাসে উড়ে গেছে মানে ?

ছাদে বসে এসেছি তো— ঝড়ের মধ্যে পড়োঁছ।

বলেন কী। কী সর্বনাশ!

শোন জহুরুল, এখান থেকে যাওয়ার ব্যবস্থা কী ? আমার কিন্তু হাঁটার ক্ষমতা নেই।

হাঁটা ছাড়া তো যাওয়ার অন্য কোনো ব্যবস্থাও নেই। নদীতে এখনো পানি হয় নি, নৌকা চলে না।

মিসির আলি একটি দীঘনিঃশ্বাস ফেলে পথে নামলেন। সেখানে আবাব তাঁকে বৃষ্টিতে ধরল।

জুবের ঘোর কাটতে মিসির আলীর দু'দিন লাগল। পুরোপুরি আচ্ছন্ন অবস্থা গেল এ দু'দিন। সবকিছু স্বপ্নদৃশ্যের মতো। যা দেখেন, তাই মনে হয় কাটা কাটা খণ্ডচিত্র। একটিব সঙ্গে অন্যটির মিল নেই।

একটি অপরূপ রূপবতী মেয়েকে প্রায়ই উদ্ভগ্ন মুখে তাঁর পাশে বসে থাকতে দেখেন। এই মেয়েটিই বোধহয় নাজনীন মেয়েটি মাথায় পানি ঢালে। মাথার চুল টেনে দেয় এবং অত্যন্ত নরম স্ববে জিজ্ঞেস কবে, চাচাজি, এখন কি একটু ভালো লাগছে ? বলুন, ভালো লাগছে ?

তাঁর ভালো লাগে না। তবু মেয়েটিকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে বলেন, ভালো লাগছে মা, বেশ ভালো লাগছে।

একজন বয়স্কা মহিলাকেও প্রায় সর্বক্ষণই তাঁর ঘরের চেয়ারে বসে থাকতে দেখেন। ইনি বোধহয় নাজনীনের মা। এই মহিলাটি কথা-টথা বলেন না।

চব্বিশ ঘণ্টা থাকবার পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিলেন, তাকে থাকতে হলো এক সপ্তাহ। চার দিনের দিন তিনি নিজের ঘর থেকে বেরুলেন এবং খানিকক্ষণ হাঁটাইটি করে আবার জ্বর বাঁধিয়ে ফেললেন। সেই জ্বর পুরোপুরি ছাড়ল না। তবু এর মধ্যেই যে-সব কাজ করবার কথা, সব করলেন।

প্রথম কাজ ছিল ফিরোজ এসে যে-সব জায়গায় গিয়েছে, সে-সব জায়গায় যাওয়া।

দেখা গেল, সে খুব বেশি বেড়ায় নি। বাড়ি এবং শিয়ালজানি খাল—এ দু'য়ের মধ্যেই তার গতিবিধি সীমিত ছিল। একদিন শুধু 'উত্তর-বন্ধ' বলে গিয়েছিল মাছ ধরা দেখতে। সেখানে সে নিজেই নেমেছিল মাছ মারতে। তখন শিং মাছ কাঁটা ফুটিয়ে দেয়। সে ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ে। তার ধারণা, সাপে কেটেছে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। কারণ, ঘটনাটি ঘটে তার অসুস্থ হবার আগের দিন। খুব সম্ভব ঘটনাটি তার মনের উপর ছাপ ফেলে। রাতে তার একটু জ্বরজ্বরও হয়।

যে বটগাছের নিচে চশমা-পরা লোকটির সঙ্গে তাব দেখা হয়েছিল, সেই গাছটিও তিনি দেখতে গেলেন। এবং গাছের নিচে দাঁড়িয়ে তাঁর মনে হলো, ঘটনাটি এখানে ঘটে নি। ফিরোজের বর্ণনা অনুসারে জায়গাটা নির্জন। দু'একটা পরিত্যক্ত হিন্দু ঘরবাড়ি ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু বটগাছটা যে-অঞ্চলে, সে-জায়গাটা নির্জন নয়। পাশেই শিয়ালজানি খালের উপর একটি বাঁশের সঁকো, যার উপর দিয়ে লোকজন চলাচল করছে। নদীব ওপারেই কয়েক ঘর কুমোরের বাস। তাদের বাড়ি ভর্তি ছেলেমেয়ে, যারা খুব হৈচৈ করে খেলে। এই অঞ্চলটিকে নির্জন বলা চলে না।

ঘটনাটি নিশ্চয়ই অন্য কোথাও ঘটেছে এবং ফিরোজ ঘোরের মধ্যে হেঁটে হেঁটে চলে এসেছে বটগাছের নিচে, যেখানে অন্য লোকজন তাকে দেখতে পায়।

মিসির আলি শিয়ালজানি খালের দু'পার ধরে প্রচুর খোঁজাখুঁজি করলেন, কোনো বকুল গাছ পাওয়া যায় কিনা। পাওয়া গেল না।

তাঁর দ্বিতীয় কাজ ছিল এখানে আসার পর ফিরোজের সঙ্গে যাদের দেখা হয়েছে, তাদের সঙ্গে আলাপ করা। জানতে চেষ্টা করা, তারা ফিরোজের আচার ব্যবহারে কোনো অস্বাভাবিকতা লক্ষ করেছে কিনা। দেখা গেল, খুব অল্প কিছু লোকজনের সঙ্গে তার কথা হয়েছে। কেউ তেমন কিছু বলে নি। মিসিব আলি প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর ইন্টারভ্যুর খুঁটিনাটি লিখে ফেললেন। কয়েকটি নমুনা—

মোসাম্মাৎ সালেহা বেগম

বয়স ৫০/৫৫। আজমল চৌধুরীর মা। পর্দানশীন। কম কথা বলেন। রাতে চোখে ভালো দেখতে পান না।

প্রশ্ন : ফিরোজ ছেলেটি কেমন ?

উত্তর : ভালো।

প্রশ্ন : কেমন ভালো ?

- উত্তর : এত বড় লোকের ছেলে, কিন্তু অহঙ্কার নাই।
- প্রশ্ন : বুঝলেন কী করে অহঙ্কার নেই ?
- উত্তর : আমার পা ছুঁয়ে সালাম করল।
- প্রশ্ন : যেদিন সে অসুস্থ হয় সেদিন, অর্থাৎ অসুস্থ হবার আগে কি তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল ?
- উত্তর : হয়েছিল, চা খাওয়ার সময়।
- প্রশ্ন : কোনো কথা হয়েছিল ?
- উত্তর : না।
- প্রশ্ন : ওকে দেখে কি আপনার একটু অন্যরকম লাগছিল ?
- উত্তর : না। তবে চোখ-মুখ ফোলা ছিল। রাতে ঘুম হয় নি, সে জন্য বোধহয়।
- প্রশ্ন : বুঝলেন কী করে, ওর রাতে ঘুম হয় নি ? কারণ আপনার সঙ্গে তো ওর কোনো কথা হয় নি।
- উত্তর : সে আজমলের কাছে বলছিল, তাই শুনলাম।
- প্রশ্ন : আপনি জিজ্ঞেস করেন নি, কী জন্যে ঘুম হয় নি ?
- উত্তর : না।

নাজনীন সুলতানা

বয়স ২০/২১। মমিনুল্লাহ সা কলেজ থেকে বিএ পাস করে বাড়িতে আছে। অপরূপ দৃশ্যবতী। মায়ের মতো স্বল্পভাষী নয়। ইনহিবিশন কেটে গেলে প্রচুর কথা বলে। লাজুক নয়। কথাবার্তায় মনে হলো অত্যন্ত জেদি, তবে হাসি খুশি ধরনের মেয়ে।

- প্রশ্ন : কেমন আছ নাজনীন ?
- উত্তর : ভালো আছি চাচা। আপনি এমন খাতা-কলম নিয়ে প্রশ্ন করছেন কেন ? আমার কাছে গানে হচ্ছে, আমি কোনো পত্রিকায় ইন্টারভিউ দিচ্ছি।
- প্রশ্ন : ফিরোজকে তোমাব কেমন লেগেছিল ?
- উত্তর : ভালো।
- প্রশ্ন : কেমন ভালো ?
- উত্তর : বেশ ভালো। (এই পর্যায়ে মেয়েটি ঈষৎ লজ্জা পেয়ে গেল)
- প্রশ্ন : ঠিক কী কারণে তুমি বলছ বেশ ভালো ?
- উত্তর : জানি না কী কারণে।
- প্রশ্ন : ফিরোজ অসুস্থ হবার পেছনে কি কোনো কারণ আছে বলে মনে হয় ?
- উত্তর : এইসব নিয়ে আমি কখনো ভাবি নি চাচা।
- প্রশ্ন : আচ্ছা, ফিরোজ অসুস্থ হয়ে তোমাদের বাড়িতে এলো। সে সময় তুমি তার সামনে গিয়েছিলে ? তোমাকে কি সে চিনতে পেরেছিল ?

- উত্তর : চিনতে পেরেছিলেন কিনা, তা তো চাচা বলতে পারব না। তবে উনি খুব হৈচৈ করছিলেন, আমাকে দেখে হৈচৈ থামিয়ে ফেলেন। রাতের বেলাও খুব চিৎকার শুরু করলেন। তখন ভাইয়া আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। আমাকে দেখে চুপ করে গেলেন।
- প্রশ্ন : আচ্ছা এখন আমি একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি। জবাব দিতে না চাইলে জবাব দিও না। প্রশ্নটি হচ্ছে— ধর, ফিরোজ যদি এখন পুরোপুরি সেরে যায় এবং তোমাকে বিয়ে করতে চায়, তুমি কি রাজি হবে ?
- উত্তর : (খুব সহজ এবং শান্ত গলায়) ইঁ্যা হব। চাচা, আজকেব মতো থাক। আপনার জন্যে এখন শরবত নিয়ে আসি— নাকি চা খাবেন ? আপনি খুব ঘনঘন চা খাচ্ছেন— এটা কিন্তু ঠাচা ভালো না।

হরিপ্রসন্ন রায়

এম. বি. বি. এস

স্থানীয় ডাক্তার। বয়স ৪০/৪৫। ব্যস্তবাগীশ লোক। এ অঞ্চলে তাঁর খুব পসার আছে। ইন্টারভিউ চলাকালেই দু'জন লোক তাঁকে নিতে এলো। কথা বেশি বলেন।

- প্রশ্ন : আপনি কখন বোগীকে দেখতে এলেন ?
- উত্তর : আমাকে খবর পাঠিয়েছে পাঁচটায়। তখন যাওয়াব উপায় ছিল না। কারণ ধর্মপাশা থেকে একজন পেসেন্ট এসেছে, এখন-তখন অবস্থা। পেটেব ব্যথা। আলসার ছিল, সেই পেইন। কাজেই আমি সন্ধ্যাব পবে গিয়ে উপস্থিত হই। ধরুন ছ'টা সাড়ে ছ'টা। শীতকাল তো, ছ'টাব সময় চারদিক অন্ধকার।
- প্রশ্ন : আপনি কী দেখলেন ? মানে রোগীব অবস্থার কথা বলছি।
- উত্তর : গৌ-গৌ শব্দ করছে। মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে। হিষ্টিবিয়াব লক্ষণ মনে হলো। চোখ বড় বড় করে ঘোবাচ্ছিল। ভয়াবহ অবস্থা। আমি নাড়ি দেখলাম। হার্টবিট ছিল খুব হাই। হিষ্টিবিয়াতে এরকম হয়।
- প্রশ্ন : ওষুধপত্র কী দিলেন ?
- উত্তর : তেমন কিছু না। ঘুমের ওষুধ দিয়েছি, ফেনোবারবিটন। তারপব বললাম ইমিডিয়েটলি ঢাকা নিয়ে যেতে।
- প্রশ্ন : কতক্ষণ ছিলেন আপনি ?
- উত্তর : রাত দশটা পর্যন্ত ছিলাম। ওবা খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল। নাজনীন কান্নাকাটি কবছিল। কাজেই বোগী ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত ছিলাম।
- প্রশ্ন : ঘুমের মধ্যে বোগী কি কোনো কথাবার্তা বলছিল ?
- উত্তর : না, সাউন্ড ঘুম। আমি ঘুমের মধ্যে আরেকবার নাড়ি দেখলাম। হার্টবিট বেশি ছিল, তবে আগের চেয়ে কম। কত ছিল তা মনে নেই।
- প্রশ্ন : গায়ে টেম্পারেচার ছিল ?

উত্তর : আমি যখন দেখি, তখন অল্প ছিল। নাইনটি নাইন পয়েন্ট ফাইভ। আমি চলে আসার সময় বলেছিলাম, সকালবেলা আবার দেখব। কিন্তু সেটা সম্ভব হয় নি। ভোর পাঁচটার ট্রেনে রোগীকে নিয়ে তারা ঢাকা চলে যায়।

জহুরুল হক

বয়স ২০/২১। স্থানীয় কলেজের ছাত্র। বুদ্ধিমান এবং স্মার্ট। চৌধুরীদের বাড়ি লজিং থাকে। এদের সঙ্গে ক্ষীণ আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। কথাবার্তা শুনে ধারণা হলো, নাজনীন মেয়েটির প্রতি সে খানিকটা অনুরক্ত।

প্রশ্ন : ফিরোজের সঙ্গে তোমার কথা হয়েছিল ?

উত্তর : জি না। আমি একটু দূরে দূরে ছিলাম।

প্রশ্ন : দূরে দূরে ছিলে কেন ?

উত্তর : আজমল ভাই সব সময় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। আমি আজমল ভাইকে সব সময় এড়িয়ে চলি। তাঁকে ভীষণ ভয় পাই। কাজেই...

প্রশ্ন : ভয় পাও কেন ?

উত্তর : আজমল ভাই ভীষণ রাগী। চট করে রেগে যায়। ওদের ফ্যামিলির সবাই খুব রাগী। এখনো ওদের মধ্যে কিছুটা জমিদার-জমিদার ভাব আছে। সবাইকে মনে করে ছোটলোক।

প্রশ্ন : ফিরোজ কেন অসুস্থ হয়েছিল বলে তোমার ধারণা ?

উত্তর : জানি না কেন হয়েছে। তবে লোকে বলে, ওরা ধুতুবর বীজ খাইয়ে পাগল করে ফেলেছে।

প্রশ্ন : বলো কী তুমি!

উত্তর : না, আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। লোকে কী বলে, সেটা বললাম।

প্রশ্ন : লোকে এ জাতীয় কথা কেন বলছে ?

উত্তর : এদের পূর্বপুরুষরা খুব অত্যাচারী জমিদার ছিল। এরা মানুষের প্রাণ অতিষ্ঠ করে দিয়েছিল। এরা প্রচুর অন্যায় করেছে, সেই জন্যেই এ সব বলে।

প্রশ্ন : তুমি মনে হয় এদের ওপর রেগে আছ ?

উত্তর : না, রাগব কেন ? সত্যি কথাটা আপনাকে বললাম।

মোহনগঞ্জে আসায় মিসির আলি সাহেবের তেমন কোনো লাভ হয় নি। এখন পর্যন্ত এমন কোনো তথ্য পান নি, যেটা তাঁর কোনো কাজে আসবে। চট করে অবশ্যি কোনো কিছুই পাওয়া যায় না। খুঁজতে হয়। জট খোঁজার প্রথম ধাপই হচ্ছে অনুসন্ধান। অন্ধকারে হাতড়ানোর মতো কোনো আলোর ইশারা থাকতে হবে। সে-রকম কোনো আলোর সন্ধান মিসির আলি এখনো পান নি।

তবে যাবার দিন ভোরবেলায় একটি সূত্র পাওয়া গেল। অস্বস্তিকর একটি সূত্র, যাকে

গ্রহণ করাও যায় না, আবার ফেলে দেয়াও যায় না। নাজনীন এসে বলল, চাচা, আসুন আপনাকে একটা মজার জিনিস দেখাব।

কী মজার জিনিস ?

আমাদের এক পূর্বপুরুষ পিতলের একটা কলসি পেয়েছিলেন। কলসি ভর্তি ছিল মোহর। সেই মোহর পেয়েই তারা জমিদার হলো।

কলসিটায় কোনো বিশেষত্ব আছে ?

না। সাধারণ কলসি, তবে অমাবশ্যার সময়ে এটা ঝনঝন শব্দ করে।

তুমি নিজে শুনেছ ?

না, তবে অনেকেই শুনেছে। আমি আর ভাইয়া এক অমাবশ্যার রাতে কলসির পাশে জেগে ছিলাম। কিছু শুনেতে পাই নি।

মিসির আলি হাসিমুখে বললেন, প্রাচীন মোহর ভর্তি কলসি— এ জাতীয় গল্প খুব প্রচলিত। তবে এসবের কোনো ভিত্তি নেই।

চাচা, অনেকেই কিন্তু শব্দ শুনেছে।

হয়তো হুঁদুর ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। হুঁদুর শব্দ করেছে।

মিসির আলি কলসি দেখার জন্যে কোনোরকম আগ্রহ বোধ করলেন না। শুধুমাত্র নাজনীনের মন রক্ষার জন্যে সঙ্গে গেলেন। দোতলার উত্তরের সবচেয়ে শেষের ঘরটির তালা খুলল নাজনীন। মিসির আলির শিরদাঁড়া দিয়ে একটি ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। কলসির কারণে নয়। এ ঘরে কয়েকটি পুরনো পেইন্টিং আছে। তাদের একটিতে খালি গায়ে একটি লোক ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। তার পরনে কালো রঙের প্যান্ট। চোখে সোনালি চশমা। শুকনো ধরনের কঠিন একটি মুখ।

নাজনীন, এ ছবিটা কার ?

আমার দাদার বাবা। উনি খালি গায়ে ঘোড়ায় চড়তেন।

নাম কী উনার ?

মাসুক চৌধুরী।

উনার সম্পর্কে আর কী জানো তুমি ?

বিশেষ কিছু জানি না। শুনেছি, খুব অত্যাচারী ছিলেন। তাবপব একদিন সন্ধ্যাবেলা ঘোড়ায় চড়ে আসছিলেন। হঠাৎ প্রজারা তাঁকে ঘিরে ফেলে।

তারপর ?

তাবপব আবার কী ? মেরে ফেলে। লোহাব রড দিয়ে পিটিয়ে মারে। —চাচা, এই দেখুন কলসি। আবার কী কী যেন লেখাও আছে গায়ে। চেষ্টা কবে দেখুন। পড়তে পারেন কিনা। পালি ভাষায় লেখা।

লেখা পড়ার ব্যাপারে তিনি বিন্দুমাত্র উৎসাহ বোধ করলেন না। ঠাণ্ডা গলায় বললেন, তোমার দাদার বাবাকে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে মারে ?

হ্যাঁ। উনার কথা এড জিজ্ঞেস করছেন কেন ?

এমনি জিজ্ঞেস করছি। আচ্ছা, ফিরোজ কি এই ঘরটি দেখেছে ? সে কি এই ঘরে ঢুকেছিল ?

জি না।

কী করে বুঝলে ঢোকে নি ?

কারণ, ঘরটা তালা দেয়া থাকে। এই তালার একটিমাত্র চাবি। সেই চাবি থাকে আমার কাছে।

জানালা-টানালা দিয়ে এই ঘরে ঢোকার কোনো উপায় নেই, তাই না ?

উহু, আর উপায় থাকলেই শুধু শুধু জানালা দিয়ে ঢুকতে যাবেন কেন ? কী আছে এই ঘরে ?

মিসির আলি দাঁড়িয়ে রইলেন ছবির সামনে। তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। তিনি জট খুলতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু জট খুলছে না। আরো পাকিয়ে যাচ্ছে। ফিরোজ যদি একবার এই ঘরে ঢুকত, তাহলে সমস্ত ব্যাপারটাই অনেক সহজ হয়ে যেত। তিনি বলতে পারতেন— ফিরোজ এই ছবিটি দেখেছে। তার মনে ছাপ ফেলেছে এই ছবি। পরবর্তী সময়ে ছবির মানুষটিকেই সে দেখেছে। হেলুসিনেশন। কত সহজ সমাধান! কিন্তু ফিরোজ এই ছবি দেখে নি।

মিসির আলি বললেন, একটি মাত্র চাবি ?

হ্যাঁ।

তুমি কি নিশ্চিত যে এই ঘরের দ্বিতীয় কোনো চাবি নেই ?

হ্যাঁ, নিশ্চিত।

মিসির আলি আবার তাকালেন ছবির দিকে। তার কেন জানি মনে হলো, ছবির মানুষটি তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। বিদ্রূপের হাসি। তাক্ষিল্যের হাসি।

৯

নীলু পত্রিকার খবরটা চারবার পড়ল।

একটা লাল কলম দিয়ে বক্স করা খবরটির প্রতিটি লাইন দাগাল, তারপর কাগজটা তার বাবাকে দিয়ে এলো। খবরটা এরকম- -

পুরানা পল্টনে আতঙ্ক

(স্টাফ রিপোর্টার)

গুত্রবার রাত একটার দিকে পুরানা পল্টন এলাকায় মধ্যযুগীয় নাটকের অবতারণা হয়েছে। লোহার রড হাতে এক যুবক অত্র অঞ্চলে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীর ভাস্য অনুযায়ী উক্ত যুবকটির পরনে ছিল কালো প্যাট, গায়ে কোনো কাপড় ছিল না। সে প্রথমে একটা রাস্তার কুকুর পিটিয়ে মেরে ফেলে এবং তার পরপরই গাড়ি বারান্দায় গুয়ে থাকা কিছু ছিন্নমূল মানুষকে আক্রমণ করে। সৌভাগ্যবশত কেউ হতাহত হয় নি। চিৎকার এবং হৈচৈ শুনে প্রচুর লোকজন জমে যায় এবং যুবকটি পালিয়ে যেতে সমর্থ

হয়। নীলক্ষেত পুলিশ-ফাঁড়ির সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করি। ফাঁড়ি কর্তৃপক্ষ জানান যে, এই প্রসঙ্গে তারা কিছুই জানেন না।

জাহিদ সাহেব খবরটা পড়লেন। কিন্তু তাঁর কোনো ভাবান্তর হলো না। পত্রিকা খুললেই এ জাতীয় খবর থাকে। বাংলাদেশের কোথাও না কোথাও কেউ না কেউ ত্রাসের সৃষ্টি করছে। একবার খবর বেরুল, ছোট ছোট শিশুদের পানিতে ডুবিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে। একবার বেরুল, রক্তচোষার আগমন ঘটেছে। এরা কাউকে একা পেলেই ধরে বেঁধে সিরিঞ্জ দিয়ে টেনে সমস্ত রক্ত নিয়ে যাচ্ছে। খলিলুল্লাহ বলে এক লোককে নিয়ে প্রচুর হৈচৈ হলো। এই লোকটির প্রধান খাদ্য নাকি মৃত মানুষের কলিজা। অবিশ্বাস্য ব্যাপার! কতটুকু সত্যি কে জানে!

জাহিদ সাহেবের ধারণা, এ জাতীয় খবরের বেশির ভাগই রিপোর্টাররা চা-সিগারেট খেতে খেতে তৈরি করেন। মানুষের কৌতূহল জাগিয়ে পত্রিকার কাটতি বাড়ান। এ জাতীয় খবরের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, বেশ কয়েকটি ফলো-আপ স্টোরি ছাপা হবে এবং সবশেষে একটি সচিত্র ফিচারের মাধ্যমে ঘটনার ইতি হবে। অতঃপর রিপোর্টাররা অন্য কোনো ভয়াবহ ঘটনা ফাঁদতে চেষ্টা করবেন— ‘অজ্ঞাতনামা জন্তু’ বা এই জাতীয় কিছু।

কিন্তু নীলু এই খবরটি এভাবে দাগিয়েছে কেন? বর্তমানে নীলুর কিছু অস্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। সে কি সেই ক্ষমতার কারণেই কিছু আঁচ করছে?

দুপুরবেলা খাবার সময় জাহিদ সাহেব প্রসঙ্গটা তুললেন। হালকা গলায় বললেন, ‘পুরানা পল্টনে আতঙ্ক’ এই খবরটা তুই দাগিয়েছিস কেন?

নীলু জবাব দিল না। তার মুখ থমথমে। জাহিদ সাহেব বুঝলেন, নীলু এখন কোনো কথারই জবাব দেবে না। মাঝে মাঝে সে এরকম চুপ করে যায়। প্রয়োজনীয় কথটাও বলে না।

জাহিদ সাহেব মেয়ের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নিজের মনে বললেন, দরজা-টরজা ভালোমতো বন্ধ করে ঘুমানো উচিত। বলা তো যায় না। পল্টন আর কাঁঠালবাগান— খুব একটা দূরের ব্যাপার না।

তাঁর এসব বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে মেয়েকে আলোচনায় টেনে আনা। কিন্তু নীলু একটি কথায় বলল না। খাওয়ার মাঝখানেই সে উঠে চলে গেল।

জাহিদ সাহেব যা ভেবেছিলেন, তাই। ফলো-আপ স্টোরি ছাপা হয়েছে। খবর চলে এসেছে প্রথম পাতায়। আকর্ষণীয় শিরোনাম।

নগ্নগাত্র বিভীষিকা (স্টাফ রিপোর্টার)

পহেলা জুলাই শনিবার, পুরানা পল্টন এলাকায় ত্রাস সৃষ্টিকারী যুবক আবার আজ গভীর রাতে দেখা দিয়েছে। যথারীতি তার হাতে ছিল লোহার রড। এবার তার রডের আঘাতে রাহেলা নাম্নী এক

পতিতা গুরুতর আহত হয়। তার ডান হাত এবং পাঁজরের দুটি হাড় ভেঙে যায়। তাকে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রাহেলার বর্ণনা অনুযায়ী রাত আনুমানিক দুই ঘটিকার সময় নগ্নগাত্র যুবক একটি সুঁচাল লোহার রড নিয়ে উপস্থিত হয় এবং...

নীলু আজও খবরটির চারদিকে লাল পেনসিল দিয়ে দাগ দিল। তারপর বাবাকে খবরের কাগজটি দিয়ে বলল, বাবা, আমাকে একটা কাজ করে দেবে?

নিশ্চয়ই দেব। কাজটা কী?

আমি মিসির আলি স্যারকে চিঠি লিখেছি। ঐটি তাঁকে পৌঁছে দেবে। তিনি অবশ্যি এখনো ঢাকায় ফেরেন নি। তুমি দরজার নিচ দিয়ে রেখে আসবে, যাতে আসামাত্র পেয়ে যান।

জাহিদ সাহেব বিস্মিত হয়ে মেয়ের দিকে তাকালেন। নীলু বলল, স্যারের খুব বিপদ। খালি গায়ে ছেলেটি স্যারকে মেরে ফেলবে। তাঁকে সাবধান করা দরকার।

বলিস কী!

আমি যা বলছি, ঠিকই বলছি। তুমি এক্ষুণি যাও। খামের উপর ঠিকানা লেখা আছে। আমি নিজেই যেতাম, কিন্তু আমার ভালো লাগছে না।

জাহিদ সাহেব দেখলেন, খামের উপর পুরানা পল্টনের ঠিকানা লেখা।

১০

পুলিশ কমিশনার রাত এগারটায় পুরানা পল্টন এলাকায় এলেন। থমথম করছে চারদিক। একটি ভিখিরিকেও দেখা গেল না। দোকানপাট সব বন্ধ। তিনি লক্ষ করলেন, একতলার বাসিন্দাদের প্রায় সবাই এই প্রচণ্ড গরমেও জানালা বন্ধ করে শুয়েছে। আতঙ্কের মতো ভয়াবহ কিছুই নেই। এবং পুলিশের শাস্ত্রে আতঙ্কগ্রস্ত মানুষের মতো ভয়াবহ কিছুই নেই। মিছিলের মানুষজন হঠাৎ স্কিণ্ডের মতো পুলিশের গাড়িতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কারণ রাইফেল হাতে পুলিশকে দেখে তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়।

সাজ্জাদ হোসেন গাড়ি থেকে নেমে সিগারেট ধরালেন। এ অঞ্চলে টহলপুলিশের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন তাদের জন্যে। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলবেন। হঠাৎ করেই তাঁর মনে হলো, গোরস্থানের ভেতর কিছু ফিল্ড পোস্ট সেন্টি দেয়া দরকার। লুকায় থাকার জন্যে গোরস্থান হচ্ছে আদর্শ জায়গা। কেউ কিছু টের পাবে না। একসময় আত্মগোপনকারী দেয়াল উপকে ঝাঁপিয়ে পড়বে অসতর্ক পথচারীর ওপর।

তিনজন পুলিশের একটি দল আসছে গল্প করতে করতে। সাজ্জাদ হোসেন লক্ষ করলেন, এদের সঙ্গে টর্চ লাইট নেই। অথচ বলে দেয়া হয়েছিল, পাঁচ ব্যাটারির একটি টর্চ লাইট যেন সঙ্গে থাকে। পুলিশ বাহিনীতে একটি কাজও কি কখনো ঠিকমতো করা হবে না!

হল্ট।

তিনজন দাঁড়িয়ে পড়ল এবং স্যালুট দিল।

তোমরা তিনজন কেন ? একেকটা দলে দু'জন করে থাকতে বলেছি। তৃতীয় জন এসে জুটল কীভাবে ?

জানা গেল, এই ব্যবস্থা তারা নিজেরা করে নিয়েছে। তিনজন থাকলে নাকি মনে বেশি সাহস থাকে।

তোমরা কি লোহার রড হাতে একটা লোকের ভয়ে আধমরা হয়ে গেছ ? একজন আনসারের সাহসও তো তোমাদের চেয়ে বেশি।

ওরা কিছু বলল না। তিনি থমথমে গলায় বললেন, মেইন রোড ধরে হাঁটছ কেন ? আমি বলেছি না, অলি-গলিতে থাকবে এবং কিছুক্ষণ পরপর বাঁশি বাজাবে ? আমি পনের মিনিট এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, একবারও তো জেঁমাদের বাঁশি শুনলাম না।

বাঁশি শুনলে তা স্যার ঐ ব্যাটা সাবধান হয়ে যাবে। ধরতে পাবব না।

ঐ ব্যাটার জন্যে আমার মোটেও মাথাব্যথা নেই। বাঁশি বাজানো দবকার অন্যদের সাহস দেবার জন্যে। যাতে সবাই বুঝতে পারে, ভালো পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে। বুঝতে পারছ ?

জি স্যার।

আর শোন, রাত একটার পর যাকেই দেখবে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। খালি গায়েই হোক কিংবা কোট-প্যান্ট পরাই হোক। বুঝতে পাবছ ?

জি স্যার।

সাজ্জাদ হোসেন গোরস্থানে ঢুকলেন। সন্দেহজনক কিছুই কোথাও নেই। টুপি পরা দু-তিনজন লোক ঘোরাফেরা করছে। এরা গোরস্থানেরই লোক। তবু তিনি তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। ওদের একজন হাসি মুখে বলল, গোবস্থানে কোনো আজোবাজে লোকে ঢোকে না স্যাব। গোরস্থান হইল গিয়া আল্লাহ পাকেব খাস জায়গা।

সাজ্জাদ হোসেন প্রচণ্ড ধমক দিয়ে তাকে থামালেন। তাঁর আঠাব বছরের পুলিশী জীবনে তিনি ভয়ঙ্কর সব অপরাধীদের গোরস্থান এবং মসজিদে লুকিয়ে থাকতে দেখেছেন।

তোমরা সজাগ থাকবে এবং লক্ষ রাখবে।

জি আচ্ছা স্যার।

কাল থেকে গোরস্থানের ভেতরেও আমি পুলিশ বসাব।

জি আচ্ছা স্যার।

যত সব শুয়োরের বাচ্চা।

ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। পুলিশ সাহেব গালটা কাকে দিলেন, বোঝা গেল না। এই লোকের মেজাজ খারাপ। গোরস্থানের ভেতর কেউ এরকম গরম দেখায় না। এত সাহস কারো নেই।

সাজ্জাদ হোসেন তাঁর জিপ নিয়ে আরো খানিকক্ষণ এই অঞ্চলে ঘুরলেন। একটা পাগল-ছাগল রড হাতে বের হয়েছে এবং সেই কারণে এ জাতীয় পুলিশী তৎপরতার কোনো মানে হয় না। কিন্তু এটা করতে হয়েছে, কারণ একজন মন্ত্রীর স্বত্ত্বরবাড়ি এই

অঞ্চলে। এমনিতেই মন্ত্রীদের যন্ত্রণায় প্রাণ বের হয়ে যায়, তার উপর ইনি হচ্ছেন নন পার্লামেন্টারিয়ান মন্ত্রী। এঁদের গরমই আলাদা।

তিনি মন্ত্রী সাহেবের স্বস্তরবাড়ির সামনে জিপ থামালেন। বাড়ির সামনেই পুলিশ পাহারা আছে। সব ক'জন মন্ত্রীর স্বস্তরবাড়ির সামনে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করতে হলে তো সর্বনাশ! বিশাল এক পুলিশ বাহিনী লাগবে মন্ত্রীদের আত্মীয়স্বজনদের জন্যে।

সাজ্জাদ হোসেনের মুখ তেতো হয়ে গেল। তিনি শব্দ করে থুথু ফেললেন। মিসির আলির বাড়িও এ অঞ্চলে। ঠিকানা সঙ্গে নেই। ঠিকানা থাকলে একবার যাওয়া যেত। মিসির আলির কাজের মেয়েটি সম্পর্কেও তিনি কিছু খোঁজখবর নিয়েছেন। হারিয়ে যাওয়া বেশ কিছু মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেগুলো দিয়ে মিসির আলিকে আপাতত ঠাণ্ডা করা যাবে।

সেন্টি এগিয়ে আসছে।

সাজ্জাদ হোসেন বললেন, কী খবর ?

খবর স্যার ভালোই।

সব ঠিকঠাক ?

জি স্যার। তবে স্যার, এই বাড়ির লোকজন আমার সাথে খুব রাগারাগি করছে।

কেন ?

এরা নাকি দু'জন সেন্টি চেয়েছিল। একজন দেখে রেগে গেছে।

দু'জন লাগবে কেন ? এরা কোন দেশের মহারাজ ?

স্যার কী বললেন ?

কিছু বলি নি। যাও, ডিউটি দাও।

এরা স্যার জিজ্ঞেস করছিল, তোমাদের ডিউটি অফিসার কে।

তাই নাকি ?

জি স্যার। বলছিল, ব্যাটার চাকরি খাব।

সাজ্জাদ হোসেন আবার থুথু ফেললেন। মন্ত্রীদের আত্মীয়স্বজনেরা কথায় কথায় চাকরি খেতে চায়। চাকরি ছাড়া ওদের মুখে অন্য কিছু রোচে না। শালা!

সেন্টি।

জি স্যার ?

যাও ডিউটি কর। দেখি, আমি আরেকজনকে পাঠাব।

সাজ্জাদ হোসেন মনে মনে ভাবলেন, পুলিশের চাকরি করার মানেই হচ্ছে পদে-পদে অপমানিত ও অপদস্থ হওয়া।

১১

মিসির আলি ঢাকা পৌঁছলেন রবিবার ভোরে। দরজা খুলেই নীলুর চিঠি ভর্তি খাম পেলেন। চিঠিতে একটিমাত্র লাইন— ‘স্যার, আপনার বড় বিপদ!’ কিসের বিপদ, কী সমাচার, কিছুই লেখা নেই।

মেয়েদের নিয়ে এই সমস্যা। তাদের সব চিঠিতেই অপ্রয়োজনীয় কথার ছড়াছড়ি। শুধু প্রয়োজনীয় কথাগুলোর বেলায় তারা শর্টহ্যান্ড ভাষা ব্যবহার করে। আজ পর্যন্ত তিনি মেয়েদের এমন কোনো চিঠি পান নি, যেখানে জরুরি কথাগুলো গুছিয়ে লেখা।

তবে নীলু একটি কাজ করেছে। নিজের বাড়ির ঠিকানা দিয়েছে। এক্ষুণি চলে যাওয়া যায়। মিসির আলি গেলেন না। হাত-মুখ ধুয়ে গ্লান করতে বসলেন, আজ সারাদিনে কী করবেন।

ক. হানিফার খোঁজ নেবেন।

খ. ইউনিভার্সিটিতে যাবেন।

গ. ফিরোজের খোঁজ নেবেন।

ঘ. সাজ্জাদ হোসেনের সঙ্গে দেখা করবেন।

ঙ. আজমলের সঙ্গে দেখা করবেন।

এই পাঁচটি কাজ শেষ করবার পর নীলুর কাছে যাওয়া যেতে পারে। তাঁর এমন কোনো বিপদ নেই যে এক্ষুণি ছুটে যেতে হবে। তবে কেন জানি নীলুব কাছে আগে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে। ফ্রয়েডিয়ান কোনো ব্যাখ্যা এর নিশ্চয়ই আছে।

দ্রেনে আসতে আসতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এবং আশ্চর্য, নীলুকে স্বপ্নে দেখলেন। স্বপ্নটি এমন ছিল যে, জেগে উঠে তাঁর নিজেরই লজ্জা করতে লাগল। কেবলই মনে হতে লাগল, তাঁর পাশে বসে থাকা লোকগুলোও তাঁর স্বপ্নের ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে। তিনি যে খ নিকক্ষণ আগেই একটি রূপবতী মেয়ের হাত ধবে নদীৰ ধাবে হাঁটছিলেন, এটা সবাই জানে।

হানিফা সুস্থ।

তবে অনেক রোগা হয়ে গেছে। মুখ শুকিয়ে হয়েছে এতটুকু। হানিফাব কাছে তিনি ঠিক সময়েই এসেছেন। আজই তার রিলিজ অর্ডার হবে। আর একদিন দেরি হলে মুশকিল হয়ে যেত। মেয়েটি ঘাবড়ে যেত। কাবণ এই সাতদিন কেউ তাকে দেখতে আসে নি। অথচ বাড়িওয়ালা করিম সাহেব বাববাব বলেছেন, তিনি প্রতিদিন একবার এসে খোঁজ নেবেন। আমাদের দেশের মানুষদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, যে কাজগুলো তারা করতে পাববে না, সেই কাজগুলোর দায়িত্ব তারা সবচেয়ে আগ্রহ কবে নেবে।

১ল হানিফা, বাসায় যাই।

চলেন।

তুই তো দারুণ রোগা হয়েছিস বে বেটি।

আপনেও রোগা হইছেন।

অসুখে পড়ে গিয়েছিলাম বে হানিফা। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছিল, তাতে মনে হয়েছিল নিউয়োনিয়াতে ধরেছে। মরতে-মরতে বেঁচে গেছি। তুই বস এখানে, আমি রিলিজ অর্ডার ব্যবস্থা করি।

রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ান বললেন, হানিফা মেয়েটি আপাতত সুস্থ, কিন্তু আবার অসুস্থ হয়ে পড়বে।

কেন ?

ওর প্রবলেমটা হার্টের একটা ভাঙ্গে। তার জন্মই হয়েছিল একটা ডিফেকটিভ ভাঙ্ক নিয়ে। তার ছোটবেলায় ডাক্তাররা চেষ্টা করেছেন ভাঙ্কটা রিপেয়ার করতে। ওপেন হার্ট সার্জারি হয়েছে তার।

কী করে বুঝলেন ? মেয়েটি বলেছে ?

না, সে কিছু বলে নি। জিজ্ঞেস করেছিলাম। তার কিছু মনে-টনে নেই। তবে আমাদের বুঝতে না পারাব কোনো কারণ নেই। ওর হার্ট আবার ওপেন করতে হবে।

এখানে করা যাবে ?

আগে যেখানে কবা হয়েছিল, সেখানে করলেই ভালো হয়। আমাদের এখানে এত ছোট বাচ্চাদের ওপেন হার্ট সার্জারির সুযোগ নেই।

আপনার ধারণা, ওর অপারেশনটা এ দেশে হয় নি ?

না, এ দেশে হয় নি। পশ্চিমা কোনো দেশে হয়েছে। কেন, আপনি জানেন না ?

জি না, আমার জানা নেই।

মিসির আলি চিন্তিত মুখে হানিফাকে নিয়ে ঘরে ফিরলেন। সাজ্জাদ হোসেনের সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। সে কতদূর কী করেছে জানা দরকার, বা আদৌ কিছু করেছে কিনা। কিছু না করারই কথা। এ দেশের বেশির ভাগ লোকই কোনো কাজ করতে চায় না। কেন করতে চায় না— এই নিয়ে কিছু ভালো গবেষণা হওয়া দরকার। কর্মবিমুখতার কারণটি কী ? যদি একাধিক কারণ থেকে থাকে, সেগুলোই-বা কী ?

সাজ্জাদ হোসেনকে টেলিফোনে পাওয়া গেল না। যতবারই টেলিফোন করা হয়, ততবারই খুব চিকন গলায় একজন পুরুষ মানুষ বলে, উনি ব্যস্ত আছেন। মিটিং চলছে।

মিসির আলি বড় বিরক্ত হলেন। পুলিশরা এত মিটিং করে, তাঁর জানা ছিল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এয়ারকন্ডিশনড ঘরে বসে মিটিং করার মতো সময় তো তাদের থাকার কথা নয়। এগুলো হচ্ছে করোপারেট অফিশগুলোর কাজ— শুধু কথা বলা, বকবক কবা। কিছুক্ষণ পরপর কফি খাওয়া। সুখে সময় কাটানো যার নাম।

সাজ্জাদ হোসেনের সময়টা অবশ্য খুব সুখে কাটছিল না। মন্ত্রীর শাশুড়ির কল্যাণে তিনি একটি বিপজ্জনক অবস্থায় আছেন। আইজি মতিয়ুর রহমান পিএসপি'র কাছে তাঁকে জবাবদিহি করতে হচ্ছে।

আইজি মতিয়ুর রহমান ছোটখাট মানুষ, কিন্তু দারুণ কড়া অফিসার। পুলিশমহলে একটি চালু কথা আছে— মতিয়ুর রহমানের সামনে দাঁড়ালে হাতিরও বুক কাঁপে। সাজ্জাদ হোসেনের বুক কাঁপছিল।

মতিয়ুর রহমান বললেন, দু'জন সেক্সি চেয়েছিল, দিভেন দু'জন, কেন ঝামেলা করলেন ?

আমি স্যার দিতাম, পরে অফিসে ফিরে মনে হলো ঝামোখা...।

একজন মন্ত্রী শাশুড়ির ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনেক বড় ব্যাপার, কেন বুঝতে পারেন না ? তাছাড়া যে একজন সেন্ত্রি ছিল, সকালবেলা দেখা গেল সে ঘুমাচ্ছে।

সারা রাত ডিউটি দিয়েছে স্যার, কাজেই ভোরবেলা ঘুম এসে গেছে। পুলিশ হলেও তো স্যার এরা মানুষ।

এখন বলেন, আমি কী করি। মিনিষ্টার সাহেব ভোর সাতটায় আমাকে টেলিফোন করে বলেছেন, আপনার বিরুদ্ধে অ্যাকশান নেবার জন্যে।

সাজ্জাদ হোসেন ক্লান্ত গলায় বললেন, কী আর করবেন স্যার। অ্যাকশান নিতে বলেছে, অ্যাকশান নেন।

মতিয়ুর রহমান সাহেব ফাইল থেকে একটি চিঠি বের করে বললেন, আমি মিনিষ্টার সাহেবকে এই চিঠিটা পাঠিয়েছি। কী লিখেছি শুনুন—

জনাব,

পুলিশ কমিশনার সাজ্জাদ হোসেনের বিরুদ্ধে আপনি আমাকে যে অ্যাকশান নেবার কথা বলেছেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আপনাকে জানাচ্ছি যে সাজ্জাদ হোসেন পুলিশ বাহিনীর একজন দক্ষ, নিষ্ঠাবান এবং সৎ অফিসার। একান্তরের মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের জন্যে তাকে বীর বিক্রম উপাধিতে সম্মানিত করা হয়েছে। এ জাতীয় একজন অফিসারের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে লিখিত অভিযোগের প্রয়োজন আছে। আপনার অভিযোগের উপর ভিত্তি কবে তদন্ত হবে। তদন্তকারী অফিসার সাজ্জাদ হোসেনকে দোষী সাব্যস্ত করবার পরই ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্ন ওঠে।

বিনীত

মতিয়ুর রহমান চিঠি পড়া শেষ করে বললেন, ঠিক আছে ?

থ্যাংকস্ ভেরি মাচ স্যার।

থ্যাংকস দেবার কিছু নেই। সত্যি কথাই লিখেছি। তবে, আপনাব উচিত আরো ট্যান্টিফুল হওয়া।

যাব স্যার ?

হ্যাঁ যান।

স্যার, একটা কথা বলি ?

বলুন।

স্যার, আমার ইচ্ছা হচ্ছে কালো একটা প্যান্ট পরে খালি গায়ে হাতে একটা লোহার রড নিয়ে যাই এবং ঐ শাশুড়ির মাথায় একটা বাড়ি দিয়ে আসি।

কথাটা বলেই সাজ্জাদ হোসেনের মনে হলো, একটা বড় ভুল হয়ে গেল। আইজি এমন কোনো ব্যক্তি নন, যিনি রসিকতা সহজভাবে নেবেন। কিন্তু অবাক কাণ্ড, মতিয়ুর রহমান সাহেব হেসে ফেললেন। মুচকি হাসি নয়। হা হা করে হাসি।

সাজ্জাদ হোসেনের জীবনে এটা একটা স্বর্ণীয় দিন। তাঁর মনের গ্লানি কেটে যেতে শুরু করেছে। তিনি অফিসে ফিরে দুটি সংবাদ শুনলেন— দশ মিনিট পরপর কে নাকি

তাকে খোঁজ করছে এবং গত রাতে নগ্নগাত্র ত্রাস একটি ছ'বছরের ছেলেকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। তার ডেডবডি কিছুক্ষণ আগেই রিকভার করা হয়েছে। চেনার উপায় নেই। লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে খেঁতলে ফেলা হয়েছে।

সজ্জাদ হোসেন তক্ষুণি জিপ নিয়ে বেরলেন।

হ্যালো, এটা কি ফিরোজদের বাসা ?

হ্যাঁ।

আপনি কে কথা বলছেন ?

আপনি কে এবং আপনার কাকে দরকাব, সেটা বলুন।

আমার নাম মিসির আলি।

ও আচ্ছা। আমি ফিরোজের মা।

স্নামালিকুম আপা।

ওয়ালাইকুম সালাম।

আমি সপ্তাহখানেক বাইরে ছিলাম। আপনাদের খবর দিয়ে যেতে পারি নি।

ও।

গিয়েছিলাম চব্বিশ ঘণ্টাও আগে, ঝামেলায় পড়ে এত দেরি হলো। আমি ফিরোজের ব্যাপারেই খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম।

ও।

ফিরোজ কেমন আছে ?

ভালো।

ওকে টেলিফোনটা দিন।

ওকে টেলিফোন দেয়া যাবে না।

বাসায় নেই।

না।

কোথায় গিয়েছে ? বাইবে ?

হ্যাঁ।

তাহলে আমি বরং রাতের বেলা এ ফার টেলিফোন করব।

না, রাতের বেলা টেলিফোন করবেন না। ওকে পাওয়া যাবে না।

কেন, ও কি রাতে ফিরবে না ?

না। ও ঢাকার বাইরে।

ঢাকার বাইরে! কোথায় ?

ওর মামার বাড়িতে— বরিশালে।

কিন্তু আমি তো বলেছিলাম ওকে দীর্ঘদিন চোখে-চোখে রাখতে হবে।

কোনো উত্তর নেই।

হ্যালো।

বলুন।

কী হয়েছে ফিরোজের ?

কী আবার হবে ? কিছুই হয় নি। ও ভালো আছে।

কিন্তু আপনার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে, কিছু-একটা হয়েছে। আপনি কি দয়া করে বলবেন ?

ওর কিছু হয় নি। ও ভালো আছে। ও আছে তার মামার বাড়িতে।

বরিশালে ?

হ্যাঁ, বরিশালে।

আপনি ঠিক কথা বলছেন না। কারণ ফিরোজের মামার বাড়ি বরিশাল নয়। ফিরোজ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য আমার জানা। দয়া করে আপনি আমাকে বলুন, কী হয়েছে।

কিছু হয় নি। অনেকবার তো এই কথা বললাম। তবু কেন বিরক্ত করছেন ?

ওসমান সাহেবকে দিন। তাঁর সঙ্গে কথা বলব।

উনি বাসায় নেই।

কখন ফিরবেন ?

জানি না কখন ফিরবেন।

শুনুন আপা, আমি আসছি এই মুহূর্তে।

মিসির আলি টেলিফোন নামিয়ে রেখে তক্ষুণি ধানমণ্ডি ছুটলেন। কিন্তু ওসমান সাহেবের বাড়ির ভেতর ঢুকতে পারলেন না। দারোয়ান গেট বন্ধ করে বসে আছে। সে কিছুতেই গেট খুলবে না। ওসমান সাহেব এবং তাঁর স্ত্রী— কেউ নাকি বাড়ি নেই। কখন ফিরবেন তারও ঠিক নেই। মিসির আলি বললেন, ঠিক আছে, আমি বসার ঘরে অপেক্ষা করব। গেট খোল।

সাহেব আর মেমসাহেব বাড়িতে না থাকলে গেট খোলা নিষেধ আছে।

মিসির আলি প্রায় দু'ঘণ্টা বন্ধ গেটের ওপাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। কোনো লাভ হলো না। নীলুদের বাসা কাছেই কোথাও হবে। ঝিকাতলা ধানমণ্ডি থেকে খুব-একটা দূর নয়। মিসির আলি সেদিকেই রওনা হলেন।

ফিরোজের কথা বারবার মনে আসছে। কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছেন না। কী হলো ছেলেটার ? আর যদি কিছু হয়েই থাকে, সবাই মিলে এটা তাঁর কাছে গোপন করছে কেন ? রহস্যটা কী ? রাতে ফেরাবাব পথে আবেকবার খোঁজ নিতে হবে।

১২

মিসির আলি নরম স্বরে বললেন, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক। আমার এক ছাত্রী কি এ বাড়িতে...।

বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, আসুন, আমি নীলুর বাবা। আমার নাম জাহিদুল ইসলাম।
শ্রামালিকুম।

ওয়ালাইকুম সালাম। বসুন আপনি। নীলু এসে পড়বে।

ওকে খবর দিন। আমি বেশিক্ষণ থাকব না, আকাশের অবস্থা ভালো না— ঝড়-বৃষ্টি হবে।

জাহিদ সাহেব তাঁর মেয়েকে খবর দেয়ার জন্যে মোটেই ব্যস্ত হলেন না। খবর দেয়ার কিছু নেই। নীলু খবর পেয়ে গেছে। দশ মিনিট আগেই সে বলেছে, স্যার আমাদের বাসার দিকে রওনা হয়েছেন। এসে পড়বেন কিছুক্ষণের মধ্যে।

নীলুর মুখ উজ্জ্বল এবং হাসি হাসি। এইসব জাহিদ সাহেবের ভালো লাগছে না। একজন মাঝবয়সী অধ্যাপকের জন্যে এত আগ্রহ নিয়ে তাঁর মেয়ে অপেক্ষা করবে কেন?

তিনি একটি সুস্থ স্বাভাবিক মেয়েকে নিজের পাশে চান— যার কোনো অলৌকিক ক্ষমতা নেই। কী হবে না হবে, যা সে আগে থেকে বলতে পারবে না। অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে যে গ্রহণ করবে আর দশটি মেয়ের মতো।

মিসির আলি বললেন, আমি আপনার এ বাড়িতে আগে একবার এসেছি। আনিস সাহেব বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁর স্ত্রীকে কিছুদিন চিকিৎসা করেছিলাম।

আমি জানি।

আনিস সাহেব কি এখনো এ বাড়িতে থাকেন?

না।

অন্য কোনো ভাড়াটে এসেছে বুঝি?

না, বাড়ি ভাড়া দিই না এখন, যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।

এ কথা বলছেন কেন?

রানু মেয়েটা এ বাড়িতে না থাকলে, আজ আমার মেয়ের এ অবস্থা হতো না।

এত জোব দিয়ে তা বলা কি ঠিক? অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা আমরা কেউ তো জানি না।

জাহিদ সাহেব গম্ভীর হয়ে গেলেন। বোগা, কালো এবং কিশোরী কুঁজো হয়ে বসে থাকা এই লোকটিকে তাঁর মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। নীলু এই লোকটির মধ্যে কী দেখেছে? জাহিদ সাহেবের ইচ্ছা হচ্ছে উঠে চলে যেতে। কিন্তু বাইরের একটি লোককে একা বসিয়ে রেখে উঠে চলে যাওয়া যায় না। তিনি লক্ষ করলেন, ভদ্রলোক সিগারেট ধরিয়েছেন। তাঁর সামনেই অ্যাশট্রে তবু তিনি চারদিকে ছাই ফেলছেন। কী কুৎসিত স্বভাব! এরা ছাত্রদের কী শেখাবে? নিজেরাই তো কিছু শেখে নি।

মিসির আলি বললেন, আপনার আরেকটি মেয়ে ছিল। ওর কি বিয়ে হয়ে গেছে? হ্যাঁ।

কোথায় আছে সে?

বাইরে।

বিলুর প্রসঙ্গ উঠলেই জাহিদ সাহেব অনেক কথা বলেন। কিন্তু আজ এই লোকটির সঙ্গে কোনো কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না। তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

মিসির আলি সাহেব।

জি ?

আমার মাথা ধরেছে, আমি একটু শুয়ে থাকব। কিছু মনে করবেন না। আমি নীলুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

জি আচ্ছা।

জাহিদ সাহেব নীলুর ঘরে উঁকি দিয়ে অবাক এবং দুঃখিত হলেন। নীলু শাড়ি বদল করেছে। সাধারণ শাড়ি বদলে বেগুনি রঙের চমৎকার একটি শাড়ি পবেছে এবং চুল বাঁধছে। এর মানেটা কী ?

নীলু।

জি ?

তোর স্যার বসে আছেন নিচে।

যাচ্ছি বাবা।

বেশিক্ষণ উনাকে আটকে রাখা ঠিক না। আকাশের অবস্থা খারাপ।

বাবা, আমি তো উনাকে আজ রাতে এখানে থেকে যেতে বলব।

সে কী! কেন ?

আমার কথা শেষ হতে অনেক রাত হয়ে যাবে। এত রাতে আমি উনাকে ছাড়ব না।

কথাটা তাহলে দিনের বেলা বল। কাল উনাকে আসতে বলে দে।

বাবা, উনার সঙ্গে আজই আমার কথা বলা দবকার। একটা বাত উনি এখানে থাকলে, তোমার কি কোনো আপত্তি আছে ?

জাহিদ সাহেব হ্যাঁ-না কিছুই বলতে পারলেন না। নীলু বলল, আমাদের গেস্টরুমটা ঠিকঠাক করে রেখেছি। উনি সেখানেই থাকবেন। তুমি এত গম্ভীর হয়ে আছ কেন বাবা ? আপত্তি থাকলে বলো— আমার আপত্তি আছে।

আমার আপত্তি আছে।

আপত্তিটা কেন ?

ঐ ভদ্রলোকেব সঙ্গে তোর এত কীসের খাতির ?

খাতির কিছু নেই বাবা। উনি আমার টিচার এবং চমৎকাব একজন টিচার। আমি অনেক কিছু শিখেছি তাঁর কাছ থেকে। তাঁর প্রতি আমার অন্যরকম একটা শ্রদ্ধা আছে।

এই জন্যেই কি এত শাড়ি-গয়না পরে সাজতে শুরু করেছিস ?

না বাবা, সে জন্যে সাজছি না এবং তুমি যা ভাবছ তাও ঠিক না। আমি এত সাজগোজ করছি, কারণ স্যাব রিকশা করে আসতে আসতে ভাবছিলেন, আমাকে দেখবেন বেগুনি রঙের একটা শাড়ি পরা অবস্থায়। কাজেই আমি এইভাবে সেজেছি। রহস্যময় সবকিছুতে স্যাবের অবিশ্বাস আছে, আমি সেটা দূর করতে চাই। চলে যেও না বাবা, আমার কথা এখনো শেষ হয় নি। এই স্যার রানু আপার ব্যাপারটা খুব ভালো জানেন। রানু আপার রহস্যের সঙ্গে আমার রহস্যের একটা মিল আছে। সেই মিল নিয়ে স্যারের সঙ্গে আমি কথা বলব।

নীলু দম নেয়ার জন্যে থামল। জাহিদ সাহেব কী বলবেন, ভেবে পেলেন না।

বাবা।

বল।

স্যার যদি আজ রাতে এ বাড়ির গেষ্টরুমে থাকেন, তোমার কি খুব বেশি আপত্তি হবে ?

না ?

আমি যখন স্যারের সঙ্গে কথা বলব, তখন তুমি ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে থাকতে পার।

না, আমি শুয়ে থাকব, আমার মাথা ধরেছে।

না বাবা, তোমার মাথা ধরে নি। তুমি আমাব স্যারকে খুবই অপছন্দ করছ বলে এ রকম করছ। বাবা, তোমাকে শুধু একটা কথা বলি— মানুষ হিসেবে উনি প্রথম শ্রেণীর। তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না, তাই না ?

বিশ্বাস করব না কেন ? করছি।

না, তুমি করছ না। তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না, তবে তুমি যদি বিশ্বাস করতে, তাহলে আমার ভালো লাগত। ঠিক আছে বাবা, তুমি যাও, শুয়ে থাক। রাত দশটার সময় টেবিলে ভাত দেব, তখন তোমাকে ডাকব।

নীলু বসার ঘরে ঢুকল নিঃশব্দে। মিসির আলি চাঁপা ফুলের হালকা একটা সুবাস পেয়ে চমকে পেছনে ফিরলেন। নীলু বলল, কেমন আছেন স্যার ?

তিনি কোনো জবাব দিতে পারলেন না। তাঁর দারুণ অস্বস্তি ও লজ্জা লাগতে লাগল। একটা বিব্রতকর অবস্থা। কাবণ তিনি বিকশায় আসতে আসতে নীলুকে যেভাবে দেখবেন কল্পনা করেছিলেন, সে ঠিক সেভাবেই সেজেছে। কাকতালীয় মিল বলে একে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। দুটি কারণে এবকম হতে পারে। হয়তো নীলু এরকম সেজে বসেছিল। তিনি তাঁর ESP-র মাধ্যমে তা টের পেয়েছেন। এটা সম্ভব নয়, কারণ মিসির আলি খুব ভালো করেই জানেন, তাঁর কোনো ESP ক্ষমতা নেই। দ্বিতীয় কাবণটি যদি সত্যি হয়, তাহলে বড় অস্বস্তির ব্যাপার হবে। তিনি রিকশায় আসতে আসতে যা ভাবছিলেন, নীলু তা টের পেয়েছে এবং সেইভাবে সেজেছে। এরকম হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

মিসির আলি রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন! তাঁর মনে নীলু সম্পর্কে যে-সব কল্পনা আছে, তা তিনি আড়াল করে রাখতে চান। বিশেষ করে ট্রেনে আসতে আসতে যে স্বপ্নটা দেখেছেন। এটি যদি নীলু টের পায়, তাহলে বড় লজ্জার ব্যাপার হবে। তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন, দেখ নীলু, স্বপ্নের উপর আমাব হাত নেই। স্বপ্ন হচ্ছে স্বপ্ন।

কিন্তু মনোবিজ্ঞানের একজন শিক্ষক হিসেবে তিনি জানেন, স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন নয়। অবচেতন কামনা-বাসনার ছবি। তিনি তাকালেন নীলুর দিকে। মেয়েটির মুখে হাসি। ছোটদের দুষ্টমি দেখে বড়রা যে-রকম হাসে, সে-রকম।

নীলু বলল, স্যার চলুন, আমরা বারান্দায় গিয়ে বসি।

আমি বেশিক্ষণ বসব না নীলু। আকাশের অবস্থা ভালো না! ঝড় হবে।

হলে হবে। ঝড়-বৃষ্টি নিয়ে ঠিক এই মুহূর্তে আপনাকে ভাবতে হবে না।

বারান্দায় অন্ধকার। সেখানে পাশাপাশি দুটি বেতের চেয়ার দেয়া আছে। খিল থাকা সত্ত্বেও বারান্দায় বসে অনেকখানি আকাশ দেখা যায়। যে আকাশে অনববত বিদ্যুৎ চমকচ্ছে। মিসির আলি বললেন, কী বলবে তুমি, বলো।

নীলু বলল, আপনি একবার ক্লাসে ESP-র ওপর বলেছিলেন। আপনার মনে আছে ?

আছে।

আমার এবং আমার কয়েকজন বন্ধুর ESP আছে কিনা তা পরীক্ষা করলেন। মনে আছে।

হ্যাঁ, মনে আছে। ‘জেনার কার্ড’ দিয়ে পরীক্ষা।

সেই পরীক্ষায় আমরা কেউ পাস করতে পারি নি। তার মানে, আমাদের কারোই এক্সট্রা সেনসরি পারসেপশান ক্ষমতা নেই।

হুঁ, তা ঠিক। যাদের লজিক খুব তীক্ষ্ণ, তাদের এটা থাকে না। নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীদের, যাদের লজিক খুব দুর্বল— তাদের থাকে।

স্যার, আমি জানি না আমি এখন একটি নিম্নশ্রেণীর প্রাণী কিনা, কিন্তু আমার ESP ক্ষমতা অনেক বেশি। ঠিক এই মুহূর্তে আপনি কী ভাবছেন, আমি বলে দিতে পারি।

নীলু বলতে বলতে হেসে ফেলল। এবং হাসি ঢাকাব জন্যে অন্যদিকে মুখ ফেরাল। মিসির আলি খুব লজ্জায় পড়ে গেলেন। কারণ, তিনি একটি আর্পাঙ্কর ভাবনা ভাবছিলেন। তিনি ভাবছিলেন— নীলুব সঙ্গে বিকশা কবে যাচ্ছেন। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে দু’জনেই ভিজে জবজবে। হুড তোলা এবং পর্দা ফেলা। বিকশাওয়ালা বাতাস কাটিয়ে বহু কষ্টে এগুচ্ছে। তিনি নীলুর হাত ধরে আছেন।

স্যার।

বলো।

শুধু শুধু আপনি এত লজ্জা পাচ্ছেন কেন ? আমরা সবাই তো এরকম কত অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তা করি, এবং এটাই তো স্বাভাবিক।

হু, তা ঠিক। আমার সঙ্গে কী বলতে চাচ্ছিলে বলো। আমি বেশিক্ষণ থাকব না। ঝড় আসবে।

বলতে না বলতেই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। বাতাস বইতে শুরু করল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়ে চারদিক অন্ধকারে ডুবে গেল। নীলু মৃদু স্বরে বলল, রানু আপাকে তো আপনি ভালো মতো চিনতেন, তাই না স্যার ?

হ্যাঁ।

রানু আপাব সঙ্গে আমার কাঁ কী মিল আছে ?

কোনো মিল নেই। প্রতিটি মানুষই আলাদা। একজন মানুষের সঙ্গে অন্য একজন মানুষের মিল থাকে সামান্যই।

কিন্তু রানু আপনার অসম্ভব ESP ক্ষমতা ছিল। ছিল না ?

তা ছিল।

আমারও আছে। আছে না?

হ্যাঁ, আছে।

রানু আপা কি আপনাকে কখনো বলেছিল, তার ভেতরে একজন দেবী বাস করেন?

বলেছিল।

আপনি বিশ্বাস করেন নি?

না, করি নি। এইসব ছেলেমানুষী জিনিস বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে।

স্যাব, রানু আপা যা বলত, এখন আমি যদি তা-ই বলি— আপনি বিশ্বাস করবেন না?

না।

পৃথিবীতে অনেক রহস্যময় ব্যাপার আছে স্যার।

এক সময় ঝড়-বৃষ্টিকেও রহস্যময় মনে করা হতো, এখন করা হয় না। মানুষের জ্ঞান, মানুষের বুদ্ধি রহস্যময়তাকে সরিয়ে দিচ্ছে। এই পৃথিবীতে যত অলৌকিক ব্যাপার আছে, তার প্রতিটির পেছনে আছে একটি লৌকিক ব্যাখ্যা।

মিসির আলি সিগারেট ধরালেন এবং বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলতে লাগলেন— দেখ নীলু, তুমি বলছ তোমার ভেতর একজন দেবী আছেন। সেই দেবী যদি এই মুহূর্তে তোমার ভেতর থেকে বের হয়ে আসেন এবং আমাকে বলেন, এই যে মিসির আলি সাহেব। তাহলেও আমি ব্যাপারটা বিশ্বাস করব না। আমি খুঁজব একটা লৌকিক ব্যাখ্যা।

কী হবে সেই ব্যাখ্যা?

আমি যা দেখব, মনোবিজ্ঞানীর ভাষায় তার নাম হেলুসিনেশন। কিছু কিছু ড্রাগস আছে, যা খেলে হেলুসিনেশন হয়। যেমন এলএসডি। ইংল্যান্ডে আমি এক ছাত্রকে দেখেছিলাম— সে এলএসডি খেত যিশু খ্রিষ্টকে দেখাব জন্যে। এলএসডি খেলেই সে যিশু খ্রিষ্টকে দেখতে পেত। তুমি বুঝতেই পারছ, সে যা দেখত, তা হেলুসিনেশন।

নীলু দীর্ঘ সময় চুপ করে বসে রইল। বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। এক-একটা বাতাসের ঝাপটা এসে গা ভিজিয়ে দিচ্ছে, তবু দু'জনের কেউ নড়ল না। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। শুধু মিসির আলির সিগারেটের আলো ওঠানাম করছে।

নীলু ক্ষীণ স্বরে বলল, স্যার।

বলো।

আমি একটি খারাপ লোকের হাতে পড়েছিলাম স্যার। একটা ভয়ঙ্কর খাবাপ লোক আমাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নির্জন একটা ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। সে একটা ক্ষুব্ধ নিয়ে এসেছিল আমাকে মারতে। তখন সেই দেবী আমাকে রক্ষা করেন। সমস্ত ব্যাপারটা আমার দেখা। দেবীকেও আমি দেখেছি। একটি অপূর্ব নারীমূর্তি।

তুমি বলতে চাও, তারপর থেকে সেই দেবী তোমার সঙ্গে আছে?

হ্যাঁ।

তুমি যা দেখেছ, তার যে একটা লৌকিক ব্যাখ্যা হতে পারে— তা কি তুমি ভেবেছ ?
সবকিছুর ব্যাখ্যা নেই স্যাব ।

চেষ্টা করে দেখি, এর একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায় কিনা ।

ঠিক আছে, চেষ্টা করুন ।

রানু মেয়েটির সঙ্গে তোমার খুব ভাব ছিল । তার কাছ থেকেই দেবীর ব্যাপারটি তুমি শুনেছ । একটা নতুন ধরনের কথা । রোমান্টিক ফ্লোর আর দেবীর ব্যাপারটায়, কাজেই জিনিসটা তোমার মনে গেঁথে রইল । তুমি নিজে যখন বিপদে পড়লে, ঐ জিনিসটাই উঠে এলো তোমার মনের ভেতর থেকে । একটা হেলুসিনেশন হলো । তীব্র মানসিক চাপ এবং তীব্র হতাশা থেকে এই হেলুসিনেশনের জন্ম । মনোবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে stress induced hallucination.

ঐ খারাপ লোকটি মারা গেল কীভাবে ?

তার মৃত্যু হয়েছে স্বাভাবিক কারণে । পা পিছলে উল্টে পড়ে মাথায় আঘাত পেয়েছে বা এই জাতীয় কিছু । এখানে দেবীর কোনো ভূমিকা নেই । লোকটিব সুরতহাল রিপোর্ট থেকেই তার মৃত্যুর কারণ বের হয়ে আসা উচিত । কী ছিল পোস্টমর্টেম রিপোর্টে ?

মিসিব আলি প্রশ্নের জবাবের জন্যে অপেক্ষা করলেন । কোনো জবাব পাওয়া গেল না । নীলু মনে হচ্ছে গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে । অন্ধকারে পরিষ্কার কিছু দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু কেন জানি তাঁর মনে হলো, মেয়েটি কাঁদছে । কাঁদবে কেন সে ? কাঁদার মতো কোনো কথা কি তিনি বলেছেন ?

নীলু ।

জি ।

আমি এখন উঠি ? আমার যাওয়ার দবকার । এ বৃষ্টি কমবে না । যত বাত হবে, তত বাড়বে । তুমি কি আমাকে আরো কিছু বলবে ?

নীলু জবাব দিল না । মিসিব আলি উঠে দাঁড়ালেন ।

তোমার বাবাকে খবর দাও, বিদেয় নিয়ে যাই ।

নীলু কঠিন কণ্ঠে বলল, আপনি যাচ্ছেন কোথায় ?

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, বাসায় যাচ্ছি, আর কোথায় যাব ?

না আপনার বাসায় যাওয়া হবে না । আজ রাতে আপনি এখানে থাকবেন ।

কী বলছ তুমি !

আপনার জন্যে ঘর স্বেচ্ছা করে বেখেছি । সঙ্গে অ্যাটাচড বাথরুম আছে । আপনার কোনো অসুবিধা হবে না ।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না । এখানে কেন থাকব ?

এখানে থাকবেন, কারণ আজ রাতে লোহার রড নিয়ে একটি ছেলে আপনাকে মারতে যাবে । আমি আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করছি না বা বানিয়েও কিছু বলছি না । আমি অনেক কিছুই বুঝতে পারি । ঐ ছেলেটির নাম যদি আপনি জানতে চান, তাও বলতে পারি । কি, জানতে চান ?

মিসির আলি ক্ষীণ স্বরে বললেন, ওর কী নাম ?

ওর নাম ফিরোজ। স্যার, আপনি কি আমি যা বলছি, তা বিশ্বাস করছেন ?

বুঝতে পারছি না। আমি একটি দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেছি।

দ্বিধার মধ্যে পড়েন বা না পড়েন— আমি এখান থেকে আপনাকে যেতে দেব না, কিছুতেই না।

মিসির আলি লক্ষ করলেন, মেয়েটি কঠিন স্বরে কথা বলছে। তার কথা বলার ধরন থেকেই বলে দেয়া যায়, এই মেয়ে তাকে যেতে দেবে না।

নীলু, আমার বাসায় কাজের মেয়েটি আছে একা।

না, ‘ইমা’ আপনার ঘরে নেই। আপনার ফিরতে দেরি দেখে সে বাড়িওয়ালার ঘরে ঘুরতে গেছে।

তুমি ওর কী নাম বললে ?

যা নাম, তা-ই বললাম— ইমা।

ইমা ?

হ্যাঁ, ইমা।

ওব বাবার নাম বলতে পারলে ?

ইমা নাম থেকেই আপনি ওব বাবাকে বের করতে পারবেন।

বলতে বলতে নীলু হেসে উঠল। হাসিতে একটি খাতব ঝংকার। অন্য এক ধরনের কাঠিন্য। যেন এ নীলু নয়, অন্য একটি মেয়ে। অচেনা একজন মেয়ে।

স্যার আসুন, আপনাকে আপনার ঘর দেখিয়ে দিই। ড্রয়ারে মোমবাতি আছে, মোমবাতি জ্বালিয়ে বসে বসে বৃষ্টির শোভা দেখুন। আমি যাব শাল্লা করতে।

তোমাদের টেলিফোন আছে না ?

আছে। দিয়ে যাচ্ছি আপনার ঘরে। যত ইচ্ছা টেলিফোন করুন।

টেলিফোনে অনেক চেষ্টা করেও ফিরোজদের বাড়ির কাউকে ধরা গেল না। হয় টেলিফোন নষ্ট কিংবা রিং হচ্ছে, হেণ্ড পরছে না। আশ্চর্য ব্যাপার!

বাড়িওয়ালা করিম সাহেবকে টেলিফোন করলেন। করিম সাহেব জেগে ছিলেন এবং তিনি জানালেন হানিফা তাঁর বাসাতেই আছে ঘুমাচ্ছে।

মিসির আলি মোমবাতি জ্বালিয়ে গেস্টরুমে বসে বইলেন একা-একা। এখনো ইলেকট্রিসিটি আসে নি। বাজ পড়ে কোনো ট্রান্সফরমার পুড়ে-টুড়ে গেছে হয়তো। কেউ ঠিক করবার চেষ্টা করছে না। এ দেশে কেউ কোনো কিছু ঠিক করবার জন্যে ব্যস্ত নয়। শহর অন্ধকাবে ডুবে আছে তো কী হয়েছে ? থাকুক ডুবে। দুষ্ট লোকেবা অন্ধকারে বেরিয়ে আসবে ? আসুক বেরিয়ে। আমরা কেউ কারো জন্যে কোনো মমতা দেখাব না। মমতা এ যুগের জিনিস নয়।

কিন্তু সত্যি কি নয় ? মমতা কি কেউ কেউ দেখাচ্ছে না ? নীলু যে তাঁকে আটকে রাখল, তার পেছনে কি মমতা কাজ করছে না ?

সে কেন তাঁকে এই মমতাটা দেখাচ্ছে ? কেন, কেন ? তাঁর ভুরু কুঞ্চিত হলো।

কপালের শিরা দপদপ করতে লাগল। জ্বর আসছে নাকি ?

তিনি আবার সিগারেট ধরালেন। প্যাকেট শূন্য হয়ে আসছে। রাত কাটবে কী করে ? এ বাড়িতে এখনো কোনো কাজের লোক তাঁর চোখে পড়ে নি, যাকে সিগারেট আনার জন্যে অনুরোধ করা যায়।

স্যার, আপনার চা।

নীলু এসে দাঁড়িয়েছে। মোমবাতির আলোয় কী সুন্দর লাগছে তাকে! মিসির আলি বিব্রত স্বরে বললেন, চা তো চাই নি।

রান্না হতে দেরি হবে। চা খেয়ে খিদেটা চেপে বাখার ব্যবস্থা করুন।

তিনি চায়ের পেয়ালা হাতে নিলেন। এবং নিজের অজান্তেই বলে ফেললেন, তুমি আমার নিরাপত্তার জন্যে হঠাৎ এত ব্যস্ত হলে কেন ?

নীলু মৃদু হেসে বলল, এই প্রশ্নের জবাব এখন দেব না। একদিন নিজেই বুঝতে পারবেন। চায়ে চিনি হয়েছে কিনা তাড়াতাড়ি দেখুন। আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। হয়েছে।

নীলু নিঃশব্দে চলে গেল। মিসির আলির হঠাৎ মনে হলো, তিনি চাঁপা ফুলের গন্ধ পাচ্ছেন। হালকা সুবাস, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তা গাঢ় হলো। তিনি ঘরের ভেতর ফিসফিস কথা শুনলেন। কে কথা বলছে ? দমকা বাতাসে মোমবাতি নিভে গেল। এবং তিনি স্পষ্ট শুনলেন, মল পরে হেঁটে যাওয়ার মতো কে যেন তার পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। 'কে কে' বলে টেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও তিনি থেমে গেলেন। এ সব মনেব ভুল। এ জগতে কোনো রহস্য নেই। আশেপাশে নিশ্চয়ই কোনো চাঁপা ফুলের গাছ আছে। গন্ধ আসছে সেখান থেকেই।

কিন্তু তবু তাঁর মনে হচ্ছে, দরজার ওপাশে পর্দার আড়ালে কেউ-একজন দাঁড়িয়ে আছে, এবং তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। কে সে ? অন। ভুবনের কেউ ? নাকি অবচেতন মনে তাব জন্ম ? পৃথিবীর সমস্ত অশরীরীর জন্মই কি অবচেতন মনে নয় ? অবচেতন মন জিনিসটির অবস্থান কোথায় ? মস্তিষ্কের নিউরোনে ? নিউরোনের বৈদ্যুতিক আবেশই কি আমাদের নানান রকম মায়া দেখাচ্ছে ?

তিনি ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। পর্দাটি খুব নড়ছে। যেন কেউ পর্দা নাড়িয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করছে।

তিনি দেয়াশলাই জ্বাললেন। আলো আসুক। আলোর স্পর্শে সব মায়া কেটে যাক। তিনি যেন নিজেকে সাহস দেবার জন্যেই বললেন, এ পৃথিবীতে রহস্যের কোনো স্থান নেই।

১৩

সন্ধ্যাবেলা ওসমান সাহেব নিজে গিয়ে পরীক্ষা করলেন, গেট বন্ধ করা হয়েছে কিনা। তালা টেনে টেনে দেখলেন। দারোয়ানকে বললেন, ভোর হবার আগে গেট খুলবে না। কেউ ঢুকতে চাইলে বলবে, বাড়িতে কেউ নেই।

জি আচ্ছা।

রাতটা মোটামুটি সজাগ কাটাবে। কোনো শব্দটুকু হলে বের হয়ে দেখবে কী ব্যাপার।

জি আচ্ছা।

ওসমান সাহেব চিন্তিত মুখে ঘরে ঢুকলেন। ফরিদার সঙ্গে তাঁর দেখা হলো, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোনো কথা হলো না। দু'জন এমন ভাব করছেন, যেন কেউ কাউকে চেনেন না। অনিদ্রাজনিত কারণে ফরিদার চোখ লাল। তিনি বসে আছেন মূর্তির মতো। ওসমান সাহেব তাঁর সামনের চেয়ারটাতে দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে থেকে মৃদু স্বরে বললেন, ফিরোজ কেমন আছে?

ফরিদা জবাব দিলেন না।

ওসমান সাহেব বিরক্ত স্বরে বললেন, আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছি। কানে যায় নি?

ফরিদা কোনো সাড়াশব্দ করলেন না। ঠাণ্ডা চোখে তাকালেন। ওসমান সাহেব চাপা স্বরে বললেন, কথার জবাব দাও। ফিরোজ কেমন আছে?

ভালো।

ভালো মানেটা কী? গুছিয়ে বলো।

গুছিয়ে বলতে পাবব না। তুমি দেখে আস। আর শোন, আমার সঙ্গে এরকম ভঙ্গিতে কথা বলবে না।

ফরিদা উঠে গেলেন। রওনা হলেন ফিবোজের ঘরের দিকে। ক্রুদ্ধ আওয়াজ আসছে সে ঘর থেকে। চাপা আওয়াজ। কোনো মানুষের কণ্ঠ থেকে এ ধরনের আওয়াজ হওয়া সম্ভব নয়। যে এমন আওয়াজ করছে, সে মানুষ হতে পারে না। ফরিদার গা কাঁপতে লাগল। কী হচ্ছে এসব? তিনি কি এগিয়ে যাবেন, না ফিরে আসবেন? এগিয়ে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা করছে না, কিন্তু তিনি গেলেন।

কাছাকাছি যাওয়ামাত্র ক্রুদ্ধ গর্জন থেমে গেল। তিনি দেখলেন, ফিরোজ বেশ ভালোমানুষের মতো চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছে। হাতে একটি বই। সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক ভাবভঙ্গি। ফরিদা বললেন, কেমন আছিস তুই?

ভালো। তুমি কেমন আছ মা?

ফরিদার চোখে পানি এসে গেল। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে এই প্রথম ফিরোজ এমন স্বরে কথা বলল।

ফিবোজ, তুই আমাকে চিনতে পারছিস তো?

চিনতে পারব না কেন? কী বলছ তুমি!

গত দু'দিন তো চিনতে পারিস নি।

তোমরাও তো আমাকে চিনতে পার নি।

আমরা চিনতে পারব না কেন?

না চিনতে পার নি। চিনতে পারলে নিজের ছেলেকে তালাবদ্ধ করে রাখতে না। তোমরা বিশাল একটা তালা দিয়েছ। হা হা হা।

ফরিদা কথা ঘোরাবার জন্যে বললেন, কিছু খাবি ফিরোজ ?

হ্যাঁ, খাব। কিন্তু মা, টেবিলে খাবার দেবে। তালা খুলে ফেলবে। আমি খাবার ঘরে টেবিল-চেয়ারে বসে খাব।

ফরিদা কোনো উত্তর দিলেন না। শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। ফিরোজ যা বলছে তা সম্ভব নয়। তালা খুলে তাকে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

কি মা, কথা বলছ না যে ? তালা খুলবে না ?

ফরিদা জবাব দিলেন না।

কিন্তু মা তালাবন্ধ করে কাউকে আটকে রাখা ঠিক না। খুব অন্যায়। অন্যায় নয় ? হ্যাঁ, অন্যায়।

বেশ, তালা খোল।

ফিরোজ উঠে দাঁড়াল। তার কোলের উপর রাখা বইটি মেঝেতে পড়ে গেল, ফিরোজ সেদিকে ফিরেও তাকাল না। সে এগিয়ে এসে জানালার শিক ধরে দাঁড়াল। ফরিদা জানালার পাশ থেকে একটু দূরে সরে গেলেন।

দূরে চলে গেলে যে মা ? ভয় লাগছে ? হা হা হা। খুব ভয় লাগছে, না ?

ফিরোজ জানালার শিক ধরে ঝাঁকাতে লাগল।

তিনি ভয় পাওয়া গলায় বললেন, এরকম করছিস কেন ?

লোহার শিকগুলো কেমন শক্ত, তাই দেখছি।

এরকম করিস না বাবা।

তালা খুলে দাও, এরকম করব না। আমি চিড়িয়াখানাব জন্তু নই মা, যে, আমাকে খাঁচার মধ্যে বন্দি করে রাখবে। যাও, বাবাব কাছে যাও। চাবি নিয়ে আস। বন্ধ ঘরে আমার দম আটকে আসছে। আমি খোলা মাঠে খানিকক্ষণ হাঁটব। যাও, যা করতে বলছি কর।

ফরিদা বসার ঘরের দিকে এগোলেন। ফিরোজ জানালার শিক ধরে ঝাঁকাজে। তাব মুখ হাসি হাসি। যেন শিক ঝাঁকানো খুব-একটা মজার ব্যাপার। আনন্দের একটা খেলা। খুব ছোটবেলায় ফিরোজ এরকম করত। জানালায় উঠে শিক ধরে ঝাঁকাত।

ওসমান সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। কঠিন স্ববে বললেন, কী পাগলের মতো কথা বলছ! তালা খুলব মানে ? কী হয়েছে তুমি জানো না ?

ফরিদা চুপ করে রইলেন।

একটা ছেলে মারা গেছে। তাব পরেও তুমি বলছ তালা খুলব।

তালা দিয়েই-বা লাভ কী হচ্ছে ? ঐ রাতেও তো তালাবন্ধ ছিল। ছিল না ?

ওসমান সাহেব এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। হ্যাঁ, ঐ রাতে তালাবন্ধ ছিল। এবং ভোরবেলা ঘর তালাবন্ধই পাওয়া গেছে।

ফরিদা বললেন, ঐ ছেলের মৃত্যুর সঙ্গে ফিরোজের কোনো সম্পর্ক নেই। ফিবোজ ঘরেই ছিল।

ঘরে থাকলেই ভালো ।

ফরিদা স্বামীর পাশে বসলেন । তাঁর মুখ শান্ত । তাঁর চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ ।
ওসমান সাহেব বললেন, তুমি কিছু বলবে ?

হ্যাঁ ।

বলে ফেল । এভাবে তাকিয়ে থেক না ।

ফিরোজ প্রসঙ্গে তুমি যে ডিসিশন নিয়েছ, আমার মনে হয় তা ঠিক নয় । তুমি
কতদিন তাকে তালাবন্ধ করে রাখবে ? ওর চিকিৎসা করাও । মিসির আলিকেই-বা
আসতে দিচ্ছ না কেন ?

ঐ ছেলেটির মৃত্যুর প্রসঙ্গ চাপা না পড়ার আগে আমি কাউকে এ বাড়িতে আসতে
দেব না । উনি টেলিফোন করলে বলবে— ফিরোজ আমার বাড়ি গেছে ।

এতে ফিরোজের অসুখ বাড়তেই থাকবে ।

বাড়ুক । তুমি নিশ্চয়ই চাও না, তোমার ছেলেকে ওরা ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিক ।
চাও ?

না, চাই না ।

তাহলে চুপ করে থাক । একটা তালা আছে, আরেকটা তালা লাগাও ।

ফিরোজকে শুধু শুধু সন্দেহ করছ । তালাবন্ধ ঘব থেকে সে কীভাবে বের হবে ?

তা জানি না । কিন্তু সে বেব হয়েছে— এটা আমি যেমন জানি, তুমিও তেমন
জানো । এই নিয়ে আমি কোনো কথা বলতে চাই না । তুমি অন্য ঘরে যাও । আমাকে
একা থাকতে দাও ।

ঝনঝন শব্দ হচ্ছে ফিরোজের ঘরে । সে প্রচণ্ড শব্দে জানালা ঝাঁকচ্ছে ।

ফরিদা নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করলেন । ওসমান সাহেব বেঁচ হয়ে এসে কঠিন স্বরে
ফিরোজকে বললেন, এরকম করছিস কেন ? স্টপ ইট ।

ফিরোজ হাসি মুখে বলল, রাগ করছ কেন বাবা ?

ওসমান সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ।

দরজা খুলে দাও বাবা । আমি খাবার ঘরে এসে ভাত খাব । খিদে লেগেছে । কি,
খুলবে না ?

লোহার রডটা আমার কাছে দে, আমি ত না খুলে দিচ্ছি ।

না বাবা, ওটা সম্ভব নয় । লোহার রডটা দেয়া যাবে না ।

কেন দেয়া যাবে না ?

ও রাগ করবে ।

কে রাগ করবে ?

নাম বললে চিনবে ? শুধু শুধু জিজ্ঞেস করছ কেন ? তালা খুলবে কি খুলবে না ?

ওসমান সাহেব জবাব না দিয়ে চলে এলেন । ফিরোজ জানালা ঝাঁকতে ঝাঁকতে
খুব হাসতে লাগল ।

থার্ড ইয়ার ফাইনালের ডেট দিয়ে দিয়েছে।

মেডিকেলের ছাত্রদের কারো দম ফেলার সময় নেই। ক্লাস এখন সাসপেন্ডেড। আজমল ঠিক করে রেখেছে, সে এখন থেকে নাশতা খেয়ে পড়তে বসবে এবং একটানা পড়বে লাঞ্চ টাইম পর্যন্ত। এক ঘণ্টার ব্রেক নেবে লাঞ্চে, তারপর আবার পড়া। তাছাড়া পাস করার উপায় নেই। নানান দিক দিয়ে খুব ক্ষতি হয়েছে এ বছর। প্রতিদিনই কোনো-না-কোনো ঝামেলায় পড়া হচ্ছে না। এরকম চললে পরীক্ষা দেয়া হবে না। এবার পরীক্ষায় না বসলে ডাক্তারি পড়া বন্ধ করে দিতে হবে। খরচ চালিয়ে যাবার ক্ষমতা নেই। গ্রামের বাড়ি বিক্রি করে দিলে হতো, কিন্তু মা বেঁচে থাকতে তা সম্ভব নয়। তাছাড়া বিক্রি করেও লাভ হবে না কিছু। ভাঙা রাজপ্রাসাদ কে কিনবে? কার এত গরজ?

আজমল বই নিয়ে বসেই উঠে পড়ল— জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে মিসির আলি ঢুকছেন। তার খুব ইচ্ছা হতে লাগল, বইপত্র নিয়ে অন্য কোনো ঘরে চলে যায়। কিছুক্ষণ খুঁজে-টুঞ্জে তিনি চলে যাবেন। কিন্তু ভদ্রলোকের যা স্বভাব-চরিত্র, তিনি আবার আসবেন। আবার আসবেন! অসহ্য! কেন জানি আজমল তাঁকে সহ্য করতে পারে না। কেন সহ্য করতে পারে না— এ নিয়েও সে ভেবেছে, কিছু বের করতে পারে নি। লোকটি ভালোমানুষ ধরনের, তবে অসম্ভব বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান কেউ ভালোমানুষ হতে পারে না। ভালোমানুষেরা বোকাসোকা ধরনের হয়।

হেতরে আসব?

আজমল বিরক্তি গোপন কবে বলল, আসুন।

তামি পরশুও একবার এসেছিলাম। তোমার রুমমেটকে বলে গিয়েছিলাম, আজ সকালে আসব। সে তোমাকে কিছু বলে নি?

হাঁ না, বলে নি। ভুলে গেছে বোধহয়। বসুন।

মিসির আলি বসতে বসতে বললেন, অনেকদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা। এর মধ্যে তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। জানো বোধহয়।

জি জানি। নাজ চিঠি লিখেছিল।

খুব যত্নপায় ফেলোছিলাম ওদের। অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম।

আজমল কিছু বলল না।

মিসির আলি বললেন, বেশিক্ষণ তোমাকে বিরক্ত করব না। একটা কথা শুধু জিজ্ঞেস করতে এসেছি।

জিজ্ঞেস করুন।

তোমাদের বাড়িতে একটা ঘর আছে, যেখানে তোমাদের পূর্বপুরুষদের কিছু ছবিটাই আছে। তুমি কি সেই ঘরে ফিরোজকে নিয়ে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ, নিয়ে গিয়েছিলাম।

কিন্তু ঐ ঘর তো তালাবন্ধ। ওর চাবি থাকে নাজনীনের কাছে। সে তো বলল, ও ঘর খোলা হয় নি।

তোমার কাছে একটা চাবি আছে, ও জানে না।

খালি গায়ে একজনের ছবি আছে। ঐ ছবিটা কি ফিরোজকে দেখিয়েছ ?

সব ছবিই দেখিয়েছি।

আমি এই বিশেষ ছবিটি প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করছি। শুনেছি ঐকে ক্ষিপ্ত প্রজারা লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলে। এটা কি সত্যি ?

জি সত্যি। শাবল দিয়ে পিটিয়ে মারে।

এই গল্পটি কি তুমি ফিরোজের সঙ্গে করেছ ?

জি না, করি নি।

অন্য কেউ কি করেছে বলে তোমার ধারণা ?

মনে হয় না। গল্প করে বেড়াবাব মতো কোনো ঘটনা এটা না।

মিসির আলি উঠে পড়লেন। আজমল বলল, আব কিছু জিজ্ঞেস করবেন না ?

না। উঠি এখন। তুমি পড়াশোনা করছিলে, কর। আর ডিসটার্ব করব না।

আজমল তাঁকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলো। মিসির আলি বললেন, নাজনীন মেয়েটি বড় ভালো। ওকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। চমৎকার মেয়ে।

আজমল কিছু বলল না।

মিসির আলি বললেন, নাজনীন আমাকে বলেছে শীতের সময় একবার যেতে। আমি কথা দিয়েছি, যাব। এই শীতেই যাব। যাই আজমল, আর আসতে হবে না।

তিনি মাথা নিচু করে হাঁটতে লাগলেন। ফিবোজ ছবিটা দেখেছে। জট খুলতে শুরু করেছে। এই ছবির ছাপ পড়েছে ফিরোজের চেতনায়। এবং মিসির আলির ধারণা, লোকটির মৃত্যুসংক্রান্ত গল্পটিও সে শুনেছে। লোহার বড নিয়ে তার খালি গায়ে বের হবার রহস্যটি হচ্ছে ছবিতে এবং গল্পটিতে।

বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। মিসির আলি গ্রাহ্য করলেন না। বরং বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এগিয়ে যেতে তাঁর ভালোই লাগছে। ফিরোজের অসুখের পেছনের কারণগুলো দাঁড় করাতে চেষ্টা করতে লাগলেন। অনেকগুলো ঘটনাকে এক সঙ্গে মেলাতে হবে। ঘটনাগুলো এরকম—

১. অসম্ভব ক্রবতী একটি মেয়েব সঙ্গে দেখা হলো। মেয়েটির পোলিও। এই ঘটনাটি তাকে অভিভূত কবল।
২. মেয়েটি তাকে আহত করল, সে কড়া গলায় বলল— আমার হাত ছাড়ুন।
৩. ফিবোজ খালি গায়েব লোকটিব চবি দেখল, এবং খুব সম্ভব তাব মৃত্যুবিসয়ক গল্পটিও শুনল।
৪. রাতে তার প্রচণ্ড জ্বর হলো। জ্বরের ঘোবে ঐ লোকটির ছবি বারবার মনে হলো।
৫. সে নির্জন নদীর পাড় ধবে একা-একা হাঁটতে গেল, তখুনি একটি হেলুসিনেশন হলো।

মিসির আলি বৃষ্টিতে নেয়ে গেছেন। রাস্তার লোকজন অবাক হয়ে তাঁকে দেখছে। ঢালাও বর্ষণ উপেক্ষা করে কেউ এমন নির্বিকার ভঙ্গিতে হাঁটে না।

সাইদুর রহমান সাহেব অবাক হয়ে বললেন, আপনার কী হয়েছে!

মিসির আলি বললেন, শরীরটা খারাপ স্যার।

শরীর তো আপনার সব সময়ই খারাপ। এর বাইরে কিছু হয়েছে কি না বলেন। আপনাকে হ্যাগার্ডের মতো দেখাচ্ছে!

গত পরশু রাতে কে যেন তালা ভেঙে আমার ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র ভেঙেচুরে তছনছ করেছে।

আপনি বাসায় ছিলেন না?

আমি তো স্যার প্রথমেই আপনাকে বলেছি তালা ভেঙে ঢুকেছে। কাজেই আমার ঘরে থাকার প্রশ্ন ওঠে না।

সাইদুর রহমান সাহেব গম্ভীর হয়ে গেলেন।

মিসির আলি বললেন, আমি ছুটির অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছি। দিন দশেকের ছুটির আমার খুব দরকার।

সাইদুর রহমান সাহেব মুহূর্তের মধ্যে গম্ভীর হয়ে গেলেন। ঠাণ্ডা গলায় বললেন, ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস-ট্রাশ তো এমনিতেও হয় না। এর মধ্যে আপনারা ছুটি নিলে তো অচল অবস্থা। এর চেয়ে আসুন, সবাই মিলে ইউনিভার্সিটি তালাবন্ধ করে চলে যাই, কী বলেন?

মিসির আলি সহজ স্বরে বললেন, আপনি কি স্যার আমাব সঙ্গে রসিকতা কবতে চেষ্টা করছেন?

রসিকতা করব কেন?

গত দু'বছরে আমি কোনো ছুটি নিই নি। এখন নিতান্ত প্রয়োজনে চাচ্ছি। দিতে না চাইলে দেবেন না। আপনার নিজের কী অবস্থা? এ বছরে আপনি কি কোনো ছুটি নেন নি?

অন্যের সঙ্গে সব সময় একটা কমপেয়ার করার প্রবণতা আপনার মধ্যে খুব বেশি। এটা ঠিক না মিসির আলি সাহেব। আপনি সি.এল.-এর ফরমটা রেখে যান, আমি রিকমেন্ড করে দেব।

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। সাইদুর রহমান বললেন, উঠবেন না, আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে। বসুন।

তিনি বসলেন। জরুরি কথাটা কী আঁচ করতে চেষ্টা করলেন। সাইদুর রহমান সাহেবের মুখ হাসি হাসি। কাজেই কথাটা মিসির আলির জন্যে নিশ্চয়ই সুখকর হবে না।

আপনার পার্ট টাইম অ্যাপয়েন্টমেন্টের মেয়াদ তো শেষ হতে চলল। এক্সটেনশনের জন্যে কী করছেন?

মিসির আলি বিস্মিত হয়ে বললেন, আমাকে কিছু করতে হবে নাকি। আমার তো ধারণা ছিল, আমার কিছু করার নেই। ইউনিভার্সিটি যা করার করবে।

সাইদুর রহমান সাহেব কিছু বললেন না। তাঁর চোখ-মুখ উজ্জ্বল। এর মানে কী?

তাকে কি এক্সটেনশন দেয়া হবে না ? সেটা তো সম্ভব নয় । যেখানে ফুল টাইম টিচার
অ্যাপয়েন্টমেন্ট হবার কথা, সেখানে পার্ট টাইম চাকরির এক্সটেনশন হবে না ? এটা
কেমন কথা!

স্যার, আপনি ঠিক করে বলেন তো ব্যাপারটা কী । আমার মেয়াদ শেষ ?

এখনো কিছু বলা যাচ্ছে না । তবে একজনের এডহক অ্যাপয়েন্টমেন্ট তো হয়েছে ।
এখন আর আমাদের টিচারের শর্টেজ নেই ।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ তাই । খাজনার থেকে বাজনা বেশি । ছাত্রের চেয়ে টিচারের সংখ্যা বেশি ।

মিসির আলি ঠাণ্ডা গলায় বললেন, আমি তো আপনার কোনো ক্ষতি করি নি ।
আপনি কেন আমার পেছনে লেগেছেন ?

আরে, এটা কী বলছেন! আমি আপনার পেছনে লাগব কেন ? কী ধরনের কথা
এসব ?

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন । আর এখানে বসে থাকার কোনো মানে হয় না ।

সাইদুর রহমান সাহেব বললেন, কি, চললেন ?

হ্যাঁ, চললাম ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কর্তাস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করলে কেমন হয় ? তাঁরা
কি কিছু করতে পাববেন ? পারবেন নিশ্চয়ই । কিন্তু এ জাতীয় কা'বা সঙ্গে তাঁর পরিচয়
নেই । বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব কম সংখ্যক অধ্যাপককেই তিনি চেনেন ।

স্যার, স্লামালিকুম ।

মিসির আলি তাকিয়ে দেখলেন, দু'টি ছাত্র দাঁড়িয়ে অ'ছে । তিনি বললেন, তোমরা
কিছু বলবে ?

জি না স্যার ।

আচ্ছা, ঠিক আছে ।

তিনি হাটছেন ক্লান্ত ভঙ্গিতে । চাকরি চলে গেলে তিনি অথই পানিতে পড়বেন ।
সময় ভালো না । দ্বিতীয় কোনো চাকরি চট কবে জোগাড় করা মুশকিল । সঞ্চয় তেমন
কিছু নেই । ইচ্ছা কবলে সঞ্চয় করা যেত । ইচ্ছা করে নি । এ পৃথিবীতে কিছুই জমা কবে
রাখা যায় না । সব খরচ হয়ে যায় ।

মিসির আলি হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে বললেন, I cannot and will not believe
that man can be evil

তাঁর প্রিয় একটি লাইন । প্রায়ই নিজের মনে বলেন । কেন বলেন ? এই কথাটি কি
তিনি বিশ্বাস করেন না ? যা আমরা বিশ্বাস করি না অথচ বিশ্বাস করতে চাই, তাই আমরা
বারবার বলি ।

তিনি ঘড়ি দেখলেন । তিনটা বাজে । শরীফ খারাপ লাগছে । বাসায় ফিরে যেতে ইচ্ছা
করছে । কিন্তু অনেক কাজ পড়ে আছে । আজমলের সঙ্গে দেখা করা এখনো হয়ে ওঠে
নি । ফিরোজের সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি । তার সঙ্গে দেখা করার সবক'টি প্রচেষ্টা
বিফল হয়েছে । অথচ খুব তাড়াতাড়ি দেখা করা দরকার । সাজ্জাদ হোসেনেরই-বা খবর

কী ? সে কি হানিফা সম্পর্কে কোনো তথ্য পেয়েছে ? না কোনো চেষ্টাই করে নি ?

নীলুর সঙ্গেও আর দেখা হয় নি। এর মধ্যে দু'বার গিয়েছেন ঝিকাতলায়। দু'বারই বাসার সামনে থেকে চলে এসেছেন। কেন যে তাঁর লজ্জা লাগছিল। লজ্জার কী আছে ? কিছুই নেই। তিনি যাচ্ছেন তাঁর ছাত্রীর বাসায়। এর মধ্যে লজ্জার কী ?

লাইব্রেরি থেকে একটা বই ইস্যু করার কথা— 'ইল্যুশন অ্যান্ড হেলুসিনেশন', ড. জিম ম্যাকার্থির বই। প্রচুর কেইস হিন্দি আছে সেখানে। কেইস হিন্দিগুলো দেখা দরকার। কোনোটার সঙ্গে কি ফিরোজের বা নীলুব ব্যাপারগুলো মেলে ? পুরোপুরি না মিললেও অনেক উদাহরণ থাকবে খুব কাছাকাছি। সেগুলো খুঁটিয়ে দেখা দরকার।

মিসির আলি লাইব্রেরিতে চলে গেলেন। সাধারণত যে বইটি খোঁজা হয়, সে বইটিই পাওয়া যায় না। ভাগ্যক্রমে এটি ছিল। চমৎকার বই। তিনশ'র মতো কেইস হিন্দি আছে। আজ রাতের মধ্যেই শেষ করে ফেলতে হবে। তিনি স্টিভিনসনের 'সমনোমবলিক প্যাটার্ন' বইটিও নিয়ে নিলেন। এটিও একটি চমৎকার বই। তাঁর নিজেরই ছিল। তাঁর কাজের ছেলোটি পুরনো বইয়ের দোকানে বিক্রি করে দিয়েছে। মহাবদমাশ ছিল। তাঁকে প্রায় ফতুর করে দিয়ে গেছে। তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। মানুষ কত বিচিত্র। এই ছেলোটিকে তিনি বিশেষ স্নেহ করতেন। স্নেহ অপাত্রে পড়েছিল। মানুষের বেশির ভাগ স্নেহ-মমতাই অপাত্রে পড়ে।

কেউ আমার খোঁজ করেছিল, হানিফা ?

জি না।

চা'বানিয়ে আন। দুধ-চিনি ছাড়া।

হানিফা চলে গেল। তার শরীর বোধহয় খানকটা সেবেছে। মুখের শুকনো ভাবটা কম। ঘরে ওজন নেবার কোনো যন্ত্র নেই। যন্ত্র থাকলে দেখা যেত, ওজন কিছু বেড়েছে কিনা।

মিসির আলি ইজি চেয়ারে শুয়ে জিম ম্যাকার্থির বইটির পাতা ওলটাতে লাগলেন। কত বিচিত্র কেইস হিন্দিই না ভদ্রলোক জোগাড় কবেছেন।

কেইস হিন্দি নাম্বার সিক্সটি থ্রী

মিস কিং সিলভারস্টোন

বয়স পঁচিশ।

কম্পুটার প্রোগ্রামার।

দি এনেক্স ডিজিটালস লিমিটেড

ডোভার। ক্যালিফোর্নিয়া।

মিস কিং সিলভারস্টোন থ্যাংকস গিভিংয়ের দু'দিন আগে দি এনেক্স ডিজিটালস লিমিটেডের তিনতলাব একটি ঘরে কাজ করছিলেন। সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। অফিসের একজন গার্ড ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। গার্ড একতলায় কফিরুমে। সে বলে গেছে মিস সিলভারস্টোন যেন কাজ শেষ করে যাবার সময় তাকে বলে যান।

কাজেই মিস সিলভারস্টোন রাত আটটার সময় কাজ শেষ

করে কফিরুমে গেলেন। অবাক কাণ্ড, কফিরুমে অন্ধকার। কেউ কেথাও নেই। তিনি ভয় পেয়ে ডাকলেন— ‘মুন্সার।’ কেউ সাড়া দিল না।

তিনি ভাবলেন মুন্সার হয়তো-বা সোফায় ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন— মুন্সার নেই, তবে সোফায় একজন অস্বাভাবিক লম্বা মানুষ বসে আছে। মানুষটি নগ্ন। তিনি চোঁচিয়ে ওঠার আগেই লোকটি বলল, ভয় পেও না। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

তুমি কে ?

আমি এই গ্রহের মানুষ নই। আমি এসেছি সিরাস নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে। আমি পৃথিবীর একটি রমণীর গর্ভে সন্তানের সৃষ্টি কবতে চাই।

মিস সিলভারস্টোন পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পাবলেন না। তাঁর পা যেন মেঝের সঙ্গে আটকে গেছে। তিনি চিৎকার কবতে চেষ্টা করলেন— গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হলো না। তিনি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, একে একে তাঁর গায়ের কাপড় আপনা-আপনি খুলে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে তিনি সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গেলেন। এই লোকটি তখন উঠে দাঁড়াল। তিনি লক্ষ্য করলেন লোকটির গায়ের চামড়া ঈষৎ সবুজ। এবং তাব গা থেকে চাপা এক ধবনের আলো বেরুচ্ছে।

লোকটি এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। আপনা আপনি বাতি নিভে গেল।

এই হচ্ছে মিস কিং সিলভারস্টোনের গল্প। তিনি পরবর্তী সময়ে গর্ভবতী হয়ে পড়েন এবং ডাক্তারের কাছে জানতে চান, তাঁর বাচ্চাটির গায়ের বঙ সবুজ হবার সম্ভাবনা কতটুকু।

ম্যাকার্থির একুশ পৃষ্ঠার বিশ্লেষণ আছে কেইস হিন্ট্রির সঙ্গে। তিনি অভ্রান্ত যুক্তিতে প্রমাণ করেছেন, এটি ইলিউশনের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। মিস সিলভারস্টোন সেখানে দেখেছেন মুন্সারকে। সিরাস নক্ষত্রপুঞ্জের কোনো আগন্তুককে নয়।

মিসির আলি একটির পর একটি কেইস হিন্ট্রি গভীর আগ্রহে পড়তে শুরু করলেন। তাঁর নিজেরও এরকম একটি বই লেখার ইচ্ছা হতে লাগল। সেখানে রানু, নীলু, ফিরোজের কেইস হিন্ট্রি এবং অ্যানালিসিস থাকবে। কিন্তু তা কবতে হলে এদের সমস্ত রহস্য ভেদ করতে হবে। তা কি সম্ভব হবে ? কেন হবে না ? অসম্ভব আবাব কী ? নোপোলিয়নের কী-একটি উক্তি আছে না এ প্রসঙ্গে— Impossible is the word...? উক্তিটি কিছুতেই মনে পড়ল না।

হানিফা চা বানিয়ে এনেছে। সুন্দর লাগছে তো মেয়েটিকে। মেয়েটির ব্যাপারে খোঁজ নিতে হবে। তিনি কি অলস হয়ে যাচ্ছেন ? বোধহয়। বয়স হচ্ছে। আগের

কর্মদক্ষতা এখন আর নেই। মিসির আলি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

আপনের চা।

হানিফা চায়ের কাপ সাবধানে নামিয়ে রাখল। তিনি লক্ষ করলেন, মেয়েটি নখে নেলপালিশ লাগিয়েছে। নেলপালিশ তিনি তাকে কিনে দেন নি। সে নিজেই তার জমানো টাকা থেকে কিনেছে। তাঁর নিজেরই কিনে দেয়া উচিত ছিল।

হানিফা বস। তোর সঙ্গে গল্পগুজব করি কিছুক্ষণ।

হানিফা বসল। মিসির আলি বললেন, আমি তোর বাবা-মাকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছি বুঝলি?

হানিফা কিছু বলল না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। তিনি কি পারবেন এর কোনো খোঁজ বের করতে? না পারার কী আছে? এটি এমন জটিল কাজ নিশ্চয়ই নয়। সাজ্জাদ হোসেন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁকে তিনি বলেছেন, মেয়েটির নাম ‘ইমা’ হবার সম্ভাবনা। এই নামের কোনো নিখোঁজ মেয়ের তথ্য আছে কিনা দেখতে। সে চোখ-মুখ কুঁচকে বলেছে, বুঝলি কী করে, ওর নাম ইমা? তিনি সে প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন নি। দিতে পারেন নি বলাটা ঠিক হলো না, বলা উচিত— দিতে পারতেন, কিন্তু দেন নি। সব প্রশ্নের উত্তর সবাইকে দেয়া যায় না। ‘ইমা’ নামটি কোথেকে পাওয়া, সেটা কাউকে না বলাই ভালো, বিশেষ করে পুলিশকে। পুলিশরা এ জাতীয় আদিভৌতিক ব্যাপার সাধারণত বিশ্বাস করে না।

পুলিশের উপর পুরোপুরি নির্ভরও তিনি করেন নি। তাঁর এক ছাত্রকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। তার কাজ হচ্ছে প্রতিদিন পাবলিক লাইব্রেরিতে গিয়ে পুরনো পত্রিকা ঘাঁটা। দেখবে, ‘ইমা’ নামের নিখোঁজ মেয়ের কোনো খবর ছাপা হয়েছে কিনা। এই কাজের জন্য সে ঘণ্টায় পঞ্চাশ টাকা করে পাবে। দশ ঘণ্টার জন্যে পাঁচ শ’ টাকা তিনি তাকে আগেই দিয়ে দিয়েছেন। কাজে যাতে উৎসাহ আসে, তার জন্যে একহাজার টাকার একটি পুরস্কারের কথাও বলেছেন। যদি সে ‘ইমা’ নামের কোনো নিখোঁজ বালিকার খবর বের করতে পারে, তাহলে এককালীন টাকাটা পাবে।

এই ব্যাপারে মিসির আলির মন খুঁতখুঁত করছে। ‘ইমা’ নামটির উপর এতটা গুরুত্ব দেয়া ঠিক হয় নি। যে-কোনো নিখোঁজ বালিকার সংবাদ সংগ্রহ করতে বলাটাই যুক্তিযুক্ত ছিল। একজনের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার উপর এতটা আস্থা রাখা ঠিক নয়। তিনি নিজে একজন যুক্তিবাদী মানুষ। তাঁর জন্যে এটা অবমাননাকর।

১৬

রাত আটটা।

সাজ্জাদ হোসেন অফিসের টেবিলেই মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে বিশ্রাম নেবার চেষ্টা করছেন। গত রাতে এক ফোঁটাও ঘুমোন নি। দিনের বেলায়ও ঘণ্টাখানেকের মতো শোবার সময় পাওয়া যায় নি। এবং খুব সম্ভব আজ রাতটাও তাঁর জেগেই কাটবে। লোহার রড হাতের সেই নগ্নগাত্র আগন্তুক তাঁর সর্বনাশ করে দিয়েছে। পুলিশ বাহিনীর নাকের ডগায় আরেকটি খুন হয়েছে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

একটি লোক রোজ রাতে লোহার রড হাতে একই জায়গায় ঘোরাঘুরি করবে, অথচ তাকে ধরা যাবে না— এটা কেমন কথা!

স্যার, আপনার সঙ্গে এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান।

সাজ্জাদ হোসেন টেবিল থেকে মাথা তুললেন। তাঁর আরদালি দাঁড়িয়ে আছে। এই লোকটির কি কোনো বুদ্ধিগুণ নেই? তাকে বলে দিয়ে এসেছেন যেন কিছুতেই আগামী দু'ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে ডাকা না হয়। অথচ দশ মিনিট পার না হতেই ব্যাটা ডাকতে এসেছে। তিনি বরফশীতল গলায় বললেন, বলো আমি নেই।

স্যার, আমি বলেছি যে আপনি আছেন।

তাতে অসুবিধা নেই। এখন গিয়ে বলো যে, আমার আগের কথাটা ঠিক না। উনি আসলে নেই, কোথায় গিয়েছেন কেউ জানে না।

স্যার, উনি একজন সাংবাদিক। পত্রিকা অফিস থেকে এসেছেন।

সাজ্জাদ হোসেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। সাংবাদিকদের বিরাগভাজন হবার মতো সাহস তাঁর নেই। পত্রিকায় দীর্ঘ আর্টিকেল বের হয়ে যাবে— ‘পুলিশ অফিসারের দুর্ব্যবহার।’

আসতে বলো, আর শোন— দু'কাপ চা দিতে বলো।

সাংবাদিক ভদ্রলোকের নাম মীরউদ্দীন। ভদ্রলোক শুধু যে পেশায় সাংবাদিক তাই নয়— চেহায়ায়, পোশাকে, এমনকি হাবে-ভাবেও সাংবাদিক। প্রশ্নের ধবন ডিটেকটিভের মতো। প্রতিটি বাক্যের শেষে একটি খোঁচা আছে, যা ঠিক সহ্য করা মুশকিল। সাংবাদিক, কাজেই সহ্য করতে হবে। এবং কিছুতেই চটানো যাবে না। মীরউদ্দিনের কাছ থেকে জানা গেল যে, একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘নগ্নগাত্র বিভীষিকা’ শিরোনামে একটি প্রচ্ছদ কাহিনী ছাপবে। কাজেই পুলিশের বক্তব্যটি শোনবার জন্যে তিনি দয়া করে এখানে তশরিফ রেখেছেন।

আমার প্রশ্নের জবাব দিতে আপনার কোনো আপত্তি নেই তো?

না, নেই। প্রশ্ন করুন।

নগ্নগাত্র ব্যক্তিটি প্রসঙ্গে আপনার কী ধারণা?

তেমন কোনো ধারণা নেই। পাগল-টাগল হবে আব কী।

তাকে পাগল বলার পেছনে আপনার যুক্তি কী?

একটাই যুক্তি— কোনো সুস্থ মাথার লোক একটা লোহার রড নিয়ে খুনখারাবি করে বেড়ায় না।

কেন, সুস্থ লোকও তো খুনখারাবি করে।

তা করে, কিন্তু তার পেছনে কোনো মোটিভ থাকে। এর কাণ্ডকাবখানার পেছনে কোনো মোটিভ নেই।

বুঝলেন কী করে, মোটিভ নেই? হয়তো, মোটিভ আছে, আপনারা ধরতে পারছেন না।

সাজ্জাদ হোসেনের বিরক্তির সীমা রইল না। এ তো মহা তাঁদড়ের পাল্লায় পড়া গেল! জ্বালিয়ে মারবে মনে হচ্ছে।

নগ্নগাত্রকে নিয়ে পুরানা পল্টন এলাকায় গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। সেটা কি আপনি জানেন ?

না, জানি না। কী গুজব ?

সেটা আপনি নিজেই কষ্ট করে জেনে নেবেন। কারণ পুলিশের উচিত শহরের চালু গুজবগুলোর প্রতি লক্ষ রাখা। কি, উচিত না ?

সাজ্জাদ হোসেন জবাব দিলেন না। এই লোকের সঙ্গে কথা যত কম বলা যায়, ততই ভালো।

এখন আপনি দয়া করে বলুন, লোকটিকে ধরবার ব্যাপারে পুলিশ বাহিনী কি চূড়ান্ত রকমের ব্যর্থতার পরিচয় দেয় নি ?

না। ধরবার চেষ্টা হচ্ছে, শিগগিরই ধরা পড়বে। হয়তো আজ রাতেই ধরা পড়বে।

আচ্ছা, বিদেশে অপরাধীকে ধরবার জন্যে ট্রেন্ড পুলিশ কুকুর আছে, এরা গন্ধ শুঁকে অপরাধীকে বের করে ফেলে। এখানে এমন কিছু নেই ?

না নেই। কারণ এটা বিদেশ নয়। বাংলাদেশ।

কিন্তু বাংলাদেশে তো পুলিশ বাহিনীর একটা মাউন্টেড রেজিমেন্ট আছে। যার প্রতিটি ঘোড়া লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে কেনা। অপ্রয়োজনীয় ঘোড়ার পেছনে এত টাকা খরচ না করে দু'-একটা শিক্ষিত কুকুর কি কেনা যায় না ?

আমকে এসব বলছেন কেন ভাই ? আমি সামান্য ব্যক্তি। এসব কর্তা ব্যক্তিদের বলেন।

আমি আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই। উচিত কি উচিত না ?

উচিত তো বটেই।

সাজ্জাদ হোসেন উঠে পড়লেন। শুকনো গলায় বললেন, আমার ডিউটি আছে। আব থাকতে পারছি না।

এই সাংবাদিকের সঙ্গে আরো কিছু সময় কাটালে প্যাচে পড়ে যেতে হবে। চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে। আজকের ইন্টারভ্যু দিয়েই তাঁর ভয় ভয় লাগছে। না জানি কী ছাপা হয়! তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। চাকরি বাঁচিয়ে চলা ক্রমেই মুশকিল হয়ে পড়ছে।

সাজ্জাদ হোসেন জিপ নিয়ে খানিকক্ষণ একা-একা পুরানা পল্টন এলাকায় ঘুরলেন। তাবপর খুঁজে বেব কবলেন মিসিব আলির বাড়ি।

এটা সেই বাড়ি, যা 'নগ্নগাত্র' এসে লগ্নভণ্ড কবে দিয়ে গেছে। তাঁর জানা ছিল না। মিসিব আলির সঙ্গে এব পরেও তাঁর দেখা হয়েছে, কিন্তু মিসির আলি এ প্রসঙ্গে কোনো কথা বলেন নি। যেন এটা বলার মতো কোনো ব্যাপার নয়। অথচ মিসির আলিকে দু'-তিনবার স্টেটমেন্ট দিতে হয়েছে। একজন ইনভেসটিগেটিং অফিসার এসে সব দেখে শুনে গিয়েছে। যথেষ্ট হৈচৈ করা হয়েছে এটা নিয়ে। অন্য যে-কেউ হলে প্রথম সুযোগেই ঘটনাটা বন্ধু-বান্ধবদের বলত। মিসির আলি বলেন নি। লোকটি কি ইচ্ছে করেই নিজেকে আলাদা প্রমাণ করবার জন্যে এরকম করে ?

সাজ্জাদ হোসেন কড়া নাড়লেন। মিসির আলি ঘরেই ছিলেন। তিনি দরজা খুললেন। সাজ্জাদ হোসেনকে দেখে বিন্দুমাত্র অবাক হলেন না। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো তিনি যেন বন্ধুর জন্যেই অপেক্ষা কবছিলেন।

সাজ্জাদ হোসেন বললেন, খবর কী তোর ?

ভালো।

খোঁজ নিতে এলাম টিকে আছি, না নগ্নগাত্র এসে তোকে পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে দিয়ে গেছে।

না, এখনো বানায় নি।

তোর 'ইমা'র পাত্তা এখনো লাগাতে পারি নি। পারলেই জানবি।

পারার সম্ভাবনা কী রকম ?

কম। খুবই কম। ঠাণ্ডা পানি খাওয়াতে পারবি ? খুব ঠাণ্ডা।

ঠাণ্ডা পানি হবে না। ঘরে ফ্রিজ নেই।

বাড়িওয়ালার ঘরে নিশ্চয়ই আছে। তোর ইমাকে পাঠিয়ে দে না, নিয়ে আসুক। ঠাণ্ডা পানি খেতে ইচ্ছা হচ্ছে।

মিসির আলি ইমাকে পাঠালেন না। নিজেই ঠাণ্ডা পানির বোতল নিয়ে এলেন। সাজ্জাদ হোসেন টেবিলে পা তুলে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসে আছেন। দেখলেই মায়া লাগে। লোকটির উপর দিয়ে ঝড় যাচ্ছে। মিসির আলি বললেন, চা খাবি ?

না। তোর সোফায় ঘণ্টাখানিক শুয়ে থাকব।

সোফায় কেন ? বিছানায় শুয়ে থাক।

সোফা হলেই চলবে। বিছানা লাগবে না। তুই কাঁটায় কাঁটায় একঘণ্টা পরে ডেকে তুলবি।

ঠিক আছে, তুলব।

সাজ্জাদ হোসেন সোফায় লম্বা হলেন এবং দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লেন। তবে তাঁকে ডেকে তুলতে হলো না। ঠিক এক ঘণ্টা পরে নিজে নিজেই জেগে উঠলেন। প্রাণী হিসেবে মানুষের তুলনা নেই। তার অবচেতন মন সর্বক্ষণ কাজ করে। যথাসময়ে তাকে সজাগ করে দেয়। বিপদের আভাস দিতে চেষ্টা করে। মুশকিল হচ্ছে তার কর্মপদ্ধতি আমাদের জানা নেই। সাজ্জাদ হোসেন বললেন, এক কাপ চা খাব। তারপর যাব। আজ সাব্বারাত ডিউটি। যেভাবেই হোক, আজ নগ্নগাত্রকে ধরবই।

মিসির আলি শান্ত স্বরে বললেন, ম্যানিয়াকদের ধবা খুব মুশকিল। এদের ইন্দ্রিয় খুব সজাগ থাকে।

সজাগ থাকুক আর যা-ই থাকুক, ব্যাটাকে আজ ধরবই।

'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড'-এর দেশ খোদ ইংল্যান্ডেও কিন্তু কিছু কিছু ম্যানিয়াকদেরকে ধরতে তিন-চার বছর সময় লেগেছে। একজনের নাম তুই নিশ্চয়ই জানিস— রোড সাইড স্ট্রাংগলার। বেছে বেছে ব্লড মেয়েদের খুন করত। সাড়ে ছ'বছর চেষ্টা করেও কিন্তু ওকে ধরা যায় নি।

আমি ধরব। আজ রাতেই ধরব।

মিসির আলি চুপ করে গেলেন। সাজ্জাদ হোসেন বললেন, উঠি ?

চা না খাবি বললি ?

মত বদলেছি, খাব না।

মিসির আলি বললেন, আমি কি তোর সঙ্গে যেতে পারি ?

আমার সঙ্গে যাবি ? কেন ?

আমি ধানমন্ডির একটা বাড়িতে ঢুকতে চাই। ওরা ঢুকতে দিচ্ছে না। গেট বন্ধ করে রাখছে এবং বলছে বাড়িতে কেউ নেই। কিন্তু আমি জানি বাড়িতে লোকজন আছে। পুলিশের গাড়িতে করে গেলে দারোয়ান ভয় পেয়ে গেট খুলবে।

আজ রাতেই যেতে হবে ?

হঁ।

তোকে ঢুকতে দিচ্ছে না কেন ?

আছে, অনেক ব্যাপার আছে, পরে বলব। আমাদের ও-বাড়িতে নামিয়ে দিতে তোর অসুবিধা আছে ? অসুবিধা থাকলে থাক।

না, অসুবিধা নেই।

বাত সাড়ে দশটার মতো বাজে।

দারোয়ান জেগেই ছিল। মিসির আলি যা ভেবেছিলেন, তা-ই হলো। পুলিশ এসেছে শুনে সে গেট খুলল। মিসির আলি ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

ওসমান সাহেব এবং তাঁর স্ত্রী দু'জনেই দোতলার বাবান্দা থেকে দেখলেন, মিসির আলি গেট দিয়ে ঢুকছেন এবং বেশ সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেঁটে আসছেন। ওসমান সাহেব নিচে নেমে এলেন। মিসির আলি বললেন, আপনি ভালো আছেন ?

ওসমান সাহেব সে-প্রশ্নের জবাব দিলেন না। মূর্তিব মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

মিসির আলি বললেন, অসময়ে এসেছি। উপায় ছিল না বলেই আসতে হয়েছে। আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই।

১৭

ওসমান সাহেবের বসার ঘর। রাত প্রায় এগারটা। একটি কম পাওয়ানের টেবিল ল্যাম্প ছাড়া ঘরে কোনো আলো নেই। আবছা অন্ধকার। এই আবছা অন্ধকার ঘরে তিনজন মানুষ মুখোমুখি বসেছিলেন। একজন উঠে চলে গেলেন। ফরিদা। তিনি নিঃশব্দে কাঁদছিলেন। যে আলোচনা চলছিল, তা তাঁর সহ্য না হওয়ায় উঠে গেছেন। এখন বসে আছেন দু'জন— মিসির আলি এবং ওসমান সাহেব। কথাবার্তা এখন বিশেষ হচ্ছে না। ওসমান সাহেবের যা বলার তা বলেছেন। এখন আব তাঁর কিছু বলার নেই। তিনি বসে আছেন মূর্তির মতো। দেখে মনে হচ্ছে, তাঁর মধ্যে জীবনের ক্ষীণতম স্পর্শও নেই। যেন একজন মরা মানুষ।

মিসির আলি বললেন, আপনি বলছেন, ফিরোজকে তালাবন্ধ করে রেখেছেন ?
হ্যাঁ ।

কবে থেকে ?

আজ নিয়ে ছ'দিন ।

এটা তো বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না । কারণ এই ছ'দিনে বেশ ক'বার সে বের হয়ে গেছে । পুরানা পল্টন এলাকায় তাকে দেখা গেছে । পত্রিকায় নিউজ হয়েছে ।

ওসমান সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, কীভাবে কী হচ্ছে আমি জানি না । আমি যা করেছি, সেটা বললাম । তালা দেয়া আছে । আপনি নিজে গিয়ে দেখতে পারেন ।

সেই তালার চাবি কার কাছে ? অর্থাৎ আমি জানতে চাচ্ছি, অন্য কেউ তালা খুলে দিতে পারে কিনা ।

না, পারে না । কারণ চাবি আমার কাছে ।

অর্থাৎ আপনি বলতে চাচ্ছেন তালাবন্ধ করে রাখা সত্ত্বেও সে বের হয়ে পড়ছে ?

আমি কিছুই বলতে চাচ্ছি না । আপনার যা ইচ্ছা মনে করতে পারেন ।

মিসির আলি ঠাণ্ডা গলায় বললেন, আমি কোনো আধিভৌতিক ব্যাপারে বিশ্বাস করি না । একজনকে তালাবন্ধ রে রাখা হবে, তবু সে বের হয়ে যাবে— এটা আর যে-ই বিশ্বাস করুক, আমি কবব না ।

বিশ্বাস কবতে আমি আপনাকে বলছি না । আপনি নিজে গিয়ে দেখুন । সেটা না করে আপনি একই ক' ববার আমাকে বলছেন কেন ?

সেটা বলছি, কারণ আমি আগে সমস্ত ব্যাপাবটা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা কবতে চাই । ওসমান সাহেব, আমি, আমি আপনাকে সাহায্য কবতে চাই, আমি এই ছেলেটিকে সুস্থ করে তুলতে চাই । আপনি আমাকে শত্রুপক্ষ মনে করছেন, এটা ঠিক না । আমার কোনো পক্ষ নেই । আমি একজন চিকিৎসক ।

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন এবং সহজ স্ববে বললেন, চলুন ফিরোজের ঘরটা দেখে আসি ।

আপনি একাই যান, আমি যাব না ।

আপনি যাবেন না কেন ?

আমার সহ্য হয় না । আমি নিজেও পাগল হয়ে যাব ।

মিসির আলি একাই বওনা হলেন ।

ফিরোজের ঘর নিঃশব্দ । সে এই গবমেবও চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে । তার মুখের দিকে তাকিয়ে মিসির আলি চমকে উঠলেন । মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোফ । গালের হনু উচু হয়ে আছে । সেই উজ্জ্বল গৌববর্ণের কিছুই নেই, কেমন কালি মেরে গেছে । মিসিব আলি লক্ষ করলেন, ফিরোজের হাতের নখ বড় বড় হয়েছে । নখের নিচে ময়লা জমে দেখাচ্ছে শকুনের নখের মতো । ঘুমের মধ্যেই ফিরোজ পাশ ফিরল । মিসির আলি লক্ষ করলেন, সে হাঁ করে ঘুমাচ্ছে এবং মুখ দিয়ে লالا পড়ে বিছানার একটা বেশ বড় অংশ

চটচটে হয়ে আছে। কুৎসিত একটা দৃশ্য।

ঘরের একটিমাত্র দরজা, সেখানে সত্যি সত্যি বিরাট একটা তালা ঝুলছে। দু'দিকে দু'টি বিশাল জানালা। জানালায় লোহার গ্রিল। সেই গ্রিল ভেঙে বের হওয়া অসম্ভব। সুস্থ মানুষ দূরের কথা, একজন পাগলও সেই চেষ্টা করবে না।

মিসির আলি বসার ঘরে ফিরে এলেন। ওসমান সাহেব বললেন, ঘর যে বন্ধ, এটা আপনার বিশ্বাস হয়েছে?

হ্যাঁ হয়েছে।

এখন বলুন সে কীভাবে বের হয়?

ফিরোজের ঘরের সঙ্গে একটা এ্যাটাচড বাথরুম আছে। বাথরুমের ভেতরটা আমি দেখতে পাই নি। তবে আমার ধারণা, বাথরুমে বেশ বড় একটি ভেন্টিলেটর আছে, এবং ফিরোজ সেই ভেন্টিলেটর দিয়ে বের হয়।

ওসমান সাহেব নড়েচড়ে বসলেন। সিগারেট ধরালেন। মিসির আলি লক্ষ করলেন, সিগারেট ধরাতে গিয়ে তাঁর হাত কাঁপছে। মিসির আলি বললেন, এফুণি আপনি ভেন্টিলেটর বন্ধ করার ব্যবস্থা করুন। আজ রাতে যেন সে বের হতে না পারে।

হ্যাঁ, করছি।

আমি এখন চলে যাব। কিন্তু কাল ভোবে আবার আসব। আপনার দারোয়ানকে বলে দিন, যাতে সে আমাকে ঢুকতে দেয়।

হ্যাঁ আমি বলব।... মিসির আলি সাহেব।

বলুন।

আমার ছেলে কি কোনোদিন সুস্থ হয়ে উঠবে?

নিশ্চয়ই হবে। হতেই হবে।

এত রাতে আপনি বাড়ি গিয়ে কী করবেন? থেকে যান এখানে।

না, থাকতে পারব না। আমার সঙ্গে একটা ছোট মেয়ে থাকে, সে একা ভয় পাবে। আপনি দেরি না করে ভেন্টিলেটরটা বন্ধ করার ব্যবস্থা করুন।

করছি। এফুণি করছি।

ফরিদা ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে খুব উদ্ভিগ্ন ও চিন্তিত মনে হলো। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, এবং তিনি কাঁপছেন। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। ফরিদা থেমে বললেন, মিসির আলি সাহেব, ফিরোজ জেগেছে। আপনাকে ডাকছে। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

কেমন আছ ফিরোজ?

ভালো আছি। তুই কেমন আছিস?

মিসির আলি চমকে উঠলেন। ভারি গম্ভীর গলায় কথা বলছে ফিরোজ। চোখে-মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি। সে পায়ের উপর পা তুলে চেয়ারে বসে আছে।

তুই তুই করে বলছি বলে রাগ করছিস না তো? তুই তো আবার প্রফেসর মানুষ।

রাগ করছি না, তবে দুঃখিত হচ্ছি। সবাইকে সবার প্রাপ্য সম্মান দেয়া উচিত।

তা উচিত। কিন্তু মুশকিল কী জানিস, সারা জীবন তুই ছাড়া কোনো সম্বোধন করি নি। আমাকে চিনতে পারছিস তো ? তুই তো গিয়েছিলি আমাদের বাড়িতে।

মিসির আলি চুপ করে রইলেন। যে কথা বলছে, সে ফিরোজ নয়। ফিরোজের দ্বিতীয় সত্তা। সেকেন্ড পার্সোনালিটি।

কী-রে, চুপ করে আছিস কেন ? ভয় পাচ্ছিস ? হা হা হা।

না, ভয় পাচ্ছি না।

খাঁচায় আটকে রেখেছিস, ভয় পাবি কেন ? ছেড়ে দে, তারপর দেখি তোর কত সাহস।

আমার সাহস কম।

এই তো একটা সত্যি কথা বললি। হ্যাঁ, তোর সাহস কম— তবে তোর বুদ্ধি আছে। মাথা খুব পরিষ্কার। বোকা বন্ধুর চেয়ে বুদ্ধিমান শত্রু ভালো।

আমি কারো শত্রু নই।

বাজে কথা বলিস না। তুই আমার শত্রু মহা শত্রু!

কেমন করে ?

তুই ফিরোজকে সারিয়ে তুলতে চাচ্ছিস। ওকে সারিয়ে তুললে আমি যাব কোথায় ? ডাঙাপেটা করব কীভাবে ? তুইই বল।

ডাঙাপেটা করতেই হবে ?

করব না ? বলিস কী তুই! আমাকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে, আমি ছেড়ে দেব ? পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে ফেলব।

লাভ কী তাতে ?

লাভ-লোকসান জানি না। ছোট চৌধুরী লাভ-লোকসানের পরোয়া করে না। তোকে আমি একটা শিক্ষা দেব। এক বাড়ি মেরে টপ করে মাথাটা ফাটিয়ে দেব। গল-গল করে ঘিলু বের হয়ে আসবে। ছিটকে আসবে রক্ত। বড় মজার ব্যাপার হবে। তবে তুই দেখতে পাবি না। আফসোসের কথা।

মিসির আলি তাকিয়ে দেখলেন, এ বাড়ির প্রায় সবাই এসে জড়ো হয়েছে। চোখ বড় বড় করে গুনছে এই অস্বাভাবিক কথোপকথন। কাঁদছেন শুধু ফরিদা।

ফিরোজ হিসহিস করে উঠল, কী, চুপ করে আছিস যে ? কথা বলাছিস না কেন ? ভয় পেয়েছিস ? ভয় পেয়ে শেষটায় মেয়েমানুষের আঁচল ধরলি ? লজ্জা করে না ?

কার কথা বলছ ?

ওরে হারামির বাচ্চা, তুই জানিস না কার কথা বলছি ? তোর পেয়ারের নীলু বেগম। যার ইয়ে দুটি...। এবং যার ইচ্ছে হচ্ছে...।

কুৎসিত সব কথা। সে একনাগাড়ে বলে যেতে লাগল। কদর্য অনীলতা। যা ছাপার অক্ষরে লেখার কোনো উপায় নেই। ফিরোজ যে-সব কথা বলতে লাগল, তার গুণাগুণও অনীলতম পর্ণো পত্রিকায় থাকে না। ফরিদা দ্রুত ঘরে চলে গেলেন। কাজের লোকগুলি

মুখ চাওয়া-চাওয়া করতে লাগল। ওসমান সাহেব ধৈর্য হারিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, শাট আপ!

ফিরোজ হাসিমুখে তাকাল ওসমান সাহেবের দিকে। যেন খুব মজার কথা বলছে, এমন ভঙ্গিতে বলতে লাগল, আমাকে ইংরেজিতে গাল দিচ্ছে। বাহ বেশ মজা তো! কাকে তুই ইংরেজিতে গাল দিচ্ছিস? তোর নাড়ি-নক্ষত্র আমি জানি। সালেহা নামের কাজের মেয়েটির সঙ্গে তুই কী করেছিস, বলে দেব? খুব মজা পেয়ে গিয়েছিলি, তাই না? ক’দিন খুব সুখ করে নিলি। বলব কী করেছিলি? বলব? হা হা হা। কী, পালিয়ে যাচ্ছিস কেন? লজ্জা লাগছে? ফুর্তি করার সময় লজ্জা লাগে নি? একটা ঘটনা বরং বলেই ফেলি...

ওসমান সাহেব বললেন, মিসির আলি সাহেব, আপনি চলে আসুন।

আপনি বসার ঘরে গিয়ে বসুন। আমি আসছি।

তুই যাচ্ছিস না কেন? কথাগুলো শুনতে মজা লাগছে? তোর ইয়ে... (কিছু কুৎসিত কথা)।

মিসির আলি গম্ভীর গলায় বললেন, ফিরোজ, চুপ কর।

ঠিক আছে, চুপ করলাম। তুই আজ রাতে কোথায় থাকবি?

বাসাতেই থাকব।

তাহলে দেখা হবে।

না, দেখা হবে না। বাথরুমের ভেন্টিলেটর বন্ধ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

ফিরোজের কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল ব্যাপারটা বুঝতে। তারপর লগুভগু কাণ্ড করল। চেয়ার ভাঙল, লাথির পর লাথি বসাতে লাগল পালঙ্কে। কাপ বাটি ছুড়ে ছুড়ে ফেলতে লাগল। চোখে দেখা যায় না এমন ব্যাপার। ভয়াবহ উন্মত্ততা। মনে হয় না এ কোনোদিন শান্ত হবে। মিসির আলি একটি সিগারেট ধরালেন। ফিরোজ চাপা গলায় গর্জন করছে। ত্রুদ পশুর গর্জন। সমস্ত আবহাওয়াই দূষিত হয়ে গেছে। নরকের একটি ক্ষুদ্র অংশ নেমে এসেছে এখানে।

মিসির আলি দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের বললেন, তোমরা যাও। বারান্দার বাতি নিভিয়ে দাও। ও আপনা-আপনি শান্ত হবে।

১৮

নাজনীন একটি ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখেছে। স্বপ্নটি দেখেছে ছাড়া ছাড়া ভাবে। তবু সব মিলিয়ে একটা অর্থ দাঁড় করানো যায়। এবং অর্থটি ভয়াবহ। নাজনীন দেখেছে— একটা ছোট ঘরের এক প্রান্তে একটি বিছানা। বিছানাটিতে সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে একজন লোক শুয়ে আছে। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ আরেকজন লোক ঘরে ঢুকল। লোকটার হাতে একটা লোহার রড। লোকটি টান দিয়ে ঘুমিয়ে থাকা লোকটির ওপর থেকে চাদর সরিয়ে ফেলল। লোকটির মুখ দেখা যাচ্ছে। এবং সেটি একটি পরিচিত মুখ— মিসির আলির মুখ। স্বপ্নের মধ্যেই প্রচণ্ড একটা শব্দ হলো, এবং দেখা গেল মিসির আলির মাথা

ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।

নাজনীন জেগে উঠল চিৎকার করে। স্বপ্ন এত ভয়াবহ হয়! নাজনীন বাকি রাতটা আর ঘুমতে পারল না। ছ' রাকাত নফল নামাজ পড়ল। কোরান শরীফ পড়ল। মন শান্ত হলো না। নাজনীনের মা বললেন একটা ছদকা দিয়ে দিতে। প্রাণের বদলে প্রাণ। সেই ছদকা তো ভোর না হবার আগে দেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই কঠিন। নাজনীন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে খানিকক্ষণ কাঁদল। সে জানে এটা স্বপ্ন। স্বপ্ন কখনো সত্যি হয় না। তবু এমন লাগছে কেন?

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে একটি টেলিগ্রাম পাঠাল, 'সাবধান থাকবেন।' টেলিগ্রামটি পাঠিয়েই মনে হলো, এর অর্থ তো উনি কিছুই বুঝবেন না। তিন ঘণ্টা পর দ্বিতীয় একটি টেলিগ্রাম করল। এই টেলিগ্রামটি বেশ দীর্ঘ।

চাচা, আপনার সম্বন্ধে খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। একটি লোক লোহার রড দিয়ে আপনার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। আপনাকে অনুরোধ করছি, সাবধানে থাকবেন। নাজনীন।

১৯

নিজের মেয়েকে চিনতে না পারার মতো কষ্টের কি কিছু আছে? জাহিদ সাহেব বসে বসে তাই ভাবেন। তাঁর বড় অস্থির লাগে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কেমন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন। এরকম হবে, জানতেন। দুই মেয়ে বড় হবে, এদের বিয়ে হবে, আলাদা জীবন হবে। তিনি পড়ে থাকবেন একা। এ অবস্থা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। পুরোপুরি সেবকম অবশ্যি হয় নি। এক মেয়ে তাঁর সঙ্গেই আছে। কিন্তু এই মেয়েকে তিনি চেনেন না। এ এক অচেনা নীলু।

আজ দুপুরে খেতে গিয়ে দেখেনে, মাংসের ভূনা তরকারি এবং খিচুড়ি করা হয়েছে। তিনি অবাক হয়ে বললেন, আজ খিচুড়ি যে!

নীলু বলল, তুমি খেতে চেয়েছিলে, তাই।

জাহিদ সাহেব খেতে চেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু কাউকে সে-কথা বলেন নি। নীলুব সঙ্গে গতকাল রাত থেকেই তাঁর কোনো কথা হয় নি। অথচ সে ঠিকই জানল। শুধু আজই নয়, এরকম প্রায়ই হয়। বড় অস্থিতি লাগে। শুধু অস্থিতি নয়, একটু ভয় ভয় করে। একেক রাতে ভয়টা অসম্ভব বেড়ে যায়। বেন বাড়ে, তাও তিনি জানেন না। তাঁর ইচ্ছা করে সব ছেড়ে ছুড়ে দূরে কোথাও চলে যান। যেখানে কেউ তাঁর কোনো খোঁজ পাবে না।

প্রথম এরকম হলো বিলুর বিয়ে চারদিন পর। বিলু নেই। বিয়েবাড়ির আত্মীয়স্বজনরা সব চলে গেছে। বাড়ি একেবারেই খালি। মন-টন খারাপ করে জাহিদ সাহেব নিজের ঘর ছেড়ে ঘুমতে গেলেন নীলুর পাশের ঘরে। একজন কেউ থাকুক আশেপাশে। যাতে ডাকলে সাড়া পাওয়া যায়।

অনেক রাত পর্যন্ত তাঁর ঘুম এলো না। সামনের জীবন কেমন কাটবে, তাই নিয়ে ভাবতে লাগলেন। মৃত জীবর কথা মনে করে খানিকক্ষণ কাঁদলেন। প্রথম জীবনে একটি

ছেলে হয়েছিল— দেড় বছর বয়সে মারা যায়। মিষ্টি কথা বলত। পাখিকে বলত ‘বাকি’। ফুলকে বলত ‘কুল’। অনেকদিন পরে মৃত ছেলের কথা মনে করেও চোখ মুছলেন। আর ঠিক তখন এক অদ্ভুত ব্যাপার হলো। চাঁপা ফুলের তীব্র গন্ধে অভিভূত হয়ে গেলেন। ব্যাপার কী! ফুলের গন্ধ আসছে কোথেকে? তাঁর নিজের এক সময় বিরাট ফুলের বাগান ছিল। সে-সব আর কিছু নেই। বাগান জঙ্গল হয়েছে।

জাহিদ সাহেব অবাক হয়ে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াতেই নৃপূরের শব্দ শুনলেন। খুব হালকা, কিন্তু স্পষ্ট। এর মানে কী? তিনি নীলুর ঘরের সামনে দাঁড়ালেন। আশ্চর্য! নীলু যেন কার সঙ্গে কথা বলছে। গভীর রাতে কে এসেছে নীলুর ঘরে? জাহিদ সাহেব ভয়াব্র গলায় ডাকলেন, নীলু, ও নীলু।

নীলু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলল।

কার সঙ্গে কথা বলছি?

আছে একজন। তুমি চিনবে না।

জাহিদ সাহেব ঘরে উঁকি দিলেন। কাউকে দেখতে পেলেন না। নীলু বলল, ঘুমিয়ে পড় বাবা। এত রাত পর্যন্ত জেগে আছ কেন?

জাহিদ সাহেব বললেন, কী হচ্ছে এসব! কার সঙ্গে কথা বলছিলি?

ও তুমি বুঝবে না বাবা।

বুঝবে না মানে? বুঝবে না মানে কী?

অনেক কথা বাবা। পরে তোমাকে বলব।

না, এখনই শুনব।

নীলু বলল, এবং নীলুর কথা তিনি কিছুই বুঝলেন না। একজন কেউ নীলুর সঙ্গে আছে— যে নীলুকে তার মহাবিপদ থেকে রক্ষা করেছিল। কী অদ্ভুত কথা!

জাহিদ সাহেব দারুণ দুশ্চিন্তায় দিন কাটাতে লাগলেন। তাঁর ধারণা হলো, নীলুব বড় কোনো অসুখ হয়েছে। তিনি ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বললেন। দু’জন পীরের কাছ থেকে তাবিজ আনালেন। সেই সব তাবিজ পরতে নীলু কোনো আপত্তি করল না। ডাক্তারদের ওষুধপত্র খেতেও তার কোনো অসুখ দেখা গেল না। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হলো না। এবং হবেও না কোনোদিন। তাঁর বাকি জীবন কাটবে অদ্ভুত এই নীলুকে সঙ্গে নিয়ে— যাকে তিনি চেনেন না, বোঝেন না। যে মনের কথা বুঝে ফেলে। যার ঘরে অপরিচিত এক রমণীকণ্ঠ শোনা যায় এবং দমকা হাওয়ার মতো চাঁপা ফুলের গাঢ় গন্ধ যাকে হঠাৎ ঘিরে ফেলে।

আজ বুধবার। আকাশে মেঘ নেই। বৌদ্রোজ্জ্বল একটি সুন্দর সকাল। জাহিদ সাহেব অনেক দিন পর উৎফুল্ল বোধ করলেন। তাঁর মনে হলো, দুঃস্বপ্ন কেটে যাবে। নীলু ভালো হয়ে যাবে। তাঁর চমৎকার একটি বিয়ে হবে। ছেলেপুলে আসবে তাদের সংসারে। সেই সব ছেলেমেয়ে নিয়ে তাঁর শেষ জীবন ভালোই কাটবে। একজন মানুষ তো সারা জীবন দুঃখী থাকতে পারে না। দুঃসময়ের পর আসে সুসময়। জীবনচক্রের এই এক কঠিন নিয়ম। তবে কারো কারো ক্ষেত্রে দুঃসময়টা দীর্ঘ হয়, এই যা। যেমন তাঁর হয়েছে।

জাহিদ সাহেব ডাকলেন, নীলু, নীলু মা। অনেক দিন পরে তাঁর কণ্ঠে আনন্দ ঝরে পড়ল।

নীলু এলো না। তিনি উঁকি দিলেন নীলুর ঘরে। তার ঘর অন্ধকার। দরজা জানালা বন্ধ। পর্দা টেনে দেয়ায় ঘরের বাতাস ভারি হয়ে আছে।

কী হয়েছে নীলু?

কিছু হয় নি।

এভাবে শুয়ে আছিস কেন? শরীর ভালো না?

তিনি নীলুর কপালে হাত দিলেন। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। নীলুর চোখ-মুখ রক্তবর্ণ। তিনি হতভম্ব হয়ে বললেন, কী হয়েছে মা?

কিছু হয় নি।

কিছু হয় নি, মানে? তোর গায়ে তো প্রচণ্ড জ্বর। কখন জ্বর এলো? ডাক্তার ডাকা দরকার। এফুণি দরকার।

বাবা, এই নিয়ে তুমি ভাববে না। কাউকে ডাক্তার দরকার নেই।

দরকার নেই, বললেই হলো!

বাবা, তোমাব পায়ে পড়ি। আমাকে একা থাকতে দাও। বিরক্ত করো না। ভয় নেই, জ্বর সেরে যাবে।

জাহিদ সাহেব লক্ষ্য বদলেন, নীলু কাঁদছে।

মা, কী হয়েছে তোর?

কিছু হয় নি বাবা। আমি সেরে যাব। আমি আবাব আগের মতো হব। যে আমাব সঙ্গে থাকত, সে আমাকে বলেছে।

সে কে?

আমি নিজেও জানি না, সে কে' এক মহাবিপদে সে আমাকে রক্ষা করেছিল। বাবা, তুমি যাও।

জাহিদ সাহেব মুখ কালো করে সব থেকে বের হয়ে এলেন। চমৎকারভাবে যে দিনটি শুরু হয়েছিল, সেটি খানখান হয়ে ভেঙে পড়ল। তিনি খবরের কাগজ হাতে নিয়ে একা-একা বাবান্দায় বসে রইলেন।

২০

বুধবার। সময় সাতটা দশ।

সন্ধ্যার ঠিক পবপব মিসির আলি নিউ ইস্কাটন বোডের যে তিনতলা দালানের সামনে এসে দাঁড়ালেন, তার নাম 'নিকুঞ্জ'। লোকজন বিশাল প্রাসাদ তৈরি করে নাম দেয় 'কুটির'! এরকম বাড়ির নাম কেউ কুটির রাখে?

বাড়ির সামনে ফুটবলের মাঠের মতো বড় লন। লনের ঘাস বড় বড় হয়ে আছে। লনের চারদিকে একসময় ফুলের বাগান ছিল। এখন নেই। শ্বেতপাথরের একটি শিশুমূর্তি

(সম্ভবত কোয়ারা) আছে মাঝখানে, তাতে শ্যাওলা পড়েছে। চারদিকে অবহেলা ও অযত্নের ছাপ।

মিসির আলির মনে হলো— এ বাড়ির মালিক দেশে থাকেন না। চাকর-বাকরের হাতে বাড়ির দায়িত্ব দিয়ে তিনি থাকেন বিদেশে। হঠাৎ হঠাৎ আসেন, আবার চলে যান। মিসির আলি খানিকটা শঙ্কিত বোধ করলেন। বাড়ির মালিক এস. আকন্দ সাহেবের সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়া খুবই জরুরি। কারণ মিসিব আলির ছাত্র শেষ পর্যন্ত ‘ইমা’ নামের একটি মেয়ের খবর পত্রিকায় পেয়েছে। খবরের শিরোনাম— ‘হারিয়ে গেল ইমা’। ডল হাতে তিন বছর বয়সী একটি বালিকার ছবি আছে খবরের সঙ্গে।

মেয়েটি তার বাবা-মার সঙ্গে ঢাকা থেকে খুলনা যাচ্ছিল। খুব চঞ্চল মেয়ে। সারাদিন ছোট্টাছুটি করেছে। স্টিমারে উঠে তার খুব ফুর্তি। একজন আয়া তার সঙ্গে সঙ্গে। বরিশাল থেকে স্টিমার ছাড়ার কিছুক্ষণ পরই আয়া দেখল ইমা নেই। সিঁড়ি দিয়ে দোতলা থেকে একা-একা নিচে নেমে গেছে? সে ছুটে এলো নিচে। সেখানেও ইমা নেই। সে কি রেলিং টপকে নদীতে পড়ে গেছে? আয়া ভয়ে-আতঙ্কে অজ্ঞান হয়ে গেল। ইমার বাবা-মা তখনো কিছু জানেন না। তাঁরা টেলিস্কোপিক লেন্স লাগিয়ে দূরের একটি মাছধরা নৌকার ছবি তোলার চেষ্টা করছেন।

এ জাতীয় বাড়িগুলোতে সাধারণত দারোয়ান এবং কুকুর থাকে। কিন্তু এ বাড়িতে দুটোর কোনোটাই দেখা যাচ্ছে না। মিসির আলি অনেকটা দ্বিধা নিয়েই গেটের ভেতর ঢুকলেন। কলিং বেল থাকার কথা। তাও চোখে পড়ছে না। তবে বাড়িতে লোক আছে। আলো জ্বলছে।

আচ্ছা, এরকম হওয়া কি সম্ভব যে, এ বাড়িতে এস. আকন্দ নামের কেউ থাকেন না! এককালে ছিলেন, এখন নেই। কিংবা খবরের কাগজে যে এস. আকন্দের কথা আছে, ইনি সেই ব্যক্তি নন।

হওয়া অসম্ভব নয়। তবে সাজ্জাদ হোসেন বেশ জোর দিয়েই বলেছেন— এটিই ঠিকানা। খবরের কাগজের কাটিং থেকে ঠিকানা বের করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল সাজ্জাদ হোসেনকে। এটি মনে হচ্ছে তিনি ঠিকই করেছেন।

কলিং বেল খুঁজে পাওয়া গেল না। মিসির আলি দরজায় ধাক্কা দিলেন। দরজা খুলে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

কাকে চান?

এটা কি আকন্দ সাহেবের বাড়ি? এস. আকন্দ?

জি।

উনি কি আছেন? তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

উনি খুবই ব্যস্ত। আজ রাত দু’টার ফ্লাইটে লন্ডন চলে যাচ্ছেন। আপনার কী দরকার বলুন?

আমার খুবই দরকার।

আমাকে বলুন।

আমি তাঁকেই চাই। বেশি সময় লাগবে না। পাঁচ মিনিট সময় নেব।

ঠিক আছে বসুন, আমি দেখি।

মিসির আলি সাহেব বসার ঘরে একা-একা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বসে রইলেন। বসার ঘরটি সুন্দর। অসংখ্য দর্শনীয় জিনিসপত্র দিয়ে জ্বড়জ্বড় করা হয় নি। ঘাস রঙের একটা কার্পেট। নিচু নিচু বসার চেয়ার। দেয়ালে একটিমাত্র পেইন্টিং— চার-পাঁচজন গ্রামের ছেলেমেয়ে পুকুরে সাঁতার কাটতে নেমেছে। অপূর্ব ছবি। ছবিটির জন্যেই বসবার ঘরে একটি মায়্যা-মায়্যা ভাব চলে এসেছে। মিসির আলি মনে মনে ঠিক করলেন, তাঁর কোনো দিন টাকা-পয়সা হলে এবকম করে একটি ড্রইংরুম সাজাবেন। সেরকম টাকা-পয়সা অবশ্যি তাঁর হবে না। সবার সব জিনিস হয় না।

আপনি কি আমার কাছে এসেছেন? আমি সাবির আকন্দ।

মিসির আলি ভদ্রলোককে দেখলেন। বেশ লম্বা। শ্যামলা গায়ের রঙ। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। মুখে একটি কঠিন ভাব আছে। তবে চোখ দু'টি বড় বড়, যা মুখের কঠিন ভাবের সঙ্গে মানাচ্ছে না।

আমি আপনাকে কোনো সময় দিতে পারব না। আমি আজ একটায় চলে যাচ্ছি।

আমি আপনার বেশি সময় নেব না। আপনি পত্রিকার এই কাটিংটি একটু দেখুন।

আকন্দ সাহেব দেখলেন। কাটিংটি ফিরিয়ে দিয়ে মিসির আলির পাশে বসে ক্লান্ত স্বরে বললেন, এটা আপনি আমাকে কেন দেখাচ্ছেন? কিছু কিছু জিনিস আমি মনে করতে চাই না। এটা হচ্ছে তার একটি।

মিসির আলি বললেন, আমার সঙ্গে একটি মেয়ে থাকে। আমার ধারণা, ও ইমা।

ভদ্রলোক কোনো কথা বললেন না। তাঁর মুখের একটি পেশিও বদলাল না।

আপনার এই মেয়ের কি খুব ছোটবেলায় ওপেন হার্ট সার্জারি হয়েছিল?

হ্যাঁ। ইংল্যান্ডে। ওর বয়স তখন দু'বছর।

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি আপনার পরিচয়টি জানতে পারি?

পারেন। আমার নাম মিসির আলি। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পাট টাইম শিক্ষক।

আকন্দ সাহেব সিগারেট ধারণে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে টানতে লাগলেন।

মিসির আলি বললেন, আমি বুঝতে পারছি, ঘটনার আকস্মিকতা আপনাকে কনফিউজ করে ফেলেছে এবং এটা যে আপনারই মেয়ে, তা আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না।

ভদ্রলোক কিছু বললেন না।

মিসির আলি বললেন, একবার এই মেয়েটি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং জুরের ঘোরে বলতে থাকে 'মামি ইট হার্টস, মামি ইট হার্টস'; তখনই আমার প্রথম মনে হলো...।

মিসির আলি কথা বন্ধ করে আকন্দ সাহেবের দিকে তাকালেন। ভদ্রলোকের মুখ রক্তশূন্য। মনে হচ্ছে এগুণি অজ্ঞান হয়ে পড়বেন। তারপর আনন্দ আর যন্ত্রণা একসঙ্গে মেশানো গলায় আকন্দ সাহেব থেমে থেমে বললেন, খুব ছোটবেলায় হার্টের অসুখে কষ্ট পেত, তখন বলত, 'মামি ইট হার্টস।' ওর নাভিতে একটি কালো জন্মদাগ আছে?

আমি বলতে পারছি না। তবে এই মেয়ে আপনারই মেয়ে কি না, তা বোঝার একমাত্র উপায় হচ্ছে DNA টেস্ট। আপনার এবং এই মেয়ের রক্ত পরীক্ষা করে সেটা বলে দেয়া সম্ভব। এটা একটা অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা।

জানি। তার দরকার হবে না। আমি আমার মেয়েকে দেখলেই চিনতে পারব। আমি কি এখনই যেতে পারি আপনার সঙ্গে?

হ্যাঁ, পারেন।

আমি আমার স্ত্রীকেও সঙ্গে নিতে চাই।

নিশ্চয়ই সঙ্গে নেবেন।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন! তাঁর সমস্ত মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। তিনি বললেন, আপনি কী করেন?

এই প্রশ্ন আগে একবার করা হয়েছে এবং তার জবাবও দেয়া হয়েছে। তবু মিসিব আলি দ্বিতীয়বার জবাব দিলেন।

আকন্দ সাহেব কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, আমার মেয়েটি কী করে আপনার ওখানে?

মিসির আলি শান্ত স্বরে বললেন, ও আছে কাজের মেয়ে হিসেবে। ভাত-টাত রন্ধে দেয়। বিনিময়ে খেতে পায় এবং থাকতে পায়।

ভদ্রলোক চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন। যেন তিনি মিসিব আলির কথা বুঝতে পারছেন না। তিনি ফিসফিস করে নিজের মনেই কয়েকবার বললেন, কাজের মেয়ে! কাজের মেয়ে!

২১

বুধবার। সময় রাত আটটা একুশ।

মিসির আলি ভেবেছিলেন পিতা, কন্যা এবং মাতার মিলনদৃশ্যটি চিরদিন মনে রাখার মতো একটি দৃশ্য হবে। কিন্তু বাস্তবে সেরকম হলো না। কোনো হৈচৈ, কোনো কান্নাকাটি— কিছুই না। ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রী অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে বইলেন হানিফার দিকে। এভাবে তাকিয়ে থাকার কিছু ছিল না। হানিফা দেখতে অবিকল তার মা'র মতো। নাকের ডগায় তার মা'র মতো একটি তিল পর্যন্ত আছে। ভদ্রলোক বললেন, আমরা তোমার বাবা-মা, তুমি খুব ছোটবেলায় হারিয়ে গিয়েছিলে। এখন আমরা তোমাকে নিতে এসেছি।

হানিফা ফ্যালফ্যাল করে তাকাল মিসির আলির দিকে। মিসির আলি হাসলেন। সাহস দিতে চেষ্টা করলেন। এরকম একটি নাটকীয় মুহূর্তের জন্যে তিনি হানিফাকে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। তাকে বলেছিলেন যে, তার বাবা-মা'র খোঁজ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এবং খোঁজ পাওয়া যাবে।

ভদ্রমহিলা এগিয়ে এসে হানিফার হাত ধরলেন। মিসির আলি ভেবেছিলেন, এই মহিলাটি হয়তো কিছুটা আবেগ দেখাবেন। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে কাঁদবেন। কিন্তু তিনি

তা করলেন না। হয়তো আবেগকে সংযত করলেন। ভদ্রমহিলার গলার স্বর ভারি মিষ্টি। তিনি মিষ্টি গলায় বললেন, মা, আমার কথা কি তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? দেখ, আয়নায় তাকিয়ে দেখ— আমি অবিকল তোমার মতো দেখতে।

মিসির আলি ওদের সামনে থেকে সরে গেলেন। বাইরের একজনের উপস্থিতি হয়তো এদের কাছে ভালো লাগবে না।

তারা চলে গেলেন পনের মিনিটের মধ্যে। যাবার আগে মিসির আলি বললেন, ওর জিনিসপত্রগুলি নিয়ে যান। ভদ্রমহিলা কঠিন স্ববে বললেন, কোনোকিছুই নেবার প্রয়োজন নেই।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, যাবার আগে এস. আকন্দ সাহেব অত্যন্ত শুকনো গলায় একবার শুধু বললেন, আমাকে কষ্ট করে খুঁজে বের করবার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। ব্যস, এইটুকুই।

মিসিব আলি ভেবে পেলেন না, এরা তাঁর সঙ্গে এমন আচরণ কেন করলেন! তাঁদের মেয়েটি তার বাসায় গৃহভৃত্য ছিল, এইটিই কি তাঁদের মর্মপীড়ার কারণ হয়েছে? এত বিচিত্র কেন মানুষের মন!

অবশ্য তাঁদের বিচিত্র আচরণেব অন্য একটি ব্যাখ্যাও দাঁড় করানো যেতে পারে। হয়তো আজকের এই ঘটনার আকস্মিকতায় তাঁরা হকচকিয়ে গেছেন। আচার-আচরণে অস্বাভাবিকতা এসে পড়েছে এ কারণেই।

মিসিব আলি হঠাৎ লক্ষ্য কবলেন, তাঁর চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। হানিফা নামের মেয়েটির জন্যে খারাপ লাগছে। বেশ খারাপ লাগছে। মেয়ে জাতটাই হচ্ছে মায়াবতীর জাত। কখন যে এই মেয়েটি মাগায় জড়িয়ে ফেলেছে, নিজেই বুঝতে পারেন নি।

হানিফার সঙ্গে তাঁর আর কোনোদিন দেখা হবে না। তাঁ নিশ্চয়ই তাঁদের মেয়েকে নিয়ে এখানে আসবেন না। তিনি নিজেও যাবেন না। কারণ তিনি কোনো পিছুটান রাখতে চান না। কিংবা কে জানে, একদিন হয়তো যাবেন। দেখবেন ঝড়েব রাতে পাওয়া ভিখিরি মেয়েটিকে রাজবাণী বেশে কেমন লাগছে। সে কি মনে রাখবে তাব দুঃসহ শৈশব? যদি রাখে, তবেই সে জীবনে অনেকে বড় হবে। এবং তার ধারণা, এই মেয়েটি তা মনে রাখবে।

মিসির আলি চোখ মুছে নিজেব ঘরে কলেন। বারবার চোখ ভিজে উঠছে কেন? তাঁর মতো একজন শুকনো ধরনের মানুষের হৃদয়ে এত ভালোবাসা কোথেকে এলো?

দরজায় নক হচ্ছে। কে এলো এত রাতে?

মিসির আলি দরজা খুলে অবাক হয়ে দেখলেন— আকন্দ সাহেব। তাদের গাড়ি দূবে দাঁড়িয়ে। তিনি শুধু একা নেমে এসেছেন। মিসির আলি অবাক হয়ে বললেন, কী ব্যাপার! বাসার কাছাকাছি পৌছার পর মনে হলো, আপনাকে আমি যথাযথ ধন্যবাদ দিই নি।

ধন্যবাদের কোনে প্রয়োজন নেই।

আপনার নেই। আপনি সাধারণ মানুষের উর্ধ্বে। কিন্তু আমি নিতান্তই সাধারণ মানুষ।

ভদ্রলোক জড়িয়ে ধরলেন মিসির আলিকে এবং ছেলেমানুষের মতো চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। ভদ্রলোকের স্ত্রী হানিফাকে নিয়ে নেমে এসেছেন গাড়ি থেকে। তিনি শক্ত করে হানিফার হাত ধরে রেখেছেন, যেন হাত ছেড়ে দিলেই মেয়েটি পারিয়ে যাবে।

মিসির আলি কোমল স্বরে বললেন, শান্ত হোন। আপনি শান্ত হোন। আসুন, ভেতরে গিয়ে বসি।

ভদ্রলোক ধরা গলায় বললেন, প্রিজ, আরো কিছুক্ষণ আপনাকে জড়িয়ে রাখার সুযোগ দিন। প্রিজ।

২২

বুধবার। সময় রাত দশটা চল্লিশ।

ওসমান সাহেবের ঘুমের সময় হয়ে গিয়েছে। ইদানীং তিনি সিডাকসিন না খেয়ে ঘুমাতে পারেন না। তিনি উঠলেন। একটি সিডাকসিন ট্যাবলেট খেয়ে মাথায় পানি ঢাললেন, হাত-মুখ ধুলেন। বিছানায় যাবার আগে রোজকার অভ্যেসমতো উঁকি দিলেন ফিরোজের ঘরে। গত তিনদিন তিন রাত ধরে ফিরোজ তার ঘরে আটক। দু'দিন দু'রাত সে ছটফট করেছে, জিনিসপত্র ভেঙেছে, খাবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজ সারাদিন তেমন কিছু করে নি। ভাত-টাত কিছুই খায় নি, তবে কোনোবকম চিৎকার এবং হৈচৈ করে নি। এখন সম্ভবত করবে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার পাগলামি বাড়ে, অস্থিরতা বাড়ে।

ওসমান সাহেব ফিরোজের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বেশ অবাক হলেন। ফিরোজ শান্ত ভঙ্গিতে বসে আছে। গায়ে একটি শার্ট। চুল আঁচড়িয়েছে। মুখভর্তি খোঁচ খোঁচা দাঁড় নেই। শেভ করেছে। এবং সম্ভবত গোসলও করেছে। ওসমান সাহেব নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না।

কেমন আছ ফিরোজ ?

ফিরোজ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল এবং সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল, ভালো আছি। তুমি কেমন আছ বাবা ?

ভালো ভালো। আমি ভালো, বেশ ভালো।

ওসমান সাহেবের বিশ্বয়ের সীমা রইল না। কী অদ্ভুত কাণ্ড! ফিরোজ কি সুস্থ ? নিশ্চয়ই সুস্থ।

বাবা, মাকে ডাক। খিদে পেয়েছে, ভাত খাব।

নিশ্চয়ই খাবি। নিশ্চয়ই। কী দিয়ে খাবি ?

যা আছে, তাই দিয়ে খাব। স্পেশাল কিছু লাগবে না।

লাগবে না কেন ? নিশ্চয়ই লাগবে। দাঁড়া ডাকছি। তোর মাকে ডাকছি। তোর শরীরটা এখন ভালো, তাই না ?

হ্যাঁ ভালো। বাবা, আমার ঘরটা খুব নোংরা হয়ে আছে, একটা ঝাড়ু দিতে বলো।
তালা খোলার দরকার নেই। জানালা দিয়েই দাও।

ওসমান সাহেব ঝাড়ু এনে দিলেন এবং ছুটে গেলেন স্ত্রীকে খবর দিতে। ফরিদাকে
ঘুম ভাঙিয়ে তুলে এনে দেখেন, ফিরোজ ঘর মোটামুটি পরিষ্কার করে ফেলেছে। কত
সহজ এবং স্বাভাবিক তার ব্যবহার। ফরিদার চোখে পানি এসে গেল।

মা, ভাত দাও আমাকে। খুব খিদে লেগেছে।

দিচ্ছি বাবা, দিচ্ছি। এক্ষুণি দিচ্ছি।

জানালায় শিকের ফাঁক দিয়ে দিও না মা। নিজেই জন্তুর মতো লাগে। মনে হয়
আমি চিড়িয়াখানার একটা পশু।

না না, জানালা দিয়ে খাবার দেব না। টেবিলে খাবার দিচ্ছি। তুই চেয়ার-টেবিলে
বসে খাবি।

আর শোন মা, আমাব বিছানার চাদর-টাদর বদলে দাও। ধবধবে সাদা চাদর
দেবে।

দিচ্ছিবে বাবা, দিচ্ছি।

আনন্দে ফরিদা বারবার মুখ মুছতে লাগলেন। সব ঠিক হয়ে গেছে। আর কোনো
সমস্যা নেই। তাদের দুঃস্বপ্নের রাত শেষ হয়েছে।

খাবার টেবিলে ভাত সাজিয়ে ওসমান সাহেব ফিরোজের ঘরের তালা খুললেন।
ফিরোজ বেরিয়ে এলো। তার হাতে লোহাব রড। তার পরনে একটি কালো প্যান্ট, খালি
গা। সে থমথমে গলায় বলল, কি, ভয় লাগছে? ভয়ের কিছু নেই। মিসির আলির সঙ্গে
দেখা করতে যাচ্ছি। ও আমাব চিকিৎসা কববে।

ওসমান সাহেব একটি কথাও বলতে পারলেন না। ফিরোজ হেঁটে হেঁটে গেল
গেটেব কাছে। দারোয়ানকে ঠাণ্ডা গলায় বলল গেট খুলে দিতে। দারোয়ান গেট খুলে
দিল।

টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশে মেঘের পবে মেঘ জমতে শুরু করেছে।
রাস্তায় কেন যে স্ট্রিট লাইট নেই। ফিরোজ লম্বা পা ফেলে অন্ধকারে নেমে গেল।

২৩

বুধবাব।

জাহিদ সাহেব রাত এগারটার দিকে একজন ডাক্তার ডেকে আনলেন।

নীলুর আকাশ-পাতাল জ্বর। তিনি নিজে হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন। ডাক্তারের অবস্থাও
তাই। ডাক্তার মুখ শুকনো করে বলল, এই মেয়েকে এক্ষুণি হাসপাতালে নিতে হবে।
আমি আমার ডাক্তারি জীবনে এত জ্বর কাবো দেখি নি। আপনি মেয়েটির মাথায় বরফ
চাপা দেবার ব্যবস্থা করুন। আগে টেম্পারেচার কমাতে হবে।

ফ্রিজে বরফ ছিল না। তারা দু'জন ধরাধরি করে নীলুকে বাথরুমে নিয়ে ঝরনার কল
খুলে দিল। পানির ধারার স্রোতে যদি গায়ের তাপ কমানো যায়।

নীলু পড়ে আছে মরার মতো। তার চোখ রক্তবর্ণ। সে কিছুক্ষণ পরপরই মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে এবং ফিসফিস করে বলছে, স্যারের বড় বিপদ। তুমি কি তাকে দেখবে না ? এইটুকু কি তুমি আমার জন্য করবে না ?

জাহিদ সাহেব ডাক্তারকে বললেন, এইসব কী বলছে ডাক্তার সাহেব ?

প্রলাপ বকছে। ডেলিরিয়াম। আপনি মেয়ের কাছে থাকুন, আমি এ্যাম্বুলেন্সের জন্যে যাচ্ছি। টেলিফোন আছে তো ?

জি আছে। বসার ঘরে।

ডাক্তার সাহেব দ্রুত নিচে নেমে গেলেন। নীলু কাতর স্বরে বলল, বাবা, তুমি খানিকক্ষণ আমাকে একা থাকতে দাও। আমি ওর সঙ্গে কথা বলি।

কার সঙ্গে কথা বলবি ?

যে আমার সঙ্গে থাকে, তার সঙ্গে। ওর সাহায্য আমার ভীষণ দরকার। বাবা প্রিজ। প্রিজ। তুমি আছ বলে সে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারছে না। বাবা, আমি তোমার পায়ে পড়ি।

নীলু সত্যি সত্যি হাত বাড়িয়ে বাবার পা স্পর্শ করল। জাহিদ সাহেব বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই চাঁপা ফুলের তীব্র সুবাস পেলেন।

স্পষ্ট শুনলেন নূপুর পায়ে কে যেন হাঁটছে। নীলুর কথাও শোনা যাচ্ছে, আমার এত বড় বিপদে তুমি আমাকে দেখবে না ?

অপরিচিত একটি কণ্ঠ শোনা গেল। জাহিদ সাহেব কিছু বুঝতে পাবলেন না। তিনি এক মনে আয়াতুল কুরসি পড়তে লাগলেন।

২৪

বুধবার মধ্যরাত্রি।

মিসির আলির রুটিনের ঝামেলা শুরু হয়ে গেছে। ঘরে বান্ধা হয় নি। তাঁকে রাতে হোটেলে খেয়ে আসতে হয়েছে। ডাল-গোশত নামের যে খাদ্যটি তিনি কিছুক্ষণ আগে গলাধঃকরণ করেছেন, তা এখন জানান দিচ্ছে। মিসির আলি পেটে ব্যথা নিয়ে জেগে আছেন। ফুড পয়জানিং-এর লক্ষণ কি না কেন জানে ? পেটের ব্যথা ভুলে থাকবার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে থ্রিলার জাতীয় কোনো রচনায় মনোনিবেশ করা। কিন্তু ঘরে এ জাতীয় কোনো বই নেই। তবু মিসির আলি বুক সেলফের কাছে গেলেন। সবই একাডেমিক বই। একটি সায়েন্স ফিকশন পাওয়া গেল— Horseman from the sky তেমন কোনো ইন্টারেস্টিং বই নয়। আগে একবার পড়েছেন। তবুও সেই বই হাতে নিয়েই বিছানায় গেলেন এবং তখন ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। বৃষ্টি ও বাতাস দুই-ই থেমে গেছে, তবুও। মাঝরাতে লোডশেডিং হবার কথা নয়, কিন্তু ঢাকা শহরের ইলেকট্রিসিটির কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।

মিসির আলি অত্যন্ত বিরক্ত মুখে ড্রয়ার খুললেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, ড্রয়ারে বড় বড় দু'টি মোমবাতি পাওয়া গেল। হানিফা নিশ্চয়ই এক সময় কিনে রেখে দিয়েছে। মিসির

আলি মোমবাতি জ্বালিয়ে বই খুললেন। দ্বিতীয়বার পড়বার সময় বইটি অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি শারীরিক ব্যথা ভুলে আগ্রহ নিয়ে বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলেন। চমৎকার লেখা— এক ভোরবেলায় মস্কো শহরের প্রাণকেন্দ্রে এক ঘোড়সওয়ারের আগমন হলো। লোকটির চেহারা কুৎসিত। মাথায় সার্কাসের ক্লাউনের টুপির মতো এক টুপি। সে তার ঘোড়া নিয়ে নানান খেলা দেখাতে শুরু করল। দেখতে দেখতে তাকে ঘিরে ভিড় জমে গেল।

এত মজার একটি বই আগেরবার পড়তে এত বাজে লাগছিল কেন? পাঠকের জন্ম? মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন— চা বানাবেন। চা খেতে খেতে আরাম করে পড়া যাবে। তাঁর মনে হলো মোমবাতির আলোয় বই পড়ায় আলাদা একটা আনন্দ আছে। আধো আলো আধো ছায়া। বইয়ের জগতটিও তো তাই— অন্ধকার এবং আলোর মিশ্রণ। লেখকের কল্পনা হচ্ছে আলো, পাঠকের বিভ্রান্তি হচ্ছে অন্ধকার। নিজের তৈরি উপমা নিজের কাছেই চমৎকার লাগল তাঁর। তিনি নিজেকে বাহবা দিয়ে সিগারেটের জন্যে পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিতেই দরজায় খুব হালকাভাবে কে যেন কড়া নাড়ল।

মিসির আলি ঘড়ি দেখলেন, রাত প্রায় একটা। এত রাতে কে আসবে তাঁর কাছে। তিনি বিস্মিত স্বরে বললেন, কে, কে?

কোনো জবাব পাওয়া গেল না। মিসির আলি গলা উঁচিয়ে বললেন, কে ওখানে?
আমি।

মিসির আলির বিশ্বয়েব সীমা বইল না। নীলুর গলা। সে এত রাতে এখানে কী কবছে? পাগল নাকি?

কী ব্যাপার নীলু?

নীলু জবাব দিল না। ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। মিসির আলি ছুটে গিয়ে দরজা খুললেন। নীলু নয়, ফিরোজ দাঁড়িয়ে আছে।

ফিরোজের দু'টি হাত পেছন দিকে। সে-হাতে সে কী ধবে আছে তা মিসির আলির বুঝতে অসুবিধা হলো না। তাঁর শিরদাঁড়া দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। তিনি হাসতে চেষ্টা করলেন।

কেমন আছ ফিরোজ? নীলুর গলা তো চমৎকার ইমিটেট করলে। এসো, ভেতরে এসো। ইস, ভিজে গেছ দেখি।

ফিরোজ ভেতরে ঢুকল। পলকের জন্যে মিসির আলির ইচ্ছা করল ছুটে পালিয়ে যেতে। কিন্তু তিনি পারলেন না। তাঁর পা পাথরের মতো ভারি হয়ে গেছে। অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলাব চেষ্টা করলেন।

কিছু খাবে ফিরোজ? চা খাবে? ঠাণ্ডায় চা-টা ভালো লাগবে। ইনফ্যান্ট আমি চা বানানোর জন্যেই উঠেছিলাম।

ফিরোজ দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝখানে। সে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে। সে মাঝে মাঝে ঠোঁট টিপে হাসছে।

মিসির আলি বললেন, বসো ফিরোজ, দাঁড়িয়ে আছ কেন? এতক্ষণ শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলাম। একটা সায়েন্স ফিকশন। তুমি কি সায়েন্স ফিকশন পড়?

ফিরোজ এবার শব্দ করে হাসল। মিসির আলি শিউরে উঠলেন। কী অমানুষিক হাসি! এই হাসির জন্য পৃথিবীতে নয়, অন্য কোনো ভুবনে। অচেনা ভয়ঙ্কর এক ভুবন, যার কোনো রহস্যই মিসির আলির জানা নেই। মিসির আলির সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেল। তিনি বহু কষ্টে বললেন, তুমি কি আমাকে মেরে ফেলবে ফিরোজ ?

হ্যাঁ।

কেন ফিরোজ ? আমি কি তোমার ক্ষতি করেছি ?

ফিরোজ তার জবাব দিল না। লোহার রডটি উঁচু করল। মিসির আলি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। চিৎকার দিতে ইচ্ছে করল, চিৎকার দিতে পারলেন না। তাঁর কাছে শুধু মনে হলো, মোমবাতির আলো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠছে এবং আশ্চর্যের ব্যাপার— ছেলেবেলার একটি স্মৃতি তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমের এক দুপুরে তিনি কাঁপিয়ে পড়েছেন ব্রহ্মপুত্রের শীতল জলে। ঠাণ্ডা ও ভারি সেই পানি। মাছের চোখের মতো সেই স্বচ্ছ জলে ইচ্ছে করে তলিয়ে যেতে।

মৃত্যুর আগে গত জীবন চোখের সামনে একবার হলেও ভেসে ওঠে, এটা কি সত্য ? হয়তো সত্য। নয়তো হঠাৎ করে ভুলে যাওয়া শৈশবের এই ছবি চোখে ভাসবে কেন ?

মিসির আলি কিছু-একটা বলতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু বলতে পারলেন না। তার আগেই লোহার রড প্রচণ্ড বেগে নেমে এলো তাঁর দিকে। চারদিকে সীমাহীন অন্ধকার। তীব্র ও তীক্ষ্ণ ব্যথা। এক গভীর শূন্যতা। মিসির আলি বুঝতে পারছেন, তিনি তলিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর চারদিকে সীমাহীন জলরাশি। তিনি কিছু বলতে চেষ্টা করলেন— বলতে পারলেন না।

মিসির আলি। মিসির আলি। তাকাও তুমি। তাকিয়ে দেখ।

মিসির আলি চোখ মেললেন। মোমবাতি জ্বলছে। আলো এবং আঁধার। তিনি কি বেঁচে আছেন ? নাকি এটা মৃত্যুর পরের কোনো জগৎ ? কোনো অদেখা ভুবন ?

মিসির। মিসির।

কে কথা বলে ? কোথেকে আসছে কিন্নর কণ্ঠ। খাড় ঘুরিয়ে কিছু দেখার উপায় নেই। সমস্ত শরীর অসহ্য ব্যথায় কঁকড়ে যাচ্ছে। নিঃশ্বাস নিতে এত কষ্ট। এত কষ্টও আছে পৃথিবীতে ? কোথায়, ফিরোজ কোথায় ?

মিসির। মিসির আলি। আর কোনো ভয় নেই। সে পালিয়ে গেছে। আমি এসেছি। তাকাও। তাকাও আমার দিকে।

কে পালিয়ে গেছে ? কে কথা বলছে ? কার দিকে তাকাতে বলছে ? মিসির আলি তাকাতে গিয়ে ব্যথায় নীল হয়ে গেলেন। মুখ ভর্তি করে বমি করলেন। টকটকে লাল রক্ত এসেছে বমিতে। ফুসফুস ফুটো হয়েছে। পাঁজরের হাড় ঢুকে গেছে ফুসফুসে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে এই কারণে।

মিসির আলির চোখে জল এসে গেল। এত কষ্ট, এত কষ্ট!

মিসির, মিসির।

কে তুমি ?

তাকিয়ে দেখ ।

মিসির আলি তাকালেন । যন্ত্রণা এবং ব্যথার জন্যেই কি তিনি এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখছেন ? হেলুসিনেশন ? হেলুসিনেশন ।

মিসির আলি, আমি কে বলো তো ।

জানি না কে ।

ভালো করে দেখ, ভালো করে দেখ । চোখ নামিয়ে নিচ্ছ কেন ? আমার সঙ্গে কথা বলতে থাক, তাতে ব্যথা ভুলে থাকবে । বলো আমি কে ?

মিসির আলি আবার মুখ ভর্তি করে বমি করলেন ।

আমিই সেই দেবী । তুমি তো আমাকে বিশ্বাস কর না । নাকি এখন করছ ?

তুমি আমার কল্পনা । উইশফুল থিংকিং । দেবী আবার কী ?

আমিই কিন্তু তোমাকে বাঁচিয়েছি ।

দেবীমূর্তি খিলখিল করে হেসে উঠল । কী চমৎকার হাসি ! কী অপূর্ব সুরধ্বনি ! ঘরে চাপা ফুলের গন্ধ, তীব্র সৌরভ । হেলুসিনেশন । হেলুসিনেশন হচ্ছে । হেলুসিনেশন ছাড়া এ আর কিছুই নয় ।

দেবী হাসল । চাপা ফুলের গন্ধ কি দেবীর গা থেকেই আসছে ? তাকে রক্তমাংসের মানবীর মতোই লাগছে । ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে । কিন্তু কী কষ্ট ! কী কষ্ট ! মিসির আলি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, দেবী, আমার কষ্ট কমিয়ে দাও ।

আমাকে বিশ্বাস করছ তাহলে ?

না ।

কেন করছ না ? এ জগতের সমস্তই কি যুক্তিগ্রাহ্য ? এই আকাশ, অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জ ? তুমি কি বলতে চাও, এর কোথাও কোনো রহস্য নেই ? অসীম কী ? এই সামান্য প্রশ্নেব জবাব কি তোমার জানা আছে ? বলো তুমি জানো ?

আজ জানি না, কিন্তু একদিন জানব । আমি না জানলেও আমার পরবর্তী বংশধর জানবে ।

মিসির আলি, তুমি বড় অদ্ভুত লোক ।

মিসির আলি কাতর কণ্ঠে বললেন, আমাব ব্যথা কমিয়ে দাও । আমার ব্যথা কমিয়ে দাও ।

দেবী হেসে উঠল । মৃদু স্বরে বলল, আমায় বিশ্বাস করছ না, অথচ ব্যথা কমিয়ে দিতে বলছ ?

বড় কষ্ট, বড় কষ্ট !

তোমার বন্ধু চলে আসছে । তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে । তুমি আবার সুস্থ হয়ে উঠবে । এবং মজার ব্যাপার কি জানো ? নীলুর সঙ্গে বিয়ে হবে তোমার । যদি কোনোদিন হয়, আমার কথা মনে করো ।

মিসির আলি আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে লাগলেন। তিনি দেবীর কথা এখনো শুনতে পাচ্ছেন। কী অপূর্ব কণ্ঠ! কী অলৌকিক সৌন্দর্য! কিন্তু এ সবই মায়া। অসুস্থ ব্যাথা-জর্জরিত মনের সুখ-কল্পনা। প্রকৃতি চাচ্ছে নারকীয় কষ্ট থেকে তাঁর মন ফিরিয়ে নিতে। সে-জন্যেই সুখের স্বপ্ন দেখিয়ে তাঁকে ভোলাচ্ছে। হয়তো নীলুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে। তাতে কিছুই প্রমাণিত হয় না। প্রমাণ বড় কঠিন জিনিস। বড় কঠিন।

মিসির আলি কাতর কণ্ঠে বললেন, কষ্ট কমিয়ে দাও। কষ্ট কমিয়ে দাও।

অপরূপা নারীমূর্তি চাঁপা ফুলের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে দূরে সরে যাচ্ছে। তার পায়ে ঝুমঝুম করছে নূপুর। কে যেন দরজা ধাক্কা দিচ্ছে। কে সে? সাজ্জাদ হোসেন? ওরা কি ধরে ফেলেছে ফিরোজকে? ওকে সুস্থ করে তুলতে হবে। ইসিটি দিয়ে দেখলে হয়। কিংবা কে জানে হয়তো এখন সে সুস্থ। তাঁকে একবার আঘাত করেই তার চেতনা ফিরে এসেছে।

হানিফা। হানিফা কেমন আছে? কোথায় আছে? সুখে আছে তো?

আহ্ বড় কষ্ট! কেউ আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। ঘুম পাড়িয়ে দাও। আমি তলিয়ে যেতে চাই অতল অন্ধকাবে। বড় কষ্ট, বড় কষ্ট।

সাজ্জাদ হোসেন দরজা ঠেলে ভেতবে ঢুকলেন। টর্চের আলো ফেললেন মিসির আলির মুখে। সাজ্জাদ হোসেনের মুখে এক ধরনের প্রশান্তি লক্ষ করা গেল। কারণ, নগ্নগাত্র আগন্তুককে কিছুক্ষণ আগেই ধবা হয়েছে। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, পুলিশকে সে প্রথম যে কথাগুলি বলে তা হচ্ছে, আপনারা স্যারকে বাঁচানোর চেষ্টা করুন। এক্ষুণি হাসপাতালে নিয়ে যান। আর আমার বাবাকে টেলিফোন করে বলুন, আমি ভালো হয়ে গেছি। স্যারের বাসায় একজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে আমাকে ভালো করে দিয়েছে।

গল্পের অধিকাংশ চরিত্রই কাল্পনিক। পর্বিচিত কিছু চরিত্র এবং কিছু ঘটনা ব্যবহার কবেছি। তবে কাউকে হয় করবাব জন্যে করা হয় নি। মানুষের প্রতি আমার মমতা মিসির আলির মতো হয়তো নয়, কিন্তু খুব কমও নয়।



আয়নাঘর

লিলিয়ান এক টুকরা মাছ ভাজা মুখে দিয়ে হাসিমুখে বলল, 'ইহা খেতে বড় সৌন্দর্য হয়। তাহের হো-হো করে হেসে ফেলল। লিলিয়ান ইংরেজিতে বলল, আমার ধারণা আমি ভুল বাংলা বলি নি। হাসছ কেন ?

তাহের হাসি থামাল না। তার হাসিরোগ আছে। একবার হাসতে শুরু করলে সহজে থামতে পারে না। লিলিয়ান আহত গলায় ইংরেজিতে বলল, আমার বাংলা শেখার বয়স মাত্র ছ'মাস। যা শিখেছি নিজের চেষ্টায় শিখেছি। এ ব্যাপারে তুমি আমাকে কোনো সাহায্য করছ না। বরং উল্টোটা করছ। যখনই বাংলা বলার চেষ্টা করছি তুমি হাসছ। এটা কি ঠিক ?

তাহের বলল, অবশ্যই ঠিক। একশ' ভাগ ঠিক। আমরা বাঙালিরা বিদেশীদের মুখে ভুল বাংলা সহ্য করি না। যতবার তুমি ভুল বাংলা বলবে ততবার আমি হাসব। মাছ ভাজা মুখে দিয়ে বললে, 'ইহা বড় সৌন্দর্য হয়'। মাছ ভাজার মধ্যে আবার সৌন্দর্য কী ? এটা পিকাসোর ছবি না, আবার রবীন্দ্রনাথের কবিতাও না। মাছ ভাজা হলো মাছ ভাজা। বুঝলে ?

না, বুঝলাম না। মাছ ভাজা খেতে ভালো লাগলে আমি কিছুই বলব না ?

বলবে— খেতে মজা হয়েছে, কিংবা বলবে— ভালো হয়েছে। খেতে সৌন্দর্য হয়েছে আবার কী ? 'সুন্দর' আমরা খাই না। চাঁদেব আলো খুব সুন্দর, তাই বলে চাঁদের আলো কি কেউ খায় ?

তাহের আবার হেসে উঠল। লিলিয়ান তাহেরের উপর রাগ করার চেষ্টা করছে, পারছে না। কখনো পাবে না। তার মনে হয় না কখনো পারবে। লিলিয়ানের বয়স তেইশ। নেপলস-এর মেয়ে। তাহেরের সঙ্গে তার পরিচয় হয় ইয়েলো স্টোন পার্কে। পরিচয়-পর্ব বেশ মজার। লিলিয়ান ত্রিশ ডলারের টিকিট কেটে একটা ট্যুর গ্রুপের সঙ্গে এসেছে। এই প্রথম শহর ছেড়ে বাইরে আসা, যা দেখছে তাই তার ভালো লাগছে। সে মুগ্ধ হয়ে একের পর এক ছবি তুলে যাচ্ছে— তখন সে লক্ষ করল, কালো, লম্বামতো ঝাঁকড়া চুলের একটি ছেলে তাব দিকে তাকিয়ে হো-হো করে হাসছে। রূপবতী মেয়েদের আশেপাশে যে-সব ছেলেরা থাকে তারা তাদের অজান্তেই অনেক অদ্ভুত আচরণ করে, কিন্তু এরকম অশালীন ভঙ্গিতে দাঁত বের করে কখনো হাসে না। লিলিয়ান ব্যাপারটা অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করল। কিন্তু অগ্রাহ্য করা যাচ্ছে না। যতবারই সে ছবি তুলছে ততবারই মানুষটা মুখের সব ক'টা দাঁত বের করে হাসছে। যেন লিলিয়ান তেইশ বছর বয়েসী ঝকঝকে চেহারার তরুণী নয়, যেন সে মহিলা চার্লি চ্যাপলিন। তার প্রতিটি ক্রিয়াকলাপে হাসতে হবে। লিলিয়ান এগিয়ে গেল। বরফ শীতল গলায় বলল, আপনি হাসছেন কেন জানতে পারি ?

লিলিয়ানের শীতল গলা শুনে যে-কোনো পুরুষ ঘাবড়ে যেত। এ ঘাবড়াল না। লোকটি হাসিমুখে বলল, অবশ্যই জানতে পারেন। আপনার ছবি তোলা শেষ হোক, তারপর বলব।

এখন বলতে অসুবিধা আছে ?

হ্যাঁ অসুবিধা আছে, অবশ্যই অসুবিধা আছে।

আমার ছবি তোলা শেষ হয়েছে, আপনি বলুন কেন হাসছেন ?

আপনি আপনার ক্যামেরার মুখ থেকে ক্যাপ সরান নি। মুখে ক্যাপ লাগিয়ে ছবি তুলছিলেন। এই জন্য হাসছিলাম।

না হেসে আপনি যদি আমাকে বলতেন— ‘ক্যামেরার মুখের ক্যাপ সরানো হয় নি’— সেটাই কি শোভন হতো না ?

হ্যাঁ হতো।

বলতে বলতে তাহের আগের চেয়েও শব্দ করে হেসে উঠল। লিলিয়ান সরে এলো। সে জীবনে এত অপদস্ত হয় নি। তার রীতিমতো কান্না পাচ্ছে। ইচ্ছা করছে ক্যামেরাটা ‘ওল্ড ফেইথফুলে’র পানিতে ছুড়ে ফেলতে। সাধারণ শিষ্টতা, সাধারণ ভদ্রতা কি তরুণী মেয়েরা পুরুষদের কাছ থেকে আশা করতে পারে না ? লিলিয়ানের ইচ্ছা কবছে খুব কঠিন কঠিন কথা মানুষটাকে শুনাতে। তা সে পারবে না। খুব রেগে গেলে সে গুছিয়ে কোনো কথা বলতে পারে না। সবচে’ ভালো হয় লিলিয়ান যদি তার হোটেল ফিরে যেতে পারে। তা সম্ভব হবে না। সে যে গাইডেড ট্যারে এসেছে তাদের মাইক্রোবাস ছাড়বে সন্ধ্যা মেলাবার পর। ইচ্ছা না করলেও সন্ধ্যা পর্যন্ত তার এখানে থাকতে হবে। ঘুবেরি ঐ লোকটির সঙ্গে দেখা হবে। সেও নিশ্চয়ই সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকবে। লিলিয়ানকে দেখামাত্র দাঁত বের করে হাসবে। কত বিচিত্র মানুষই না পৃথিবীতে আছে।

লিলিয়ান লক্ষ করল, লোকটা তার দিকে আসছে। হাসিমুখেই আসছে। লিলিয়ানের চোখমুখ শক্ত হয়ে গেল। মুখে থুথু জমতে শুরু করল। মানুষটাকে কোনো কঠিন গাল দিতে পারলে মন শান্ত হতো। লিলিয়ান জানে, তা সে পাবে না। সবাই সব কিছু পাবে না। লিলিয়ান কাউকে কড়া কথা বলতে পারে না।

আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবার জন্য এসেছি।

লিলিয়ান স্থির চোখে তাকাল, কিছু বলল না। লোকটা নরম গলায় বলল, আমি যখন প্রথম এ দেশে আসি, তখন একটা সস্তা ধরনের ক্যামেরা কিনে খুব ছবি তুলেছিলাম। যা দেখেছি মুগ্ধ হয়ে তারই ছবি তুলেছি। মজার ব্যাপার হলো, সব ছবি তুলেছি ক্যামেরার ক্যাপ লাগিয়ে। আপনাকে দেখে পুরনো স্মৃতি মনে পড়ল। আপনি কি আমেরিকায় নতুন এসেছেন ?

না।

ও আচ্ছা, তাহলে ক্যামেরা নতুন কিনেছেন। এ ধরনের ক্যামেরায় এই অসুবিধা হয়েই। সুন্দর দৃশ্য দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়বেন। ক্যামেরার ক্যাপ না খুলেই ছবি তুলবেন। আপনার যা করা উচিত তা হচ্ছে— Single Lens Reflex ক্যামেরা কেনা। এর বলে SLR।

আপনার অযাচিত উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। আমাকে দয়া করে একা থাকতে দিন।
আমি কি আপনাকে বিরক্ত করছি ?

হ্যাঁ করছেন।

লোকটা চলে গেল, কিন্তু লিলিয়ানের মনে হলো সে আবার আসবে। সহজে তার সঙ্গ ছাড়বে না। এশিয়ান ছেলেগুলি মোটামুটি নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে। সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার সামান্যতম সুযোগও এরা ছাড়ে না। এও ছাড়বে না। চেষ্টা চালিয়েই যাবে। লোকটার সঙ্গে কথা বলাই উচিত হয় নি।

লিলিয়ানের অনুমান মিথ্যা হলো না। বিকেলে লিলিয়ানদের দলের সবাই বসে কফি খাচ্ছে। ছেলেটি উপস্থিত। লিলিয়ানের কাছে গিয়ে হাসিমুখে বলল, আমি আপনার জন্য একটা ফিল্ম কিনে এনেছি।

লিলিয়ান কঠিন মুখে বলল, কেন ?

আমার কারণে আপনার ফিল্ম নষ্ট হয়েছে। আমি প্রথম থেকেই লক্ষ করেছিলাম। আমার উচিত ছিল আপনাকে সতর্ক করা, তা করি নি, উল্টা মজা পেয়ে হেসেছি। অবশ্যই অপরাধ করেছি, কাজেই অপবাদের প্রায়শ্চিত্ত করছি।

লিলিয়ান কঠিন মুখে বলল, অপরাধ-টপরাধ কিছু না। আপনি আমার সঙ্গে গল্প করার লোভ সামলাতে পারছেন না। সুন্দর অজুহাত বানিয়ে এগিয়ে এসেছেন।

আপনি ভুল বললেন। নিজেই খুব রূপবতী ভাবছেন বলে এই সমস্যা হয়েছে। আপনি হয়তো আপনার দেশে, কিংবা খোদ এই আমেরিকাতেই রূপবতী। কিন্তু আমাদের দেশের রূপের বিচাবে রূপবতী নন।

আপনাদের দেশে রূপবতী হবার জন্য কি গায়েন রঙ আপনার মতো কুচকুচে কালো হতে হয় ?

তা না। আমাদের দেশে রূপবতী মেয়েদের প্রথম শর্ত হলো— তাদের চোখ সুন্দর হতে হয়।

আমার চোখ সুন্দর না ?

না। আপনার চোখে মণি নীল। আমাদের দেশে বাদামি বা নীল চোখের তারার মেয়েদের বলে বিড়াল-চোখা মেয়ে। এদের সহজে বর জুটে না। পুরুষরা এদের বিয়ে করতে চায় না।

কী অদ্ভুত কথা! আপনি কোন দেশের মানুষ ?

দেশের নাম আপনাকে বর্ণাচ্ছি, কিন্তু দয়া করে দেশের নাম শুনে ঠোট উল্টে বলবেন না— এই দেশ আবার কোথায় ? এ জাতীয় কথা যখন কেউ বলে অসম্ভব রাগ লাগে। আমার দেশের নাম ‘বাংলাদেশ’। নাম শুনেছেন ?

না।

নাম না শোনার অপরাধ আমি ক্ষমা করলাম, যদিও ক্ষমা করা উচিত হচ্ছে না। খাই হোক, আমি কি আপনার পাশে বসতে পারি ?

বিড়াল-চোখা মেয়ের পাশে বসে কী করবেন ?

আপনার সঙ্গে এক কাপ কফি খাব, তারপর চলে যাব।

বসুন।

আপনার নাম কি জানতে পারি ?

লিলিয়ান গ্রে।

আমার নিজের নামটা কি আপনাকে বলতে পারি ?

লিলিয়ান চুপ করে রইল। মানুষটার সাহস দেখে সে বিস্মিত হচ্ছে। লোকটা হাসিমুখে বলল, আমার নাম তাহের। আপনি যেমন লিলিয়ান গ্রে, তেমনি গায়ের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে আমাকে তাহের ব্ল্যাক বলে ডাকা যায়। আমি সম্প্রতি আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক্তারি পাস করেছি। আমার ফিল্ড অব স্পেশালাইজেশন হচ্ছে— চোখ। আমি ডাক্তারি পড়ছি, ভবিষ্যতে চোখের ডাক্তার হবো।

ভালো।

চোখের ডাক্তার হিসেবে আপনার নীল চোখ সম্পর্কে আমি আপনাকে মজার একটা তথ্য দিতে পারি। তথ্যটা হচ্ছে— বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আপনার চোখ কিন্তু কালো হতে থাকবে, নীল থাকবে না।

কেন ?

চোখের পিগমেন্টগুলি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বড় হতে থাকে। চোখের বঙ নির্ভর করে পিগমেন্টের সাইজের ওপর। সাইজ বড় হলে রঙ কালো হয়ে যাবে। এক ধরনের Tyndall effect.

কখন চোখ কালো হবে ?

যখন বুড়ো হবেন তখন।

আপনি বলতে চাচ্ছেন বৃদ্ধ বয়সে আমি যদি আপনার দেশে যাই তাহলে আমাকে সবাই রূপবতী বলবে ?

তাহের হো-হো করে হাসতে লাগল। এমন হাসি যে লিলিয়ানদের দলের সবাই চোখ ঘুরিয়ে তাকাল। লিলিয়ান নিজেও খানিকটা অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগল। হাসতে হাসতে তাহেরের চোখে পানি এসে গেল। সে রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল, সরি। আমি একটু বেশি হাসি। আমার হাসি-রোগ আছে। একবার হাসতে শুরু করলে থামতে পারি না। পুরো এক ঘণ্টা তেইশ মিনিট ক্রমাগত হাসার আমার একটা ব্যক্তিগত রেকর্ড আছে। গিনিস রেকর্ড কত তা অবশ্য জানি না।

হাসি-রোগ ছাড়া আর কী রোগ আছে ?

ঘুম-রোগ আছে।

ঘুম-রোগটা কী ?

একবার ঘুমিয়ে পড়লে সহজে আমার ঘুম ভাঙে না।

খুব আনকমন রোগ কিন্তু না। অনেকেরই এই রোগ আছে।

আমারটা আনকমন। উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন। দু'বছর আগে আমি লস এনজেলসে ছিলাম। হোস্টেলে থাকি। একবার ভূমিকম্প হলো। ভূমিকম্পের নিয়ম হচ্ছে প্রথম একটা ছোট্ট দুলুনি হয়— তারপর হয় বড় দুলুনি। প্রথম দুলুনির পর আমার বন্ধু-বান্ধবরা আমার ঘুম ভাঙানোর প্রাণপণ চেষ্টা করল। কোনো লাভ হলো না। শেষে ওরা আমাকে চ্যাংদোলা করে বাইরে নিয়ে ফুটপাথে শুইয়ে রাখল। আমার ঘুম ভেঙেছে ভোরে, জেগে দেখি আমি একটা হাইড্রেন্টের পাশে শুয়ে আছি।

লিলিয়ান খিলখিল করে হেসে উঠল। লিলিয়ানের সঙ্গীরা আবারো ফিরে তাকাল। তাহের বলল, আমরা বোধহয় ওদের ডিস্টার্ব করছি, একটু দূরে গেলে কেমন হয় ?

ভালো হয় না। আমাদের যাত্রার সময় হয়ে গেছে। আমি এখন উঠব।

আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। আমি আপনাকে পৌঁছে দিতে পারি।

ধন্যবাদ। অপরিচিত কারো গাড়িতে আমি চড়ি না।

শুরুতে অপরিচিত ছিলাম। এখন নিশ্চয়ই অপরিচিত না। আপনি আমার নাম জানেন। আমি আপনার নাম জানি।

লিলিয়ান কঠিন মুখে বলল, আপনি শুধু শুধু আমার সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করছেন। আপনার গাড়িতে আমি যাব না।

লিলিয়ান তার সঙ্গীদের দিকে রওনা হলো। একবার তার ইচ্ছা করল পেছন ফিরে মানুষটির মুখের বিবর্ত ভঙ্গিটা দেখে। অনেক কষ্টে এই লোভ সে সামলাল। মনে মনে ভাবল— ভালো শিক্ষা হয়েছে। কাউকে শিক্ষা দেবার এটাই সবচে' ভালো টেকনিক। প্রথম কিছুটা প্রশয় দিতে হয়, তারপর ছুড়ে ফেলতে হয় আঁস্তাকুড়ে। আশ্চর্য স্পর্ধা— ফিল্ম কিনে নিয়ে এসেছে। আড়াই ডলার দামের একটা উপহাব কিনে মনে মনে ভেবেছে অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

লিলিয়ান ডরমিটরিতে থাকে না। রুমিং হাউজে থাকে। রুমিং হাউজগুলি ইউনিভার্সিটির কোনো ব্যাপার না। ব্যক্তিমালিকানায় চলে। বাড়িওয়ালারা সস্তায় ভাড়া দেয়। রুমিং হাউজে শুধু থাকার ব্যবস্থা। রান্না করার ব্যবস্থা নেই, কারণ কিচেন নেই। কমন বাথরুম। মাসে চল্লিশ ডলারে এরচে' ভালো কিছু আশা করাও অবশ্যি অন্যায়। এরচে' বেশি খরচ করে ডরমিটরিতে জায়গা নেয়া লিলিয়ানের সাধারণ বাইরে। পিকনিক করতে এসে পঞ্চাশ ডলার খরচ হয়ে গেছে। এই মাসটা তার কষ্টে যাবে। কয়েকটা বই কেনা দরকার। এ মাসে কেনা হবে না। ভেবেছিল মা'র জন্মদিন উপলক্ষে মাকে লংডিস্টেন্স কল করবে। তাও সম্ভব হবে না। তিন মিনিট কথা বলতেই লাগে আঠার ডলার। তাছাড়া মা'র সঙ্গে তিন মিনিট কথা বলাও যাবে না। একবার টেলিফোন হাতে পেলে তিনি ছাড়বেন না। রাজ্যের কথা বলতে থাকবেন। লিলিয়ান যদি বলে— এখন রাখি মা, বিল উঠছে। মা বলবেন— আর একটু, জরুরি কথাটাই বলা হয় নি। তোর পজার চাচা এঁদিন কী করেছে শোন। ঐ লোকটার আক্কেল বলে এক জিনিস এখনো হলো না। এদিকে তার ডেনটিস্ট বলেছে তার না-কি তিনটা আক্কেল দাঁত। এমন কথা কি শুনেছিস কখনো— তিনটা আক্কেল দাঁত ?

বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে লিলিয়ানের ঘুম এলো শেষ রাতে। ঘুম আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল। সে অপরিচিত একটা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিশাল নদী। পানিতে কানায় কানায় ভর্তি। নদী, নদীর ওপাশে বন—সব জোছনায় থৈ-থৈ করছে। হঠাৎ মাঝ নদীতে কালোমতো কী দেখা গেল। স্রোতের প্রবল টানে ভেসে যাচ্ছে। লিলিয়ান দেখতে পারছে না, তবু পরিষ্কার বুঝতে পারছে নদীর স্রোতে যে জিনিসটা ভেসে যাচ্ছে তা একটা মৃতদেহ। মৃতদেহটা লিলিয়ানের চেনা। খুব চেনা। মৃত মানুষ প্রশ্নের জবাব দেয় না। তবু লিলিয়ান চিৎকার কবে উঠল— কে কে কে ?

স্বপ্নে সবই সম্ভব। মৃতদেহ কথা বলল। অনেক কষ্টে পানির উপর উঠে বসল। ক্ষীণ গলায় বলল, লিলিয়ান আমি। ওরা আমাকে মেরে নদীতে ফেলে দিয়েছে। তুমি আমাকে বাঁচাও।

লিলিয়ান আতঙ্কে অস্থির হয়ে বলল, আমি কী করে তোমাকে বাঁচাব ? তুমি তো মরেই গেছ।

বাঁচাও লিলিয়ান, বাঁচাও। প্লিজ প্লিজ।

এই সময় নদীর স্রোত বেড়ে গেল। জলের প্রবল টান উপস্থিত হলো। শোঁ-শোঁ শব্দ হতে লাগল। মৃতদেহটি ভাটির দিকে তীব্র গতিতে ছুটে যাচ্ছে। অনেক অনেক দূর থেকে সে ডাকছে— লিলিয়ান লিলিয়ান।

লিলিয়ান নদীর পাড় ঘেঁসে ছুটতে শুরু কবেছে। খানাখন্দ ঝোপঝাড় ভেঙে সে ছুটছে। মনে হচ্ছে সে আর দৌড়াতে পারবে না। হুমড়ি খেয়ে পড়বে। মৃতদেহ এখনো তাকে ডাকছে। মৃতদেহের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ। সেই স্বর বাতাস ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। লিলিয়ানের কান পর্যন্ত পৌছাতে পারছে না।

এই অবস্থায় লিলিয়ানের ঘুম ভাঙল। তার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজ়ে গেছে। জেগে ওঠার পরেও সে অনেকক্ষণ ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপল। তার ভয়ের অনেকগুলি কারণেব একটি হচ্ছে— যে যুবকের মৃতদেহটি ভেসে যাচ্ছিল সেই যুবক তার চেনা। যুবকের নাম— তাহের। দেখা হয়েছিল ইয়েলো স্টোন পার্কে। তার গায়ে ছিল হলুদ বডেব গলাবন্ধ স্যুয়েটার। স্বপ্নেও সেই একই স্যুয়েটার ছিল, তবে তার রঙ ছিল ধূসর।

তীব্র ভয় অনেকটা যেমন হঠাৎ আসে তেমনি হঠাৎই চলে যায়। রোদ উঠার সঙ্গে সঙ্গে লিলিয়ানের ভয় কেটে গেল। শুধু যে ভয় কাটল তাই না, হাসিও পেতে লাগল। তার মনে হলো সে এমন কিছু ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখে নি। নদী দেখেছে। নদী কোনো ভয়ঙ্কর জিনিস নয়। নদী দেখার কারণও আছে। আগের দিন পুরো সময়টা কাটিয়েছে ওল্ড ফেইথফুল হ্রদের তীরে। তাহের নামের ছেলেটিকে জড়িয়ে স্বপ্ন দেখেছে— সেটাও স্বাভাবিক। তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। সাক্ষাৎ-পর্বও খুব সুখকর ছিল না। মস্তিষ্ক এই ব্যাপারগুলিই তার নিজের মতো করে সাজিয়েছে। লিলিয়ানের পরিষ্কার মনে আছে— ছোটবেলায় সে যার সঙ্গেই ঝগড়া করত রাতে তাকেই স্বপ্নে দেখত। সেই স্বপ্নগুলিও হতো ভয়ঙ্কর।

লিলিয়ান ঠিক করল আজ ইউনিভার্সিটিতে যাবে না। আজ একটামাত্র ক্লাস। এই ক্লাস এমন জরুরি নয়। না করলে ক্ষতি হবে না। তারচে' বরং ক্যান্টিনে যাওয়া যাক। কোনো কাজ পাওয়া যায় কি-না সেই চেষ্টা করা যেতে পারে। চার-পাঁচ ঘণ্টা কাজ করতে পারলে— ইয়েলো স্টোন পার্কের খরচ কিছুটা উঠে আসবে।

ক্যান্টিনে কোনো কাজ পাওয়া গেল না। সে সুইমিং পুলের দিকে গেল। অকারণে যাওয়া। সাতার কাটতে হলে টিকিট লাগবে। তার টিকিট কাটার মতো ডলার নেই। কী অভূত দেশ এই আমেরিকা! কারো মুখে ডলার ছাড়া অন্য শব্দ নেই।

লিলিয়ান বেশ অনেকক্ষণ সুইমিং পুলে সাতার কাটা দেখল। তার কাছে সব সময় মনে হয় পৃথিবীর সবচে' সুন্দর দৃশ্যের একটি হচ্ছে— মানুষের সাতারের দৃশ্য। মানুষ যদি উড়তে পাবত তাহলে সেই দৃশ্য নিশ্চয়ই খুব সুন্দর হতো।

লিলিয়ান স্যান্ডউইচ কিনে ইউনিভার্সিটি বোটানিক্যাল গার্ডেনের দিকে গেল। লাঞ্চ খাওয়ার জন্য তার এখানে একটি প্রিয় জায়গা আছে। মেপল গাছের নিচের বাঁধানো বেদি। গাছের পাতা হলুদ হতে শুরু করেছে। কী সুন্দর লাগছে গাছটাকে! সে একা একা সন্ধ্যা পর্যন্ত গাছের নিচে বসে রইল। আরো কিছুক্ষণ বসত। শীত শীত করছে। স্যুয়েটারে শীত মানছে না। তাছাড়া ঘুমও পাচ্ছে। পড়াশোনা করা দরকার। মনে হচ্ছে আজ পড়া হবে না। সকাল সকাল শুয়ে পড়তে হবে।

আশ্চর্য ব্যাপার, আজ রাতেও লিলিয়ানের ঘুম হলো না। শেষ রাতের দিকে তন্দ্রামতো হলো। তন্দ্রায় দেখল দুঃস্বপ্ন। আগের রাতের স্বপ্নটাই অন্যভাবে দেখা। সে এবং তাহের দৌড়াচ্ছে। প্রাণপণে ছুটেছে। তাদের তাড়া করছে ভয়ঙ্কর কিছু মানুষ। তাহের বলছে, লিলিয়ান আমাব হাত ধব। আমি দৌড়াতে পারছি না। প্রিজ, আমাব হাত ধব। প্রিজ।

লিলিয়ান চিৎকার কবে জেগে উঠল। নিজেকে শান্ত করতে তার সময় লাগল। হিটিং কয়েল দিয়ে গরম এক কাপ কফি খেয়ে মাকে চিঠি লিখতে বসল।

মা,

আমার কী জানি হয়েছে— দুঃস্বপ্ন দেখছি। ভয়ঙ্কর সব দুঃস্বপ্ন। আমার রাতে ঘুম হচ্ছে না। তুমি চার্চে গিয়ে আমার নামে দু'টা বাতি জ্বালিও...

এই পর্যন্ত লিখেই লিলিয়ান চিঠি ছিঁড়ে ফেলল। এ ধরনের চিঠি মাকে দেয়ার কোনো মানে হয় না। তিনি শুধু শুধু দুশ্চিন্তায় পড়বেন। তাঁর হাঁপানির টান উঠে যাবে। সে নতুন একটি চিঠি লিখল। সেখানে খুব সুন্দর করে লেখা হলো— ইয়েলো স্টোন পার্কে বেড়াতে যাবার বর্ণনা। ইউনিভার্সিটি সুইমিং পুলে সাতাবের আনন্দ বিবরণ।

ভোর সাতটায় সে তৈরি হলো ইউনিভার্সিটিতে যাবার জন্য। আয়নায় একবার নিজেকে দেখল। দু'রাত ঘুম হয় নি। কিন্তু চেহারায় ক্লান্তির কোনো ছাপ নেই। তার নিজের কাছে মনে হলো আজ তার চোখ অন্যদিনের চেয়েও অনেক উজ্জ্বল।

আজ লাঞ্চ আওয়ারের আগে কোনো ক্লাস নেই। কিন্তু টার্ম পেপার জমা দিতে

হবে—লাইব্রেরিতে বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবে। বিরক্তিকর কাজগুলির মধ্যে একটি। যে বইটি তার প্রয়োজন দেখা যাবে সেটি ছাড়া সব বইই আছে।

একেকদিন একেকজনের ভাগ্য খুব ভালো থাকে। আজ লিলিয়ানের ভাগ্য খুবই ভালো। যে বইগুলি তার দরকার ছিল সবই সে পেয়ে গেল—বাড়তি পেল একটি মনোগ্রাফ—তার টার্ম পেপারের সঙ্গে মনোগ্রাফের কোনো বেশকম নেই। টুকে ফেললেই হয়। দু'ঘণ্টার মধ্যে টার্ম পেপার লেখা শেষ হলো। লিলিয়ান কফি হাউসে কফি খেতে গেল। ঘুমঘুম লাগছে। কফি খেয়ে ঘুম তাড়াতে হবে, নয়তো ক্লাস করা যাবে না।

কফি হাউজ ছাত্র-ছাত্রীতে ঠাসা। এখন লাঞ্চ আওয়ার। কফি শপে এত ভিড় থাকার কথা নয়। আজ এত ভিড় কেন? আজ কি সস্তায় কফি দিচ্ছে? না ফ্রি কফি দিচ্ছে? কফি হাউজ মাঝে মাঝে কিছু কায়দা করে নোটিস দিয়ে দেয়—আজ বেলা ন'টা থেকে সাড়ে ন'টা পর্যন্ত ফ্রি কফি। ব্যবসার নতুন কোনো চাল। আজও এরকম কিছু হয়েছে বোধহয়। লিলিয়ান কফির মগ হাতে জায়গা খুঁজছে তখন গুনল হাত উঁচিয়ে কে তাকে ডাকছে—হ্যালো লিলিয়ান, এদিকে এসো জায়গা আছে।

লিলিয়ান তাকিয়ে দেখে, তাহের।

সে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল—তারপর এগিয়ে গেল। তাহের হাসি মুখে বলল, এত তাড়াতাড়ি তোমার দেখা পাব ভাবি নি। তুমি কি এই ইউনিভার্সিটির ছাত্রী?

হ্যাঁ।

আমি যাক্সিলাম পাশ দিয়ে, কী মনে করে যে ঢুকেছি। তোমার সাবজেক্ট কী?
এনথ্রপলজি।

দাঁড়িয়ে আছ কেন? বসো। বসো।

লিলিয়ান বসবে কি-না বুঝতে পারছে না। তার অস্বস্তি লাগছে। মনে হচ্ছে বসা ঠিক হবে না। এই মানুষটির সঙ্গে যোগাযোগের ফল শুভ হবে না। এর কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। তাছাড়া এই লোক তার সঙ্গে এমন আন্তরিক ভঙ্গিতে কথা বলবে কেন? এই অধিকার তাকে কে দিয়েছে?

তুমি কী খাবে? কফি? কফিতে ক্রিম থাকবে—না ব্ল্যাক কফি?

আমি কিছু খাব না।

কাপাচিনো কফি খাবে? প্রচুর ফেনা থাকে, একগাদা মিষ্টি দিয়ে বানানো হয়। দারুণ মজা। তুমি বসো। আমি নিয়ে আসছি।

তাহের কফি নিয়ে ফিরে এসে দেখে লিলিয়ান শান্ত ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে বসে আছে। মেয়েটিকে তার খুব অসহায় মনে হলো। শুধু অসহায় না, ক্লান্ত বিষণ্ণ। এই বয়েসী মেয়েরা অনেক হাসিখুশি থাকে।

কফি কেমন লাগছে?

বেশি মিষ্টি।

একে ধরনের কফির একেক নিয়ম। এই কফি খেতে হয় প্রচুর মিষ্টি দিয়ে। তোমার কি মন খারাপ ?

না।

দেখে মনে হচ্ছে খুব মন খারাপ।

লিলিয়ান কিছু বলবে না ভেবেও বলে ফেলল, রাতে আমার ঘুম হয় নি।

তাহের হেসে ফেলল। শব্দময় হাসি। আশেপাশের টেবিল থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা তাকাচ্ছে। অনেকের ভুরু কুঁচকে আছে। কোনো বিদেশী তাদের দেশের কফি শপে বসে সবাইকে অগ্রাহ্য করে এমন হাসি হাসবে তা বোধহয় এদের পছন্দ নয়।

তাহের লিলিয়ানের দিকে নুঁকে এসে বলল, শোন লিলিয়ান— মাঝে মাঝে রাতে ঘুম না হওয়াই সুস্থ মানুষের লক্ষণ। শুধুমাত্র পশুদেরই রাতে ঘুমের অসুবিধা হয় না। মানুষের হয়। আমাকে দেখ— আমি বিছানায় শোয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়ি। এ জন্য নিজেকে পশু পশু লাগে। হা হা হা।

আবারো সেই হাসি। আবারো লোকজন চোখ ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে। লিলিয়ান বলল, আমি উঠব। কফির জন্য ধন্যবাদ।

আহা, বসো আর খানিকক্ষণ।

না না।

কাল তো ছুটি। এত ভাড়া কীসের ? এখান থেকে নব্বুই কিলোমিটার দূরে একটা পেট্রোলিংইড ফব্বেস্ট আছে। পুরো জঙ্গল পাথর হয়ে আছে। অর্গিম আগামীকাল যাব বলে ভাবছি। দিনে দিনে ফিরে আসা যাবে। তুমি কি আগ্রহী ?

না, আমি আগ্রহী না। আমার বেড়াতে ভালো লাগে না।

ঐদিন ইয়েলো স্টোন পার্কে কিন্তু খুব বেড়াচ্ছিলে।

ঐদিন ভালো লেগেছিল। এখন লাগবে না।

লিলিয়ান বের হচ্ছে। তাহের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। তাকে মুখের ওপর না বলা হয়েছে তবু কোনো বিকার নেই। অদ্ভুত নির্লজ্জ ধরনের ছেলে তো। সাধারণত আমেরিকান ছেলেগুলি এরকম হয়— আঠার মতো লেগে থাকে। এ তো বিদেশী এক ছেলে। তার মান-অপমান বোধ আরো খানিকটা থাকা উচিত ছিল না ?

লিলিয়ান বলল, আর আসতে হবে না। আমি যাচ্ছি।

তাহের বলল, আবার দেখা হবে। ভালো থাক— রাত জেগে জেগে তুমি যে উচ্চ শ্রেণীর মানব সন্তান তা প্রমাণ করতে থাক। হা হা হা। ভালো কথা, তুমি কি আমার টেলিফোন নাম্বার রাখবে ? রাতে দুঃস্বপ্ন দেখলে টেলিফোন করতে পার।

আমি অন্যের টেলিফোন নাম্বার রাখি না

অন্যের টেলিফোন নাম্বারই তো রাখতে হয়। নিজেরটা তো মনেই থাকে। হা হা হা।

আমি যাচ্ছি।

লিলিয়ান দ্রুত করিডোরে চলে এলো। সে এমনিতেই দ্রুত হাঁটে, আজ আরো দ্রুত হাঁটছে। মেমোরিয়েল ইউনিয়নের বাইরে এসে হাঁপ ছাড়ল। পেছনে ফিরে তাকাল। তাহেরকে দেখা যাচ্ছে না। নাছোড়বান্দা হয়ে সে যে পেছনে পেছনে আসে নি— এতেই লিলিয়ান আনন্দিত।

লিলিয়ান তার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরল না। কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে হাঁটতে বের হলো। আজ সারাদিন সে হাঁটবে। হেঁটে হেঁটে এমন ক্লান্ত হবে যে বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুমুতে যাবার আগে হট শাওয়ার নেবে। এক গ্লাস আগুন গরম দুধ খাবে। বিছানায় নতুন চাদর বিছিয়ে রাখবে। তার ঘুমের সমস্যা আছে। এক রাত ঘুম না হলে পর পর কয়েক রাত ঘুম হয় না।

বেশিক্ষণ হাঁটতে হলো না। অল্প হেঁটেই লিলিয়ান ক্লান্ত হয়ে পড়ল। হলগুলিতে ঘুরতে এখন আর ভালো লাগছে না। ইচ্ছা করছে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়তে। এখন বিছানায় যাওয়াটা হবে বিপদজনক। খানিকক্ষণ ঘুম হবে, কিন্তু রাতটা কাটবে অঘুমো। লিলিয়ান স্যান্ডউইচ কিনল। পার্কে বসে একা একা খেল। একা একা খাওয়া খুব কষ্টের। খাবার সময় একজন কেউ পাশে থাকা দরকার। যে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে কথা বলবে। হাসবে। লিলিয়ানের এমন কেউ নেই। কোনোদিন কি হবে? প্রিয় একজন কি থাকবে পাশে? কে হবে সেই মানুষটি? চার্চের পাদ্রি মাথায় হালি ওয়াটার ছিটিয়ে, বুকে ক্রশ স্পর্শ করে বলবেন—

তোমাদের দু'জনকে আমি স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করলাম। মৃত্যু এসে তোমাদের বিচ্ছিন্ন না করা পর্যন্ত একজন থাকবে অন্যের পাশে, সুখে দুঃখে, আনন্দে বেদনায়। Till death do you part

লিলিয়ানের চোখে পানি এসে যাচ্ছে। সে পার্কের অপরূপ দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল। মন শান্ত হচ্ছে না। সে একধরনের হাহাকার বোধ করছে— মনে হচ্ছে এই অপরূপ দৃশ্য একা দেখাব নয়। দু'জনে মিলে দেখার।

লিলিয়ান অ্যাপার্টমেন্টে ফিরল সন্ধ্যা মিলাবার পর। ক্লান্তিতে তার শরীর ভেঙে পড়ছে। মনে হচ্ছে এক সেকেন্ডও সে জেগে থাকতে পারবে না। হট শাওয়া নেয়া, গরম দুধ খাওয়া, বিছানার চাদর বদলানো কিছুই তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে দবজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। গাঢ় গভীর ঘুম। যে ঘুমের সময় মানুষ মানুষ থাকে না, পাথরের মতো হয়ে যায়। গভীর ঘুমের স্বপ্নগুলি অন্যরকম হয়। স্বপ্ন আর স্বপ্ন থাকে না। বাস্তবের কাছাকাছি চলে যায়। হালকা ঘুমের স্বপ্নগুলি হয় হালকা, অস্পষ্ট কিছু লজিক বিহীন এলোমেলো ছবি। গাঢ় ঘুমের স্বপ্ন— স্পষ্ট, যুক্তিনির্ভর।

আজ লিলিয়ান দেখল গাঢ় ঘুমের স্বপ্ন। স্বপ্নে সে এবং তাহের দু'জন পাশাপাশি শুয়ে আছে। তাহের ঘুমুচ্ছে, সে জেগে আছে। ঘুমের মধ্যে তাহের অস্ফুট শব্দ করল। লিলিয়ান হাত রাখল তাহেরের গায়ে। হাত ভেজা ভেজা লাগছে। সে চোখের সামনে হাত মেলে ধরল। হাত রঙে লাল। সে চোঁচিয়ে উঠল। লিলিয়ানের ঘুম ভাঙল নিজের চিৎকারে। বাকি রাত সে ঘুমুল না। জেগে বসে রইল। ভোরবেলা টেলিফোন করল মা'কে।

কেমন আছ মা ?

আমি ভালো আছি। তোর গলা এমন শোনাচ্ছে কেন ? তোর কী হয়েছে ?

ক'দিন ধরে আমি খুব দুঃস্বপ্ন দেখছি।

কী দুঃস্বপ্ন ?

ভয়ঙ্কর সব দুঃস্বপ্ন। একটা বিদেশী ছেলেকে নিয়ে দুঃস্বপ্ন।

এ ছেলের সঙ্গে কি তোর পরিচয় আছে ?

না। দু'দিন কথা হয়েছে।

কী রকম কথা ?

সাধারণ কথা মা। তেমন কিছু না।

ছেলেটার মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যা দেখে তুই ভয় পেয়েছিস।

তেমন কিছু নেই মা। ভালো ছেলে।

দু'দিনের আলাপে কী করে বুঝলি ভালো ছেলে ?

লিলিয়ান জবাব দিল না। তার মা কয়েকবার বললেন, হ্যালো হ্যালো— লিলিয়ান শুনতে পাচ্ছিস ? আমি তো কিছুই শুনতে পাচ্ছি না— হ্যালো হ্যালো।

লিলিয়ানের সবচে' হেটবোন রওনি কাঁদছে। রান্নাঘরে মা নিশ্চয়ই কল ছেড়ে রেখেছে— পানি পড়ার শব্দ আসছে।

হ্যালো, লিলিয়ান। হ্যালো... টেলিফোনটায় কী হলো কিছু শুনতে পারছি না।

লিলিয়ান বলল, মা রওনি কাঁদছে। তুমি ওকে দেখ— আমি টেলিফোন রাখলাম...

না না। টেলিফোন রাখিস না। তুই আমার কথা শোন মা... তুই একজন ভালো ডাক্তার দেখা। টাকা যা লাগে লাগুক... আমি যেভাবেই হোক ডলার পাঠাব। কিছু দিন পর পর তুই এমন দুঃস্বপ্ন দেখিস। এটা তেঁা ভালো কথা না।

টেলিফোন রাখলাম মা।

না না না...

লিলিয়ান টেলিফোন রাখল না। কানে লাগিয়ে চূপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। এখনো রওনির কান্না শোনা যাচ্ছে। বাথরুমের ট্যাপ দিয়ে পানি পড়ার শব্দ আসছে, কেউ একজন বোধহয় এসেছে তাদের বাড়িতে, কলিং বেল টিপছে... ক্রমাগত বেল বাজছে। লিলিয়ানের মা কাঁদো কাঁদো গলায় বলে যাচ্ছেন, হ্যালো লিলিয়ান হ্যালো। কী হলো টেলিফোনটায়— কোনো কথা শুনতে পাচ্ছি না। অপারেটর হ্যালো অপারেটর...

লিলিয়ান মা'র কথা অগ্রাহ্য করল না। কোনো দিন করেও না। সে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে কথা বলতে গেল। ইউনিভার্সিটি'র সাইকিয়াট্রিস্ট। এরা বলে স্টুডেন্ট কাউন্সিলার। ছাত্র-ছাত্রীদের নানান ধরনের সমস্যা নিয়ে এঁরা কথা বলেন। এক সময় ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা ছিল পড়াশোনা কৌশল— কোর্স ভালো লাগছে না, শ্রেড খারাপ হচ্ছে এই জাতীয়। এখনকার সমস্যা বেশির ভাগই মানসিক। যে কারণে স্টুডেন্ট কাউন্সিলারদের মধ্যে অন্তত একজন থাকেন সাইকিয়াট্রিস্ট।

লিলিয়ান যার কাছে গেল তাঁর নাম ভারমান। ডা. এঙ্গেলস ভারমান। ভদ্রলোক ভারি ক্রি ধরনের বেষ্টেখাট মানুষ। তাঁর মুখ ভর্তি দাড়িগোঁফ। চুল-দাড়ি সবই পাকা। ফর্সা গায়ের রঙের সঙ্গে চুলের রঙ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমাটা ঝুলে আছে নাকের উপর। ভদ্রলোক তাকালেন চশমার ফ্রেমের উপর দিয়ে। লিলিয়ানের মনে হলো— ভদ্রলোকের চোখ সুন্দর। তিনি তাকাচ্ছেন মমতা নিয়ে। ডাক্তাররা যখন রোগীর দিকে তাকান তখন রোগটাকে দেখার চেষ্টা করেন, মানুষটাকে নয়। এই ডাক্তার মানুষটাকে দেখার চেষ্টা করছেন।

লিলিয়ান বলল, গুড মর্নিং ডা. এঙ্গেলস ভারমান।

গুড মর্নিং লিটল মিস।

আমার নাম লিলিয়ান।

গুড মর্নিং লিটল মিস লিলিয়ান।

গুড মর্নিং স্যার।

বলো তো লিলিয়ান, তুমি কেমন আছ ?

আমি খুব ভালো নেই।

গুনে খুশি হলাম। সারাক্ষণ ভালো থাকা কোনো কাজের কথা না। তোমরা যদি সারাক্ষণ ভালো থাক তাহলে আমরা কী করব ? তোমার সমস্যা কী তা এখন বলো। সহজভাবে বলো। খোলাখুলি বলো।

আমার ঘুম হচ্ছে না।

এটা কোনো সমস্যাই না। ঘুম না হলে এক লক্ষ ধরনের ঘুমের ওষুধ আছে। আর কী সমস্যা ?

ঘুমুলেই দুঃস্বপ্ন দেখি।

তুমি তো ভালো আছ, ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখ। আমি দেখি জেগে জেগে। চাবদিকে যা দেখছি সবই দুঃস্বপ্ন। গতকাল কী হয়েছে শোন— সাবওয়ে দিয়ে আসছি, আমার চোখের সামনে একজন মহিলার ব্যাগ এক কালো ছোকরা ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ে পালাল। এতগুলি লোক আমরা, কেউ কোনো কথা বললাম না। সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। এটা কি বড় ধরনের দুঃস্বপ্ন না ?

আপনিও কিছু বলেন নি ?

না। আমি হচ্ছি অবজাবভার, আমি বসে বসে দেখেছি।

লিলিয়ান বলল, অন্যরাও হয়তো আপনার মতো কোনো অভ্যুহাত তৈরি কবে বসে ছিল।

ডা. এঙ্গেলস ভাবমান হাসতে হাসতে বললেন, তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে। তোমার কোনো সমস্যা থাকার কথা না। সমস্যা হয় কম বুদ্ধির মানুষদের। এরা কিছু বুঝতে চায় না। কিন্তু তুমি বুঝবে। যুক্তি দিয়ে বোঝালে বুঝবে। এখন সুন্দর করে তোমার সমস্যা বলো। না-কি বলার আগে কফি খেয়ে নেবে ?

কফি খাব।

ঐ টেবিলে কফি মেকার আছে। তোমার জন্য আন এবং আমার জন্য আন। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে তোমার সমস্যার কথা বলো। আমার বদঅভ্যাস হচ্ছে, আমি চশমার ফাঁক দিয়ে তাকাই। আশা করি এতে কোনো সমস্যা হবে না। কারণ আমার চোখ খুব সুন্দর। ঠিক বলি নি?

জি ঠিক বলেছেন।

লিলিয়ান খুব গুছিয়ে তার সমস্যার কথা বলল। ডা. ভারমান কোনো প্রশ্ন করলেন না। চুপচাপ শুনে গেলেন। এক ফাঁকে উঠে গিয়ে আবার কফির পেয়ালা ভর্তি করে আনলেন। লিলিয়ান কথা শেষ কববার পর ডা. ভারমান মুখ খুললেন। তিনি নরম গলায় বললেন, তোমার পরিবারে লোক সংখ্যা কত?

অনেক। আমাদের যৌথ পরিবার। আমার দু'চাচা এবং বাবা... এরা তিন ভাই একসঙ্গে থাকেন।

একত্রে রান্না হয়?

হ্যাঁ, এক সঙ্গে রান্না হয়। তবে আমাদের পজার চাচা কিছুদিন পরপর রাগ করে বলেন এখন থেকে তিনি আলাদা রান্নাবান্না করবেন। কারো সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ নেই। দু'একদিন আলাদা রান্না হয়, তাবপর আবার আগের জায়গায় ফিরে আসেন।

তোমাদের চাচাদের মধ্যে কি খুব মিল?

মোটেন্ড মিল নেই। সারাক্ষণ তাঁরা ঝগড়া কবছেন, কিন্তু তারপরেও একজন অন্যজনের ছাড়া থাকতে পাবেন না। আমার মনে হয় ঝগড়া করার জন্যই তাঁদের একসঙ্গে থাকা প্রয়োজন। ব্যাপারটা বেশ মজার।

তুমিই প্রথম বাইরে পড়তে এসেছ?

জি।

তুমি যখন বিদেশে রওনা হলে তখন তোমার পরিবারের সদস্যরা কী করল?

সবাই খুব কাঁদল। আমার পজার চাচা পুরো একদিন এক রাত না খেয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরে বসে ছিলেন। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁকে খাওয়ানো হয়।

ডা. ভারমান পাইপ ধরাতে ধরাতে বললেন, তোমার সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে তোমার পরিবার। তুমি এমন এক ক্রোজ পরিবার থেকে এসেছ যে পরিবারের সদস্যরা ভালোবাসার কঠিন জালে তোমাকে আটকে রেখেছে। তুমি জাল ছিঁড়তে চাচ্ছ— পারছ না।

আপনি ভুল বললেন— আমি জাল ছিঁড়তে চাচ্ছি না।

তুমি চাচ্ছ কিন্তু তোমার মন তাতে সায় দিচ্ছে না। তোমার মনে একই সঙ্গে দুটি বিপরীত ধারা কাজ করছে। একটি ধারা তোমাকে জাল কেটে বেরিয়ে আসতে বলছে, অন্যটি তা করতে দিচ্ছে না। এতে মনে প্রচণ্ড ঝাপ পড়ছে।

এর সঙ্গে আমার দুঃস্বপ্নের সম্পর্ক কী? আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি অন্য একজনকে নিয়ে।

সম্পর্ক আছে...। ঐ ছেলেটিকে দেখেই তোমার জাল কেটে বেরিয়ে আসবার কথা মনে হলো। তোমার মনের একটি অংশ তাতে সায় দিল না। সৃষ্টি হলো প্রচণ্ড চাপের।

দুঃস্বপ্নগুলি চাপের ফল, আর কিছুই না। ছেলেটিকে তোমার খুব ভালো লেগে গেছে—
তুমি তা স্বীকার করতে চাচ্ছ না।

ছেলেটিকে ভালো লাগার কিছু নেই।

আমার ধারণা আছে। তুমি তোমার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কাকে সবচে’
ভালোবাসো ?

পজার চাচাকে।

চিন্তা করে দেখ তো পজার চাচার স্বভাব-চরিত্রের সঙ্গে তোমার ঐ ছেলেটির স্বভাব
চরিত্রের কোন কোন মিল আছে ?

কোনো মিল নেই।

ভালো করে চিন্তা কর। আমার ধারণা মিল আছে।

পজার চাচা অকারণে হো-হো করে হাসেন। ঐ ছেলেটিও হাসে।

আর ?

এইসব নিয়ে ভাবতে আমার ভালো লাগছে না।

আমি যে তোমার সমস্যাটা ধরিয়ে দিয়েছি তা-কি বুঝতে পেরেছ ?

লিলিয়ান জবাব দিল না। ডা. ভারমান হাসলেন। লিলিয়ান বলল, আমাকে আপনি
কী করতে বলেন ?

উপদেশ চাচ্ছ ?

হ্যাঁ।

আমি তোমাকে কোনো উপদেশ দেব না। তুমি কী করবে না করবে তা তোমার
ব্যাপার। আমি সমস্যা ধরিয়ে দিয়েছি। সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব তোমার। কারণ
সমস্যাটা তোমার, আমার নয়।

লিলিয়ান উঠে দাঁড়াল। ফিরে গেল অ্যাপার্টমেন্টে। প্রায় এক ঘণ্টার মতো চুপচাপ
বিছানায় শুয়ে রইল। তারপর উঠে হাতে মুখে পানি ছিটাল। সে তার সবচে’ সুন্দর
পোশাকটা পরল। অনেক সময় নিয়ে চুল আঁচড়াল। তার সম্বল অল্প কিছু ডলাবেব সব
ক’টা সঙ্গে নিয়ে বেরুল। সে তাহেবকে খুঁজে বের করবে। এই শহরের মেডিকেল স্কুলের
একজন বিদেশী ছাত্রের ঠিকানা বের করা কঠিন হবার কথা না। তবে লিলিয়ান প্রথমে
গেল ডাউন টাউনের এক ফুলের দোকানে। দশ ডলার দিয়ে সে পঁচিশটা চমৎকার
গোলাপ কিনল। আধ ফোটা গোলাপ। আগুনের মতো টকটকে রঙ। চিরকাল ছেলেরাই
মেয়েদের জন্য ফুল কিনেছে। মাঝে-মাঝে নিয়মেব হেরফের হলে কিছু যায় আসে না।

কলিং বেল টেপার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে গেল। তাহের খুব স্বাভাবিক গলায় বলল,
এসো লিলিয়ান। তার কথা বলার ভঙ্গি থেকে মনে হওয়া অস্বাভাবিক না যে সে
লিলিয়ানের জন্যই অপেক্ষা করছিল।

লিলিয়ান বলল, আমি যে এখানে আসব তা কি আপনি জানতেন ?

তাহের বলল, জানব কী করে— আগে তো বলো নি।

আমাকে দেখে অবাক হন নি ?

আমি এত সহজে অবাক হই না। ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে রিকশা করে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ করে বাবা রিকশা থেকে পড়ে গেলেন। নেমে গিয়ে দেখি মরে পড়ে আছেন। সেই থেকে অবাক হওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

লিলিয়ানের চোখে-মুখে হকচকিত ভাব। তার ফর্সা কপাল ঘামছে। হাতের গোলাপগুলি নিয়েও সে বিব্রত। তাহের বলল, ফুলগুলি কি আমার জন্য ?

হঁ।

দাও আমার হাতে। তুমি বসো।

না।

দাঁড়িয়ে থাকার জন্য এসেছ ?

লিলিয়ান কী বলবে বুঝতে পারছে না। সত্যি তো সে কী জন্য এসেছে ? কেনই বা এসেছে ? সে তাকাল চারদিকে। অবিবাহিত পুরুষের ঘর। একপলকেই বোকা যায়। টেবিলে বা দেয়ালে কোনো তরুণীর ছবি নেই। এটা একটা বড় ব্যাপার। বিছানার কাছে পিন আপ পত্রিকা নেই। লিলিয়ান ক্ষীণ গলায় বলল, আমি এখন চলে যাব।

চলে যাবে ভালো কথা— চলে যাও। হঠাৎ করে একগাদা ফুল নিয়ে এসে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে চলে যাওয়া ভালো।

আপনাকে বিব্রত করার জন্য আমি দুঃখিত।

আমি মোটেও বিব্রত হই নি। বিস্মিত হচ্ছি। অন্যদের বিশ্বয় যেমন চোখে-মুখে ফুটে উঠে আমার বেলায় তা হয় না বলেই তোমার কাছে মনে হচ্ছে আমি পুরো ব্যাপারটা খুব সহজভাবে নিচ্ছি। আসলে তা না। আমার ঠিকানা কোথায় পেলে ?

জোগাড় করছি।

কেন ?

লিলিয়ান চুপ করে রইল। তাহেরের মনে হলো এই মেয়ে আর কোনো প্রশ্নের জবাব দেবে না। মেয়েটিকে সহজ করার কোনো পথও সে খুঁজে পাচ্ছে না। কী বললে সে সহজ হবে ?

লিলিয়ান, তুমি কি পেট্রিফায়েড ফরেস্টটা দেখতে চাও ? ঐদিন আমি যাই নি। তুমি যেতে চাইলে আজ যেতে পারি। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় চলে আসতে পারব।

আমি আমার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যাব।

বেশ তো ফিরে যাবে। আমি তোমাকে পৌছে দেব।

আপনাকে পৌছে দিতে হবে না।

তুমি লক্ষ্য কব নি বোধহয়— বাইরে খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। এই ঠাণ্ডায় তুমি এমন পাতলা কাপড় পরে কী করে এসেছ সেও এক রহস্য। তুমি আমার সঙ্গে যেতে না চাইলে একাই যাবে— আমার একটা ওভারকোট আছে, সেটা গায়ে চাপিয়ে চলে যেতে পারবে। না—কি আমার ওভারকোটও গায়ে দেবে না ?

লিলিয়ান বসল। সে যে বসেছে তাতে সে নিজেও অবাক হয়েছে। তার কাছে মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা স্বপ্নে ঘটছে। সে নিজের ইচ্ছেতে কিছু করছে না। যা তাকে করতে বলা হচ্ছে তাই সে করছে। পুরো ঘটনা অন্য কেউ ঘটাবে। সে অন্য কেউটা কে ?

লিলিয়ান ।

হঁ ।

কফি খাবে ?

হঁ ।

শুনে খুশি হলাম । আমি কফি তৈরি করছি । তুমি সহজ এবং স্বাভাবিক হতে চেষ্টা কর । তারপর তোমার কাছে কয়েকটা জিনিস জেনে নেব । যা যা জানতে চাই তাও বলে নিচ্ছি,— এক, হঠাৎ তুমি একগাদা ফুল নিয়ে আমার কাছে কেন এসেছ ? দুই, আজ যে আমার জন্মদিন তা-কি তুমি জানো ? যদি জানো তাহলে কীভাবে জানো ?

লিলিয়ান বিস্মিত হয়ে বলল, আজ আপনার জন্মদিন ?

তাহের বলল, আমি দ্বিতীয় প্রশ্নটির জবাব পেয়ে গেছি । আজ যে আমার জন্মদিন তা তুমি জানো না । এখন বাকি রইল প্রথম প্রশ্ন । তুমি প্রশ্নটির জবাব নিয়ে ভাবতে থাক । আমি একটু ঘ্রোসারি শপে যাব । ঘরে কফি, চিনি, ক্রিম কিছুই নেই ।

আমি কি আপনার এখান থেকে একটা টেলিফোন করতে পারি ?

হ্যাঁ পার ।

একটা লং ডিসটেন্স কল করব ।

একটা কেন, দশটা কর । তুমি আমার এখানে আসায় আমি নিজে যে কী পরিমাণ খুশি হয়েছি তা কোনোদিন তুমি বুঝবে না । প্রথম দেখাতেই ভালোবাসা— এই জাতীয় কিছু কথা সাহিত্যে প্রচলিত আছে । এই জাতীয় বায়বীয় কথা আমি কখনো বিশ্বাস করতাম না । তোমাকে ওল্ড ফেইথফুল লেকের কাছে দেখে প্রথম মনে হলো— সাহিত্যের এই কথাটা মিথ্যা না । মেয়েদের পেছনে ঘোরা আমার স্বভাব নয় । তারপবেও আমি খুঁজে খুঁজে তোমার অ্যাপার্টমেন্ট বের করেছি । ঐদিন তোমার সঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে দেখা হলো । তোমার বোধহয় ধারণা পুরো ব্যাপারটা কাকতালীয় । আসলে তা না । আমি প্রায়ই তোমাদের মেমোরিয়াল ইউনিয়নে বসে থাকতাম এই আশায় যে তোমার সঙ্গে দেখা হবে । দেখা হলেই বলব, পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম... । কবে কোথায় কোন রুমে তোমার ক্লাস তাও আমি জানি— প্রমাণ দেব ?

লিলিয়ান তাকিয়ে আছে, কিছু বলছে না । তাহের আগের মতোই সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, আজ ছিল তোমার টার্ম পেপার জমা দেয়ার শেষ দিন । আমি কি ঠিক বলেছি ?

লিলিয়ান অন্যদিকে তাকিয়ে হাসল । তাহের বলল, আমি কফি নিয়ে আসতে যাচ্ছি । আমার আসতে খানিকটা দেরি হবে । আমার জন্মদিন উপলক্ষে একটা ভালো হোটেলে আমি তোমাকে নিয়ে খেতে যাব । দুশ্চিন্তাশ্রান্ত হবার কোনো কারণ নেই । খাওয়ার শেষে আমি তোমাকে তোমার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দেব । তুমি যে এসেছ এতেই আমি খুশি । এর বেশি আমি কিছু আশা করি নি । যা হয়েছে তাই যথেষ্ট । যদিও জানি না— ঘটনা এমন কেন ঘটল । ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আছে । তোমার ইচ্ছা করলে তুমি ব্যাখ্যা করবে । ইচ্ছা না করলে করতে হবে না ।

তাহের ঘর ছেড়ে চলে গেল। লিলিয়ান উঠে দরজা বন্ধ করল। টেলিফোন করল তার মা'কে। লিলিয়ানের মা আতঙ্ক মেশানো গলায় বললেন, আমি এর মধ্যে তিনবার তোর অ্যাপার্টমেন্টে টেলিফোন করেছি। আমরা চিন্তায় চিন্তায় অস্থির।

চিন্তার কিছু নেই মা।

তুই কি গিয়েছিলি কোনো ডাক্তারের কাছে ?

হ্যাঁ।

ডাক্তার কী বললেন ?

ডাক্তার নতুন কিছু বলে নি। আমি যা জানতাম তাই বলেছেন।

আমি তোর কথা কিছু বুঝতে পারছি না। তুই কী জানতি ?

লিলিয়ান হাসল। শব্দ করে হাসল। লিলিয়ানের মা বললেন, কী হলো হাসছিস কেন ?

হাসি আসছে তাই হাসছি ?

তুই এখন কোথায় ?

কেন আমার অ্যাপার্টমেন্টে।

না, তুই অন্য কোনো জায়গায়।

কী করে বুঝলে ?

আমি জানি। আমার মন বলছে। তুই কি ঐ ছেলেটির কাছে ?

হ্যাঁ।

কেন— ঐখানে কেন ? কী হচ্ছে লিলিয়ান ?

ভয়ের কিছু নেই মা।

অবশ্যই ভয়ের কিছু। তুই কেন ঐ ছেলের কাছে গেলি ?

লিলিয়ান খানিকক্ষণ চুপ করে বইল। ওপাশ থেকে ভদ্রমহিলা বারবার বলতে লাগলেন— হ্যালো হ্যালো।

মা শোন, আমি খুব সম্ভব এই ভদ্রলোককে বিয়ে করব।

কী বলছিস তুই ?

আমি এখনো জানি না। ভদ্রলোক এখানে নেই। তিনি ক'ফি কিনতে গিয়েছেন। ফিরে এলেই তাঁকে বলব।

কী বলবি ?

বলব যে আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই। যদি রাজি থাকেন তবেই শুধু আপনার সঙ্গে ক'ফি খাব এবং রাতে ডিনার করতে যাব।

হা ঈশ্বর! মা তুই কী বলছিস ? তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে মা। আমি নিশ্চিত তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

অস্থির হয়ে। না মা। আমার মাথা খারাপ হয় নি। মাথা ঠিক আছে। আর এক্ষুণি তোমাদের চিন্তিত হতে হবে না। হয়তো বিয়েতে ভদ্রলোক রাজি হবেন না। হয়তো বলবেন— তিনি বিবাহিত

লোকটা বিবাহিত কি-না তাও তুই জানিস না ?

না ।

হা ঈশ্বর! এসব কী শুনছি ।

কথায় কথায় হা ঈশ্বর বলবে না মা । শুনতে ভালো লাগছে না ।

লিলিয়ান লক্ষ্মী মা, তুই দেশে চলে আয় । তোকে পড়াশোনা করতে হবে না ।

কাঁদছ কেন মা ? আমি তো ভয়ঙ্কর কিছু করছি না ।

তুই তোর পজার চাচার সঙ্গে কথা বল ।

আমি এখন কাবো সঙ্গে কথা বলব না ।

তোর বাবার সঙ্গে কথা বল ।

বললাম তো মা, আমি এখন কারো সঙ্গে কথা বলব ন' ।

হা ঈশ্বর! আমি এ কী শুনছি ?

লিলিয়ান শান্ত স্বরে বলল, ঈশ্বরের প্রতি তোমার অবিচল ভক্তি । কাজেই তুমি ধরে
নাও— যা হচ্ছে ঈশ্বরের ইচ্ছার আগোচরে হচ্ছে না ।

লিলিয়ান মা লিলিয়ান...

টেলিফোন রাখছি মা । তুমি ভালো থেকো ।

লিলিয়ানের মা চিৎকার করে কঁাদতে লাগলেন । লিলিয়ান জানালার পাশে দাঁড়াল ।
বরফ পড়তে শুরু করেছে— বছরের প্রথম বরফ । ইচ্ছে করছে বরফেব ভেতর ছুটে
যেতে । সারা গায়ে বরফ মাখতে । লিলিয়ান খানিকক্ষণ বরফ পড়া দেখল । এক দৃষ্টিতে
তাকিয় থাকার জন্যই বোধহয় তার চোখ জ্বালা করছে । সে বাথরুমে ঢুকে চোখে পানি
দিয়ে কিছুক্ষণ কঁাদল । ফিসফিস করে বলল, মা রাগ করো না । আমি কী করছি আমি
নিজেও জানি না । এর ফল শুভ হবে, কি শুভ হবে না তাও জানি না । শুধু একটা জিনিস
জানি— আমৃত্যু আমাকে অচেনা-অজানা এই ছেলেটির সঙ্গে থাকতে হবে । এর থেকে
আমার মুক্তি নেই । কিংবা কে জানে আমার মুক্তি হয়তো বন্ধনের ভেতরই ঘটবে ।

দরজায় কলিং বেল বাজছে । লিলিয়ান দরজা খুলে দিল । তাহের মুগ্ধ গলায় বলল,
বাইবে বরফ পড়ছে দেখেছ ?

হ্যাঁ ।

গায়ে বরফ মাখবে ?

হ্যাঁ মাখব ।

বাহ চমৎকাব! আমাদের দেশে বরফ নেই, তবে বৃষ্টি আছে । বৎসবের প্রথম বৃষ্টি
হলে আমরা বৃষ্টিতে ভিজ, এতে গায়েব গামাচি নষ্ট হয় । বরফে কিছু নষ্ট হয় কি-না কে
জানো ।

তোমাদের দেশের বৃষ্টি কি তুমারপাতের চেয়েও সুন্দর ?

লক্ষ গুণ সুন্দর । আমাদের দেশের প্রথম বৃষ্টিতে কী হয় জানো— এক ধরনের মাছ
আতঃ— নাম হলো কৈ মাছ । এরা এত আনন্দিত হয় যে দলবেঁধে পানি ছেড়ে শুকনায়
উঠে আসে ।

কেন আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ ?

মোটাই ঠাট্টা করছি না। তোমাকে আমি দেশে নিয়ে গিয়ে নিজের চোখে দেখাব তখন তুমি...

তাহের কথা শেষ করল না, থেমে গেল। বিব্রত চোখে লিলিয়ানের দিকে তাকাল লিলিয়ানও তাকিয়ে আছে। লিলিয়ানের চোখে চাপা দ্যুতি।

ওদের বিয়ে হতে দশ দিন লাগল। বিয়ের লাইসেন্স বের করা এদেশে অনেক যত্ননা। অনেক স্টেপ-ফেস্ট করতে হয়। ডাক্তাররা আগে নিশ্চিত হয়ে নেন এই দম্পতির সন্তান বংশগত কোনো রোগের শিকার হবে না। তারপরই সার্টিফিকেট দেন। সেই সার্টিফিকেট দেখিয়ে লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করতে হয়।

বিয়ের পরপর লিলিয়ান ডা. ভাবমানের সঙ্গে দেখা করতে গেল। ডা. ভারমান চশমার ফাঁক দিয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, মিস থেকে মিসেস হয়েছে ?

হ্যাঁ। কী কবে বুঝলেন ? আমার কপালে তো লেখা নেই মিসেস।

অবশ্যই লেখা আছে। সেই লেখা সবাই পড়তে পারে না। আমি পারি। তুমি কি ঐ ছেলেটিকেই বিয়ে করেছ ?

হ্যাঁ।

দুঃস্বপ্ন এখন নিশ্চয়ই দেখছ না ?

জি-না, দেখছি না।

শুনে খুব খুশি হলাম। মনস্তত্ত্ববিদ্যা একটি বড় বিদ্যা— তা কি বুঝতে পারছ ?

পারছি।

ভবিষ্যতে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমার কাছে আসবে। তবে আমার মনে হয় ভবিষ্যতে কোনো সমস্যা হবে না। যদি হয় তুমি নিজে তার সমাধান করতে পারবে। পারবে না ?

হ্যাঁ পারব।

তোমার হাসি-খুশি মুখ দেখে ভালো লাগছে। সত্যিকার হাসিমুখ অনেক দিন দোখ না। চারদিকে ভেজাল হাসি দেখি।

হাসির ভেজালও আপনি ধরতে পারেন ?

অবশ্যই পারি। আমার নিজের মুখে যে হাসিটি আমি ঝুলিয়ে রাখি তা হলো ভেজাল হাসি। একশ' ভাগ ভেজাল। তুমি তোমার জীবনে ভেজাল হাসিকে আসতে দিও না। মনে কষ্ট পেলে কাদবে। মনের কষ্ট চাপা দেয়ার জন্য হাসির ভান করার প্রয়োজন নেই।

আমি আপনার উপদেশ মনে রাখব ডা. ভারমান।

ডা. ভারমানের উপদেশের জন্যই হয়তো দেশ থেকে মা'র চিঠি পেয়ে লিলিয়ান সারাদিন কাঁদল। চিঠিটি তিনি মেয়ের বিয়ের সংবাদ পাওয়ার পর লিখেছেন। সংক্ষিপ্ত চিঠি :

যদিও লিলিয়ানের মা'র হাতে লেখা তবু লিলিয়ান জানে— এই চিঠি তার বাবা লিখে দিয়েছেন। মা শুধু দেখে দেখে কপি করেছেন। কপি করতে গিয়েও মা'র বানান ভুল হয়েছে। বাবা সেইসব বানান শুদ্ধ করেছেন।

লিলিয়ান,

তোমার বিবাহের সংবাদ পাইয়াছি। আনন্দে উল্লসিত হই নাই। তুমি নিশ্চয়ই তা আশাও কর না। তুমি খুব ভালো জানো তুমি আমাদের সবার অতি আদরের ধন ছিলে। তোমাকে নিয়া আমাদের স্বপ্নের অন্ত ছিল না। তুমি সব স্বপ্নের অবসান ঘটাইয়াছ। আমি তোমাকে দোষ দেই না। ঈশ্বরের ইকুম ছাড়া কিছুই হয় না। এই ক্ষেত্রেও তাঁর ইচ্ছারই প্রতিফলন হইয়াছে। আমি তোমার এবং তোমার স্বামীর সুখী সুন্দর জীবন কামনা করি। যে সুখের জন্য তুমি আমাদের পন্ডিবারের সকলের সুখ তুচ্ছ করিয়াছ, ঈশ্বর যেন সেই সুখ তোমাকে দেন ইহাই আমাদের সকলের কামনা।

এখন তোমাকে কিছু কথা বলিব, মন দিয়া শোন। তোমার বাবা পরিবারের সদস্য হিসেবে তোমাকে গ্রহণ করিবার ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের সকলেরই সেইমতো অভিমত। সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে তোমাকে বর্জন করা হইয়াছে। ইহাতে মনে কষ্ট পাইও না। তুমি সকলকে ত্যাগ করিয়া একজনকে পাইতে চাহিয়াছ। ঈশ্বর তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন।

এক্ষণে বাড়িতে তোমার নাম আর উচ্চারিত হইবে না। তোমার ব্যবহারী জিনিস, তোমার ফটোগ্রাফ সমস্ত নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তুমি আমাদের সহিত কোনো রকম যোগাযোগ রাখিবার চেষ্টা করিবে না। যোগাযোগ করিবার চেষ্টার অর্থই হইবে আমাদেরকে কষ্ট দেওয়া এবং নিজে কষ্ট পাওয়া।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ঈশ্বরের নিকট তোমার প্রসঙ্গে ইহাই আমাদের শেষ প্রার্থনা।

তোমার হতভাগিনী মা।

পুনশ্চ: মা, তোমার দুঃস্বপ্ন দেখা কি বন্ধ হয়েছে ?

লিলিয়ানের ধারণা চিঠির শেষের পুনশ্চ অংশটি মা'র লেখা। মা বাবাকে না জানিয়ে এই বাক্যটি লিখেছেন। কেন মায়েরা এত ভালো হয় ? কেন হয় ? সে নিজে কি কোনো একদিন এমন একজন মা হবে ?

লিলিয়ান কাঁদতে কাঁদতে ভাবল আমার প্রথম সন্তানটি যেন মেয়ে হয়। মেয়ে হলেই আমি মা'র নামে তার নাম রাখতে পারব।

ভিন দেশের ভিন ধর্মের একটি ছেলেকে বিয়ে করে ফেলার মতো কাজ সাধারণত প্রচণ্ড ঝোঁকের মাথায় করা হয়, এবং ঝোঁক দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বিয়ের এক মাসের মধ্যেই মনে হতে থাকে, কাজটা ঠিক হয় নি। খুব ভুল হয়ে গেছে। এদের বেলায় এটা ঘটল না। বিয়ের এক বছর পর এক গভীর রাতে লিলিয়ানের মনে হলো, আমি নিশ্চয়ই আমার শৈশবে কিংবা আমার যৌবনে বড় ধরনের কোনো পুণ্যকর্ম করেছি। বড় ধরনের কোনো পুণ্যকর্ম ছাড়া এমন একজনকে স্বামী হিসেবে, বন্ধু হিসেবে পাওয়া যায় না। লিলিয়ান একা একা কিছুক্ষণ কাঁদল। তারপর চেষ্টা করল তাহেরের ঘুম ভাঙাতে। পারল না। তাহেরের ঘুম ভাঙানো সত্যি সত্যি অসম্ভব ব্যাপার। লিলিয়ানের খুব ইচ্ছা করছিল তাহেরের ঘুম ভাঙিয়ে তাকে নিয়ে রাস্তায় হাঁটতে যায়। গভীর রাতে নির্জন রাস্তায় হাত ধরাধরি করে হাঁটতে হাঁটতে সে তাহেরকে বলে— আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমার জন্য আলাদা করে রাখা এই ভালোবাসা কখনো নষ্ট হবে না। কখনো না।

বিয়ের দেড় বছরের মাথায় তাহের ফিফথ অভিন্যুতে নতুন বাড়ি নিল। বিশাল ডুপলেক্স। একতলায় খাবার ঘর, বসার ঘর, লাইব্রেরি কাম স্টাডি রুম এবং একটা গেস্ট রুম। দোতলায় চারটা শোবার ঘর। এত বড় বাড়ির তাদের কোনোই প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাহের ছোট বাড়ি নেবে না। ছোট বাড়িতে তার নাকি দম বন্ধ হয়ে আসে। ছোট বাড়ি নেবার কথা বলতেই তাহের হাসতে হাসতে বলল, আমার পূর্বপুরুষরা খুব বড় বড় বাড়িতে থাকতেন— বুঝলেন বিদেশিনি? কাজেই আমিও বড় বাড়িতে থাকব। বেতন যা পাই সেখান থেকে টাকা আলাদা করে রাখব। বছর পনের পর সেই টাকায় দশ একর জায়গা নিয়ে এমন বাড়ি বানাব যে তোমার আক্কেলগুডুম হয়ে যাবে।

হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তার হিসেবে তাহের যা পায় তা তার জন্য যথেষ্ট— জমানো দূরে থাকুক মাসের শেষে সে শেষ কোয়ার্টারটিও খরচ করে শুকনো মুখে লিলিয়ানকে বলে— লিলি! তোমার কাছে কি গোটা বিশেক ডলার হবে? তখন তাহেরের শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে লিলিয়ানের চোঁচিয়ে বলতে ইচ্ছা করে— I love you, I love you. সে অবশ্যি চোঁচিয়ে বলে না। মনে মনে বলে যেন তাহের কখনো ধরতে না পাবে। যেমন ধরা যাক, তাহের কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে যখন বলে— বাহ্ তুমি তো একসেলেন্ট কাপাচিনো কফি বানাতে শিখে গেছ? এসো আমরা একটি কফি শপ চালু করি। কফি শপের নাম হবে— লিলিয়ান'স কাপাচিনো। তখন লিলিয়ান মনে মনে বলে— I love you, I love you. ঈশ্বর মানুষকে প্রচুর ক্ষমতা দিয়েছেন, মনের কথা বুঝবার ক্ষমতা দেন নি। যদি দিতেন তাহলে তাহের বুঝতে পাবত কী গাঢ় ভালোবাসায় লিলিয়ান এই মানুষটাকে ঘিরে রেখেছে।

তাহের অনেক রাত জেগে পড়াশোনা কবে। এই সময়টা লিলিয়ান তাকে বিরক্ত করে না। বারান্দায় রকিং চেয়ারে বসে দোল খেতে খেতে ভাবে— ঈশ্বর আমাকে এত সুখী কেন করলেন? এর একশ' ভাগের এক ভাগ সখী হলেও তো আমার জীবনটা সুন্দর চলে যেত।

ভালোবাসা ব্যাপারটা কী লিলিয়ান বুঝতে চেষ্টা করে। বুঝতে পারে না। তার ধারণা ভালোবাসা নামের ব্যাপারটায় শরীরের স্থান খুব অল্প। নেই বললেই হয়। আবার

কখনো কখনো সম্পূর্ণ উল্টো কথা মনে হয়। মনে হয় ভালোবাসায় শরীর অনেকখানি। অনেকখানি না হলে কেন তার সারাক্ষণ এই মানুষটাকে ছুঁয়ে থাকতে ইচ্ছা করবে? মন ছোঁয়া সম্ভব নয় বলেই কি শরীর ছোঁয়ার এই আকুলতা?

আচ্ছা, তার যেমন সারাক্ষণ মানুষটাকে ছুঁয়ে থাকতে ইচ্ছে করে ঐ মানুষটারও কি তাই করে? সরাসরি জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করে, লিলিয়ান ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করেছে— তাহের প্রশ্নটা ধরতে পারে নি। যেমন লিলিয়ান একদিন জিজ্ঞেস করল, শোন তাহের আমরা যখন বাগানে হাঁটি— অর্থাৎ পাশাপাশি আমরা হাঁটিছি। তখন তোমার কোন দিকে হাঁটতে ভালো লাগে? অর্থাৎ আমার পাশাপাশি হাঁটতে ভালো লাগে, না আমার আগে আগে, না পেছনে পেছনে?

তাহের গম্ভীর হয়ে বলেছে— মাই ডিয়ার বিদেশিনী! আমার বাগানে হাঁটতেই ভালো লাগে না। আমার ভেতর বাগান-ভীতি আছে। আমাদের গ্রামের বাড়ির চারপাশে বাগান। ঐ বাগানে একবার আমাকে সাপে তাড়া করেছিল। সেই থেকে বাগান-ভীতি।

আচ্ছা ধর, বাগানে না রাস্তায় হাঁটিছি তখন?

মাই ডিয়ার বিদেশিনী! রাস্তায় হাঁটতেও আমার ভালো লাগে না। আমেরিকার রাস্তাগুলি হাঁটার জন্য নয়, গাড়ি নিয়ে চলার জন্য।

লিলিয়ান দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছে, তুমি সব সময় আমাকে বিদেশিনী বলে কেন?

তুমি বিদেশী মেয়ে, এই জন্যই বিদেশিনী বলি।

বিদেশী মেয়ে বলে কি তোমার মনে কোনো ক্ষোভ আছে?

বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই।

খুব অস্পষ্টভাবে হয়তো আছে। এত অস্পষ্ট যে তুমি নিজেও জানো না।

যদি থাকে তুমি কী করবে?

তোমার সেই ক্ষোভ, সেই হতাশা দূর করার চেষ্টা করব।

কীভাবে করবে?

প্রথমে আমি তোমার ভাষা শিখব।

বাংলা ভাষা শিখবে?

হ্যাঁ।

নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার। বাংলা ভাষা হচ্ছে পৃথিবীর কঠিন ভাষাগুলির চেয়েও কঠিন। হিব্রু বাংলা ভাষার তুলনায় শিশু।

কেন বাজে কথা বলছ?

মোটোও বাজে কথা বলছি না। ইংরেজি 's' অক্ষরের ধ্বনির কাছাকাছি আমাদের তিনটা অক্ষর আছে শ, স, ষ। আবার 'z' অক্ষরের কাছাকাছি আছে তিনটা অক্ষর— জ, য, ঝ।

এরকম সব ভাষাতেই আছে।

আমাদের আরো অদ্ভুত ব্যাপার-স্বাপার আছে। যেমন ধর— আমার শীত লাগে, এর এক রকম মানে; আবার আমার শীত শীত লাগে— এর অন্য রকম মানে। শীত শব্দ দু'বার ব্যবহার করা মাত্র অর্থ বদলে গেল। সে দারুণ কঠিন ব্যাপার।

কঠিন ব্যাপার হলে তুমি আমাকে সাহায্য কর।

পাগল হয়েছে? আমি নিজেই বাংলা জানি না, তোমাকে সাহায্য করব কী? মেট্রিকে বাংলা ফার্স্ট পেপারে ৩৬ পেয়েছিলাম। কানের পাশ দিয়ে গুলি গিয়েছে।

তার মানে তুমি আমাকে সাহায্য করবে না?

না।

না কেন?

আমি তার প্রয়োজন দেখছি না।

আমি দেখছি। তুমি যে ভাষায় কথা বলো, আমি সেই ভাষা জানব না তা হতেই পারে না। আমি তোমাকে ভালোবাসি, কাজেই আমি তোমার ভাষায় কথা বলতে চাই।

আমিও তোমাকে ভালোবাসি, তাব মানে এই না যে বাত জেগে আমাকে তোমার গ্রিক ভাষায় কথা বলতে হবে।

আমার ভাষা কিন্তু গ্রিক না।

সব বিদেশী ভাষাই আমার কাছে গ্রিক ভাষা।

আমি তো তোমাকে আমার ভাষা শিখতে বলছি না। আমি শুধু বলছি তোমার ভাষা শেখার ব্যাপারে তুমি আমাকে সাহায্য কর।

ফাইন, সাহায্য করব! ভাষা শেখা ছাড়া আর কী কী জিনিস শিখতে চাও? একবারে বলে ফেল।

আমি তোমাদের দেশের বান্ধা শিখতে চাই।

আব কী?

তোমাদের দেশের রীতি রীতি, আদব-কায়দা। ভাসাভাসা শেখা নয়। খুব ভালোমতো শেখা, যেন তুমি কোনোদিন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে না বলো— কেন যে বিদেশী একটা মেয়ে বিয়ে করলাম।

তাঁহের হাসতে হাসতে বলল, তুমি চেষ্টা করছ পুরোপুরি একটি বাঙালি মেয়ে হয়ে যেতে।

হ্যাঁ। খুব কি কঠিন?

ভয়ঙ্কর কঠিন।

মোটাই কঠিন না। আমি ঠিক কবেছি বাংলাটা পুরোপুরি শেখা হয়ে গেলে আমি তোমাকে নিয়ে তোমার দেশে যাব। বাঙালি মেয়ে হবার মূল ট্রেনিং আমি দেশে গিয়ে নেব।

পাগল হয়েছে! দেশে যাবার কথা আমি চিন্তাও করি না।

কেন চিন্তা কর না ?

দেশে আমার কেউ নেই।

তোমার বাবা-মা মারা গেছেন তা জানি, তাই বলে আর কেউ থাকবে না, তা কী করে হয় ?

আমার বাবা-মা নেই, আমার কোনো ভাই-বোনও নেই। একটাই বোন ছিল। ছোটবেলায় মেনিনজাইটিসে মারা গেছে।

বাড়িঘর তো আছে, না তাও নেই ?

একটা বাড়ি আছে তাও গ্রামের দিকে। শহরে কোনো বাড়িঘর নেই।

গ্রামের বাড়িতে কে থাকে ?

কেউ থাকে না। তালাবদ্ধ থাকে। দরজা-জানালা কিছু কিছু চুরি করে নিয়ে গেছে, তবে খুব বেশি নিতে পারে নি। বাড়ির সঙ্গে বিরাট আম-কাঁঠালের বাগান আছে। আমার এক দূর-সম্পর্কের চাচা সেই বাগান দেখাশোনা করেন। বাগানের আয় তিনিই ভোগ করেন। তাঁকে আমি মাঝে মাঝে কিছু ডলার পাঠাই যাতে তিনি বাড়িটা দেখেগুনে রাখেন।

লিলিয়ান আগ্রহ নিয়ে বলল, খুবই ভালো কথা। মনে হচ্ছে তোমাদের পৈতৃক বাড়ি বাসযোগ্য অবস্থায় আছে। এই সামারে চল দু'মাস থেকে আসি।

পাগল হয়েছে ? সামারে আমি থাকব ভিয়েনা।

কোনোক্রমেই কি যাওয়া সম্ভব না ?

না। তাছাড়া লিলিয়ান সামারে বাংলাদেশ তোমার ভালোও লাগবে না। ট্রিপক্যাল কান্ডি। প্রচণ্ড গরম। টেম্পারেচার চৌত্রিশ ডিগ্রি পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠে। হাই হিউমিডিটি। গা থেকে আলকাতরার মতো ঘাম বের হয়।

আমার কোনোই অসুবিধা হবে না।

হবে। আমার পৈতৃক বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি নেই। হাতপাখা হচ্ছে একমাত্র পাখা। প্রচণ্ড মশা। বাড়ির চারদিকে বাগানটা সুন্দর, কিন্তু সুন্দর হলেও বাগানে হাঁটতে পারবে না। বর্ষায় প্যাচপ্যাচে কাদা হয়ে থাকে। সেই সঙ্গে আছে সাপের উপদ্রব।

তুমি আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছ।

ভয় দেখানোর চেষ্টা করছি না। সত্যি কথা বলছি। ভয় দেখাতে চাইলে বলতাম, আমাদের বাড়ির চারপাশে ঘনজঙ্গল। সেই জঙ্গলে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, এবং বুনোহাতি ঘুরে বেড়ায়। আমি মশার কথা বলেছি, রয়েল বেঙ্গল টাইগারের কথা বলি নি।

লিলিয়ান দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমার খুব আশা ছিল আমি এই সামারেই তোমার পৈতৃক বাড়ি দেখতে যাব।

তোমার আশা আপাতত পূর্ণ হচ্ছে না। কোনো একদিন নিশ্চয়ই হবে। বাংলাদেশের

মশা তোমাকে দেখিয়ে আনব। সব মশা এক্সপোর্ট কোয়ালিটির ইয়া সাইজ। একেক জন এক ছটাক দেড় ছটাক করে রক্ত খায়। রক্ত খেয়ে বমি করে ফেলে দেয়, আবার খায়। হা হা হা।

তাহেরের ভিয়েনায় এক মাসের জন্য যাবার কথা ছিল। সেটা বেড়ে হয়েছে দু'মাস। সেমিনারের শেষে একটা শর্টকোর্স শেষ করে সে ফিরবে। তাহের খুব খুশি। লিলিয়ানের খারাপ লাগছে। বেশ খারাপ লাগছে। খারাপ লাগছে এই ভেবে যে তাহের বুঝতে পারছে না তাহেরকে ছেড়ে একা একা বাস করা তার জন্য কত কষ্টের। সে তো অনায়াসে বলতে পারত—লিলি, তুমিও আমার সঙ্গে চল। ঘরদুয়াব তালাবন্ধ থাকুক। এই কথা একবারও বলছে না।

তাহেরের ফ্লাইট বুধবারে। সে মঙ্গলবার নাশতার টেবিলে কফি খেতে খেতে বলল, লিলি তুমিও চল। আমি সেমিনার করব, কোর্স করব—তুমি শহরে শহরে ঘুরবে। শুধু রাতে আমরা এক সঙ্গে ঘুমুব। এখানে একা একা এত বড় বাড়িতে থাকার তোমার দরকার কী? শেষে ভয়টয় পাবে।

না আমি ভয় পাব না।

ভয় না পেলে থাক। বাড়ি খালি রেখে যাওয়া ঠিক না।

লিলিয়ানের কান্না পাচ্ছে—কেন দে, বলতে গেল 'না আমি ভয় পাব না।' তাহের বলামাত্র সে বার্জি হলো না কেন? এখন কি সে বলবে—আমি একা একা এখানে থাকতে চাচ্ছি না। আমি তোমার সঙ্গে যাব। তুমি আমার জন্যও একটা টিকিট কর। না, তা বলা সম্ভব না। এমন ছেলেমানুষ কিছু সে করতে পারবে না।

লিলিয়ান।

হঁ।

তুমি স্বীকার না করলেও আমি বুঝতে পারছি দু'মাস একা একা থাকা তোমার জন্য কষ্টকর হবে। তোমাকে আমি একটা সাজেশান দেই। তুমি তোমার বাবা-মা'র কাছ থেকে ঘুরে আস। ওদের রাগ ভাঙিয়ে আস।

ওদের রাগ সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই বলেই তুমি এমন কথা বললে। এই রাগ ভাঙবার নয়।

আমার ধারণা তাঁদের সামনে গিয়ে তুমি কান্নাকাটি শুরু করলেই—রাগ গলে জল হয়ে যাবে। চেষ্টা করে দেখ।

চেষ্টা করে লাভ হবে না। আমার পজার চাচা মারা গেছেন, কেউ আমাকে এই খবরটাও দেয় নি। আমি জেনেছি অন্য একজনের কাছে।

এরা কোনোদিনই তোমাকে গ্রহণ করবে না?

তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে, কিংবা মারা গেলে হয়তো বা করবে।

তোমাকে ছেড়ে যাবার প্রশ্ন উঠে না। মৃত্যু বিষয়ে কিছু বলা যাচ্ছে না। যে প্লেনে উঠছি সেই প্লেনটাই ক্র্যাশ করতে পারে। তবে তোমাকে পৈতৃক বাড়ি না দেখিয়ে আমি মরব না। এ বিষয়ে নিশ্চিত থাক।

লিলিয়ানের খুব খারাপ লাগছে। হঠাৎ মৃত্যু প্রসঙ্গ চলে এলো কেন? এই প্রসঙ্গ তো আসার কথা ছিল না।

লিলিয়ান।

হঁ।

আমি প্রতিদিন একবার টেলিফোন করব।

আচ্ছা।

তোমার ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে একটা খাম বেখে যাচ্ছি। আমি বাসা থেকে বেরুবার পর খাম খুলবে। তার আগে নয়।

কী আছে খামে?

কিছু না। আরেকটা কথা, তুমি যদি একা থাকতে ভয় পাও তাহলে ঘরে তালা দিয়ে পরিচিত কারোর বাড়িতে উঠে পড়বে। কিংবা কোনো হোটেলে।

আমি ভয় পাব না।

তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে এখনি ভয় পাচ্ছ। আমি চোখের ডাক্তার। চোখ বিশেষজ্ঞ। চোখ দেখে অনেক কিছু বলে দিতে পারি। হা হা হা।

লিলিয়ান তাহেরের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, I love you.

লিলি!

হঁ।

এই দু'মাসে তুমি কি দয়া কবে একটা কাজ করবে, গাড়ি চালানোটা শিখে নেবে? এটা কোনো কঠিন ব্যাপার না। ড্রাইভিং-এর যে-কোনো স্কুলে ভর্তি হলেই হবে। গাড়ি চালানো জানলে তুমি আমাকে এয়ারপোর্টে নামিয়ে দিয়ে আসতে পারতে। দু'জন গল্প কবতে করতে যেতাম। এখন যাব ক্যাবে কবে। বিশ্রী ব্যাপার।

তাহের ঘর থেকে বের হওয়া মাত্র লিলিয়ান ড্রয়ার খুলল। সেখানে একটা চিঠি। চিঠিতে লেখা— প্রিয় লিলি, খামের ভেতর একটা ভিয়েনা যাবার ওপেন টিকিট আছে। টিকিটটা তোমার জন্য। যখন ইচ্ছে করবে তুমি চলে আসবে। আমি জোর করেই তোমাকে নিয়ে যেতাম। যাই নি। কারণ আমি সারাদিন থাকব ব্যস্ত, তুমি একা একা হোটেলে বসে থাকবে। নিজের স্বার্থে তোমাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করল না। এরচে' ওপেন টিকিট ভালো। এখানে একা একা থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়লে চলে আসবে। তখন ভিয়েনাব হোটেলে বসে বিরক্ত হলেও আমাকে দোষ দিতে পারবে না। কারণ তুমি এসেছ নিজের আগ্রহে। হা হা হা।

লিলিয়ান সঙ্গে সঙ্গেই ট্রাভেল এজেন্টকে ফোন করল। যদি বুকিং পাওয়া যায়। সম্ভব হলে আজ।

ট্রাভেল এজেন্টের বোবট গলার মেয়েটি বলল, আগামী পনের দিন বুকিং পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। সামারে ইউরোপ যাবার টিকিট কনফার্ম করা কঠিন দলবেঁধে

টুরিস্টরা যাচ্ছে। তবে তোমাকে আমি ওয়েটিং লিস্টে রেখে দিচ্ছি। কিছু পাওয়া গেলে জানাব।

অনেকদিন পর লিলিয়ান একা একা ঘুমুতে গেল। এবং আশ্চর্য অনেকদিন পর ভয়ঙ্কর স্বপ্নটা সে আবার দেখল। এবারের স্বপ্ন আরো স্পষ্ট। যেন স্বপ্ন না, পুরো ব্যাপারটা বাস্তবে ঘটে যাচ্ছে। সে দেখল— বিশাল প্রাচীন শ্যাওলা পড়া এক অট্টালিকা। সে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। লোহার প্যাঁচানো সিঁড়ি। সে উঠেই যাচ্ছে। সিঁড়ি শেষ হচ্ছে না। হঠাৎ সিঁড়ি শেষ— নিচে নামতে চেষ্টা করল। কী আশ্চর্য, নিচে নামারও ব্যবস্থা নেই। সে এখন কী করবে? তাহেরের কথা শোনা যাচ্ছে। সে অনেক দূর থেকে ডাকছে। তার গলার স্বর ক্ষীণ। প্রায় অস্পষ্ট।

লিলিয়ান! লিলিয়ান। তুমি কোথায়?

আমি এখানে।

তুমি আমাকে বাঁচাও। আমি ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছি। ওরা আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে। তুমি বাঁচাও আমাকে।

আমি নামতে পারছি না। আমি আটকা পড়ে গেছি।

আমাকে বাঁচাও। লিলিয়ান, আমাকে বাঁচাও।

আমি আটকা পড়ে গেছি।

সিঁড়ি দুলছে। প্রচণ্ড শব্দে দুলছে। দুলুনিতে লোহার রেলিং খুলে আসছে। অনেক দূর থেকে তাহেরের অস্পষ্ট স্বর কানে আসছে। খুব বাতাস দিচ্ছে। বাতাসের কারণে কিছু শোনা যাচ্ছে না।

লিলিয়ান জেগে উঠল। ঘড়িতে একটা দশ বাজে। লিলিয়ান বাকি রাতটা বারান্দায় রকিং চেয়ারে বসে কাটাল।

ডা. ভারমান চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছেন। লিলিয়ানের মনে হলো তিনি হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করছেন। যে-কোনো মুহূর্তে হেসে ফেলবেন। হাসবেন তাহেরের মতো শব্দ করে। লিলিয়ান খুব লজ্জায় পড়বে। সে-রকম কিছু হলো না। ডা. ভারমান হাসলেন না। চোখ থেকে চশমা খুলে ফেলে ক'চ পরিষ্কার করতে করতে বললেন, তুমি আবাব দুঃস্বপ্ন দেখছে?

হ্যাঁ।

মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখা তো খুব স্বাভাবিক লিলিয়ান। আমরা সুন্দর স্বপ্ন যেমন দেখি দুঃস্বপ্নও দেখি।

ডা. ভারমান, আমি তা জানি। কিন্তু আমার স্বপ্ন অন্য রকম।

অন্য রকম বলতে কী বোঝাচ্ছ?

আপনাকে ব্যাখ্যা করতে পারব না। তবে আমার মনে হয় স্বপ্নে কেউ আমাকে কিছু বলার চেষ্টা করছে।

তুমি ঠিকই ধরেছ। স্বপ্নে কেউ তোমাকে কিছু বলার চেষ্টা করছে— এটা ঠিক। অবশ্যই বলার চেষ্টা করছে। সেই কেউটা হচ্ছে— তুমি নিজে। তোমার নিজের সাব-কনশাস মাইন্ড তোমার কনশাস মাইন্ডকে তথ্য দিতে চাইছে।

ডক্টর! তা কিন্তু না। তাহেরের মহাবিপদ সম্পর্কে আমাকে কেউ একজন সাবধান করছে।

ডা. ভারমান এবার হাসলেন, তবে শব্দ করে না। নিঃশব্দে। শিশুদের প্রবোধ দেয়ার জন্য বড়রা যেমন হাসে তেমন হাসি।

শোন লিলিয়ান, ছেলেটা সম্পর্কে তোমার নিজের মধ্যেই এক ধরনের ভয় আছে। সেই ভয় হচ্ছে ছেলেটিকে হারানোর ভয়। এই ভয়ের উৎপত্তি হলো ভালোবাসায়। কাউকে গভীরভাবে ভালোবাসলেই এই ভয় তৈরি হয়। মনে হয়— এক সময় ভালোবাসার মানুষ আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। তখন আমার কী হবে? অবচেতন মনে ধীরে ধীরে ভয় জমা হতে থাকে... তোমার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।

আপনাকে আমি বোঝাতে পারছি না— আমি স্বপ্নে তাহেরদের প্রাচীন বসতবাড়ি স্পষ্ট দেখেছি। আমি সে বাড়ির লোহার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছিলাম।

তুমি তোমার কল্পনার একটি বাড়ির লোহার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছিলে।

ডা. ভারমান, আমি কিন্তু নিশ্চিত জানি একদিন ঐ বাড়িতে আমরা যাব— তাহের ভয়ঙ্কর বিপদে পড়বে।

যদি জানো তাহলে ঐ বাড়িতে যেও না।

আমাদের যেতেই হবে। এটা হচ্ছে নিয়তি। যা ঘটবার তা ঘটবেই।

লিলিয়ান তুমি তোমার নিজের যুক্তিতে আটকা পড়ে যাচ্ছে— যা ঘটবার তা যদি ঘটে তাহলে তোমাকে স্বপ্নে সাবধান করার প্রয়োজন কী?

লিলিয়ান চুপ করে রইল। ডা. ভারমান শান্ত গলায় বললেন, তুচ্ছ জিনিস নিয়ে এত ভেবো না। তুচ্ছ জিনিসকে তুচ্ছ কবতে শেখ।

লিলিয়ান উঠে দাঁড়াল। ক্লান্ত গলায় বলল, আমি ওদের বাড়ি স্বপ্নে সত্যি দেখেছি। দেখামাত্র চিনতে পারব। লোহার প্যাঁচানো সিঁড়ি...

লিলিয়ান আমি তোমাকে ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি। রাতে ঘুমুতে যাবার এক ঘণ্টা আগে দু'টা ট্যাবলেট খাবে। মনে থাকবে?

থাকবে।

ডক্টর ভারমান নিশ্চয় খুব কড়া ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন। ওষুধ খাবার পরপর লিলিয়ানের মনে হলো সে তলিয়ে যেতে শুরু করেছে। কোনো গভীর খাদে পড়ে গেছে— নিচে নেমে যাচ্ছে। অতি দ্রুত নেমে যাচ্ছে। খাদটা অন্ধকার এবং শীতল। লিলিয়ানের ভয় ভয় করতে লাগল। মনে হয় এই ঘুম তার আর ভাঙবে না। কেউ ভাঙতে পারবে না। সে বিরাট ঐ বাড়িতে মরে পড়ে থাকবে। কেউ জানবেও না।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং!

কীসের শব্দ? টেলিফোন, না কেউ এসে কলিং বেল টিপছে? না-কি গীর্জার ঘণ্টার শব্দ? তাদের বাড়ির কাছেই ক্যাথোলিক চার্চ। ওরা মাঝে মাঝে ঘণ্টা বাজায়! কেউ

মারা গেলে ঘণ্টা বাজায়। কে মারা গেছে? তাহের? তাহেরেব কি কিছু হয়েছে? প্লেন দুর্ঘটনার খবর টিভি খুব ফলাও করে প্রচার করে। ট্রেন বা বাস দুর্ঘটনার খবর কোনো পান্ডা পায় না। এর কারণ কী?

ক্রিং ক্রিং ক্রিং।

লিলিয়ান টেলিফোন তুলে ক্লান্ত গলায় বলল, হ্যালো!

ওপাশ থেকে তাহেরের গলা পাওয়া গেল।

হ্যালো লিলিয়ান— আমি। তুমি কেমন আছ?

ভালো।

গলা শুনে তো ভালো মনে হচ্ছে না। অসুখ-বিসুখ কবেছে না-কি?

না, ঘুম পাচ্ছে।

এখনই ঘুম পাচ্ছে কেন? রাত তো বেশি হয় নি। ক'টা বাজে তোমাদের ওখানে?
দশটা।

দশটা তো তেমন बात না। তুমি ঘুমে কথা বলতে পারছ না। ব্যাপার কী?

আমি ঘুমের ওষুধ খেয়েছি।

কেন?

কয়েক রাত ধবে আমার ঘুম হচ্ছে না। আমি দুঃস্থপ্ন দেখছি।

ও আচ্ছা।

লিলিয়ান জড়ানো স্বরে বলল, তোমাকে একটা জরুরি কথা জিজ্ঞেস করি। খুব জরুরি। আচ্ছা, তোমাদের গ্রামের বাড়িটা বিশাল না?

হ্যাঁ বিশাল। হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন?

কারণ আছে। এখন বলে তোমাদের বাড়ির বাইবেব দিকে ছাদ পর্যন্ত লোহার প্যাঁচানো সিঁড়ি আছে না?

না নেই।

আগে এক সময় ছিল। এখন নেই।

কখনো ছিল না। কোনো কালেও ছিল না। সিঁড়ির কথা এলো কেন?

এখন কথা বলতে পারব না— খুব ঘুম পাচ্ছে।

হ্যালো লিলিয়ান— হ্যালো!

লিলিয়ান টেলিফোন নামিয়ে বেখে সোফার ওপর ঘুঁমিয়ে পড়ল। আবাব ঘুম ভাঙল টেলিফোনের শব্দে। লিলিয়ান জড়ানো গলায় বলল, হ্যালো।

মিসেস লিলিয়ান।

ইয়েস।

ইউনাইটেড ট্রাভেল এজেন্সি থেকে বলছি— আপনি ভিয়েনার বুকিং চেয়েছিলেন। আগামীকাল বুকিং পাওয়া গেছে। লন্ডন ফ্রাংকফোর্ট হয়ে ভিয়েনা। লন্ডনে একরাত থাকতে হবে।

কোথায় থাকব ?

এয়ারপোর্ট হোটেল। এয়ারপোর্টের কাছেই।

আচ্ছা, এই হোটেল কি প্যাঁচানো লোহার সিঁড়ি আছে ?

ম্যাডাম আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না।

লিলিয়ান টেলিফোন রেখে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যে সেই প্যাঁচানো সিঁড়ি আবার দেখল। সে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। অতি দ্রুত নামছে। সিঁড়ি কাঁপছে— মনে হচ্ছে পড়ে যাবে। লিলিয়ান ঘুমের মধ্যেই ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

তাহেরের নার্ভ শক্ত।

শুধু শক্ত না, বেশ শক্ত। চরম বিপদেও তার মাথা ঠাণ্ডা থাকে। ভিয়েনায় সে কোনো বিপদের মধ্যে নেই। সুখেই আছে বলা চলে। সেমিনার চলছে। পেপার পড়া হচ্ছে, তবে আড্ডা হচ্ছে তার চেয়ে বেশি। প্রতি সন্ধ্যায় ককটেল পার্টি। হৈচৈ, নাচানাচি। তাহের এই হৈচৈ-এ নিজেকে মেশাতে পারছে না। মনে হচ্ছে তার ইস্পাতের নার্ভেও মরিচা ধরে গেছে। গত রাতে এক ফোঁটা ঘুম হয় নি। এরকম অদ্ভুত ঘটনা তাহেরের জীবনে খুব বেশি ঘটে নি। বিছানায় যাবার আগেই সে ঘুমিয়ে পড়ে। তার অনিদ্রার কারণ লিলিয়ান। লিলিয়ানের সমস্যাটা সে ঠিক ধরতে পারছে না। টেলিফোনে প্যাঁচানো সিঁড়ির কথা কেন জিজ্ঞেস করল ? তাহেরকে এত আগ্রহ করে সে কেনইবা বিয়ে করল ? আমেরিকান মেয়েগুলির কাছে বিয়ে এবং ডিভোর্স দুই-ই ডালভাত। চব্বিশ ঘণ্টার পরিচয়ে তারা বিয়ে করে ফেলে, আবার এক সপ্তাহ পর ছাড়াছাড়ি। দু'জন দু'দিকে গিয়ে অন্য দু'জনকে খুঁজে নেয়। কিন্তু লিলিয়ান এ রকম মেয়ে নয়। সে কেন তাহেরের মতো আধা-বাউগেল একজনের জন্যে এতটা ভালোবাসা জমিয়ে রাখবে ?

লিলিয়ান কোনো একটি ব্যাপারে কষ্ট পাচ্ছে। সেই কষ্টের প্রকৃতি তাহের জানে না। জানার চেষ্টা করা কি উচিত ? স্বামী-স্ত্রীর ভেতরও কিছু গোপন ব্যাপার থাকা প্রয়োজন বলে তাহের মনে করে। অবশ্যি ভিয়েনায় পা দেয়ার পর থেকে তাহেরের মনে হচ্ছে, সে ভুল করছে। তার উচিত ছিল লিলিয়ানের গোপন কষ্টের ব্যাপারগুলি জানা।

লিলিয়ানকে টেলিফোনে ধরার সব চেষ্টা বিফল হলো। সারা দিনে তাহের ছ'বার চেষ্টা করল। রিং হয়, কেউ টেলিফোন ধরে না। লিলিয়ান কি ঘর তলাবন্ধ করে কোথাও গেছে ? না-কি স্ট্রোক হয়ে ঘরে মরে পড়ে আছে ? তাহের খুব অস্থির বোধ করতে লাগল। সেমিনারে একেবারেই মন বসছে না। ইচ্ছা করছে ব্যাগ গুছিয়ে প্লেনে উঠে বসতে। রাতদুপুরে বাড়িতে পৌঁছে আমেরিকানদের মতো চৈচিয়ে বলতে— Honey I am home.

সেমিনারে 'Cataract Solvent'-এর উপর বিরক্তিকর এক বক্তৃতা হচ্ছে। বক্তা মাঝে মাঝে হাসাবার চেষ্টা করছেন, পারছেন না।

বক্তৃতার মাঝখানে তাহেরের কাছে স্লিপ এলো, আমেরিকা থেকে জরুরি কল। তাহের টেলিফোন ধরবার জন্যে প্রায় ছুটে গেল। যিনি পেপার পড়ছিলেন তিনি পড়া বন্ধ করে কড়া চোখে তাকিয়ে রইলেন।

টেলিফোন করেছে লিলিয়ান। তাহের বলল, কেমন আছ লিলিয়ান ?
ভালো আছি।

কোনো বিশেষ কারণে টেলিফোন করেছে, না এমনি ?

এমনি করেছে। আমি কি তোমাকে বিরক্ত করলাম ?

মোটোও বিরক্ত কর নি, বরং খুব আনন্দিত করেছে। আমি তোমাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করছিলাম। ঐদিন হঠাৎ টেলিফোন রেখে দিলে...

খুব ঘুম পাচ্ছিল, শরীর ভালো লাগছিল না।

প্যাচানো সিঁড়ির কথা জিজ্ঞেস করছিলে কেন ?

ও কিছু না। বাদ দাও।

লিলিয়ান, এখন তোমার শরীর কেমন ?

শরীর ভালো। তুমি আমাকে নিয়ে মোটেও চিন্তা করবে না। তুমি ঠিকমতো তোমার সেমিনার কর। কোর্স ওয়ার্ক কবে থেকে শুরু হচ্ছে ?

তাহের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে খুব নরম গলায় বলল, লিলিয়ান, তুমি কি আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবে ?

অবশ্যই দেব ?

আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, তুমি এক ধরনের ক্রাইসিসের ভেতর দিয়ে যাচ্ছ। ক্রাইসিসের কাবণটা কি আমি জানতে পারি ?

না।

বেশ, জানাতে না চাইলে জানাতে হবে না। এমন কিছু কি আছে যা তুমি আমাকে বলতে চাও ?

হ্যাঁ।

তাহলে বলো।

I love you.

অন্য সময় হলে তাহের হো-হো করে হেসে ফেলত। আজ পারল না। তার অসম্ভব মন খারাপ হয়ে গেল। টেলিফোন নামিয়ে রেখে সে দু'টা কাজ করল। প্রথম কাজ, কোর্স কো-অর্ডিনেটরকে বলল, আমার একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমি আমেরিকা ফিরে যাচ্ছি। দ্বিতীয় কাজ, ট্র্যাভেল এজেন্সিতে টেলিফোন করে বলল, আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে দু'মাস ঘুরে বেড়াব। খুব ইন্টারেস্টিং একটা ট্যুর প্ল্যান তুমি তৈরি করে দাও। ট্যুর প্লানে সমুদ্র, পাহাড়, অরণ্য— এই তিনটি জিনিসই থাকতে হবে। আমরা বিয়ের পর একসঙ্গে বাইরে কোথাও যাই নি। এটা হবে আমাদের হানিমুন ট্যুর।

অ্যাডভেঞ্চার চাও, না smooth প্ল্যান চাও ?

দুই-ই চাই।

ট্যুর প্ল্যানে হোটেলের ব্যবস্থাও থাকবে ?

হ্যাঁ থাকবে।

ইকনমি হোটেল, না এক্সপেনসিভ হোটেল ?

এক্সপেনসিভ হোটেল। ইকনমি হোটেলে আমি থাকতে পারি না— দম বন্ধ হয়ে আসে।

কোন মহাদেশ ঘুরতে চাও ? ইউরোপ, এশিয়া ? ইন্ডিয়া দেখে আস। ইন্ডিয়া এবং নেপাল। পাহাড়, সমুদ্র, অরণ্য— সবই পাবে। তাজমহল আছে— সপ্তম আশ্চর্য...

তাহের হঠাৎ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, তুমি বরং আমাদের দু'জনের জন্যে বাংলাদেশে একটা ট্যুরের ব্যবস্থা কর।

বাংলাদেশ খুব ইন্টারেস্টিং হবে বলে আমার মনে হয় না।

আমার নিজেরও মনে হয় না। তবু কর।

পুরো ট্যুরটাই হবে বাংলাদেশে ?

হ্যাঁ।

কিছু মনে করবে না— বাংলাদেশে হানিমুন ট্যুরে যেতে চাওয়ার কারণ কী জানতে পারি ?

হ্যাঁ পার। এটা আমার নিজের দেশ। হো হো হো। হা হা হা।

অনেক দিন পর তাহের প্রাণখুলে হাসল। অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল, হ্যালো মিস, আমাকে মন্টানা যাবার একটা টিকিটের ব্যবস্থা করে দাও। এমনভাবে করবে যেন আমি রাতদুপুরে উপস্থিত হতে পারি। আমি আমার স্ত্রীকে চমকে দিতে চাই। হা হা হা।

রাত তিনটায় লিলিয়ান দরজা খুলল।

তাহের দাঁড়িয়ে আছে। বাচ্চাদের খেলনার দোকান থেকে অঙ্কিত একটা মুখোশ কিনে মুখে পরেছে। মুখোশে তাকে ভয়ঙ্কর দেখানোর কথা। কেন জানি তা দেখাচ্ছে না। বরং হাস্যকর লাগছে। লিলিয়ান শিশুদের মতো চোঁচিয়ে উঠে বলল— এ কী! তুমি ?

তাহের মুখোশের আড়াল থেকে হাসতে হাসতে বলল, ইয়েস বিদেশিনী, আমি।

চলে এলে যে ?

তোমাকে দেখতে এলাম, তুমি কেমন আছ ?

লিলিয়ান বললমলে গলায় বলল, খুব খারাপ ছিলাম। এখন আর খারাপ নেই। আমি এখন ভালো আছি। খুব ভালো আছি।

ভালো থাকলে চমৎকার করে কাপাচিনো কফি বানাও। প্রচুর ফেনা যেন হয়, এবং জিনিসপত্র গোছগাছ করা শুরু কর।

আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

আমরা যাচ্ছি বাংলাদেশের একটি জেলা নেত্রকোনা। নেত্রকোনা থেকে নান্দাইল রোড স্টেশন বলে অখ্যাত একটা রেলস্টেশনে। সেখান থেকেও কুড়ি মাইল দূরের অতি

দুর্গম এক স্থানে। যেখানে আমার পূর্বপুরুষরা বোকার মতো এক বিশাল অট্টালিকা বানিয়েছিলেন। সেই অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে আসব। ঐ অঞ্চলে পৌছতে যেসব যানবাহনে আমরা চড়ব সেসব হচ্ছে— প্লেন, রেল, নৌকা, মহিষের গাড়ি, সবশেষে ‘হন্টন’।

হন্টন মানে কী ?

হন্টন মানে আমি বলব না। বাংলাদেশে যাচ্ছ, কাজেই এখন থেকে কথাবার্তা হবে বাংলায়। তুমি বুঝতে পারলে ভালো কথা, বুঝতে না পারলে নেই।

এত দ্রুত কথা বললে বুঝব কী করে ? শ্লোলি বলো, আমি সবই বুঝব।

বাংলা এমনই ভাষা যা শ্লো বলা যায় না। অর্থাৎ দ্রুত বলতে হয়। দ্রুত কথা বলা শিখে নাও। আমাদের দেশের লোকজন কাজকর্ম করে টিমাতালে কিন্তু কথা বলে দ্রুত। হা হা হা।

রেল, নৌকা, মহিষের গাড়ি এবং হন্টনের কথা বলা হলেও ট্রেন থেকে নেমে সরাসরি নৌকা নিয়ে বাড়ির ঘাটে যাওয়া যায়। ঘাটের নাম ইন্দারঘাট, গ্রাম তিলতলা। তাহের নৌকা নিয়েছে, ঠাকরাকোনা থেকে ইন্দারঘাট যাবে। দুই মাঝির নৌকা। দুই মাঝির একজনের বয়স দশ-এগার। সে আবার দার্শনিক প্রকৃতির। বেশির ভাগ সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রশ্ন করলে মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয়। তার নীরবতা অন্যজন পুষিয়ে দেয়। একটা কথা জিজ্ঞেস করলে দশটা কথা বলে।

তাহের বলল, কতক্ষণ লাগবে ?

বালক মাঝি উত্তর দিল না, মুখ ঘুরিয়ে নিল। বালক মাঝির বাবা হাসিমুখে বলল, একটানে লইয়া যামু। একটানের মামলা।

টান দিতে পারবেন তো ? আপনার নিজের অবস্থা দেখছি কাহিল— ছেলেটাও নিতান্তই শিশু।

বিছনা কইরা দিতাছি। শুইয়া ঘুমান। ইন্দারঘাটে ঘুম থাইক্যা ডাইক্যা তুলব। সাথের মেমসাব আফনের কী লাগে ?

আমার স্ত্রী।

গত বছর একজন মেমসাব দেখছিলাম। হাফপেন্ট পরা। নবীনগর হাটবারে মোটর সাইকেল নিয়া আসছে। একটা কুমড়া কিনছে। কুমড়া এরা খুব ভালো পায়। শখ কইরা খায়।

আপনি নৌকা ছাড়ার ব্যবস্থা করুন তো দেখি।

সব ব্যবস্থা হইতেছে। নূর মিয়ার নৌকায় উঠছেন। আর চিন্তার কিছু নাই।

নৌকা ছাড়ার পর মনে হলো চিন্তার অনেক কিছুই আছে। নূর মিয়া নিজে দাঁড়া করে না, হাল ধবে বসে আছে। বাচ্চা ছেলে একা দাঁড় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। দশ পথ যেতে দীর্ঘ সময় লাগবে। দিনে দিনে পৌছানোর আশা মনে হচ্ছে ছেড়ে

লিলিয়ান খুব আগ্রহ নিয়ে নদী দেখছে। তার কেমন লাগছে বোঝা যাচ্ছে না।
কালো চশমায় তার চোখ ঢাকা। তাহের বলল, কেমন লাগছে লিলিয়ান ?

খুব ভালো লাগছে— অদ্ভুত লাগছে। আশা করি খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই জার্নি শেষ হবে না।

না, এই জার্নি বলতে গেলে অনন্তকাল ধরে চলবে। তুমি ইচ্ছা করলে ঘুমিয়ে পড়তে পার।

আমি ঘুমব না।

খিদে পেয়েছে ?

না।

স্টেশনে কিছু খেয়ে নেয়া দরকার ছিল। অল্পক্ষণের ভেতর খিদে পাবে। তখন নদীর পানি ছাড়া কিছুই খেতে পারবে না।

নূর মিয়া তাদের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, খাওয়া-দাওয়া নিয়া কোনো চিন্তা কইরেন না। বসিরহাট বাজারে নৌকা ভিরাযু। বাজার সদাই কইরা রান্ধা চাপামু, খাওয়া-দাওয়া শেষ কইরা বেলাবেলি চইল্যা যামু ইন্দারঘাট। একটানের মামলা।

তাহের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। তার কাছে মনে হচ্ছে নূর মিয়া খুব যত্নগা করবে। তাদের প্রতিটি কথায় অংশগ্রহণ করবে। নিজস্ব মতামত দেবে। রান্নাবান্নায় অনেক সময় নষ্ট করার গরিকল্পনাও নূর মিয়ার আছে বলে মনে হচ্ছে।

স্যার, আপনার পরিবার বাংলা কথা কয় ?

হঁ।

ঐ মটর সাইকেলের মেমসাবও বাংলায় কথা কয়। কুমড়া কিনতে গিয়া পরিষ্কার বলছে— কুমড়ার কত দাম ?

ঠিক মতো নৌকা চালান নূর মিয়া। বেশি কথা বলার দরকার নেই।

এইটা স্যার আপনার বলা লাগব না। বেশি কথার মইদ্যে নূর মিয়া নাই। দেশটা নষ্ট হইতাছে অধিক কথার কারণে।

লিলিয়ান ইংরজিতে বলল, আহা বেচারা কথা বলতে এত পছন্দ করে আর তুমি তাকে কথা বলতেই দিচ্ছ না। বলুক না কথা। কী ক্ষতি তাতে ? আমার তো ওর কথা শুনতে ভালো লাগছে।

বুঝতে পারছ ?

কিছু কিছু পারছি। যতই কথা শুনব ততই আরো বেশি বুঝব।

তুমি এক কাজ কর— নূর মিয়ার সঙ্গে বসে বসে গল্প কর। আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

চারদিকে অসহ্য সুন্দর, এর মাঝখানে তুমি ঘুমিয়ে পড়বে ?

কাব্যগব আমার একেবারেই নেই লিলি। আমি মানুষটা পাথর টাইপ। অনুভূতিশূন্য।

আমি কি এই অনুভূতিশূন্য মানুষটির কাছে একটি আবেদন রাখতে পারি ?

হ্যাঁ পার।

আমেরিকায় ফিরে গিয়ে কী হবে ? চল, আমরা এখানেই থেকে যাই ।

তাহের সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, এই জঙ্গলে থেকে যেতে চাও ?

হ্যাঁ চাই ।

তোমার মাথা থেকে পোকাগুলি দূর কর লিলিয়ান । তুমি আমার গ্রামের বাড়ি দেখতে চেয়েছিলে বলে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি । সেখানে আমি থাকব খুব বেশি হলে তিন দিন । তারপর বাংলাদেশের সুন্দর সুন্দর জায়গাগুলি ঘুরে ঘুরে দেখব— কক্সবাজার, সুন্দরবন, সিলেট । তারপর যাব নেপাল । হিমালয়-কন্যা নেপাল দেখার পর আমেরিকা ফিরে যাব ।

লিলিয়ান ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে শান্তগলায় প্রায় ফিসফিস করে বলল, আমার একটা অদ্ভুত কথা মনে হচ্ছে । আমার মনে হচ্ছে আমাদের দুজনের কেউই এই জায়গা ছেড়ে কোনোদিন অন্য কোথাও যেতে পারব না । বাকি জীবনটা আমাদের থেকে যেতে হবে এইখানে ।

তারা ইন্দারঘাটে পৌছল সন্ধ্যার পর । কাকতালীয়ভাবেই পূর্ণিমা পড়ে গেছে । চাঁদ উঠেছে, তবে চাঁদের আলো এখনো জোরালো হয় নি । গাছপালায় সব কেমন ভুতুড়ে অন্ধকার । তাহের বলল, হাত ধর লিলিয়ান, বনের ভেতর দিয়ে যেতে হবে । এক সময় এটা ছিল সুন্দর বাগান । এখন পুরোপুরি ফরেস্ট । ‘হালুম’ শব্দ করে বাঘ বের হয়ে এলেও অবাধ হবো না । এখনো বের হচ্ছে না কেন সেও এক রহস্য ।

বাড়ি দেখে লিলিয়ান একই সঙ্গে মুগ্ধ ও দুঃখিত হলো । বিশাল অটালিকা, কিন্তু অস্তিম দশা । বাড়ির পলেস্তারা খসে খসে পড়ছে । দক্ষিণ দিকের দেয়াল ধসে পড়েছে । পুরো বাড়ি ঘন শ্যাওলায় ঢাকা । দোতলায় উঠার সিঁড়ি ভাঙা, বেলিং ধসে গেছে । একতলার বারান্দায় গোবরের স্তূপ দেখে মনে হয় বৃষ্টির সময় এই জায়গা গরু-ছাগলের আস্তানা হিসেবে ব্যবহৃত হয় ।

তাহের বিরস গলায় বলল, বাড়ি দেখলে লিলিয়ান ?

হ্যাঁ দেখলাম ।

কোনো কमेंট কবতে চাও ?

চাই ।

কবে ফেল ।

এই বাড়ি আমাব চেনা । আমি এই বাড়ি আগে দেখেছি । তোমাকে আমি লোহাব প্যাঁচানো সিঁড়ির কথা বলেছিলাম । তুমি বলেছিলে— এরকম সিঁড়ি নেই । সেই সিঁড়ি কি এখন দেখতে পাচ্ছ ? স্বপ্নে আমি অবিকল এই সিঁড়ি, এই বাড়ি দেখেছি ।

লোহার সিঁড়ি তাহেবের চোখে পড়ল । বাড়ির যে অংশ ধসে পড়েছে সিঁড়ি সেই দিকে । সিঁড়ির গা ঘেসে তেঁতুল পাতার মতো চিকন পাতার একটা গাছ । তাহের বলল, আমি এ বাড়িতে খুব ছোটবেলায় থেকেছি । এই কাবণেই সিঁড়ি চোখে পড়ে নি । যাই হোক, তুমি দাবি করছ এই বাড়িই তুমি স্বপ্নে দেখেছ ?

হঁ।

স্বপ্নের সব ভাঙা বাড়ি এক রকম হয়।

লিলিয়ান ক্লান্ত গলায় বলল, হয়তো হয়।

তাহেরের দূর-সম্পর্কের চাচা ইক্সান্দর আলী, তার দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। হাতে হারিকেন। এই গরমেও ইক্সান্দর আলীর গায়ে চাদর। পরনের লুঙ্গিটা সিক্কের, চিকচিক করছে। সপ্তের ছেলে দু'টির গায়ে গোঞ্জ। দু'জনেরই শক্ত-সমর্থ চেহারা। এরা কোনো কথা বলছে না, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লিলিয়ানের দিকে। তাকানোর ভঙ্গি শালীন নয়। তাহের একবার ভাবল ধমক দিয়ে বলে, এভাবে তাকিয়ে আছ কেন? বলল না। নিজেই সামলে নিল। চাচার দিকে তাকিয়ে বলল, বাড়ির অবস্থা তো শোচনীয়।

ইক্সান্দর আলী কাশতে কাশতে বললেন, পুরানা বাড়ি, এর চেয়ে ভালো আর কী হইব? ভাইয়া যে পড়ে নাই এইটাই আল্লাহর রহমত।

ঠিকঠাক করার জন্যে প্রতি মাসে টাকা পাঠাই।

প্রতিমাসে পাঠাও না। মাঝে-মইদ্যে পাঠাও।

অবস্থা যা তাতে মনে হয় না এ বাড়িতে থাকা যাবে।

থাকতে পারবা। দুইতলার কয়েকটা ঘর পরিষ্কার করাইয়া থুইছি।

থাকা যাবে?

হ যাবে। সাথেই এই মাইয়া কি তোমার ইসতিরি?

হ্যাঁ।

খিরিস্তান বিবাহ করছ?

হ্যাঁ।

মেয়ে দেখতে সুন্দর আছে। বিবাহ কবছ ভালো করছ। খিরিস্তান বিবাহ করা জায়েজ আছে। নবী করিম নিজেও একটা খিরিস্তান মেয়ে বিবাহ করেছিলেন।

বাবুর্চির ব্যবস্থা করতে লিখেছিলাম। ব্যবস্থা করেছেন?

গেরাম দেশে বাবুর্চি কই পামু? আমার ঘরে রান্ধা হইব। টিফিন বাক্সে কইবা তোমরারে খানা দিয়া যাব। তোমরা থাকবা কয় দিন?

এখনো বলতে পারছি না।

ডাকাইতের খুব উপদ্রব। বেশি দিন না থাকনই ভালো।

আমার সঙ্গে আছে কী যে ডাকাত নেবে?

তোমার ইসতিরিরে নিয়া যাবে। সুন্দর মেয়েছেলে— হইলদা চামড়া, বিলাতি। ডাকাইতরা খুশি হইয়া তোমার ইসতিরিরে নিয়া যাবে।

আপনি কি আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছেন?

তোমারে ভয় দেখাইয়া আমার ফয়দা কী? তোমার স্ত্রী মাছ-ভাত খায়, না পাউরুটি খায়?

মাছ-ভাত খায় ।

শুয়োরের গোশত খায় ?

তাহের ক্ষিপ্ত গলায় বলল, খেলে কী কববেন ? শুয়োরের গোশত ব্যবস্থা করবেন ?
রাগ হও ক্যান ? কথার কথা বললাম । তোমার ইসতিরি দেখি হাসতাকে । সে বাংলা
কথা বুঝে ?

তাকেই জিজ্ঞেস করুন ।

একলা একলা বাড়িতে ঢুকতেছে, তারে নিষেধ কর ।

নিষেধ করতে হবে না । তার বুদ্ধিভৃদ্ধি আছে ।

লিলিয়ান হারিকেন হাতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে । খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে উঠছে ।
মনে হচ্ছে এটা তার অনেকদিনের চেনা বাড়ি ।

ইক্সান্দর আলী থু করে তাহেরের পায়ের কাছে একদলা থুথু ফেললেন । তাহের
চমকে সরে গেল । ইক্সান্দর আলী হাই তুলতে তুলতে বললেন, খাওয়ার জইন্যে কিছু
খরচ দিও । জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য । মাছ এক জিনিস পাওয়াই যায় না । একটা মুরগির
বাচ্চা হেব দামই তোমার চল্লিশ, পঞ্চাশ ।

তাহের দু'টা পাঁচশ' টাকার নোট বের করল । তিনি বিবসমুখে নোট দু'টা হাতে
নিলেন । তাহের বলল, উত্তর দিকে ভাঙা দেয়াল ঠিক করার জন্যে টাকা চেয়েছিলেন ।
পাঠিয়েছিলাম । দেয়াল তো ঠিক হয় নি ।

বললেই ঠিক হয় না । ইট, সুরকি, সিমেন্ট আনাইতে হয় শহর থাইক্যা । বর্ষা
মৌসুমে নৌকা দিয়া আনতে হয় । বিরাট যন্ত্রণা ।

টাকাটা কী কবেছেন ?

আছে, টাকা আলাদা করা আছে ।

বাড়িটার এ কী অবস্থা! ভূতের বাড়ি বলে মনে হচ্ছে । আলোর কোনো ব্যবস্থা
কবেছেন ?

দুইটা হারিকেন আছে । মোমবাতি আছে ।

একটা টর্চের ব্যবস্থা করুন ।

আইচ্ছা করব । বললেই তো হয় না । সব আনতে হয় শহর থাইক্যা । তোমারারে
একটা উপদেশ দেই— দোতলায় থাকবা । একতলায় নামনের প্রয়োজন নাই ।

কেন ?

সাপের উপদ্রব । গত চইত মাসে সাপের কামড়ে একটা গরু মারা গেল ।

কার্বলিক এসিডেব ব্যবস্থা করতে পারবেন ? এখানে কোনো ফার্মেসি আছে ?

না । তুমি বললে ছেলে একটারে শহরে পাঠাইতে পারি । এরা কিছুই করে না ।
বাদাইম্যা হইছে । শহরে যাইতে বললে ফাল দিয়া উঠে ।

দিন, কাউকে পাঠিয়ে দিন ।

যাওনের খরচ দেও । আন কী আনা লাগব কাগজে লেইখ্যা দেও । সাপের ওষুধ ?

ওষুধে কিছু হয় না— কপালে লেখা থাকলে ওষুধের বোতলের ভিতরে বসা থাকলেও সাপে কামরাইব।

আমি কাগজে লিখে দিচ্ছি। দয়া করে আনবার ব্যবস্থা করুন। একশ' টাকা দিচ্ছি যাওয়ার খরচ। এতে হবে ?

আরো কিছু দেও। একশ' টাকা আইজ-কাইল কোনো টেকাই না। তুমি থাক বিদেশে। এই জন্যে বুঝতাম না। আর একটা কথা, তোমার পরিবারেরে নিয়া আমার বাড়িত একদিন যাওয়া লাগে। বাড়ির মেয়েছেলেরা দেখতে চায়। এরা আবার কার কাছ থাইক্যা জানি ছনছে— বিলাতের মাইয়াছেলে পিসাব পায়খানার পরে পানি নেয় না। বড় 'ঘিন্নাকর', কিন্তু কী আর করা! যে দেশে যে নিয়ম! তোমার আমার করণের কিছু নাই।

তাহের বিরক্তমুখে বলল, ঠিক আছে আপনি এখন যান। রাতে খাবার পাঠিয়ে দেবেন। খাবার পানি পাঠাবেন।

আইচ্ছা। তোমরা নিশ্চিত হইয়া ঘুমাও। ছেলে দুইটারে বইল্যা দিচ্ছি রাইতে পাহারা দিতে। এরা কাজকাম কিছুই করে না। বাদাইম্যা। যে কয়দিন থাকবা এরা পাহারা দিব। কিছু খরচ-বরচ দিও।

তাহের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। তার মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

লিলিয়ান হারিকেন হাতে দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে। ইন্সান্দর আলী দোতলার জানালার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তোমার ইসতিরি বড়ই সৌন্দর্য। এইটা বিপদের কথা। ডাকাইতে সন্ধান পাইলে বড়ই খুশি হইব। ইন্সান্দর আলীর দুই ছেলেও গভীর আগ্রহ নিয়ে দোতলার বারান্দার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের চোখে পলক পড়ছে না।

লিলিয়ান বারান্দা থেকে চোঁচিয়ে বলল, উপরে চলে আস। দোতলাটা অসম্ভব সুন্দর। মার্বেল পাথরের মেঝে।

লিলিয়ানের খুব ভালো লাগছে। সে হারিকেন হাতে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাচ্ছে। তার ভাবভঙ্গি কিশোরীর মতো। যে ঘরে আজ রাতে তারা থাকবে সেই ঘর দেখে সে মুগ্ধ। বিশাল দু'টা জানালা। জানালার পাশে দাঁড়ালেই দূরের ব্রহ্মপুত্র দেখা যায়। নদীতে চর পড়েছে। চরের ধবধবে সাদা বালি চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে। কী হাওয়া! উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়। শোবার ঘরটা কী প্রকাণ্ড! যেন ফুটবল খেলাব মাঠ। মাঠেব মাঝখানে খাট পাতা হয়েছে। কালো রঙের একটা খাট, যার চারদিকে রেলিং দেয়া। খাটে সরাসরি উঠার উপায় নেই, এত উঁচু। টুলে পা দিয়ে উঠতে হয়। ঘর ভর্তি ভারী ভারী আলমিরা। লিলিয়ান প্রতিটি আলমিরা খুলে দেখল। সব শূন্য। খাটের মাথার কাছে গোল স্বেত-পাথরের টেবিল। এ বাড়ির অনেক দরজা-জানালা লোকজন খুলে নিয়ে গেছে। এগুলি নেয় নি কেন ?

লিলিয়ান বলল, এই টেবিল, এই খাট যে-কোনো মিউজিয়াম লুফে নেবে। মনে হচ্ছে হাজার বছরের পুরনো।

লিলিয়ানের মুগ্ধতা তাহেরকে স্পর্শ করছে না। সে বেশ ক্লান্ত। বারান্দায় রাখা বালতির পানিতে হাত-মুখ ধুয়ে সে বিছানায় বিরসমুখে বসে আছে। এ বাড়িতে রাত্রিযাপন ঠিক হবে কি-না তা বুঝতে পারছে না। সাপের ব্যাপারটা তাকে চিন্তিত করছে।

লিলিয়ান বলল, কথা বলছ না কেন ?

কী বলব ?

তোমাদের এইসব ফার্নিচারের বয়স কত ?

তাহের হাই তুলতে তুলতে বলল, এদের বয়স দুশ' বছরের মতো। সবই আমার দাদার বাবা বানিয়েছিলেন। খাটটা বার্মা থেকে কেনা। এই যে বাড়ি দেখছ, এই বাড়িও উনার করা।

খুব ধনী মানুষ ছিলেন ?

হতদরিদ্র ছিলেন। পরের বাড়িতে কামলা খাটতেন। সুপারির ব্যবসা করে ধনী হন। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে তিনি লাখের বাতি জ্বালিয়েছিলেন।

লাখের বাতিটা কী ?

আমাদের অঞ্চলে নিয়ম ছিল— কেউ লাখপতি হলে লাখের বাতি জ্বালাতে হতো। একটা লম্বা বাঁশের মাথায় হারিকেন জ্বালিয়ে ঘরের উঠানে রেখে দিত। এই হলো লাখের বাতি। দূর থেকে দেখে লোকজন বুঝত এই অঞ্চলে একজন লাখপতি আছে।

এই নিয়ম কি এখনো আছে ?

পাগল হয়েছ ? এই নিয়ম থাকলে উপায় আছে ? আজ কোনো বাড়িতে লাখের বাতি জ্বালালে কালই ডাকাতি হবে। সেই বাড়িতে যদি তোমার মতো রূপবতী কেউ থাকে তাহলে তো কথাই নেই।

আমাব মনে হয় এ বাড়িতে এসে তোমার ভালো লাগছে না।

এখন পর্যন্ত ভালো লাগার মতো কোনো কারণ ঘটে নি।

আমার কাছে কিছু অসাধারণ লাগছে।

ভাঙা বাড়ি অসাধারণ লাগছে ?

পুরনো বাড়ি ভাঙা তো থাকবেই। এই অঞ্চলের জন্যে পুরনো বাড়ি সুন্দর মনিয়ে গেছে। ঝকঝকে নতুন বাড়ি এখানে মানাতো না। আমি এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাচ্ছি আর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছি।

ভয়ে ?

না ভয়ে না। মনে হচ্ছে এই ঘরগুলিতে কত না স্মৃতি, কত বহস্য— আমি ঠিক করেছি আজ সারারাত ঘুমব না।

হারিকেন হাতে এক ঘর থেকে আবেক ঘরে ঘুরবে ?

হ্যাঁ।

খুব ভালো কথা। ঘুরে বেড়াও। দয়া করে আমাকে ঘুমুতে দিও। আমি খুব ক্লান্ত হয়ে আছি। ডিনার শেষ হওয়া মাত্র শুয়ে পড়ব।

লিলিয়ান বলল, তুমি আমাকে ক্রমাগত মশার ভয় দেখিয়েছ। মশা কিছু নেই।
তাই দেখছি। তবে ঘুমুতে হবে মশারি খাটিয়ে। মশা না থাকুক, পোকামাকড়
আছে।

আজ রাতে না ঘুমুলে কেমন হয় ?

কী বললে ?

চল আমরা বারান্দায় বসে জোছনা দেখি।

আর কোনো পরিকল্পনা আছে ?

আমার খুব শাড়ি পরতে ইচ্ছা করছে। সুন্দর একটা শাড়ি জোগাড় করতে পারবে ?
আমাকে শিখিয়ে দেবে কী করে পরতে হয় ?

তোমার কি মনে হয় না লিলিয়ান তুমি বাড়াবাড়ি করছ ?

না, আমার মনে হয় না।

আমার কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি বাড়াবাড়ি করছ।

লিলিয়ান কিছুক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, তোমাব এবকম মনে হয়ে
থাকলে আমি দুঃখিত। আমার যা মনে হয়েছে আমি তোমাকে বলেছি। তোমাদের এই
বাড়িটা ভাঙা। দরজা-জানালা লোকজন খুলে নিয়েছে। তারপরেও এ বাড়িতে পা দেয়ার
পর থেকে আমার ভালো লাগছে। এক ধবনেব আনন্দ অনুভব করছি। সেই আনন্দ
লুকানোর চেষ্টা করি নি। হয়তো সেটা করাই উচিত ছিল।

লিলিয়ান বারান্দায় চলে গেল। তার খুব খারাপ লাগছে। চোখে পানি এসে যাচ্ছে।
এই দৃশ্য দেখলে তাহের হেসে উঠতে পারে। লিলিয়ান চোখের পানি দিয়ে তাহেরকে
হাসাতে চায় না। লিলিয়ান একটা ঘর থেকে অন্য ঘবে যেতে লাগল। তার কাছে কেন
জানি মনে হচ্ছে, ঘরগুলি তাকে ডেকে ডেকে বলছে, এসো লিলিয়ান, এসো। আমাকে
দেখে যাও।

তাহের এসে লিলিয়ানকে আবিষ্কার করল সর্বদক্ষিণের বারান্দায়। এখান থেকেই
লোহার সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে।

লিলিয়ান!

কী ?

তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ ?

না।

মনে হচ্ছে তুমি রাগ করেছ। আসল ব্যাপার কী জানো, আমার চাচার সঙ্গে কথা
বলে মেজাজ হয়েছে খাবাপ। কিছুই ভালো লাগছিল না। এই কারণেই তোমার সঙ্গে
খারাপ ব্যবহার করেছি। কিছু মনে করো না।

আমি কিছু মনে করি নি।

খাওয়া-দাওয়াব পর আমরা ছাদে বসে জোছনা দেখব।

ছাদে উঠার সিঁড়ি আছে ?

হ্যাঁ, সিঁড়ি আছে। তালাবন্ধ। চাচার ছেলেটাকে পাঠিয়েছি চাবি আনতে।
থ্যাংক ইউ।

তোমার খিদে পেয়েছে লিলিয়ান?

এখনো খিদে পায় নি।

একটা বিরিট ভুল হয়েছে। ওদের বলে দেয়া উচিত ছিল মসলা কম দিতে। এরা
প্রচুর মসলা দিয়ে রান্না করবে। ঝালের জন্যে কিছু মুখে দিতে পারবে না।

আমার খাওয়া নিয়ে ভেবো না। তুমি যা খেতে পারবে, আমিও পারব।

সব ঘর দেখা হয়েছে?

হ্যাঁ।

আয়নাঘর? আয়নাঘর দেখেছ?

না তো। আয়নাঘর কী?

ওটা একটা ইন্টারেস্টিং ঘর। আমার দাদার বাবা— দি গ্রেট জাঙ্গির মুনশি, এই ঘর
বানিয়েছিলেন। তালাবন্ধ কি-না জানি না। তালাবন্ধ থাকার কথা। চল দেখি— খুঁজে বের
কবতে হবে— কোন দিকে তাও জানি না।

ঘরটা তালাবন্ধ। বেশ বড় তালা ঝুলছে। কয়েকবার ঝাঁকি দিতেই তালা খুলে
গেল। অনেকদিন বন্ধ থাকায় ঘরে ভ্যাপসা জলজ গন্ধ। ছোট্ট ঘর, কোনো জানালা নেই।
ঘরে ঢোকার একটাই দরজা। সেই দরজাও নিচু। ঘবেব একদিকের পুরো দেয়াল জুড়ে
বিশাল আয়না। অন্য পাশে কাবার্ড।

লিলিয়ান বলল, এত বড় আয়না কোথায় পেলেন?

তাহেব হাসতে হাসতে বলল, জানি না কোথায় পাওয়া গেছে। দি গ্রেট জাঙ্গির
মুনশি জোগাড় করেছিলেন সাহেব বাড়ি থেকে। অর্থাৎ ইংরেজদের কাছ থেকে। এই
ঘরটাব নাম হলো আয়নাঘর। জাঙ্গির মুনশির স্ত্রী তিতলী বেগম এই ঘরে সাজগোজ
কবতেন। সাজের সময় বাইরের কেউ যেন দেখতে না পায় এ জন্যেই এ-ঘরের কোনো
জানালা নেই। লক্ষ করেছে?

হ্যাঁ, লক্ষ করেছি।

ঐ মহিলা অসম্ভব রূপবতী ছিলেন। তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রের জন্মদিনে মারা যান।
মাত্র ষোল বছর বয়সে।

আহা!

আয়নাঘর উনার খুব প্রিয় ছিল। উনি যখন মোটামুটি নিশ্চিত হলেন যে মারা
যাচ্ছেন তখন তিনি তাঁর স্বামীকে বলেন তাঁকে আয়নাঘরে নিয়ে যেতে। তাই করা হলো।
তিনি মারা গেলেন আয়নাঘরে। জাঙ্গিব মুনশি দ্বিতীয়বার বিয়ে কবেন নি। স্ত্রীর মৃত্যুর
পর তিনি প্রায় চল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন। এই চল্লিশ বছর তিনি আয়নাঘর বন্ধ করে
রেখেছিলেন। একদিনের জন্যেও খুলেন নি। উনার মৃত্যুর পর আয়নাঘর প্রথম খোলা
হয়। এসো লিলিয়ান, খুব সম্ভব খাবার নিয়ে এসেছে। খেয়ে নেই। খিদে লেগেছে।
তাছাড়া আমার বেশিক্ষণ থাকা ঠিকও নয়। আয়নাঘরে কোনো পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

তুমি যাও। আমি এই ঘরে একটু একা একা থাকি।

কেন বলো তো ?

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগছে। এই দেখ আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে— দেখ, দেখ।

তাহের বিস্মিত হয়ে বলল, হ্যাঁ দেখলাম। কারণটা কী ?

প্রায় দেড়শ' বছর আগে এই বাড়ির বউ এক আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখেছিল। আজ আমি নিজেকে দেখছি। আমিও এই বাড়িরই বউ। এই আয়নাটা আমার।

তাহের বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল। লিলিয়ান বলল, আমি যখন অসুস্থ হয়ে পড়ব তখন তুমি আমাকে এই বাড়িতে নিয়ে আসবে। আমি চাই আমার মৃত্যু যেন আয়নাঘরে হয়।

সে তো অনেক দূরের ব্যাপার। আপাতত ভাত খাই চল।

প্লিজ, প্লিজ, আমি খানিকক্ষণ এখানে একা থাকব। খুব অল্প কিছুক্ষণ।

তাহের চিন্তিতমুখে বের হয়ে এলো। লিলিয়ান তাকিয়ে আছে আয়নার দিকে। তাহের লিলিয়ানের কাণ্ডকারখানা কিছুই বুঝতে পারছে না।

রান্নার আয়োজন ভালো। রুই মাছ ভাজা। পোলাও কোরমা। এক বাটি পায়েরস। লিলিয়ানের জন্যে একটা কাঁটা চামচও দেয়া হয়েছে। তবে পোলাও সিদ্ধ হয় নি— চাল চাল রয়ে গেছে। কোরমা রান্না হয়েছে প্রচুর পরিমাণে চিনি দিয়ে। খেতে রসগোল্লার মতো লাগছে। তাহের বিরক্তমুখে বলল, ভাজা মাছ খেয়ো না লিলিয়ান। মাছটা পচা বলে ভেজে ফেলেছে।

খাদদ্রব্যের মধ্যে পানটাই আরাম করে খাওয়া গেল। মৌবী দিয়ে সুন্দর করে বানানো। লিলিয়ান দু'টা পান মুখে দিল। সে বিস্মিত হয়ে বলল, খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে তোমরা ভেজিটেবল খাও কেন তা তো বুঝলাম না।

তাহের বলল, এটা ভেজিটেবল না। এর নাম পান। খাবার পর খেতে হয়। কুৎ করে গিলে ফেললে হবে না। ক্রমাগত চিবিয়ে যাবে। গিলতে পারবে না।

কতক্ষণ চিবাবো ?

আধঘণ্টা তো বটেই।

তাতে লাভ কী ?

মুখের একটা একসারসাইজ হয়। এইটুকুই লাভ।

ঠাট্টা করছ ?

মোটাই ঠাট্টা করছি না। তুমি কি ভেবেছ আমার কাজ শুধু ঠাট্টা করা ?

জিনিসটা খেতে আমার ভালো লাগছে।

ভালো লাগলে খাও। আমাদের গ্রামের নতুন বউদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের একটি হচ্ছে পান খেয়ে ঠোঁট লাল করা।

আমি তো নতুন বউ না।

অবশ্যই নতুন বৌ। ছেলেমেয়ে না হওয়া পর্যন্ত আমাদের দেশের বউদের নতুন বউ ধরা হয়।

কোনো মহিলার দশ বছরেও যদি ছেলেমেয়ে না হয় তাহলে কি তাকে নতুন বউ ধরা হবে?

না। তখন তাকে বলা হবে বাঁজা-মেয়েমানুষ। অমঙ্গলজনক একটি ব্যাপার। সেই মেয়েকে কোনো উৎসবে ডাকা হবে না। সকালবেলা কেউ তার মুখ দেখতে চাইবে না।

তোমাদের নিয়ম-কানুন ভারী অদ্ভুত।

অদ্ভুত তো বটেই। আরো অদ্ভুত কথা শুনবে? আমাদের দেশে স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে পাশাপাশি বসে পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকাবে না।

তাকালে কী হয়?

তাকালে তাদের যে সন্তান হবে সে হবে চরিত্রহীন।

আবার তুমি তামাশা করছ। কী জন্যে করছ তাও বুঝতে পারছি। তুমি আমার সঙ্গে জোছনা দেখতে চাচ্ছ না।

জোছনা দেখতে অসুবিধা নেই। চাঁদের দিকে না তাকালেই হলো।

ছাদে সত্যি সত্যি বসবে আমার সঙ্গে?

ঐ বসব। তবে ছাদে না। বারান্দায়। তোমাব বিখ্যাত চাঁদ বারান্দা থেকেও দেখা যায়। চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি যদি মুগ্ধ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি কিছু মনে করো না। ঘুমিয়ে পড়াব সম্ভাবনা নিরানব্বই দশমিক নয় ভাগ।

ইস্কান্দর আলীর মেজো ছেলে বারান্দা ঝাঁট দিচ্ছে। তাহেব তাকে বারান্দায় চাদর পাততে বলেছে। এই ছেলেই খাবার নিয়ে এসেছে। বাজার থেকে জিনিসপত্র কিনে এনেছে। তার বুদ্ধি কোন পর্যায়ে তাহের এখনো ধরতে পারছে না। সে টর্চ কিনে এনেছে, কিন্তু ব্যাটারি আনে নি।

তোমার নাম কী?

ছালাম।

ছালাম না সালাম?

ছালাম। ছালাম আলী।

ছালাম তোমাকে টর্চের ব্যাটারি আনতে যেতে হবে, পারবে না?

হঁ।

দোকান কি অনেক দূর?

হঁ।

দূর হলে থাক, সকালে এনে দিও।

ছাইকেল আছে।

সাইকেল থাকলে সাইকেলে করে নিয়ে এসো।

তারা ঘুমুতে গেল রাত দু'টায়। তাহের বলল, হারিকেন জ্বালানো থাকুক। লিলিয়ান বলল, হারিকেন জ্বালানো থাকলে ঘরে চাঁদের আলো আসবে না। তাহের বলল, তোমার ভেতর এত কাব্যভাব আছে তা কিন্তু আমার জানা ছিল না।

জানা থাকলে কী করতে, আমাকে বিয়ে করতে না ?

তাহের হাসল। হাসতে হাসতে বলল, চা খেতে ইচ্ছা করছে। আমার সমস্যা হচ্ছে ঘুমের প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেলে ঘুম আসে না। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, বাকি রাতটা তুমি আরাম করে ঘুমবে, আর আমাকে জেগে থেকে তোমার বিখ্যাত জোছনা দেখতে হবে।

চা সত্যি খেতে চাও ? আমার কাছে টি-ব্যাগ আছে, সুগার কিউব আছে। শুধু দুধ নেই।

পানি গরম করবে কীভাবে ?

কাগজ জ্বালিয়ে পানি গরম করব।

কাগজ পাবে কোথায় ?

তুমি ডার্টি জোকস-এর যে বইটি এনেছ, সেটা পুড়িয়ে ফেলব। বানাব চা ?

মন্দ না। পারলে বানাও।

তুমি চুপচাপ বিছানায় বসে থাক। আমি চা বানিয়ে আনছি।

আমি তোমার পাশে বসি।

লিলিয়ান চায়ের পানি গরম করছে। পাশে বসে আছে তাহেব। তাব ঘুম কেটে গেছে বলে মনে হচ্ছে না। সে খানিকক্ষণ পরপর হাই তুলছে। লিলিয়ান বলল, তুমি ঐ মহিলা সম্পর্কে আরো কিছু বলো।

কোন মহিলা ?

আয়নাঘরে যিনি মারা গিয়েছিলেন।

আমি কিছুই জানি না। খুব রূপবতী ছিলেন, এইটুকু জানি। জাঙ্গির মুনশি বেনারস থেকে একজন আর্টিস্ট এনে তাঁর কিছু ছবি আঁকিয়েছিলেন। সেইসব ছবি দেখলে তাঁর সম্পর্কে আন্দাজ পেতে। তবে ছবিও নেই। উনার মৃত্যুর পব জাঙ্গিৎ মুনশি তাঁর স্ত্রীর সব ছবি পুড়িয়ে ফেলেন।

লিলিয়ান কোমল গলায় বলল, উনাকে খুব দেখতে ইচ্ছা করছে।

তাহেব চা খাচ্ছে। কাচের গ্লাসে চা দেয়া হয়েছে। গ্লাস গরম হয়ে গেছে— চা খাওয়া যাচ্ছে না। তাহেব চায়েব গ্লাসে ফুঁ দিতে দিতে বলল, আমার মা'র ধারণা উনি একবার তিতলী বেগমকে দেখেছিলেন।

উনি দেখবেন কীভাবে ?

মা'র ধারণা, দেখেছেন। গভীর রাতে আয়নাঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ শুনেন আয়নাঘরের ভেতর থেকে বুনবুন চুড়ির শব্দ। আয়নাঘর তালাবন্ধ। চুড়ির শব্দ কীভাবে আসবে ? মা খুব অবাক হলেন। উনার সাহসের সীমা ছিল না। চা'বি নিয়ে আয়নাঘর খুললেন। মোমবাতি হাতে একা একা আয়নাঘরে ঢুকলেন।

তারপর ?

তারপরের ব্যাপার পরিষ্কার জানা যায় না। মা কিছু একটা দেখেছিলেন। কী দেখেছিলেন কিছুই ভেঙে বলেন নি। এরপর থেকে তাঁর অভ্যাস হয়ে গেল— গভীর রাতে আয়নাঘরের দরজা খুলে সেখানে ঢুকতেন। অনেকক্ষণ থাকতেন। আয়নাঘরের মেঝেতে পাটি পেতে দুপুরে ঘুমুতেন। আমার বাবা জানতে পেরে খুব রাগ করেন। বাবার ধারণা, এই বাড়িটা অভিশপ্ত। এ বাড়িতে থাকলে অকল্যাণ ছাড়া কল্যাণ হবে না। তিনি মা'কে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যান।

কোথায় যান ?

প্রথম ময়মনসিংহ শহরে যান। সেখান থেকে যান ঢাকায়। ঢাকায় যাবার পর থেকে মা'র মাথায় পাগলামি ভর করে। তিনি রাতে একেবারেই ঘুমুতেন না। ছটফট করতেন। আর বলতেন— ঐ বাড়ি ফেলে এসেছি, উনি খুব রাগ করছেন। খুব মন খারাপ করছেন। উনার কত শখ বাড়ি ভর্তি থাকবে ছেলেমেয়েতে। তারা হৈচৈ করবে, চৈচামেচি করবে।

উনি মানে কে ? তিতলী বেগম ?

হঁ। মা খুব কান্নাকাটি শুরু করেন বাড়ি যাবার জন্য। বাবা পাত্তাই দেন নি। বাবা বলতেন— ঐ বাড়িতে থাকার জন্যেই তোমার মাথার দোষ হয়েছে। আমি ওখানে তোমাকে নিয়ে যাব না। বাবা নিয়ে যান নি। মা'র মৃত্যু হয় ঢাকায়।

তোমার কি মনে হয় না তোমার বাবা ভুল করেছিলেন ?

না, মনে হয় না। বাবা যুক্তিবাদী মানুষ ছিলেন। মা'ব মনের ভ্রান্তিকে তিনি আমল দেন নি। তুমি নিশ্চয়ই মনে কর না আয়নাঘরে একজন মৃত মানুষ বাস করে।

জগৎ বড়ই রহস্যময় তাহেব।

জগৎ মোটেই রহস্যময় নয়। জগৎ কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলায় বাঁধা। প্রকৃতি কখনো কোনো নিয়মের ব্যতিক্রম হতে দেয় না। রহস্যের বাস মানুষের মনে। মানুষই রহস্য লালন করে। যেমন তুমি কর। কত আয়োজন করে জোছনা দেখলে। জোছনার যে সৌন্দর্য তার সবটাই তুমি আরোপ কবেছ। জোছনা কী ? সূর্যের প্রতিফলিত আলো— একে নিয়ে মাতামাতি করার কিছু নেই। কিন্তু তুমি মাতামাতি কবেছ। তোমার মতো অনেকেই করছে। কবিতা লেখা হচ্ছে। গান লেখা হচ্ছে— আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে...।

লিলিয়ান বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। 'ছালাম' সব কাজ ফেলে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লিলিয়ানের দিকে। লিলিয়ান বাংলায় বলল, 'আপনাদের পাঠানো খাবার উত্তম হয়েছে। পান খুবই উত্তম হয়েছে।' ছালাম কিছু বলছে না। তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে লিলিয়ানের কোনো কথা তার কান দিয়ে ঢুকছে না। লিলিয়ান বলল, আমি আমাদের এই বাগান প্রাতঃকালে পরিচ্ছন্ন করব। আমি কিছু লেবার নিয়োগ করব। দয়া করে আমাকে সাহায্য করবেন। আপনি কি আমার বাংলা ভাষা বুঝতে পারছেন ?

ছালাম কিছু বলল না। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল। তাহের বলল, বিদেশী উচ্চারণে তোমার অদ্ভুত বাংলা সে কিছুই বুঝে নি। বোঝাব চেষ্টাও করে নি। আমিই

বুঝতে পারি না, আর বুঝবে ছালাম আলী! সে হা করে তাকিয়ে ছিল তোমার দিকে।
যাই হোক, এসে বসো এখানে। জোছনা দেখ।

লিলিয়ান বসল। তাহের হাই তুলতে তুলতে বলল, কাপাচিনো কফি খেতে পারলে ভালো হতো। যা ঘুম পাচ্ছে বলার না। চাঁদটাকে ঘুমের ট্যাবলেটের মতো লাগছে। যতই দেখছি ততই ঘুম পাচ্ছে। ভালো কথা, জঙ্গল পরিষ্কারের কথা কী বলছ? এইসব মাথা থেকে দূর কর।

না, দূর করব না। আমি বাগান পরিষ্কার করব। বাড়ি ঠিকঠাক করব। আমাদের এত সুন্দর বাড়ি এভাবে পড়ে থাকবে?

সুন্দর দেখলে কোথায়?

আমার কাছে খুব সুন্দর লাগছে।

আচ্ছা ধরে নিলাম সুন্দর। কে থাকবে তোমার এই সুন্দর বাড়িতে?

আমরা দু'জন থাকব। আমাদের ছেলেমেয়েরা থাকবে। এরা বাগানে খেলবে। আমি এদের জন্যে দোলনা বানিয়ে দেব। জোছনা রাতে বাচ্চাদের হাত ধরে আমরা নদীর পারে হাঁটব। আর একটা বড় নৌকা কিনব। নদীর ঘাটে নৌকা বাঁধা থাকবে।

তাহের হাসতে হাসতে বলল, কী বলছ পাগলের মতো?

আমার মনের ইচ্ছার কথা তোমাকে বলছি।

লোকালয় ছেড়ে আমরা বনে পড়ে থাকব?

হ্যাঁ।

তোমার কী হয়েছে বলো তো লিলিয়ান?

বুঝতে পারছি না।

আমার মনে হয় ঘুমের অভাবে তোমাব চিন্তাশক্তি এলোমেলো হয়ে গেছে। ভালো করে ঘুমাও— দেখবে মাথা থেকে ভূত নেমে গেছে। চল শুয়ে পড়ি।

তুমি শুয়ে পড়। আমি খানিকক্ষণ বসি।

আচ্ছা বসো, আমি তাহলে এখানেই শুয়ে থাকি। তোমার যখন জোছনা দেখা শেষ হবে, আমাকে ডেকে দিও।

একটুক্ষণ জেগে থাক না। আমার খুব গল্প করতে ইচ্ছা করছে।

তাহের হাই তুলতে তুলতে বলল, আমি জেগে থাকার চেষ্টা করছি। তুমি গল্প শুরু কর। আমার পক্ষে গল্প করা সম্ভব না। আমার পক্ষে যা সম্ভব তা হচ্ছে হাই তোলা। ঐ কাজটা আমি দায়িত্বের সঙ্গে করে যাচ্ছি।

তাহের দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করল। মনে হচ্ছে সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

লিলিয়ান গলার স্বর হঠাৎ অনেকখানি নিচে নামিয়ে বলল, আমি তোমাকে কতখানি ভালোবাসি তা কি তুমি জানো?

তাহের চোখ না মেলেই বলল, জানি।

কীভাবে জানো?

বলতে চাচ্ছি না। বললে তুমি লজ্জা পাবে।

আমি লজ্জা পাব না। তুমি বলো। আমার শুনতে ইচ্ছে করছে।

তোমার শুনতে ইচ্ছা করলেও, আমার বলতে ইচ্ছা করছে না। আমার ঘুমুতে ইচ্ছা করছে। আমি কি তোমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তে পারি ?

হ্যাঁ পার। আমি সারারাত কিছু এখানেই বসে থাকব। তুমি এইভাবেই ঘুমাবে।

তোমার মধ্যে পাগলামির বীজ আছে লিলিয়ান। আমার ধারণা বেশ ভালো মতো আছে।

লিলিয়ান হালকা গলায় বলল, হয়তো আছে। এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে কী জানো ? আমার মনে হচ্ছে এই যে— তুমি আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছ— একজন কেউ তা দেখছে। খুব আনন্দ নিয়ে দেখছে।

সেই একজন কেউ'টা কে ? ভূত-প্রেত ?

বুঝতে পারছি না, তবে তার উপস্থিতি অনুভব করছি।

এ বাড়িতে তোমাকে বেশিদিন রাখা ঠিক হবে না। তোমার ব্রেইন পুরোপুরি নষ্ট হবার আগেই আমাদের চলে যেতে হবে।

ছালাম উঠে এসেছে। তাহের লিলিয়ানের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে দেখেও সে অস্বস্তি বা লজ্জা কোনোটাই বোধ করল না। শুকনো গলায় তাহেরকে বলল, ব্যাটারি আনছি।

তাহের তাকিয়ে দেখল ছালাম দু'টি পেনসিল ব্যাটারি নিয়ে এসেছে। তাহেরের কেন জানি মনে হলো সে এটা নির্বুদ্ধিতার কারণে করে নি। ইচ্ছা করে করেছে।

আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যাও।

আর কিছু লাগবে ?

না, আব কিছু লাগবে না।

লিলিয়ান বলল, আজ হঠাৎ তুমি এত গুছিয়ে কথা বলছ কেন ? এত লজিক দিয়ে তুমি কখনো কথা বলো না।

তা বলি না, আজ বলছি। কখনো আমার মনে হচ্ছে তোমার নিজস্ব জগতে লজিকের স্থান খুব কম। তোমার লজিক ভালো থাকলে কখনো আমাকে বিয়ে করতে না। আর কবলেও ভালো মতো যৌজখবর করতে— তুমি কে ? আমার বাবা-মা কোথায়, ক'ভাই বোন... ? কোনো প্রশ্ন না, কোনো কৌতূহল না— স্বপ্নে পাওয়া মানুষের মতো বলে বসলে— আমি আমার জীবনটা তোমার সঙ্গে কাটাতে চাই।

আমি কি ভুল করছি ?

তুমি ভুল করছে কি-না তা আমি এই মুহূর্তে বলতে পারব না। তুমি নিজেও বুঝবে না। আজ থেকে দশ বা পনের বছর পর ধরতে পারবে।

কীভাবে ধরবে ?

আমাকে বিয়ে করার সময়, আমার সম্পর্কে তোমার কিছু প্রত্যাশা ছিল। আমি যদি তা মেটাতে পারি তাহলে বুঝতে হবে আমাকে বিয়ে করে তুমি ভুল কর নি। মজার

ব্যাপার হচ্ছে, আমি নিজে এখনো জানি না কোন প্রত্যাশা নিয়ে তুমি আমাকে বিয়ে করেছ। জানলে মেটাবার চেষ্টা করতাম।

তোমার প্রতি আমার কোনো প্রত্যাশা নেই। আমাকে তোমার পাশে থাকতে হবে—এটা হলো নিয়তি।

তাহের সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, নিয়তি হচ্ছে আরেকটা বাজে কথা। যারা দুর্বল মানুষ, অর্থাৎ যারা দুর্বল লজিকের মানুষ— নিয়তি তাদের একটি প্রিয় শব্দ। এই শব্দ আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত। অভিধান থেকে এই শব্দ ভুলে দেওয়া উচিত।

লিলিয়ান কোমল গলায় বলল, পৃথিবীর সব ভাষার অভিধানে কিন্তু এই শব্দটি আছে। নিয়তি বলে কিছু একটা আছে বলেই আছে।

তাহের রাগী গলায় বলল, তুমি একটা হাস্যকর লজিক দিলে লিলিয়ান। অভিধানে দৈত্য শব্দটাও আছে। পরী আছে, ড্রাগন আছে, মৎস্যকন্যা আছে। তুমি কি কখনো দৈত্য, পরী বা ড্রাগন দেখেছ? পৃথিবীর কেউ কি দেখেছে?

না, দেখে নি। এত রেগে যাচ্ছ কেন? চল ঘুমুতে যাই।

তাহের মুখে বলছিল তার ঘুম ছুটে গেছে, বাস্তবে দেখা গেল বিছানায় শোয়ামাত্র তার নাক ডাকতে শুরু করেছে। হারিকেন নিভিয়ে লিলিয়ান এসে পাশে শুয়েছে। তাব ঘুম আসছে না। জানালা গলে জোছনা এসে পড়েছে তাদের খাটের এক মাথায়। কী সুন্দর যে লাগছে দেখতে! বাইরের বাগানে পাখি ডাকছে। লিলিয়ান কোন বইয়ে যেন পড়েছিল রাতে কখনো পাখি ডাকে না। বইয়ের তথ্য ঠিক না— অনেক পাখিই ডাকছে। ঝিঁঝির ডাকের সঙ্গেও বোধহয় পাখির ডাকের এক ধরনের সম্পর্ক আছে। ঝিঁঝির ডাক যখন থামছে তখনই শুধু পাখি ডাকছে। ঝিঁঝি এবং পাখি কখনোই এক সঙ্গে ডাকছে না।

শোবার ঘরের দরজায় খুঁট করে শব্দ হলো। কে যেন দরজায় হাত বেখেছে। এ ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করা যায় নি। দরজার ছিটকিনিতে জং পড়েছে। কিছুতেই নড়ানো যায় না। কেউ যদি সত্যি সত্যি এসে থাকে সে অল্প ধাক্কা দিয়েই দরজা খুলতে পারবে। আশ্চর্য তো, দরজা খুলে যাচ্ছে। লিলিয়ান তাহেরের গায়ে হাত রাখল। তাহের ঘুমের মধ্যেই বলল, আহ, কী কর!

লিলিয়ান হাত সরিয়ে নিল। সে খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে আছে। তার কাছে মনে হচ্ছে দরজার ওপাশে কেউ একজন আছে। সে গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকে দেখছে। লিলিয়ান বলল, কে?

ফিসফিস কবে কেউ কি জবাব দিল? খুব হালকা স্বর যা বাতাসে ভেসে চলে যায়। লিলিয়ান খুব সাবধানে বিছানা থেকে নামল। এগুলো দরজার দিকে। তার মোটেও ভয় করছে না। বরং ভালো লাগছে।

না, দরজার ওপাশে কেউ নেই। ফাঁকা সিঁড়ি। রেলিং গলে জোছনা পড়ে অপূর্ব সব নকশা তৈরি হয়েছে। নকশার ভেতর দিয়ে হাঁটতে কেমন লাগবে? লিলিয়ান হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে সে আয়নাঘরের সামনে চলে এলো। আয়নাঘরের দরজা ভেজানো। তার ইচ্ছা করতে লাগল ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে। ভেতরটা নিশ্চয়ই অন্ধকার। দরজা খুলে দিলে চাঁদের আলো কি ঘরে ঢুকবে?

লিলিয়ান দরজা খুলল। চাঁদের আলো ঘরে ঢুকেছে। আয়নার একটা অংশ আলোকিত হয়ে আছে। কী সুন্দর লাগছে দেখতে! শোবার ঘর থেকে ঘুমের ঘোরে তাহের ডাকল, লিলিয়ান!

শোবার ঘরে যেতে ইচ্ছা করছে না। আয়নাঘরের মেঝেতে পাটি পেতে শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে। পাটি ছাড়াও সিমেন্টের মেঝের উপর শুয়ে থাকা যায়। এ ঘরের মেঝে কালো সিমেন্টের। খুব মসৃণ। কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব।

তাহের আবার ডাকল, লিলিয়ান। এবার বোধহয় সে জেগে উঠেছে। লিলিয়ান ক্লান্ত গলায় বলল, কী?

পানি খাব।

আনছি।

পানির গ্লাস নিয়ে লিলিয়ান আবার শোবার ঘরে চলে এলো। তাহেরের গায়ে হাত বেখে মনে মনে বলল, I love you. যদিও মনে মনে বলার প্রয়োজন ছিল না। তাহের ঘুমিয়ে আছে। এই বাক্যটি শব্দ করেও বলা যেত। তবু কিছু কিছু কথা আছে মনে মনে জ্বলতেই ভালো লাগে।

খুব ভোবে পাখির কিচাঁকচ শব্দে লিলিয়ানের ঘুম ভেঙেছে। এত পাখিকে সে একসঙ্গে কখনো ডাকতে শুনে নি। তাহেরকে ডেকে তুলে পাখির গান শোনাতে ইচ্ছা করছে। ডেকে লাভ হবে না। এত ভোবে সে উঠবে না। ছুটিব দিনে ন'টা-দশটার আগে তার ঘুম ভাঙে না। এখন তো প্রতিদিনই ছুটি। লিলিয়ান বিছানা ছেড়ে বাগানে গেল। কাল বাতে যে বাগানটাকে ভয়াবহ জঙ্গল বলে মনে হচ্ছিল এখন তা মনে হচ্ছে না। ঝোপঝাড় ঠিকই আছে, ঝোপঝাড়ের জন্যেই ভালো লাগছে। বাগানটা বেশ বড়, বেশির ভাগ গাছই তার অচেনা। তাহেরের কাছ থেকে গাছের নামগুলি জেনে নিতে হবে। একটা বড় গাছের সামনে লিলিয়ান থমকে দাঁড়াল। এ গাছটা চেনা চেনা লাগছে। মনে হচ্ছে ওলিভ গাছ। এ দেশে কি ওলিভ গাছ হয়? একেক দেশে একেক বকম গাছ, সেই হিসেবে মানুষেরও তো একেক রকম হওয়া উচিত। এ বিষয়ে তাহেরের মতামত কী জিজ্ঞেস করতে হবে।

একটা গাছের নিচটা বাঁধানো। এখানে বসে ব্রেকফাস্ট খেলে কেমন হয়? তাহেবকে বললে সে হয়তো আবার মুখ বাকিয়ে বলবে— তুমি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছ।

লিলিয়ানের ধারণা, সে মোটেই বাড়াবাড়ি করছে না। এই যে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা কি বাড়াবাড়ি? নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ি না। সে দেখছে মোট কত ধরনের গাছ এখানে আছে।

ইস্কান্দর আনীর সঙ্গে বাগানেই লিলিয়ানের দেখা হলো। তিনি সকালের নিয়ে এদিকে আসছেন। এক হাতে টিফিন ক্যারিয়ার, অন্য হাতে ফ্লাস্ক।^১ দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। লিলিয়ান বলল, গুড মর্নিং!

তিনি হাসিমুখে মাথা নাড়লেন। লিলিয়ান বাংলায় থেমে থেমে বলল, আপনি কেমন আছেন ?

ইস্কান্দর আলী খতমত খেয়ে বললেন, জেু ভালো। এইখানে কী করেন ?

আমি বাগান দেখছি।

বাগানে দেখার কিছু নাই। সাপের আড্ডা। প্রতি বছর একটা-দুইটা গরু মরে। সাপ চিনেন তো ?

জি, আমি সাপ চিনি।

বড়ই ভয়ঙ্কর জিনিস। চলেন উপরে যাই। নাশতা নিয়া আসছি। খিচুড়ি আর ডিমের তরকারি। গৈ-গেরাম জায়গা। কিছু পাওয়া যায় না। সব জিনিস শহর থাইক্যা আনা লাগে। অনেক খরচ পড়ে।

লিলিয়ান সব কথা বুঝতে না পারলেও আন্দাজ করছে— এই মানুষটি বলছে, শহর থেকে জিনিস আনতে হয় বলে টাকা বেশি লাগে। লিলিয়ান বলল, আপনি তাহেরকে বলবেন, ও টাকা দেবে।

বলতেও শরম লাগে। কত টেকা সে আনছে কিছুই তো জানি না।

ও যথেষ্ট টাকা-পয়সা এনেছে। আমরা বাড়িঘর ঠিক করব, টাকা লাগবে।

বাড়িঘর ঠিক কইরা ফয়দা কী ? কে থাকব ?

আমরা থাকব। আচ্ছা, আপনি বলুন তো এই গাছটার কী নাম ?

জলপাই গাছ।

আমি ঠিক করেছি আমি এবং তাহের এই গাছের নিচে বসে সকালের ব্রেকফাস্ট করব। ক উকে দিয়ে কি পরিষ্কার করিয়ে দিতে পারবেন ?

পার। কিছু খরচ-বরচ লাগবে। টেকা ছাড়া কাউবে দিয়া কিছু করন যায় না। যে যুগের যে ভাও। দুনিয়া গেছে উল্টাইয়া।

লিলিয়ান ইস্কান্দর আলীকে নিয়ে বাগানে ঘুরছে। গাছের নাম জিজ্ঞেস কবছে। অনেকগুলি নাম লিলিয়ান শিখে ফেলল— আমগাছ, তেঁতুলগাছ, বেলগাছ, কাঁঠালগাছ, জলপাইগাছ, গাবগাছ...।

লিলিয়ানের খুব ভালো লাগছে। তাহেরের ঘুম না ভাঙা পর্যন্ত সে বাগানে বাগানে ঘুরল।

তাহের নাশতা খেয়ে আবাব ঘুমিয়ে পড়ল। দুপুরের খাবার খেয়েও ঘুমুতে গেল। তার ঘুম গাঙল বিকেলে। সে হাসিমুখে বলল, ইচ্ছা করে ঘুম স্টক করে নিয়েছি। আজ রাত জাগব। ত্রোমাকে নিয়ে ছাদে বসে থাকব। কাল ছাদে যাওয়া হয় নি। আজ হবে। ছাদটা সুন্দর। ছাদ থেকে ব্রহ্মপুত্র পরিষ্কার দেখা যায়। ব্রহ্মপুত্র নদীতে নৌকাভ্রমণ করতে চাও ?

চাই

দেখি খোঁজ করে।

তাহের হাই তুলতে তুলতে বলল, বেশি ঘুমানোর প্রবলেম কী জানো ? নেশা লেগে যায়। তখন শুধু ঘুমুতে ইচ্ছা করে।

তুমি কি আবার ঘুমাবে ?

না ।

বাগানে যাবে ? চল বাগানে যাই । বিকেলের চা'টা বাগানে বসে খাই ।

ওরে সর্বনাশ ! বিকেলে বাগানে যাওয়াই যাবে না । বিকেলে সাপরা খুব উত্তেজিত থাকে । বিকেলে দোতলা থেকে নিচে নামাটা হবে চরম বোকামি । বরং চল ছাদে বসে চা খাই ।

বেশ চল ।

তোমাকে আরেকটা কথা বলা দরকার । আজ রাতই কিন্তু এ বাড়িতে আমাদের শেষ রজনী । কাল ভোরে আমরা চলে যাব । তোমার যা দেখার দেখে নাও । ছবি তুলতে চাইলে ছবি তোল । ক্যামেরাটা বের কর তো ?

লিলিয়ানের মন খারাপ হয়ে গেল । আজই শেষ রজনী ? লিলিয়ান কিছু বলল না । ছবি তোলার ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ দেখা গেল না ।

বিকেলে ছাদে চা খাওয়া হলো না । কারণ ছাদের দরজার চাবি নেই । ছালাম চাবি নিয়ে এলো অনেক রাতে । সেই চাবিতে তালা না খোলায় তালা ভাঙতে হলো । ছাদে পাটি পেতে বিছানা করতে করতে রাত দশটার মতো বেজে গেল । লিলিয়ানের খুব শখ ছিল শাড়ি পরবে । শাড়ি জোগাড় হয় নি । সে তার সবচে' সুন্দর ড্রেসটি পরে ছাদে বসে আছে । তাহের ছালামকে বিদেয় করে ছাদে আসবে । সে আসতে খুব দেরি করছে । একা একা ছাদে বসে থাকতে লিলিয়ানের খুব খারাপ লাগছে না । বরং ভালোই লাগছে । তবে আজ গত রাতের মতো জোছনা হয় নি । আকাশে মেঘ । মরা জোছনা ।

তাহের ছাদে এলো এগারটার দিকে । বিরক্তমুখে বলল, লিলিয়ান, ছাদের প্রোগ্রামটা আধঘণ্টা পিছিয়ে দিতে হবে । আমার চাচা খবর পঠিয়েছেন । অত্যন্ত জরুরি কী কথা না-কি এই মুহূর্তে আমাকে বলা দরকার । তাঁর হাঁপানীর টান উঠেছে । তিনি আসতে পারছেন না । তুমি শোবার ঘরে গিয়ে বসো । আমি ফিরে এসে তোমাকে নিয়ে ছাদে যাব ।

তারা ছাদ থেকে নেমে এলো । লিলিয়ান বুঝতে পারছে তাকে একা ফেলে তাহেরের যেতে ইচ্ছা করছে না । লিলিয়ান বলল, আমিও যাই তোমার সঙ্গে ?

তিনি বলে দিয়েছেন আমি যেন একা গাই । তোমার ভয়ের কিছু নেই । তাঁর বড় ছেলেটা এখানে থাকবে ।

আমি মোটেও ভয় পাচ্ছি না । তবে উনাব ছেলে এখানে না থাকলে ভালো হয় । ছেলেটাকে আমার পছন্দ না । সারাক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে আছে । তাকানোর ধরনটা ভালো না ।

তাকানোর ধরন ঠিকই আছে । ওরা কখনো বিদেশী মেয়ে দেখে নি । তোমাকে অবাক হয়ে দেখছে । এতে যে তুমি অস্বস্তিবোধ কবতে পার সেই জ্ঞান গুদের নেই । তাছাড়া সে থাকবে একতলায়, তুমি দোতলায়— অসুবিধা কী । পারবে না আধঘণ্টা থাকতে ?

পারব।

সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিও।

আচ্ছা।

আমি মোটেও দেরি করব না। কথাটা শুনব আর চলে আসব। তাদের যদি ভালো কোনো শাড়ি থাকে তোমার জন্যে নিয়ে আসব।

থ্যাংকস।

লিলিয়ান সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে শোবার ঘবে চলে এলো। তার হাতে হারিকেন। তাকে একা একা আধঘণ্টা সময় কাটাতে হবে। আধঘণ্টা সময় কিছুই না। দেখতে দেখতে কেটে যাবে। হিথ্রো এয়াবপোর্ট থেকে তাহের ডার্টি জোকস-এর একটা বই কিনেছে। নোংরা রসিকতা পড়তে ভালো লাগে না। তবু সময় কাটানোর জন্যে নিশ্চয়ই পড়া যায়।

লিলিয়ান শ্বেতপাথরের টেবিলে হারিকেন নামিয়ে রাখল। হারিকেনের সম্ভবত কোনো সমস্যা হয়েছে। শিখা দপদপ করছে। নিভে যাবে না তো? লিলিয়ান তাকিয়ে আছে হারিকেনের শিখার দিকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই কোনোরকম কাবণ ছাড়া আচমকা তীব্র ভয়ে লিলিয়ান আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তার মনে হলো— ভয়ঙ্কর কোনো বিপদ ঘটতে যাচ্ছে। তাহের কিছুক্ষণের মধ্যেই ভয়াবহ কোনো বিপদে পড়বে। লিলিয়ান যন্ত্রের মতো পরপর তিনবার বলল, Oh God! Save him Please, Save him. পরম করুণাময় ঈশ্বর। তুমি আমার স্বামীকে রক্ষা কর।

লিলিয়ানের সামনে রাখা হারিকেন নিভে গেল। সে স্পষ্ট শুনল খুব হালকা পায়ে কে যেন আসছে তার ঘরের দিকে। যে আসছে তার পা ছোট ছোট, সে পা ফেলছে খুব সাবধানে। দরজার কাছে এসে সে থমকে দাঁড়িয়েছে, এক হাতে দরজা ধরেছে তা বুঝা যাচ্ছে। দরজায় ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হলো। এর উপস্থিতিই কি লিলিয়ান টের পাচ্ছিল? কে, এ কে? লিলিয়ান আতঙ্কে অস্থির হয়ে কাঁপা গলায় বলল, কে? কে? Who is there?

ছোট্ট করে কে যেন নিঃশ্বাস ফেলল। ছোট নিঃশ্বাস, কিন্তু লিলিয়ান স্পষ্ট শুনল। সে কি তার নিজের নিঃশ্বাসের শব্দই শুনেছে? ভয় পেলে মানুষের মস্তিষ্ক ঠিক কাজ করে না। তারও কি তাই হয়েছে? ডা. ভারমান নিশ্চয়ই এর চমৎকার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন কিন্তু তার কাছে কোনো ব্যাখ্যা নেই।

তাহের সিগারেট ধরিয়েছে। বর্ষাকাল হলেও কয়েকদিন বৃষ্টি না হওয়ায় রাস্তাঘাট শুকনো। একজন যাচ্ছে সামনে সামনে। তার হাতে টর্চলাইট। সে টর্চের আলো ফেলছে। তাহেরের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে চারজন যুবক। একজনের নাম তাহের জানে— ছালাম। চাচার মেজো ছেলে। সে আসছে সবার পেছনে। বাকি তিনজন কে? এরা সঙ্গে যাচ্ছে কেন? কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হচ্ছে না। ওরাও কিছু বলছে না। চাচার এমন কী জরুরি কথা থাকতে পারে? জমিজমা সম্পর্কিত কিছু? তাহেরের পৈতৃক জমি নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। যা হবার হবে। এগুলি হাতছাড়া হয়ে একদিকে ভালো হয়েছে।

বন্ধনমুক্ত হওয়া গেছে। জমির কারণে তার বাবাকে অপঘাতে মরতে হয়েছে। এই অভিশাপ থেকে তাহের মুক্তি চায়। তবে বাড়িটা সে রাখবে। সংস্কার করাবে। লিলিয়ানের যখন এত পছন্দ। তাদের ছেলেমেয়েরা বড় হলে এদের দেখাতে নিয়ে আসবে। কে জানে বৃদ্ধ বয়সে সে নিজেও হয়তো ফিরে আসবে। সে এবং লিলিয়ান জীবনের শেষ সময়টা কাটাবে নদীর ধারের এই বিশাল বাড়িতে। ততদিনে গ্রামে গ্রামে ইলেকট্রিসিটিও নিশ্চয়ই চলে আসবে।

দলটা নদীর পাড়ে এসে থমকে দাঁড়াল। তাহের বলল, এখানে কী ? টর্চ হাতের ছেলেটা বলল, নদীর হেই পাড়ে যাওয়া লাগব।

তাহের বিস্মিত হয়ে বলল, নদীর ঐ পাড়ে কেন ? ঐ পাড়ে কী ? ছালাম ভুঁমি এদিকে এসো। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি।

ছালাম এলো না। সে দ্রুত সরে গেল। গেল নদীর দিকেই। সেখানে ঝাঁকড়া একটা পাকুর গাছ। পাকুর গাছের ডালের সঙ্গে নৌকা বাঁধা। চাঁদ উঠে নি। চারদিক অন্ধকার। নক্ষত্রের আলোয় কিছু দেখা যাচ্ছে না। অসংখ্য ঝাঁঝ পোকা ডাকছে। Something is very wrong, তাহের দ্রুত ভাবতে চেষ্টা করছে। চারজন যুবক তাকে ঘিরে আছে কেন ? এরা নদীর পাড়ে তাকে নিয়ে এসেছে কেন ? হত্যা কবতে চায় ? কেন চায় ? টাকা-পয়সা বজো ? মানুষ খুন কবা এত সহজ।

টর্চ হাতের লোকটা বলল, আসেন নৌকায় আসেন।

তাহের কি দৌড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে ? পারবে পালাতে ? এমনও তো হতে পারে পুবো ব্যাপাটো কিছুই না। সে ভয় পাচ্ছে বলেই আজীবাজে চিন্তা করছে। হয়তো তার চাচা নদীর ঐ পাড়ে আবেকটা বাড়ি কবেছেন। এই ছেলেগুলিকে রাখা হয়েছে বাড়ি পাহারাব জন্মে।

খাড়াইয়া আছেন ক্যান ? আসেন। দেবি কইরা তো কিছু লাভ নাই।

তাহের যন্ত্রের মতো এগুলো। পাকুর গাছের কাছে চাদর গায়ে আর একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। এই গবমে তার গায়ে চাদর কেন ? লোকটা নৌকায় উঠে বসল। তাহের এগুলো যন্ত্রের মতো।

সবাই নৌকায় উঠল না। ছালাম এবং টর্চ হাতে ছেলেটা পাকুর গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বইল। দু'জন তাহেরের দু'হাত ধরে নৌকায় প্রায় টেনে তুলল। চাদর গায়ের লোকটা ছাড়াও নৌকার একজন মাঝি আছে। মাঝি সঙ্গে সঙ্গে নৌকা ছেড়ে দিল। চাদর গায়ের লোকটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আইজ গরম বড় বেশি পড়ছে।

লোকটির গলাব স্বরে বোঝা যাচ্ছে সে বৃদ্ধ। তাহেরের বলার ইচ্ছা করছে— গরম বেশি কিন্তু আপনি চাদর গায়ে দিয়েছেন কেন ? তাহের কিছুই বলল না। তাহেরের হাতে সিগারেট, প্যাকেট থেকে বের কবে হাতে নিয়েছে। আগুন ধরতে ভুলে গেছে। যদিও আগুন নেই তবু তাহের অভ্যাস মতো সিগারেট মুখে দিচ্ছে এবং টানছে।

চাদর গায়ে বুড়ো লোকটি খুকখুক করে কেশে বলল, নৌকা মাঝগাংগে নিয়া চল। লোকটির মাথা থেকে চাদর সরে গেছে। তার মাথার সব চুল সাদা। থুতনির কাছে অল্প কিছু দাড়ি। দাড়ির রঙ কালো। তাহেরের মনে হলো তার বুকুর উপর দিয়ে বরফ শীতল

পানির একটা স্রোত বয়ে গেল। এরা তাকে খুন করার জন্যে এখানে নিয়ে এসেছে। গ্রামের সব খুনখারাপি হয় নদীর কাছে। নদী হত্যার চিহ্ন ধুয়ে মুছে ফেলে। জলধারার প্রবল স্রোত মৃতদেহ অনেক দূর নিয়ে যায়। জলজ প্রাণী অতি দ্রুত মৃতদেহ নষ্ট করে দেয়। চেনার উপায় থাকে না।

বুড়ো বলল, আপনার সিগারেট নিভা। সিগারেট ধরান। সিগারেট ধরাইয়া আরাম কইরা একটা টান দেন। আহ্ শালার গরম কী পড়ছে!

তাহেরের বাঁ হাতটা একজন ধরেছিল। সে হাত ছাড়ল। তাহেব পকেট থেকে দেয়াশলাই বের করল। তাকাল বুড়োর দিকে। মনে হচ্ছে এই বুড়োই হত্যাকারী। বুড়ো বন্দুক আনে নি। নিশ্চয়ই চাদরের নিচে ছোরা নিয়ে এসেছে। খোলা জায়গায় বন্দুকের আওয়াজ অনেক দূর পর্যন্ত যাবে। সেই তুলনায় ছোরা অনেক নিরাপদ।

বুড়ো বলল, ধরান সিগারেট ধরান।

তাহের সিগারেট ধরানোর চেষ্টা করছে। ধরাতে পাবছে না। বাতাসের বেগ প্রবল। তাছাড়া তার হাত কাঁপছে। দেয়াশলাইয়ের চারটি কাঠি নষ্ট হবার পর, পঞ্চম কাঠিটি ধরল। তীব্র ঘামের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ঘামের গন্ধে তার বমি এসে যাচ্ছে।

তাহের দেখল সবাই এক দৃষ্টিতে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। কেউ মুহূর্তের জন্যেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছে না। বুড়ো লোকটির মুখ হাসি হাসি। চাঁদের আলোয় হাসিমুখের এই বুড়োকে কী ভয়ঙ্করই না লাগছে।

লিলিয়ানের শোবার ঘর অন্ধকার। হারিকেন নিভে যাওয়ার পর সলতা থেকে বিশ্রী ধোঁয়া আসছে। লিলিয়ানের নাক জ্বালা করছে। ঘরে কি কার্বন মনোক্সাইড তৈরি হয়েছে? তার কি ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত? সিঁড়ির দরজায় ধাক্কার শব্দ হলো। ভারী গলায় কে বলল— দরজা খুলেন।

লিলিয়ান বলল, কে?

খবর আছে। দরজা খুলেন, Urgent খবর।

লিলিয়ান সিঁড়ির দরজার কাছে চলে এলো। দরজা খুলল না। তার মন বলছে— দরজার আড়ালে অপেক্ষা করছে ভয়ঙ্কর বিপদ।

খুলেন দরজা। খুলেন।

কে যেন প্রচণ্ড শব্দে ধাক্কা দিচ্ছে। লিলিয়ান বলল, Go away

দরজায় হিংস্র পশুর খাবার মতো থাবা পড়ছে। একজন না, কয়েকজন। লিলিয়ানের মনে হলো— খুব কম করে হলেও তিনজন আছে। লিলিয়ান খিঙ্খিঙ্ক হাসিব শব্দও শুনল। তিনজনের কোনো-একজন আনন্দে হাসছে। এই আনন্দের উৎস কী?

ঐ সাদা চামড়া, দরজা না খুলিয়া কতক্ষণ থাকবি? আপোসে দরজা খোল।

লিলিয়ান নড়ল না। দাঁড়িয়ে রইল। প্রাচীন ভারী দরজা চট করে ভাঙবে না। ভাঙতে সময় লাগবে। কতক্ষণ সময় লিলিয়ান জানে না। তাহের ফিরে আসা পর্যন্ত কি দরজা তাকে রক্ষা করবে? কিন্তু তাহের? ও কেমন আছে? তারও কি লিলিয়ানের

মতোই বিপদ হয় নি ? সে কি ফিরে আসতে পারবে ? অনেক দিন পর লিলিয়ান তার মাকে ডাকল। ফিসফিস করে বলল, মা, আমি খুব বিপদে পড়েছি।

প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে দরজায়। এরা দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে। লিলিয়ান কাঁপা গলায় বলল, ঈশ্বর আমাদের রক্ষা কর। দরজার সামনে থেকে তার সরে যাওয়া উচিত। লিলিয়ান সরতে পারছে না। তার পা সিসের মতো ভারী হয়ে আছে— দরজার বাইরের মানুষগুলি পশুর মতো গর্জন করছে।

ভাঙ দরজা। ভাইঙা ধর সাদা চামড়ারে।

দরজা ভেঙে পড়ার কয়েক মিনিট আগে লিলিয়ান সংবিত ফিরে পেল। প্রথম দৌড়ে ঢুকল শোবার ঘরে। সেখান থেকে ছুটে গেল আয়নাঘরে। কোথাও লুকিয়ে থাকতে হবে। আয়নাঘরে লুকানোর জায়গা কোথায় ? কাবার্ড! কাবার্ড খুলে ভেতরে বসে থাকবে।

লিলিয়ান কাবার্ড খুলে ভেতরে ঢুকল, আর তখনই তিনজনের একটা দল দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়ল। এই দলের একজন নিতান্ত চ্যাংড়া। তার হাতে পাঁচ ব্যাটারির একটা টর্চ। তাব বয়স পনের-ষোলর বেশি না। সে থিকথিক করে হাসতে হাসতে বলল— মেম মাগি গেছে কই ?

একজন বলল, পালাইছে। হয় খাটের নিচে নয় আলমিরার ভিতরে।

লিলিয়ান এদের কথা শুনেতে পারছে, কিন্তু গ্রাম্য টানা টানা কথার অর্থ ধরতে পারছে না। লিলিয়ানের মনে হচ্ছে কাবার্ডে ঢুকে সে বড় ধরনের বোকামি করেছে। এরা প্রথমেই কাবার্ডগুলি খুঁজবে। এক এক করে খুঁজবে। তার উচিত কাবার্ড থেকে বের হয়ে আসা। খোলামেলা জায়গায় থাকা যাতে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করতে পারে। কোণঠাসা হয়ে ধরা পড়ার কোনো মানে হয় না।

ওরা হারিকেন জ্বালিয়েছে। হারিকেন নিয়ে আয়নাঘরেই বোধহয় আসছে। লিলিয়ান কাবার্ড ছেড়ে পালাবার জন্যে কাবার্ডের দরজায় হাত রাখল, আর ঠিক তখন কাবার্ডের ভেতর কী যেন একটা নড়ে উঠল। বুনবুন শব্দ হলো। একজন কেউ কোমল ভঙ্গিতে হাত বাখল তাব পিঠে। লিলিয়ান ছোট্ট একটা নিঃশ্বাসের শব্দও যেন শুনল।

কী হচ্ছে লিলিয়ানের ? সে কি পাশল হয়ে গেছে ? তার কি হেলুসিনেশন হচ্ছে ? সে এখন কী করবে ? চিৎকার করে উঠবে ? তাতে লাভ কী ? পিঠে যে হাত রেখেছে সে হাত সরিয়ে নিচ্ছে না। যেন তাকে বলার চেষ্টা করছে— ভয় নেই। কোনো ভয় নেই। আয়নাঘরে তুমি নিশ্চিন্ত মনে অপেক্ষা কর। এরা তোমাকে কিছুতেই খুঁজে পাবে না। লিলিয়ান মনে মনে বলল, আপনি যেই হোন, আমার স্বামীকে রক্ষা করার চেষ্টা করুন। ও বিপদে পড়েছে। ওব বিপদ আমার চেয়েও ভয়ঙ্কর বিপদ। আমি বুঝতে পারছি। আমি খুব পবিত্র বুঝতে পারছি।

তাহেরের সিগারেট অনেক ছোট হয়ে এসেছে। সিগারেটের শেষ অংশ এখনই নদীর জলে ফেলে দিতে হবে। এরা সম্ভবত সিগারেট শেষ করার জন্যে অপেক্ষা করছে। তাহের বুদ্ধের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি কী চান ?

বৃদ্ধ খিকখিক করে খানিকক্ষণ হাসল। সে একাই হাসছে। অন্য কেউ হাসছে না। বৃদ্ধ হাসি থামিয়ে বলল, বিলাত দেশটা কেমন এটু কন তো হনি।

বিলেতের খবর আমি জানি না। আমি থাকি আমেরিকায়।

আমার কাছে আমারকা বিলাত এক জিনিস।

বৃদ্ধ চাদরের নিচে হাত ঢুকালো। তাহের জুলন্ত সিগারেট হাতে লাফিয়ে পড়ল নদীতে। পানির টান প্রবল। তাহেরকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এরা কি তাহেরকে ছেড়ে দেবে? মনে হয় না। নৌকা নিয়ে এরা তাকে খুঁজবে। তন্নতন্ন করে খুঁজবে। তাহের ভাবার চেষ্টা করছে তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কতটুকু। খুব বেশি নয়। সম্ভাবনা ক্ষীণ, কারণ তাহের সাঁতার জানে না।

লিলিয়ান আয়নাঘরের কাবার্ভে বসে আছে। কী গাঢ় অন্ধকার! এই অন্ধকার মাতৃগর্ভের অন্ধকার। কোনো মানুষের পক্ষে এই অন্ধকার সহ্য করা সম্ভব নয়।

হঠাৎ করে অন্ধকার কমে গেল। তিনজনের দলটা আয়নাঘরে ঢুকল। কাবার্ভে বসে থাকার অর্থ হয় না। লিলিয়ান ঠিক করল সে দরজা খুলে বের হবে। বলবে, কী চাও তোমরা?

লিলিয়ান দরজা খুলতে পারল না। যে লিলিয়ানের পিঠে হাত রেখেছিল সে এবাব লিলিয়ানের হাত চেপে ধরল। নরম হাত। হাত ভর্তি চুড়ি। রিনারিন কবে চুড়ি বেজে উঠল। এসব কি স্বপ্নে ঘটছে?

টর্চ হাতেব ছেলেটি বলল, কুন্দুস ভাই, আমার মনে হইতেছে মেম সাব এই ঘরে। ‘ছেন্টের’ গন্ধ পাইতেছি। মেম সাব শইল্যে ‘ছেন্ট’ দিছে। হি হি হি...।

লিলিয়ান শক্ত হয়ে আছে। এই বোধহয় কাবার্ভের দরজা খুলল। ঠিক তখন রান্নাঘরে ‘বন’ করে শব্দ হলো। টিনের একটা কিছু মেঝেতে গাড়িয়ে যাচ্ছে। দলেব তিনজনই ছুটে গেল রান্নাঘরের দিকে। দৌড়ে যাবার জন্যে হারিকেনটা নিভে গেল।

যে লিলিয়ানের হাত ধরেছে সে-ই তাকে কাবার্ভ থেকে বের করল। টেনে নিয়ে যাচ্ছে পাশের ঘরে। চারদিকে জমাটবাধা অন্ধকার। চাঁদের আলো কোথায়? আজ কি চাঁদ উঠে নি? কিছুই দেখা যাচ্ছে না। লিলিয়ান অন্ধের মতো অনুসরণ কবছে। তার বোধ লুপ্ত। সে কী করছে নিজেও জানে না। তারা দু’জন এখন দাঁড়িয়ে আছে একটা পর্দার আড়ালে। এটা কোন ঘর? লিলিয়ানের সব এলোমেলো হয়ে গেছে। যে তাব হাত ধরে আছে সে কে? বা আসলেই কি কেউ তার হাত ধরে আছে?

তিনজনের দলটি এ ঘরে এসেছে। তারা এখন খানিকটা বিভ্রান্ত। একজন বলল, গেল কই? বসির ভাই, গেল কই?

এই ঘর দেখা হইছে?

একবার দেখলাম।

আবার দেখ। পর্দা টান দিয়া ফেলা।

একজন এসে পর্দা ধরল আর তখন শোবার ঘর থেকে খিলখিল হাসির শব্দ শোনা

গেল। কিশোরীর মিষ্টি রিনরিনে গলা। টর্চ হাতের ছেলেটা বলল— হাসে কেডা বসির ভাই, হাসে কেডা ?

তিনজন এগুচ্ছে শোবার ঘরের দিকে। এবার আর আগের মতো ছুটে যাচ্ছে না। কিশোরীর হাসির শব্দ আরো বাড়ল। তারপর হঠাৎ করে থেমে গেল। লিলিয়ান মনে মনে বলল, যা ঘটছে সবই আমার কল্পনা। আমার উত্তেজিত মস্তিষ্ক আমাকে এসব দেখাচ্ছে, শোনাচ্ছে। আসলে কেউ আমার হাত ধরে নেই। কেউ আমাকে টেনে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে না। আমি নিজেই জায়গা বদল করছি, এবং কল্পনা করছি। প্রচণ্ড ভয়ের কারণে আমার এ রকম হচ্ছে ? ডা. ভারমান আমাকে তাই বলতেন।

তারপরেও লিলিয়ান ফিসফিস করে বলল, আপনি কে ?

ছোট্ট নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। কোনো জবাব পাওয়া গেল না। লিলিয়ান বের হয়ে এলো পর্দার আড়াল থেকে। নিজের ইচ্ছায় নয়— যে তার হাত ধরে ছিল সেই তাকে টেনে বের করল। সে চরকির মতো ঘুরছে— এ-ঘর থেকে ঐ-ঘরে। যেন এক মজার খেলা। এক সময় লিলিয়ান লক্ষ করল সে লোহার প্যাঁচানো সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। বাইরের অন্ধকাব গাঢ় নয়। অস্পষ্টভাবে সবকিছুই দেখা যাচ্ছে। এখন আর কেউ তার হাত ধরে নেই। এতক্ষণ যা ঘটেছিল সবই কল্পনা। মস্তিষ্ক তার নিজস্ব নিয়মে তৈরি করেছে বিভ্রম, এবং তাকে নিয়ে এসেছে ঘরের বাইরে। অশরীরী বলে কিছু নেই, কিছু থাকতে পারে না।

লিলিয়ান খুব সাবধানে লোহাব সিঁড়ি দিয়ে নামছে এতটুকু শব্দও যেন না হয়। তাকে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে হবে। অনেক দূর যেতে হবে, যেন কেউ তার নাগাল না পায়। সিঁড়ি এত দুলছে কেন ? মনে হচ্ছে ভেঙে পড়ে যাবে। খুব হাওয়া। উড়িয়ে নিয়ে যাবার মতো হাওয়া। এই ব্যাপারগুলি তো স্বপ্নে ঘটেছিল। এখনো কি সে স্বপ্ন দেখছে ? পুরোটাই কি স্বপ্ন ? লিলিয়ানের শরীর অবসন্ন, অসম্ভব ক্লান্ত। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। ইচ্ছা করছে সিঁড়ির রেলিং জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ে। মনে হচ্ছে সে জেগে আছে হাজার বছর ধরে।

সে একতলায় নেমে এসেছে। তার সামনেই এ বাড়ির ভাঙা প্রাচীর। ফিসফিস কথা শোনা যাচ্ছে। নিচেও কি কেউ অপেক্ষা করছে তার জন্যে ? না-কি ওরাই নেমে এসেছে নিচে ? দোতলা থেকে টর্চের আলো ফেলল সিঁড়িতে। আলো এদিক-ওদিক যাচ্ছে। খুঁজে বেড়াচ্ছে লিলিয়ানকে। আর একটু হলেই সে ভালো পড়ত লিলিয়ানের মুখে। লিলিয়ান ক্লান্ত গলায় ফিসফিস করে বলল, আমাকে সাহায্য করুন। আমাকে সাহায্য করুন, Please help me.

কার কাছে সে সাহায্য চেয়েছে ? উত্তেজিত বিভ্রান্ত মস্তিষ্কের কাছে, না-কি যে অশব্দী নারী তার হাত ধরেছিল তার কাছে। লিলিয়ান জানে না। সে জানতেও চায় না। প্রয়োজন হলে সে চোখ বন্ধ কবে থাকবে। অশরীরী নারীমূর্তি তার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাক। লিলিয়ান আবারও বলল, আপনি কোথায় ? আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

আর ঠিক তখন সে নারীমূর্তিকে দেখতে পেল। ভাঙা দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা প্রকাণ্ড শরীর গাছের আড়ালে সে দাঁড়িয়ে। সে হাত ইশারায় লিলিয়ানকে ডাকল। লিলিয়ান মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে গেল।

নারীমূর্তি সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে আগে আগে যাচ্ছে। পেছনে পেছনে এগুচ্ছে লিলিয়ান। পাঁচিলের বাইরে এসেই নারীমূর্তি ছুটতে শুরু করল। সে লিলিয়ানকে কিছুই বলে নি। তবু লিলিয়ানের মনে হলো তাকে যেন এই অশরীরী মূর্তি বলছে— ভয় পেও না। তুমি আমার পেছনে পেছনে দৌড়াতে থাক।

আমবাগান ছাড়িয়ে, খোলা মাঠ, আবার খানিক যোপঝাড়, চষা ক্ষেত। নারীমূর্তি দ্রুত ছুটছে। একবারও পেছন ফিরে তাকাচ্ছে না। লিলিয়ান কাতর গলায় বলল, পারছি না। আমি পারছি না— একটু থামুন, Please একটু থামুন। নারীমূর্তি থামছে না। ছুটছে, আরো দ্রুত ছুটছে।

তারা এক সময় চলে এলো নদীর তীরে। আর তখনই মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ স্পষ্ট হলো। ঝলমল করে উঠল নদী ও নদীর ওপাশের বনভূমি। নারীমূর্তি থমকে দাঁড়িয়েছে। হাত ইশারায় নদীর তীরে পড়ে থাকা কী একটা যেন দেখাচ্ছে। লিলিয়ান সেদিকে তাকাচ্ছে না। সে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে নারীমূর্তির দিকে।

কী সুন্দর মায়াময় একটি মুখ। লম্বা বিনুনি করা চুল। শাড়ির আঁচল হাওয়ায় উড়ছে। লিলিয়ান বলল, আপনি কে? আপনি কি আমার কল্পনা না-কি সত্যি কিছু?

নারীমূর্তি হাসল। কী সুন্দর সে হাসি। লিলিয়ান হাসির শব্দও শুনল।

আপনি কি বলবেন না আপনি কে?

ছায়ামূর্তি না-সূচক মাথা নাড়ল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যদিও থেকে এসেছিল সেদিকে ছুটতে শুরু করল। লিলিয়ান চোঁচিয়ে বলল, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

ছায়ামূর্তি ছুটতে ছুটতে কী যেন বলল, বাতাসের শব্দে তা শোনা গেল না।

লিলিয়ান এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছে না। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আশেপাশে তাকালেই দেখতে পেল নদীর তীরে চিৎ হয়ে যে মানুষটি শুয়ে আছে সে তাহের। এখনো তার দেহে প্রাণ আছে, সে বেঁচে যাবে, সে নিশ্চয়ই বেঁচে যাবে।

জ্যোৎস্না প্রাবিত জলরাশি, তার ধার ঘেসে ছুটে যাচ্ছে এক নারীমূর্তি। বাতাসে তার শাড়ির আঁচল উড়ছে। রিনরিন করে বাজছে হাতের চুড়ি।

পনের বছর পর লিলিয়ান আবার তাহেরকে নিয়ে ইন্দারঘাটে এসেছে। তাদের সঙ্গে দু'টি ফুটফুটে মেয়ে। এগার বছরের সারা, সাত বছরের রিয়া। দু'জনই হয়েছে মা'র মতো, শুধু চোখ পেয়েছে বাবার। বড় বড় কালো চোখ। মা'র নীল চোখ কেউই পায় নি। দু'জনই খুব হাসিখুশি মেয়ে, কিন্তু এদের চোখের দিকে তাকালে মনে হয়— চোখ ভর্তি জল। এক্ষুণি বুঝি কাঁদবে।

তাদের আসা উপলক্ষে বাড়িঘর ঠিক করা হয়েছে। বাড়ির চাবপাশের বাগান পরিষ্কার করা হয়েছে। মেয়ে দুটি মহানন্দে বাগানে ছোট্টাছুটি করছে। রিয়া ছুটতে গিয়ে উল্টে পড়ে হাঁটুতে ব্যথা পেয়েছে। হাঁটুর চামড়া ছিলে গেছে। কিন্তু রিয়া হাঁটু চেপে ধরে হাসছে। যেন এই বাগানবাড়িতে ব্যথা পাওয়াও এক আনন্দজনক অভিজ্ঞতা।

তাহের নিজেও বাগানে। সে খুব ব্যস্ত। আমগাছের ডালে দোলনা টানানোর চেষ্টা করছে। ডাল উঁচু। চেয়ারে দাঁড়িয়ে নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। বড় মেয়ে সান্না বাবাকে

সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এলো। সে গম্ভীর গলায় বলল, বাবা শোন, তুমি যদি দু'দিন পর বলো, বেড়ানো শেষ হয়েছে এখন আমেরিকা ফিরে যাব। তাহলে কিন্তু হবে না। আমরা খুব রাগ করব।

তাহলে আমাকে কী করতে হবে ?

এখানে থাকতে হবে।

কতদিন ?

For eternity.

তাহের হো-হো শব্দে হাসছে। হাসির শব্দে লিলিয়ান এসে দোতলার বারান্দায় দাঁড়াল। তাহের উঁচু গলায় বলল, এই যে বিদেশিনী! দয়া করে মগভর্তি কাপাচিনো কফি বানিয়ে নিচে এসে আমাকে সাহায্য কর।

এখন কফি বানানো যাবে না। সরঞ্জাম নেই।

কোনো অজুহাত শুনতে চাই না। কফি বানাতে হবে।

ছোট মেয়ে রিয়া চেষ্টায়ে বলল, বাবার জন্যে কফি বানাতেই হবে।

লিলিয়ান রান্নাঘরের দিকে গেল না। সে ঢুকল আয়নাঘরে। দরজা বন্ধ করে দিল। অন্ধকার হয়ে গেল আয়নাঘর। সে গলার স্বর নামিয়ে প্রায় ফিসফিস কবে বলল, আপনাকে দেখানোর জন্যে আমি আমার বাচ্চা দু'টিকে নিয়ে এসেছি। আপনি কি দেখেছেন তাদের ?

কেউ জবাব দিল না।

লিলিয়ান বলল, আপনি কি তাদের একটু আদর করে দেবেন না ?

নীলবতা ভঙ্গ হলো না। আয়নাঘরের স্তব্ধতা ভাঙল না। লিলিয়ানের চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। পনের বছর আগে এক ভয়ঙ্কর জটিল সময়ে কেউ একজন তার হাত ধরে বলার চেষ্টা করেছিল— কোনো ভয় নেই। সেই দুঃসময় আজ আর তার নেই। জীবন তার মঙ্গলময় বিশাল বাহু মেলে লিলিয়ানকে জড়িয়ে ধরেছে। আজ আর আশ্বাসের বাণী শোনার তার প্রয়োজন নেই।

লিলিয়ান আবার বারান্দায় এসে দাঁড়াল। নিচে খুব মজা হচ্ছে। দোলনা তৈরি হয়ে গেছে। তাহের দোল খাচ্ছে। মেয়েরা বাবাকে নামিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে, পারছে না। লিলিয়ান আপন মনে বলল, আমি কেউ না, অতি চুচ্ছ একজন, তবু ঈশ্বর কেন এত সুখ আমার জন্যে রেখেছেন ?

খুট করে শব্দ হলো। আয়নাঘরের দরজা খুলে গেল। লিলিয়ানের মনে হলো, নূপুর পায়ে কে যেন আসছে তার দিকে। এই তো লিলিয়ান তার পা ফেলার ছোট ছোট শব্দ শুনতে পাচ্ছে। লিলিয়ান বাগানের দিকে ইশা বা কবে স্পষ্ট স্বরে বলল— ঐ দেখুন, ও হচ্ছে সারা। আমার বড় মেয়ে। আর নীল জামা পরা মেয়েটা রিয়া। দু'জনই খুব দুষ্টি।

তাহের দোল খাওয়া বন্ধ করে উঁচু গলায় বলল, মেয়েরা! তোমাদের মা'কে দেখ। অকারণে কাঁদছে। ব্যাপারটা কী বলো তো, এই মহিলার অকারণে কাদার রোগ আছে। আগেও কয়েকবার লক্ষ করেছি।

রিয়া বড়দের মতো গম্ভীর গলায় বলল, আমার মনে হয় মা'র চোখে কোনো প্রবলেম আছে।

লিলিয়ান খুব কাঁদছে। অসম্ভব সুন্দর এই দিনে কেউ কাঁদে না। লিলিয়ান কাঁদছে, কাঁদতে তার বড় ভালো লাগছে।



বৃহন্নলা

অতিপ্রাকৃত গল্পে গল্পের চেয়ে ভূমিকা বড় হয়ে থাকে।

গাছ যত-না বড়, তার ডালপালা তার চেয়েও বড়। এই গল্পেও তাই হবে। একটা দীর্ঘ ভূমিকা দিয়ে শুরু করব। পাঠকদের অনুরোধ করছি তাঁরা যেন ভূমিকাটা পড়েন। এর প্রয়োজন আছে।

আমার মামাতো ভাইয়ের বিয়ে।

বাবা-মা'র একমাত্র ছেলে, দেখতে রাজপুত্র না হলেও বেশ সুপুরুষ। এমএ পাস করেছে। বাবার ব্যবসা দেখাশোনা করা এবং গ্রুপ থিয়েটার করা— এই দুইয়ে তার কর্মকাণ্ড সীমিত।

বাবা-মা'র একমাত্র ছেলে হলে যা হয়— বিয়ের জন্যে অসংখ্য মেয়ে দেখা হতে লাগল। কাউকেই পছন্দ হয় না। কেউ বেশি লম্বা, কেউ বেশি বেঁটে, কেউ বেশি ফর্সা, কেউ বেশি কথা বলে, আবার কেউ-কেউ দেখা গেল কম কথা বলে। নানান ফ্যাকড়া।

শেষ পর্যন্ত যাকে পছন্দ হলো, সে-মেয়ে ঢাকা ইন্ডেন কলেজে বিএ পড়ে— ইতিহাসে অনার্স। মেয়ের বাবা নেই। মা'র অন্য কোথায় বিয়ে হয়েছে। মেয়ে তার বড়চাচার বাড়িতে মানুষ। তিনিই তাকে খরচপত্র দিয়ে বিয়ে দিচ্ছেন।

আমাব মামা এবং মামি দু'জনের কেউই এই বিয়ে সহজভাবে নিতে পারলেন না। যে-মেয়ের বাবা নেই, মা আবার বিয়ে করেছে— পাত্রী হিসেবে সে তেমন কিছু না। তা ছাড়া সে খুব সুন্দরীও না। মোটামুটি ধরনের চেহারা। আমার মামাতো ভাই তবু কেন জানি একবারমাত্র এই মেয়েকে দেখেই বলে দিয়েছে— এই মেয়ে ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করবে না। মেয়ের বাবা নেই তো কী হয়েছে? সবার বাবা চিবকাল থাকে নাকি? মেয়ের মা'র বিয়ে হয়েছে, তাতে অসুবিধাটা কী? অল্প বয়সে বিধবা হয়েছেন, তাঁর তো বিয়ে করাই উচিত। এমন তো না যে, দেশে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ।

মামা-মামিকে শেষ পর্যন্ত মত দিতে হলো, তবে খুব খুশিমনে মত দিলেন না, কারণ মেয়ের বড়চাচাকেও তাঁদের খুবই অপছন্দ হয়েছে। লোকটা নাকি অভদ্রের চূড়ান্ত। ধবাকে সবা জ্ঞান করে। চামার টাইপ।

বিয়ের দিন-তারিখ হলো।

এক মঙ্গলবাব কাকডাকা ভোরে আমরা একটা মাইক্রোবাস এবং সাদা রঙের টয়োটায করে রওনা হলাম। গন্তব্য ঢাকা থেকে নব্বই মাইল দূরের এক মফস্বল শহর। মফস্বল শহরের নামটা আমি বলতে চাচ্ছি না; গল্পের জন্যে সেই নাম জানার প্রয়োজনও নেই।

তেরিশ জন বরযাত্রী। অধিকাংশই ছেলেছোকরা। হৈচৈয়ের চূড়ান্ত হচ্ছে। এই মাইক বাজছে, এই মাইক্রোবাসের ভেতর ব্রেক ডাঙ্গ হচ্ছে, এই পটকা ফুটছে। ফাঁকা

রাস্তায় এসে মাইক্রোবাসের গিয়ারবক্সে কী যেন হলো। একটু পরপর বাস থেমে যায়। সবাইকে নেমে ঠেলতে হয়। বরযাত্রীদের উৎসাহ তাতে যেন আরো বাড়ল। শুধু আমার মামা অসম্ভব গম্ভীর হয়ে পড়লেন। আমাকে ফিসফিস করে বললেন, এটা হচ্ছে অলক্ষণ। খুবই অলক্ষণ। রওনা হবার সময় একটা খালি জগ দেখেছি, তখনই মনে হয়েছে একটা কিছু হবে। গিয়ারবক্স গেছে, এখন দেখবি চাকা পাংচার হবে। না হয়েই পারে না।

হলোও তাই। একটা কালভার্ট পার হবার সময় চাকার হাওয়া চলে গেল। মামা বললেন, কী, দেখলি? বিশ্বাস হলো আমার কথা? এখন বসে-বসে আঙুল চোষ।

স্পেয়ার চাকা লাগাতেও অনেক সময় লাগল। মামা ছাড়া অন্য কাউকে বিচলিত হতে দেখলাম না।

বরযাত্রীদের উৎসাহ মনে হলো আরো বেড়েছে। চিৎকার হৈচৈ হচ্ছে। একজন গান গাওয়ার চেষ্টা করছে। শুধুমাত্র বিয়েবাড়িতে পৌঁছানোর পরই সবার উৎসাহে খানিকটা ভাটা পড়ল।

মফস্বল শহরের বড় বাড়িগুলি সাধারণত যে-রকম হয়, সে-রকম একটা পুরনো ধরনের বাড়ি। এইসব বাড়িগুলি এমনিতেই খানিকটা বিষণ্ণ প্রকৃতির হয়। এই বাড়ি দেখে মনে হলো বিরাট একটা শোকের বাড়ি। খাঁ-খাঁ করছে চারদিক। লোকজন নেই। কলাগাছ দিয়ে একটা গেটের মতো করা হয়েছে, সেটাকে গেট না-বলে গেটের প্রহসন বলাই ভালো। একদিকে রঙিন কাগজের চেইন, অন্যদিকে খালি। হয় বঙিন কাগজ কম পড়েছে, কিংবা লোকজনের গেট প্রসঙ্গে উৎসাহ শেষ হয়ে গেছে। আমার মামা হতভম্ব। বরযাত্রীরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। ব্যাপারটা কী!

হাফশার্ট পরা এক চ্যাংড়া ছেলে এসে বলল, আপনাবা বসেন। বিশ্রাম করেন।

আমি বললাম, আর লোকজন কোথায়? মেয়েব বড়চাচা কোথায়? সেই ছেলে শুকনো গলায় বলল, আছে, সবাই আছে। আপনারা বিশ্রাম করেন।

আমি বললাম, কোনো সমস্যা হয়েছে?

সেই ছেলে ফ্যাকাসে হাসি হেসে বলল, জি-না, সমস্যা কিসের? এই বলেই সে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। আর বেরুল না।

বসার ঘরে চাদর পেতে বরযাত্রীদের বিশ্রামের ব্যবস্থা। বারান্দায় গোটা দশেক ফোল্ডিং চেয়ার। বিয়েবাড়ির সজ্জা বলতে এইটুকুই।

মামা বললেন, বলেছিলাম না অলক্ষণ? এখন বিশ্বাস হলো? কী কাণ্ড হয়েছে কে জানে! আমার তো মনে হয় বাড়িতে মেয়েই নেই। কারোর সঙ্গে পালিয়ে-টালিয়ে গেছে। মুখে জুতোর বাড়ি পড়ল, স্রেফ জুতোর বাড়ি।

মামা অল্পতেই উত্তেজিত হন। গত বছর তাঁর ছোটখাট স্ট্রোক হয়ে গেছে। উত্তেজনার ব্যাপারগুলি তাঁর জন্যে ক্ষতির কারণ হতে পারে। আমি মামাকে সামলাতে চেষ্টা করলাম। হাসিমুখে বললাম, হাত-মুখ ধুয়ে একটু শুয়ে থাকুন তো মামা। আমি খোঁজ নিচ্ছি কী ব্যাপার।

মামা তীব্র গলায় বললেন, হাত-মুখটা ধোব কী দিয়ে, গুনি? হাত-মুখ ধোবার পানি কেউ দিয়েছে? বুঝতে পারছিস না? এরা বেইজ্ঞতার চূড়ান্ত করার চেষ্টা করছে।

কী যে বলেন মামা!

কথা যখন অক্ষরে-অক্ষরে ফলবে, তখন বুঝবি কী বলছি। কাপড়-চোপড় খুলে ন্যাংটো করে সবাইকে ছেড়ে দেবে। পাড়ার লোক এনে ধোলাই দেবে। আমার কথা বিশ্বাস না-হয়, লিখে রাখ।

মামার কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই খালিগায়ে নীল লুঙ্গি-পরা এক লোক প্রাস্টিকের বালতিতে করে এক বালতি পানি এবং একটা মগ নিয়ে ঢুকল। পাথরের মতো মুখ করে বলল, হাত-মুখ ধোন। চা আইতাছে।

মামা বললেন, খবরদার কেউ চা মুখে দেবে না, খবরদার! দেখি ব্যাপার কী।

ভেতরবাড়ি থেকে কান্নার শব্দ আসছে। বিয়েবাড়িতে কান্না কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু এই কান্না অস্বাভাবিক লাগছে। মধ্যবয়স্ক এক লোক এক বিশাল কেটলিতে করে চা নিয়ে ঢুকল। আমি তাঁকে বললাম, ব্যাপার কী বলেন তো ভাই? সেই লোক বলল, কিছু না।

ভেতরবাড়ির কান্না এই সময় তীব্র হলো। কান্না এবং মেয়েলি গলায় বিলাপ। কান্না যেমন হঠাৎ তুঙ্গে উঠেছিল, তেমনি হঠাৎই নেমে গেল। তার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই মেয়ের বড়চাচা ঢুকলেন। ভদ্রলোককে দেখেই মনে হলো তাঁর উপব দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে। তিনি নিচু গলায় যা বললেন, তা শুনে আমরা স্তম্ভিত। কী সর্বনাশের কথা! জানলাম যে কিছুক্ষণ আগেই তাঁর বড়ছেলে মারা গেছে। অনেক দিন থেকেই অসুখে ভুগছিল। আজ সকাল থেকে খুব বাড়াবাড়ি হলো। সব এলোমেলো হয়ে গেছে এই কারণেই। তিনি তার জন্যে লজ্জিত, দুঃখিত ও অনুতপ্ত। তবে যত অসুবিধাই হোক—বিয়ে হবে। আজ রাতে সম্ভব হবে না, পরদিন।

এই কথা বলতে-বলতে তিনি হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

আমার মামা খুবই আবেগপ্রবণ মানুষ। অল্পতে বাগতেও পারেন, আবার সেই রাগ হিমশীতল পানিতে রূপান্তরিত হতেও সময় লাগে না। তিনি মেয়ের বড়চাচাকে জড়িয়ে ধরে নিজেও কেঁদে ফেললেন। কাতর গলায় বললেন, আপনি আমাদের নিয়ে মোটেও চিন্তা করবেন না। আমাদের কিছু লাগবে না, আপনি বাড়ির ভেতরে যান বেয়াই সাহেব।

অদ্ভুত একটা অবস্থা! এর চেয়ে যদি গুনতাম মেয়ে পালিয়ে গেছে, তাও ভালো ছিল। কারো উপর রাগ ঢেলে ফেলা যেত।

আমরা বরযাত্রীরা খুবই বিব্রত বোধ করছি। স্থানীয় লোকজন এখন দেখতে পাচ্ছি। তারা বোধহয় এতক্ষণ ভেতরের বাড়িতে ছিলেন। আমরা বসার ঘরেই আছি। খিদেয় একেকজন প্রায় মরতে বসেছি। খাবার কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে কিনা বুঝতে পারছি না। এই পরিস্থিতিতে খাবারের কথা জিজ্ঞেসও করা যায় না। একজন মামাকে কানে-কানে এই ব্যাপারে বলতেই তিনি রাগী গলায় বললেন, তোমাদের কি মাথাটাখা খারাপ হয়েছে? এত বড় একটা শোকের ব্যাপার, আর তোমরা খাওয়ার চিন্তায় অস্থির! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! 'রাত না খেলে হয় কী? খবরদার, আমার সামনে কেউ খাবারের কথা মুখ দিয়ে করবে না।

আমরা চুপ করে গেলাম। বার-তের বছরের ফুটফুটে একটি মেয়ে এসে পানভর্তি একটা পানদান রেখে গেল। কাঁদতে-কাঁদতে মেয়েটি চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে। এখনো কাঁদছে।

মামা মেয়েটিকে বললেন, লক্ষ্মীসোনা, তোমাদের মোটেই ব্যস্ত হতে হবে না। আমাদের কিছুই লাগবে না।

রাত আটটার দিকে থাকা এবং খাওয়ার সমস্যার একটা সমাধান হলো। স্থানীয় লোকজন ঠিক করলেন, প্রত্যেকেই তাঁদের বাড়িতে একজন-দু'জন করে গেষ্ট নিয়ে যাবেন। বিয়ে হবে পরদিন বিকেলে।

আমাকে যিনি নিয়ে চললেন, তাঁর নাম সুধাকান্ত ভৌমিক। ভদ্রলোকের বয়স ষাটের কাছাকাছি হবে। বেঁটেখাটো মানুষ। শক্তসমর্থ চেহারা। এই বয়সেও দ্রুত হাঁটতে পারেন। ভদ্রলোক মৃদুভাষী। মাথার চুল ধবধবে সাদা। গেরুয়া বস্তুর একটা চাদর দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন বলেই কেমন যেন ঋষি-ঋষি লাগছে।

আমি বললাম, সুধাকান্তবাবু! আপনার বাসা কত দূর?

উনি বললেন, কাছেই।

গ্রাম এবং মফস্বলের লোকদের দূরত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। তাদের 'কাছেই' আসলে দিল্লি হনুজ দূর অন্তের মতো। আমি হাঁটছি তো হাঁটছিই।

অগ্রহায়ণ মাস। গ্রামে এই সময়ে ভালো শীত থাকে। আমাব গায়ে পাতলা একটা পাঞ্জাবি। গীত ভালোই লাগছে।

আমি আবার বললাম, ভাই, কত দূর?

কাছেই।

আমরা একটা নদীর কাছাকাছি এসে পড়লাম। আঁতকে উঠে বললাম, নদী পার হতে হবে নাকি?

পানি নেই, জুতো খুলে হাতে নিয়ে নিন।

রাগে আমার গা জ্বলে গেল। এই লোকের সঙ্গে আসাই উচিত হয় নি। আমি জুতো খুলে পায়জামা গুটিয়ে নিলাম। হেঁটে নদী পার হওয়ার কোনো আনন্দ থাকলেও থাকতে পারে। আমি কোনো আনন্দ পেলাম না, শুধু ভয় হচ্ছে কোনো গভীর খানাখন্দে পড়ে যাই কিনা। তা'র নদীর পানি বেশ গরম।

সুধাকান্তবাবু বললেন, আপনাকে কষ্ট দিলাম।

ভদ্র করে হলেও আমার বলা উচিত, না, কষ্ট কিসের! তা বললাম না। নদী পার হয়ে পায় গ্রামা নামাচ্ছি, সুধাকান্তবাবু বললেন, আপনি ছেলের কে হন?

ফুপ তো ভাই।

বিয়েটা না-হলে ভালো হয়। সকালে সবাইকে বুঝিয়ে বলবেন।

সে নী!

মেয়েটার কারণে ছেলেটা মরল। এখন চট করে বিয়ে হওয়া ঠিক না। ^{কিছুদিন}
যাওয়া উচিত।

কী বলছেন এসব!

ছেলেটা সকালবেলা বিষ খেয়েছে। ধুতরা বীজ। এই অঞ্চলে ধুতরা খুব হয়।

আপনি বলছেন কী ভাই?

ছেলের বাবা রাজি হলেই পারত। ছেলেটা বাঁচত। গৌয়ারগোবিন্দ মানুষ। তার 'না' মানেই না।

ছেলে-মেয়ের এই প্রেমের ব্যাপাবটা সবাই জানে নাকি?

জানবে না কেন? মফস্বল শহরে এইসব চাপা থাকে না। আপনাদের শহরে অন্য কথা। আকছার হচ্ছে।

আমার মনটা খাবাপ হয়ে গেল। এ কী সমস্যা! বাকি পথ দু'জন নীরবে পার হলাম।

পুরোপুরি নীরব বলাটা বোধহয় ঠিক হলো না। ভদ্রলোক নিজের মনেই মাঝে মাঝে বিভ্রিবিড় করছিলেন। মন্ত্রটন্ত্র পড়ছেন বোধহয়।

ভদ্রলোকের বাড়ি গণ্ডকবারে জঙ্গলের মধ্যে। একতলা পাকা দালান। প্রশস্ত উঠোন। উঠোনের মাঝখানে তুলসী মঞ্চ। বাড়ির লাগোয়া দু'টি প্রকাণ্ড কামিনী গাছ। একপাশে কুয়া আছে। হিন্দু বাড়িগুলো যেমন থাকে, ছবির মতো পরিচ্ছন্ন। উঠোনে দাঁড়াতেই মনে শান্তি-শান্তি একটা ভাব হলো। আমি বললাম, এত চূপচাপ কেন? বাড়িতে লোকজন নেই?

না।

আপনি একা নাকি?

হঁ।

বলেন কী! একা-একা এত বড় বাড়িতে থাকেন!

আগে অনেক লোকজন ছিল। কিছু মরে গেছে। কিছু চলে গেছে ইন্ডিয়াতে। এখন আমি একাই আছি। আপনি মান করে ফেলুন।

স্নান-ফান লাগবে না। আপনি কিছু খাবারের ব্যবস্থা করুন, তাহলেই হবে।

একটু সময় লাগবে, রান্নার জোগাড় করতে হবে।

আপনি কি এখন রান্না করবেন?

রান্না না কবলে খাবেন কী? বেশিক্ষণ লাগবে না।

ভদ্রলোক গামছা, সাবান এবং একটা জলচৌকি এনে কুয়ার পাশে রাখলেন।

স্নান করে ফেলুন। সারাদিন জার্নি করে এসেছেন, স্নান কবলে ভালো লাগবে। কুয়াব জল খুব ভালো। দিন, আমি জল তুলে দিচ্ছি।

আপনাকে তুলতে হবে না। আপনি বরং রান্না শুরু করুন। খিদেয় চোখ অন্ধকার হয়ে আসছে।

এই লুঙ্গিটা পরুন। ধোয়া আছে। আজ সকালেই সোডা দিয়ে ধুয়েছি। আমার আবার পবিত্রতার থাকার বাতিক আছে, নোংরা সহ্য করতে পারি না।

ভদ্রলোক যে নোংরা সহ্য করতে পারেন না, তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। তিনি রান্না করতে বসেছেন উঠোনে। উঠোনেই পরিষ্কার ঝকঝকে দুটো মাটির চুলা। সুধাকান্তবাবু চুলার সামনে জলচৌকিতে বসেছেন। থালা, বাটি, হাঁড়ি সবই দেখি দু'বার তিন বার করে ধুচ্ছেন।

সুধাকান্তবাবু!

বলুন।

আপনি বিয়ে করেন নি?

না।

চিরকুমার?

ঐ আর কী।

আপনি করেন কী?

শিক্ষকতা করি। হাই স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক। মনোহরদি হাই স্কুল।

রান্নাবান্না আপনি নিজেই করেন?

হ্যাঁ, নিজেই করি। এক বেলা রান্না করি। এক বেলা ভাত খাই, আর সকালে চিড়া, ফলমূল—এ-সব খাই।

কাজের লোক রাখেন না কেন?

দরকার পড়ে না।

খালি বাড়ি পড়ে থাকে, চুরি হয় না?

না। চোর নেবে কী? আমি একজন দরিদ্র মানুষ। আপনি স্নান করে নিন। স্নান করলে ভালো লাগবে।

অপরিচিত জায়গায় ঠাণ্ডার মধ্যে গায়ে পানি ঢালার আমার কোনোই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু সুধাকান্তবাবু মনে হচ্ছে আমাকে না ভিজিয়ে ছাড়বেন না। লোকটি সম্ভবত শুচিবাহিগ্রস্ত।

কুয়ার পানি নদীর পানির মতো গরম নয়, খুব ঠাণ্ডা। পানি গায়ে দিতেই গা জুড়িয়ে গেল। সারা দিনের ক্লান্তি, বিয়েবাড়ির উদ্বেগ, মৃত্যুসংক্রান্ত জটিলতা—সব ধুয়ে-মুছে গেল। চমৎকার লাগতে লাগল। তাছাড়া পরিবেশটাও বেশ অদ্ভুত। পুরনো ধরনের একটা বাড়ি। ঝকঝকে উঠোনের শেষ প্রান্তে শ্যাওলাধরা প্রাচীন কুয়া। আকাশে পরিষ্কার চাঁদ। কামিনী ফুলের গাছ থেকে ভেসে আসছে মিষ্টি গন্ধ। এক ঋষির মতো চেহারার চিরকুমার বৃদ্ধ রান্না বসিয়েছেন। যেন বিভূতিভূষণের উপন্যাসের কোনো দৃশ্য।

সুধাকান্তবাবু!

বলুন।

রান্নার কত দূর?

দেরি হবে না।

একা-একা থাকতে আপনার খারাপ লাগে না?

না, অভ্যেস হয়ে গেছে।

বাসায় ফিরে আপনি করেন কী ?

তেমন কিছু করি না। চুপচাপ বসে থাকি।

ভয় লাগে না ?

সুধাকান্তবাবু এই প্রশ্নের জবাব দিলেন না।

খাবার আয়োজন সামান্য, তবে এত চমৎকার রান্না আমি দীর্ঘদিন খাই নি। একটা কিসের যেন ভাজি, তাতে পাঁচফোড়নের গন্ধ— খেতে একটু টক-টক। বেগুন দিয়ে ডিমের তরকারি, তাতে ডালের বড়ি দেওয়া। ডালের বড়ি এর আগে আমি খাই নি। এমন একটা সুখাদ্য দেশে প্রচলিত আছে তা-ই আমার জানা ছিল না। মুগের ডাল। ডালে ঘি দেওয়াতে অপূর্ব গন্ধ!

আমি বললাম, আপনি ক্ষুধার্ত ছিলেন, তাই এত ভালো লেগেছে। রুচির রহস্য ক্ষুধায়। যেখানে ক্ষুধা নেই, সেখানে রুচিও নেই।

আমি চমৎকৃত হলাম।

লোকটির চেহারাই শুধু দার্শনিকের মতো না, কথাবার্তাও দর্শনযেঁসা।

সুধাকান্তবাবু উঠানে পাটি পেতে দিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর সিগারেট হাতে সেখানে বসলাম। কিছুক্ষণ গল্পগুজব করা যেতে পারে। সুধাকান্তবাবুকে অবশ্যি খুব আলাপী লোক বলে মনে হচ্ছে না। এই যে দীর্ঘ সময় তাঁর সঙ্গে আছি, তিনি এর মধ্যে আমার নাম জানতে চান নি। আমি কী করি তাও জানতে চান নি। আমি এই মানুষটির প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ বোধ করছি, কিন্তু এই লোকটা আমার প্রতি কোনো আগ্রহ বোধ করছেন না। অথচ আমি আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, যারা মাষ্টারি করে, তারা কথা বলতে খুব পছন্দ করে। অকাবণেই কথা বলে।

প্রায় মিনিট পনের আমার চুপচাপ বসে থাকার পর সুধাকান্তবাবু আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন একা-একা আমি এই বাড়িতে থাকতে ভয় পাই কিনা, তাই না ?

আমি বললাম, হ্যাঁ, তাই।

সুধাকান্তবাবু বললেন, ভয় পাই। প্রায় রাতেই ঘুমতে পারি না, জেগে থাকি। ঘরের ভেতর আগুন করে রাখি। হারিকেন জ্বালানো থাকে। ওরা আগুন ভয় পায়। আগুন থাকলে কাছে আসে না।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কারা ?

তিনি জবাব দিলেন না।

আমি বললাম, আপনি কি ভূতপ্রেতের কথা বলছেন ?

হ্যাঁ।

আমি মনে মনে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম। পৃথিবী কোথায় চলে গিয়েছে— এই বৃদ্ধ তা বোধহয় জানেন না। চাঁদের পিঠে মানুষের জুতোর ছাপ পড়েছে, ভাইকিং উপগ্রহ নেমেছে মঙ্গলের মরুভূমিতে, ভয়েজার ওয়ান এবং টু উড়ে গেছে বৃহস্পতির কিনারা

যেসে, আর এই অঙ্কের শিক্ষক ভূতের ভয়ে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখছেন। কারণ, অশরীরীরা আগুন ভয় পায়।

আমি বললাম, আপনি কি ওদের দেখেছেন কখনো ?

না।

ওদের পায়েব শব্দ পান ?

তাও না।

তাহলে ?

বুঝতে পারি।

বুঝতে পারেন ?

জি। আপনি যখন আছেন, আপনিও বুঝবেন।

ওদের কাণ্ডকারখানা দেখতে পাব, তাই বলছেন ?

হুঁ, তবে ওদের না, একজন শুধু আসে।

তাও ভালো যে একজন আসে। আমি ভেবেছিলাম দলবল নিয়ে বোধহয় চলে আসে। নাচগান হৈ-হুগা করে।

আপনি আমার কথা একেবারেই বিশ্বাস কনছেন না ?

ঠিকই ধবেছেন, বিশ্বাস করছি না। অবশি) এই মুহূর্তে আমার গা ছমছম কবছে। কারণ, আপনাব পরিবেশটা ভৌতিক।

সুধাকান্তবাবু বললেন, ওরা কিছু আছে।

আমি চুপ করে রইলাম। এই বৃদ্ধের সঙ্গে ভূত আছে কী নেই, তা নিয়ে তর্ক করার কোনো অর্থ হয় না। থাকলে থাকুক।

আমার কাছে যে আসে, সে একটা মেয়ে।

তাই নাকি ?

জি, এগার-বার বছর বয়স।

বুঝলেন কী কবে তাব বয়স এগার-বার ? আপনাকে বলেছে ?

জি-না। অনুমান কবে বলছি।

তাব নাম কী ? নাম জানেন ?

জি-না।

সে এসে কী করে ?

সুধাকান্তবাবু বললেন, মেয়েটি যে আসছে এই কি যথেষ্ট নয় ? তাব কি আর কিছু করার প্রয়োজন আছে ?

আমি চুপ করে গেলাম। আসলেই তো, অশরীরী এক বালিকার উপস্থিতিই তো যথেষ্ট। সুধাকান্তবাবু বললেন, আপনি নিজেও হয়তো দেখতে পারবেন। আমি চমকে উঠলাম। ভদ্রলোক সহজ স্বরে বললেন, আমি ছাড়াও অনেকে দেখেছে।

সুধাকান্তবাবু ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন এবং তার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে বিকট একটা হাসি শুনলাম। উঠোন কাঁপিয়ে গাছপালা কাঁপিয়ে হো-হো করে কে যেন হেসে উঠল। সুধাকান্তবাবু পাশে না থাকলে অজ্ঞানই হয়ে যেতাম। আমি তীক্ষ্ণ গলায় চোঁচিয়ে উঠলাম, কে, কে ?

সুধাকান্তবাবু বললেন, ওটা কিছু না।

আমি ভয়-জড়ানো গলায় বললাম, কিছু না মানে ?

ওটা খাটাশ। মানুষের মতো শব্দ করে হাসে।

বলেন কী! খাটাশের নাম তো এই প্রথম শুনলাম। এ তো ভূতের বাবা বলে মনে হচ্ছে। এখনো আমার গা কাঁপছে।

জল খান। জল খেলে ভয়টা কমবে।

সুধাকান্তবাবু কাঁসার গ্লাসে করে পানি নিয়ে এলেন। খাটাশ নামক জন্তুটি আরেকবার রক্ত হিম-করা হাসি হাসল। সুধাকান্তবাবু যদি কিছু না বলতেন তাহলে ভূতের হাসি শুনেছি, এই ধারণা সারা জীবন আমার মনের মধ্যে থাকত।

লোকটার প্রতি এই প্রথম আমার খানিকটা আস্থা হলো। আজগুবি গল্প বলে ভয় দেখানো এই লোকের ইচ্ছা নয় বলেই মনে হলো। এরকম ইচ্ছা থাকলে, এই ভয়ঙ্কর হাসির কারণ সম্পর্কে সে চূপ করে থাকত।

সুধাকান্তবাবু বললেন, ঐ মেয়েটাব কথা শুনবেন ?

হ্যাঁ, শোনা যেতে পারে। তবে আমি নিজে অবিশ্বাসী ধবনেব মানুষ, কাজেই গল্পের মাঝখানে যদি হেসে ফেলি কিছু মনে করবেন না।

এই গল্পটা কাউকে বলতে ভালো লাগে না। অবশ্যি অনেককে বলেছি। এখানকার সবাই জানে।

আপনাব গল্প এখানকার সবাই বিশ্বাস করেছে ?

সুধাকান্তবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, আমি যদি এখানকার কাউকে একটা মিথ্যা কথাও বলি, এবা বিশ্বাস কববে। এরা আমাকে 'সাধুবাবা' বলে ডাকে। আমি আমার এই দীর্ঘ জীবনে কোনো মিথ্যা কথা বলেছি বলে মনে পড়ে না। আমি থাকি একা-একা। আমার প্রয়োজনও সামান্য। মানুষ মিথ্যা কথা বলে প্রয়োজন এবং স্বার্থের কারণে। আমার সেই সমস্যা নেই। এইসব থাক, আমি বরং গল্পটা বলি।

বলুন।

ভেতবে গিয়ে বসবেন ? এখানে মনে হচ্ছে একটু ঠাণ্ডা লাগছে। অগ্রহায়ণ মাসে হিম পড়ে।

আমার অসুবিধা হচ্ছে না, এখানেই বসে ভালো লাগছে। গ্রামে তেমন আসা হয় না। আপনি শুরু করুন।

সুধাকান্তবাবু গল্প শুরু করতে গিয়েও শুরু করলেন না। হঠাৎ যেন একটু অন্য রকম হয়ে গেলেন। শেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছু দেখতে চেষ্টা করছেন। খসখস শব্দ হলো। নতুন কাপড় পবে হাঁটলে যেমন শব্দ হয়, সেরকম। তার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই কাচের চুড়ির টুং-টাং শব্দের মতো শব্দ। আমি বললাম, কী ব্যাপার বলুন তো ?

সুধাকান্তবাবু ফ্যাকাসে মুখে হাসলেন।

আমি বললাম, কিসের শব্দ হলো ?

তিনি নিচু গলায় বললেন, ও কিছু না, আপনি গল্প শুনুন। আজ ঘুমিয়ে কাজ নেই, আসুন গল্প করে রাত পার করে দিই।

গা-ছমছমে পরিবেশ। বাড়ির লাগোয়া ঝাঁকড়া কামিনী গাছ থেকে কামিনী ফুলের নেশা-ধরানো গন্ধ আসছে। কুয়ার আশেপাশে অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে-নিভছে। উঠানের চুলা থেকে ভেসে আসছে পোড়া কাঠের গন্ধ। আকাশ-ভরা নক্ষত্রবীথি।

সুধাকান্তবাবু গল্প শুরু করলেন।

২

যুবক বয়স থেকেই আমাকে সবাই ডাকত ‘সাধুবাবা’।

যদিও ঠিক সাধু বলতে যা বোঝায় আমি তা নই। তবে প্রকৃতিটা একটু ভিন্ন ছিল। সবকিছু থেকে নিজে থেকে দূরে-দূরে রাখার স্বভাব আমার ছিল। শ্মশান, কবরস্থান এইসব আমাকে ছোটবেলা থেকেই আকর্ষণ করত। অল্প বয়স থেকেই শ্মশান এবং কবরস্থানের আশেপাশে ঘুরঘুর করতাম। আমার বাবা শ্যামাকান্ত ভৌমিক তখন জীবিত। আমার মতিগতি দেখে অল্প বয়সেই আমার বিবাহ ঠিক করলেন। পাশের গ্রামের মেয়ে। ভবানী মিত্র মহাশয়ের প্রথম কন্যা আরতি। খুবই রূপবতী মেয়ে। গ্রামাঞ্চলে এরকম মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। আমি বিবাহ করতে রাজি হলাম। কথাবার্তা পাকাপাকি হয়ে যাবার পর একটা দুর্ঘটনায় মেয়েটা মারা যায়।

কী দুর্ঘটনা ?

সাপের কামড়। আমাদের এই অঞ্চলে সাপের উপদ্রব আছে। বিশেষ করে কেউটে সাপ।

তারপর কী হলো বলুন।

মেয়েটির মৃত্যুতে খুব শোক পেলাম। প্রায় মাথা-খারাপের মতো হয়ে গেল। কিছুই ভালো লাগে না। রাত-বিরাতে শ্মশানে গিয়ে বসে থাকি। সমাজ-সংসার কিছুতেই মন বসে না। গভীর বৈরাগ্য। কিছুদিন সাধু-সন্ন্যাসীর খোঁজ করলাম। ইচ্ছা ছিল উপযুক্ত গুরুর সন্ধান পেলে মন্ত্র নেব। তেমন কাউকে পেলাম না।...

আমার বাবা অন্যত্র আমার বিবাহের চেষ্টা করলেন। আমি রাজি হলাম না। বাবাকে বুঝিয়ে বললাম যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা না যে আমি সংসারের বন্ধনে আটকা পড়ি। পরিবারের অন্যরাও চেষ্টা করলেন— আমি সম্মত হলাম না। এসব আমার প্রথম যৌবনের কথা। না-বললে আপনি গল্পটা বুঝতে পারবেন না। আপনি কি বিরক্ত হচ্ছেন ?

আমি বললাম, না, বিরক্ত হব কেন ?

সুধাকান্তবাবু বললেন, প্রথম যৌবনের কথা সবাই খুব আগ্রহ করে বলে। আমি বলতে পারি না।

আপনি তো ভালোই বলছেন। থামবেন না, বলতে থাকুন।

সুধাকান্তবাবু আবার শুরু করলেন—

এরপর অনেক বছর কাটল। শাশানে-শাশানে ঘুরতাম বলেই বোধহয় ঈশ্বর আমার ঘরটাকেই শাশান করে দিলেন। পুরোপুরি একা হয়ে গেলাম। মানুষ যে-কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেয়। আমিও মানিয়ে নিলাম। আমার প্রকৃতির মধ্যে একধরনের একাকিত্ব ছিল, কাজেই আমার খুব অসুবিধা হলো না। এখন আমি মূল ঘটনায় চলে আসব, তার আগে আপনি কি চা খাবেন ?

জি-না।

খান একটু চা, ভালো লাগবে।

আমার মনে হলো ভদ্রলোকেব নিজেরই চা খেতে হচ্ছে হচ্ছে। আমি বললাম, ঠিক আছে, বানান। একটু ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগছে অবশ্যি!

ভেতবে গিয়ে বসবেন ?

জি-না, এখানেই ভালো লাগছে।

চা শেষ করার পর দ্বিতীয় দফায় গল্প শুরু হলো। এইখানে আমি একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। আমার কাছে মনে হলো ভদ্রলোকের গলার স্বর পাণ্টে গেছে। আগে যে-স্বরে কথা বলছিলেন, এখন সেই স্বরে বলছেন না। একটা পরিবর্তন হয়েছে। আমার মনের ভুল হতে পারে। অনেক সময় পরিবেশের কারণে সবকিছু অন্যরকম মনে হয়।

সুধাকান্তবাবু বলতে শুরু করলেন—

গত বৎসবের কথা। কার্তিক মাস। আমি বাড়িতে ফিরছি। বাত প্রায় দশটা কিংবা তার চেয়ে বেশিও হতে পারে। আমার ঘড়ি নেই, সময়ের হিসাব ঠিক থাকে না।

আমি সুধাকান্তবাবুকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাব স্থল তো নিশ্চয়ই চারটা-পাঁচটার দিকে ছুটি হয়। এত রাতে ফিরছিলেন কেন ?

সুধাকান্তবাবু নিচু গলায় বললেন, রোজই এই সময়ে বাড়ি ফিরি। সকাল-সকাল বাড়ি ফেরার কোনো উৎসাহ বোধ করি না। পাবলিক লাইব্রেরি আছে। ঐখানে পত্রিকা-টত্রিকা পড়ি, গল্পের বই পড়ি।

বলুন তারপর কী হলো।

তারিখটা হচ্ছে বারই কার্তিক, সোমবার। আমি মানুষ হিসেবে বেশ সাহসী। রাত-বিরাতে একা-একা ঘোরাফেঁবা করি। ঐ রাতে রাস্তায় নেমেই আমার ভয়ভয় করতে লাগল। কী জন্যে ভয় করছে সেটাও বুঝলাম না। তখন মনে হলো— রাস্তায় একটা পাগলা কুকুর বের হয়েছে, ভয়টা বোধহয় ঐ কুকুরের কারণে। আমি একটা লাঠি হাতে নিলাম।

গুরুপক্ষের রাত। ফক্ফকা জ্যোৎস্না, তবু পরিষ্কার সবকিছু দেখা যাচ্ছে না। কারণ কুয়াশা। কার্তিক মাসের শেষে এদিকে বেশ কুয়াশা হয়।

নদীর কাছাকাছি আসতেই কুকুরটাকে দেখলাম। গাছের নিচে গুয়ে ছিল। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াল এবং পেছনে পেছনে আসতে লাগল। মাঝে-মাঝে চাপা শব্দ করছে।

পাগলা কুকুর পেছনে পেছনে আসছে, আমি এগোচ্ছি— ব্যাপারটা খুব ভয়াবহ। যে-কোনো মুহূর্তে এই কুকুর ছুটে এসে কামড়ে ধরতে পারে। আমি কুকুরটাকে তাড়াবার চেষ্টা করলাম। ঢিল ছুড়লাম, লাঠি দিয়ে ভয় দেখালাম। কুকুর নড়ে না, দাঁড়িয়ে থাকে। চাপা শব্দ করতে থাকে। আমি হাঁটতে শুরু করলেই সেও হাঁটতে শুরু করে।

যাই হোক, আমি কোনোক্রমে নদীর পাড়ে এসে পৌছলাম। তখন আমার খানিকটা সাহস ফিরে এলো। কারণ, পাগলা কুকুর পানিতে নামে না। পানি দেখলেই এরা ছুটে পালায়।

অদ্ভুত কাণ্ড, কুকুর পানি দেখে ছুটে পালাল না। আমার পেছনে পেছনে পানিতে নেমে পড়ল। আমার বিশ্বয়ের সীমা বইল না।

আমি নদীর ওপারে উঠলাম। কুকুরটাও উঠল। আর ঠিক তখন একটা ব্যাপার ঘটল।

সুধাকান্তবাবু থামলেন।

আমি বিরক্ত গলায় বললাম, আপনি জটিল জায়গাগুলিতে দয়া করে থামবেন না। গল্পের মজা নষ্ট হয়ে যায়।

সুধাকান্তবাবু বললেন, এটা কোনো গল্প না। ঘটনাটা কীভাবে বলব ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না বলে থেমেছি।

আপনি মোটামুটিভাবে বলুন, আমি বুঝে নেব।

কুকুরটা আমার খুব কাছাকাছি চলে এলো। পাগলা কুকুর আপনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন কিনা জানি না। ভয়ঙ্কর দৃশ্য! সারাক্ষণ হাঁ করে থাকে। মুখ দিয়ে লাল পড়ে, চোখের দৃষ্টিটাও অন্যরকম। আমি ভয়ে কাঠ হয়ে গেছি। ছুটে পালান বলে ঠিক করেছি, ঠিক তখন কুকুরটা কেন জানি ভয় পেয়ে গেল। অস্বাভাবিক ভয়। একবার এদিকে যাচ্ছে, একবার ওদিকে যাচ্ছে। চাপা আওয়াজটা তার গলায় আন নেই। সে যেউঘেউ করেছে। আমার কাছে মনে হলো, সে কুকুরের ভাষায় আমাকে কী যেন বলার চেষ্টা করেছে। এরকম চলল মিনিট পাঁচেক। তার পরই সে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাঁতরে ওপারে চলে গেল। পুরোপুরি কিন্তু গেল না, ওপারে দাঁড়িয়ে রইল এবং ক্রমাগত ডাকতে লাগল।

তারপর ?

আমি একটা সিগারেট ধরলাম। তখন আমি ধূমপান করতাম। মাস তিনেক হলো ছেড়ে দিয়েছি। যাই হোক, সিগারেট ধরাবার পর ভয়টা পুরোপুরি কেটে গেল। হাত থেকে লাঠি ফেলে দিলাম। বাড়ির দিকে রওনা হব বলে ভাবছি, হঠাৎ মনে হলো নদীর ধার ঘেঁসে বড়-হওয়া ঘাসগুলোব মাঝখান থেকে কী-একটা যেন নড়ে উঠল।

আপনি আবার ভয় পেলেন ?

না, ভয় পেলাম না। একবার ভয় কেটে গেলে মানুষ চট করে আর ভয় পায় না। আমি এগিয়ে গেলাম।

কুকুরটা তখনো আছে ?

হ্যাঁ, আছে।

তারপর বলুন।

কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে দেখলাম একটা মেয়ের ডেডবডি। এগার-বার বছর বয়স।
পরনে ডোরাকাটা শাড়ি।

বলেন কী আপনি!

যা দেখলাম তাই বলছি।

মেয়েটা যে মরে আছে তা বুঝলেন কী করে?

যে কেউ বুঝবে। মেয়েটা মরে শক্ত হয়ে আছে। হাত মুঠিবদ্ধ করা। মুখের কণ্ঠে
রক্ত জমে আছে।

কী সর্বনাশ!

আমি দীর্ঘ সময় মেয়েটার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ভয় পেলেন না?

না, ভয় পেলাম না। আপনাকে তো আগেই বলেছি, একবার ভয় পেলে মানুষ
দ্বিতীয় বার চট করে ভয় পায় না।

তারপর কী হলো বলুন।

মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। বাচ্চা একটা মেয়ে এইভাবে মরে পড়ে আছে, কেউ
জানছে না। কীভাবে না জানি বেচারি মরল। ডেডবডি এখানে ফেলে রেখে যেতে ইচ্ছা
করল না। ফেলে রেখে গেলে শিয়াল-কুকুর ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে। আমার মনে হলো এই
মেয়েটাকে নিয়ে যাওয়া উচিত।

আশ্চর্য তো!

আশ্চর্যের কিছু নেই। আমার অবস্থায় পড়লে আপনিও ঠিক তাই করতেন।

না, আমি তা করতাম না। চিৎকার করে লোক ডাকাডাকি করতাম।

আশেপাশে কোনো বাড়িঘর নেই। কাকে আপনি ডাকতেন?

তারপর কী হলো বলুন।

সুধাকান্তবাবু বললেন, আপনি আমাকে একটা সিগারেট দিন। সিগারেট খেতে ইচ্ছা
করছে।

আমি সিগারেট দিলাম। বৃদ্ধ সিগারেট ধরিয়ে খকখক করে কাশতে লাগলেন।

আমি বললাম, তারপর কী হলো বলুন।

সুধাকান্তবাবু বললেন, ঘটনাটা এখানে শেষ করে দিলে কেমন হয়? আমাব কেন
জানি আর বলতে ইচ্ছা কবছে না।

ইচ্ছে না করলেও বলুন। এখানে গল্প শেষ করার প্রশ্নই ওঠে না।

এটা গল্প না।

গল্প না যে তা বুঝতে পারছি। তারপর বলুন আপনি কী করলেন। মেয়েটাকে
তুললেন?

হ্যাঁ তুললাম। কেন তুললাম সেটাও আপনাকে বলি। একটা অপরিচিত মেয়ের শবদেহ কেউ চট করে কোলে তুলে নিতে পারে না। আমি এই কাজটা করলাম, কারণ এই বালিকার মুখ দেখতে অবিকল...

সুধাকান্তবাবু থেমে গেলেন। আমি বললাম, মেয়েটি দেখতে ঐ মেয়েটির মতো, যার সঙ্গে আপনার বিয়ের কথা হয়েছিল। আরতি ?

হ্যাঁ, আরতি। আপনার স্মৃতিশক্তি তো খুব ভালো!

আপনি আপনার গল্পটা বলে শেষ করুন।

মেয়েটি দেখতে অবিকল আরতির মতো। আমি মাটি থেকে তাকে তুললাম। মব মানুষের শরীর ভাবি হয়ে যায়, লোকে বলে। আমি দেখলাম মেয়েটার শরীর খুব হালকা। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, মেয়েটাকে তোলার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা চিৎকার বন্ধ করে দিল। আমার কাছে মনে হলো চারদিক হঠাৎ সেন অস্বাভাবিক নীরব হয়ে গেছে। আমি মেয়েটাকে নিয়ে রওনা করলাম।

আপনার ভয় করল না ?

না, ভয় করে নি। মেয়েটাব জন্যে মমতা লাগছিল। আমার চোখে প্রায় পানি এসে গিয়েছিল। কার না কার মেয়ে, কোথায় এসে মরে পড়ে আছে। বাড়িতে এসে পৌঁছলাম। মনে হচ্ছে নিশ্চিতি রাত। আমি কোলে করে একটা মৃত বালিকা নিয়ে এসেছি, অথচ আমার মোটেও ভয় করছে না। আমি মেয়েটিকে ঘাড়ের উপর শুইয়ে রেখেই তালা খুলে ঘরে ঢুকলাম। তখন কেন জানি বুকটা কেঁপে উঠল। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো। আমি ভাবলাম ঘর অন্ধকার বলেই এরকম হচ্ছে, আলো জ্বাললেই ভয় কেটে যাবে। মেয়েটাকে আমি বিছানায় শুইয়ে দিলাম।

খাটের নিচে হারিকেন থাকে। আমি হারিকেন বের করলাম। ভয়টা কেন জানি ক্রমেই বাড়তে লাগল। মনে হলো ঘরের বাইরে অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে। অবাক হয়ে আমার কাণ্ডকারখানা দেখছে। যেন আমার সমস্ত আত্মীয়স্বজন চলে এসেছে। আমার বাবা, আমার ঠাকুরদা, আমার ছোটপিসি— কেউ বাদ নেই। ওরা যে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করছে, তাও আমি শুনতে পাচ্ছি।

হারিকেন জ্বালাতে অনেক সময় লাগল। হাত কেঁপে যায়। দেশলাইয়ের কাঠি নিভে যায়, সলতায় আগুন ধরতে চায় না। টপটপ করে আমার গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। শেষ পর্যন্ত হারিকেন জ্বলল। আমার নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এলো। আমি খাটের দিকে তাকালাম— এটা আমি কী দেখছি! এটা কি সম্ভব ? এসব কী ? আমি দেখলাম, মেয়েটা খাটের উপর বসে আছে। বড়-বড় চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমার পায়ের নিচের মাটি কেঁপে উঠল। মনে হলো মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছি।

স্পষ্ট শুনলাম উঠান থেকে ভয়ানক গলায় আমার বাবা ডাকছেন, ও সুধাকান্ত, ও সুধাকান্ত, তুই বেরিয়ে আয়। ও সুধাকান্ত, তুই বেরিয়ে আয়। ও বাপধন, বেরিয়ে আয়।

আমি বেরিয়ে আসতে চাইলাম, পারলাম না। পা যেন মাটির সঙ্গে গেঁথে গেছে। সমস্ত শরীর পাথর হয়ে গেছে। আমি মেয়েটির উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারলাম না। মেয়েটি একটু যেন নড়ে উঠল। কিশোরীদের মতো নরম ও কোমল গলায় একটু

টেনে-টেনে বলল, তুমি একা-একা থাক। বড় মায়া লাগে গো! কতবার ভাবি তোমাবে দেখতে আসব। তুমি কি আমারে চিনতে পারছ? আমি আরতি গো, আরতি। তুমি কি আমারে চিনছ?

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো বললাম, হ্যাঁ।

তোমার জন্যে বড় মায়া লাগে গো, বড় মায়া লাগে। একা-একা তুমি থাক। বড় মায়া লাগে। আমি কত ভাবি তোমার কথা। তুমি ভাব না?

আমি যন্ত্রের মতো বললাম, ভাবি।

আমার মনে হলো বাড়ির উঠানে আমার সমস্ত মৃত আত্মীয়স্বজন ভিড় করেছে। আট বছর বয়সে আমার একটা বোন পানিতে পড়ে মারা গিয়েছিল। সেও ব্যাকুল হয়ে ডাকছে— ও দাদা, তুই বেরিয়ে আয় দাদা। আমার ঠাকুরমা'র ভাঙা-ভাঙা গলাও শুনলাম— ও সুধাকান্ত, সুধাকান্ত!...

খাটের উপর বসে থাকা মেয়েটা বলল, তুমি ওদেব কথা শুনতেছ কেন গো? এতদিন পরে তোমার কাছে আসলাম। আমার মনটা তোমার জন্যে কান্দে। ওগো, তুমি আমাব কথা ভাব না? ঠিক করে বলো— ভাব না?...

ভাবি।

আমার গায়ে হাত দিয়ে বলো, ভাবি। ওগো আমার গায়ে হাত দিয়ে বলো। ..

আমি একটা ঘোরের মধ্যে আছি। সবটাই মনে হচ্ছে স্বপ্ন। স্বপ্নে সবই সম্ভব। আমি মেয়েটির গা স্পর্শ কবাব জন্যে এগোলাম, তখনই আমাব মৃত মা উঠোন থেকে চৈচালেন— খবরদার সুধাকান্ত, খবরদার!...

আমাব ঘোর কেটে গেল। এ আমি কী করছি? এ আমি কী করছি? আমি হাতে ধবে বাখা হারিকেন ছুড়ে ফেলে ছুটে ঘর থেকে বেরোতে গেলাম। খাটের উপর বসে-থাকা মেয়েটি পেছন থেকে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমার ডান পায়ের গোড়ালি কামড়ে ধরল। ভয়াবহ কামড়! মনে হলো পায়ের হাড় সে দাঁত ফুটিয়ে দিয়েছে।

সে হাত দিয়ে আমাকে ধরল না। কামড়ে ধরে রাখল। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করলাম বেবিয়ে যেতে। কিছুতেই পারলাম না। এতটুকু একটা মেয়ে— কী প্রচণ্ড তার শক্তি! আমি প্রাণপণে চৈচালাম— কে কোথায় আছ, বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও! তখন একটা ব্যাপার ঘটল। মনে হলো কালো একটা কী-য়েন উঠোন থেকে ঘরের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটির উপর। চাপা গর্জন শোনা যেতে লাগল। মেয়েটি আমাকে ছেড়ে দিল। আমি পা টানতে-টানতে উঠানে চলে এলাম।

উঠানে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারলাম ভেতরে ধস্তাধস্তি হচ্ছে। ধস্তাধস্তি হচ্ছে ঐ পাগলা কুকুব এবং মেয়েটার মধ্যে। মেয়েটা তীব্র গলায় বলছে— ছাড়, আমাকে ছাড়...।

কুকুরটা ক্রুদ্ধ গর্জন করছে। সেই গর্জন ঠিক কুকুবের গর্জনও নয়। অদেখা ভুবনের কোনো পশুর গর্জন। সেই গর্জন ছাপিয়েও মেয়েটির গলার স্বব শোনা যাচ্ছে— আমারে খাইয়া ফেলতাকে। ওগো তুমি কই? আমারে খাইয়া ফেলতাকে।

সুধাকান্তবাবু থামলেন।

আমি বললাম, তারপর?

তিনি জবাব দিলেন না। আমি আবার বললাম, তারপর কী হলো সুধাকান্তবাবু ?

তিনি আমার দিকে তাকালেন। যেন আমার প্রশ্নই বুঝতে পারছেন না। আমি দেখলাম তিনি থরথর করে কাঁপছেন। আমি বললাম, কী হলো সুধাকান্তবাবু ?

তিনি কাঁপা গলায় বললেন, ভয় লাগছে। দেয়াশলাইটা একটু জ্বালান তো।

আমি দেয়াশলাই জ্বাললাম। সুধাকান্তবাবু তাঁর পা বের করে বললেন, দেখুন, কামড়ের দাগ দেখুন।

আমি গভীর ক্ষতচিহ্নের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সুধাকান্তবাবু বললেন, ও এখনো আসে। বাড়ির পেছনে থপথপ করে হাঁটে। নিঃশ্বাস ফেলে। জানালার পাট হঠাৎ করে বন্ধ করে দিয়ে ভয় দেখায়। হাসে। নাকি সুরে কাঁদে। একেক দিন খুব বিরক্ত করে। তখন ঐ কুকুরটাও আসে। হুটোপুটি গুরু হয়ে যায়। সাধারণত কৃষ্ণপক্ষের রাতেই বেশি হয়।

আমি বললাম এটা কি কৃষ্ণপক্ষ ?

সুধাকান্তবাবু বললেন, না। চাঁদ দেখতে পাচ্ছেন না ?

আমি বললাম, আপনি তো ভাই ভয়াবহ গল্প শোনালেন। আমি তো এখন রাতে ঘুমুতে পারব না।

ঘুমানোর দরকার নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে সূর্য উঠবে। চাঁদ ডুবে গেছে দেখছেন না ?

আমি ঘড়ি দেখলাম। চারটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি। সত্যি-সত্যি রাত শেষ হয়ে গেছে।

সুধাকান্তবাবু বললেন, চা খাওয়া যাক, কি বলেন ?

হ্যাঁ, খাওয়া যাক।

তিনি চুলা ধবিয়ে কেটলি বসিয়ে দিয়ে নিচু গলায় বললেন, বড় বিরক্ত করে। মাঝে-মাঝে টিল মাঝে টিনের চালে, থু-থু করে থুথু-ফেলে। ভয় করে, রাত-বিবাতে বাথরুমে যেতে হলে হাতে জ্বলন্ত আগুন নিয়ে যেতে হয়। গলায় এই দেখুন একটা অষ্টধাতুর কবচ। কোমরে সবসময় একটা লোহার চাবি বাঁধা, তবু ভয় কাটে না।

বাড়ি ছেড়ে চলে যান না কেন ?

কোথায় যাব বলেন ? পূর্বপুরুষের ভিটে।

কাউকে সঙ্গে এনে রাখেন না কেন ?

কেউ থাকতে চায় না রে ভাই, কেউ থাকতে চায় না।

সুধাকান্তবাবু চায়ের কাপ হাতে তুলে দিলেন। চুমুক দিতে যাব, তখনী বাড়ির একটা কপাট শব্দ করে নড়ে উঠল। আমি চমকে উঠলাম। হাওয়ার কোনো বংশও নেই— কপাটে শব্দ হয় কেন ?

আমি সুধাকান্তবাবুর দিকে তাকালাম। তিনি সহজ গলায় বললেন, ভয়ের কিছু নেই— চা খান। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোর হবে।

বাড়ির পেছনের বনে খচমচ শব্দ হচ্ছে। আসলে আমি অস্থির বোধ করছি। এই অবস্থা হবে জানলে কে আসত এই লোকের কাছে! আমার ইচ্ছে করছে ছুটে পালিয়ে যাই। সুধাকান্তবাবু বললেন, ভয় পাবেন না।

আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি একমনে মন্ত্র আওড়াতে লাগলেন। নিশ্চয়ই ভূত-তাড়ানো মন্ত্র। আমি খুব চেষ্টা করলাম ছোটবেলায় শেখা আয়াতুল কুরসি মনে করতে। কিছুতেই মনে পড়ল না। মাথা পুরোপুরি এলোমেলো হয়ে গেছে। গা দিয়ে ঘাম বেরোচ্ছে। ঠিকমতো নিঃশ্বাসও নিতে পারছি না। মনে হচ্ছে বাতাসের অক্সিজেন হঠাৎ করে অনেকখানি কমে গেছে। ভয় নামক ব্যাপারটি যে কত প্রবল এবং কী-রকম সর্বগ্রাসী, তা এই প্রথম বুঝলাম।

একসময় ভোর হলো।

ভোরের পাখি ডাকতে লাগল। আকাশ ফরসা হলো। তাকিয়ে দেখি গায়ের পাঞ্জাবি ভিজে জবজব করছে।

৩

আমাব মামাতো ভাইয়ের বিয়েটা শেষ পর্যন্ত হলো না। মেয়ে কিছুতেই ‘কবুল’ বলল না। যত বাব বলা হলো, মা, বলো কবুল; তত বারই মেয়ে কঠিন গলায় বলল, না।

আমি ছেলেব পক্ষের সাক্ষীদের একজন। বড় বিব্রত বোধ করতে লাগলাম। মেয়ের এক খালা বললেন, আপনারা একটু পরে আবার আসুন। বাড়িতে এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। মনটন খারাপ। বুঝতেই পারছেন।

আমবা চলে এলাম। ঘন্টাকানেক পর আবার গেলাম। বলা হলো, মা, বলো তো কবুল। মেয়েটি অস্ফুট গলায় কী যেন বলল। মেয়ের খালা বললেন, এই তো বলেছে। মেয়েমানুষ চিৎকার করে বলবে নাকি? আমি শুনেছি, পরিষ্কার বলেছে। এখন যান ছেলের কবুল নিয়ে আসুন।

আমি দৃঢ় গলায় বললাম, আমি কিছু শুনতে পাই নি। পরিষ্কার কবে বলতে হবে।

উকিল বললেন, মা, বলো কবুল।

মেয়েটি এবাব স্পষ্ট কবে বলল, না। বলেই তীব্র চোখে আমাব দিকে তাকাল। সেই চোখে বাগ ছিল, ঘৃণা ছিল, কিঞ্চিৎ অভিমানও ছিল। যেন সে বলেছে— কেন তোমরা আমাকে কষ্ট দিচ্ছ? তোমাদের পায়ে পড়ি, দয়া কবে আমাকে মুক্তি দাও।

আমি বললাম, বিয়ের ব্যাপারটা আপাতত বন্ধ থাকুক। শোকের ধাক্কাটা কমুক, তাবপর দেখা যাবে।

আমরা চলে এলাম। মফস্বলের ঐ শহরের সাথে কোণেরকম সম্পর্ক রইল না। তবে শহরটার স্মৃতি আমার মনে কাঁটার মতো বিধে রইল। স্মৃতির সবটুকুই গভীর বেদনার। আমার মামা ওখান থেকে ফিরে আসার পরপরই মাইয়ো কার্ডিয়াক ইনফ্রাকশানে মারা গেলেন। ছেলের বৌ দেখার খুব শখ ছিল, সেই শখ মিটল না। মামাতো ভাইটিও বিয়ে করতে রাজি হলো না। বিচিত্র কারণে সে ঐ মেয়েটির ছবি বুকে

পুষতে লাগল। শুধুমাত্র তার মুখের দিকে তাকিয়েই আবার বছরখানেক পর গেলাম ঐ শহরে। শুনলাম মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে— ছেলে ডাক্তার।

সুধাকান্তবাবুর সঙ্গেও দেখা হলো। আশ্চর্যের ব্যাপার, তিনি আমাকে চিনতে পারলেন না! যখন বললাম, আপনার সঙ্গে একবার সারারাত কাটালাম, আপনার কিছুই মনে নেই? তিনি বললেন, ও আচ্ছা, মনে পড়েছে। তাঁর চোখ-মুখ দেখেই বুঝলাম কথাগুলো তিনি ভদ্রতা করেই বললেন, আসলে কিছুই মনে পড়ে নি।

ভদ্রলোক আমাকে ভুলে গিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু আমি তাঁকে মনে রেখেছি এবং বেশ ভালোভাবেই মনে রেখেছি। তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা প্রায়ই মনে হতো। সেই অভিজ্ঞতায় আমারও কিছু অংশ আছে। কপাটের শব্দ আমি নিজের কানে শুনে এসেছি। বাতাস নেই, কিছু নেই, অথচ শব্দ করে কে যেন কপাট বন্ধ করল।

কাচের চুড়ির শব্দ। বাড়ির পেছনে খচখচ আওয়াজ— সবই আমার নিজের কানে শোনা।

সুধাকান্তবাবুর এই গল্প অনেকের সঙ্গেই করেছি। খুব আগ্রহ নিয়েই করেছি। ঝড়বৃষ্টির রাতে যখনই ভূতের গল্পের আসর বসেছে, আমি এই গল্প বলেছি। তবে গল্প তেমন জমাতে পারি নি। আমি যেমন অভিজ্ঞ হয়েছিলাম, আমি লক্ষ করেছি আমার গল্পের শ্রোতারা তার একশ' ভাগেব এক ভাগও হয় না। অথচ আমি নিজে খুব ভালো গল্প বলতে পারি। হয়তো পরিবেশ একটা ব্যাপার। সুধাকান্তবাবুর বাড়িতে আধোজ্যোৎস্নায় যে-পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, ঢাকা শহরের ড্রয়িংরুমে সেই পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব নয়। তবু এটি আমার একটি প্রিয় গল্প। যত বার এই গল্প বলেছি, তত বার ঐ রাতের কথা মনে পড়েছে— একধরনের শিহরণ বোধ করেছি।

8

বছর তিনেক পরের কথা।

সন্ধ্যা সাতটার মতো বাজে। একটা 'সেমিনার টক' তৈরি করছি। বিষয়-পরিবেশ দৃষ্ণে পলিমারের ভূমিকা। চারদিকে কাগজপত্র, চার্ট, গ্রাফ নিয়ে বসেছি। সব এলোমেলো অবস্থায় আছে। ঠিক করে রেখেছি, কাজ শেষ না করে উঠব না।

মার্ক'স ল বলে একটা ব্যাপার আছে। মার্ক'স ল বলে— Anything that can go wrong, will go wrong আমার বেলাও তাই হলো। একের পর এক সমস্যা হতে লাগল। লিখতে গিয়ে দেখি বলপয়েন্টে কালি আসছে না। কালির কলম নিয়ে দেখা গেল ঘরে কালি নেই।

একের পর এক টেলিফোন আসতে লাগল। আমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই এত দিন থাকতে আজই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য। তাদের কথাও দেখি অনেক জমে আছে, কিছুতেই শেষ হয় না। আমি টেলিফোন রিসিভার উঠিয়ে রাখলাম। দোকান থেকে এক ডজন বলপয়েন্ট আনিয়াে বসলাম, আর তখন আমার বড় মেয়ে বলল, বাবা, একজন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, তোমাকে না বলেছি। কেউ এলে বলবে আমি বাসায় নেই ?

আমার মেয়ে বলল, আমি মিথ্যা বলতে পারি না, বাবা।

মিথ্যা কথা বলতে পার না মানে ? আমার তো ধারণা, তুমি সারাক্ষণই মিথ্যা কথা বলো।

মঙ্গলবারে বলি না। মঙ্গলবার হচ্ছে সত্য-দিবস।

অনেক কষ্টে রাগ সামলালাম। কিছুদিন আগে কী-একটা নাটকে দেখিয়েছে মঙ্গলবার সত্য-দিবস, সেদিন মিথ্যা বলা যাবে না।

আমি মনের বিরক্তি চেপে রেখে বসার ঘরে ঢুকলাম। অপরিচিত এক ভদ্রলোক বসে আছেন। অসম্ভব রোগা, লম্বা একজন মানুষ— যাকে দেখলেই সরলরেখার কথা মনে হয়। এই গরমে গলায় একটা মাফলার। চোখে মোটা চশমা। ভদ্রলোক বসে আছেন মূর্তির মতো। মনে হচ্ছে ধ্যানে বসেছেন।

ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। লম্বাটে মুখ। দাড়ি আছে। চুল লম্বা। দাড়ি, চুল, পরনের কালো কোট সবই কেমন যেন এলোমেলো। প্রথম দর্শনে মনে হয় ভবঘুরে ধরনের কেউ। তবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে এই ভাবটা চলে যায়। মনে হয় লাজুক ধরনের একজন মানুষ এসেছেন। যে-কোনো কারণেই হোক মানুষটা বিব্রত বোধ করছেন।

আমি বললাম, আপনি কি আমার কাছে এসেছেন ?

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, জি।

আজ আমি একটা বিশেষ কাজে ব্যস্ত। আপনি কি অন্য একদিন আসতে পারেন ? জি, পারি।

তাহলে তাই করুন।

জি আচ্ছা।

বলেই ভদ্রলোক আবার বসে পড়লেন। আমি বিস্মিত হয়ে তাকালাম। ভদ্রলোক বললেন, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, আপনি বোধহয় লক্ষ করেন নি। আমি সঙ্গে ছাতা আনি নি। বৃষ্টিটা কমলেই চলে যাব।

আমি ফিরে এসে আমার কাজে মন দিলাম। তিন ঘণ্টা একনাগাড়ে কাজ করলাম। অসাধ্যসাধন যাকে বলে। আর কোনো ঝামেলা হলো না। মার্ফি সাহেবের আইন দেখা যাচ্ছে সবসময় কাজ করে না। আমি ভুলেই গেলাম যে, বসার ঘরে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। কী কারণে যেন বসাব ঘরে গিয়েছি, ভদ্রলোককে দেখে চমকে উঠলাম।

আপনি আছেন এখনো ?

জি।

বৃষ্টি তো থেমে গেছে!

তা গেছে, কিন্তু কাউকে কিছু না-বলে যাই কী করে ?

আমি লজ্জিত বোধ করলাম। ভদ্রলোক দীর্ঘসময় একা-একা বসে আছেন। বসার ঘরে কেউ আসে নি, কারণ আমার টিভি শোবার ঘরে। সবাই টিভির সামনে চোখ বড় বড় করে বসে আছে। টিভিতে নিশ্চয়ই কোনো নাটক হচ্ছে।

আমি বললাম, আপনাকে কি ওরা চা দিয়েছে ?

জি-না।

চা খাবেন এক কাপ ?

আরেক দিন যখন আসব, তখন খাব।

আমি বললাম, আরেক দিন আসার দরকার নেই। আজই বলে ফেলুন। চট করে কি বলতে পারবেন ?

না, পারব না। আমি আরেক দিন আসব।

আপনার নামটা তো জানা হলো না।

আমার নাম মিসির আলি।

আমি কি আপনাকে চিনি ?

জি-না। চেনার কোনো কারণ নেই। আমি অ্যাবনর্মাল সাইকোলজি বিষয়ে পড়াশোনা করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্টটাইম শিক্ষক।

আমার সঙ্গে আপনার যোগাযোগের কারণটা আমি বুঝতে পারছি না।

আরেক দিন যখন আসব, আপনাকে বুঝিয়ে বলব। আজ যাই, রাত হয়ে গেছে।

ভদ্রলোক চলে গেলেন। ভদ্রলোককে বেশ আত্মভোলা লোক বলেও মনে হলো। একটা পলিথিনের ব্যাগ ফেলে গেছেন। ব্যাগে একটা পাউরুটি এবং ছোট-ছোট দুটো কলা। মনে হচ্ছে ভদ্রলোকের সকালবেলার নাশতা।

আমি বুঝতে পারলাম না, অ্যাবনর্মাল সাইকোলজির একজন অধ্যাপক আমাব কাছে ঠিক কী চান ? আমার আচার-আচরণে অস্বাভাবিক কিছু তো নেই। বহুসাঁটা কী ?

৫

এক সপ্তাহ পর ভদ্রলোক আবার এলেন।

আমিই দরজা খুললাম। ভদ্রলোক বললেন, আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন ?

আমি বললাম, পারছি। আপনার নাম মিসির আলি। আপনি অ্যাবনর্মাল সাইকোলজির একজন অধ্যাপক। গত সপ্তাহে আমার এখানে এসে একটা পাউরুটি এবং দুটো কলা ফেলে গেছেন।

ভদ্রলোক হেসে ফেললেন। হাসিটি সুন্দর। শিশুর সারল্যমাখা। আজকাল মাপা হাসি ছাড়া আমরা হাসতে পারি না।

মিসির আলি বললেন, আপনার মেয়েটাকে একটু ডাকবেন ? তার জন্যে এক প্যাকেট চকলেট এনেছি।

আমি খানিকটা বিরক্ত ছলাম। অপরিচিত লোক দামি চকলেটের প্যাকেট নিয়ে এলে বুঝতে হবে কিছু ব্যাপার আছে।

আবার চকলেট কেন ?

আপনার জন্যে তো আমি নি, আপনি বিরক্ত হচ্ছেন কেন ? আপনার মেয়েটিকে আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। পছন্দের মানুষকে কিছু দিতে ইচ্ছে করে। আপনি কোনোরকম অস্বস্তি বোধ করবেন না। এই উপহারে কোনোরকম স্বার্থ জড়িত নেই। আমি আপনার কাছে কিছু চাইতে আসি নি।

আমি খানিকটা লজ্জিত বোধ কবলাম। ভদ্রলোককে ঘরে বসিয়ে চকলেটের প্যাকেট ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে বললাম, কী করতে পারি আপনার জন্যে ?

মিসিব আলি বললেন, আপনার কাছে আমার এক কাপ চা পাওনা আছে। ঐ পাওনা চা খাওয়াতে পারেন।

চা আসবে। এখন আসল ব্যাপারটা বলুন।

আপনার কি কোনো তাড়া আছে ?

না, তাড়া নেই।

আমি আপনার কাছে সুধাময়বাবু সম্পর্কে কিছু জানতে এসেছি। আপনি যদি কষ্ট কবে বলেন...

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, সুধাময়বাবু কে ?

আপনি এই নামে কাউকে চেনেন না ?

জি-না।

সুধাময়বাবুর বাড়িতে আপনি কি এক রাত কাটান নি, যেখানে আপনার একটা ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয়।

আপনি কি সুধাকান্তবাবুর কথা বলছেন ?

নাম সুধাকান্ত হতে পারে। গল্পটা আমাকে যে বলেছে, সে সম্ভবত নামে গুণগোল কবেছে।

আমি বললাম, আপনি কি আমাকে দয়া কবে গুঁছিয়ে বলবেন, ব্যাপারটা কী ? সুধাকান্তবাবুকে আমি ঠিকই চিনি। একটা অসাধারণ গল্প তাঁর মুখ থেকে শুনেছি। আপনাব সঙ্গে সেই গল্পের কী সম্পর্ক বুঝতে পারছি না।

মিসির আলি বললেন, আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। তবে রহস্যময় ব্যাপারগুলোর প্রতি আমার একটা আগ্রহ আছে। পৃথিবীতে অনেক রহস্যময় ব্যাপার ঠিকই ঘটে। আবার অনেক কিছু ঘটে যেগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে খুব রহস্যময় মনে হলেও আসলে রহস্যময় নয়। আমি ব্যাপারটা বুঝতে চাই। সুধাকান্তবাবুর চরিত্র আমাকে খানিকটা কৌতূহলী করেছে, কারণ ওর চরিত্রে কিছু অস্বাভাবিক দিক আছে। ঐ সম্পর্কে আমি ভালোভাবে জানতে চাই। তা ছাড়া আপনার গল্পটাও বেশ মজার। এর মধ্যে এমন কিছু এলিমেন্ট আছে, যা প্রচলিত ভূতের গল্পে থাকে না।

আপনি কি ভূতের গল্প নিয়ে গবেষণা করছেন নাকি ?

জি-না। কিছু-কিছু গল্পের প্রতি একধরনের ফ্যাসিনেশন জন্মে যায়। ব্যাপারটা কী, ভালোমতো জানতে ইচ্ছে কবে।

আমার গল্প আপনি কার কাছ থেকে শুনেছেন ?

আমার এক ছাত্রের মুখে শুনেছি। সে শুনেছে আপনার কাছে। নাম হচ্ছে রক্তম। তার কাছ থেকেই আমি আপনার ঠিকানা নিয়েছি।

আপনি বলছিলেন গল্পটাতে মজার কিছু এলিমেন্ট আছে, সেগুলো কী ?

যেমন ধরুন, কুকুরের ব্যাপারটা। একদল কুকুর সুধাকান্তবাবুকে ঘিরে ধরল। তারপর তাকে ঘিরে চক্রাকারে হাঁটতে লাগল এবং একটি বিশেষ দিকে নিয়ে যেতে লাগল। যেখানে নিয়ে গেল সেখানে একটা যুবতীর নগ্ন মৃতদেহ, যাকে কিছুক্ষণ আগেই হত্যা করা হয়েছে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, এ-রকম কিছুই কিন্তু গল্পে নেই। কোনো নগ্ন যুবতীর মৃতদেহ পড়ে ছিল না। একটি বালিকার ডেডবডি ছিল। তার পরনে শাড়ি ছিল।

মিসির আলি হাসতে-হাসতে বললেন, আমিও তাই ভাবছিলাম। গল্প যখন এক জনের মুখ থেকে অন্য জনের মুখে যায়, তখন ডালপালা ছড়ায়। অনেক সময় মূল গল্প খুঁজে পাওয়া যায় না। এই জন্যেই আমি এসেছি আপনার মুখ থেকে গল্পটা শোনার জন্যে। যদি আপনার কষ্ট না হয়।

আমার কোনো কষ্ট হবে না। আমি আগ্রহ করে গল্পটা বলব।

মিসির আলি কোটের পকেট থেকে নোটবই এবং কলম বের কবলেন। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, আপনি কি নোট করেছেন নাকি!

দু-একটা পয়েন্ট লিখে রাখব। আমার স্মৃতিশক্তি ভালো, তবু মাঝে-মাঝে কিছু নোট রাখি। স্মৃতি মানুষকে প্রভাৱণা করে, লেখা করে না।

চা চলে এলো। চা খেতে-খেতে ভদ্রলোক গল্প শুনলেন। তবে গল্প বলে আমি কোনো আরাম পেলাম না। ভদ্রলোক গল্পের মাঝখানে একবারও বললেন না— অদ্ভুত তো! তারপর কী হলো ? কী আশ্চর্য!

তিনি পাথরের মতো মুখ করে গল্প শুনলেন এবং গল্প শেষ হওয়ামাত্র বললেন, আচ্ছা তাহলে যাই। আপনাকে কষ্ট দিলাম, কিছু মনে করবেন না।

আমি বললাম, আপনার কাজ হয়ে গেল ?

জি।

গল্পটা কি আপনার কাছে অদ্ভুত মনে হয় নি ?

জি-না, ভূতের গল্প সাধারণত এরকমই হয়। নতুনত্ব কিছু নেই। আমার শুধু একটা প্রশ্ন, মেয়েটার ডেডবডি কি শেষ পর্যন্ত ছিল ?

তার মানে ?

এ-জাতীয় গল্পে ডেডবডি শেষ পর্যন্ত থাকে না। বাতাসে মিলিয়ে যায় কিংবা কুকুর খেয়ে ফেলে। আপনি জানান, কী হয়েছিল ?

আমি জানি না, আমি জিজ্ঞেস করি নি। আপনি গল্পটার কিছুই বিশ্বাস করেন নি, তাই না ?

জি-না।

কেন, দয়া করে বলবেন কি ?

এই জাতীয় ভয়াবহ অভিজ্ঞতা যখন হয়, তখন মানুষ খুব কনফিউজড অবস্থায় থাকে। কোনো ঘটনাই সে পরিষ্কার দেখে না। যা দেখে তাও সে গুছিয়ে বলতে পারে না। অথচ আপনার সুধাকান্তবাবু চমৎকারভাবে সব বর্ণনা করলেন। অতি সূক্ষ্ম ডিটেলও বাদ দিলেন না। এই জিনিস পাওয়া যায় তৈরি-করা গল্পে।

আমি বললাম, সব মানুষ তো এক রকম নয়। কিছু-কিছু মানুষ বিপর্যয়ের সময়ও মাথা ঠাণ্ডা রাখে।

তা রাখে। যেমন আমি নিজেই রাখি।

তার পরেও আপনি বললেন এটা একটা গল্প ?

জি।

কেন বলুন তো ?

সুধাকান্তবাবু আপনার কথামতো একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ, সাধু-প্রকৃতির লোক। এই ধরনের একজন মানুষ বিপদে ঈশ্বরের নাম নেবে, গায়ত্রী মন্ত্র পড়বে। একজন নাস্তিক পর্যন্ত যে কাজটা করবে, তিনি করেন নি। ঘটনা সত্যি-সত্যি ঘটলে তিনি তা অবশ্যই কবতেন। যেহেতু ঘটনাটা বানানো, কাজেই এই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা বাদ পড়েছে।

আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলাম। লোকটার উপর খানিকটা রাগ হচ্ছে। এককথায় সে বলে দিল গল্প বানানো ?

মিসির আলি বললেন, আপনার সঙ্গে যখন গল্প করছিলেন, তখন ভয় পেয়ে ভদ্রলোক মন্ত্রপাঠ শুরু করলেন, অথচ ঐ রাতে করলেন না। ব্যাপারটা অদ্ভুত না ?

আমি বললাম, সুধাকান্তবাবু শুধু-শুধু এরকম একটা গল্প বানাবেন কেন ? এই রকম একটা গল্প তৈরি পেছনে কোনো একটা কারণ থাকবে নিশ্চয়ই।

তা তো থাকবেই। তাঁরও আছে।

কী কারণ ?

অনেক কারণ হতে পারে। তবে আমাব যা মনে হয়, তা হচ্ছে উনি নিঃসঙ্গ ধরনের মানুষ, এই জাতীয় একটা গল্প তৈরি করে নিজে সবার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছেন। এটা একজন নিঃসঙ্গ মানুষের জন্য কম কথা নয়।

মিসির আলি লোকটির প্রতি আমার ভক্তি হলো। লজিক বা যুক্তি নামক ব্যাপারটা যে কত শক্তিশালী হতে পারে, মিসির আলি তা আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

আমি বললাম, এই গল্পটা যে সত্যি, এটা আপনি কখনো স্বীকার করবেন ? অর্থাৎ কোনো প্রমাণ উপস্থিত করলে আপনি গল্পটা মেনে নেবেন ?

মিসির আলি হাসতে-হাসতে বললেন, ঐ মেয়েটির ডেডবডি যদি অন্যরা দেখে থাকে এবং কন্স দেওয়া হয় বা দাহ করা হয়, তবে আমি ঘটনাটা মেনে নেব।

আমি আপনাকে খবরটা এনে দেব। আমি চিঠি লিখে খবরটা জোগাড় করব। আপনি আপনার ঠিকানা লিখে রেখে যান।

মিসির আলি তাঁর ঠিকানা লিখে রেখে চলে গেলেন। আশ্চর্য কাণ্ড, আজও তাঁর পলিথিনের ব্যাগ ফেলে গেলেন। ব্যাগের ভেতর ছোট্ট একটা পাউরুটি, একটা কলা এবং এক টুকরো মাখন। গরমে সেই মাখন গলে ব্যাগময় ছড়িয়ে পড়েছে।

৬

চিঠি লিখলাম আমার মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে যে মেয়েটির বিয়েব কথা হয়েছিল, সেই মেয়ের বড়চাচাকে। আমার ধারণা ছিল ভদ্রলোক জবাব দেবেন না। যে পরিচয়ের সূত্র ধবে চিঠি লিখেছি, সেই সূত্রে চিঠির জবাব দেওয়ার কথা নয়। ভদ্রলোক কিন্তু জবাব দিলেন এবং বেশ গুছিয়েই জবাব দিলেন।

আপনার পত্র পাইয়াছি।

এক নিতান্ত দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় আপনাদের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। আপনি যে সেই পরিচয় মনে রাখিয়া পত্র দিয়াছেন তাহাতে কৃতজ্ঞ হইলাম। আপনি আমার ভাইস্তি প্রসঙ্গে জানিতে চাহিয়াছেন। দুই বছর আগে তাহার বিবাহ হইয়াছে। এই খবর তো আপনার জানা। সে এখন তাহার স্বামীব সহিত ইরাকে আছে। তাহার স্বামী একজন ডাক্তার। আপনাদের দোয়ায় তাহারা ভালোই আছে।

দ্বিতীয় যে-বিষয়টি আপনি জানিতে চাহিয়াছেন, তাহার সবই সত্য। কুকুরের কামড়ে ছিন্নভিন্ন বালিকাটির দেহ আমরা সবাই দেখিয়াছি। তাহার মৃতদেহ সৎকাবেব কোনো ব্যবস্থা হয় নাই, কারণ বালিকাটি হিন্দু কী মুসলিম তাহা জানা সম্ভব হয় নাই।

ঘটনাটি সেই সময় জনমনে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। দৈনিক ইন্তেফাক পত্রিকার মফস্বল পাতায় খবরও ছাপা হইয়াছিল।

অধিক আর কী? আমরা ভালো আছি। আপনার সর্বাস্থীণ কুশল কামনা করি।

আমি চিঠিটি ডাকযোগে মিসির আলিব ঠিকানায পাঠিয়ে দিলাম। মনে-মনে হাসলাম। ভ্রাতুষ্ট যুক্তিও মাঝে-মাঝে অচল হয়ে যায়। এই চিঠিটি হচ্ছে তার প্রমাণ। চিঠি পাঠাবার তৃতীয় দিনের মাথায় মিসির আলি এসে উপস্থিত। আমি হেসে বললাম, কী, গল্পটা এখন বিশ্বাস করলেন?

মিসির আলি গুনো গলায় বললেন, হুঁ।

তাকে খুব চিন্তিত মনে হলো।

আমি বললাম, আপনাকে এত চিন্তিত মনে হচ্ছে কেন?

মিসির আলি বললেন, আমি আপনার কাছ থেকে গল্পটা আবার শুনতে চাই।

কেন?

প্রিজ, আরেকবার বলুন।

আবার কেন?

বলুন শুন।

আমি দ্বিতীয় বার গল্পটা শুরু করলাম। এক জায়গায় মিসির আলি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, কত তারিখ বললেন?

বারই কার্তিক। এই তারিখে ঘটনাটা ঘটল।

বারই কার্তিক তারিখটা আপনার মনে আছে?

হ্যাঁ, আছে। প্রথম বাব যখন আপনাকে গল্প বলি, তখনো তো বারই কার্তিক বলেছিলাম বলে আমার মনে হয়।

হ্যাঁ, বলেছিলেন। আজও সেই একই তারিখ বলেন কিনা তাই দেখতে চেয়েছি। এই তারিখটা বেশ জরুরি।

জরুরি কেন?

বলছি কেন! তার আগে আপনি বলুন বার তারিখটা আপনার মনে রইল কেন? এসব দিন-তারিখ তো আমাদের মনে থাকে না।

বার তারিখ আমার বড়মেয়ের জন্মদিন। কাজেই সুধাকান্তবাবু বার তারিখ বলামাত্র আমার মনে গের্গে গেল। তা ছাড়া আমার স্মৃতিশক্তি ভালো।

তাই তো দেখছি!

এখন বলুন তারিখটা এত জরুরি কেন?

যে-বছরে ঘটনা ঘটল, আমি সেই বছরের পঞ্জিকা দেখেছি। বাব তারিখ হচ্ছে ২৪ অক্টোবর। স্কুল ছুটি থাকে। ঐদিন লক্ষ্মীপূজার বন্ধ। কাজেই আপনাব সুধাকান্তবাবু আপনাকে একটা মিথ্যা কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ঐদিন স্কুল করেছেন।

হয়তো উনিই তারিখটা ভুল বলেছেন।

হ্যাঁ, তা হতে পারে। তবে আমি তাঁর নিজের মুখে ঘটনাটা শুনতে চাই।

আবার শুনতে চান?

হ্যাঁ।

কেন?

ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছি না।

আমি বিবক্ত হয়ে বললাম, বিশ্বাস করতে না চাইলে করবেন না। আপনাকে বিশ্বাস কবতেই হবে এমন কোনো কথা আছে?

মিসির আলি বললেন, আপনি কি একটু যাবেন আমার সঙ্গে?

কোথায়?

ঐ জায়গায়।

কেন?

তাহলে জেনে আসতাম তারিখটা বাব কিনা।

আপনি কি পাগল নাকি ভাই?

মিসির আলি বললেন, ব্যাপারটা খুব জরুরি। আমাকে জানতেই হবে।

জানতে হলে আপনি যান। আমি আপনাকে ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি।

আপনি যাবেন না ?

জি-না। আজেবাজে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় আমার নেই।

এটা আজেবাজে ব্যাপার না।

আমার কাছে আজেবাজে। আমার যাবার প্রশ্নই ওঠে না।

মিসির আলি মুখ কালো করে উঠে গেলেন। আমি মনে-মনে বললাম, ভালো পাগলের পাল্লায় পড়েছি। লোকটা মনে হলো অ্যাবনর্মাল। অ্যাবনর্মাল সাইকোলজি করতে-করতে নিজেও ঐ পর্যায়ে পৌঁছেছে। এরা দেরি বিপজ্জনক ব্যক্তি।

মিসির আলি যে কী পরিমাণ বিপজ্জনক ব্যক্তি তা টেব পেলাম দিন দশেক পর। আমার ঠিকানায় মিসির আলির এক চিঠি এসে উপস্থিত।

ভাই,

আপনি কেমন আছেন ?

আমি সুধাকান্তবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। দেখা হয় নি। উনি তাঁর দূর সম্পর্কের এক বোনের বাড়ি চলে গিয়েছেন বলে দেখা হয় নি। শুনলাম, তিনি সেখানে পুরো গরমের ছুটিটা কাটাবেন। যাই হোক, উনার অনুপস্থিতিতে আমি কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি। থানায় গিয়ে থানার রেকর্ডপত্র দেখেছি। ঐ খানে ঘটনার তারিখ ২৩ অক্টোবর দিবাগত রাত। অর্থাৎ ১১ কার্তিক। কাজেই সুধাকান্তবাবু তারিখ বলায় একটা ভুল করেছেন বলে মনে হয়। আমি স্থানীয় কুলের হেডমাস্টার সাহেবের সঙ্গেও কথা বলেছি। তিনি বলেছেন, ঐদিন সুধাকান্তবাবু ঠিকই সারা দিন ক্লাস কবেছেন। কাজেই সুধাকান্তবাবু মিথ্যা বলেন নি। তারিখে ভুল করেছেন।

তারিখ ভুল করা খুব অস্বাভাবিক নয়। ভদ্রলোকের শ্রুতিশক্তি তেমন ভালো না। কারণ আপনার মুখেই শুনেছি দ্বিতীয়বার তখন তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয়, তখন তিনি আপনাকে চিনতে পাবেন নি।

থানার ওসি সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম— পোস্টমর্টেম করা হয়েছিল কি ? উনি বললেন— পোস্টমর্টেমের মতো অবস্থা ছিল না। কুকুর সব ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়ে ফেলেছে। ছিন্নভিন্ন কিছু অংশ ছড়িয়ে ছিল। গ্রামের অনায়াও তাই বলল।

মেয়েটি কোথাকার তাও জানা যায় নি। আমি এত দিন পব এসব খোঁজ করছি দেখে তারা প্রথমে একটু অবাক হলেও পরে আমাকে আগ্রহ করে সাহায্য করেছে, কারণ তাদের বলেছি আমার কাজই হচ্ছে রহস্যময় ঘটনা সংগ্রহ করা। গ্রামবাসীদের ধারণা, মেয়েটির অশরীরী আত্মা এখনো ঐ বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়। নানান রকম শব্দ শোনা যায়। মেয়েলি কান্না, দরজা-জানালা আপনা-আপনি বন্ধ হওয়া— এইসব। আমি ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্যে দু'রাত ঐ বাড়ির উঠানে বসে

ছিলাম। তেমন কিছু দেখি নি বা শুনি নি। তবে একবার বাড়ির পেছনে মানুষ দৌড়ে যাবার শব্দ শুনেছি। এটা শেয়ালের দৌড়ে যাবার শব্দও হতে পারে। সারা জীবন শহরে মানুষ হয়েছে বলে এই জাতীয় শব্দের সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় নেই।

আপনাকে চিঠিতে সব জানাচ্ছি, কারণ আমার শরীরটা খুবই খারাপ। ওখান থেকে এসেই প্রবল জ্বরে পড়ে যাই। একবার রক্তবমি হয় বলে ভয় পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। এখন আছি মিডফোর্ড হাসপাতালে। ওয়ার্ড দু'শ' তেত্রিশ। বেড নাম্বার সতের। আপনি যদি আসেন তাহলে খুব খুশি হব। সুধাকান্তবাবু প্রসঙ্গে একটা জরুরি আলাপ ছিল। আশা করি আপনি ভালো আছেন।

আমি এই চিঠি ফেলে দিলাম। একটা পাগল লোককে শুরুতে খানিকটা প্রশ্ন দিয়েছি বলে আফসোস হতে লাগল। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে এই লোক আমার পেছনে জোঁকেব মতো লেগে থাকবে এবং জীবনটা অস্থির করে তুলবে।

তাকে হাসপাতালে দেখতে যাবাব পেছনেও কোনো যুক্তি খুঁজে পেলাম না। দেখতে যাওয়া মানে তাকে প্রশ্ন দেওয়া। দূবে-দূবে থাকাই ভালো। দেখা হলে বলা যাবে— চিঠি পাই নি। বাংলাদেশে চিঠি না-পাওয়া এমন কিছু অবিশ্বাস্য ব্যাপার না। খুবই স্বাভাবিক।

মজাব ব্যাপার হচ্ছে, হাসপাতালেই নিতান্ত কাকতালীয়ভাবে মিসির আলির সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। টেম্পোর সঙ্গে অ্যাকসিডেন্ট করে আমার এক কলিগ পা ভেঙে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাকে দেখে ফিবে আসছি, ইঠাৎ শুনি পেছন থেকে চিকন গলায় কে যেন আমাকে ডাকছে, হুমায়ূন সাহেব। এই যে হুমায়ূন সাহেব।

তাকিয়ে দেখি আমাদের মিসির আলি।

বিছানার সঙ্গে মিশে আছেন। গলা দিয়ে স্বব বেরোচ্ছে না। চিঠি আওয়াজ হচ্ছে। আমি বললাম, আপনাব এ কী অবস্থা।

অসুখটা কাহিল করে ফেলেছে। ততকাল পর্যন্ত ধারণা ছিল মারা যাচ্ছি। আজ একটু ভালো।

ভালোর বুঝি এই নমুনা ?

বড় পড়াটা বন্ধ হয়েছে। তবে ব্যথা সাবে নি। ভাই, বসুন। আপনি আমাকে দেখতে এসেছেন, বড়ই আনন্দ হচ্ছে। আসছেন না দেখে ভাবছিলাম হয়তো চিঠি পান নি।

আমি খানিকটা লজ্জিত বোধ করতে লাগলাম। একবার ইচ্ছা হলো সত্যি কথাটা বলি। বলি যে তাকে দেখতে আসি নি, ভ্রমশ্রমে দেখা হয়ে গেল। পরক্ষণেই মনে হলো, সব সত্যি কথা বলতে নেই।

হুমায়ূন সাহেব!

জি ?

বসুন ভাই, একটু বসুন।

আমি বসলাম। মিসির আলি বললেন, আপনাকে দেখে ভালো লাগছে। একটা বিশেষ কারণে মনটা খুব খারাপ ছিল।

বিশেষ কারণটা কী ?

এগার নম্বর বেডটার দিকে তাকিয়ে দেখুন। আলসারের পেশেন্ট। কিছু খেতে পারে না। হাসপাতাল থেকে যে-খাবার দেয়, সবটাই রেখে দেয়। তখন কী হয় জানেন ? তার ছোটভাই সেটা খায়। খুব তৃপ্তি করে খায়। দিন-রাত বড় ভাইয়ের কাছে সে যে বসে থাকে, ঐ খাবারের আশাতেই বসে থাকে। আজ কী হয়েছে জানেন ? বড়ভাইয়ের শরীর বোধহয় একটু ভালো হয়েছে, সে তার খাবার সব খেয়ে ফেলেছে। ছোট ভাইটা অভুক্ত অবস্থায় সারাদিন বসে আছে। অসম্ভব কষ্ট হয়েছে আমার, বুঝলেন। চোখে পানি এসে গিয়েছিল। আমাদের দেশের মানুষগুলো এত গরিব কেন বলুন তো ভাই ?

আমি মিসির আলির প্রশ্নের জবাব দিতে পারলাম না। এগার নম্বর বেডের দিকে তাকলাম। ষোল-সতের বছরের একজন যুবক অসুস্থ ভাইয়ের পাশে বসে আছে। আমি বললাম, ছেলেটি কি এখনো না-খেয়ে আছে ?

হ্যাঁ। আমি নার্সের হাতে তার জন্যে পঞ্চাশটা টাকা পাঠিয়েছিলাম। সে রাখে নি। বড়ই কষ্ট হচ্ছে হুমাযূন সাহেব।

আমি মিসির আলির হাত ধরলাম। এই প্রথম বুঝলাম— এই মানুষটি আমাদের আর দশটি মানুষের মতো নয়। এই রোগা আধপাগলা মানুষটির হৃদয়ে সমুদ্রের ভালোবাসা সঞ্চিত আছে। এদের স্পর্শ করলেও পুণ্য হয়।

হুমাযূন সাহেব!

জি ?

এই খাতাটা আপনি মনে করে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।

কী খাতা ?

সুধাকান্তবাবুর বিষয়ে এই খাতায় অনেক কিছু লিখে বেখেছি। বাসায় নিয়ে মন দিয়ে পড়বেন।

শরীরের এই অবস্থায়ও আপনি সুধাকান্তবাবুকে ভুলতে পাবেন নি ?

হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে এইটা নিয়ে শুধু ভাবতাম। কিছু করার ছিল না তো। অনেক নতুন-নতুন পয়েন্ট ভেবে বের করেছি। সব লিখে ফেলেছি।

ভালো করেছেন। এখন বিশ্রাম করুন। আমি খাতা নিয়ে যাচ্ছি। কাল আবার আসব।

মিসির আলি নিচু গলায় বললেন, একবার কি চেষ্টা করে দেখবেন— ঐ ছেলেটিকে বাইরে নিয়ে কিছু খাওয়ানো যায় কিনা ?

আমি দেখব। আপনি এই নিয়ে ব্যস্ত হবেন না।

আমি ব্যস্ত হচ্ছি না।

চলে আসার আগে-আগে মিসির আলি বললেন, আপনি কষ্ট করে আমাকে দেখতে এসেছেন, আমি খুবই আনন্দিত।
আমি আবার লজ্জা পেলাম—

৭

ব্যক্তিগত কাজ অনেক জমে ছিল, মিসির আলির খাতা নিয়ে বসা হলো না। আমি তেমন উৎসাহও বোধ করছিলাম না। সামান্য গল্প নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ির আমি কোনো অর্থ দেখি না। আমি লক্ষ্য করেছি— গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বেশির ভাগ মানুষ সম্পূর্ণ অবহেলা করে, মাতামাতি করে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে। মিসির আলিও নিশ্চয় এই গোত্রের। পরিবার-পরিজনহীন মানুষদের জন্যে এর অবশ্য প্রয়োজন আছে। কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থাকা— জীবন পার করে দেওয়া।

এক রাতে শোবার আগে খাতা নিয়ে বসলাম। পাতা উল্টে আমার আঙ্কেলগুডুম। একশ' ছিয়াশি পৃষ্ঠার ঠাসবুনোন লেখা। সুধাকান্তবাবু এবং তার গল্প নিয়ে যে এত কিছু শেখা যায় কে জানত! পরিষ্কার গোটা-গোটা লেখা। পড়তে খুব আরাম।

অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম আমাকে নিয়ে তিনি আট পৃষ্ঠা লিখেছেন। সেই অংশটিই প্রথম পড়লাম। শুরুটা এরকম—

নাম : হুমায়ূন আহমেদ।

বিবাহিত, তিন কন্যার জনক। পেশা অধ্যাপনা।

বদমেজাজি। অহঙ্কারী। অধ্যাপকদের যেটা বড় ক্রটি— অন্যদের বুদ্ধিমত্তা খাটো করে দেখা, ভদ্রলোকের তা আছে।

এই ভদ্রলোকের স্মৃতিশক্তি ভালো। তিনি গল্পটি দু'বার আমাকে বলেছেন। দু'বারই এমনভাবে বলেছেন যে, একটি শব্দ এদিক-ওদিক হয় নি। তাঁব কথাবার্তায় চিরকুমার সুধাকান্তবাবু প্রতি গভীর মমতা টের পাওয়া যায় এই মমতার উৎস কী?

সুধাকান্তবাবু এই ভদ্রলোককে ক্ষুধার্ত অবস্থায় চমৎকার কিছু খাবার রান্না কবে খাইয়েছেন— এইটাই কি একমাত্র কারণ? আমার মনে হয় সুধাকান্তবাবুর চেহারা, কথাবার্তাও ভদ্রলোকের উপর খানিকটা প্রভাব ফেলেছে। সুধাকান্তবাবু অতি অল্প সময়ে এই বুদ্ধিমান মানুষটিকে প্রভাবিত করেছেন। কাজেই ধরে নেওয়া যায়, মানুষকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা সুধাকান্তবাবুর আছে। আমরা তাহলে কি ধারণা করতে পারি না, সুধাকান্তবাবু তাঁর আশেপাশের মানুষদেরও প্রভাবিত করেছেন?

সুধাকান্তবাবুকে নিয়ে তিনটি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম— 'পূর্বপরিচয়'। এই অংশে সুধাকান্তবাবুর পরিবারের যাবতীয় বিবরণ আছে।

বাবার নাম, দাদার নাম, মার নাম। তাঁরা কে কেমন ছিলেন, কী করতেন। কে

কীভাবে মারা গেলেন। দেশত্যাগ করলেন কবে। কেন করলেন। এত তথ্য ভদ্রলোক কীভাবে জোগাড় করলেন, কেনই-বা করলেন কে জানে!

দ্বিতীয় অধ্যায়টির নাম— ‘সুধাকান্তবাবু ও তাঁর বাগদত্তা।’ এই অধ্যায়টি বেশ ছোট। পড়ে মনে হলো মিসির আলি তেমন কোনো তথ্য জোগাড় করতে পারেন নি।

তৃতীয় অধ্যায় সুধাকান্তবাবুর চরিত্র এবং মনমানসিকতা নিয়ে। গুরুটা এমন—

ভদ্রলোক নিজেকে সাধুশ্রেণীতে ফেলেছেন। গুরুতেই তিনি বলেছেন, যে সাধুসন্ন্যাসীর জীবনযাত্রায় তাঁর আগ্রহ আছে। শ্মশানে-শ্মশানে ঘুরতেন এবং স্থানীয় লোকজনও তাঁকে সাধুবাবা বলে। নিজের সাধু-চরিত্রটির প্রতি ভদ্রলোকের দুর্বলতা আছে। এই দুর্বলতার কারণ কী? প্রকৃত সাধুশ্রেণীর লোক গুরুতেই অন্যকে বলে না— আমি সাধু। ইনি তা বলেছেন, কাজেই ধরে নেওয়া যাক ইনি আমাদের মতোই দোষগুণসম্পন্ন সাধারণ একজন মানুষ।

তিনি নিঃসঙ্গ জীবন ঠিক পছন্দ করেন বলেও মনে হলো না। অনেক রাতে বাড়ি ফেরেন, যাতে একা-একা খুব অল্প সময় তাঁকে থাকতে হয়। একজন সাধকশ্রেণীর মানুষের চরিত্রের সঙ্গেও ব্যাপারটা মিশ খায় না।...

মিসির আলির খাতা শেষ করতে-করতে দুটো বেজে গেল। পরিশিষ্ট অংশে ভদ্রলোক ছ’টি প্রশ্ন তুলেছেন এবং বলেছেন— রহস্য উদ্ধারের জন্যে এই প্রশ্নগুলোর জবাব জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই ছ’টি প্রশ্ন পড়ে আমার মাথা ঘুরতে লাগল। এ কী কাণ্ড! মিসির আলি সাহেবের খাতা আবার গোড়া থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়লাম। ছ’টা প্রশ্নের কাছে এসে আবার চমকালাম। আমার মাথা ঘুরতে লাগল। ইচ্ছে করল এক্ষণি ছুটে যাই মিসির আলির কাছে।

৮

মিসির আলি সাহেব আজ অনেক সুস্থ। গায়ে চাদর জড়িয়ে বিছানায় বসে আছেন। হাতে শিবরাম চক্রবর্তীর বই ‘জন্মদিনের উপহার’। কিছুক্ষণ পড়ছেন, তারপর গা দুলিয়ে হাসছেন। আবার পড়ছেন, আবার হাসছেন।

আশেপাশের রোগীরা ব্যাপারটায় বেশ মজা পাচ্ছে। আগ্রহ এবং কৌতূহল নিয়ে তারা দেখছে এই বিচিত্র মানুষটাকে।

আমার দিকে চোখ পড়তেই মিসির আলি বললেন, শিবরামের বাঘের গল্পটা পড়ছেন? অসাধারণ! সকাল থেকে এখন পর্যন্ত এগার বার গল্পটা পড়লাম।

তাই নাকি?

আমার কী মনে হয় জানেন? হাসপাতালের রোগীদের জন্যে এই জাতীয় বই গুরুপত্রের সঙ্গে দেওয়া দরকার। প্রাণখুলে কয়েকবার হাসতে পারলে যে-কোনো অসুখ অনেকটা কমে যায় বলে আমার ধারণা।

আপনার তাহলে কমে গেছে?

জি ।

আমি বললাম, আপনার খাতাটা কাল রাতে পড়ে শেষ করেছে। আমার মনে হয়, যে-ছ'টি প্রশ্ন আপনি তুলেছেন, তার উত্তর জানা প্রয়োজন।

প্রয়োজন তো বটেই!

আমি আপনার সঙ্গে যাব এবং সুধাকান্তবাবুর সঙ্গে কথা বলব।

মিসির আলি হাসতে-হাসতে বললেন, আমি জানতাম আপনি এই কথা বলবেন।

আমি বললাম, কোনো-একটা ভৌতিক গল্প শুনলেই কি আপনি এরকম করেন, সব রহস্য উদ্ধারের জন্যে লেগে পড়েন?

মিসির আলি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

আমি বললাম, আপনি কি আপনার শোণামতো ভৌতিক গল্পের রহস্য ভেদ করতে পেরেছেন?

না, পারি নি। শতকরা বিশ ভাগ ক্ষেত্রে কিছুই করতে পারি নি। আমার আরেকটা খাতা আছে। ঐ খাতাব নাম 'রহস্য-খাতা'। যে-সব সমস্যা আমি সমাধান করতে পারি নি, রহস্য-খাতায় সেইসব লিখে রেখেছি। আপনাকে একদিন পড়তে দেব।

ঠিক আছে। আপনার রহস্য-খাতা একদিন পড়ব।

কিংবা আপনি যদি চান তাহলে গ্রিথানকার একটা গল্প আপনাকে শোনাতেও পারি। এইখানে বলবেন?

অসুবিধা কী? হাসপাতালে একটা ক্যান্টিন আছে। ক্যান্টিনে বসে চা খেতে-খেতে গল্পটা আপনাকে বলতে পারি। আসলে ব্যাপারটা কি জানেন— আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমাব ভালো লাগছে। একটা গল্প যদি শুরু করি, তাহলে ভদ্রতার কাবণেই আপনি গল্প শেষ না-করা পর্যন্ত বসে থাকবেন। এটাই হচ্ছে আমার লাভ।

আপনাব শরীরের এই অবস্থায় আপনি ক্যান্টিনে যেতে পারবেন?

পারব। আমাকে যতটা কাহিল দেখাচ্ছে, ততটা কাহিল কিন্তু না। আসুন যাই।

আমরা ক্যান্টিনে বসলাম।

অবাক হয়ে লক্ষ করলাম হাসপাতাল নোংরা হলেও ক্যান্টিনটা বেশ পরিষ্কার। ভিড় আছে, তবে হৈচৈ নেই। দু'ধরনের চা পাওয়া যাচ্ছে— এক নম্বর চা এবং দু'নম্বর চা। এক নম্বর চা এক টাকা করে, দু'নম্বর চা তিন টাকা করে। মিসির আলি বললেন, একই চা দু'ধরনের কাপে দেওয়া হয় বলে দু'ধরনের দাম এবং মজার ব্যাপার কী জানেন, সবাই কিন্তু বেশি দামের চাটা খাচ্ছে। গতকালও চা খেতে এসেছিলাম। একজনকে বলতে শুনলাম— এক নম্বর চা মুখে দেওয়া যায় না। খানিকটা পানি গরম করে এনে দিয়ে দেয়।

আমি বললাম, আপনি কি নিশ্চিত যে দুটো চা-ই এক?

হ্যাঁ, নিশ্চিত। প্রমাণ করে দিতে পারি। করব?

না, প্রমাণ করতে হবে না। আপনার কথা আমি বিশ্বাস করছি। এখন আপনার গল্পটা বলুন।

আপনার কি তাড়া আছে?

না, তাড়া নেই। তবু বেশিক্ষণ হাসপাতালে থাকতে আমার ভালো লাগে না। মিসির আলি সঙ্গে-সঙ্গে গল্প শুরু করলেন—

রহস্য-খাতায় এই গল্পের নম্বর হচ্ছে একুশ। অর্থাৎ এটা একুশ নম্বর গল্প। এর চেয়ে অনেক ভয়ংকর গল্প আমার স্টকে আছে, তবু এটা বলছি, কারণ এটা বলতে গেলে একটা ফাস্ট-হ্যান্ড স্টোরি। আমার নিজের জীবনে ঘটে নি, তবে যার জীবনে ঘটেছে, সে আমার প্রিয় এক মানুষ। ঘটনাটার সঙ্গে আমার যোগাযোগও প্রত্যক্ষ।

মেয়েটি হচ্ছে আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়া— আমার মা'র মামাতো বোনের মেয়ে। গ্রামের মেয়ে। হোট্টেলে থেকে ময়মনসিংহ মর্মিনুয়েসা কলেজে পড়ত। সেকেন্ড ইয়ারে উঠে হঠাৎ করে তার বিয়ে হয়ে যায়। খুব বড় ঘরে বিয়ে হয়। ছেলের অর্থ, বিত্ত এবং প্রতিপত্তির কোনো অভাব নেই। পরিবারটিও এ দেশের নামকরা পরিবার। নাম বললেই আপনি চিনবেন, তাই নাম বলছি না। শুধু ধরে নিন যে, এই দেশের রাজনীতিতে এই পরিবারটির প্রত্যক্ষ যোগ আছে।

আপনি গল্পটা বলুন। বিত্তবান পরিবারের ব্যাপারে আমার আগ্রহ নেই।

আমার নিজেরও নেই এবং আমার ঐ খালাব মেয়েটিরও ছিল না। অত্যন্ত ক্ষমতাবান একটি পরিবারে বিয়ে হবার কারণে তার জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। কিছুদিন স্বামীর সঙ্গে ইউরোপ-আমেরিকা ঘুরল। সেই বছর পরীক্ষা দেওয়া হলো না। তার পরের বছর হলো না, কারণ সে তখন কনসিড করেছে।

সমস্যা শুরু হলো তখন, যখন মেয়েটি বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখতে লাগল। প্রতিটি স্বপ্নেব মূল বিষয় একটিই। ছোট্ট একটা ছেলে এসে তাকে বলে— মা, তোমাকে একটা কথা বলি, মন দিয়ে শোন। আমাকে এরা মেরে ফেলবে। যে-রাতে আমার জন্ম হবে সেই রাতেই ওরা আমাকে মারবে। তুমি আমাকে রক্ষা কর।

বুঝতেই পারছেন, গর্ভবতী একটি মেয়ের কাছে এই জাতীয় স্বপ্ন কতটা ভয়াবহ। মেয়েটি অস্থির হয়ে পড়ল। খেতে পারে না, ঘুমোতে পারে না এবং প্রায় রোজই এই জাতীয় স্বপ্ন দেখে।

আমার সঙ্গে মেয়েটির তখন যোগাযোগ হয়। আমি তাকে নানানভাবে বুঝিয়ে বলি যে এটা কিছুই না। গর্ভবতী মেয়েদের অবচেতন মনে একটা মৃত্যুভয় থেকেই যায়। সেই ভয় নানানভাবে প্রকাশ পায়। তোমার বেলায় এইভাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

মেয়েটির স্বামী বিষয়টি নিয়ে খুব বিব্রত বোধ করছিল। সে ঠিক করে রেখেছিল যে, মেয়েটির মনের শান্তির জন্যে ডেলিভারির ব্যাপারটা এ-দেশে না করে বিদেশের কোনো হাসপাতালে করা হবে।

সেটা সম্ভব হলো না। আট মাসের শেষে হঠাৎ করে মেয়েটির ব্যথা উঠল। তাড়াহুড়ো করে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো ঢাকার নামকরা একটা ক্লিনিকে। নর্মাল ডেলিভারি হলো। রাত দুটোয় মেয়েটি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল।

মিসির আলি থামলেন। ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, অনেকের সঙ্গে আমিও ক্লিনিকে অপেক্ষা করছিলাম। মেয়েটি আমার রোগী, কাজেই আমার খানিকটা দায়িত্ব আছে। ক্লিনিকের পরিচালক একজন মহিলা ডাক্তার। তিনি আমাকে ডেকে ভেতরে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, যে-বাচ্চাটির জন্ম হয়েছে তাকে একটু দেখুন।

আমি দেখলাম।

একটা গামলার ভেতর বাচ্চাটিকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। জেলি ফিস আপনি দেখেছেন কিনা জানি না, শিশুটির সমস্ত শরীর জেলি ফিসের মতো স্বচ্ছ, থলথলে গাঢ় নীল রঙ। শুধু মাথাটা মানুষের। মাথাভর্তি রেশমি চুল। বড়-বড় চোখ। হাত-পা কিছু নেই। অষ্টোপাসের মতো নলজাতীয় কিছু জিনিস কিলবিল করছে। আমি খুবই সাহসী মানুষ, কিন্তু এই দৃশ্য দেখে ভয়ে গা কাঁপতে লাগল।

ডাক্তার বললেন, এই শিশুটিকে আপনি কী করতে বলেন?

আমি বললাম, আমার বলায় কিছু আসে-যায় না। বাচ্চার বাবা-মা কী বলেন?

বাচ্চার মাকে জানানো হয় নি। তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। বাচ্চার বাবা চান না বাচ্চা বেঁচে থাকুক।

আমি চূপ কবে রইলাম। তিনি বললেন, এরকম অ্যাবনর্মাল বাচ্চা এমনিতেই মারা যাবে। আমাদের মারতে হবে না। প্রকৃতি এত বড় ধরনের অ্যাবনর্মালিটি সহ্য করবে না।

আমি কিছু বললাম না। বাচ্চাটিকে ফুল স্পিড ফ্যানের নিচে রেখে দেওয়া হলো। প্রচণ্ড শীতের রাত, বাচ্চাটির মাথার উপর ফ্যান ঘুবছে, এতেই তার মরে যাওয়া উচিত, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার— ভোর পাঁচটায় দেখা গেল, বাচ্চা দিবা সুস্থ। বড়-বড় চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, শিস দেওয়ার মতো শব্দ কবছে। ভোর সাড়ে পাঁচটায় সবার সম্মতি নিয়ে বাচ্চাটিকে একশ' সিসি ইম্যাজেল ইনজেকশন দেওয়া হলো। যে-কোনো পূর্ণবয়স্ক লোক এতে মারা যাবে, কিন্তু তার কিছু হলো না। শুধু শিস দেওয়ার ব্যাপারটা একটু কমে গেল। ভোর ছ'টায় দেওয়া হলো পঞ্চাশ সিসি এট্রোজিন সল্যুশন। বাচ্চাটা মারা গেল ছ'টা বিশেষ। বাচ্চার মা জানতে পারল না। সে তখনো ঘুমে অচেতন।

মিসির আলি গল্প শেষ করলেন। আমি বললাম, তারপর?

তারপর আবার কী? গল্প শেষ।

বাচ্চাটির মা'র কী হলো?

বাচ্চার মা'র কী হলো তা দিয়ে তো আমাদের প্রয়োজন নেই। রহস্য তো এখানে নয়। রহস্য হচ্ছে বাচ্চার মা যে-স্বপ্নগুলো দেখত সেখানে। সেই রহস্য আমি ভেদ করতে পারি নি। সুধাকান্তবাবুর রহস্যও শেষ পর্যন্ত ভেদ করতে পারব কিনা তা জানি না।

আমার তো মনে হয় রহস্য ভেদ করেছেন।

কাগজপত্রে করেছি। কাগজপত্রে রহস্য ভেদ এক জিনিস, বাস্তব অন্য জিনিস। যখন সুধাকান্তবাবুর মুখোমুখি বসব তখন হয়তো দেখব গুছিয়ে-আনা জিনিস সব এলোমেলো হয়ে গেছে। মজার ব্যাপার কী, জানেন ভাই? প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে না, সে নিজে কিন্তু খুব রহস্যময়।

কবে যাবেন সুধাকান্তবাবুর কাছে ?

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেনই যাব। আপনি কি যাবেন আমার সঙ্গে ?

আমি বললাম, অবশ্যই।

৯

রাত প্রায় ন'টা।

আমি এবং মিসির আলি সুধাকান্তবাবুর বাড়ির উঠানে বসে আছি। সুধাকান্তবাবু চুলায় চায়ের পানি চড়িয়েছেন। তিনি আমাদের যথেষ্ট যত্ন করছেন। মিসির আলিকে খুব আগ্রহ নিয়ে বাড়ি ঘুরে-ঘুরে দেখলেন। নানা গল্প করলেন।

বাড়ি আগের মতোই আছে। তবে কামিনী গাছ দু'টির একটি নেই। মরে গেছে। কুয়ার কাছে সারি বেঁধে কিছু পেয়ারা গাছ লাগানো হয়েছে, যা আগে দেখি নি।

সুধাকান্তবাবু বললেন, চা খেয়ে আপনারা বিশ্রাম করুন, আমি খিচুড়ি চড়িয়ে দিচ্ছি।

মিসির আলি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বললেন, খিচুড়ি মন্দ হবে না। তা ছাড়া শুনেছি আপনার রান্নার হাত অপূর্ব।

আমাদের চা দিয়ে সুধাকান্তবাবু খিচুড়ি চড়িয়ে দিলেন। মিসির আলি বললেন, রান্না করতে-করতে আপনি আপনার ভৌতিক অভিজ্ঞতার কথা বলুন। এটা শোনার জন্যেই এসেছি। আগেও একবার এসেছিলাম, আপনাকে পাই নি।

জানি। খবর দিয়ে এলে থাকতাম। আমি বেশিরভাগ সময়ই থাকি।

গুরু করুন।

সুধাকান্তবাবু গল্প শুরু করলেন। ভৌতিক গল্পের জন্যে চমৎকার একটা পরিবেশ। অন্ধকার উঠান। আকাশে নক্ষত্রের আলো। উঠানের উপর দিয়ে একটু পরপর হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। একটা তক্ষক ডাকছে। তক্ষকের ডাক বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য ঝিঝিপোকা ডেকে উঠছে। ঝিঝিপোকা থামতেই তক্ষক ডেকে ওঠে। তক্ষকরা চুপ করতেই ডাকে ঝিঝিপোকা। অদ্ভুত কনসার্ট!

সুধাকান্ত গল্প বলে চলেছেন। মিসির আলি মাঝে মাঝে তাঁকে থামাচ্ছেন। গভীর আগ্রহে বলছেন, এই জায়গাটা দয়া করে আরেকবার বলুন। অসাধারণ অংশ। গা শিউরে উঠছে।

সুধাকান্তবাবু তাতে বিরক্ত হচ্ছেন না। সম্ভবত মিসির আলির গভীর আগ্রহে তাঁব ভালো লাগছে।

যেখানে মেয়েটি সুধাকান্তবাবুর পা কামড়ে ধরে, সেই অংশ মিসির আলি তিনবার শুনলেন। শেষ বার গভীর আগ্রহে বললেন, আপনি যখন পালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন মেয়েটি পেছন থেকে আচমকা আপনাকে কামড়ে ধরল ?

জি।

হাত দিয়ে ধরল না, আঁচড় দিল না— শুধু কামড়ে ধরল ?

জি।

দেখি কামড়ের দাগটা ।

তিনি কামড়ের দাগ দেখালেন । মিসির আলি পায়ের দাগ পরীক্ষা করলেন । জড়ানো গলায় বললেন, কী অদ্ভুত গল্প! তারপর কী হলো ?

সুধাকান্তবাবু গল্পে ফিরে গেলেন ।

এক সময় গল্প শেষ হলো । সুধাকান্তবাবু বললেন, খিচুড়ি নেমে গেছে । আপনাদের কি এখন দিয়ে দেব ? রাত মন্দ হয় নি কিন্তু ।

মিসির আলি বললেন, জি, খেয়ে নেব । আপনাকে দু'-একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি ।

জিজ্ঞেস করুন ।

মেয়েটি শুধু কামড়ে ধরল— হাত দিয়ে আপনাকে ধরল না কেন ?

আমি কী করে বলব বলুন । আমার পক্ষে তো জানা সম্ভব না ।

আমার কিন্তু মনে হয় আপনি জানেন ।

সুধাকান্তবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ।

মিসির আলি বললেন, আপনার গল্পের সবচে' দুর্বল অংশ মেয়েটির কামড়ে ধরা । মেয়েটি কিন্তু পেছন থেকে আপনাকে কামড়ে ধরে নি । পায়ের দাগ দেখেই বোঝা যাচ্ছে কামড়ে ধরেছে সামনে থেকে । আপনার দাগ ভালোভাবে পরীক্ষা কবলেই তা বোঝা যায় । আপনাকে আক্রমণ করবার জন্যে মেয়েটি তার হাত ব্যবহার করে নি । কারণ একটাই— সম্ভবত তার হাত পেছন থেকে বাঁধা ছিল । তাই নয় কি ?

সুধাকান্তবাবুর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো । একটি কথাও বললেন না ।

মিসির আলি বললেন, আপনার গল্পে একটা কুকুর আছে । পাগলা কুকুর । হাইড্রোফোবিয়ার কুকুর কিছুই খায় না । অসহ্য যন্ত্রণায় মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করে । অথচ এই কুকুরটা আস্ত একটি মেয়েকে খেয়ে ফেলল, পাঁচটা সুস্থ কুকুরের পক্ষেও যা সম্ভব নয় । আপনি অসাধারণ একটা ভূতের গল্প তৈরি করেছেন । কিন্তু গল্পে অনেক ফাঁক রয়েছে, তাই না ?

সুধাকান্ত বিড়বিড় করে কী-যেন বললেন । আমি কাঠ হয়ে বসে রইলাম । কী শুনছি এ-সব! মিসির আলি লোকটি এ-সব কী বলছে!

মিসির আলি বললেন, ব্যাপারটা কী হয়েছিল আমি বলি । আপনি চিরকুমার একজন মানুষ । আপনার মনে আছে অবদমিত কামনা-বাসনা । মহাপুরুষরাও কামনা-বাসনাব উর্ধ্বে নন । কীভাবে যেন আপনি অল্পবয়সী একজন কিশোরীকে আপনার ঘরে নিয়ে এলেন । এই মেয়েটি কীভাবে এলো বুঝতে পারছি না । বাড়ি থেকে পালিয়ে আসতে পারে, বা অন্য কিছুও হতে পারে । এই অংশটা আমার কাছে পরিষ্কার না ।

যাই হোক, মেয়েটিকে আপনার ঘরে নিয়ে আপনি তার হাত বেঁধে ফেললেন । মেয়েটির চিৎকার, কান্নাকাটি আশেপাশে কেউ শুনল না । কারণ আশপাশে শোনার মতো কেউ নেই । মেয়েটি নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে আপনাকে কামড়ে ধরল । এই অংশই তার কাছে ছিল ।

অবশ্যি মেয়েটি নিজেকে রক্ষা করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত মারা গেল।

আপনি তার মৃতদেহ ঘরেই ফেলে রাখলেন। দরজা-জানালা খুলে রাখলেন, যাতে শেয়াল-কুকুর শবদেহটা খেয়ে ফেলতে পারে। এক দিনে তো একটা মানুষ শেয়াল-কুকুরে খেয়ে ফেলতে পারে না। হয়তো দু' দিন বা তিন দিন লাগল। এই সময়টা আপনি নষ্ট করলেন না, ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলেন। ভেবে-ভেবে অসাধারণ একটা গল্প তৈরি করলেন। সেই গল্পে সূত্র আছে, কুকুর আছে, অশরীরী আত্মা আছে। কি সুধাকান্তবাবু, আমি ঠিক বলি নি ? দিন, এখন খাবার দিয়ে দিন— প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। খেয়ে নেব।

আমি অবাক হয়ে দেখলাম সত্যি-সত্যি মিসির আলি খেতে বসেছেন। সুধাকান্তবাবু তাঁকে থালা এগিয়ে দিচ্ছেন। মিসির আলি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি খাবেন না ?

আমি বললাম, না, আমার খিদে নেই।

মিসির আলি খেতে-খেতে বললেন, সুধাকান্তবাবু, আপনার বিরুদ্ধে কেস দাঁড় করাবার মতো কিছু আমার হাতে নেই। যে-সব কথা আপনাকে বলেছি, সে-সব আমি কোর্টে টেকাতে পারব না, আমি সেই চেষ্টাও করব না। কাজেই আপনার ভয়ের কিছু নেই। তবে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, আপনি থানায় গিয়ে অপরাধ স্বীকার করবেন। আচ্ছা, মেয়েটার নাম কী ছিল ?

সুধাকান্ত গভীর গলায় বললেন, বিত্তি। ওর নাম বিত্তি।

ও অচ্ছা, বিত্তি।

মিসিঃ আলি খুব আগ্রহ করে খাচ্ছেন। আমি দূর থেকে তাঁকে দেখছি। সুধাকান্তবাবুও দেখছেন। তাঁর চোখে পলক পড়ছে না। সেই পলকহীন চোখে গভীর বিষ্ময়।

মিসির আলি বললেন, খিচুড়ি তো ভাই অপূর্ব হয়েছে! আমাদের রেসিপিটা দেবেন তো! আমিও আপনার মতো একা-একা থাকি। মাঝে-মাঝে খিচুড়ি রান্না করব। বলেই মিসির আলি বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসলেন। আমি এর আগে এত অদ্ভুতভাবে কাউকে হাসতে শুনি নি। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

পরিশিষ্ট

আমার অধিকাংশ গল্পের শেষ থাকে না বলে পাঠক-পাঠিকা বা আপাণ্ড তোলেন। এই গল্পের আছে। সুধাকান্তবাবু তাঁর অপরাধ স্বীকার করে থানায় ধরা দিয়েছিলেন। বিচার শুরু হবার আগেই থানা-হাজতে তাঁর মৃত্যু হয়।



ভয়ংকর

আখলাক সাহেব থাকেন কলাবাগানে। অনেকখানি ভেতরের দিকে। দেয়ালঘেরা তিন কামরার একতলা একটা বাড়ি। আশেপাশে ছয়-সাততলা বিশাল বাড়ি ঘর উঠে গেছে। সেখানে এরকম ছোট একটা বাড়ি মাঝে মাঝে তাঁর লজ্জাই লাগে। বাড়ি ভেঙে বড় বাড়ি করার মতো টাকা পয়সা তাঁর নেই। ইচ্ছাও নেই। বড় বাড়ি দিয়ে কী করবেন? তিনি একা মানুষ। একজন মানুষের ঘুমাবার জন্যে তো আর পাঁচটা কামরা লাগে না। একটা কামরাই যথেষ্ট। তিনি বাড়ির চারদিকে গাছপালা লাগিয়েছেন। গাছগুলি চোখের সামনে বড় হচ্ছে। দেখতে তাঁর ভালো লাগে। গত বর্ষায় কাকরুল গাছ লাগালেন— ঝেঁপে কাকরুল হলো। এতেই তিনি খুশি। তিনি খুব শান্তিতে আছেন।

কিছুদিন হলো তাঁর মনের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। তাঁর বাড়িতে ভূতের উপদ্রব হয়েছে। যে জিনিস তিনি বিশ্বাস করেন না, সেই জিনিস তার ঘরে। ভয় তিনি পাচ্ছেন না। যা পাচ্ছেন তাব নাম লজ্জা। এত কিছু থাকতে তাঁর বাড়িতে কিনা ভূতের উপদ্রব। ব্যাপারটা কাউকে বলতেও পারছেন না। যাকে বলবেন সে-ই মুখ বাঁকিয়ে হাসবে। হাসারই কথা। অন্য কেউ তাঁকে ভূতের কথা বললে তিনিও হাসতেন। হাসাটাই স্বাভাবিক।

উপদ্রবটা গত চাবদিন ধবে চলছে। প্রথম দিনের ঘটনাটা এরকম— রাত এগারোটা, তিনি মশাবি খাটিয়ে বাতি নিভিয়ে বিছানায় এসে শুয়েছেন, ওম্নি বাতি আপনা আপনি জ্বলে উঠল। তিনি অন্য দশ জনের মতো ভাবলেন সুইচে কোনো গুপ্তগোল। দেশী সুইচগুলি কোনো কাজেব না। কিছু না কিছু গুপ্তগোল থাকবেই। মানুষ যে শুধু বিদেশী জিনিস খোঁজ কবে— এই জন্যেই করে। তিনি আবার উঠে গিয়ে বাতি নেভালেন। বিছানায় এসে শুলেন। শীত শীত লাগছিল, চাদরটা গায়ে টেনে দিলেন, ওম্নি আবারো বাতি জ্বলে উঠল। তিনি চাদর ফেলে দিয়ে বিছানায় উঠে বসলেন, তখন একবার মনে হলো ভূতের উপদ্রব না তো? এবকম হাস্যকর একটা কথা তার মনে এসেছে— এই ভেবে তিনি নিজেই নিজের উপর অত্যন্ত বিবক্ত হলেন। বোঝাই যাচ্ছে সুইচে গুপ্তগোল। শ্পিং ট্রিং কেটে গেছে কিংবা কোনো স্কু টাইট হয়ে গেছে। একজন ইলেকট্রিক মিস্ট্রিকে এনে দেখাতে হবে। আখলাক সাহেব বুঝতে পারছেন না আবার বাতি নেভাবেন কিনা। লাভ কী, নিভালেই হয়তো আবার জ্বলে উঠবে। এবচে' বাতি জ্বলাই থাকুক। তিনি আবার শুয়ে পড়লেন, তখন বাতি আপনা-আপনি নিভে গেল। তিনি ডাকলেন, মোতালেব মোতালেব।

মোতালেব তাঁর কাজের ছেলে। পাশের ঘরে সে ঘুমুচ্ছে। সামান্য ডাকে তার ঘুম ভাঙবে এরকম মনে করার কোনোই কারণ নেই। তার দশ গজের ভেতর মাঝারি সাইজের কোনো এটম বোমা ফাটলে ঘুম ভাঙলেও ভাঙতে পারে। এই সাধারণ তথ্য জেনেও আখলাক সাহেব মোতালেবকে কেন ডাকলেন নিজেই বুঝতে পারছেন না। তিনি কি ভয় পাচ্ছেন? ছিঃ ছিঃ কী লজ্জার কথা। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনি কি না ভূতের ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর কাজের ছেলেকে ডাকছেন! ভাগ্যিস ব্যাপারটা আর কেউ শুনে ফেলে নি।

কোনোদিন কারো সঙ্গে আলোচনা করাও ঠিক হবে না। বাহান্ন বছরের একজন মানুষ ভূতের ভয়ে তার কাজের ছেলেকে ডাকাডাকি করছে— কোনো মানে হয় ?

আখলাক সাহেব শুয়ে পড়লেন। মনস্থির করে শোয়া। বাতি জ্বলতে থাকুক নিভতে থাকুক তিনি ঘুমিয়ে পড়বেন। তাকে সকালে উঠতে হবে। ফাস্ট ইয়ারের ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর সকাল আটটায় ক্লাস। তিনি তাদের কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি পড়ান। কাল তাঁকে সার্কেলের ইকোয়েশন বুঝাতে হবে। নতুন চ্যাপ্টার। সকাল সকাল উঠতে না পারলে ক্লাস মিস হয়ে যাবে। ছাত্ররা ক্লাস মিস করতে পারে, শিক্ষকরা পারে না। তাঁর ঘুমের কোনো সমস্যা নেই। বিছানায় যাওয়া মাত্র তিনি ঘুমাতে পারেন। আজ ঘুম চটে গেছে। তিনি একাত থেকে ওকাত হলেন। তাঁর খানিকটা পিপাসাও পেল। পানি খাওয়ার জন্যে এখন উঠলে ঘুম পুরোপুরি চটে যাবে। কাজেই তিনি পিপাসা নিয়েই চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইলেন। তাঁর মনে হলো বালিশে কোনো সমস্যা। বালিশটা আরেকটু উঁচু হলে ভালো ছিল। তিনি বালিশ উল্টে দিলেন আর তখন শুনলেন তার মশারির কাছে এসে কে যেন কাশল। একবার দু'বার। দৃষ্টি আকর্ষণ করা জাতীয় কাশি। কে কাশবে তাঁর মশারির কাছে ?

স্যার কি ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি ?

কে ?

স্যার আমি।

আমিটা কে ?

আমাকে স্যার চিনবেন না। আমি জনৈক বিপদগ্রস্ত ভূত। গভীর বাতে আপনাদের বিরক্ত করার জন্যে আন্তরিক লজ্জিত। ক্ষমাপ্রার্থী। স্যাব, দয়া কবে নিজ গুণে ক্ষমা কববেন। ক্ষমা মানব ধর্ম।

আখলাক সাহেব ধরেই নিলেন তিনি ব্যাপারটা স্বপ্নে দেখছেন। ভূতের ভয় পেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন বলেই ভৌতিক স্বপ্ন। আর কিছুই না। ভূত বিশ্বাস না কবলেও স্বপ্নে ভূতের সঙ্গে কথা বলা যায়। তাতে অস্বস্তি বা লজ্জা বোধ করার কিছু নেই। এখন তাঁব একটু মজাই লাগল।

তুমি তাহলে ভূত ?

জি স্যার। বিপদগ্রস্ত ভূত। অপারগ হয়ে আর্পনাব কাছে এসেছি।

তুমিই কি বাতি জ্বালাচ্ছিলে নিভাচ্ছিলে ?

ইয়েস স্যার।

ইংরেজি জানো নাকি ?

সামান্য জানি স্যার। ভেরি লিটল। চর্চা নেই বলে মাঝে মাঝে ভুল হয়।

তুমি বিপদগ্রস্ত বলছিলে, বিপদটা কী ?

সে এক লম্বা ইতিহাস, সময় নিয়ে বলতে হবে। স্যারের কি সময় হবে ?

না, সময় হবে না। আমাকে সকালে উঠতে হবে। সকাল আটটায় আমার একটা ক্লাস আছে। সময়মতো ঘুমাতে না পারলে ক্লাস মিস করব। আগের দু'টা ক্লাস হরতালেব জন্যে হয় নি।

তাহলে তো স্যার আর বিরক্ত করা ঠিক হবে না।

অবশ্যই ঠিক হবে না।

স্যার শুভ রাত্রি।

শুভ রাত্রি।

শুভ নাইট স্যার।

শুভ নাইট।

স্যার গুটেন নাখট, স্নেপেনজি গুট।

এইটা আবার কী?

জার্মান ভাষায় শুভ রাত্রি, সুন্দিদা হোক।

তুমি জার্মান জানো নাকি?

না জানার মতোই স্যার। জার্মান কালচারাল ইন্সটিটিউটে কিছুদিন ঘোরাঘুরি করে যা শিখেছি। একেবারেই চর্চা নেই। বিদেশী ভাষা, চর্চা না থাকলে দু'দিনেই ভুলে যেতে হয়। তাহলে যাই স্যার। কাল আবার দেখা হবে।

আচ্ছা। ভালো কথা, ঘরে ঢুকেছ কোন দিক দিয়ে?

জানালা দিয়ে ঢুকেছি। স্যার যদি অনুমতি দেন তাহলে চলে যাই।

যাও।

আখলাক সাহেবেব মনে হলো জানালার কপাট একটু নড়ল। তারপর সব চূপচাপ।

আর কোনো শব্দ হচ্ছে না। তখন আখলাক সাহেবের মনে হলো ব্যাপারটা কি আসলে স্বপ্নে ঘটেছে না তিনি জেগেই ছিলেন, এবং এখনো জেগে আছেন? তিনি আবার ডাকলেন, মোতালেব এই মোতালেব। মোতালেব জবাব দিল না। তার জবাব দেবার কোনো কারণ নেই। একটা গদা দিয়ে মাথায় বাঁড়ি মারলে যদি ঘুম ভাঙ্গে।

পানিব পিপাসা আবাবো হচ্ছে। স্বপ্নে কি পানির পিপাসা হয়? এইসব ভাবতে ভাবতে হয় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন, কিংবা তাঁর স্বপ্ন দেখা শেষ হলো।

তাঁর ঘুম ভাঙল সকাল ন'টা দশ মিনিটে। ক্লাস মিস হয়ে গেল। তাঁর অত্যন্ত মেজাজ খারাপ হলো। ভূতের উপর রাগে গা জ্বলে গেল। ক্লাস যখন মিস হয়েই গেল তখন তিনি ঠিক করলেন আজ আর কলেজে যাবেন না। মিস্ত্রি ডাকিয়ে সুইচটা ঠিক করবেন যাতে আবাবো ভূত বিষয়ক জটিলতায় ক্লাস মিস না হয়।

নিজেই মিস্ত্রি ডেকে আনলেন। সে সুইচ বদলে বিদেশী সুইচ লাগিয়ে দিয়ে গেল— জার্মান সুইচ। জার্মান সুইচের কথায় মনে পড়ল ভূতটা জার্মান ভাষায় কী কী যেন বলছিল। গুটেন নাখট জাতীয় কিছু। কী হাস্যকর ব্যাপার। কাউকে বলা যাবে না। বিকেলে মালিবাগে তিনি তাঁর ছোট বোনের বাসায় বেড়াতে গেলেন। আত্মীয়স্বজন কারো বাসাতেই তিনি যান না। ভালো লাগে না। একা থাকতেই ভালো লাগে। যে কারণে বিয়ে টিয়ে করেন নি। এখন মনে হচ্ছে বিয়ে করলে ভালো হতো। জার্মান জানা ভূতের গল্প নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করা যেত। একান্ত আপনজনের সঙ্গে অনেক গল্প করা যায়। তাঁর ছোট বোন মিলি অবশ্যি তাঁর খুবই আপন। সপ্তাহে একবার তাকে না দেখতে পেলে আখলাক সাহেবের দারুণ মেজাজ খারাপ হয়। মিলির সমস্যা একটাই, দেখা হলেই বিয়ের

জন্যে আখলাক সাহেবকে চেপে ধরবে। ঘ্যানঘ্যান করে মাথা খারাপ করে দেবে— ভাইয়া, তুমি একা একা কী করে থাকবে? বাহান্ন বছর বয়সে এইসব কথা শুনতে ভালো লাগে না বলে মিলির বাসায় সপ্তাহে একদিনের বেশি তিনি যান না। তাছাড়া মিলির মেয়ে তৃণা হয়েছে মহা দুষ্ট। তৃণা তাঁকে বড় বিরক্ত করে।

মিলি বাসায় ছিল না। তার স্বামীর সঙ্গে কোনো বিয়েতে নাকি গেছে। তবে তৃণা বাসায় ছিল। সে ‘বড় মামা’ বলে এমন চিৎকার শুরু করল যে আখলাক সাহেবের মাথা ধরে গেল। আখলাক সাহেব মিলিকে যেমন পছন্দ করেন তার মেয়েকে তারচে’ বেশি পছন্দ করেন তবে পছন্দের ব্যাপারটা প্রকাশ করেন না। বাচ্চারা একবার যদি বুঝে ফেলে কেউ তাদের পছন্দ করছে তাহলে তার জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। বিশেষ করে সে বাচ্চা যদি দুষ্ট প্রকৃতির হয় তাহলে তো কথাই নেই। তাছাড়া মিলির এই মেয়ে তার মা’র মতোই বেশি কথা বলে। বকবক করে মাথা ধরিয়ে দেয়।

আখলাক সাহেব গম্বীর গলায় বললেন, খবর কীরে?

তৃণা হড়বড় করে বলল, বড় মামা আমার খবর ভালো। খুব ভালো। আজ তোমাকে যেতে দেব না। আজ তোমাকে আমাদের বাড়িতে থাকতে হবে। সারা রাত গল্প করতে হবে। ভূতের গল্প।

আখলাক সাহেব হাই তুলতে তুলতে বললেন, অন্য কোনো গল্প করতে পারি, ভূতের গল্প না।

উঁহ মামা, ভূতের গল্প শুনব।

ভূতের গল্প তো কিছুতেই বলব না।

বলবে না কেন?

বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এসে ভূতের গল্প বলা যায় না। শোনাও যায় না।

শোনা যায় না কেন?

শুনলে পাপ হয়। মানুষ যখন চাঁদে যাচ্ছে, মঙ্গল গ্রহে ভাইকিং নামিয়ে সয়েল টেস্টিং করছে তখন আমরা ভূত নামক কাল্পনিক প্রাণীর কথা ভেবে ভয় পাচ্ছি— এটা হাস্যকর।

বড় মামা, আসলে তুমি ভূতের গল্প জানো না।

আখলাক সাহেব একবার ভাবলেন গত রাতের অভিজ্ঞতাটাই গল্পের মতো করে বলেন। শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলালেন। শিশুদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেয়া অপরাধেব মতো। তিনি ইশপের একটা গল্প শুরু করলেন।

এক ধোপার একটা গাধা ছিল। গাধাটা একদিন তার নীল মেশানো পানির গামলায় পড়ে গেল। তার গায়ের রং হয়ে গেল নীল...

তৃণা করুণ গলায় বলল, বড় মামা গাধার গল্প শুনতে ভালো লাগছে না।

তাহলে রাখাল বালকের গল্প শুনবি? এক রাখাল বালক মাঠে মেষ চড়াতে। সে ছিল দারুণ মিথ্যাবাদী। একদিন মজা করার জন্যে বলল, বাঘ এসেছে বাঘ এসেছে ...

তৃণা হাই তুলতে তুলতে বলল, শিক্ষামূলক গল্প শুনতে ভালো লাগছে না মামা। অসহ্য লাগছে।

আখলাক সাহেবকে বাধ্য হয়ে গত রাতের গল্পটা বলতে হলো। তবে ব্যাপারটা যে আসলে স্বপ্ন তা তিনি খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন। বাচ্চাদের মনে কোনো ষটকা থাকা ঠিক না। তৃণা বলল, মামা আমার ধারণা আসলেই কোনো ভূত তোমার কাছে এসেছিল। দেখবে আজও আসবে। আজও আপনা-আপনি বাতি জ্বলবে নিভবে।

আখলাক সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, সুইচে গুণগোল ছিল। সুইচ ঠিক করা হয়েছে। আজ আর কিছুই হবে না। তৃণা বলল, আজ আরো বেশি হবে। ভূতটার সাহস বেড়ে গেছে তো। আজ অনেক বেশি গল্প করবে। মনে হয় গান টান গাইবে। ভূতের গান কেমন হয় কে জানে।

আখলাক সাহেব বাসায় ফিরলেন মন খারাপ কবে। গল্পটা তৃণাকে বলা ঠিক হয় নি। মেয়েটার বেশি বুদ্ধি। সে তিলকে তাল করবে। স্কুলে বাস্কবীদের বলবে। তার বাস্কবীদের মনে (বিশেষ কবে দুর্বল চিন্তের যারা) ভূত ব্যাপারটা গুঁথে যাবে। এইসব জিনিস একবার মনে ঢুকে গেলে মন থেকে বের করা কঠিন হয়। খুবই ভুল হয়েছে।

বাঁতে তিনি আজ একটু সকাল সকাল ঘুমুতে গেলেন। বাতি নিভিয়ে বিছানায় উঠার সময় মনে হলো আজ আবাব বাতি নিভবে না তো? এটা মনে হওয়াতে নিজের উপরই তাঁর রাগ লাগল। তিনি একজন বয়স্ক মানুষ। ভূতের ব্যাপারটা যদি তাব মধ্যই গুঁথে যায় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তার পরিণাম কী ভয়াবহ হবে তা তো বোঝাই যাচ্ছে। বাতি নিভল না। তিনি বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা কবে আসল ঘুমের প্রত্নতি নিলেন। তাঁর সামান্য আশাভঙ্গও হলো, একটু যেন মন খারাপও লাগছে। তিনি কেন জানি মনে মনে চাচ্ছিলেন বাতিটা আপনা-আপনি জ্বলে উঠুক।

স্যাব কি জেগে আছেন, না ঘুমিয়ে পড়েছেন?

কে?

স্যাব আমি। বিপদগ্রস্ত ভূত। গতরাতে আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা হলো। যাবার সময় জামান ভাষায় বললাম— গুটেন নাখট স্লিপেনাজ ওয়েল।

ও আচ্ছা তুমি?

আখলাক সাহেব পাশ ফিরলেন। তিনি নিশ্চিত, ব্যাপারটা স্বপ্ন। স্বপ্নেই যা ঘটান ঘটছে। কিছু কিছু স্বপ্ন মানুষ ঘুরেফিরে দেখে। ছাত্রাবস্থায় তিনি প্রায় প্রতিরাতেই স্বপ্ন দেখতেন। পরীক্ষাব হলে পরীক্ষা দিতে বসেছেন, পকেটে হাত দিয়ে দেখেন কলম আনেন নি। ভূতের স্বপ্নও সেরকম কিছু হবে।

তুমি তাহলে এসেছ?

জি স্যার।

কাল তো বাতি জ্বালাচ্ছিলে নেভাচ্ছিলে। আজ কিছু করছ না, ব্যাপারটা কী?

নতুন সুইচ লাগালেন এই জন্যেই কিছু করি নি। একটা জিনিস নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।

তোমার নাম কী?

আখলাক সাহেব হাসির শব্দ শুনলেন। একেই বোধহয় বলে ভৌতিক হাসি। ভয়ে রক্ত জমে যাওয়ার মতো কিছু হলো না। হাসি শুনতে বরং ভালোই লাগছে। সহজ স্বাভাবিক হাসি।

হাসছ কেন ?

ভূত সম্পর্কে মানুষের কত ভুল ধারণা এই ভেবেই হাসি আসছে। আপনাদের নাম আছে বলে আপনাদের ধারণা আমাদেরও নাম আছে। আসলে তা না। ভূতদের স্যার নাম থাকে না।

আখলাক সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, তাই নাকি ?

কর্মেরি আমাদের পরিচয়, নামে নয়।

বলো কী ?

সত্যি কথাই বলছি স্যার। যেমন ধরুন বোকা ভূতদের নাম হচ্ছে— বোকা ১, বোকা ২, বোকা ৩, বোকা ৪... যে যত বোকা তার নাম্বার তত বেশি। নাম্বার দেখেই বলে দিতে পারবেন সে কত বড় বোকা। মানুষের বেলায় এরকম কোনো ব্যবস্থা না থাকায় তাব নাম থেকে বোকা যায় না সে বোকা না বুদ্ধিমান।

আখলাক সাহেবের মুখ হা হয়ে গেল। ভূতটা গম্ভীর গলায় বলল, আমাদের ব্যবস্থা স্যার খুবই বৈজ্ঞানিক।

তোমাদের নিয়মে তোমার নাম কী ?

লেখক ৭৪।

তুমি লেখক নাকি ?

একটু স্যার বদঅভ্যাস আছে।

বদঅভ্যাস বলছ কেন ? লেখক হওয়া তো সহজ ব্যাপার না। লেখক ৭৪, তার মানে কি তুমি অনেক বড় লেখক ?

দু'একটা ছোটখাট পুরস্কার স্যার পেয়েছি। গত বছর পেলাম ভূত শ্রেষ্ঠ পদক। লৌহ পদক। লৌহ পদক স্যার একটা বিরল ঘটনা।

লৌহ পদক পেয়ে গেছ, বলো কী ?

আর স্যার আমার একটা রচনা ভূতকুলে পাঠ্য হয়েছে। এটাও একটা বিরল সম্মান।

বিরল সম্মান তো বটেই। তুমি কি দাঁড়িয়ে আছ নাকি ? বোস, চেয়ারটা টেনে বোস। এতক্ষণ তুমি ভূমি করে বলায় আমার তো নিজেরই খারাপ লাগছে।

আপনি স্যার লজ্জা দেবেন না।

তুমি বোস, চেয়ারে বোস।

চেয়ার টানার শব্দ হলো। কেউ একজন চেয়ারে বসল। ঘর অন্ধকার বলে তিনি কিছু দেখতে পেলেন না। আখলাক সাহেব যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ভূতকুলে তোমার যে রচনাটা পাঠ্য সেটা কী ?

একটা প্রবন্ধ।

নাম কী প্রবন্ধটার ?

মানুষদের নিয়ে লেখা প্রবন্ধ, নাম হলো 'ইহা মানুষ'।

ইন্টারেস্টিং প্রবন্ধ বলে মনে হচ্ছে।

স্যার, গবেষণামূলক প্রবন্ধ। শিশুভূতদের জন্যে একটু কঠিন হয়ে গেছে।

তুমি কি প্রবন্ধই লেখ না গল্প-উপন্যাসও লেখ ?

গল্প লিখি। সম্প্রতি আমার একটা বই বের হয়েছে, 'মানুষের গল্প'।

তুমি ভূত আর তোমার সব লেখালেখি দেখি মানুষদের নিয়ে।

মানুষরা যেমন ভূতের গল্প লেখে আমিও তেমন মানুষের গল্প লিখি।

দেখি একটা গল্প পড়ে শুনাও তো।

তাহলে স্যার বইটা নিয়ে আসি।

নিয়ে আস দেখি।

ভূত বই আনতে গেল। আখলাক সাহেব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লেন। সেই রাতে তাঁর আর গল্প শোনা হলো না।

২

কলেজে আখলাক সাহেবকে সবাই চেনে গম্ভীর ধরনের মানুষ হিসেবে। যারা অঙ্ক শেখায় তাবা খানিকটা গম্ভীর প্রকৃতির এম্মিতেই হয়ে থাকে। আখলাক সাহেব তাদের চেয়েও একটু গম্ভীর। যেদিন একটা ক্লাস থাকে তিনি ক্লাস নিয়ে বাড়ি চলে আসেন। যেদিন দু'টা কিংবা তিনটা ক্লাস থাকে সেদিন ক্লাসের মাঝখানের সময়ে শিক্ষকদের কমন রুমে বসে খবরের কাগজ পড়েন। শিক্ষকদের গল্প শুজব হৈচৈ-এ কখনো অংশ নেন না। তাঁর ভালো লাগে না।

আজ একটু ব্যতিক্রম দেখালেন। কমনরুমে আখলাক সাহেব যথাবীতি খবরের কাগজ পড়াছিলেন, তাব পাশে বসেছেন বাংলাব শিক্ষক শামসুদ্দিন আহমেদ। তিনি গল্প করছিলেন ঠিক তাঁর মুখোমুখি বসা লজিকের শিক্ষক দাবিরুদ্দিনেব সঙ্গে। তাঁবা দু'জনই খুব বন্ধু মানুষ। তবে রোজই কোনো একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে তুমুল তর্ক বেঁধে যায়। একেকটা তর্ক শেষ পর্যন্ত রাগারাগি হাতাহাতির পর্যায়েও যায়। প্রিন্সিপাল সাহেব তাঁদের দু'জনকে কাছাকাছি বসতে নিষেধ করে দিয়েছেন। তারপরেও তাঁবা সামনাসামনি বসেন, সহজভাবে গল্প শুরু করেন, আরম্ভ হয় তর্ক, তর্ক থেকে গালাগালি।

তাঁদের আজকের গল্পের বিষয় হলো, নাম, রাখা। শামসুদ্দিন সাহেবের স্বভাব হলো যে-কোনো গল্পই করা হোক না কেন তাতে টেনে টুনে রবীন্দ্রনাথের নিয়ে যাওয়া। দাবিরুদ্দিনেব দিন দশেক আগে একটি মেয়ে হয়েছে, তার নাম এখনো ঠিক কবা হয় নি। এই প্রসঙ্গে শামসুদ্দিন সাহেব বললেন, নাম রেখে দিন মীনাঙ্কী। রবীন্দ্রনাথের খুব পছন্দের নাম।

দাবিরুদ্দিন বললেন, মীনাঙ্কীর অর্থটা কী ?

মীনের মতো অক্ষি, অর্থাৎ মাছের মতো চোখ।

আমার মেয়ের চোখ তো মাছের মতো না। দিব্যি মানুষের মতো চোখ। তার নাম মীনাঙ্কী রাখব কেন ? মানুষাঙ্কী বরং রাখার একটা যুক্তি আছে।

রবীন্দ্রনাথের খুবই পছন্দের নাম। তিনি বুদ্ধদেব বসুর মেয়ের নাম রেখেছিলেন মীনাক্ষী।

বুদ্ধদেব বসুর মেয়ের চোখ ছিল বোয়াল মাছের চোখের মতো, এই জন্যে হয়তো রেখেছিলেন।

শামসুদ্দিন সাহেব চোখ লাল করে বললেন, বোয়াল মাছের মতো চোখ— এটা বলার অর্থ কী ?

বোয়াল মাছের মতো না হলে অন্য কোনো মাছের মতো, রুই মাছের মতো কিংবা পুটি মাছের মতো। রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষ নিশ্চয়ই কোনো একটা মাছের চোখের সাথে নাম মিলিয়ে নাম রাখেন নি। হেলাফেলা করে নাম রাখার মানুষ তিনি না।

তর্ক প্রায় বেঁধে যাচ্ছে এই পর্যায়ে সবাইকে অবাক করে দিয়ে আখলাক সাহেব হঠাৎ বললেন, মানুষের নাম রাখার পদ্ধতির মধ্যে সমস্যা আছে। পদ্ধতিটা ত্রুটিপূর্ণ।

শামসুদ্দিন সাহেব অবাক হয়ে বললেন, ত্রুটিপূর্ণ মানে ?

মানুষের নাম এমনটা রাখা যেতে পারে যা থেকে তার চরিত্র সম্পর্কে আমরা মোটামুটি একটা ধারণা পেয়ে যাই।

কী রকম ?

যেমন ধরুন যারা বোকা, তাদের সবার নাম গুরু হবে বোকা দিয়ে: তবে নামের শেষে একটা সংখ্যা থাকবে, সে সংখ্যা থেকে সে কতটা বোকা সেই সম্পর্কে একটা তুলনামূলক ধারণা পাওয়া যাবে। যত বোকা, সংখ্যার মান তত বেশি।

দবিরুদ্দিন বললেন, যে একই সঙ্গে বোকা এবং জ্ঞানী, তার বেলা কী হবে ? অনেক জ্ঞানী বোকাও তো সমাজে আছে। ওদের সংখ্যাই বরং বেশি।

একটা পদ্ধতি তাদের বেলাতেও বের করতে হবে। যেমন ধরুন বোকা ৭০, জ্ঞানী ৪০, অর্থাৎ সে যতটা না জ্ঞানী তারচে' বেশি বোকা।

শামসুদ্দিন সাহেব হা হয়ে গেলেন। এরকম অদ্ভুত কথা তিনি এর আগে শোনেন নি। দবিরুদ্দিন বললেন, এতে নাম অনেক বড় হয়ে যাবে না ?

সংক্ষেপ করার পদ্ধতি বের করা যাবে। যেমন ধরুন বোকা ৭০, জ্ঞানী ৪০ এটাকে সংক্ষেপে বলা যাবে বোজ্জা ৭০-৪০, বোকার বো, আর জ্ঞানীর জ্ঞা নিয়ে বোজ্জা, ৭০ এবং ৪০ এর মাঝখানে থাকছে একটা হাইফেন। বুঝতে পারছেন ?

পারছি।

শামসুদ্দিন এবং দবিরুদ্দিন দু'জনই পুরোপুরি হকচকিয়ে গেলেন, দবিরুদ্দিন বললেন, আখলাক ভাই আপনি কি সম্প্রতি এই নিয়ে গবেষণা করছেন ?

আখলাক সাহেব জবাব দিতে পারলেন না। ক্লাসের ঘন্টা পড়ে গেছে, তিনি ক্লাসে চলে গেলেন। ক্লাস শেষ করে কমনরুমে ফিরলেন না, বাসার দিকে চলে গেলেন। কমনরুমে ফিরে এলে জানতেন যে এই এক ঘন্টায় তাঁর নতুন নামকরণ করা হয়েছে— মিঃ বোজ্জা ৭০-৪০।

আখলাক সাহেব আজ আবার ছোট বোনের বাসায় গেলেন। মিলি তাঁকে দেখে প্রায় চৈঁচিয়ে বলল, তোমার কী হয়েছে দাদা ?

আখলাক সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, হবে আবার কী! কিছু হয় নি তো।

তৃণা বলছিল, একটা ভূত নাকি তোমার কাছে আসে। জার্মান ভাষায় তোমার সঙ্গে গল্প করে।

আরে না। ব্যাপারটা স্বপ্ন।

এইসব আজীবনে স্বপ্নই বা তুমি দেখবে কেন?

স্বপ্নের উপর কি কারো হাত আছে? আমি যে স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছা করব সেই স্বপ্ন দেখব— তা তো কখনো হয় না।

দাদা আমার কিছু খুব খারাপ লাগছে। তুমি একা একা থাক, এই জন্যে এসব হচ্ছে। তুমি তোমার বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আমার এখানে এসে থাক। আমি তোমার ঘর আলাদা করে দেব। তৃণাকে বলে দেব যেন কখনো তোমাকে বিরক্ত না করে।

আহা যন্ত্রণা করিস না তো। সামান্য স্বপ্ন নিয়ে ...

তোমার মুখও তো কেমন শুকনা শুকনা লাগছে।

আখলাক সাহেব খুবই বিরক্ত হলেন। কঠিন গলায় বললেন, মুখের আবার শুকনা-ভেজা কী? মুখ কি তোয়ালে যে শুকনা থাকবে আবার ভেজা থাকবে।

মিলি বলল, দাদা শোন, বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে তুমি আবেকটু ভাব। তোমার পায়ে পড়ি দাদা। প্লিজ। তোমার জন্যে যে মহিলার কথা আমি ভেবে রেখেছি তিনি অসাধারণ একজন মহিলা। খুব অল্প বয়সে তাঁর স্বামী মারা গিয়েছিল, তিনি আর বিয়ে করেন নি। তুমি যেমন নিঃসঙ্গ তিনিও নিঃসঙ্গ। তাছাড়া বাহান্ন কোনো বয়সই না। পিকাসো ৮২ বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন।

আমি কি পিকাসো? আমাকে কখনো ছবি আঁকতে দেখেছিস? এই নিয়ে আর একটা কথা না।

আখলাক সাহেবের একটিই বোন। বোনের ভালোবাসা তাঁর কাছে অত্যাচারের মতো লাগে। এ কারণেই তিনি মিলিন্দে বাড়িতে কম আসেন। এটা তাকে বলাও যায় না। বললে মনে কষ্ট পাবে

দাদা, রাতে কী খাবে?

রাতে কিছু খাব না।

এটা তুমি কী বললে দাদা, তোমাকে অঁম না খাইয়ে রাতে ছেড়ে দেব? ঐ দিন এলে, আমি ছিলাম না। বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিলাম। এত সুন্দর একটা মেয়ে বান্দরের মতো একটা ছেলেকে বিয়ে করেছে। কথাও বলে বান্দরের মতো কিচকিচ করে। আবার প্রত্যেকটা শব্দের সঙ্গে একটা চন্দ্রবিন্দু লাগায়। মনে হয় নাকে প্রবলেম আছে। আমাকে দেখে বলল, আঁফা তাঁলো আছেন?... তুই আমাকে চিনিস না জানিস না, আমার সঙ্গে তোর এত কীসের কথা?

আখলাক সাহেব বড়ই বিরক্ত হচ্ছেন। মিলি একবার কথা শুরু করলে থামে না। ছেলেমেয়েরা মাকে দেখে শেখে, তৃণা মা'র স্বভাব পাচ্ছে এটা অত্যন্ত আশঙ্কার কথা। তবে মিলির স্বামী আবু তাহের কথা একেবারেই বলে না। তার বাক্যালাপ হ্যাঁ হুঁর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এটা আশার কথা। সবাই কথা বললে এ বাড়িতে আসাই সমস্যা হতো। আবু

তাহের ডাক্তার। এম আর সি পি। হাসপাতালের বাইরে তার পশার এমন যে সে ঠিকমতো নিঃশ্বাস নিতে পারে না। বাড়িতে সে বিশ্রাম করতে আসে বলেই বোধহয় কথাবার্তা বলে অকারণ পরিশ্রম করে না। সারাক্ষণ খিম ধরে থাকে।

রাতে আখলাক সাহেবকে খেয়ে যেতে হলো। মিলি শখ করে রোঁধেছে। সাধারণ খাওয়া না। পোলাও কোর্মা। পোলাও হয়েছে শক্ত চাল চাল। কোর্মা লবণের জন্যে মুখে দেয়া যাচ্ছে না। এত আগ্রহ করে রোঁধেছে, কিছু বলা যাচ্ছে না। শুধু আবু তাহের মুখ শুকনো করে বলল, আবার তুমি রোঁধেছ ? রান্নার জন্যে বাবুর্চি তো আছে। নিজে রান্নাধতে গেলে কেন ?

মিলি বিরক্ত মুখে বলল, দাদা এসেছে আমি রান্নাধব না তো কি পাড়ার লোকে এসে রোঁধে দিয়ে যাবে ? বাবুর্চির রান্না আমি দাদাকে খাওয়াব ? তোমার খেতে ইচ্ছে না হলে খেয়ো না। আমি তো তোমার পায়ে ধরে সাধি নি যে খেতেই হবে। খেতে কি খারাপ হয়েছে ?

তাহের বলল, খেতে ভালোই হয়েছে তবে পোলাও মুখে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চাবাতে হয়। এতক্ষণ চাবানোর ধৈর্য থাকে না।

মিলি স্বামীর দিকে আগুন দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজেকে সামলে নিল। ভাইয়ের পাতে পোলাও তুলে দিতে দিতে বলল, দাদা যে ভূতটা তোমার কাছে আসে তার নাম কী ?

আখলাক মনের ভুলে বলে ফেললেন, ওর নাম লেখক ৭৪।

ভূতের প্রসঙ্গটা তিনি আনতে চাচ্ছিলেন না। তারপরেও এসে গেল।

মিলি কিছু বলার আগেই আবু তাহের বলল, ভূতের কী নাম বললেন ?

লেখক ৭৪।

এটা কী ধরনের নাম ?

ভূত সমাজের নাম রাখার এই ধারা। আমরা এই ধারার সঙ্গে পরিচিত নই বলে আমাদের কাছে হাস্যকর মনে হতে পারে। ওদের কাছেও ঠিক এমনভাবে আমাদের নামগুলিও খুব হাস্যকর লাগে।

মিলি বলল, হাস্যকর নাম তো আমাদের আছেই। আমার এক বান্ধবী তার ছেলের নাম রেখেছে— গুলকি। আমি বললাম কীরে এত নাম থাকতে ‘গুলকি’ নাম রাখলি কেন ? সে কিছু বলে না, শুধু হাসে।

তাহের একবার বিরক্ত দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকাল। যে দৃষ্টির অর্থ হলো— চূপ কর তো, সব কিছুতে কথা বলবে না। মিলি সেই দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বলল, আমাদের পাশের বাড়ির কাজের মেয়েটার নাম কী জানো দাদা ? তার নাম তর্জি বেগম।

তাহের বলল, একটু চূপ করবে ? ভাইজানের সঙ্গে একটা জরুরি কথা বলছি। মিলি বলল, আমিও জরুরি কথাই বলছি। আমার কথাগুলি কম জরুরি না।

তোমার জরুরি কথাগুলি একটু পরে বলো, আমারটা শেষ করে নিই। তুমিতো একবার কথা শুরু করলে শেষ করতে পার না। নদীর স্রোতের মতো চলতেই থাকে।

তাহের আখলাকের দিকে তাকিয়ে বলল, ভাইজান আপনার এই ভূতের ব্যাপারটা ঠিক কী বলুন তো। আমি ভাসাভাসা ভাবে শুনলাম। সত্যি কি কিছু দেখেছেন ?

বুঝতে পারছি না, মনে হয় স্বপ্ন।

রোজই দেখছেন ?

পরপর দু'রাত দেখলাম। মনে হয় আজও আবার দেখব।

আজ রাতে একটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমুবেন। যাবার সময় আমার কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে যাবেন। বিছানায় যাবার আধ ঘণ্টা আগে খাবেন। ওষুধ খাবার পর ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি খাবেন। রোজ রোজ ভূত দেখা কোনো কাজের কথা না। শেষ পর্যন্ত একটা মানসিক সমস্যা হয়ে যাবে। শুরুতেই সাবধান হওয়া ভালো।

মিলি বলল, তুমিও তো দেখছি কথা শেষ করতে পারছ না। বকবক করেই যাচ্ছ।

আর করব না। এখন তুমি শুরু করতে পার।

মিলি বলল, দাদা তুমি আমাকে ভূতের ব্যাপারটা ভালোমতো বলো তো।

আখলাক সাহেব বললেন, ভালোমতো বলার কিছু নেই। দুঃস্বপ্ন। আর কিছু না।

দাদা তুমি পেট ঠাণ্ডা রাখবে। পেট গরম হলেই লোকজন দুঃস্বপ্ন দেখে। একবার কী হয়েছে শোন, আমি মুনীর জন্মদিনের পার্টিতে গিয়ে এক গাদা ভাজাভুজি খেয়েছি। বাসায় এসে আবার খাসির মাংস দিয়ে ভাত খেলাম। পেট হয়ে গেল গরম। রাতে স্বপ্নে দেখি কী লক্ষ লক্ষ পিঁপড়া খুবলে খুবলে আমার গায়ের মাংস খেয়ে ফেলছে। কী যে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন। এখনো মনে হলে গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে যায়। তুমি দাদা এখন থেকে সহজপাচ্য খাবার খাবে। মশলা একেবারে দেবেই না। পেপে পেটের জন্যে ভালো, চেষ্টা করবে বোজই পেপে খেতে। পেপে সিদ্ধ করে বেটে একটু কাঁচা মরিচ পেঁয়াজ দিয়ে ভর্তা বানিয়ে খেয়ে দেখো, ভালো লাগবে। সঙ্গে সরষে বেটে দিতে বলবে। নতুন সরষে, পুরনোটা দিলে তিতা লাগবে।

আবু তাহের ছ'টা ঘুমের ট্যাবলেট দিলেন। প্রতি রাতে শোয়ার আগে দু'টা করে খেতে হবে। আখলাক সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, ভূত-প্রেত এইসব নিয়ে আপনি মোটেই চিন্তা করবেন না ভাইজান। ভূত-প্রেতের সময় আমরা পার কবে এসেছি।

আখলাক সাহেবকে এইসব কথা বলা অর্থহীন। ভূত-প্রেতের সময় যে আমরা পার কবে এসেছি তা তাঁর থেকে বেশি কেউ জানে না। অথচ তার কপাল এমন যে উপদেশগুলি তাঁকে শুনতে হচ্ছে।

যে ভূতটার কথা বলছেন সেটা দেখতে কেমন ?

দেখি নি তো কখনো। ঘর অন্ধকার থাকে, কাজেই দেখা হয় নি।

ও আচ্ছা।

আখলাক সাহেব বিষণ্ণ মুখে বললেন, ভূতটাকে যে এখনো দেখি নি সেটাই আমার ক'ছে একটা খটকা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কী রকম ?

স্বপ্ন হলে ভূতটাকে দেখতে কোনো অসুবিধা ছিল না। ভূত-টুত এইসব স্বপ্নেই বেশি দেখা যায়। অথচ এখনো দেখলাম না।

স্বপ্ন অনেক রকম হয় ভাইজান। স্বপ্নে শুধু শব্দও শোনা যায়।

তাও ঠিক ।

এটা হচ্ছে বিংশ শতাব্দী । আমরা এই শতাব্দীর প্রায় শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি । চান্দে মানুষ নেমে গেছে । মঙ্গল গ্রহে খুব শিগগিরই নামবে । আমাদের স্পেস প্রোব পাইওনিয়ার সৌর মণ্ডলের সীমানা ছাড়িয়ে চলে গেছে । আমরা ভাইরাস প্রায় জয় করতে যাচ্ছি, এই সময় আপনার মতো শিক্ষিত একজন মানুষ ...

আখলাক সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে ভাবলেন— তাহের যে মিলির চেয়ে কম কথা বলে তা তো না, বরং বেশিই বলে । মিলির কারণে কথা বলার সুযোগ পায় না বলে বোধহয় বলতে পারে না । খুবই খারাপ লক্ষণ । যে সব ডাক্তার বকবক করে তাদের পশার হয় না ।

বুঝলেন ভাইজান, ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়বেন, লম্বা ঘুম দেবেন । ভূতের কথা মনে স্থান দেবেন না । একটা কথা মনে রাখবেন— ভূতের বাস হচ্ছে মানুষের মনে । ভুল বললাম, আসলে মন বলেও কিছু নেই । যদিও আমরা কথায় কথায় মন বলি । আসল জিনিস হচ্ছে মস্তিষ্ক, দি ব্রেইন । ভূতের বাস হচ্ছে আমাদের ব্রেইনে, মস্তিষ্কে । আমাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে ...

আচ্ছা খেয়াল রাখব ।

প্রয়োজনে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে আপনাকে নিয়ে যাব । আমার বন্ধু মানুষ ।

আচ্ছা ঠিক আছে ।

ভাইজান, কী বললাম মনে থাকবে তো ?

হঁ । মনে থাকবে ।

রাতে তিনি ঘুমের ওষুধ খেলেন । ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি খেলেন । ওষুধ খাওয়ার আধ ঘণ্টা পর ঘুমতে যাবার কথা, তার আগেই ঘুমে তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে আসতে লাগল । খুব কড়া ওষুধ, বোঝাই যাচ্ছে । দু'টা না খেয়ে একটা খেলেই হতো । তিনি বিছানায় গেলেন প্রায় চোখ বন্ধ করে । বালিশে মাথা রাখতে না রাখতেই তাঁর ঘুম কেটে গেল । চোখে এখন আর একফোঁটা ঘুম নেই । অবশ্য তাঁর ক্ষীণ সন্দেহ হতে লাগল যে তিনি আসলে ঘুমিয়ে পড়েছেন তবে স্বপ্নে দেখছেন যে জেগে আছেন ।

স্যার কেমন আছেন ?

আখলাক সাহেব পাশ ফিরলেন । কিছু দেখা যায় কিনা । না কিছু দেখা যাচ্ছে না । চারদিক ফাঁকা ।

ঐ দিনের জন্যে স্যার খুবই লজ্জিত ।

ঐ দিন কী হয়েছিল ?

আপনি আমার লেখা পড়তে চাইলেন, আমার নিয়ে আসতে দেরি হলো । এসে দেখি আপনি আরাম করে ঘুমাচ্ছেন । আর আপনাকে জাগলাম না । আপনার আবার সকালে ক্লাস থাকে । লেখা স্যার আজ নিয়ে এসেছি ।

কোনটা এনেছ ?

অনেকগুলি এনেছি।

তোমরা কি বাংলা ভাষাতেই লেখ ?

আমরা স্যার বাঙালি ভূত। আমরা বাংলা ছাড়া কীসে লিখব ?

ভূত-ভাষা বলে কিছু নেই তাহলে ?

জি না।

কথা বলার সময় তোমরা শুধু চন্দ্রবিন্দু বেশি ব্যবহার কর, তাই না ?

এটাও স্যার আপনাদের ভুল ধারণা। আপনারা ভূতের গল্প লেখার সময় ভূতের মুখে চন্দ্রবিন্দু দেন। ভূত বলে— আমরা মাইঁ দেন। এটা স্যার ঠিক না। কারো নাকে যখন সমস্যা থাকে তখন সে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করে নাকে কথা বলে। আমাদের নাকই নেই।

তোমাদের নাক নেই নাকি ?

জি না স্যার। আমরা তো আসলে বাতাসের তৈরি। বাতাসের আবার নাক কী ? আমাদের সম্পর্কে আসলে আপনারা কিছুই জানেন না। না জেনেই গল্প লেখা হয়। অথচ আমাদের দেখুন— মানুষদের সম্পর্কে আমাদের প্রতিটি লেখার পেছনে আছে দীর্ঘ দিনের কিসাচ। ‘ইহা মানুষ’ প্রবন্ধটা লেখার জন্যে আমাকে দশ বৎসর নিরলস গবেষণা করতে হয়েছে।

বলো কী!

প্রবন্ধটা কি স্যার পড়ব ?

পড়।

মানুষ হলো কুড়ি আঙ্গুল বিশিষ্ট প্রাণী। কুড়িটি আঙ্গুলের ভেতর সে মাত্র দশটির ব্যবহার জানে। বাকি দশটি আঙ্গুল, যাদের অবস্থান পায়ে, তাদের ব্যবহার সে জানে না।

আখলাক সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, পায়ের আঙ্গুলের আবার ব্যবহার কী ?

অবশ্যই ব্যবহার আছে। প্রকৃতি আঙ্গুল দিয়েছে যখন তখন ব্যবহারও দিয়েছে। মানুষ তা জানে না, জানার চেষ্টাও করে না।

আখলাক সাহেব হুঁ বলেই চুপ কবে গেলেন। অন্যকে দোষ দিয়ে লাভ কী তিনি নিজেও কোনোদিন জানার চেষ্টা করেন নি।

স্যার কি ঘুমিয়ে পড়েছেন ?

না।

মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির এই সীমাবদ্ধতার কারণ কি জানেন ?

না।

একটাই কারণ, মানুষ দু’পায়ে হাঁটে। মানুষ চার পায়ে হাঁটলে তাব জ্ঞান বুদ্ধি কোনো সীমা থাকত না।

আখলাক সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, এই জাতীয় উদ্ভট কথা আমাকে বলবে না। মানব জাতির এই যে উত্থান তার কারণ হঠাৎ একদিন আমরা গাছ থেকে নেমে হাঁটার চেষ্টা করতে লাগলাম। সেই চেষ্টা না করলে এখনো আমাদের গাছে গাছে বানর হয়ে ঝুলতে হতো।

ভূত হাসি হাসি গলায় বলল, আসল ব্যাপারটা আপনাকে বুঝিয়ে বলি। মানুষ দু'পায়ে হাঁটে, তাকে ব্যালাঙ্গ রাখতে হয়। মানুষের ব্রেইনের বেশিরভাগই খরচ হয়ে যায় ব্যালাঙ্গ রাখার হিসাবনিকাশে। প্রতিনিয়ত ব্রেইনকে এই হিসাব করতে হচ্ছে। এই হিসাব কঠিন ও জটিল হিসাব। মানুষ যদি চারপায়ে হাঁটত তাহলে তার মস্তিষ্কে চাপ থাকত অনেক কম। সে তার ক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারত।

আখলাক সাহেব কিছু বললেন না। ভূতের যুক্তি তিনি ফেলে দিতে পারছেন না। আবার যুক্তি মেনে নিতেও পারছেন না। তিনি অস্বস্তি বেড়ে ফেলার জন্যে কয়েকবার শুকনো ধরনের কাশি কাশলেন। ভূতটা বলল, স্যার আপনার অস্বস্তিতে কাশাকাশি করার দরকার নেই। আমি সত্যি কথাই বলছি।

আখলাক সাহেব ইতস্তত করে বললেন, আমরা যদি এখন দু'পায়ে না হেঁটে চারপায়ে হামাগুড়ি দিতে শুরু করি...

তখন স্যার জ্ঞান বুদ্ধিতে আপনাদের নাগাল পাওয়া সমস্যা হবে। আপনারা অনেক দূর এগিয়ে যাবেন।

তবু ব্যাপারটা একটু যেন হাস্যকর।

নতুন সব জিনিসই স্যার হাস্যকর। মানুষ যখন প্রথম জুতা পায়ে দিল তখন সবাই তাদের নিয়ে হাসাহাসি করেছে। আর আজ আপনি খালি পায়ে কলেজে ক্লাস নিতে যান আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু হবে। ভুল বললাম স্যার ?

না ভূত বলো নি।

স্যারো! কি ঘুম পেয়ে গেছে নাকি ?

বুঝতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছে এতক্ষণ যা ঘটছে পুরোটাই স্বপ্নে ঘটছে।

এরকম মনে হওয়ার কারণ কী ?

দু'টা ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমলাম তো। আচ্ছা ভালো কথা, ভূতরা কি স্বপ্ন দেখে ?

দেখে। তাদের সবই দিবাস্বপ্ন। এরা দিনে ঘুমায় তো, তাই দিবাস্বপ্ন। স্যার কি একটা কবিতা শুনবেন ?

কবিতা ?

মানুষ নিয়ে একটা ছড়ার মতো লিখেছিলাম। 'সাপ্তাহিক ভূত' পত্রিকার বর্ষশুভ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। স্যার পড়ব ?

পড়।

ভূত বেশ সুরেলা গলায় কবিতা পাঠ শুরু করল—

মানুষ।

হুসহুস

ভুসভুস।

মানুষ।

খুশখুশ

ফুসফুস।

মানুষ
ঠুববুস
ভুববুস ।
মানুষ
হাংকুশ
পাংকুশ ।
মানুষ
মানুষ ।

কবিতা চলতেই থাকল । সুরেলা গলার কবিতা শুনতে শুনতে আখলাক সাহেব গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন; তবে ঘুমের মধ্যেও কবিতা চলতে থাকল— মানুষ, হুসহুস ভুসভুস । মানুষ, খুশখুশ ফুসফুস । মানুষ, ঠুববুস ভুববুস...

৩

সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল এমরান সুবাহানের ঘরে আখলাক সাহেবের ডাক পড়েছে । আখলাক সাহেব কারণটা ঠিক ধরতে পারছেন না । বিশেষ কোনো জরুরি কারণ ছাড়া এমরান সাহেব কোনো শিক্ষককে তাঁর ঘরে ডাকেন না । এমরান সাহেব মানুষটা রাশভারী ধরনের । পুরনো কালের প্রিন্সিপালদের মতো হাবভাব । শুধু ছাত্র না, শিক্ষকরাও তাঁকে ভয় পান । তিনি অকারণে কাউকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠান না । যখন ডেকে পাঠান তখন বুঝতে হবে বিশেষ কিছু ঘটে গেছে । ভয়ঙ্কর কিছু । আখলাক সাহেব ঠিক বুঝতে পারছেন না তাঁর ক্ষেত্রে সেই ভয়ঙ্কর কিছুটা কী ?

এমরান সাহেব চিঠি লিখছিলেন, লেখা বন্ধ রেখে হাসি মুখে বললেন, আখলাক সাহেব বসুন ।

আখলাক সাহেব বসতে বসতে বললেন, স্যার ডেকেছিলেন ?

হ্যাঁ । আপনাদের সঙ্গে তো সামাজিক সৌজন্যের কথাবার্তাও হয় না । এমন ব্যস্ত থাকি । খবর কী বলুন তো ?

খবর ভালো ।

ক্লাস চলছে কেমন ?

জি ভালো ।

চা খাবেন ?

জি না ।

খান, আমার সঙ্গে এককাপ চা খান ।

এমরান সাহেব বেল টিপে বেয়ারাকে চা দিতে বললেন । আখলাক সাহেব বললেন, স্যার আপনি কি আমাকে বিশেষ কিছু বলার জন্যে ডেকেছেন ?

এমরান সাহেব অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, না বিশেষ কিছু না । আচ্ছা ভালো কথা, আপনি নাকি সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রদের বলেছেন— মানুষের দু'পায়ে হাঁটা উচিত না । চারপায়ে হামাগুড়ি দেয়া উচিত । এরকম কিছু কি বলেছেন ?

জি বলেছি।

রসিকতা করে নিশ্চয়ই বলেছেন। আমাদের সমস্যা হচ্ছে কোনটা রসিকতা আর কোনটা রসিকতা না সেটা ধরতে পারি না। সিরিয়াস বিষয়গুলিকে রসিকতা মনে করি। আর রসিকতার বিষয়গুলিকে সিরিয়াসভাবে নিয়ে নিই। আই কিউ কম হলে যা হয়। জাতিগতভাবেই আমাদের আই কিউ কম।

আমি স্যার রসিকতা করি নি।

এমরান সাহেবের মুখ হা হয়ে গেল। চা চলে এসেছে। তিনি চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন, আপনি ছাত্রদের হামাগুড়ি দিতে বলেছেন?

জি না। হামাগুড়ি দেয়ার উপকারিতাটা বলেছি।

এমরান সাহেব হতভম্ব গলায় বললেন, কী উপকারিতা?

আখলাক সাহেব উপকারিতা ব্যাখ্যা করলেন। সুন্দর করে ব্যাখ্যা করলেন। এমরান সাহেব অবাক হয়ে শুনলেন। এক সময় গলা খাকারি দিয়ে বললেন, আপনার যুক্তি ইন্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছে। তবে ব্যাপার হচ্ছে কী, একেবারে রেভ্যুলিশনারী ধারণার ব্যাপারে আমাদের অনেক সাবধান হতে হবে। আজ আপনার কথা শুনে কলেজের সব ছাত্রছাত্রী যদি হামাগুড়ি দিয়ে চলাফেরা করতে শুরু করে সেটা কি ভালো হবে?

আখলাক সাহেব কিছু বললেন না। শান্ত মুখে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। এমরান সাহেব বললেন, ক্লাসে বক্তৃতায় এইসব আমার মনে হয় না বলাই ভালো। তাছাড়া আপনার বিষয় হচ্ছে অঙ্ক। হামাগুড়ি তো আপনার বিষয় নয়। আপনি তো আর ড্রিল টিচার না। ঠিক না?

জি স্যার।

আবার শুনলাম মানুষের নামকরণ পদ্ধতিটাও নাকি আপনার কাছে ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে।

আমরা যেভাবে নাম রাখি তাতে নাম থেকে চট করে কিছু বোঝা যায় না। মানুষের নাম এমন হওয়া উচিত যেন নাম শুনেই বলে দেয়া যায় মানুষটা বোকা না জ্ঞানী, বুদ্ধিমান না ধূর্ত। রাসায়নিক যৌগগুলির নাম যেমন শোনা মাত্র বোঝা যায় ব্যাপারটা কী। ১-৩ বিউটাডাইন বললেই আমরা জেনে যাই ১ ও ৩ পজিশনে ডাবল বন্ড আছে।

এমরান সাহেব শুকনো গলায় বললেন, ও আচ্ছা।

স্যার আমি কি এখন উঠব?

বসুন, আরেকটু বসুন।

আখলাক সাহেব দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, প্রিন্সিপাল সাহেবের কথায় আবার বসলেন।

এমরান সাহেব বললেন, আপনার তো অনেক ছুটি পাওনা আছে, আপনি কিছুদিন ছুটি নিয়ে ঘুরে আসুন না কেন?

ছুটির কোনো প্রয়োজন দেখছি না স্যার।

ছুটির প্রয়োজন দেখবেন না কেন? ছুটির প্রয়োজন আছে। নগর জীবনের প্রবল চাপে আমাদের ভেতর নানান সমস্যা দেখা দেয়। এইসব সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে

আমাদের মাঝে মাঝে ছুটি নেয়া খুব জরুরি হয়ে পড়ে। Far from the madding crowd. আপনি ছুটির দরখাস্ত করুন। আপনার ছুটি তো পাওনাও আছে, আছে না ?

জি স্যার আছে।

তাহলে আর সমস্যা কী ? আপনি এক কাজ করুন— সমুদ্র দেখে আসুন। রোগ সারানোয় সমুদ্রের মতো কিছু হয় না।

আখলাক সাহেব বললেন, স্যার আমার তো কোনো রোগ নেই।

জানি। সুস্থ মানুষের জন্যে সমুদ্র আরো বেশি সুফলদায়ক।

এমরান সাহেব বেল টিপে বেয়ারাকে ডাকলেন। ছুটির ফরম আনতে বললেন। আখলাক সাহেবকে সাত দিনের ছুটি নিয়ে প্রিন্সিপাল সাহেবের ঘর থেকে বেরুতে হলো।

আখলাক সাহেব খুবই বিরক্ত বোধ করছেন। এই সাত দিন তিনি ঘরে বসে থেকে কী করবেন ? পাহাড় সমুদ্র এইসব বিষয়ের প্রতি তাঁন কোনো আগ্রহ নেই। মিলিদের সঙ্গে একবার সমুদ্র দেখতে গিয়েছিলেন, সমুদ্রের গর্জন শুনে মাথা ধরে গেল। রাতে আর ঘুম আসে না। গাদাখানিক পানি দেখার মধ্যে লোকজন কী মজা পায় কে জানে।

তিনি টিচার্স কমন রুমে এসে বসলেন। হঠাৎ লক্ষ করলেন সবাই যেন কেমন কেমন দৃষ্টিতে তাঁকে দেখছে। শামসুদ্দিন সাহেব গলাখাকারি দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছেন আখলাক সাহেব ?

ভালো।

সাত দিনেব ছুটি নিয়েছেন শুনলাম ?

হঁ।

সমুদ্র দেখতে যাচ্ছেন ?

আখলাক সাহেব ভেবে পেলেন না তাঁর ছুটির খবরটা ইতিমধ্যে জানাজানি হলো কীভাবে! তিনি তো কাউকে কিছু বলেন নি।

শামসুদ্দিন সাহেব বললেন, আপনার হামাগুড়ি থিওরি শুনলাম। অসাধারণ। বৈপ্রবিক বলা যেতে পারে।

আপনার সে-রকম মনে হচ্ছে ?

অবশ্যই মনে হচ্ছে। থিওরি অব রিলেটিভিটির পর এমন বৈপ্রবিক ধারণা আর আসে নি। কে কী বলবে না বলবে তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। লোকে আপনাকে পাগল ভাবলেও আপনি কেয়ার করবেন না। গ্যালিলিও যখন বললেন, পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরে, তখন অনেকেই তাঁকে পাগল ভেবেছিলেন। মহান থিওরির প্রচারকরা সবসময়ই পাগল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। গ্রেট ট্র্যাজেডি।

দবিরুদ্দিন বললেন, আপনার থিওরি আমার কাছেও গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে। শুধু একটাই সমস্যা আমাদের দু'জোড়া করে জুতা লাগবে। পায়ের জন্যে এক জোড়া, আবার হাতে পরার জন্যে আরেক জোড়া। হাতে পরা জুতার অন্য একটা নাম থাকা দরকার। 'হতা' নাম দিলে কেমন হয় ? পায়েরটা জুতা আর হাতেরটা 'হতা'।

আখলাক সাহেবের সন্দেহ হলো এরা তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করছে। তাঁর মন বিষণ্ণ হলো। তিনি কাউকে নিয়ে রঙ্গ রসিকতা করেন না। তারা কেন তাঁকে নিয়ে করবে ?

শামসুদ্দিন বললেন, শুধু হাতের জুতা থাকলেই হবে না হাঁটুর জন্যেও কিছু একটা দরকার। হামাগুড়ি দেয়ার সময় হাঁটু মাটিতে লাগে। চামড়া বা প্লাস্টিকের টুপি জাতীয় কিছু লাগবে হাঁটুর জন্যে। এইসব সমস্যা সমাধান করতে হবে।

দবিরুদ্দিন বললেন, আর একটা বড় সমস্যার কথা আপনারা চিন্তাই করছেন না। ঈদের সময় রাস্তা-ঘাটের ভিড় লক্ষ করেছেন? চারপায়ে হাঁটলে অনেকখানি জায়গা নিয়ে নেবে। ভিড়ের অবস্থাটা হবে কী?

শামসুদ্দিন বললেন, এর একটা ভালো দিকও আছে। ছোট বাচ্চাকাচ্চারা ঘোড়ার মতো পিঠে বসে থাকবে। এরা ঘ্যানঘ্যান করবে না। আনন্দে থাকবে। ঘোড়ার পিঠের হাতির হাওদার মতো একটা হাওদা থাকলে বাচ্চারা পড়ে যাবে না। বেল্ট দিয়ে হাওদা কোমরের সঙ্গে বাঁধা থাকবে।

আখলাক সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। এইসব কথাবার্তা শুনতে তাঁর আর ভালো লাগছে না। আগামী সাত দিন তাঁর কিছু করার নেই— ভাবতেই খারাপ লাগছে। বাসায় ফিরতেও ইচ্ছা করছে না। আচ্ছা লোকজন কি তাঁকে পাগল ভাবতে শুরু করেছে? পাগলের কোনো আচরণ কি তিনি করছেন? মনে হয় না তো। অবশ্যি তিনি কোনো পাগলকে ভালোভাবে লক্ষ করেন নি। ছোটবেলায় মামার বাড়িতে একটা পাগল আসত। তাকে দেখে দৌড়ে ঘরে পালাতেন। তার আচার আচরণ ভালো মতো দেখা হয় নি। একটা বড় ভুল হয়েছে। এখন থেকে পাগল দেখলে খুব ভালো করে লক্ষ করতে হবে। দূর থেকে লক্ষ করা 'কাছে যাওয়া যাবে না। তিনি কুকুর এবং পাগল এই দুই জিনিসকে বড়ই ভয় পান।

8

আখলাক সাহেব রাত ঠিক ন'টায় ভাত খান। রাতে আমিষ খান না। সামান্য ভাত, একটা ভাজি আর ডাল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমিষের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হয় বলে কোথায় যেন পড়েছিলেন। তিনি তা মেনে চলছেন।

মোতালেব ভাত নিয়ে এসে অবাক হয়ে দেখল আখলাক সাহেব বিছানার উপর চারপায়ে ঘোড়ার মতো দাঁড়িয়ে আছেন। ঘোড়া যেভাবে কোমর নাড়ায় তিনিও মাঝে মাঝে সেভাবেই কোমর নাড়াচ্ছেন।

মোতালেব বলল, আফনের কী হইছে?

কিছু হয় নি।

আফনে ঘোড়া হইছেন ক্যান?

আখলাক সাহেব ঠিক হয়ে বিছানায় বসলেন। তিনি যে হামাগুড়ি মতো করছিলেন নিজেও বুঝতে পারেন নি। ব্যাপারটা ঠিক হয় নি। নিজের উপরই রাগ লাগছে। মোতালেব আবার বলল, আফনের কী হইছে?

বললাম তো কিছু হয় নি। এটা হচ্ছে এক ধরনের ব্যায়াম। চিন্তা শক্তি বাড়াবার ব্যায়াম।

ও আইচ্ছা।

এখন থেকে এই ব্যায়াম তুইও কববি। রোজ দু'ঘন্টা করে।

মোতালেবের মুখ হা হয়ে গেল। আখলাক সাহেব উৎসাহিত গলায় বললেন— তোর ব্রেইন বলে তো কোনো পদার্থ নেই। এক বৎসর চেষ্টা করে অক্ষর জ্ঞান করাতে পারলাম না। এই ব্যায়ামের পরে দেখবি ফটাফট অক্ষর শিখে ফেলবি। আজ থেকেই শুরু কর।

মোতালেবকে খুব আগ্রহী মনে হলো না। বরং তাকে চিন্তিত মনে হলো। তবে আখলাক সাহেব খুবই আগ্রহ বোধ করছেন। ভূত যা বলছে তা সত্যি কিনা তা পরীক্ষা করার একটা সুযোগ পাওয়া গেল।

মোতালেব !

জি খালুজান।

সকালে এক ঘণ্টা আর সন্ধ্যায় এক ঘণ্টা দু'ঘণ্টা চারপায়ে থাকবি।

জি আইচ্ছা।

আখলাক সাহেব খেতে বসেছেন। আরাম করে খাচ্ছেন। মোতালেব বিমর্ষ মুখে তাঁর খাওয়া দেখছে। আখলাক সাহেব বললেন, চারপায়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নেই। ইচ্ছা করলে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবি। চারপায়ে যাবি।

মাইনমে পাগল কইব।

আখলাক সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, পাগল বলবে কেন ? এর মধ্যে পাগল বলার কী আছে ?

উলটা পালটা কাম করলে লোকে পাগল কয়।

আখলাক সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, উলটা পালটা কাজ মানে কী ?

এই ধরেন ভাত খাওনের সময় পাগল করে কী— আগে বেবাক তরকারি খাইয়া ফেলে। পরে হুদা ভাত কপকপাইয়া খায়।

আখলাক সাহেব অস্বস্তির সঙ্গে লক্ষ করলেন তিনি নিঃশব্দে ভার্জি আগে খেয়ে ফেলেছেন। ভাতে এখনো হাত দেন নি। ব্যাপারটা অন্যমনস্কতার জন্যে হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। তবুও খানিকটা অস্বস্তি লেগেই রইল। তাঁর ক্ষিধে নষ্ট হয়ে গেল। তিনি এক চুমুকে ডালের বাটি শেষ করে ফেললেন। তাঁর অস্বস্তি আরো বাড়ল। ভাত রেখে ডাল, ভার্জি সব খেয়ে ফেলেছেন— এবা মানে কী ? তাঁর মনটাই খাবাপ হয়ে গেল। তিনি কি পাগল হয়ে যাচ্ছেন ? মাথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে ? ভূত বলে যাকে দেখছেন সে কি তাঁর উত্তপ্ত এলোমেলো মস্তিষ্কের কল্পনা ?

মোতালেব।

জ্যে খালুজান।

তুই কি ভূত বিশ্বাস করিস ?

অবশ্যই করি। না করনের কী আছে ? চাইরদিক কিলবিল করতাছে ভূতে।

বলিস কী ?

মানুষ যেমুন আছে নানান পদের, ভূতও আছে নানান পদের। বাড়ির কোণাতে থাকে এক ভূত, তারে কয় কুনি-ভূত। দরজার চিপাত থাকে এক-কিসিমের ভূত, তার নাম চিপা-ভূত। আছে কন্দ কাটা, আছে মেছো ভূত...

চুপ কর।

জ্বে আইচ্ছা চুপ করলাম ।

ভূত বলে জগতে কিছু নাই । বুঝলি ?

জ্বে বুঝছি ।

যা এখন থালাবাসন নিয়ে সামনে থেকে যা ।

জ্বে আইচ্ছা ।

মোতালেব বিমর্ষ মুখে সরে গেল । সে খুবই চিন্তিত বোধ কবছে ।

৫

আখলাক সাহেব একটা কুটিরের মতো করেছেন— রাতে ঘুমাতে যাবার আগে বাতি নিভিয়ে চারপায়ে বিছানায় কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন । ঋষি মাঝে বিছানার এ মাথা থেকে ও মাথায় যান । আবার কখনো কখনো এক জায়গায় ঘুরপাক খান । এতে তাঁর শরীরটা বেশ হালকা ও ঝরঝরে লাগে । আশ্চর্য হওয়ার মতো ঘটনা তো বটেই । শরীরের ভর দু'টা পায়ে না থেকে চারটা পায়ে চলে যাওয়ায় মোটামুটি আরাম বোধ হয় । এভাবে থাকলে চিন্তা-শক্তি ভালো হয় কিনা তাও তিনি পরীক্ষা করেছেন । পরীক্ষার ফল সম্পর্কে তিনি এখনো নিশ্চিত হতে পারেন নি । তবে স্মৃতি-শক্তি এই অবস্থায় বাড়ে বলে তাঁর ধারণা । ছোটবেলায় স্কুলে পড়া অনেক কবিতা তাঁর এই অবস্থায় মনে পড়ে । যা অন্য সময় মনে পড়ত না । ক্লাস টেনে মাইকেলের খটমটে কবিতা মেঘনাদবধের একটা অংশ পাঠ্য ছিল । কোনোদিন সেটা তিনি মুখস্ত করার চেষ্টা করেন নি । প্রয়োজনও বোধ করেন নি । চারপায়ে থাকা অবস্থায় হঠাৎ সেই কবিতা তাঁর মনে পড়ে গেল । তিনি গম্ভীর গলায় আবৃত্তি করলেন—

অন্যায় সমরে পড়ি, অসুরারি-রিপু
রাক্ষস কুল ভরসা পুরুষ বচনে
কহিলা লক্ষণ শূরে, 'বীরকুলগ্লানি
সুমিত্রানন্দন, তুই! শত ধিক তোরে!
রাবন নন্দন আমি, না ডরি শমনে
কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,
পামর এ চিরদুঃখ রহিলরে মনে!

তিনি পুরো কবিতাটাই বোধহয় বলতে পারতেন কিন্তু তার আগেই মোতালেব এসে ঘরে ঢুকে বাতি জ্বেলে দিল । এবং চোখে মুখে রাজ্যেব ভয় নিয়ে তাঁর দিকে তাকাল । আখলাক সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, কী চাস ?

মোতালেব বলল, কিছু চাই না । আফনে কী করেন ?

কী করি সে তো দেখতেই পাচ্ছি । রিলাক্স করছি । ঘুমোবার আগে সামান্য একসারসাইজ । যা, বাতি নিভিয়ে চলে যা । গাধার মতো তাকিয়ে থাকিস না ।

জ্বে আইচ্ছা ।

ঘুমোবার আগে চারপায়ে থাকার ব্যাপারটায় হয়তো সামান্য হাস্যকর দিক আছে, তবে এটাকে একসারসাইজ হিসেবে নিলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় । ইয়োগার অনেক

আসন আছে খুবই হাস্যকর। মাথা নিচে ঠ্যাং আকাশে। সেই ঠ্যাং দিয়ে আবার সাইকেল চালানোর ভঙ্গি করা। লোকজন সেটাকে হাস্যকর মনে করে না কারণ ব্যায়াম হিসেবে ইয়োগো চালু হয়ে গেছে। চারপায়ে দাঁড়িয়ে থাকলেই হাসির ব্যাপার হয়ে যায়। আশ্চর্য!

আখলাক সাহেবের মনে হলো চারপায়ের ব্যাপারটাকে ব্যায়াম হিসেবে চালু করলে পারলে কেউ এটাকে হাস্যকর মনে করবে না। বরং এটাকেই তখন স্বাভাবিক ধরে নেবে। সেই ক্ষেত্রে এই ব্যায়ামের একটা নাম দিতে হয়। কী নাম দেয়া যায়? ফ্রি হ্যান্ড একসারসাইজ বলা যাবে না। হ্যান্ড ফ্রি না। হাত মাটিতে পোতা, ফিক্সড হ্যান্ড একসারসাইজ বলা যেতে পারে। এই ব্যায়ামের উপকারিতা কী তাও লোকজনদের বলতে হবে।

১. শরীরের মাংসপেশি শিথিল হয়। শরীর বিশ্রাম লাভ করে।
২. স্মৃতি-শক্তি ও চিন্তা-শক্তি বৃদ্ধি পায়।
৩. মন প্রফুল্ল হয়।
৪. সুনিদ্রা হয়।

মন প্রফুল্ল হয় কিনা এ ব্যাপারে আখলাক সাহেব এখনো নিশ্চিত নন। আরো পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ব্যাপারটা বোঝা যাবে। তবে সুনিদ্রা যে হয় সে ব্যাপারে তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত। এই ব্যায়াম তিনি যে ক'দিন করেছেন ভালো ঘুম হয়েছে। শুধু গতরাতে ঘুম কম হয়েছে। ঘুমে যখন চোখ বন্ধ হয়ে এসেছে তখন জ্ঞানী ভূত ঘুম থেকে তাঁকে ডেকে তুলেছে। তিনি বিবক্ত হতে গিয়েও হন নি, কারণ এবার ভূত অনেক দিন পর এসেছে। ভূত কাচুমাচু গলায় বলল, সরি স্যাব, আপনার কাঁচা ঘুম ভাঙ্গলাম।

আখলাক সাহেব হাই তুলতে তুলতে বললেন, তারপর তোমার খবর কী? অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ নেই।

খবর বেশি ভালো না স্যার।

কেন কী হয়েছে?

ডাইরিয়াতে স্যার খুব কষ্ট পেলাম। এখনো পাচ্ছি, পুরোপুরি সারে নি। খাওয়া দাওয়া খুব বেসট্রিকটেড।

ডাইরিয়া? তোমাদের ডাইনিয়া হয় নাকি?

খাওয়া দাওয়ার অনিয়ম করলে হয়। সেদিন এক বিয়েতে গিয়ে অনিয়ম হয়েছে। লোভে পড়ে এক গাদা খেয়ে ফেলেছি, তারপরেই পেট নেমে গেছে। ওষুধপত্র খেয়ে এখন কিছুটা আরাম হয়েছে। তবে শরীর খুবই দুর্বল।

কী ওষুধ খাচ্ছ?

ডাইরিয়ার ওষুধ তো একটাই— ওরস্যালাইন।

তোমাদেরও ওরস্যালাইন আছে নাকি?

কী বলেন স্যার, থাকবে না কেন? এক জগৎ চাঁদের আলোর সঙ্গে তিন মুঠ গোলাপ ফুলের গন্ধ, তার সঙ্গে হাতের আঙ্গুলের এক চিমটি জোনাকি পোকার আলো। তারপর দে ঘোঁটা। জিনিস যা তৈরি হয় অতি অখাদ্য। নাড়ি ভুড়ি উল্টে আসে। কী আর করব, শরীরটা তো ঠিক রাখতে হবে।

তাতো বটেই।

এদিকে স্যার বিপদের উপর বিপদ... যাকে বলে মহাবিপদ। ৪ নম্বর দূরবর্তী বিপদ সংকেত।

কী বিপদ ?

বলতেও লজ্জা লাগছে, না বলেও পারছি না।

বলে ফেল।

সত্যি কথা বলতে কী স্যার, এই বিপদে পড়েই আপনার কাছে আসা। আপনার কি স্যার মনে আছে প্রথম যেদিন আপনার কাছে এসেছিলাম সেদিন বলেছিলাম মহাবিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। আমি একজন বিপদগ্রস্ত ভূত।

হ্যাঁ মনে আছে।

প্রতিবারই ভাবি বিপদের কথাটা আপনাকে বলব। শেষে ‘নাসিকা লজ্জায়’ বলতে পারি না।

নাসিকালজ্জা ?

মানুষের লজ্জা সবটাই চোখে, এই জন্যে তারা বলে চক্ষুলজ্জা। আমাদের সবটাই নাকে। এই জন্যেই আমরা বলি নাসিকালজ্জা। এমনিতে স্যার আমরা মুখে কথা বলি। লজ্জা পেলে মুখ আপনাপনি বন্ধ হয়ে যায়, তখন কথা বলি নাকে।

ও আচ্ছা। এখন বলো তোমার বিপদের কথাটা শুনি।

বঁড় লজ্জা স্যার।

লজ্জা দূর করে বলো— অন্য দিকে তাকিয়ে বলো তাহলে লজ্জা লাগবে না।

ভূত অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে কথা শুরু কবল।

বাড়ি থেকে আমাকে বিয়ের জন্যে খুব প্রেসাব দিচ্ছে স্যাব। এদিকে আমার নিজের বিয়ের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই। আমি পড়াশোনা, গবেষণা, লেখালেখি নিয়ে থাকি। একটু দেশ ভ্রমণেরও শখ আছে। গত সপ্তাহে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঘুরে এলাম। সেখানে কাল ভৈরবীর মূর্তি দেখে এসেছি। বড়ই আনন্দ পেয়েছি। বিয়ে করলে এইসব আনন্দ থেকে বঞ্চিত হব।

কেন ? স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরবে!

আপনি কি স্যার পাগল হয়েছেন ? বাবা-মা যার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করেছেন তাকে নিয়ে দেশ বিদেশে ঘোরার প্রশ্নই ওঠে না।

কেন ?

তার নাম শুনেলই বুঝবেন কেন, তখন আর আমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে না। তার নাম হলো ফা-চল্লিশ।

ফা-চল্লিশ মানে ?

ফা-চল্লিশ মানে চল্লিশ নম্বর ফাজিল।

ফাজিল নাকি ?

ফাজিল বলে ফাজিল। রাত দিন গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায়। একে ভয় দেখায়, তাকে ভয় দেখায়। সেদিন ধানমন্ডি থানার ওসিকে ভয় দেখিয়েছে। পুলিশের সঙ্গে এইসব করা কি ঠিক? স্যার আপনি বলুন।

পুলিশের সঙ্গে রসিকতা না করাই ভালো।

এটা তো স্যার সাধারণ কথা। যে-কোনো বোকা জানে। সেও জানে, জানে না যে তা না। তবে এই যে বললাম— ফাজিল।

দেখতে কেমন?

দেখতে ভালো। সর্বনাশ তো এতেই হয়েছে। মা-বাবা ভূতনির রূপ দেখে মুগ্ধ। তাদের এক কথা— বিয়ে ফা-চল্লিশের সঙ্গেই দিতে হবে। স্যার, এখন আপনিই বলুন রূপ বড় না জ্ঞান বড়? রূপ চিরস্থায়ী না জ্ঞান চিরস্থায়ী? স্যার বলুন, আপনিই বলুন?

দুটা দু'জিনিস।

অবশ্যই। একটার সঙ্গে অন্যটার তুলনাই চলে না। আমি বাবা-মা'কে বলে দিয়েছি— চিরকুমার থাকব। নো হাংকি পাংকি। বিয়ে-সংসার এইসব আমাকে দিয়ে হবে না। এইজন্যেই স্যার আপনার সাহায্য দরকার।

আমি কীভাবে সাহায্য করব তাতো বুঝতে পারছি না।

আপনি নিজেও তো স্যার চিরকুমার। আপনি আমাকে শলা পরামর্শ দেবেন। কীভাবে আত্মীয়স্বজনদের চাপ কাটানো দেয়া যায় সেটা বলবেন। আমি সেই মতো কাজ করব।

ও আচ্ছা।

শুধু 'ও আচ্ছা' বললে হবে না স্যার। আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে হবে। ফা-চল্লিশ যেভাবে বিরক্ত করা শুরু করেছে— অসহ্য। ওফ।

মেয়েটা তোমাকে বিরক্ত করেছে?

বিরক্ত মানে মহাবিরক্ত। হয়তো কোনো জ্ঞানের বিষয় নিয়ে চিন্তা করছি তখন সামনে দিয়ে হেঁটে যাবে। হাসবে। নানান রকম ঢং করবে। এতে চিন্তার বিষয় হয়।

হওয়ারই কথা।

মনে করুন আমি কোনো রাস্তা দিখে যাব, সে করবে কী আগে ভাগে সেই রাস্তার কোনো বাঁশ গাছে পা দুলিয়ে বসে থাকবে। পা নাচাবে। উপর থেকে গায়ে থুথু ফেলবে।

আমার মনে হয় মেয়েটা তোমাকে পছন্দ করে।

এক্কেবারে খাঁটি কথা বলেছেন স্যার। আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। ইচ্ছা হচ্ছে বিষ খাই। এখন আপনি ভরসা। ঠাণ্ডা মাথায় একটু চিন্তা করে অধর্মের জীবন রক্ষা করুন।

দেখি কী করা যায়।

তাহলে স্যার আমি আজ যাই। আপনি ঘুমান। অনেকক্ষণ ডিসটার্ব করলাম। নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন স্যার।

ভূত চলে যাবার পরেও অনেক রাত পর্যন্ত আখলাক সাহেব ঘুমাতে পারলেন না। একবার মনে হয় পুরো ব্যাপারটা কল্পনা; আবার মনে হয়— না কল্পনা না, সবই সত্যি।

জগৎ খুবই রহস্যময় যে জন্যে মহাকবি শেক্সপিয়র বলেছিলেন— কী যেন বলেছিলেন ? মনে পড়েছে না । তিনি অনেকক্ষণ বিছানায় এপাশ ওপাশ করে শেক্সপিয়রের বাণী মনে করার চেষ্টা করলেন । মনে পড়ল না । এই মনে আসছে, এই আসছে না— এমন ভাব । লাইনগুলি মনে না আসা পর্যন্ত ঘুম আসার কোনো সম্ভাবনা নেই । কী করা যায় ? তাঁর মনে হলো ঘোড়ার মতো চারপায়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে মনে পড়বে । একটু লজ্জাও লাগছে । এত লজ্জা করলে জীবন চলে না । তিনি হামাগুড়ির ভঙ্গিতে বিছানায় বসলেন । চারপায়ে একটু হাঁটলেনও— বিছানাটা হাঁটাইটির জন্যে ছোট হয়ে গেছে । অর্ডার দিয়ে একটা বড় খাট এবং বড় মশারি কিনতে হবে । আখলাক সাহেব অল্প জায়গার ভেতরই একটু চক্র দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে শেক্সপিয়রের বাণী মনে পড়ল— There are many things in heaven and earth... বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে বহু কিছুই আছে যা মানবের চিন্তা ও কল্পনার অতীত... শেক্সপিয়র এইসব জিনিস তো আর গাঁজা খেয়ে লেখেন নি, জেনে শুনেই লিখেছেন । তাঁর মতো মানুষের গাঁজা খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না ।

কাজেই ভূতের ব্যাপারটা সত্যি হতেও পারে । চারপায়ে হাঁটার যে সব উপকারিতার কথা ভূত বলেছে তাও সত্যি... স্মৃতিশক্তি যে বাড়ে তা তো তিনি নিজেই পরীক্ষা করে দেখলেন । অন্যদের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করতে পারলে ভালো হতো, সেটা সম্ভব হচ্ছে না । এ দেশের মানুষ সবকিছু বিশ্বাস করে, যাবতীয় গুজব অগ্রহ নিয়ে শুনে, অন্যকে শোমায়; শুধু ভূতের মতো একটা সত্যি ব্যাপার বিশ্বাস করে না । তারপরেও তিনি ঠিক করলেন— মিলিকে খোলাখুলি ব্যাপারটা বলবেন । মিলিকে বলা আর একটা মাইক ভাড়া করে শহরে ঘোষণা দেয়া এক কথা, তারপরেও বলা দরকার । তবে মিলির স্বামী না শুনলেই ভালো— ব্যাটা অতিরিক্ত চালবাজ । সব শুনে সে চালবাজি ধরনের কিছু বলবে, মেজাজ হবে খারাপ । কী দরকার ।

কলিং বেল টিপতেই তাহের দরজা খুলে দিল । তাহেরের পেছনে উঁকি দিল মিলি, দু'জনই সেজেগুজে আছে, মনে হচ্ছে কোথাও বেরুচ্ছে । আখলাক সাহেব বললেন, কোথাও যাচ্ছিস ?

মিলি হড়বড় করে বলল, তোমার কাছে যাচ্ছি ।

আমার কাছে কেন ?

মিলি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, মোতালেব এসে কী সব উলটা পালটা খবর দিয়ে গেল । চিন্তায় অস্থির হয়ে ...

কী বলেছে মোতালেব ?

দাদা তুমি নাকি এখন চারপায়ে হাঁট । তুমি নাকি রাতে ঘুমাও না । মশাবি খাটিয়ে তার ভেতর চারপায়ে দাঁড়িয়ে থাক । মাঝে মাঝে ঘোড়ার মতো চিহ্ন করে ডাক ছাড় ।

বলতে বলতে মিলির চোখে পানি এসে গেল । গলা ধরে গেল । তাহের বলল, তুমি ভাইজানকে আগে ভেতরে এসে বসতে দাও । দরজাতেই কী গুরু করলে ? মোতালেবের সব কথা বিশ্বাস করতে হবে তার কোনো মানে আছে ? ভাইজান আপনি এসে আরাম করে বসুন তো ।

আখলাক সাহেব বসার ঘরের সোফায় এসে বসলেন। তাহের গম্বীর মুখে তাঁর সামনে এসে বসল। মিলি তার ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এখনো চোখ মুছছে। তাহের ঝুঁকে এসে বলল, মোতালেবের কথা সত্যি না, তাই না ভাইজান ?

আখলাক সাহেব গলা পরিষ্কার করে বললেন, চিঁহি করে ডাক দেয়ার ব্যাপারটা সত্যি না। ঐ অংশটা বানানো।

বাকিটা সত্যি ?

মোটামুটি সত্যি বলা যেতে পারে।

তাহেরের মুখ হা হয়ে গেল। অনেক কষ্টে সে মুখের হা বন্ধ করে বলল, আপনি তাহলে চারপায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ?

সব সময় না, মাঝে মাঝে।

মাঝে মাঝে ?

হ্যাঁ। এটা এক ধরনের একসারসাইজ। এর নাম হলো তোমার ফিস্ত্র হ্যাড একসারসাইজ। এই একসারসাইজের অনেক উপকারিতা। স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির জন্যে এরচেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না।

মিলি চোখ মুছতে মুছতে ধরা গলায় বলল, কে শিখিয়েছে তোমাকে এই একসারসাইজ ?

কেউ শেখায় নি, নিজে নিজেই বের করেছি।

মিলি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, তুমি নিজে নিজে এই একসারসাইজ বের করেছ ? ঠিক নিজে নিজে বলাটা ঠিক হবে না। ভূতের সাহায্য নিয়েছি।

দাদা, কার সাহায্য নিয়েছ ?

ঐ যে একটা ভূত যে আমার কাছে প্রায়ই আসে, নাম হলো গিয়ে— লেখক ৭৪...

মিলি ভীত গলায় বলল, লেখক ৭৪ ?

ওদের নামকরণ পদ্ধতি আর আমাদের নামকরণ পদ্ধতি এক না। প্রথম দিকে ভূতদের নাম শুনলে একটু ধাক্কা লাগবেই।

মিলি বলল, দাদা তুমি যা বলছ সব কিছুতেই আমার ধাক্কা লাগছে। একী সর্বনাশ হয়ে গেল! বলতে বলতে সে আবারো শব্দ করে কেঁদে উঠল। তাহের বলল, মিলি তুমি রান্নাঘরে যাও তো, ভাইজান এবং আমার জন্যে সুন্দর করে চা বানিয়ে আন। অকারণে অস্থির হয়ো না। মাথা ঠাণ্ডা রাখ। বি লেভেল হেডেড। সিচুয়েশন আন্ডার কন্ট্রোলে আছে। আর শোন, তুমি এখনো ভাইজানের মাথার উপর ফ্যানটা ছাড়ছ না কেন ? সব কিছু বলে দিতে হবে ? ফুল স্পিডে ফ্যান ছেড়ে দাও।

মিলি ফ্যান ছেড়ে দিল। আখলাক সাহেব গম্বীর হয়ে সেই ফ্যানের নিচে বসে রইলেন। তিনি খুবই বিরক্ত বোধ করছেন। এই বাড়িতে আসাটা তার জন্যে বোকামি হয়েছে।

তাহের তার দিকে ঝুঁকে এসে প্রায় ফিসফিস করে বলল, ভাইজান একটা কথা বলি ?

আখলাক সাহেব বললেন, যা বলতে চাও বলো। ফিসফিস করছ কেন ? ফিসফিস করার মতো কিছু কি হয়েছে ? যা বলবে স্পষ্ট করে বলবে।

ভাইজান, আপনার চিকিৎসা হওয়া দরকার।

তোমার সে-রকম মনে হচ্ছে ?

জি।

তোমার ধারণা আমার মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছে ?

জি আমার সেরকমই ধারণা। ঠিকমতো চিকিৎসা হলে আপনি আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন। আমার পরিচিত একজন সাইকিয়াট্রিস্ট আছেন আমি আপনাকে তার কাছে নিয়ে যাব।

কবে নিয়ে যাবে ?

যদি বলেন আজই নিয়ে যাব।

উনাকে আপনার ব্যাপারে সব বলে রেখেছি।

আখলাক সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, যদি সত্যি কোনোদিন পাগল হই তাহলে তোমাকে নিয়ে পাগলের ডাক্তারের কাছে যাব। এখন আমার সামনে থেকে যাও। আমাকে বিরক্ত করো না।

আপনি কি একটা রিলাক্সেন খেয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকবেন ? এতে মাথাটা ঠাণ্ডা হতো।

আমার মাথা নিয়ে তোমাকে দৃষ্টিস্তা করতে হবে না।

জি আচ্ছা।

আখলাক সাহেবের ইচ্ছা হচ্ছে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে। যাচ্ছেন না, কারণ মিলি কষ্ট পাবে। এসেছেন যখন রাতে খেয়ে যেতে হবে। মিলি নিশ্চয়ই কুণ্ঠসিত কিছু রান্না করবে। যা মুখে দেয়া যাবে না। রাতে খাবার সময় আবার বিয়ের প্রসঙ্গ তুলবে। আবারো— ৫২ এমন কোনো বয়স না! অসহ্য।

দরজার আড়াল থেকে তৃণা উঁকি দিচ্ছে। তার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। সে ফিসফিস করে ডাকল, বড় মামা।

আখলাক সাহেব বললেন, ফিসফিস করছিস কেন ?

মা তোমার সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করেছে, এই জন্যেই ফিসফিস করছি। মা শুনলে বকা দেবে।

কথা বলতে নিষেধ করেছে কেন ?

তোমার যে খুব মেজাজ খারাপ এই জন্যে।

আমার মেজাজ খারাপ না। আয় কাছে আয়।

তৃণা এগিয়ে এলো এবং কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, বড় মামা তুমি নাকি পাগল হয়ে গেছ ?

আখলাক সাহেব বললেন, কে বলেছে ?

বাবা বলেছে। মা সেটা শুনে সারা দুপুর কেঁদেছে। বড় মামা, তুমি কি পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছ, না একটু বাকি আছে ?

একটু বাকি আছে।

মোতালেব বলছিল তুমি নাকি এখন ঘোড়ার মতো হাঁট আর চিহ্ন করে ডাক দাও ।
ও একটু বেশি বেশি বলছে । চিহ্ন করে ডাক দিই না ।
যখন চিহ্ন করে ডাক দেবে তখন পুরোপুরি পাগল হয়ে যাবে, তাই না মামা ?
হঁ ।

ঐ ভূতটা কি তোমাকে পাগল বানিয়ে দিচ্ছে মামা ?

বুঝতে পারছি না, বোধহয় দিচ্ছে ।

মিলি অনেক কিছু রান্না করেছে । পাবদা মাছ, কাতলা মাছের মাথার মুড়িঘন্ট । কই মাছের ঝোল । ইলিশ মাছের সর্ষে বাটা । প্রতিটি পদই হয়েছে অখাদ্য । শুধু শুধু যে ভাত খাবেন সে উপায়ও নেই । চাল কিছু সেদ্ধ হয়েছে, কিছু হয় নি । একই হাঁড়ির ভাত অর্ধেক সেদ্ধ হয়, অর্ধেক হয় না কেন তা বোধহয় শুধু মিলিই জানে ।

৬

আখলাক সাহেব রাত এগারোটার দিকে বাড়ি ফিরলেন । মোতালেবকে বললেন, চা করতে । মোতালেব চা বানিয়ে আনল । চায়ের কাপটা তাঁব সামনে রাখল খুব ভয়ে ভয়ে । যেন তিনি ভয়ঙ্কর কোনো হিংস্র জানোয়ার, এক্ষুনি মোতালেবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন । সে তার সামনেও আসছে না । দরজার আড়াল থেকে তাকিয়ে আছে । চোখের উপর চোখ পড়া মাত্র চোখ সবিয়ে নিচ্ছে । আখলাক সাহেব শীতল গলায় ডাকলেন, মোতালেব !

মোতালেব চমকে উঠে বলল, জে খালুজান ।

তুই আমাব প্রতিটি কথায় চমকে চমকে উঠছিস কেন ? কী হয়েছে ?

কিছু হয় নাই খালুজান ।

তুই কি আমাকে ভয় পাচ্ছিস ?

অল্প অল্প পাইতেছি খালুজান ।

ভয় পাচ্ছিস কেন ?

মোতালেব কিছু না বলে মাথা চুলকাতে লাগল । আখলাক সাহেব বললেন, আচ্ছা যা, শুধু শুধু মাথা চুলকাতে হবে না । ঘুমাতে যা ।

মোতালেবের মাথা চুলকানো আবো বেড়ে গেল । আখলাক সাহেব বললেন, আর কিছু বলবি ?

একটু দেশে যাব ।

হঠাৎ দেশে যাবি কেন ?

আমার পিতার শইল খুব খাবাপ । মিত্য ছজ্জায় ।

কাব শরীর খারাপ ?

আমার পিতা, আব্বাজান ।

আখলাক সাহেবের মেজাজ খুব খাবাপ হলো, কাবণ মোতালেবের বাবা গত বৎসর মারা গেছেন । এই খবর আখলাক সাহেব ভালোমতোই জানেন । মিথ্যা কথা বলে মোতালেব ছুটি নিচ্ছে কেন ?

তোর বাবা মৃত্যুশয্যায় ?

জ্বে ।

গত বৎসর যিনি মারা গেলেন তিনি কে ?

মোতালেব খতমত খেয়ে বলল, আমার পিতা । এখন যার অসুখ হইছে সে আমার পিতার মতোই । আমার গেরাম সম্পর্কে চাচা । আমারে বড়ই ছেনেহ করে ।

আখলাক সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, যিনি ছেনেহ করেন, তার অসুখের খবরে ছুটে যাওয়া উচিত । আসবি কবে ?

এইটা অসুখের উপরে নির্ভর ।

আচ্ছা যা । কাল দিনটা থাক, বাজার টাজার যা দরকার করে দিয়ে চলে যা ।

জ্বে আইচ্ছা ।

মেজাজ টেজাজ খারাপ করে আখলাক সাহেব ঘুমতে গেলেন । মিলির বাসা থেকে ফেরার সময় মেজাজ যত খারাপ ছিল, এখন তারচে' পাঁচগুণ খারাপ । এই অবস্থায় ঘুম আসার কথা না । আখলাক সাহেব মশারি ফেলে বিছানায় বসে রইলেন । তিনি আসলে মনে মনে ভূতের জন্যে অপেক্ষা করছেন । অপেক্ষা করলে কেউ আসে না । যে ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করা হয়, সেই ট্রেন আসে তিন ঘণ্টা লেট করে । অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে তিনি যখন ঘুমতে গেলেন তখনই ভূত এসে উপস্থিত । মশারির পাশে দাঁড়িয়ে সে খুকখুক করে দৃষ্টি আকর্ষণ জাতীয় কাশি কাশতে লাগল । আখলাক সাহেব বললেন, কে ?

স্যার আমি । আপনার কি শরীর টরির খারাপ নাকি ? গলা কেমন ভারী ভারী শুনাচ্ছে । শরীর ঠিকই আছে, মনটা খারাপ ।

মন খারাপ কেন স্যার ?

আছে নানান ব্যাপার, মোতালেব আমার নামে আজোবাজে কথা ছড়াচ্ছে । মিথ্যা কথা বলে আবার ছুটি নিয়ে নিল ।

মন কি বেশি খারাপ ?

হঁ ।

আমার নিজেরো স্যার মন অতিবিক্ত খারাপ । ফা-৪০ আমার নামেও আজোবাজে জিনিস ছড়াচ্ছে । যে জন্যে গতকাল সারা রাত পুকুরে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে ছিলাম । তারপর মনটা ঠিক হয়েছে ।

আখলাক সাহেব উৎসাহিত গলায় বললেন, এরকম করলে মন ঠিক হয় নাকি ?

জি হয় । ব্যাপারটা পরীক্ষিত । ব্যাখ্যা করলে আপনি বুঝতে পারবেন । ব্যাখ্যা করব ? কর ।

ধরুন আপনি পানিতে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে রইলেন । পানিটা ঠাণ্ডা । এতে হবে কী আপনার শরীরের তাপ কমে যাবে, সেই তুলনায় মাথার তাপ থাকবে বেশি; ফলে একটা তাপ পার্থক্য তৈরি হবে । তাপ পার্থক্যের কারণে তৈরি হয় বিভব পার্থক্য বা জাংশন পটেনশিয়াল । তখন মাথা থেকে শরীরে ইলেকট্রিসিটি ফ্লো করে । এক ধরনের বায়োক্যারেন্ট । তার ফলে মাথার উপর জমে থাকা চাপ কমে যায় ।

তাই নাকি ?

খুব মন টন খারাপ হলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন স্যার ।
দেখি ।

আপনার বাসায় তো চৌবাচ্চা আছে । পানি দিয়ে চৌবাচ্চা ভর্তি করে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকবেন । সকালে বসবেন সন্ধ্যাবেলা উঠবেন । দেখবেন মন পাখির পালকের মতো ফুরফুরে হয়ে যাবে । ফা-৪০ যখনই ঝামেলা করে তখনই আমি এই পদ্ধতি ব্যবহার করি । খুব ফলদায়ক পদ্ধতি ।

মেয়েটা কি ঝামেলা করছে ?

অতিরিক্ত ঝামেলা করছে । এখন আবার আমাকে দেখলে গান গায় ।

বলো কী ?

দারুণ লজ্জার মধ্যে পড়েছি । ভূত সমাজে আমাকে নিয়ে খুব হাসাহাসি ।

গান গায় কেমন ?

ভালো গায় । এটা স্বীকার না করলে অন্যায় হবে । অডিসনে পাশ করে রেডিওতে চাপ পেয়েছে । আখলাক সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, তোমাদের রেডিও আছে নাকি ?

বেডিও টিভি সবই আছে । ভূত বলে আমাদের ছোট চোখে দেখবেন না স্যার ।

না তা দেখছি না ।

আমি আজ চলে যাই স্যার । কয়েকদিন আপনার সঙ্গে দেখা হবে না । ফা-৪০ এর হাত থেকে বাঁচার জন্যে কয়েকদিন দূরে কোথাও লুকিয়ে থাকব ।

ভূত চলে গেল । আখলাক সাহেব ঘুমিয়ে পড়লেন । কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুম ভেঙে গেল । সারা রাত আর ঘুম হলো না । বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে রইলেন । মন বেশি খারাপ । খারাপ ভাবটা যাচ্ছেই না ।

আখলাক সাহেব ভোরবেলা নাস্তা খেয়ে চৌবাচ্চায় পানি ভর্তি করালেন । ভূতের চিকিৎসাটা করে দেখা দরকার । মন খারাপ ভাবটা যদি এতে যায় । তিনি দুপুর পর্যন্ত গলা ডুবিয়ে বসে রইলেন । দুপুরবেলা মোতালেব গিয়ে মিলি এবং তাহেরকে ডেকে নিয়ে এলো ।

মিলি ভীত গলায় বলল, দাদা কী হচ্ছে ?

আখলাক সাহেব বিরক্ত গলায় বলল, কী হচ্ছে তাতো দেখতেই পাচ্ছিছ ?

তুমি পানিতে গলা ডুবিয়ে বসে আছ কেন ?

মন টন খারাপ, এই জনো বসে আছি ।

মন খারাপ হলে পানিতে বসে থাকতে হয় ?

হ্যাঁ হয় । তুই কাঁদছিস কেন ?

তুমি পানিতে বসে আছ এই জন্যে কাঁদছি । একা একা থেকে তোমার এই অবস্থা হয়েছে দাদা । কতবার বলেছি একটা বিয়ে কর । আমার কথা তো কানে নেবে না । প্লিজ উঠে আস ।

তাহেরও শুকনো মুখে বলল, ভাইজান দয়া করে পানি থেকে উঠে আসুন । আজ সন্ধ্যায় একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে আপনাকে নিয়ে যাব । এপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছি

আখলাক সাহেব বললেন, সন্ধ্যায় নিয়ে যাবে সন্ধ্যায় উঠব। এখন উঠার দরকার কী ?
মিলি এমন কান্নাকাটি শুরু করল যে আখলাক সাহেবকে বাধ্য হয়ে পানি থেকে উঠতে
হলো।

৭

সাইকিয়াট্রিস্টের নাম জয়েনউদ্দিন। আখলাক সাহেব এত বেঁটে মানুষ তাঁর জীবনে দেখেন
নি। ভদ্রলোক চেয়ারে বসে আছেন। টেবিলের উপর দিয়ে তাঁর চোখ দু'টি শুধু বের হয়ে
আছে। পাগল পাগল ধরনের চোখ। ভদ্রলোক বসে আছেন একটা রোলিং চেয়ারে। স্থির
হয়ে বসে নেই, সারাক্ষণ এদিক ওদিক করছে। চিড়িয়াখানার পশুদের যারা দেখাশোনা করে
তাদের চেহারা এবং স্বভাব চরিত্র খানিকটা চিড়িয়াখানার পশুদের মতো হয়ে যায়। মিরপুর
চিড়িয়াখানায় যে লোকটা জিরাকের দেখাশোনা করে তার গলাটা প্রতিবছর কিছুটা করে
লম্বা হয়। সাইকিয়াট্রিস্টরা পাগলের চিকিৎসা করেন, কাজেই তাদের হাব ভাব পাগলদের
মতোই হবে বলাই বাহুল্য। আখলাক সাহেব বেশ কৌতূহল নিয়ে সাইকিয়াট্রিস্ট
জালালউদ্দিনের চেয়ারে নড়াচড়া দেখছেন। ভদ্রলোক যেমন স্থির হয়ে বসতে পারেন না
তেমনি স্থির চোখে তাকাতেও পারেন না। মনে হয় দু'টা মাত্র চোখ থাকায় তাঁর খুব
অসুবিধা হচ্ছে। গোটা চারেক চোখ থাকলে সুবিধা হতো। আরাম করে এক সঙ্গে চারদিক
দেখতে পারতেন।

তাহেব চেয়ারে বসতে বসতে বলল, জালাল সাহেব আমি পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি
আমার স্ত্রী। বড়ভাই, নাম আখলাক হোসেন। অধ্যাপনা করেন। আপনাকে তার কথা
বলেছিলাম।

জালাল সাহেব হাসি মুখে বললেন, ও আচ্ছা আচ্ছা। বলেছিলেন তো বটেই। উনাব
কাছেই এন্টা ভূত আসে। গল্প শুজব করে। তাই না ? ভূতের নাম লেখক সাতচল্লিশ।

আখলাক সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, সাতচল্লিশ না চুয়াত্তর।

ও আচ্ছা, আমার আবার সংখ্যা মনে থাকে না। আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?
বসুন। আরাম করে বসুন। আজ অবশ্য আমার হাতে সময় খুব কম। আমার মেয়ের
জন্মদিন। এখান থেকে সরাসরি গুলশানে একটা খেলনার দোকানে যাব। খেলনা
কিনব। কী কিনব ভেবে পাচ্ছি না। গত আধ ঘণ্টা ধরে শুধু তাই ভাবছি। তার পছন্দের
খেলনা হচ্ছে বারবি ডল। গোটা বিশেক তার আছে বলে আমার ধারণা। আরো গোটা
বিশেক প্লেগেও শখ মিটবে না। বারবি ডলই আজ আরেকটা কিনব। যাহা বাহান্ন তাহা
একাশি।

আখলাক সাহেব বসলেন। সাইকিয়াট্রিস্টের মাথা যে পুরোপুরি খরাপ তা বোঝাই
যাচ্ছে। অ কারণে এতগুলি কথা বলল। যাহা বাহান্ন তাহা একাশি আবার কী ?

সাইকিয়াট্রিস্ট আখলাক সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার ভূতের ব্যাপারটা
কী পরিষ্কার করে বলুন তো। কিছুই বাদ দেবেন না। তবে সংক্ষেপ করে বলবেন।
হাতে এক নম সময় নেই। আজ আমার মেয়ের জন্মদিন। একটা খেলনা কিনতে হবে।
বারবি ডল।

আখলাক সাহেব চুপ করে রইলেন। লোকটার সঙ্গে তাঁর কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।
যে লোক সারাক্ষণ এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, এক মিনিটের মধ্যে দু'বার মেয়ের জন্মদিনের
কথা বলছে তার সঙ্গে কথা বলবেন কী ?

ভূতটা কি রোজ আপনার কাছে আসে ?

মাঝে মাঝে আসে।

দেখতে কেমন ?

দেখতে ভূতের মতো।

সেই ভূতের মতোটাই কেমন ? লম্বা, না বেঁটে। কালো না সাদা ? বড় বড় দাঁত না
ছোট ছোট দাঁত ? মাথায় চুল আছে না টাক মাথা ?

জানি না।

জানেন না কেন ? আপনি কি তাকে দেখেন নি ?

জি না। অন্ধকারে সে আসে। অন্ধকারে তাকে দেখব কীভাবে ? আমি তো বিড়াল না
যে অন্ধকারে দেখব।

তাতো ঠিকই। আচ্ছা ভূতটা সম্পর্কে কিছু বলুন তো।

কী বলব ?

তার স্বভাব চরিত্র। তার আচার-আচরণ। সে বোকা না বুদ্ধিমান- এইসব আর কী ?
আপনার কি ধারণা সে বুদ্ধিমান ?

সে যথেষ্টই বুদ্ধিমান।

আপনাব চেয়েও বুদ্ধিমান ?

সেটা বুঝব কী করে ?

সহজেই বোঝা যায়। যেমন ধরুন একটা ধাঁধা আপনাকে জিজ্ঞেস করা হলো। আপনি
সেটা পারলেন না। কিন্তু ভূতকে জিজ্ঞেস করা মাত্র সে পারল। তখন বুঝতে হবে ভূতটা
বুদ্ধিমান।

আমি ভূতকে কখনো কোনো ধাঁধা জিজ্ঞেস করি নি।

পরের বার যখন দেখা হবে, দয়া করে জিজ্ঞেস করবেন। এমন একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস
করবেন যার উত্তর আপনার জানা নেই।

উত্তর জানা নেই এরকম ধাঁধা আমি নিজেও জানি না। আমি যে সব ধাঁধা জানি তার
উত্তরও জানি।

আমি আপনাকে একটা ধাঁধা শিখিয়ে দিচ্ছি। আমার ধারণা এই ধাঁধার উত্তর আপনি
জানেন না।

বাঘের মতো লাফ দেয়

কুকুরের মতো বসে।

লোহার মতো জলে ডুবে

শোলার মতো ভাসে।।

অর্থাৎ অদ্ভুত একটা জিনিস যে বসে কুকুরের মতো, কিন্তু লাফ দেয় বাঘের মত।

পানিতে লোহার মতো টুপ করে ডুবে যায়, আবার শোলার মতো অবলীলায় ভাসে। আপনি কি জানেন জিনিসটা কী ?

জি না।

তাহের সাহেব, আপনি জানেন ?

জি না।

সাইকিয়াট্রিস্ট হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছেন। মনে হচ্ছে কঠিন একটা ধাঁধা দিতে পেরে তিনি আনন্দিত। আখলাক সাহেবের মনে হলো তাঁর আগে এই ভদ্রলোকের চিকিৎসা হওয়া উচিত।

আখলাক সাহেব।

জি।

আপনার ভূতের ব্যাপার সবটাই আমি জানি। তাহের সাহেব আমাকে খুব গুছিয়ে সব বলেছেন। তবু আপনার মুখ থেকে শোনা দরকার। এত লোক থাকতে ভূতটা আপনার কাছে আসে কেন বলুন তো ?

ও একটা সমস্যায় পড়েছে। সমস্যার সমাধানের জন্যে আমার কাছে আছে।

সমস্যাটা কী ?

ওর বাবা-মা ওকে বিয়ে দিতে চাচ্ছে, ও বিয়ে করতে চাচ্ছে না। ও ঠিক করেছে চিরকুমার থাকবে।

আমি যতদূর জানি আপনারও একই সমস্যা, তাই না ? আপনার আত্মীয়স্বজন আপনাকে বিয়ে দিতে চাচ্ছে, আপনি রাজি না। আপনিও ঠিক করেছেন চিরকুমার থাকবেন। ঠিক তো ?

আখলাক সাহেব চুপ করে রইলেন। সাইকিয়াট্রিস্ট বললেন, আপনার সমস্যা খুব সহজ সমস্যা। আপনার অবচেতন মনের চিন্তা-ভাবনাই ভূত হিসেবে প্রকাশ পাচ্ছে। অন্য কিছু না। সময় থাকলে আরো পরিষ্কার করে আপনাকে বুঝিয়ে দিতাম। আজ আমার একটু কাজ আছে, আপনাকে বেশি সময় দিতে পারছি না। আজ আমার মেয়ের জন্মদিন। না গেলেই না। সাতটার সময় যাওয়ার কথা ছিল। আটটা বেজে গেছে। আমাকে একটা খেলনার দোকানে যেতে হবে। খেলনা কিনতে হবে। আর দেরি করা যাবে না। আখলাক সাহেব, আপনি পরেরবার আসবেন। আপনার ভূত সমস্যার সমাধান করে দেব। ভালো কথা ধাঁধার উত্তর ভূতের কাছ থেকে নিয়ে আসবেন।

আখলাক সাহেব বললেন, জি আচ্ছা। তার মাথার মধ্যে ধাঁধা ঘুবতে লাগল।

বাঘের মতো লাফ দেয়

কুকুরের মতো বসে।

লোহার মতো জলে ডুবে

শোলার মতো ভাসে।।

আশ্চর্য তো! জিনিসটা কী ?

সাইকিয়াট্রিস্টের চেয়ার থেকে বের হয়ে তাহের বলল, ভাই সাহেব, আপনি দয়া করে আজ রাতটা আমার বাসায় থাকুন। আখলাক সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, কেন ?

আপনার বাসায় কাজের লোক নেই। মোতালেব চলে গেছে, রান্না বান্না...

এইসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

তারচেয়ে বড় কথা ভূতটা আবারো আপনাকে বিরক্ত করবে। আপনার এখন বিশ্রাম দরকার। ঘুম দরকার। ভূতটা তো আর আমার বাসা চেনে না। আমার বাসায় থাকলে সে আর আপনাকে বিরক্ত করতে পারবে না। ওর সঙ্গে তাহলে আর আপনার দেখা হবে না। আপনার ঘুমে ডিসটার্ব করতে পারবে না।

আখলাক সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, বোকার মতো কথা বলো না তো তাহের। ভূতটার সঙ্গে দেখা হওয়া আমাব বিশেষ দরকার। ওকে ধাঁধার উত্তর জিজ্ঞেস করতে হবে। তা ছাড়া সে দেখতে কেমন তাও জানি না। দেখা দরকার।

আখলাক সাহেব রাতে খাওয়া দাওয়ার পর শুয়েছেন। নিজে কিছু রান্না করেনি। হোটেল থেকে খাবার নিয়ে এসেছেন। অতি অখাদ্য খাবার। মনে হচ্ছে ফুড পয়জনিং হয়ে যাবে। আখলাক সাহেব ভূতের জন্যে অপেক্ষা করছেন। ভূত আসছে না। রুম বৃষ্টি শুরু হলো। আখলাক সাহেব চিন্তিত বোধ করছেন। ঝড় বৃষ্টিতে ভূতরা আসে কি না তা তিনি জানেন না। বৃষ্টিতে তাদের কি অসুবিধা হয়? তাদের কি ছাতা আছে? অনেক কিছুই তিনি তাদের সম্পর্কে জানেন না। ভূত সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। ‘ভূত-এনসাইক্লোপিডিয়া’ জাতীয় একটা বই থাকা দরকার ছিল। বৃষ্টির শব্দে তাঁর ঘুম এসে যাচ্ছে। চোখ মেলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে।

স্যার জেগে আছেন?

আখলাক সাহেব পাশ ফিরলেন। ভূতের কথা শুনে তাঁর ভালো লাগছে। তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। তাঁর চোখ থেকে ঘুম চলে গেল।

স্যারের কাঁচা ঘুম ভাঙলাম না তো?

না, আমি জেগেই ছিলাম। তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

শুনে বড় ভালো লাগল স্যার। আপনার কোনো খেদমত কি করতে পারি?

প্রথমে একটা ধাঁধার জবাব দাও, নয় তো কথায় কথায় ভুলে যেতে পারি। ধাঁধাটা হচ্ছে—

বাঘের মতো লাফ দেয়

কুকুরের মতো বসে।

লোহার মতো জলে ডুবে

শোবার মতো ভাসে।

এটা স্যার ব্যাঙ। ব্যাঙ বসে ঠিক কুকুরের মতো। লাফ দেয় বাঘের মত। পানিতে ডুবতে পারে আবার ভাসতেও পারে। ধাঁধা জিজ্ঞেস করছেন কেন স্যার?

আছে একটা ব্যাপার।

আমাকে বলা যাবে না?

এক ভদ্রলোক আমাকে ধাঁধাটা জিজ্ঞেস করেছিল, আমি উত্তর দিতে পারি নি।

এতে কি স্যার আপনার মন খারাপ হয়েছে?

একটু হয়েছে। এখন মনে হচ্ছে আমার বুদ্ধি ভূতদের চেয়ে কম।

সব ভূতের চেয়ে কম না স্যার, কিছু কিছু ভূতের চেয়ে কম। যেমন ধরুন আমার চেয়ে কম। তাতে লজ্জা বা অস্বস্তি বোধ করার কিছু নেই। ভূতদের মধ্যে আমার জ্ঞান বেশি। আবার মহামূর্খ ভূতও আছে।

তোমাদের মধ্যে পাগল নেই ?

পাগল ?

হ্যাঁ পাগল। মানুষের মধ্যে যেমন পাগল আছে, পাগলের ডাক্তার আছে, তোমাদের মধ্যে সেরকম কিছু নেই ?

আছে। মানুষের সঙ্গে আমাদের তেমন কোনো বেশকম নেই। আপনারা যেমন কারো উপর রেগে গেলে বলেন, ‘ব্যাটা ভূত’; আমরাও তেমনি কোনো ভূতের উপর রেগে গেলে বলি, ‘ব্যাটা মানুষ’।

তাই নাকি ?

জি স্যার। এ ছাড়াও আরো মিল আছে— যখন আপনারা খুব ব্যস্ত থাকেন তখন বলেন— ‘হাতে সময় নেই’। আমরা বলি— ‘পায়ে সময় নেই’।

আশ্চর্য তো।

আশ্চর্য হবার কিছুই নেই স্যার। ভূত ও মানুষ এক সুতায় গাঁথা। এই জন্যেই মহাকবি— ‘ক— ৫০০০০০০০’ বলেছেন—

ভূ মা

এ মা—

আখলাক সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, এর মানে কী ?

‘ভূ মা’ মানে হচ্ছে— ভূত ও মানুষ। ‘এ মা’ মানে হচ্ছে— এক সুতায় গাঁথা মালা। অসাধারণ একটা কবিতা না স্যার ?

বুঝতে পারছি না। আমি আবার কবিতা ভালো বুঝি না।

আখলাক সাহেব বললেন, আরেকটা কী যেন কথা তোমাকে জিজ্ঞেস কবতে চেয়েছিলাম। এখন মনে পড়ছে না।

চারপায়ে একটু হাঁটাইটি করুন, মনে পড়বে।

ও হ্যাঁ মনে পড়েছে। ভূত মেয়েটার খবর কী ? ফা-৪০।

ওর কথা মনে করিয়ে মেজাজটা খারাপ করে দিলেন। আমার জীবন সে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। মহাকবি ‘ক— ৫০০০০০০০’ এর ভাষায়,

জী য়

জী ময়—

মানে কী ?

মানে হচ্ছে— ‘জীবন দুঃখময়, জীবন মহাদুঃখময়’। ফা-৪০ এখন স্যার আমার পিছ ছাড়ছে না। এই যে আমি আপনার কাছে এসেছি সেও এসেছে। জানালার ওপাশে পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের প্রতিটি কথা শুনছে। স্যার, যাকে বলে মহাসমস্যা। আপনি কি তার সঙ্গে একটু কথা বলবেন ?

আমি কী বলব ?

একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলবেন। ওকে ভেতরে আসতে বলব স্যার ?

বলো।

না, আপনিই বলুন। আমার ওর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করে না। 'ফা-৪০' বলে ডাক দিন চলে আসবে।

ওকে কী বলব সেটাই তো বুঝতে পারছি না।

আমাকে যেন মুক্তি দেয় এইটুকু বলবেন। এর বেশি কিছু আমি চাই না। আমার জীবন রক্ষা করুন স্যার। আমি চিরঋণী হয়ে থাকব। আমি স্যার এখন চলে যাচ্ছি। ওর সঙ্গে এক ঘরে থাকা আমার সম্ভব না। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আমি মরে যাব। যাবার আগে একটা কথা বলে যাই সার। এই মেয়ে কিন্তু মহাবুদ্ধিমতী। যুক্তিতে তার সঙ্গে পারা কঠিন। তার সঙ্গে কথাবার্তা খুব সাবধানে বলতে হবে।

আখলাক সাহেব ডাকলেন, ফা-৪০।

জানালায় পর্দা একটু কাঁপল। আখলাক সাহেবের মনে হলো তাঁর মশারির পাশে কে ফেন এসে বসল। তাঁর মেজাজ এখন কিছুটা খারাপ, এ-কী যন্ত্রণা! তাঁর নিজের সমস্যারই কূল কিনারা নেই। তাঁকে দেখতে হচ্ছে ভূতদের সমস্যা।

তুমি কি ফা-৪০ ?

আমি ফা-৪০ হব কেন ? আমার নাম হিহিলা। ফা-৪০ কারো নাম হয় ?

তবে যে আমি শুনলাম...

ওব কাছে যা শুনছেন সবই ভুল শুনছেন। ওর মাথাটা হয়ে গেছে খারাপ। নিজের মাথা তো খাবাপ হয়েছেই, অন্যের মাথাও খারাপ করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। আপনারটাও প্রায় খাবাপ করে এনেছে।

আমারটাও খারাপ করে এনেছে ?

অবশ্যই। চাবপায়ে হাঁটাইটি করছেন। এটা মাথা খারাপের লক্ষণ না ? আপনি কি গরু না ছাগল যে চারপায়ে হাঁটবেন ? ডাবউইনের থিওরি তো আপনি পড়েছেন, পড়েন নি ?

আখলাক সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, তেমনভাবে পড়ি নি। তবে মোটামুটি জানি।

মোটামুটি জানলে তো আপনার জানা থাকার কথা— প্রাণী বিবর্তনের ভেতর দিয়ে মানুষ এসেছে। তার পূর্বপুরুষ এক সময় চারপায়ে হাঁটত। আপনি সেখানেই ফিরে যাচ্ছেন। এটা একটা লজ্জাব কথা না ?

আখলাক সাহেব দারুণ অস্বস্তি নিয়ে খুকখুক করে কাশতে লাগলেন। হিহিলা মেয়েটি তো আসলেই জটিল। ওব সঙ্গে আরো সাবধানে কথা বলতে হবে। হিহিলা বলল, ও কেমন পাগল সেটা কি স্যার আপনি দয়া করে একটু শুনবেন ?

বলো।

রোজ সে আপনার কাছে আসছে। আপনাকে বিরক্ত করছে। আবার ওঁদিকে একটা বই লিখছে, যে বইয়ের বিষয়বস্তু হচ্ছে— মানুষ বলে কিছু নেই, মানুষ হলো ভূতের মাথার কল্লা না।

বলো কী!

যা সত্যি সেটাই স্যার আপনাকে বলছি।

আখলাক সাহেব রীতিমত ধাঁধায় পড়ে গেলেন। কী বলবেন কিছু বুঝতে পারলেন না। হ্রিহিলা বলল, ওর মাথায় স্যার পদার্থ বলে এখন কিছুই নেই। আপনাকে নিয়ে সবাই যেমন হাসাহাসি করে, ওকে নিয়েও করে। আমার এমন কষ্ট হয়!

আখলাক সাহেব বললেন, তুমি একটু ভুল বলেছ হ্রিহিলা, আমাকে নিয়ে কেউ হাসাহাসি করে না।

অবশ্যই আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। কলেজ থেকে আপনাকে ছুটি দিয়েছে। আপনাকে পাগলের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছে। নিয়ে যায় নি?

হুঁ।

আপনাকে নিয়ে শুধু যে হাসাহাসি করে তাই না, আপনাকে ভয়ও করে।

ভয় করে?

অবশ্যই ভয় করে।

আপনার কাজের ছেলে মোতালেব আপনাকে ছেড়ে চলে গেল কেন? আপনাকে ভয় পাচ্ছে বলেই চলে গেছে।

হুঁ।

এখন আপনার যারা অতি কাছের তারা আপনাকে ভয় পাচ্ছে। কিছুদিন পরে দেখা যাবে সবাই ভয় পাবে। ভয় হচ্ছে সংক্রামক। সবাই আপনাকে ভয় পেতে শুরু কবলে আপনিও সবাইকে ভয় পেতে থাকবেন।

হুঁ।

আপনার স্যার মহাদুঃসময়।

হুঁ।

আপনার এখন কী করা উচিত তা কি স্যার জানেন?

না।

প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত 'ভোভোহা'র কাছ থেকে দূরে থাকা।

ভোভোহা কে?

যাকে আপনি লেখক-৭৪ নামে চেনেন সে-ই হলো ভোভোহা। এটাই তাব আসল নাম। ভূতদের নামকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে সে যা বলেছে সবই বানানো। তার উর্বর মাথার কল্পনা। আমার নাম দিয়েছেন ফা-৪০, ছিঃ ছিঃ কী লজ্জা।

আখলাক সাহেব কী বলবেন ভেবে পেলেন না। মাথা চুলকাতে লাগলেন। মেয়েটাকে তার পছন্দ হচ্ছে। ভূত হলেও চমৎকার মেয়ে। ঠাণ্ডা মাথার মেয়ে।

স্যার।

হুঁ।

আপনাদের শহরের ট্রাকের পেছনে যেমন লেখা থাকে— ১০০ গজ দূরে থাকুন। আপনিও অবশ্যই 'ভোভোহা'র কাছ থেকে ১০০ গজ দূরে থাকবেন। নয় তো আপনার ভয়াবহ বিপদ।

দূরে থাকব কী করে? রাত হলেই তো সে চলে আসবে।

সেই সমস্যার সমাধানও স্যার আছে।

বলো, কী সমাধান।

আমার সমাধান কি আপনি শুনবেন? আমি আপনার কে?

আখলাক সাহেব বললেন, তুমি আমার মেয়ের মতো। বলে নিজেই লজ্জায় পড়ে গেলেন। ভৃত্যকে তিনি বলছেন, তুমি আমার মেয়ের মতো। তাঁর মাথা তো আসলেই খরাপ হয়ে গেছে। হিহিলা গাঢ় গলায় বলল, মেয়ে যখন বলেছেন তখন আপনার মঙ্গল দেখার দায়িত্ব আমার। চাচাজান, আপনি আমার কথা শুনুন। আপনার ভৃত্য মেয়ের কথা আপনাকে শুনতেই হবে।

আখলাক সাহেব বললেন, বলো মা কী কথা।

এটা বলে তিনি আবারো চমকালেন। একটা ভৃত্য মেয়েকে তিনি মা ডাকছেন, কী আশ্চর্য কথা।

চাচাজান।

হুঁ।

আপনি একটা বিয়ে করুন চাচাজান।

সে কী?

সে কী ফেকী বললে চলবে না। আপনার বোন মিলি যে মহিলার কথা বলছে তাঁকে আমি দেখেছি— অতি ভালো একজন মহিলা... তাঁকে বিয়ে করলে আপনি খুব সুখী হবেন।

আখলাক সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, এইসব ফালতু কথা বন্ধ কর তো।

ফালতু কথা আমি বন্ধ করব না। আপনি রাজি না হলে আমি কিন্তু কাঁদতে শুরু করব। ভৃত্য মেয়েব কান্না সামলানো খুব কঠিন। আমরা মানুষ মেয়ের চেয়ে অনেক বেশি কাঁদতে পারি।

এ তো দেখি ভালো যন্ত্রণায় পড়া গেল।

হিহিলা হাসতে হাসতে বলল, ভৃত্য কন্যাকে মেয়ে ডেকেছেন, যন্ত্রণা তো হবেই।

আখলাক সাহেব গিড়বিড় করে বললেন, ভোভোহার সমস্যা মিটাতে গিয়ে নিজে কী সমস্যায় পড়ে গেলাম।

ওব সমস্যা নিয়ে আপনাকে মোটেই ভাবতে হবে না। আপনার সমস্যা যেমন আমি দেখব, ওরটাও আমি দেখব।

এই বয়সে বিয়ে, লোকে বলবে কী?

বলুক যার যা ইচ্ছা। সারাটা জীবন একা একা কাটাবেন? আপনি সারাজীবন অনেক কষ্ট করেছেন। আর আপনাকে কষ্ট করতে দেব না।

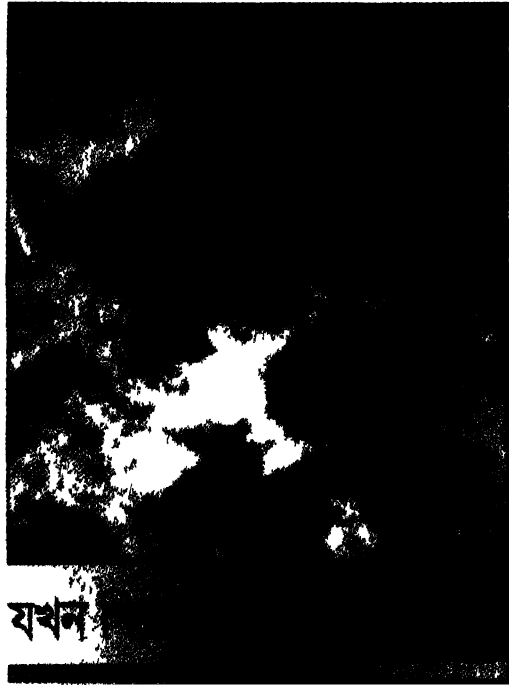
আখলাক সাহেব হিহিলার কান্নাব শব্দ শুনতে পেলেন। ভৃত্য মেয়ে কিন্তু কাঁদছে ঠিক মানুষের মেয়ের মতো। কান্না শুনে তাঁর মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তিনি গাঢ় গলায় বললেন, কাঁদিস না তো মা। হিহিলা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আরো কাঁদব। চিৎকার করে কাঁদব।

বৈশাখ মাসের বার তারিখ আখলাক সাহেবের বিয়ে হলো। বেশ ধুমধাম করে বিয়ে। আখলাক সাহেবের কঠিন নিষেধ সত্ত্বেও মিলি কার্ড ছাপিয়ে মহা উৎসাহে সবাইকে বিলি করল। আখলাক সাহেবের লজ্জার সীমা রইল না। তবে একটা কার্ডে তিনি হিহিলা ও ভোভোহার নাম লিখে রাতে ঘুমাতে যাবার আগে টেবিলের উপর রেখে দিলেন। সকালে উঠে সেই কার্ড আর দেখলেন না।

আখলাক সাহেবের ধারণা ওরা বউ-ভাতেও এসেছিল। তের তারিখ রাতে সোহাগ কমিউনিটি সেন্টারে বউ-ভাত হলো। যখন সবাই খাওয়া দাওয়া করছে তখন ইঠাৎ ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। সারা শহরে ইলেকট্রিসিটি আছে শুধু কমিউনিটি সেন্টারে নেই। ওদের নিজস্ব জেনারেটর আছে। অনেক চেষ্টা করেও সেই জেনারেটর চালু করা গেল না। মিনিট দশেক পর আপনা-আপনি সব বাতি জ্বলে উঠল।

তারপর অনেক দিন কেটে গেছে, আখলাক সাহেবের একটি মেয়ে হয়েছে। সেই মেয়েও বড় হয়েছে, এখন সে অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়ে ক্লাশ থ্রিতে পড়ে। মেয়েকে আখলাক সাহেব অসম্ভব আদর করেন। মাঝে মাঝে বিচিত্র একটা নামে তিনি মেয়েকে ডাকেন। সেই নামটা হলো— হিহিলা। কলেজ থেকে ফিরে মধুর গলায় ডাকবেন, আমার হিহিলা মা কই গো ?

আখলাক সাহেবের স্ত্রী খুব রাগ কবেন। এত সুন্দর সুন্দর নাম থাকতে পরীর মতো রূপবতী মেয়েকে কেউ হিহিলা ডাকে ? নিজের মেয়েকে আদর করার সময় ভৃত মেয়ের কথাও তাঁর মনে পড়ে যায়। সেই মেয়েকেও তাঁর খুব আদর করতে ইচ্ছা করে।



কাজটা যত জটিল হবে ভেবেছিলাম ততটা জটিল হলো না।

কোনোরকম ঝামেলা ছাড়াই কাজ শেষ হলো। ঘড়িতে এখন বাজছে আটটা কুড়ি মিনিট। শুরু করেছিলাম আটটা পাঁচে। পনেরো মিনিট সময় লাগল। জলজ্যান্ত একটা মানুষ পনেরো মিনিটে মেরে ফেলা সহজ ব্যাপার নিশ্চয়ই নয়। কঠিন ব্যাপার। তবে রুবা নিজেই ব্যাপারটা আমার জন্যে সহজ করে দিয়েছে।

আজ আমাদের একটা বিয়ের দাওয়াতে যাবার কথা ছিল। রুবির সাজগোজ শুরু হলো বিকেল থেকে। শাড়ি পরে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। পছন্দ হয় না, আবার বদলায়। আমাকে কয়েকবার জিজ্ঞেস করল কেমন দেখাচ্ছে। আমি প্রতিবারই বললাম— খুব সুন্দর লাগছে। আসলেই সুন্দর লাগছিল। শেষ পর্যন্ত বেগুনি রং একটা শাড়ি তার পছন্দ হলো। সেই শাড়ি পরার পর দেখা গেল, চায়ের দাগের মতো কী একটা দাগ লেগে আছে। কিছুতেই সেই দাগ আড়াল করা যাচ্ছে না। সে ঠিক করল বিয়েতে যাবে না। রুবির মাথা ধরল তখন। শাড়িতে দাগ পাওয়া না গেলে মাথা ধরত না। আমাদের বিয়েবাড়িতে যাওয়া বাতিল হতো না। আমার কাজটা পিছিয়ে যেত।

রুবা মুখ শুকনো করে বসে বইল বাবান্দায়।

আমি বললাম, দুটা সিডাকসিন খেয়ে চোখ বন্ধ কবে শুয়ে থাক। মাথাধরা সেরে যাবে। দুটা সিডাকসিন একটা প্যারাসিটামল। সে বাধ্য মেয়ের মতো তাই করল। ঘরে প্যারাসিটামল ছিল না। আমিই ডিসপেনসারি থেকে এনেছিলাম। সে ওষুধ খেয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। আমি বললাম, মাথা টিপে দেব ? সে বলল, দাও। আমি বসলাম তার মাথার পাশে। সে ঘুমিয়ে পড়ল দেখতে দেখতে। এখন আমার কাজ হচ্ছে বালিশটা মুখের উপর চেপে ধরা। এই কাজটা পায়ের দিকে বসে কখনো করতে নেই। সম্ভাবনা শতকরা একশ ভাগ, জীবন বাঁচানোর জন্যে শেষ মুহূর্তে প্রচণ্ড লাঠি বসাবে। কাজেই বালিশ দিয়ে মুখ চেপে ধরার আগে বসার জায়গাটা ঠিক করে রাখতে হবে। সবচে' ভালো হয় কাজটা যদি দাঁড়িয়ে করা যায়। দাঁড়িয়ে থেকে যতটা চাপ মুখের উপর দেয়া যাবে বসে থেকে ততটা দেয়া যাবে না। তারপরেও সম্ভাবনা থাকে যে, 'ভিকটিম' হাত পা ছুঁড়ে নিজেকে মুক্ত করে নেবে। একবার যদি কোনোক্রমে নিঃশ্বাস নিয়ে ফেলতে পারে তাহলেই সর্বনাশ। বুদ্ধিমানরা সেদিকটা খেয়াল রেখে অন্য ব্যবস্থাও হাতেব কাছে রাখেন, যাকে বলে ব্যাক আপ সিস্টেম। আমিও বেখেছিলাম। তার প্রয়োজন পড়ে নি।

ঐ তো রুবা আড়াআড়িভাবে বিছানায় পড়ে আছে। চোখ খোলা, যে কেউ দেখলে ভাববে শুয়ে আছে। আজ তার পা এত বেশি ফর্সা লাগছে কেন ? টিউব লাইটের জন্যে ? নাকি মৃত্যুর পর পর মানুষ ফর্সা হতে শুরু করে ? এ ব্যাপারটা আমার জানা নেই। তবে মৃত্যুর পর পর রিগোরাস মর্টিস বলে একটা ব্যাপার হয়। শরীরের মাংসপেশি শক্ত হতে শুরু করে। সেটাও এত চট করে হবে না। সময় লাগবে।

আমি উঠে গিয়ে ওর শাড়ি ঠিক করে দিলাম। মাথার নিচে বালিশ দিয়ে গায়ে চাদর টেনে দিলাম। একটা হাত কোলবালিশের উপর দিয়ে দিলাম। হঠাৎ কেউ এসে পড়লে ভাববে, ঘুমুচ্ছে। তবে তার শোয়াটা ঠিক হয় নি। 'সরোজিনি শুয়ে আছে জানি না সে শুয়ে আছে কিনা।' কার কবিতা যেন এটা? যারই হোক, এখন কবিতার সময় নয়। 'কবিতা আজকে তোমায় দিলাম ছুটি।' এটা কার, সুকান্তের?

আমি বিছানায় বসলাম। মাথা খানিকটা এলোমেলো লাগছে। এলোমেলো লাগছে বলেই কবিতার লাইন মনে আসছে। একটু বোধহয় রেন্ট দরকার। কাবার্ডে ব্রান্ডির একটা বোতল আছে। আমার না, রুব্বার। তার শরীর খুব খারাপ করল, তখন ডাক্তার তাকে খেতে দিল। তারপর কার কাছে যেন শুনল ব্রান্ডি হচ্ছে কড়া ধরনের মদ—বাস, খাওয়া বন্ধ। বোতলের পুরোটাই আছে, খানিকটা গলায় ঢেলে দিলে এলোমেলো ভাব কাটবে। আমি কাবার্ডের দিকে যেতে গিয়েও গেলাম না। এলকোহল যা করবে তা হলো সাময়িক কিছু শক্তি। তারপরই আসবে অবসাদ। I can not take any chance. কোনো চাপ নেয়া যাবে না। এখনো প্রচুর কাজ বাকি আছে।

একটা মানুষ মারা তেমন কোনো জটিল ব্যাপার না। ডেডবর্ডি গতি করাই হচ্ছে সবচে' জটিল কাজ। তবে সব ব্যবস্থা করা আছে। আমি হট কবে কিছু কারি না, যা করি ভেবে-চিন্তে করি। রুব্বাকে কী কবে মারব তা নিয়ে আমি খুব কম হলেও এক মাস ভেবেছি। তার ডেডবর্ডি কী করে সরাব তা নিয়ে ভেবেছি প্রায় এক বছর। অধিকাংশ খুনী ধরা পড়ে ডেডবর্ডি সরাতে গিয়ে। খুনের পরে পরেই এক ধরনের ল্যাথার্জি এসে যায়। নার্ভ ফেল করে। তখন খুব তাড়াহুড়া করতে ইচ্ছা করে। স্বামী হয়তো স্ত্রীকে গলা টিপে মারল—মানুষের কাছে প্রমাণ করতে চায়, ফাঁস নিয়ে মরেছে। ডেডবর্ডি সিলিং ফ্যানের সঙ্গে বুলিয়ে দিল, কিন্তু দড়ির গিটটা দিল ঘাড়ের দিকে। সে ভুলে গেছে একজন মানুষ ফাঁস নেবাব সময় দড়ির গিট ঘাড়ের কাছে দেবে না। হাত পেছন দিকে নিয়ে গিট দেয়া খুব মুশকিল। সত্যিকার ফাঁসির আসামির গিট থাকবে সামনের দিকে।

অনেকে আবার খুন করার পর ডেডবর্ডির মুখে খানিকটা বিষ ঢেলে দেয়। হাতের কাছে যা পায় তাই। ইঁদুর-মারা বিষ র্যাটম, তেলাপোকা মারাব বিষ রোচকিলার। এরা একটা জিনিস জানে না যে সুরতহালের সময় মুখে কী বিষ আছে তা দেখা হয় না। ভিসেরার বিষ পরীক্ষা করা হয়। সবকিছু ঠিকঠাক মতো করে শেষে ফেঁসে যায়। যাকে বলে তীরে এসে তরী ডুবা। আমার সেই ভয় নেই। আমি মানুষ হিসেবে অত্যন্ত মেথডিকাল। একাউন্টেন্টরা সাধারণত মেথডিকাল হয়ে থাকে।

আমি সিগারেট খাই না কিন্তু আজকের দিনের জন্য একটা সিগারেট কিনে রেখেছিলাম। বেনসন এন্ড হেজেস। সিগারেট ধরলাম। না, হাত কাঁপছে না। হাত স্থির আছে। তৃষ্ণা বোধ হচ্ছে। ফ্রিজ খুলে হিম-শীতল এক গ্রাস পানি খেলাম। যদিও ঠাণ্ডা পানি খাওয়া আমার জন্যে নিষিদ্ধ। আমার টনসিলাইটিসের সমস্যা আছে। ঠাণ্ডা কিছু খেলেই গলা খুস খুস করতে থাকে। প্রথমে খুস খুস, তারপর কাশি। কয়েক দিন কাশি হবার পর গলা বসে যায়। কথা বলতে হয় হাঁসের মতো ফ্যাসফ্যাসে গলায়।

টেলিফোন বাজছে। টেলিফোন ধরাটা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছি না। প্রথম কথা, এই টেলিফোন আমার জন্যে বাজছে না। আমাকে কেউ টেলিফোন করে না। আমিও করি না। নিশ্চয়ই রুবার টেলিফোন। তার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা কত তা সে নিজেও বোধহয় জানে না। এরা সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা সব সময় টেলিফোন করছে। এর মধ্যে একজন আছে যে রাত বারটার পর টেলিফোন করে। মিতা কিংবা রীতা বোধহয় নাম। ঐ মেয়েটা চাকর-বাকরের সমস্যা ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে কথা বলে না। এবং রুবা এমন আগ্রহ নিয়ে শুনে যে মনে হয় কোনো ঐশীবাণী শুনছে।

টেলিফোন বেজেই যাচ্ছে। আমি উঠে টেলিফোন ধবলাম। হ্যালো বলার আগেই ওপাশ থেকে বলল, রুবা ভাবিকে একটু দিন তো। সে বুঝল কী করে যে রুবা টেলিফোন ধরে নি, আমি ধরেছি? টেলিফোনের ব্যাপারে ওদের সিন্ধুথ সেন্স সম্ভবত খুব প্রবল। অল্প বয়েসী মেয়ের গলা। আমার সঙ্গে আগে কখনো কথা হয় নি। আমি অনায়াসে বলতে পারতাম, রং নাশ্বার। সেটা বললে ভুল করা হতো। কারণ ঐ মেয়ে আবার টেলিফোন করত। মেয়েদের দৈর্ঘ্য সীমাহীন। একই নাশ্বারে এক লক্ষবার টেলিফোন করেও তারা ক্লান্ত হয় না।

হ্যালো, রুবা ভাবি কি বাসায় নেই?

আছে, বাসায় আছে।

উনাকে কাইন্ডলি একটু ডেকে দিন। বলুন লীনা টেলিফোন করেছে।

ও তো ঘুমিয়ে পড়েছে।

এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লেন।

ওর শরীবটা খারাপ। মাথা ধবেছিল। একটা প্যারাসিটামল আব দু'টা সিডাকসিন খেয়ে গুয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছে।

উনার সঙ্গে খুব দরকার ছিল।

খুব দরকার থাকলে ডেকে দেই? অবশ্য এইমাত্র ঘুমিয়েছে, ডাকলে রেগে যেতে পারে। ডাকব?

না থাক।

জরুরি কিছু থাকলে আমাকে বললে আমি ওকে বলতে পারি।

আপনি কি মিজান ভাই?

হ্যাঁ।

স্নামালিকুম মিজান ভাই।

ওয়ালাইকুম সালাম।

আপনি কি আমাকে চিনেছেন? আমি বেনুর ছোটবোন। আমার নাম লীনা।

ও আচ্ছা, দীনা।

আমি কিছুই চিনলাম না। তবু আন্তরিক ভঙ্গিতে হাসলাম। হাসতে হাসতেই বললাম, জরুরি খবরটা কী এখন শুনি। অবশ্য আমাকে যদি বলা যায়।

রুবা ভাবির জন্যে দুটা কাজের মেয়ে জোগাড় করে ফেলেছি।

বলো কী ? এক সঙ্গে দুটা ?

মিরাকল বলতে পারেন। দুটা মেয়েই ভালো। একজন মিডল এজ, ধরুন, থার্ট ফাইভ হবে; আরেকটা বান্ধা মেয়ে, বয়স চৌদ্দ-পনেরো হবে। ভালনারেবল এজ। এই বয়েসের মেয়েরাই নানান সমস্যার সৃষ্টি করে। তবে মেয়েটা খুব কাজের। নাম রেশমা। ওর লাইফে একটা খারাপ ইনসিডেন্ট আছে। সেটা আপনাকে বলা সম্ভব না। রুবা ভাবিকে বলব। আপনি উনার কাছ থেকে শুনে নেবেন...

আমি টেলিফোন কানে ধরে বসে আছি। লীনা অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। কোনো দ্বিধা নেই, কোনো সংকোচ নেই। আশ্চর্য কাণ্ড!

টেলিফোনে কথা বলার বিশ্রী রোগ কোনো কোনো মেয়ের থাকে। এরও নিশ্চয়ই আছে। সহজে টেলিফোন ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না।

হ্যালো, মিজান ভাই ?

শুনছি।

রুবা আপাকে মেয়ে দুটার কথা বলবেন।

অবশ্যই বলব। ঘুম ভাঙলেই বলব। ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়েছে তো, কিছুক্ষণের মধ্যেই জেগে উঠবে বলে আমাব ধারণা।

ঘুম ভাঙলে আমাকে টেলিফোন করতে বলবেন। যত রাতই হোক।

আচ্ছা আমি বলব।

আর রুবা ভাবিকে বলবেন সে যেন ঘুমের ওষুধ-টষুধ কম খায়।

আমি বললে কি আর শুনবে! তবু বলব।

মিজান ভাই, আপনি ঘুমুতে যান কখন ?

আমার দেরি হয়। বারটা সাড়ে বারটা বেজে যায়।

সাড়ে বারটা কোনো রাত হলো ? আমি ঘুমুতে যাই কখন জানেন ? কোনো দিনও দুটার আগে না। গতকাল ঘুমুতে গেছি বাত তিনটায়। আমাব ইনসমনিয়া আছে তো, প্রায়ই ঘুম আসে না। অনেকক্ষণ আপনার সঙ্গে বকবক কবলাম। আপনি রাগ করেন নি তো ?

না। আমি রাগ করতে পারি না।

রাখি মিজান ভাই ?

আচ্ছা।

রুবা ভাবিকে আপনি কিন্তু মনে করে বলবেন। ভুলে যাবেন না আবার।

ভুলব না।

খোদা হাফেজ।

খোদা হাফেজ লীনা। Sweet Dreams.

আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম। কাঁটায় কাঁটায় এগারো মিনিট কথা বলেছি। একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। সহজভাবে কথা বলতে পেরে ভালো লেগেছে। বুঝতে

পারছি, আমার স্নায়ু ঠিক আছে। ১৯-এর ঘরের নামতা কি বলতে পারব ? ১৯ একে ১৯, ১৯ দুকুনে ৩৮, তিন ১৯-এ ৫৭, সাতাল্ল না আটাল্ল ? বাথরুমে যাওয়া দরকার। আমার যে প্রচণ্ড বাথরুম পেয়েছে এটা এতক্ষণ বুঝি নি। এখন বুঝতে পারছি। যে-কোনো বড় কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মাংসপেশি খানিকটা শিথিল হয়ে যায়। তখন প্রচণ্ড বাথরুম পায়।

জ্যাক দি রিপারের কাহিনীতে পড়েছি— সে এক একটা খুন করত। খুন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়েই প্রস্রাব করে ফেলত। প্যান্টেব জিপার খোলারও সময় পেত না।

আমি বাথরুমে ঢুকলাম। সুন্দর বাথরুম, ঝকঝক তকতক করছে। রুম্বার বাথরুম গোছানো রোগ আছে। তার বাথরুম থাকতে হবে ঝকঝকে। বাথরুমের মেঝে ভেজা থাকলে চলবে না। মেঝে থাকবে খটখটে শুকনো। গোসলের পানি যা পড়বে তা পড়তে হবে বাথ ট্রেতে। বাথ ট্রের বাইরে এক ফোটা পানিও পড়তে পারবে না।

বাথরুমের বাতি জ্বালালাম। আয়নায় একটা নোটিশ বুলছে—

ছোট বাথরুম করার আগে দয়া করে

কমোডের ঢাকনা তুলে রাখবেন।

আমি তাই করলাম। রুম্বা বেঁচে নেই তাতে কী হয়েছে! ওর কথা শুনতে আপত্তি কী ? তিন ১৯-এ কত ? ৫৭ না ৫৮ ? তিন নয় সাতাশের সাত। হাতে রইল দুই। তিন একে তিন আর দুই পাঁচ...।

মাথা থেকে নামতা ঝেড়ে ফেললাম। বাতি নিভিয়ে বাথরুম থেকে বের হয়ে এলাম। এখন আমার যা দরকার তা হলো গরম এক কাপ কফি। কফি খেয়ে শরীরটা চাঙ্গা করে শ্বশুববাড়িতে একটা টেলিফোন করতে হবে। চিন্তিত গলায় বলতে হবে— রুম্বা কি আপনাদের ওখানে গেছে ? ও-বাড়ির কেউ তেমন চিন্তিত হবে না। কারণ রুম্বা প্রতি মাসে কয়েকবার বাগ করে বাসা ছেড়ে চলে যায়। কখনো তার মার কাছে গিয়ে থাকে, কখনো তার বোনের বাসায় গিয়ে উঠে। মাঝে মাঝে চলে যায় তার বন্ধু-বান্ধবদের বাসায়।

কফির জন্যে পানি গরম করতে দিলাম। আমাদের রান্নাঘরও বাথরুমের মতোই ঝকঝকে পরিষ্কার। এক কণা ধূলি নেই, তেলের ছোপ নেই। কিচেন ক্যাবিনেটে সুন্দর করে থরে থরে বোতল সাজানো। প্রতিটি বোতলের গায়ে আবার লেবেল লাগানো— চিনি, লবণ, হলুদ, মরিচ, গবম মশলা...। রুম্বা খুব গোছানো মেয়ে ছিল, এটা স্বীকার করতেই হবে। গত একমাস হবে আমাদের কোনো কাজের লোক নেই, এতে কোনো সমস্যাই হচ্ছে না। বরং লাভ হয়ে গেল আমার। কাজের লোক থাকলে হত্যা পরিকল্পনা রদবদল করতে হতো। তাকে ছুটি দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিতে হতো বা এরকম কিছু করতে হতো। অবশ্য এতে তেমন ঝামেলা কিছু হতো না। পরিস্থিতি বুঝে পরিকল্পনা। যে কারণে ফ্লাট বাড়ি ছেড়ে আলাদা একতলা বাড়ি নিলাম। ফ্লাট বাড়ি থেকে একটা ডেডবডি বের করে নেয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। আর এখানে কোনো ব্যাপারই না। গাড়ি-বারান্দার বাতি নেভানো থাকবে। গাড়ির দরজা থাকবে খোলা। আমি রুম্বাকে বড় একটা চাদরে মুড়ে গাড়িতে ঢুকিয়ে দেব।

পানি ফুটছে। কফির ঝামেলায় গেলাম না। আমি কফি ঠিকমতো বানাতে পারি না। তেতো হয়ে যায়। এই মুহূর্তে তেতো কফি খেতে ভালো লাগবে না। এরচে' চা বানানো সহজ। একটা টি-ব্যাগ ফেলে দেয়া। চায়ের কাপ হাতে নিয়েই আমি টেলিফোন কবতে গেলাম। আমার শাশুড়ি টেলিফোন ধরলেন। আমি বললাম, মা, কেমন আছেন ?

তিনি বললেন, ভালো আছি বাবা।

আপনার পিঠের ব্যথা কমেছে ?

ব্যথাটা কমেছে, অবশ্যি জ্বর এখনো আছে।

মা, খাওয়া-দাওয়া কী করছেন ?

দুপুরে কিছু খাই নি।

কিছু একটা খাওয়া তো দরকার মা— উপোস করা ঠিক না।

কিছু খেতে ইচ্ছা করে না।

আপনার খোঁজ নেয়ার জন্যেই টেলিফোন করলাম মা।

তা তো বাবা করবেই। আমার খোঁজ-খবর যা করার তা তো তুমিই কর। তুমি যা কর কোনে: মায়ের পেটের সন্তান তা কবে না।

ছি ছি মা, আমি আবার কী করলাম ?

সেই কবে কথায় কথায় খেজুর গুড়ের সন্দেশের কথা বলেছিলাম। তুমি ঠিকই মনে রেখেছ। এক গাদা সন্দেশ পাঠিয়েছ। তা বাবা, সন্দেশ খাওয়ার বয়স কি এখন আছে ?

ঐসব কথা বাদ দিন তো মা ?

আচ্ছ বাবা, যাও বাদ দিলাম। রুবা কেমন আছে ? ওর কি দিনে একবার মাকে টেলিফোন করতেও ভালো লাগে না ?

ও সব সময় বলে আপনার কথা।

থাক বাবা। থাক। আমাকে সাবুনা দেয়ার দরকার নেই। আমার নিজের পেটেরই তো মেয়ে। আমি জানি না ওরা কেমন ?

ইয়ে মা, রুবা আপনার ওখানে যায় নি ? আমি ভাবছিলাম...

ও কি আবার রাগ করে চলে গেছে ?

জি।

তুমি ওকে কিছু বলো না কেন ? তুমি কিছুই বলো না। এতে সে আবো লাই পেয়ে গেছে। বাবা তুমি শক্ত হও।

আমি হাসলাম। আমার শাশুড়ি এতে রেগে গেলেন। বিরক্ত গলায় বললেন, হাসছ কেন ? হ'সবে না। আমি আমার মেয়েদেব নাড়ি-নক্ষত্র চিনি। এরা জানে শুধু যন্ত্রণা দিতে। তোমাকে ভালো মানুষ পেয়ে...

বাদ দিন মা।

কিছু একটা হলেই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। এসব কী ? বেশি স্বাধীনতা ভালো না। তুমি স্বাধীনতা বেশি দিয়ে ফেলেছ ?

থাক মা, আপনি এটা নিয়ে ওকে কিছু বলতে যাবেন না। ও যদি টেলিফোন করে তাহলে বলবেন, ঘরের আলমিরার চাবি নিয়ে গেছে, আমি কাপড়-চোপড় বের করতে পারছি না। অরুণের বিয়েতে যাবার কথা। মনে হচ্ছে অফিসের কাপড় পরেই যেতে হবে। যেতে অবশ্যি ইচ্ছা করছে না...

না, না, তুমি যাও। অরুণ আমাদেরকেও কার্ড দিয়ে গেছে। আমি পিঠে ব্যথা নিয়ে যাই কীভাবে? তোমার শ্বশুর সাহেবকে যেতে বলছি, দেখি যায় কি না। রুবার ব্যবহারে তুমি কিছু মনে করো না বাবা। তুমি বিয়েতে যাও। তোমার এতদিনের বন্ধু, না গেলে মনে কষ্ট পাবে।

আচ্ছা মা, আপনি যখন বলছেন যাব। সমস্যা হচ্ছে গিফট যেটা কিনেছিলাম সেটাও রুবা আলমিরায় ঢুকিয়ে রেখেছে। ভুল করে রেখেছে বোধহয়।

মোটাই ভুল করে রাখে নি। এই কাজটা সে ইচ্ছা করেই করেছে। তোমাকে সমস্যায় ফেলা, আর কিছু না। বাবা, তুমি দেরি করো না, চলে যাও?

আমি টেলিফোন নামিয়ে আবার শোবার ঘরে এলাম। রুবা শুয়ে আছে। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে বলেই কিছু কিছু চুল উড়ছে। সবই স্বাভাবিক। শুধু মুখ খানিকটা হাঁ হয়ে আছে। দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিহ্বার খানিকটা অংশ বের হয়ে আছে। মৃত্যুর পরপর মানুষের জিহ্বা কি খানিকটা লম্বা হয়ে যায়? রুবার শাড়ির আঁচলে একটা তেলাপোকা বসে আছে। এরা কি টের পেয়ে গেছে? বুঝে গেছে যে এই মেয়েটা বেঁচে নেই? তেলাপোকা যখন খবর পেয়েছে তখন পিঁপড়ারাও খবর পাবে। সারি বেঁধে আসতে শুরু করবে। নাকের ফুটো, কানের ফুটো দিয়ে ভেতরে ঢুকে যাবে। একটা ব্যবস্থা নেয়া উচিত। খানিকটা মর্টিন ছড়িয়ে দিলে হয়।

এ বাসায় মর্টিন, এরোসল, এয়ার ফ্রেশনার সবই আছে। শুধু খুঁজে বের করাই হলো সমস্যা।

ওয়াশ বেসিনের নিচেই এরোসল পাওয়া গেল। একগাদা এরোসল স্প্রে করলাম রুবার গায়ে। তেলাপোকাটা বিস্মিত হয়ে আমার কাণ্ডকারখানা দেখছে। ঠুঁড় নাড়ছে।

আমি আয়নার সামনে চলে গেলাম। বিয়েতে যেতে হবে। প্রতিটি কাজকর্ম খুব স্বাভাবিকভাবে করতে হবে। কেউ যেন কিছুই সন্দেহ করতে না পারে। আয়নায় নিজের চেহায়ায় আমি তেমন কোনো পরিবর্তন দেখতে পেলাম না। একটু ক্লান্ত ভাব আছে, এর বেশি কিছু না। কেউ দেখে বুঝতে পারবে না যে আমি কিছুক্ষণ আগে একটা খুন করেছি।

ঘব থেকে বের হবার আগে রুবাকে পাশ ফিরিয়ে দিলাম। হাঁ করা মুখ দেখতে ভালো লাগছে না। তার শরীর বরফের মতো ঠাণ্ডা। এত ঠাণ্ডা হয় কী করে? ঘরের যে তাপ সেই তাপই তো থাকার কথা। এর চেয়ে ঠাণ্ডা হবার তো কথা না। হাত-পাও শক্ত হয়ে গেছে। রিগরাস মর্টিন শুরু হয়েছে। দাওয়াত থেকে ফিরে এসে ডেডবডি সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। কী করব সব ঠিক করা আছে। কোনো সমস্যা হবে না।

বাতি নিভিয়ে ঘর থেকে বের হলাম। বাইরে তালা লাগিয়ে দিলাম। ঘড়িতে এখন বাজছে ন'টা। নভেম্বর মাসের শেষ, শীত লাগছে। গরম কাপড় আনা উচিত ছিল। দিনের বেলা বেশ গরম ছিল। বাংলাদেশের আবহাওয়া কী হচ্ছে কে জানে? ওজোন

লেয়ারের গুণগোলে সব মনে হয় ওলট-পালট হয়ে গেছে। কিছুদিন পর হয়তো দেখা যাবে শীতকালে প্রচণ্ড গরম পড়েছে। গরমকালে শীতে লোকজন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

অরুণের বিয়ে হচ্ছে সোহাগ কম্যুনিটি সেন্টারে। অরুণ হলো আমার স্কুল জীবনের বন্ধু। বন্ধু বললে বাড়িয়ে বলা হয়— স্কুলে আমি ওর সঙ্গে পড়েছি। অরুণের ধারণা, আমি ওর জন্যে খুব ব্যস্ত। এবং আমাদের বন্ধুত্ব আরসিসি কনক্রেটের মতো। সে ক’দিন পরপরই অফিসে টেলিফোন করে আন্তরিক ধরনের একটা স্বর বের করে বলে— দোস্ত, তোর কোনো খোঁজ নাই, খবর নাই। ব্যাপারটা কী ?

বাসায় যখন তখন আসে, ‘ভাবি ভাবি’ বলে সরাসরি বেডরুমে ঢুকে যায়। তার বোধহয় ধারণা, আন্তরিকতা দেখানোর প্রধান শর্ত হলো বেডরুমের বিছানায় পা এলিয়ে বসে গল্প।

অরুণের গুস্তাদী ধরনের আলাপ আমার সব সময় অসহ্য বোধ হয়। উপায় নেই বলেই সহ্য করে নেই। অরুণটা গাধা ধরনের, আমি যে তাকে দু’ চোখে দেখতে পারি না এটা সে জানে না।

কম্যুনিটি সেন্টারে পৌঁছে দেখি, দুটা ব্যাচের খাওয়া হয়ে গেছে। তাবপরেও লোকজন যা আছে, মনে হচ্ছে আরো চার-পাঁচ ব্যাচ খাবে। অরুণ আমাকে বলল, তুই গাধার মতো এত দেরি করলি ? আশ্চর্য, সামান্য সেসপও তোর নেই ? ছাগল কোথাকাব ! বউ আসে নি ?

আমি কিছু বললাম না, হাসলাম।

অরুণ বলল, আবার ঝগড়া ? আমার বিয়ের দিনটায় বেছে বেছে ঝগড়া কবলি ? মাফ করে দে।

যা, খেতে বোস। তোর স্বপ্তর এসেছেন, তোকে খুঁজছেন।

কেন ?

কে জানে কেন। তুই খেতে বোস। সবাই যে হারে খাচ্ছে খাওয়া শর্ট পড়ে যাবে। দেরি করলে কিছুই পাবি না। ভিডিও হচ্ছে বুঝলি। মনে করে তোর ভাবির সঙ্গে ছবি তুলিস। একটা রেকর্ড থাকুক।

আমি খেতে বসে গেলাম। এতটা খিদে লেগেছে নিজেও বুঝি নি। রান্না ভালো হয়েছে। অনেকেই দেখি চেয়ে চেয়ে ডাবল বোস্ট নিচ্ছে। আমিও নিলাম। পোলাও বোপহয় নতুন করে বান্না হয়েছে। আশুন-গরম। খাসির বেজালা থেকে চমৎকার গন্ধ আসছে।

এই যে মিজান!

তাকিয়ে দেখি আমার স্বপ্তর সাহেব। আমার স্বপ্তর সাহেব বিয়ে করার পর চক্রবৃদ্ধি হারে বুড়ো হতে শুরু করেছেন। রোজ অনেকখানি করে বুড়ো হন। বিয়ে উপলক্ষ্যে তিনি একটা কালো আচকান পরেছেন। সম্ভবত এই জিনিস যৌবনকালে বানিয়েছেন। আচকানও তাঁর মতো বুড়ো হয়েছে। বেচারাকে দেখাচ্ছে সার্কাসের লোম ওঠা ভালুকের মতো। আমি তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়িলাম। উনি হৈ হৈ করে উঠলেন, দাঁড়াচ্ছে কেন ? বোস বোস। রুবা বাসায় আছে এই খবরটা তোমাকে জানাতে বলল তোমার শাশুড়ি।

কে বাসায় ফিরেছে ?

রুবা ।

ও ।

তোমার শাশুড়ি তোমার বাসায় টেলিফোন করেছিল । সে ধরল । সে নাকি বাসাতেই ছিল । ঘুমিয়ে পড়েছিল । তুমি তাকে রেখে চলে এসেছ, এই নিয়ে মন খারাপ করেছে ।

আমি বুড়োর দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম । গাধাটা এইসব কী বলছে ? বুড়ো ভালুকের মাথায় নাট বন্টু কি খুলে পড়ে গেছে ? কোথায় না কোথায় রং নাশ্বার করেছে... আমি খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়লাম । আমার রুচি নষ্ট হয়ে গেছে ।

আমি হাত ধুচ্ছি, অরুণ ছুটে এসে বলল, ব্যাপার কিরে, খাওয়া শেষ ?

হঁ ।

খাওয়া কেমন হয়েছে ?

ভালো । খুব ভালো ।

পোলাও শর্ট পড়ে গিয়েছিল । নতুন করে রাঁধতে হলো । অন্য মানুষদের বিয়েতে গোশত শর্ট পড়ে, রোস্ট থাকে না, রেজালা থাকে না— আমার বেলায় শর্ট পড়ল পোলাও । হাউ স্ট্রেঞ্জ ।

দোস্ত যাই ।

যাই মানে ? হোয়াট ডু ইউ মীন বাই যাই ? তোর ভাবির সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

না ।

যা, দেখা কর । ভিডিওওয়ালাকে বলে দিচ্ছি, ভিডিও করবে ।

বাসায় যাওয়া দরকাব, রুব্বার জন্যে চিন্তা লাগছে ।

খামাখা চিন্তা করবি না । আয় তো আমার সঙ্গে, তোর ভাবির সাথে আলাপ করিয়ে দেই ।

আজকালকার বৌরা আগের দিনের মতো না, জবুথবু হয়ে লম্বা ঘোমটা টেনে বসে থাকে না । এরা হড়নড় করে কথা বলে, বিনা কারণেই হিস্টিরিয়া রোগীর মতো হাসে । অরুণের বৌয়ের হাসি শোনার সময় এখন নেই । আমাকে বাসায় যেতে হবে । এমনভাবে যেতে হবে যেন কারো চোখে কোনো অস্বাভাবিকতা ধরা না পড়ে ।

বাসায় ফিরলাম রাত দশটায় । আশ্চর্য কাণ্ড! শোবার ঘরে বাতি জ্বলছে । এর মানে কী ? আমার স্পষ্ট মনে আছে আমি বাতি নিভিয়ে ঘর থেকে বের হয়েছি । ধস্ক করে বুকে একটা ধাক্কা লাগল । চাবি হাতে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছি । পায়ের শব্দ পাচ্ছি । ঘরের ভেতর চটি পায়ের কেউ একজন হাঁটছে । নিশ্চয়ই মনের ভুল । বাতিটাও কি মনের ভুল ? হয়তো আমি ভুল করে বাতি জ্বালিয়েই এসেছি । পুরো ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে । খুব ঠাণ্ডা মাথায় । বোঝাই যাচ্ছে আমার স্নায়ু উত্তেজিত । মাথায় হয়তো রক্ত উঠে গেছে । আমার শ্বশুর সাহেবই বা এটা কী বললেন ? সব কিছু একটা লজিকেল এক্সপ্লানেশন থাকে । এরও নিশ্চয়ই আছে ।

আমি দরজা না খুলে রাস্তার দিকে রওনা হলাম। মোড়ে একটা চায়ের দোকান আছে। এক কাপ চা খাব। একটা সিগারেট খাব। পানও খাওয়া যেতে পারে। এই ফাঁকে চিন্তা করে বের করব— হচ্ছেটা কী ? ব্যাখ্যা অবশ্যই আছে। ছয়-এর সঙ্গে এক যোগ করলে তবেই সাত হয়— আপনা আপনি সাত হয় না।

চা খেতে খেতে আমি ব্যাপারটা কী ঘটছে তার একটা গ্রহণযোগ্য সিনারিও তৈরি করলাম।

আমার শাশুড়ি পিঠের ব্যথায় ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুয়েছিলেন। তাঁর হাতের কাছেই টেলিফোন। তিনি পিঠের ব্যথার জন্য কড়া ধরনের সিডেটিভ খান। কাজেই তাঁর আধো-ঘুম আধো-জাগরণ অবস্থা। এই অবস্থায় টেলিফোন বাজল। তিনি টেলিফোন ধরার জন্য হাত বাড়ালেন এবং টেলিফোন ধরার আগেই ঘুমিয়ে পড়লেন। রুবার সঙ্গে কথাবার্তার অংশটি তিনি স্বপ্নে দেখলেন। স্বপ্নটা তাঁর অবচেতন মন তাঁকে দেখাল। স্বপ্ন ভাঙার পর স্বপ্নটাকেই তাঁর সত্যি মনে হতে লাগল। আমার শ্বশুর সাহেব তখন বেরুচ্ছেন। তাঁকে তিনি রুবার কথাটা বলে দিলেন। সত্যি ভেবেই বললেন। এই হচ্ছে ব্যাপার।

একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো গেছে, এতেই আনন্দিত বোধ করছি। নিশ্চিন্ত বোধ করছি। একটা ব্যাখ্যা যখন দাঁড় করানো গেছে, আরো ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই দাঁড় করানো যাবে।

আমি পান মুখে দিয়ে ফিরে এলাম। তালা খুলে ঘরে ঢুকলাম। কেন জানি ইচ্ছা করল দরজাটা খোলা রাখতে। পর মুহূর্তে মনে হলো, এতো বড় বোকার্মি কখনোই করা ঠিক হবে না। দরজার দু'টা ছিটকিনিই বন্ধ কবলাম। ডেডবন্ডি সন্টার কাজ এখন শুরু করতে হবে। আমি শোবার ঘরে ঢুকলাম। রুবা ঠিক আগের ভঙ্গিতে শুয়ে আছে। শুধু-শুধুই একটা আজ-বাজে ধরনের ভয়ে এতক্ষণ কঁকড়ে ছিলাম।

ফ্যানটা বন্ধ কবে দিয়েছি বলেই বোধহয় ঘবটা গুমট হয়ে আছে। ফ্যান ছাড়লাম। বাতাসে রুবার মাথার চুল উড়ছে। সেই চুলের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ভয়াবহ ধরনের চমক খেলাম। রুবা তো এভাবে শুয়ে ছিল না। আমি তার মুখ দেয়ালের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। সে পাশ ফিরল কীভাবে ? তার চোখও খোলা। চোখ তো বন্ধ ছিল। চোখ খোলা হলেও এই চোখ জীবিত মানুষের নয়। চোখে পলক পড়ছে না। রুবা পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে। না না, মেঝের দিকে না। সে তো আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। একটু আগেই তো দেখেছি মেঝের দিকে তাকিয়েছিল। Something is wrong. Something is very very very wrong. গরম লাগছে। আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। আমি কি ভয় পাচ্ছি ? মানুষের ভয় পাওয়ার একটা শেষ সীমা আছে। আমি কি সীমা অতিক্রম করতে যাচ্ছি ?

‘হে মানব সন্তান।

তুমি সীমা অতিক্রম করিও না।

সীমা অতিক্রমকারীকে আমি পছন্দ করি না।’

এইগুলি কার কথা ? কোরান শরীফের ? কোন সূরায় আছে ?

নিঃশ্বাস ফেলার মতো শব্দ হলো। কে নিঃশ্বাস ফেলল ? রুবা ? মৃত মানুষ কখনোই

নিঃশ্বাস ফেলে না। আমি যা শুনছি তা আমার নিজেরই নিঃশ্বাসের শব্দ। কিংবা বাতাসের শব্দ। কিংবা...। আমি নিজের অজান্তেই ডাকলাম, রুবা!

সঙ্গে সঙ্গে কেউ একজন বলল, উঁ।

না না, রুবা এটা বলতেই পারে না। ঐ তো তার মুখ হাঁ হয়ে আছে। জিহ্বা খানিকটা বের হয়ে আছে। পলকহীন চোখে সে তাকিয়ে আছে। মৃত মানুষ কথা বলে না। বাতাসের শব্দই আমার কাছে 'উঁ' ধ্বনির মতো মনে হয়েছে। আমার মাথা এলোমেলো হয়ে গেছে। আমাকে যা করতে হবে তা হলো— এই ঘর থেকে বের হয়ে যেতে হবে। স্নায়ু ঠাণ্ডা করতে হবে। কাবার্ডে ব্রান্ডি আছে। সামান্য ব্রান্ডি খাব, তারপর ঠাণ্ডা পানি দিয়ে মাথাটা ধুয়ে ফেলব। আমার মস্তিষ্ক মনে হয় অক্সিজেন কম পাচ্ছে। অক্সিজেন কম পেলে মানুষ হেলুসিনেশন দেখতে শুরু করে।

ঘর থেকে বেরুবার আগে আরেকবার ভালোমতো রুবার দিকে তাকালাম। বড় বড় করে নিঃশ্বাস নিলাম। প্রচুর অক্সিজেন নিতে হবে। ব্রেইনের যেন অক্সিজেনের অভাব না হয়।

আমি বসার ঘরের দিকে রওনা হতেই স্পষ্ট শুনলাম, কেউ যেন পাশ ফিরল। খাট মট মট করে উঠল। নিঃশ্বাস ফেলাব শব্দও যেন হলো।

কেউ কি থুথু ফেলেছে? একটু থু শব্দ যেন শুনলাম।

আমি বসার ঘরে চলে এলাম। চায়ের কাপেব আধকাপ ব্রান্ডি একসঙ্গে গলায় ঢেলে দিলাম। তীব্র, ঝাধালো স্বাদ! মনে হচ্ছে শরীরের সমস্ত স্নায়ু পুড়িয়ে তরল আগুন নিচের দিকে নামছে। ভয়টা কমে গেছে। জিনিসটা আবো আগেই খাওয়া উচিত ছিল। আমি জানি, এখন যদি শোবার ঘরে যাই, দেখব, সব স্বাভাবিক। রুবার মুখ দেয়ালের দিকে ফেবানো, চোখ বন্ধ। বাথরুমে ঢুকে মাথায় পানি ঢাললাম। কাজটা বোকার মতো হয়ে গেল। আমার টনসিলাইটিসেব সমস্যা। ঠাণ্ডা লেগে বিশী ব্যাপার হবে।

টেলিফোন বাজছে। টেলিফোন বাজছে শোবার ঘর থেকে। এর মানে কী? টেলিফোন বসার ঘরে ছিল। তার টেনে শোবার ঘরে কে নিয়ে গেছে? না না এত অস্থির এবাব কিছু নেই, নিশ্চয়ই আমিই কোনো এক সময় টেলিফোন শোবার ঘরে নিয়ে গিয়েছিলাম। যেহেতু বড় উত্তেজনার মধ্যে আছি— কিছুই মনে থাকছে না।

আমি টেলিফোন ধবলাম।

একবারও খাটের দিকে তাকালাম না। দবকার কী? টেলিফোন আসায় ভালো হয়েছে— মন কিছুটা হলেও কেন্দ্রীভূত হবে।

হ্যালো!

কে, মিজান ভাই? আমি লীনা— রুবা আপার ঘুম ভেঙেছে?

উঁ।

কী বললেন বুঝতে পারি নি।

একবার ভেঙেছিল, আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

আপনি কি কাজের মেয়ে দুটির কথা তাঁকে বলেছেন?

হ্যাঁ।

আপা কী বলল ?

কিছু বলে নি। কথা শুনেই আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিছুই বলে নি ?

না।

আপনাদের মধ্যে ঝগড়া চলছে না তো ? আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, রুবা আপা ঘুমের ভান করে পড়ে আছে।

ভান-টান না। গভীর ঘুম।

হ্যালো মিজান ভাই! আমার ধারণা, আপনাদের মধ্যে সিরিয়াস ঝগড়া হয়েছে। বলুন তো ঠিক বলছি কি-না ?

আমি কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলাম। অনেকক্ষণ ধরে যে বড় ধরনের বোকামি করছি তা ধরা পড়ল। কেন আমি বোকার মতো বলছি— রুবা ঘুমিয়ে আছে ? আমার বলা উচিত, রুবা বাসায় নেই। পুলিশী ঝামেলা হতে পারে। পুলিশ আর কিছু পারুক না পারুক— দুনিয়ার মানুষকে প্রশ্নে প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করতে পারে। লীনাকে খুঁজে বের করে তারা বলবে— আপনাব নাম লীনা ?

লীনা ভয়ে আধমরা হয়ে বলবে— জি।

ঘটনার দিন রাতে আপনি টেলিফোন কবেছিলেন। টেলিফোনে কী কী কথা হয়েছিল দয়া করে বলুন। কোনো পয়েন্ট বাদ দেবেন না। ভালো কথা, টেলিফোন কনভারসেশনের কোনো পর্যায়ে কি মিজান সাহেব বলেছেন যে, মিসেস রুবা বাসায় আছেন— ঘুমুচ্ছেন ?

এ জাতীয় ঝামেলায় যাওয়াই যাবে না। কাজেই লীনাকে আমার বলে দেয়া উচিত যে, রুবা বাসায় নেই।

হ্যালো মিজান ভাই— আপনি চুপ করে আছেন, কিছু বলছেন না।

কী বলব ?

রুবা আপনার সঙ্গে কী আপনাব ঝগড়া হয়েছে ?

হঁ।

উনি যথারীতি রাগ করে বাসা ছেড়ে চলে গেছেন। তাই না ?

হ্যাঁ।

দেখলেন, আমি কেমন চট করে ধরে ফেললাম ? প্রথম যখন আপনাকে টেলিফোন করলাম তখন আপনার গলা শুনেই বুঝে ফেলেছি যে আপনি সত্যি কথা বলছেন না। এখন দয়া করে সত্যি কথাটা বলুন।

ও রাগ করে সন্ধ্যার একটু আগে বাসা ছেড়ে চলে গেছে। আমি খুব দুঃশ্চিন্তায় পড়েছি।

শুধু শুধু দুঃশ্চিন্তা করবেন না। রুবা আপনার মা'র বাসায় খোঁজ করেছিলেন ?

করেছিলাম, ওখানে নেই।

তার ছোট বোনের বাসায় ?

ওখানে ফোন করি নি। আচ্ছা লীনা... তুমি কিছু মনে করো না, ইয়ে মানে, না থাক...

বলুন না কী বলবেন ?

ওর কি কোনো... মানে ইয়ে...

আহ্, এত লজ্জা পাচ্ছেন কেন, বলে ফেলুন...

না মানে, কোনো ছেলের সঙ্গে ইদানিং...

লীনা খুব হাসছে। মনে হলো দারুণ মজা পেয়েছে। হাসি থামিয়ে বলল, আচ্ছা মিজান ভাই, বাড়ির বউদের আপনারা এমন হালকা ভাবেন কেন ?

তুমি তোমার আপাকে কিছু বলো না যেন। ও মনে কষ্ট পাবে।

কষ্ট তো অবশ্যই পাবে। আমি কিছু বলব না। শুনুন মিজান ভাই, আমি কিছু বলব না। আপনি বোধহয় উড়ো কথাবার্তা শুনেছেন— শুনেই আপনার আক্কেল শুঁড়ুম হয়েছে।

উড়ো কথা কিছু আছে না-কি ?

মনসুর সাহেবকে নিয়ে অনেকের মধ্যে গুজগাজ ফিসফাস হয়। ঐসব কিছু না।

ও আচ্ছা, মনসুব সাহেবের টেলিফোন নাম্বার তোমার কাছে আছে ?

হ্যাঁ, আছে। আপনি কি সেখানে টেলিফোন করবেন ? খবরদার। না।

তুমি টেলিফোন নাম্বারটা দাও না।

দিচ্ছি। আপনি কিন্তু ভুলেও বলতে পাবেন না— কোথেকে টেলিফোন নাম্বার পেয়েছেন।

আচ্ছা, বলব না।

লীনা টেলিফোন নাম্বার দিল। আমি টেলিফোন নাম্বার লিখে রাখলাম, যদিও টেলিফোন নাম্বার লিখে রাখা কোনো প্রয়োজন ছিল না। এই নাম্বার আমি জানি। টেলিফোন বই-এ লেখা আছে।

যা কবার আটঘাট বেঁধে করতে হবে। কোনো রকম ফাঁক-ফোকর রাখা যাবে না। থানায় টেলিফোন করে বলে রাখতে হবে যে, রুবা বাসা ছেড়ে চলে গেছে। ওসি সাহেব খুব অবাক হবেন না, কারণ এব আগেও কয়েকবার তাঁকে রুবার নিখোঁজ হবার খবর দিয়েছি। সবই হচ্ছে বড় পরিকল্পনার অংশ। পরিকল্পনা নিখুঁত করার জন্যে যা যা করণীয়, আমি সবই করেছি। শ্বশুরবাড়িতেও একবার টেলিফোন করা দরকার। আমার শাশুড়িকে জানানো দরকার যে, রুবা বাসায় নেই এবং রুবার সঙ্গে তাব কোনো কথা হয় নি।

অনেকবার টেলিফোন করেও আমি শ্বশুর বাড়ির লাইন পেলাম না। রিং করলেই এনগেজড টোন আসে। থানায় টেলিফোন করলাম, সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন ধরল।

রোবট ধরনের গলায় শোনা গেল— ওসি রমনা। স্নামালিকুম।

আমি বললাম, ওসি সাহেব, মিজান বলছি।

ও আচ্ছা, আচ্ছা। কী খবর? কী খ-ব-র?

ওসি সাহেবের খুব আন্তরিক গলা শোনা গেল। এই আন্তরিক গলা শোনার জন্যে আমাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে। আমার উদ্ভাবনী ক্ষমতা ব্যবহার করতে হয়েছে। আমি এই অবস্থা অনেক পরিকল্পনায় তৈরি করেছি। ওসি সাহেব হাসি হাসি গলায় বললেন, মিজান সাহেব, বলুন, খবর বলুন। ভাবি কি আবারো রাগ করে বাড়ি ছেড়ে গেছেন? হা হা হা।

ওসি সাহেবের এই বিমলানন্দের কারণ হচ্ছে, এর আগে তিনবার আমি থানায় টেলিফোন করে রুবার গৃহত্যাগের খবর দিয়েছি। একটা পরিস্থিতি তৈরি করার জন্যেই এই খবর দেয়া। যাতে পুলিশ যখন রুবার মৃত্যু নিয়ে ফাইন্যাল রিপোর্ট তৈরি করবে, তখন সেই রিপোর্টে উল্লেখ থাকবে— এই মহিলা প্রায়ই রাগারাগি করে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতেন।

প্রথমবার যখন রুবার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার খবর দিলাম, তখন ওসি সাহেব বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, আপনার স্ত্রী চলে গেছেন, চব্বিশ ঘণ্টাও তো হয় নি, চব্বিশ ঘণ্টা পার না হলে মিসিং পারসন হয় না। ধৈর্য ধরুন। আত্মীয়স্বজনের বাসায় খোঁজ করুন। আমি অত্যন্ত অনুগত গলায় বলেছি, জি আচ্ছা।

সকালের ভেতর খোঁজ না পেলে থানায় চলে আসবেন।

জি আচ্ছা।

আমি সকালবেলায় থানায় চলে গেলাম। ওসি সাহেবকে বললাম, আমাব স্ত্রীকে পাওয়া গেছে। ও সকাল আটটার সময় বাসায় এসেছে।

ওসি সাহেব গভীর গলায় বললেন— দেখলেন তো, আমার কথা ফলে গেল। এত অল্পতে আস্থার হওয়া ঠিক না।

আর আস্থার হবো না। আমি আপনার জন্যে সামান্য গিফট এনেছি। আপনি কি নেবেন?

ওসি সাহেব বিস্মিত হয়ে বলতেন, কী গিফট?

আমি খবরের কাগজে মোড়া এক কার্টুন বেনসন এন্ড হেজেস এঁগিয়ে দিতে দিতে বললাম, আপনাকে গভীর রাতে টেলিফোন করেছি, এই জন্যে...

ওসি সাহেব খুশি খুশি গলায় কপট বিরক্তি মিশিয়ে বললেন, পুলিশকে গভীর রাতে বিরক্ত করবেন না তো কাকে বিরক্ত করবেন? এই জাতীয় সমস্যা হলে টেলিফোন করবেন। যত রাতই হোক, কববেন। আমরা পুলিশরা আছি কী জন্যে?

দ্বিতীয় দফায় আমি আবার রুবার গৃহত্যাগের খবর দিলাম এবং যথারীতি পরদিন ভোরে খবর দিলাম যে, আমার স্ত্রী ফিরে এসেছে। এবারো এক কার্টুন সিগারেট নিয়ে গেলাম।

ওসি সাহেবের সঙ্গে খাতির হয়ে গেল। ওসি সাহেব ধরে নিলেন, আমি নির্বোধ ধরনের ভালো মানুষ গোছের একজন মানুষ, যাকে তার স্ত্রী তেমন পছন্দ করে না বলে রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।

এ পর্যন্ত চার কার্টুন বেনসন এন্ড হেজেস সিগারেট আমি ওসি সাহেবকে দিয়েছি। এই চার কার্টুন সিগারেটের দাম দুই হাজার পাঁচশ টাকা। এই দুই হাজার পাঁচ শ' টাকায় আমি এখন যে উপকারটা পাব তার দাম দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা।

স্ত্রী খুন হলে প্রথম সন্দেহ এসে পড়ে স্বামীর ওপর। থানার ওসি গোড়াতেই ধরে নেন— স্বামী এই খুনটি করেছে। আমার বেলায় এটা হবে না। ওসি রমনা থানা আমাকে খুনী ভেবে নিয়ে তদন্ত শুরু করবেন না। তিনি ধরেই নেবেন আমি সাথেও নেই পাঁচেও নেই একজন মানুষ। আমাকে ঝামেলা থেকে রক্ষা করা তখন তাঁর প্রথম কাজ হয়ে দাঁড়াবে।

মিজান সাহেব।

জি।

চুপ করে আছেন কেন, কথা বলুন, ভাবি কি আবার গৃহত্যাগী ?

জি।

আপনি চিন্তায় চিন্তায় অস্থির হয়েছেন— রাত তো মাত্র এগারোটা পঁচিশ। সকাল পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন এবং বেনসন এন্ড হেজেসের কার্টুন নিয়ে আমার এখানে চলে আসুন। ভাবির গৃহত্যাগ মানে তো আমার লাভ— হা-হা-হা।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলার মতো শব্দ করলাম। ওসি সাহেব বললেন, কী হলো ?

আমি বললাম, কিছু না। মনটা খুব খারাপ।

আমার একটা উপদেশ শুনুন ভাই সাহেব, স্ত্রীকে কম ভালোবাসবেন। স্ত্রীকে যত কম ভালোবাসবেন ততই কম যন্ত্রণা পোহাতে হবে। ভালোবেসেছেন কি মরেছেন। সম্রাট শাহজাহানের দিকে তাকিয়ে দেখুন, স্ত্রীকে ভালোবেসে কী বিপদে পড়েছে! সব টাকাপয়সা খরচ করে তাজমহল বানাতে হলো— হা-হা-হা। আপনার যা নেচার আমার তো মনে হয় আপনিও তাজমহল-টহল কিছু বানাবেন। মিজান সাহেব!

জি।

আজ আপনাকে অন্যদিনেব চেয়েও মনমবা মনে হচ্ছে। ব্যাপার কী বলুন তো ? ঝগড়া কি চূড়ান্ত রকমের হয়েছে না-কি ?

জি-না। আজ ওর কাছে লেখা একটা চিঠি হঠাৎ ড্রয়ারে পেয়ে মনটা খারাপ হয়েছে।

চিঠি ? কার চিঠি ?

বাদ দিন।

না, না। বাদ দেব কেন ? আপনি আমার বন্ধু মানুষ। আপনার একটা সমস্যা হলে আমি দেখব না ? কী পেয়েছেন বলুন। প্রেমপত্র ?

ই।

কে লিখেছে ?

বাদ দিন।

নামটা বলুন। খোঁজ নেব। স্ট্রেইট লাইন বানিয়ে ছেড়ে দেব।

ওর নাম মনসুর। আমার ধারণা, রুবা এখন ওর বাসাতেই আছে। চক্ষুলাজ্জায় পড়ে খোঁজ নিতে পারছি না।

আপনাকে কোনো খোঁজ নিতে হবে না। আপনি ডেলিকেট অবস্থায় পড়েছেন সেটা বুঝতে পারছি। খোঁজ-খবর আমিই করব। টেলিফোন নাম্বার আছে ঐ লোকের? থাকলে দিন। এক্ষুণি পাস্তা লাগাচ্ছি। তারপরেই আমি আপনাকে জানাব। মন খারাপ করবেন না ভাই। বি হ্যাপি। লাইফে এরকম হয়।

আমি মনসুরের টেলিফোন নাম্বার দিয়ে দিলাম। এখন বেশ নিশ্চিত বোধ করছি। মনটা হালকা লাগছে। আমার কাজ অনেক সহজ হয়ে গেছে। আমি এখন যা করব তা হলো...

পানির পিপাসা হচ্ছে। তীব্র পানির পিপাসা। পোলাও খাবার জন্যে এটা হচ্ছে। পানির পিপাসার একটা ব্যাপার হচ্ছে এটা আস্তে আস্তে হয় না। হঠাৎ পিপাসা শুরু হয়। আমি ফ্রিজ খুলে পরপর দু' গ্লাস পানি খেলাম। বাথরুম সেরে রাখার জন্যে বাথরুমে ঢুকলাম। দু'গ্লাস পানি খেয়েছি, বাথরুম তো পাবেই। বাথরুমের দরজা বন্ধ করা মাত্রই হঠাৎ মনে হলো— এখন যদি দরজা আর খুলতে না পারি তাহলে কী হবে? এরকম একটা গল্প কোথায় যেন পড়েছিলাম— বন্ধু একা থাকে, তাকে সে খুন করল। খুনের পর পর তার খুব পিপাসা পেয়ে গেল। সে পুরো এক জগ পানি খেয়ে ফেলল। পানি খাওয়ার পর পর ঢুকল বাথরুমে। দরজা বন্ধ করে বাথরুম সারল, তারপর আর বাথরুমের দরজা খুলতে পারে না। ছিটকিনি শক্ত হয়ে এঁটে গেছে। প্রাণপণ শক্তি দিয়েও সে কিছুই করতে পারছে না। পরদিন পুলিশ এসে দরজা খুলে তাকে বের করল। অতিপ্রাকৃত কোনো ব্যাপার এর মধ্যে ছিল না, পুরো ব্যাপারটাই ছিল সাধারণ একটা ব্যাপার। খুনীর শরীর দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। মাংসপেশি হয়েছিল শিথিল। শিথিল মাংসপেশি নিয়ে সে ছিটকিনি খুলতে পারছিল না। যতই সময় যাচ্ছিল ততই তার শরীর আরো দুর্বল হয়ে পড়ছিল। এর বেশি কিছু না।

আরেকটা গল্প শুনেছিলাম— এক লোক গরু বিক্রি করে ফিরছে। পথে এশার নামাজের সময় হলো। সে নামাজ পড়তে ঢুকল এক গ্রামের মসজিদে। তাকে অনুসরণ করছিল এক চোর। সেও সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে ঢুকল। মুসল্লীরা নামাজ শেষ করে চলে গেছেন। সে একা একাই নামায়ে দাঁড়াল। তখন চোরটা তাকে জাপ্টে ধরল টাকা নেবার জন্যে। দুজনে ধস্তাধস্তি হচ্ছে— চোরটা এক পর্যায়ে ছুরি বসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। চোরটা গরু বিক্রির টাকাটা নিয়ে নিল। তারপরেই হলো সমস্যা। চোর সারা মসজিদে ছোটাছুটি করছে। দরজা খুঁজে পাচ্ছে না। ব্যাকুল হয়ে সে ঘুরছে আর চেষ্টাচ্ছে— দরজা কই? দরজা কই?

পুরো সাইকোলজিক্যাল একটা ব্যাপার। এর মধ্যে অতিপ্রাকৃত কিছু নেই। ভূমিকম্পের সময়ও এরকম হয়। আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ ঘরের ভেতর ছোটাছুটি করে দরজা খুঁজে পায় না। আগুন লাগলেও এমন হয়। আমার মেজো মামার বাড়িতে একবার আগুন লাগল। ঘুম ভেঙেই তিনি দেখেন— দাউ দাউ করছে আগুন। তিনি ছোটাছুটি করতে লাগলেন এবং চেষ্টাতে লাগলেন, দরজা পাইতেছি না! দরজা!

আমি বাথরুম সারলাম। চোখে-মুখে খানিকটা পানি দিলাম। ছিটকিনি খুলতে আমার বেগ পেতে হলো না। বাথরুমের বাইরে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আর তখন শোবার ঘরে ধপ করে শব্দ হলো।

এর মানে কী ?

কানে ভুল শুনছি ? ধপ করে শব্দ হবার কী আছে ? চেয়ার টানার শব্দ হচ্ছে। কে যেন চেয়ার টানছে। মেঝের উপর চেয়ার টানার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ। কে চেয়ার টানবে ?

আমি শোবার ঘরে শুয়ে পড়লাম। কোনো দুর্বলতাকে প্রশয় দেয়া যাবে না। ভয় পাওয়া যাবে না। কিছুতেই না। ভয় এমন বস্তু যে, একবার ভয় পেলেই তা ফুলে-ফেঁপে বাড়তে থাকে।

আমি শোবার ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই টেলিফোন বেজে উঠল। আমি রিসিভার কানে তুলে বললাম, হ্যালো।

ওসি রমনা থানা বলাছ।

স্নামালিকুম ভাই।

ওয়ালাইকুম সালাম— মিজান সাহেব, আমি ঐ মনসুরকে টেলিফোন করেছিলাম। আপনার স্ত্রী ওখানে নেই। কনফার্ম। পুলিশের টেলিফোন পেয়ে সে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে। সে বলেছে আপনার স্ত্রী তার কাছে যান নি, তবে তিনি টেলিফোন করেছিলেন।

কী বললেন ? টেলিফোন করেছিল ?

জি। রাত নটার দিকে টেলিফোন করেছিল। আপনার নাকি তাঁকে নিয়ে কোনো বিয়েতে যাবার কথা। আপনি তাঁকে ফেলে চলে গেছেন, এই নিয়ে দুঃখ করছিলেন।

ও।

কাজেই আপনি কোনো রকম দৃষ্টিভ্রান্তি কববেন না। আর শুনুন ভাই, আমি ঐ মনসুর ব্যাটাকে আভার অবজারভেশন রাখব। লাইফ হেল কবে দিব। কোনো চিন্তা করবেন না।...

তার কথা শুনতে শুনতে নিজের অজান্তেই আমি খাটের দিকে তাকালাম। আমি এটা কী দেখছি ? রুবা শুয়ে নেই। সে বসে আছে। কুকুর যেমন থাবা গেড়ে বসে সেও ঠিক সে-রকম থাবা গেড়ে বসে আছে। তবে তাকিয়ে আছে খোলা দরজার দিকে। আমার দিকে না। ব্যাপারটা এতই অস্বাভাবিক যে কিছুক্ষণ আমার মধ্যে কোনো পরিবর্তন হলো না। আমি শুধু তাকিয়ে রইলাম। এক সময় দৃশ্যের অস্বাভাবিকতা আমার মাথায় ঢুকল। ঝন ঝন একটা শব্দ হলো— দেখি টেলিফোন রিসিভার আমার হাত থেকে পড়ে গেছে।

টেলিফোন রিসিভার থেকে শব্দ আসছে— হ্যালো। হ্যালো। হ্যালো। স্কীণ আওয়াজ যেন অনেক দূর থেকে কেউ ডাকছে। আমি টেলিফোনের কানেকশন খুলে ফেললাম। টেলিফোন কানেকশন খুলতে যতটা সময় লাগানো উচিত তারচেয়েও বেশি সময় লাগলাম। যেন টেলিফোন কানেকশন খোলা এই মুহূর্তে সবচে' জরুরি কাজ। এটাই একমাত্র সত্য আর সব মিথ্যা।

কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকলে কেমন হয় ? চোখ রেষ্ট পাক। রেষ্ট পেলে সব স্বাভাবিক হবে। তখন দেখা যাবে কেউ কুকুরের মতো খাবা গেড়ে দরজার দিকে তাকিয়ে বসে নেই। সবই ভ্রান্তি। কিন্তু চোখ বন্ধ করার মতো সাহসও পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে, একবার যদি চোখ বন্ধ করি তাহলে আর চোখ খুলতে পারব না। কিংবা খুললেও সেই চোখে কিছুই দেখব না। এসব হচ্ছে দুর্বল মনের কল্পনা। দুর্বল মনের কোনো কল্পনাকে প্রশ্ন দেয়া ঠিক হবে না। এখন মন শক্ত করতে হবে। অনেক কাজ বাকি আছে। আসল কাজই বাকি। এতক্ষণ যা করেছি সব নকল কাজ।

ডেডবডি সরাতে হবে। দ্রুত সরাতে হবে। এমনভাবে সরাতে হবে যেন কেউ এর কোনো খোঁজ না পায়। ডেডবডি পাওয়া না গেলে খুনের মামলা দাঁড় হয় না। খুন হয়েছে কি-না তা জানার প্রথম শর্ত হলো ডেডবডি। সুরতহাল হবে। ডাক্তাররা বলবেন, ‘খুন’। তবেই না মামলা চালু হবে।

ডেডবডি সামলানোর প্রচলিত যে ক’টি পদ্ধতি আছে তার সব কটিতে গণ্ডগোল আছে। একটাও ফুল ফ্রফ নয়। লোকজন কী করে বস্তায় ভরে নদীতে ফেলে দেয় ? দুদিন না যেতেই বস্তু ভেসে উঠে। উৎসাহী লোকজন ছুটে আসে। বস্তু খোলা হয়। পত্রিকায় রিপোর্টের পর রিপোর্ট বের হতে থাকে। আরেকটা পদ্ধতি হচ্ছে, মাটি খুঁড়ে মাটি চাপা দেয়া। পদ্ধতিটা খারাপ না, তবে এর জন্যে গর্ত গভীর হতে হবে। মাটি চাপা দেবার এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে মাটি চাপা দেয়া হয়েছে, যা অসম্ভব কঠিন কাজ।

আমার পদ্ধতি ভিন্ন। সহজভাবে পদ্ধতিটা হলো— ডিসপারসান পদ্ধতি। টুকরো টুকরো করে বড় একটা অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়া। যত ক্ষুদ্র টুকরা হবে এবং যত বেশি ছড়ানো যাবে তত দ্রুত হত্যার প্রধান আলামত মৃতদেহ উবে যাবে। কোনো টুকরা কুকুরে খাবে, কোনোটা খাবে কাক। আমি ঠিক করেছি— ডেডবডি বাথরুমে নিয়ে... ছোট ছোট পিস করা হবে... থাক, এখন এসব চিন্তা করে লাভ নেই। আপাতত কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকি। তারপর চোখ খুলব এবং দেখব রুবা বসে নেই। আগে যেভাবে বিছানায় ছিল এখন সেভাবে বিছানাতেই আছে।

আমি চোখ বন্ধ করলাম এবং মনে মনে বলতে থাকলাম— ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ান, ওয়ান থাউজেন্ড টু, ওয়ান থাউজেন্ড থ্রি...। কতক্ষণ চোখ বন্ধ করে আছি সেই আন্দাজ পাওয়ার জন্যই বলা। ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ান বলতে এক সেকেন্ড সময় লাগে।

ওয়ান থাউজেন্ড থার্ড পর্যন্ত আমি চোখ বন্ধ করে আছি অর্থাৎ প্রায় ৩০ সেকেন্ড চোখ বন্ধ। অনেকখানি সময়। চোখ খুললাম।

রুবা বসে আছে। তবে এখন সে তাকিয়ে আছে আমার দিকে পলকহীন চোখে। ঈষৎ হাঁ করে আছে। জিভ দেখা যাচ্ছে। জিহ্বার রঙ এখনো গাঢ় কালো।

যে বসে আছে সে রুবা নয়। She is dead. Dead and gone.... এ অন্য কেউ। আমি টেলিফোনের কাছে রাখা চেয়ারে বসে পড়লাম, আর তখনই রুবা স্পষ্ট করে বলল, পানি খাব।

সে কি সত্যি কথা বলছে, না আমি ভুল শুনছি ? অডিটরী হেলুসিনেশন। আমার মাথা বোধহয় জট পাকিয়ে গেছে। সে আবারো বলল, পানি খাব।

আমি লক্ষ করলাম, কথাগুলি বলার সময় তার ঠোঁট নড়ল না, জিহ্বা নড়ল না। গলার স্বর রুবার মতোই, তবে অস্পষ্ট, জড়ানো।

আমি বললাম, পানি খাবে ?

হঁ, তিয়াশ হয়েছে।

রুবাই কথা বলছে। তিয়াশ শব্দটা রুবার শব্দ। এটা রুবা বলে। আমি কী করব ? পানি এনে দেব ? আমার পক্ষে এমন হাস্যকর কিছু করা কি সম্ভব ? আমি পানি এনে দিচ্ছি একটা মৃতদেহকে। আমি নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, রুবা!

হঁ।

তুমি বেঁচে নেই। তুমি মারা গেছ। You are dead. Dead like a stone.
পানি খাব।

তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ ? আমি তোমাকে মেরে ফেলেছি।

ও।

তুমি শুয়েছিলে। আমি একটা বালিশ এনে তোমার মুখের ওপর চেপে ধরেছি।

ও।

তুমি যে মাথা গেছ তা কি বুঝতে পারছ ?

পানি।

পানি আমি তোমাকে এনে দেব। তুমি ভেব না আমি তোমাকে দেখে আতঙ্কে অস্থির হয়েছি। আমার ভয় খুব কম। অন্য যে কেউ এই অবস্থায় শ্রটফেল করে মরে যেত। আমি মবি নি এবং আমি কথা বলছি তোমার সঙ্গে। আমি কি বলছি বুঝতে পারছ ? বুঝতে পাবলে মাথা নাড়াও।

রুবা মাথা নাড়ল না। যেভাবে বসেছিল সেভাবেই বসে রইল।

আমি খাবার ঘরে ঢুকলাম। প্রথমে বের করলাম ব্রান্ডি বোতল। পুরো কাপ ভর্তি করে ব্রান্ডি ঢাললাম। ব্রান্ডির জন্য আলাদা গ্লাস আছে। গ্লাস বের করতে ইচ্ছা করছে না। অতি দ্রুত স্নায়ুর উপর দিয়ে ঝড় বইয়ে দিতে হবে। তখন শরীর ঠিক হবে। সব ফিরে যাবে আগের জায়গায়। ব্যাক টু দি প্যাভিলিয়ন।

কাপের ওপর পিঁপড়া ভাসছে। ভাসুক। পিঁপড়া খাওয়া ভালো। পিঁপড়া খেলে সাঁতার শেখা যায়। আচ্ছা, আমি কি সাঁতার জানি ? সাঁতার জানি কি জানি না অনেক ভেবেও মনে করতে পারলাম না। তার মানে আমার মস্তিষ্ক কাজ কবছে না। মুখ ভর্তি ব্রান্ডি নিয়ে গিলে ফেললাম। জিহ্বা, নাড়ি-ভুঁড়ি জ্বলতে লাগল। জ্বলুক। জ্বলে ছাই হয়ে যাক।

এই, এই!

রুবা ডাকছে। পানি খেতে চায়। তাকে পানি খেতে দেব, না এক কাপ ব্রান্ডি দেব ?

কেউ পানি চাইলে নিষেধ করতে নেই। কেউ পানি চাইলে তাকে পানি দিতে হয়, পানি না দিলে রোজ হাসরের ময়দানে যখন তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে যাবে তখন পানি পাওয়া

যাবে না। এই কথা বলতেন আমার মা। কোনো ভিখিরি পানি চাইলে আমার মা অতি ব্যস্ত হয়ে বলতেন— মিজান, ও মিজান! বাপধন, পানি দিয়ে আয়। টিনের মধ্যে টোস্ট বিস্কুট আছে। বিস্কুট দিয়ে পানি দে।

ভিখিরিদের পানি খাওয়ানোর জন্যে আমাদের একটা বড় এলুমিনিয়ামের গ্রাস ছিল। মাসের প্রথমেই বড় একটা টিন ভর্তি টোস্ট বিস্কিট কিনে রাখা হতো। অন্য বিস্কিটগুলো নরম হয়ে যায়। টোস্ট বিস্কিট কখনো নরম হয় না, যতই দিন যায় ততই শক্ত হতে থাকে— শক্ত হতে হতে এক সময় লোহার মতো শক্ত হয়ে যায়।

একবার এক ভিখিরি ভিক্ষা চাইতে এসেছে— আমি যথারীতি তাকে এক গ্রাস পানি এবং একটা টোস্ট বিস্কিট দিলাম। সেই বুড়ো ভিখিরি বিস্কিট দেখে আনন্দে অভিভূত হলো। আমি দেখলাম, সে পানিতে বিস্কিট ভিজিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করছে। লোকে চায়ে বিস্কিট ভিজিয়ে খায়, সে খাচ্ছে পানিতে ভিজিয়ে। কিন্তু বিস্কিট নরম হচ্ছে না।

আমার মা দিনের পর দিন ভিখিরিদের পানি খাইয়ে গেলেন। নিজে মৃত্যুর সময় পানি খেতে পারলেন না। তার জলাতঙ্ক হয়েছিল। কুকুর তাঁকে কামড়ায় নি— শুধু আদর করে আঁচড়ে দিয়েছিল।

এই কুকুর ছিল মায়ের পোষা। দুপুরের দিকে বাসায় এসে দরজা ধাক্কাতো। মা একটা টিনের থালায় ভাত-মাছ দিয়ে বলতেন— ধর খা।

সে ভাত-মাছ খেয়ে আরাম করে খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে বিদেয় হতো। অসুস্থ হবার পর কুকুরটা এলো চোখ লাল করে। কী ভয়ঙ্কর চেহারা! মা বললেন, এই, তোর কী হয়েছে রে? তুই এই রকম করছিস কেন?

কুকুর ঘড়ঘড় আওয়াজ করল। সেই আওয়াজও ভয়াবহ। মা কিছুই বুঝতে পারলেন না। নিজেই টিনের থালায় ভাত বেড়ে দিলেন। কুকুর খাবারে মুখ দিল না। ঝাঁপ দিয়ে মা'র কোলে উঠে তাঁকে আঁচড়ে দিল। মা বিরক্ত গলায় বললেন— করে কী, করে কী? তিনি ছিঃ ছিঃ করে উঠে গেলেন। অবেলায় গোসল করলেন। সন্ধ্যার দিকে তাঁর অল্প জ্বর হলো। পরদিন দিব্যি ভালো। তখনো তিনি জানেন না তাঁর শরীরে ভয়ঙ্কর বিষ ঢুকে গেছে। যখন জানা গেল তখন করার কিছুই ছিল না।

মৃত্যুর সময় তাঁকে স্টোর রুমে তালাবন্ধ করে রাখা হলো। স্টোর রুমের একটা জানালা। সেই জানালায় শিক বসানো। মা দু'হাতে শিক চেপে ধরে শ্লেষ্মা জড়ানো ভারি গলায় চিৎকার করতেন, পানি! পানি!

রুবা 'পানি পানি' বলছে। তার গলার স্বরটা কি ভারি শোনাচ্ছে না? শ্লেষ্মা জড়ানো মনে হচ্ছে না? না-কি আবারও শোনার ভুল? মা'র কথাই বা এখন মনে পড়ল কেন? আমি মা'র কথা মনে করতেই চাই না। মনে করিও না। এটা কি ব্রান্ডি খাওয়ার জন্যে হয়েছে? মাথা ঝিমঝিম করছে, শরীর হালকা। এতটা ব্রান্ডি এক সঙ্গে খাওয়া ঠিক হয় নি। ভুল হয়েছে। একটা ভুল যদি কেউ করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সে আরো তিনটা ভুল করে। ভুল একা চলে না, সে চলে সঙ্গি-সাথি নিয়ে। আমি এখন পরপর কয়েকটা ভুল করব। সেই ভুলগুলি কী কী?

শোবার ঘর থেকে আবার শব্দ হলো— পানি, পানি।

আমি গ্রাস ভর্তি করে পানি নিলাম। রুবার নিজের গ্রাসেই নিলাম। সে অন্যের গ্রাসের পানি খেতে পারে না। এখন সে বেঁচে নেই। সে সে... কী বলতে চাচ্ছি বুঝতে পারছি না। মৃত মানুষের জন্যে পানি নিয়ে যাচ্ছি, এটা কি দ্বিতীয় ভুল না? আচ্ছা, আমি একজন মৃত মানুষের জন্যে পানি নিয়ে যাচ্ছি কেন?

পানির গ্রাস রুবার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। সে হাত বাড়িয়েছে কিন্তু গ্রাস ধরতে পারছে না। তার আঙ্গুল কাঁপছে। আমি বিছানার পাশে সাইড টেবিলে গ্রাস নামিয়ে রাখলাম। সে পারলে টেবিল থেকে গ্রাস নেবে। না পারলে নেবে না। আমার পানি দেবার কথা, আমি দিয়েছি। বাকিটা তার ব্যাপার।

রুবা এগুচ্ছে। হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছে। তাকে দেখাচ্ছে কুকুরের মতো। জলাতঙ্ক রোগি শেষের দিকে কুকুরের মতো হয়ে যায়। কুকুরের মতো ঘড় ঘড় শব্দ করে, মুখ দিয়ে লালার বরতে থাকে এবং জিহ্বা বের করে দেয়। এটা আমার কথা না; ইদ্রিস বলে আমাদের যে কাজের ছেলে ছিল তার কথা।

মা'র যখন জলাতঙ্ক ধরা পড়ল তখন সে চুপি চুপি আমাকে বলল। আমার তখন সাত বৎসর বয়স। ইদ্রিস আমার শিক্ষাগুরু। কত কিছু আমাকে সে শেখায়। তার প্রতিটি শব্দ আমি বিশ্বাস করি।

বুঝছেন ছোট মিয়া, কুত্তায় কামড়াইলে পেড়ে কুত্তার বাচ্চা হয়। মেয়েছেলের পেড়েও হয়। পুরুষ ছেলের পেড়েও হয়। আব মানুষটা আন্তে আন্তে কুত্তার লাহান হয়। তার শইল্যে লোম উইঠা যায়— ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। এক আচানক দৃশ্য ছোট মিয়া...

তুমি দেখেছ?

কত দেখলাম। অখন তুমিও দেখবা।

স্টোর রুমের আশেপাশে আমাদের যাওয়া নিষেধ ছিল। তারপরেও মাঝে মাঝে উঁকি দিতাম মা কতটা কুকুর হয়েছেন দেখার জন্যে। মা আমাকে চিনতে পারতেন না। কাউকেই পারতেন না। শুধু আমার বড়বোনকে চিনতেন। বড়বোনকে দেখলেই বলতেন— মিনা, বাতাস বাতাস।

কেন বলতেন আমরা জনতাম না। বোধহয় তাঁর গরম লাগত। স্টোর ঘরটা ছিল ছোট। একটাই জানালা। মা শেষদিকে টেনে টেনে তাঁর গায়ের সব কাপড় ছিঁড়ে ফেললেন। পুরো নগ্ন হয়ে মেঝেতে হামাগুড়ি দিতে শুরু করলেন। যা পেতেন, কামড়ে ধরতেন। একদিন দেখি, পুরনো জুতা চিবুচ্ছেন। ইদ্রিস বলল, ছোটমিয়া দেখছেন— ক্যামনে কুত্তা হইতাছে? থিক্ থিক্ থিক্।

ব্যাপারটা তার কাছে খুব মজার মনে হচ্ছিল। সে বলতে গেলে সারাক্ষণই স্টোররুমের আশেপাশে ঘুরঘুর করত। বাবা একদিন তাকে মারলেন। ভয়ঙ্কর মার। ইদ্রিসের চোঁট কেটে গেল। দাঁত ভেঙে গেল। রক্তে তার গেঞ্জি মাখামাখি। সে নাকি স্টোর রুমের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থিক্ থিক্ করে হাসছিল। বাবা হুঙ্কার দিলেন। হারামজাদা, তোকে আমি খুন করে ফেলব। হুঙ্কার এবং চড় খাণ্ডড়, কিল ঘুসি। বাবারও বোধহয় মাখা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মা'র মৃত্যুর কাছাকাছি সময় তিনি যা করে

সবই পাগলের কাজ। সুস্থ মানুষের কাজ না। সুস্থ মানুষ এইসব করে না। যেমন—মঙ্গলবার শেষরাতে বাবা বিছানা থেকে আমাদের টেনে নামালেন। চাপা হুঙ্কার—অজু কর, অজু কর। আমরা চার ভাইবোন অজু করলাম। আয় আমার সাথে—তোর মাকে দেখবি।

আমরা স্টোর রুমের সামনে এসে দাঁড়িলাম। স্টোর রুম অন্ধকার। বাবা মা'র ওপর টর্চের আলো ফেললেন। কী কুৎসিত দৃশ্য! যেন একটা পশু চার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—যেঁ য়ো শব্দ হচ্ছে। বাবা বললেন, দেখলি ?

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, হঁ।

এখন আয় আমার সাথে।

আমরা বাবার শোবার ঘরে ঢুকলাম। সেখানে বিছানায় পাটি পাতা। বাবা বললেন, পাটিতে বসে আল্লাহর কাছে হাত তুলে বল, হে আল্লাহপাক, আমার মা'র সব কষ্টের অবসান কর। আমার মা'র মৃত্যু দাও। স্বামীর কথা আল্লাহ শুনবে না। স্বামীরা প্রায়ই স্ত্রীর মৃত্যু কামনা করে। ছেলেমেয়ের কথা শুনবে। দোয়া কর।

আমরা দোয়া করলাম।

বাবা পাথরের মতো মুখ করে পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, দোয়া শেষ করে বারান্দায় এসে দাঁড়িলাম, আমাদের কাজের মেয়ে রহিমাবু এসে বলল—আত্মজান নড়াচড়া করতেছে না, মনে হয় উনার মৃত্যু হইছে।

আমরা দোয়া করেছি বলে মা'র মৃত্যু হয়েছে এটা আমি মনে করি না। আমি আমার অন্য ভাইবানদের কথা জানি না। কিন্তু আমি নিজে মা'র মৃত্যুর কথা আল্লাহকে বলি নি। আমি হাত তুলে চুপচাপ বসেছিলাম। ভাইবোনদের দোয়ার কারণে মা'র মৃত্যু হয়েছে বলে আমি মনে করি না। আমার ধারণা, দোয়া না করলেও মঙ্গলবার ভোরবেলা তাঁর মৃত্যু হতো।

মা'র মৃত্যুর পর বাবা চাকরি ছেড়ে দিলেন। বেশির ভাগ সময়ই তিনি স্টোর রুমের দরজা বন্ধ করে বসে থাকতেন। খাওয়া-দাওয়ার খুব অনিয়ম করতেন। হয়তো টেবিলে খাওয়া দেয়া হয়েছে, তাঁকে খেতে ডাকা হলো, তিনি বললেন, না।

আমার মনে হয় তাঁর মাথার গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছিল। একদিন হঠাৎ বললেন, তিনি আর পানি খাবেন না। —আমার স্ত্রী পানির জন্যে ছটফট কবেছে, পানি পায় নাই। আমিও পানি খাব না।

তাঁকে পানি অবশ্যি খাওয়ানো হয়। আমার ছোটখালা কাঁদতে কাঁদতে যখন বলেন, পানি খান দুলাভাই। আপনি মারা গেলে বাচ্চাদের কে দেখবে ? বাবা পানি খান। তাঁর মাথা কিছু সারে না। কথাবার্তা বন্ধ করে দেন।

তাঁর একটাই কথা—একটা মানুষ যে কোনোদিন কোনো অন্যায় করে নাই, কোনো পাপ করে নাই, মানুষের দুঃখ দেখলে যে অস্থির হয়ে যেত—তার কেন এই কষ্ট ?

বাবা তখন খুব অসুস্থ, আমরা সবাই তাঁকে ঘিরে আছি, তখন তিনি একদিন বললেন—তোরা শুনে রাখ। কেউ পানি চাইলে তোর মা অস্থির হয়ে পড়ত—কোনো

ফকির-মিসকিন বলতে পারবে না সে পানি চেয়েছে, তোদের মা শুধু পানি তাকে দিয়েছে। পানি দিয়েছে, পানির সঙ্গে কিছু খেতে দিয়েছে। সে মরল কীভাবে? পানির তৃষ্ণায়।

কোনো মেয়ে ছেঁড়া শাড়ি পরে এসেছে। এমন শাড়ি যে শরীর ঢাকতে পারছে না।— তোদের মা তৎক্ষণাৎ তাকে শাড়ি দিয়েছে। কত রাগারাগিও এই নিয়ে তোদের মা'র সঙ্গে করেছি। সে কী বলত? বলত, আহা, শরীর ঢাকতে পারছে না— লোকজন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে— কী লজ্জা! সে মরল কীভাবে! লজ্জার মধ্যে। সে যখন মরল নগ্ন অবস্থায় মরল। হেন লোক নেই যে তাকে নগ্ন দেখে নি।

পশু-পাখির জন্যে তার মমতার শেষ ছিল না। একটা কাক এসে রেলিং-এ বসলে সে কী করত? ভাত ছিটিয়ে দিত। বলত, আহা বেচারি, খিদে পেটে এসেছে। কুকুর-বেড়াল যেটাই এসেছে, টিনের থালায়, খাবার দিয়েছে। সে মরল কীভাবে? কুকুরের হাতে।... কেন? বল কেন? চুপ করে থাকবি না। বল।

চুক চুক শব্দ হচ্ছে।

তাকিয়ে দেখি, হামাগুড়ি দিয়ে রুবা চেয়ারের কাছে পৌঁছে গেছে। গ্লাসের পানি খাচ্ছে। মানুষের মতো না, কুকুরের মতো। জিব পানিতে-ডুবিয়ে টেনে টেনে নিচ্ছে। কুচকুচে কালো একটা জিব। অনেকখানি লম্বা। হচ্ছেটা কী? তার গায়ে কাপড়ও নেই। সে কাপড় খুলল কখন?

আমি তাকিয়েই আছি। রুবা পানি খেতে খেতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, গরম! গরম!

আমি ঘর ছেড়ে বাইরে চলে এলাম বারান্দায়। আমারও গরম লাগছে। বারান্দায় খানিকক্ষণ বসা যাক। Something is wrong. Something is very wrong.

ঘরের ভেতরের তুলনায় বাইরে অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা। উত্তরের বারান্দা, ঠাণ্ডা হবেই। হিমালয় থেকে ঠাণ্ডা বাতাস মনে হয় ছাড়তে শুরু করেছে। বারান্দায় দু'টা প্লাস্টিকের ফোল্ডিং চেয়ার। রুবা গুলশান এক নম্বর মার্কেট থেকে কিনে এনেছিল। হলুদ ফ্রেমের ভেতব সবুজ প্লাস্টিকের ফিতার বুনোনের চেয়ার। সুন্দর। চেয়ার দু'টা কেনার পর সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মানানসই টেবিলের জন্য। কোনো টেবিলই তার পছন্দ হয় না। সুন্দর চেয়ার দু'টির সঙ্গে নাকি কোনো টেবিলই মিশ খায় না। শেষটায় সে খবর দিয়ে আনল তাব এক মামাতো ভাই মাজহারকে। আর্ট কলেজের ছাত্র। সে নাকি ডিজাইন করবে। এই ডিজাইন মতো টেবিল হবে। মাজহারের কোনো ডিজাইনই রুবার পছন্দ হয় না। যেটা পছন্দ হলো সেই টেবিলই এই মুহূর্তে আমার সামনে। বদখত একটা জিনিস। আমি অবশ্য রুবাকে বলেছি— ভালো। তেমন উচ্কাস দেখাই নি। উচ্কাস আমি কখনো দেখাই না।

বারান্দাটা রুবা আমাদের দু'জনের জন্যে সাজিয়েছে। বারান্দায় আমরা বসব। চা খাব। অন্য কেউ এখানে আসতে পারবে না। এ বাড়ির এই অংশটিতে কারোরই প্রবেশাধিকার থাকবে না। এখানে আসতেও হবে খালি পায়ে।

এখন অবশ্যি আমি খালি পায়েই আছি। পায়ে ঠাণ্ডা লাগছে। টেবিলের উপর পা তুলে দিলাম। এখন মজা হয় রুবা যদি ট্রেতে করে দু'কাপ চা নিয়ে এসে উপস্থিত হয় এবং বলে— নাও, চা নাও। কীভাবে বসেছ ? পা নামিয়ে ভদ্র হয়ে বোস।

এখানে যে কাক্তকারখানা ঘটছে তা কি কাউকে বলা যায় ? বললে কি কেউ বিশ্বাস করবে ? আমি যদি আমাদের অফিসের নুরুজ্জামান সাহেবকে ঘটনাটা বলি তিনি কী ভাববেন ? বা আমি যদি এখনই উনাকে টেলিফোন করে বলি যে কিছুক্ষণ আগে আমি আমার জ্বীকে খুন করেছি, তাহলে উনি কী মনে করবেন ? তার মুখের ভাব কীভাবে বদলাবে ? চিন্তা করেই হাসি পাচ্ছে। খানিকক্ষণ হাসলাম। নিজেব মনেই হাসলাম। মনে মনে নুরুজ্জামান সাহেবের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছি। উনার মুখের ভাব বদলাচ্ছে— কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি, আর আমার হাসি পাচ্ছে। ব্রাভির প্রভাব। ব্রাভিটা বেশি খাওয়া হয়ে গেছে। এতটা খাওয়া ঠিক হয় নি।

হ্যালো নুরুজ্জামান সাহেব ?

জি। জি। (নুরুজ্জামান সাহেব বেশিরভাগ কথাই দু'বার করে বলেন।)

আমাকে চিনতে পারছেন ?

কেন চিনব না ? কেন চিনব না ? আপনি জামান। জামান। ব্যাপার কী, এত রাতে! খবর ভালো ?

জি, খবর ভালো। তবে কিছুক্ষণ আগে খুন করেছি।

কী করেছেন ?

খুন! মার্ডার।

নুরুজ্জামান সাহেব ফোঁস ফোঁস জাতীয় শব্দ করছেন।

বুবালেন নুরুজ্জামান সাহেব, ও ঘুমাচ্ছিল। মুখের উপর বালিশ চেপে ধরেছি। দশ মিনিটেই রেজাল্ট আউট।

হঁ।

ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা হচ্ছে, মরার পরে সে আবার বেঁচে উঠেছে। ঘুব ঘুর করছে। পানি খাচ্ছে।

ও পানি খাচ্ছে। পানি খাচ্ছে।

মানুষের মতো খাচ্ছে না। কুকুরের মতো খাচ্ছে। জিব পানিতে ভিজিয়ে চেটে চেটে নিচ্ছে। আসুন না, দেখে যাবেন।

জি না। জি না।

দেখলে মজা পাবেন রে ভাই— ওর গায়ে কোনো কাপড় নেই— দিগম্বর। অন্যের জ্বীকে নেংটো দেখার সৌভাগ্য তো সবার হয় না। তাছাড়া রুবা অসম্ভব রূপবতী।

আমি হো হো করে হাসছি। এরকম একটা টেলিফোন কাউকে করতে পারলে হতো। তবে গুরুতে সবাই আমার কথা মন দিয়ে শুনলেও শেষটায় তারাও হেসে ফেলত। মৃত মানুষ হেঁটে বেড়ায় না। পানি খায় না। অতীতে কখনো খায় নি।

বর্তমানেও খাচ্ছে না। ভবিষ্যতেও খাবে না। আমার মাথায় কিছু হয়েছে। মাথায় রক্ত উঠে গেছে বা এই জাতীয় কিছু। এরকম এক গল্পও তো কোনো এক বিখ্যাত ডাক্তারকে নিয়ে প্রচলিত আছে। ডাক্তারটার নাম কি বিধানচন্দ্র না ?

তিনি তখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র। পরীক্ষা এগিয়ে আসছে। রাত-দিন পড়াশোনা করেন। সেই বিশেষ ঘটনার দিন গভীর রাত পর্যন্ত পড়লেন। রাত দু'টার দিকে মনে হলো, ডেডবডি ডিসেকশান তো ভালো মতো শেখা হয় নি। মর্গে ডেডবডি আছে। একা একা গিয়ে কাটাকুটি করে দেখা যেতে পারে। যেই ভাবা সেই কাজ। নাইটগার্ডের কাছ থেকে চাবি নিয়ে মর্গে ঢুকলেন। একটা ডেডবডি টেবিলে শোয়ানো। তিনি ঢোকামাত্র ডেডবডি উঠে বসল। অন্য যে-কেউ হলে ফিট হয়ে ধড়াম করে মেঝেতে পড়ে যেত। কিংবা দুর্বল হার্টের হলে হার্টফেল করে মরে যেত। বিধানচন্দ্রের বেলায় কিছুই হলো না। তিনি বুঝলেন, ভেইন থেকে দূষিত রক্ত মাথায় ঢুকে গেছে বলে হেলুসিনেশন হচ্ছে। তিনি যে ভেইন মাথায় রক্ত দেয় সেটা বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, ডেডবডি আগের জায়গাতেই আছে। তিনি কাটাকুটি শেষ কবে হাত-মুখ ধুয়ে আবার পড়তে বসলেন এবং যথারীতি পরীক্ষায় ফাস্ট বা সেকেন্ড এ জাতীয় কিছু হয়ে সবাইকে স্তম্ভিত করলেন।

নিতান্তই অবিশ্বাস্য গল্প। বিখ্যাত মানুষদের নিয়ে গল্প বানাতে হয়। এটিও বানানো হয়েছে। প্রথম কথা— ভেইন দিয়ে দূষিত রক্ত মাথায় যায় না। ভেইন থেকে দূষিত রক্ত বের হয়ে আসে। দ্বিতীয়ত, মেডিকেল কলেজের মর্গে ডেডবডি ফেলে রাখবে, ছাত্ররা অফটাইমে কাটাকুটি করবে, তাও অসম্ভব একটা ব্যাপার। ডেডবডি এত সস্তা না। কাটাব জন্যে ব্যাঙ জোগাড় করতেও ঝামেলা হয়, আর এটা হলো মৃত মানুষ। কাজেই বোগাস। অল বোগাস।

আমার ঘরে যা ঘটছে তাও অল বোগাস। আমার মাথা উত্তেজিত। এর বেশি কিছু না। ব্রেইনে অক্সিজেনের অভাব হচ্ছে। লোহিত রক্তকণিকা বেশি বেশি করে অক্সিজেন মস্তিষ্কে পৌঁছাতে পারছে না। বারান্দায় বসে থাকলে একটা সুবিধা হবে— ফ্রেশ বাতাস পাব। ফ্রেশ বাতাস যানেই অক্সিজেন। ফুসফুস ভর্তি করে অক্সিজেন নিতে হবে। তাহলেই...

শোবার ঘর থেকে খুট খুট শব্দ হচ্ছে। মানেটা কী ? ধড়াম করে আরেকটা শব্দ হলো। টেবিলল্যাম্পটা কি মাটিতে পড়ে গেল ? আমার কি উচিত ভেতরে ঢুকে দেখা ? না কি আমার উচিত বিস্কন্ধ বাতাসে আরো কিছুক্ষণ বসে থাকা ?

আমি উঠে দাঁড়িলাম। শোবার ঘরে খট খট শব্দ বাড়ছে। এখন মনে হচ্ছে, হাতুড়ি দিয়ে কেউ মেঝেতে শব্দ করছে। খট খট খট খট। আরো খানিকটা ব্রান্ডি গলায় ঢাললে কেমন ? ওয়ান মোর পেগ। ওয়ান ফর দা রোড। না আর না। যথেষ্ট হয়েছে— এই ন্যুইসেন্স বন্ধ করতে হবে। পরিকল্পনা মতো এগিয়ে যেতে হবে।

ঝনঝন শব্দে কলিংবেল বেজে উঠল। আমি প্রায় লাফিয়ে উঠিলাম। কে আসবে এই সময়ে ? এখন আমার করণীয় কী ? শোবার ঘরের দরজা কি বন্ধ করে দেব ? এটা কি অস্বাভাবিক হবে না ? কে হতে পারে ? আমার স্বপ্নরবাড়ির কেউ না তো ? রিটার্ন করার

পর আমার স্বপ্নের সাহেবের হাতে কোনো কাজকর্ম নেই বলে যে-কোনো তুচ্ছ ব্যাপারেও তাঁকে পাঠানো হয়। মেয়ের খোঁজ নেবার জন্য তাঁকে পাঠানো হয় নি তো ?

আবার ঝনঝন শব্দে কলিং বেল।

এ পরেও দরজা না খুললে সন্দেহজনক ব্যাপার হবে। আমি দরজা খুলে ছোটখাট একটা ধাক্কা খেলাম। রমনা থানার ওসি মকবুল সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর গায়ে পুলিশের পুরো ইউনিফর্ম। মুখ হাসি হাসি।

মিজান সাহেবের খবর কী ? আমাকে দেখে কি চমকে গেলেন না-কি ? পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম— তারপর মনে হলো দেখে যাই আপনাকে। ইঠাৎ করে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। একটু চিন্তাও হচ্ছিল। আছেন কেমন ?

জি ভালো।

ভাবি ফিরেন নি এখনো ?

জি না।

করছিলেন কী ?

বারান্দায় বসেছিলাম।

ওসি সাহেব ঘরে ঢুকলেন। চারদিকে তাকাতে তাকাতে বললেন, ভাবি বাসায় নেই, ভাবি থাকলে চা খেয়ে যেতাম।

আমি চা বানিয়ে দিচ্ছি।

না থাক, থাক। কষ্ট করতে হবে না। বাহ বাসাটা তো সুন্দর সাজিয়েছেন। চারদিক একেবারে ঝকঝক করছে। ময়লা জুতা নিয়ে ঢুকে তো লজ্জাই লাগছে।

আমার স্ত্রীর একটু শুচিবায়ুর মতো আছে।

তাই নাকি! বলেন কী ? আমার স্ত্রীরও তো শুচিবায়ু।

ওসি সাহেব তাঁর স্ত্রীর সাথে আমার স্ত্রীর মিল পেয়ে খুব আনন্দিত হলেন বলে মনে হলো। দাঁত-টাত কেলিয়ে...

চা এক কাপ পেলে মন্দ হতো না মিজান সাহেব, বানাবেন না কি ?

আমার মেজাজ বিগড়ে গেল। এই ব্যাটাকে চা খাওয়ানো এখন অত্যন্ত বিপদজনক। রুবা তার ঘরে নড়াচড়া করছে। একটা মৃত মানুষ নড়াচড়া করছে। বলতেও অস্বস্তি। তবে ব্যাপারটা ঘটছে। কীভাবে ঘটছে আমি জানি না। তারচেয়েও বড় কথা, রুবা যদি ঘর থেকে বের হয়ে আসে তখন কী হবে ? নগ্ন একটা মেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বের হলো। ওসি সাহেবের দিকে তাকিয়ে হাসল। দৃশ্যটা কেমন হবে ? ওসি সাহেব নির্ঘাৎ লাফিয়ে উঠবেন। পুলিশের লোকরা সাধারণত ভীতু প্রকৃতির হয়। নিশ্চয় তিনি 'কে কে' বলে চোঁচিয়ে উঠবেন। তখন আমাকে কী করতে হবে ? আমি কী বলব ? বলব— এ আমার স্ত্রী। এর নাম রুবা। একে মেরে ফেলেছিলাম কিন্তু আবার বেঁচে উঠেছে।

ওসি সাহেব সোফায় গা এলিয়ে বসতে বসতে বললেন, বাসায় কি আপনি একা ?
কী উত্তর দেব দ্রুত চিন্তা করতে হচ্ছে। আমি কি বলব, বাসায় কেউ নেই ? ধরা
যাক তাই বললাম, তারপর শোবার ঘর থেকে খুট খুট শব্দ হলো, তখন কী হবে ?

আমি ওসি সাহেবের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে চায়ের পানি চাপিয়ে
দিলাম। চিনি ছাড়া চা নিয়ে দেব। বলব, চিনির কৌটা পাচ্ছি না। এতে লাভ হবে। এক
চুমুক দিয়ে উঠে পড়তে হবে। এই ভদ্রলোককে দ্রুত ঘর থেকে বের করে দিতে হবে।
তবে ওসি সাহেব। আসায় একটা সুবিধাও হয়েছে। ভদ্রলোক দেখে গেছেন আমি
বাসাতেই আছি। স্বাভাবিকভাবেই আছি।

চা এনে ওসি সাহেবের সামনে রাখলাম। তিনি ওয়কিটকিতে কার সঙ্গে যেন কথা
বলছেন। খেজুরে আলাপ।

ভাই, চা নিন। ঘরে চিনি আছে কিন্তু চিনির কৌটাটা কোথায় জানি না।

চিনি নিয়ে চিন্তা করবেন না। আমি চায়ে চিনি খাই না।

ওসি সাহেব চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, চা তো ভালো বানিয়েছেন। গুড। মাঝে
মাঝে আপনার বানানো চা এসে খেয়ে যেতে হবে।

জি আসবেন।

ওসি সাহেব সিগারেট ধরালেন। মনে হয় তিনি বেশ কিছু সময় এখানে কাটাবেন।
শোবার ঘরের দরজাটা কি এক ফাঁকে আটকে দেব ? ওসি সাহেব বসেছেন শোবার
ঘরের দরজার দিকে পেছন দিয়ে। কাজেই আমি যদি দরজা বন্ধ করে দেই, উনি বুঝতে
পারবেন না।

আমি শোবার ঘরের দরজা কাছে চলে এলাম। খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দরজা টেনে
বন্ধ করলাম। এক ফাঁকে দেখলাম রুবা মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে আছে সে আমাকে
দেখে হাসল। আমি ওসি সাহেবের সামনের চেয়ারে এসে বসেছি। ওসি সাহেব বললেন,
কী এমন চূপচাপ কেন ? বউ এক রাতের জন্য গেছে, এতেই আপনি যা মন খারাপ
করেছেন— আশ্চর্য! হাসিমুখে কিছু বলুন তো শুন।

শরীরটা ভালো লাগছে না। জ্বর জ্বর লাগছে।

এই জ্বরের নাম হলো ‘বিরহ জ্বর’। শুনে ভাই, একটা উপদেশ দেই— স্ত্রীকে বেশি
ভালোবাসবেন না। বেশি ভালোবেসেছেন কি মরেছেন— স্ত্রীকে আর পাবেন না ! সবচে’
ভালো হয় যদি ভালো না বেসে পারেন। আচ্ছা উঠি।

বসুন না। একা আছি, কথা বলতে ভালো লাগছে।

বসলে হবে নারে ভাই। পুলিশের চাকরিতে বসার্বাস বলে কিছুই নেই। ভাবি
ফিবলে একটা খবর দেবেন।

জি আচ্ছা।

আমি ওসি সাহেবকে বাসার গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলাম। তিনি যখন জিপে
উঠতে যাচ্ছেন তখন এক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো— আচ্ছা, ব্যাপারটা উনাকে খুলে
বললে কেমন হয়! যদি তাঁকে বলি— ভাই, আমি আমার স্ত্রীকে খুন করেছিলাম, এখন

দেখছি সে বেঁচে আছে। পানি খাচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে, কথা বলছে। বিশ্বাস না করলে আপনি আসুন আমার সঙ্গে, আপনাকে দেখাই।

শেষ পর্যন্ত বলা হলো না। ওসি সাহেব জিপে উঠে বললেন, ভাই চলি? বলেই জিপ স্টার্ট দিলেন। আমি বেশ কিছু সময় ঠাণ্ডার মধ্যে একা একা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘরে ফিরতে ভয় লাগছে। ইচ্ছা করছে পালিয়ে যেতে। কিন্তু পালিয়ে যাওয়া যাবে না। আমাকে ঘরেই ফিরতে হবে।

আচ্ছা রুবাকে কেন মারলাম? তাকে মারাটা কি খুব জরুরি ছিল?

রুবাকে মেরে ফেলার প্রথম চিন্তাটা আমার মাথায় আসে আমাদের বাসর রাতে। চিন্তাটা আসে খুব অল্পসময়ের জন্যে। ইংরেজিতে বলা যায় *It came as a flicber*. আমার ধারণা সব মানুষের ক্ষেত্রে এরকম ঘটে। মুহূর্তের জন্যে হলেও পাশের মানুষটাকে খুন করতে ইচ্ছা করে। এটা দোষের কিছু না। আমার মনে হয় এটাই স্বাভাবিক। বাসর রাতে কী ঘটল বলি। সারাদিনের ক্লান্তিতে আমি অবসন্ন। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। মাথার দু'পাশের শিরা দপদপ করছে। দুপুরে কিছু খাই নি। ক্ষুধার কারণে বমি বমি লাগছে। এই অবস্থায় রুবা ঘরে ঢুকল।

আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছি— এত সুন্দর একটা মেয়ে! আগেও তো তাকে দেখেছি— এত সুন্দর লাগে নি! অন্য কোনো মেয়ে না তো?

রুবা আমার দিকে তাকিয়ে হড়বড় করে বলল, শুনুন, আমার প্রচণ্ড দাঁত ব্যথা করছে। আপনার সঙ্গে আজ রাতে কোনো কথাবার্তা বলতে পারব না। দয়া কবে কিছু মনে করবেন না। আমি চারটা পেইন কিলার খেয়েছি। আমার মাথা ঘুরছে।

আমি বললাম, ব্যথা কমেছে?

না কমে নি। ব্যথা আরো বেড়েছে। আপনি ডেনটিস্ট হলে ভালো হতো। ফট করে আমার দাঁত তুলে ফেলতেন। বলেই সে খিল খিল করে হাসতে লাগল। আমি অবাক হয়ে দেখছি— এত সুন্দর করে কেউ হাসে কী করে? হাসিব দমকে তার মাথা থেকে শাড়ির আঁচল পড়ে গেল। তার ফর্সা গলা বের হয়ে গেল। তার গলাটা কি অন্যদের গলার চেয়ে বেশি লম্বা? আমার ক্ষণিকের জন্যে ইচ্ছা করল শক্ত করে দু'হাতে তার গলা চেপে ধরতে। *It came as a flicber*.

রুবা অবশ্যি দাঁত ব্যথা নিয়েই সে-রাতে অনেক গল্প করল। বেশিরভাগ তার বন্ধু বান্ধবের গল্প। এক একজনের গল্প উঠলে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে যায়— জানেন, ওব মতো মানুষ হয় না। অসাধারণ! অসাধারণ!

আমি এক পর্যায়ে বললাম, আমি কিন্তু অসাধারণ না রুবা। আমি সাধারণ। রুবা হাই তুলতে তুলতে বলল, তা জানি।

কীভাবে জানো?

বললে রাগ করবেন না তো?

না রাগ করব না।

রাগ করলেও আমি অবশ্যি বলে ফেলব। আমি পেটে কথা রাখতে পারি না। আপনি যে খুব সাধারণ সেটা টের পেলাম যখন আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেল। কারণ আমার ভাগ্য খুব খারাপ, আমি এই জীবনে যা যা চেয়েছি কোনোটাই পাই নি। আমি সবসময় চেয়েছি অসাধারণ একজন স্বামী কাজেই আমি যে সাধারণ একজন স্বামী পাব সেটা তো ধরেই নেওয়া যায়। যায় না ?

হ্যাঁ যায়।

এমনিতে আমি খুব সুন্দর। যে-ই দেখবে সে-ই বলবে সুন্দর। অথচ যখন আমাকে সুন্দর দেখানো দবকার তখন আমাকে দেখায় বাদরের মতো।

কখন তোমাকে সুন্দর দেখানোর দরকার ?

একবার একটা ছেলে আমাকে দলবল নিয়ে দেখতে এলো। কী সুন্দর ছেলে। হ্যান্ডসাম, টল। প্লেন চালায়, পাইলট। আমি খুব যত্ন করে সাজলাম। সাজার পর আয়নার তাকিয়ে দেখি কী যে বিশ্রী দেখাচ্ছে। এত সুন্দরী মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও ওরা আমাকে পছন্দ করল না।

তাহলে তো তোমার ভাগ্য আসলেই খারাপ।

আমি খুব ভালো কবিতা আবৃত্তি করতে পারি। যে-ই শুনবে সে-ই মুগ্ধ হবে। টেলিভিশনে কবিতা আবৃত্তির অভিসন দিতে গেলাম— বেছে বেছে সেই দিনই আমার গলায় কী যে হলো, এক সঙ্গে দু'তিন বকম স্বর বের হয়। টেলিভিশনের যে প্রযোজক অভিসন নিচ্ছিলেন, তিনি হেসে ফেললেন। অন্যরাও হাসতে লাগল। শুধু আমি নিজের মনে তিন বকমের স্বরে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলাম। হি হি হি।

রুবা আবারো হাসতে লাগল। আবারো তার শাড়ির আঁচল মাথা থেকে খসে পড়ল। তখন আমার মনে হলো— এই অদ্ভুত মেয়েটা কি সত্যি বাকি জীবন আমার পাশে থাকবে ?

আমি বললাম, তোমার দাঁত ব্যথা কি কমেছে ?

রুবা হাসতে হাসতে বলল, আমার দাঁত ব্যথা ছিল না। আপনার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না বলে, মিথ্যা করে বলেছি— দাঁত ব্যথা।

ও আচ্ছা।

কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না কেন সেটা শুনবেন ?

বলো ?

প্রথমবার আপনার চেহারা যতটা খারাপ লেগেছিল— আজ তার চেয়ে দশগুণ বেশি খারাপ লাগছে। এই জন্যেই কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। আচ্ছা আপনি কি কবিতা শুনতে ভালোবাসেন ?

না।

জানতাম ভালোবাসেন না। আমি যে-সব জিনিস পছন্দ করি আমার স্বামী সে-সব পছন্দ করবেন তা কী করে হয়। আপনি আবার রাগ করছেন না তো ?

না।

আমার কিন্তু অনেক ছেলেবন্ধু আছে। আমি ওদের সঙ্গে খুব ঘোরাঘুরি করি। আপনি আবার বলবেন না— ওসব চলবে না। গৃহপালিত পশু হয়ে যাও। বলবেন না তো ?
না।

তাহলে এক মিনিটের জন্যে আমার হাতটা ধরতে পারেন।

রুবা হাত বাড়িয়ে দিল। এমন চমৎকার একটা মেয়েকে ভেবে চিন্তে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছি। কেন করলাম ? আমি কি অসুস্থ ? আমি কি সাইকোপ্যাথ ?

না, আমি অসুস্থ না। আমি সাইকোপ্যাথও না। আমি যা করেছি ঠিকই করেছি। এই মেয়েকে ধরে রাখার ক্ষমতা আমার ছিল না। ও সরে যাচ্ছিল। আমি তা হতে দিতে পারি না।

এখন সে আর কোথাও যেতে পারবে না। কোনো বন্ধু এসে এখন আর তার কবিতা গুনবে না। বা কারো সঙ্গে বুদ্ধিগঙ্গায় জোছনা দেখতে যেতে পারবে না।

আচ্ছা আজ কি জোছনা আছে ? আকাশ আলো হয়ে আছে, কিন্তু আমি কোনো চাঁদ দেখছি না।

ঘরে ফেরা দরকার, ঘরে ফিরতে ইচ্ছা করছে না। রুবার মুখোমুখি হতে ভয় করছে।

আমি ঘরে ঢুকলাম। বসার ঘরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ মনে হলো— শোবার ঘরের দরজাটা না খুললে কেমন হয় ? থাকুক রুবা বন্ধ ঘরে। আমি বাতটা সোফায় শুয়ে কাটিয়ে দেই। ডেডবন্ডি সরানোর কাজ রাতের বেলা না করে দিনে করাই ভালো। দিনে চারদিকে প্রচুর মানুষ থাকে। সবাই ব্যস্ত। কেউ কারো দিকে সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকায় না। রাতে সবাই সবাইকে সন্দেহ করে।

শোবার ঘরের নবে হাত রাখতেই ভেতবে ঝন ঝন শব্দে কাঁচের কী যেন ভাঙল। কী হচ্ছে ? এসব কী হচ্ছে ? আমি খুব সাবধানে দরজা ফাঁক কবলাম যেন প্রয়োজনে ঝট করে দরজা বন্ধ করে দেয়া যায়।

শোবার ঘরের মেঝেতে রুবা বসে। পানির গ্লাসের ভাঙা টুকরো জড়ো করার চেষ্টা করছে। গ্লাসটা টেবিল থেকে নিচে পড়ে ভেঙেছে। আমি তার শব্দই শুনেছি। চিন্তা-ভাবনা না করেই বললাম, কী হয়েছে ?

রুবা জড়ানো গলায় বলল, গ্লাস।

শোন রুবা, উঠে দাঁড়াও। গ্লাসের ভাঙা টুকরা জড়ো করতে হবে না। উঠে দাঁড়াও। দাঁড়াও বললাম।

সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা কবছে— পারছে না। টেনে তোলার জন্যে অসহায় ভঙ্গিতে একটা হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। এটা কি কোনো ট্রিকস ? আমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা ? আমি তার হাত ধরব, আর সঙ্গে সঙ্গে সে জাপ্টে ধরবে আমাকে। হরর স্টোরিতে এরকম থাকে। মৃত মানুষ জীবিত মানুষকে মরণ আলিঙ্গনে জাপ্টে ধরে। রুবা আবার বলল, ধর, আমাকে টেনে তোল।

আমি ধরলাম এবং টেনে তুললাম। হরর গল্পের মতো সে আমাকে মরণ আলিঙ্গনে বাঁধল না। পাড় মাতালরা যেমন হেলতে দুলতে থাকে সেও তেমনি হেলছে দুলছে। তার হাত শীতল, বরফের মতোই শীতল। তার হাট কি বিট করছে? এই মুহূর্তে তার বুকে হাত রেখে কিংবা নাড়ি ধরে তা বোঝা যাবে না। কারণ ধক ধক শব্দে আমার নিজের হাটই কাঁপছে। সেই শব্দ অন্য সব শব্দকে ঢেকে ফেলবে।

রুবা।

উঁ।

তুমি মরে গেছ। বুঝতে পারছ?

উঁ।

তুমি কীভাবে কথা বলছ। কীভাবে হাঁটাইটি করছ আমি জানি না। তোমার কেমন লাগছে বলো তো?

উঁ।

উঁ না। কথা বলো। লেট আস টক। তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ?

উঁ।

বলো আমাব নাম কী? বলো, আমার নাম বলো।

মিজান।

এই তো হয়েছে। এসো এখন এই চেযাবটায় বোস। নাও, এই চাদর দিয়ে গা ঢাক। উলঙ্গ মানুষ দেখতে ভালো লাগে না। রাস্তায় নগ্ন পাগলীদের দিকে কেউ তাকায় না। এখন আমাব কথাব জবাব দাও— তোমাব এখন কেমন লাগছে?

ভয়।

ভয় লাগছে?

হঁ।

ভয় লাগবে কেন? ভয় লাগার কী আছে? একজন মৃত মানুষের ভয় লাগার কিছু নেই। ভয় জীবিত মানুষের। মৃত মানুষের কোনো ভয় নেই। তাদের জগৎ ভয়শূন্য। You understand?

বাতি জ্বালাও।

বাতি জালাব?

হঁ।

রুবা, ঘবে বাতি জ্বলছে। একটা টিউব লাইট জ্বলছে। টেবিল ল্যাম্পও জ্বলছে।

অন্ধকার।

তোমার কাছে অন্ধকার লাগছে?

হঁ।

আমাকে দেখতে পাচ্ছ?

ছায়া ছায়া।

শোন রুবা, আমি তোমাকে মেরে ফেলেছি।

জানি।

তুমি জানো ?

হঁ।

আমার ওপর কি তোমার কোনো রাগ আছে ?

না।

রাগ থাকলে বলো।

না।

তুমি কি আমাকে খুন করতে চাও ?

না।

রুবা! তুমি কি প্রতিশোধ নিতে চাও ?

না।

গুড ভেরি গুড। বুঝলে রুবা, একটা কোনো সমস্যা হয়ে গেছে। মৃত মানুষের কথা বলার কোনো কারণ নেই— কিন্তু তুমি কথা বলছ। কীভাবে বলছ ?

আমি জানি না।

তোমার কি ঘুম পাচ্ছে ?

হঁ।

এসো, শুয়ে থাক। বিছানায় শুয়ে থাক।

আচ্ছা।

আমি রুবার হাত ধরে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। গায়ে চাদর টেনে দিলাম। সে অদ্ভুত শব্দ করছে। খুন খুন শব্দ।

কী হয়েছে ?

ভয় লাগে।

শোন রুবা, ভয়ের কিছু নেই। আমি তোমার পাশে বসে আছি।

আচ্ছা।

দাও, তোমার হাত দাও। তোমার হাত ধরে বসে থাকব।

আচ্ছা।

পানি খাবে ?

না।

পানি খাবে না ?

খাব।

রুবাকে কড়া ঘুমের ওষুধ কিছু খাইয়ে দিলে কেমন হয় ? যে কাজটা আমি করতে পারি নি ঘুমের ওষুধ সেটা করবে। হাই ডোজের 'হিপনল' আমার কাছে আছে। পানিতে

গুলে সরবতের মতো করে খাইয়ে দিতে পারলে আর দেখতে হবে না। রুবা খেতে আপত্তি করবে বলে মনে হচ্ছে না। মবে গেলে তার জন্যেও ভালো, আমার জন্যেও ভালো।

ড্রয়াব খুলে কুড়িটা টেবলেট পেলাম। আধগ্লাস পানিতে কুড়িটা টেবলেট, ঘন পেটের মতো তৈরি হলো। চেখে দেখি তিতা এবং মিষ্টি মিলে বিশ্রী স্বাদ। এই জিনিস কেউ খেতে পারবে না, কিন্তু রুবা পারবে। অবশ্যই পারবে। সে মানুষের স্তরে এখন নেই। সে এখন অন্য কোনো স্তরে। এই স্তরে স্বাদ-বর্ণ-গন্ধ বলে কিছু থাকার কথা না।

আচ্ছা, আমি এইসব কী ভাবছি? এখন ভাবাভাবির সময় না। সময়টা হলো কাজের। টাইম অব অ্যাকশন। দেরি করা যাবে না। সময় নষ্ট করা যাবে না। যা করার খুব ভেবে-চিন্তে করতে হবে। সকাল আটটার আগে ডেডবডি সরিয়ে শ্বশুরবাড়িতে যেতে হবে। শ্বশুর সাহেবকে ঘুম থেকে তুলে কাঁদো কাঁদো গলায় বলতে হবে-- রুবা এখনো ফিরে নি। শ্বশুরবাড়ি থেকেই গুঁস সাহেবকে টেলিফোন করতে হবে।

আমি গ্লাস হাতে রুবার কাছে গেলাম। রুবা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ তুলে আমাকে দেখল না।

রুবা নাও, খেয়ে ফেল।

সে গ্লাস নেবার জন্যে হাত বাড়াল না। বাড়াবে না জানতাম। সেই বোধ এখন তার নেই। আমাকেই খাইয়ে দিতে হবে। আমি তাকে উঠে বসালাম, তার মুখের কাছে গ্লাস ধরলাম। সে খাচ্ছে। চুচুচু করে খাচ্ছে।

খেতে মজা না?

উঁ।

খাও, আরাম করে খাও। খেয়ে ঘুমিয়ে থাক।

উঁ।

তুমি মেয়ে খারাপ না। মেয়ে ভালো।

উঁ।

শুধু ভালো মেয়ে বললে কম বলা হয়, তুমি বেশ ভালো মেয়ে... বুঝতে পারছ?

হঁ।

আমি যা করেছি বাধ্য হয়ে করেছি। ঈর্ষার কারণে করেছি। তোমান নানান ধরনের বন্ধু-বান্ধব। ওদের সঙ্গে তুমি কত গল্প কর, কত হাসাহাসি। আমার সঙ্গে কোনো গল্প কর না। হট করে ওদের সঙ্গে বের হয়ে যাও, আমার সঙ্গে যাও না। এ জন্যেই রাগ হতো।

হঁ।

বেশি রাগ না, অল্প রাগ। অল্প রাগটা বাড়তে বাড়তে এরকম হয়ে গেল।

বুঝতে পারছ?

হঁ।

তাছাড়া আমার চেহারা ভালো না। মুখ ঋনিকটা বাদরের মতো, দাঁত বের হয়ে থাকে— এই নিয়ে আমার মধ্যে এক ধরনের কমপ্লেক্স আছে। আমার ধারণা, কেউ আমাকে সহ্য করতে পারে না। রুবা, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ ?

হঁ।

অফিসেও কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না। প্রয়োজনে কথা বলে, অপ্রয়োজনে কথা বলে না। শুধু নুরুজ্জামান সাহেব মাঝে মাঝে বলেন। আর কেউ না। তুমিও তাই কর। কাজেই আমার ধারণা হয়েছিল— তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। বুঝতে পারছ ?

হঁ।

এই জনোই আমি তোমাকে মেরে ফেলেছি। যাতে কখনো আমাকে ফেলে চলে যেতে না পার। বুঝতে পারছ কি বলছি ?

হঁ।

কাজটা অন্যায় হয়েছে। খুব অন্যায়। পৃথিবী জায়গাটা সুবিধার না। এখানে মাঝে মাঝে অন্যায় হয়।

হঁ।

তোমার জন্যে আমার এখন খারাপ লাগছে। খারাপ লাগা উচিত না, কিন্তু লাগছে।

আচ্ছা।

আমি খুব শক্ত মানুষ, বুঝলে রুবা, অসম্ভব শক্ত মানুষ। মন খাবাপ কী ব্যাপার তা আমি জানি না। আমি কোনোদিন কাঁদি না। কিন্তু তোমার অবস্থা দেখে খাবাপ লাগছে।

হঁ।

আমার মা'র কথা কি আমি তোমাকে কোনোদিন বলেছি রুবা ?

না।

বলি নি। আমি কাউকে বলি নি। আমি কি আমার বড়বোনের কথা বলেছি ?

না।

আমি কাউকেই কিছু বালি না। আমি সব নিজের মধ্যেই রেখে দেই।

উ।

আমার বড়বোনের নাম কী বলো তো ?

রুবা।

ঠিক বলেছ, রুবা। তোমাদের দু'জনের মধ্যে খুব মিল। আমার বড়বোন ঘুমের মধ্যে হাটফেল করে মারা গিয়েছিল। ডাক্তারের রিপোর্টে তাই আছে। আসল ব্যাপারটা শুনবে ?

রুবা শব্দ করল না। আমি বললাম, কিছু খাবে ?

না।

তুমি এখন আরাম করে ঘুমাও। শুয়ে পড়। এসো শুইয়ে দেই।

আমি রুবাকে শুইয়ে দিলাম। সে কোনো আপত্তি করল না। মুখ এখনো হাঁ হয়ে আছে, ওষুধের গুঁড়া লেগে আছে। কুণ্ঠসিত দেখাচ্ছে। চোখ খোলা। মাছের মতো চোখ, চোখে পলক পড়ে না।

আমি রুবার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বললাম, চোখ বন্ধ করে ঘুমুতে চেষ্টা কর। কড়া ঘুমের ওষুধ দিয়েছি— ভালো ঘুম হবে। যা ঘটার ঘুমের মধ্যেই ঘটবে। তুমি কিছু টের পাবে না। চোখ বন্ধ কর।

রুবা চোখ বন্ধ করার চেষ্টা করছে। পারছে না। আমি চোখের পাতা টেনে দিলাম। রুবার গায়ের চামড়া খসখসে হয়ে গেছে। দেখাচ্ছে মসৃণ কিন্তু হাত রাখলেই খসখসে ভাব! অনেকটা সাপের গায়ের চামড়ার মতো। দূর থেকে কী মসৃণ দেখায়, কিন্তু হাত দিলেই খসখসে। আমি একবার সাপের গায়ে হাত দিয়েছিলাম। সাপুড়ে সাপের খেলা দেখাতে এসেছে। সবাই খেলা দেখছি। আমি ভয়ে অস্থির হয়ে বাবার কোলে বসে আছি। সাপ এক একবার ফণা তুলছে, আমি আতঙ্কে জমে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে টেঁচিয়ে উঠছি। বাবা এক পর্যায়ে বিরক্ত হয়ে বললেন, সাপ অতি নিম্নশ্রেণীর একটি প্রাণী। একে ভয়ে পাবার কিছু নেই। বিষদাঁত ভাঙা সাপ কেঁচোর কাছাকাছি। খোকন, তুমি সাপেব গায়ে হাত দাও। দাও হাত। হাত দিয়ে দেখ। একবার এর গায়ে হাত দিলেই তোমার ভয় ভেঙে যাবে। দাও, হাত দাও।

আমাকে হাত দিতে হলো। বাবার কথা অগ্রাহ্য করার সাহস আমাদের ভাইবোনদের কোনো কালেই ছিল না।

সাপের গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠলাম— কী খসখসে চামড়া!

বাবা হাসিমুখে বললেন, ভয় ভেঙেছে খোকন?

আমাব ভয় ভাঙে নি, তবু আমি মাথা নাড়লাম। বাবা হস্ট স্ববে বললেন— নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের ভয় পেতে নেই, ভয় যদি পেতেই হয় মানুষকে ভয় পাবি। মানুষ অতি উচ্চশ্রেণীর প্রাণী মানুষকে ভয় পাওয়ার মধ্যেও আনন্দ আছে।

রুবা চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে। ঘুমিয়ে পড়েছে কি? আমি তার গায়ে হাত রেখে বললাম, আমি কিছু খেয়ে আসি। আমার খিদে পেয়েছে। একগাদা পোলাও খেয়েছি, তারপরেও খিদেয় মরে যাচ্ছি। ফ্রিজে কি খাবার কিছু আছে?

হঁ।

আমি খাবার ঘরে ঢুকলাম। এই ঘরের দেয়ালে বিরাট একটা ঘড়ি আছে। ঘড়িতে দু'টা বাজে। আশ্চর্য, আমি তো বিরাট একটা ভুল করেছি। খাবার ঘরে বাতি জ্বলছে, শোবার ঘরে বাতি জ্বলছে, বারান্দায় বাতি জ্বলছে, বসার ঘরে বাতি জ্বলছে। পুলিশ কেইস হলে অনেকেই সাক্ষ্য দেবে— অনেক রাত পর্যন্ত ঐ বাড়িতে বাতি জ্বলছিল।

খাবার ঘব ও বসার ঘরের বাতি নিভালাম। একসঙ্গে সবগুলো বাতি নেভানোও ঠিক না। সন্দেহ হবে। ফ্রিজ খুললাম। অনেক খাবারই আছে। পলিগিনের ব্যাগে মোড়া স্যান্ডউইচ, লাডু, রসমালাইয়ের একটা হাঁড়ি।

একটা লাডুর অর্ধেকটা মুখে দিতেই আমার খিদে চলে গেল, বমি বমি ভাব হলো। প্রচুর খাওয়া হলে যেমন বমি ভাব হয় সে-রকম।

আমি শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি নিয়ে বসলাম। রুবার ঘরের বাতি এখনো জ্বলছে। বাতি নিভিয়ে দেওয়া দরকার। বাতি জ্বালানো থাকলে কেউ ঘুমুতে পারে না। রুবা তো একেবারেই পারে না। যদিও এই রুবা হলো অন্য রুবা। তবুও দীর্ঘদিনের একটা অভ্যাস।

রুবার ঘরে ঢুকলাম। সে ঠিক আগের মতো শুয়ে আছে। চোখ বন্ধ। চোখ এখনো খুলে নি। এটা একটা ভালো লক্ষণ। সে কি ঘুমিয়ে পড়েছে? ডেকে দেখব?

থাক, ডাকার দরকার নেই। কাঁটায় কাঁটায় এক ঘণ্টা পর এসে দেখব কী ব্যাপার। এই এক ঘণ্টা আমি বিশ্রাম নেব। বারান্দায় চেয়ারে চোখ বন্ধ করে বসে থাকব। আমার নিজের বিশ্রাম দরকার। অস্বাভাবিক ব্যাপার যা ঘটছে বিশ্রাম নিলে সেসব পুরোপুরি বন্ধ হতে পারে।

আমি বারান্দায় এসে বসলাম। জমিয়ে ঠাণ্ডা পড়েছে। বারান্দা চিক দিয়ে ঢাকা, তারপরেও চিকের ফাঁক দিয়ে শীতল হাওয়া আসছে। একটা চাদরে গা ঢেকে বসা দরকার ছিল। পা তুলে বসলাম। অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও মাথা থেকে সব চিন্তা দূর করতে হবে—নয়তো শেষটায় পাগল হয়ে যাবে। বারান্দার বাতি নেভানো, তবু খানিকটা আলো আসছে। চাঁদের আলো? ‘যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ।’ কে বলত এ কথাটা? রুবা না? হ্যাঁ রুবা।

একদিন অফিস থেকে ফিরতে বেশ দেরি হলো—ইয়ার এন্ডিং-এর ঝামেলা। বাসায় ফিরেছি রাত এগারোটায়। কাজের মেয়ে দরজা খুলে দিল। আমি ঘরে ঢুকে দেখি বিরাট উৎসব। রুবার বন্ধু-বান্ধবরা বারান্দায় গোল হয়ে বসে আছে। আজ না কি চাঁদের পঞ্চমী। চাঁদ ডুবে গেলে জীবনানন্দের ‘আট বছর আগের একদিন’ কবিতা পড়া হবে।

রুবা পরীর মতো সেজে বসে আছে। গলায় ফুলের মালা। খোঁপায় ফুল। রুবা এসে বলল, তুমি চট করে হাত-মুখ ধুয়ে আমাদের সঙ্গে এসে বসো তো।

কেন?

সুব্রত এসেছে।

সুব্রতটা কে?

আশ্চর্য! সুব্রতকে চেন না? বিখ্যাত আবৃত্তিকার। নান্দনিক গোষ্ঠীর সুব্রত দে। ও আজ কবিতা পাঠ করবে।

আমি একাউন্টেন্ট মানুষ। আমি কবিতার কী বুঝি?

তোমাকে কিছু বুঝতে হবে না। তুমি চুপচাপ বসে থাকবে।

আমার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।

তিনটা প্যারাসিটামল খাও। আমি গরম এক কাপ চা বানিয়ে দিচ্ছি। চা খাও। চা খেয়ে আমাদের সঙ্গে বসো। জীবনানন্দ দাশের কবিতা তোমার ভালো লাগবে।

রুবা প্রায় জোর করেই আমাকে বারান্দায় নিয়ে গেল। রুবার বন্ধু-বান্ধবরা একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল। সুব্রত নামের ছেলেটা আমাকে পান্তাই দিল না। সে পৌষমেলায় কী

এক গল্প করছিল— সেই গল্পই করতে লাগল। আমি বোকার মতো খানিকক্ষণ বসে থেকে শোবার ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙল তখন শুনি কবিতা পাঠ হচ্ছে। সুব্রত না, কবিতা পড়ছে রুবা—

যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ

মরিবার হলো তার সাধ;

বধু শুয়েছিল পাশে— শিশুটিও ছিল;

প্রেম ছিল, আশা ছিল— জ্যোৎস্নায়— তবু সে দেখিল

কোন ভূত ? ঘুম কেন ভেঙ্গে গেল তার ?...

কবিতা শুনতে শুনতে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। গাঢ় গভীর ঘুম। এমন গাঢ় ঘুম অনেক দিন ঘুমাই নি।

এখনো ঘুম পাচ্ছে। চোখ ভেঙে ঘুম নামছে। ঘুমিয়ে পড়াটা কি ঠিক হবে ? যদি সময়মতো ঘুম না ভাঙে! যদি জেগে উঠে দেখি দশটা বেজে গেছে— চারদিক আলো হয়ে আছে।

খোকন! খোকন!

আমি ধড়মড় করে উঠলাম। বাবার গলা। শ্বেচ্ছা জড়ানো ভারী স্বর। ভুল হবার কোনো কারণ নেই। বাবার গলা শুনব কেন ? তিনি বেঁচে নেই। ডেড এন্ড গন। আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছি। বাবা আমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি যেমন দাঁড়ান, খানিকটা কুঁজো হয়ে একটু ঝুঁকে এসেছেন। গা থেকে কড়া তামাকের গন্ধ আসছে। তাঁর গায়ে হলুদ কোট। কোটের তিনটা হলুদ বোতামের একটা লাল। হলুদ বোতাম একটা খুলে পড়ে গিয়েছিল। মা কোথেকে যেন একটা লাল বোতাম এনে লাগিয়ে দিলেন। বাবা নির্বিকার। সেই কোট পরেই স্কুলে ক্লাস নিতে যান।

খোকন, ওঠ ওঠ। তোর এক ঘণ্টা ঘুমবাব কথা, তুই ঝাড়া দেড় ঘণ্টা ঘুমুচ্ছিস। ওঠ ওঠ। শেষে একটা বিপদ বাঁধবি।

বাবা আপনি ?

হ্যাঁ, আমি। বারান্দায় বসে বসে ঘুমুচ্ছিস কোন আক্কেলে ? শেষটায় নিউমোনিয়া বাঁধিয়ে.. নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখবি না ? নিজের শরীরের যত্ন নিজে না করলে কে করবে ? বৌ-মার অবস্থাও তো ভালো না।

আমি কিছুটা কৌতূহল, কিছুটা ভয় নিয়ে বাবাকে দেখছি। শেভ করেন নি, গাল ভর্তি খোঁচা খোঁচা সাদা-কালো দাড়ি। প্রতি দিন শেভ করা বাবার ধাতে ছিল না। প্রতি তিনদিন পর পর শেভ। পয়সা বাঁচানো।

হাঁ করে কী দেখছিস রে খোকন ?

আপনাকে দেখছি।

দেখাদেখির কিছু নেই রে বাবা। সময় সংক্ষেপ। এখন কাজে লেগে পড়তে হবে। তুই একা পাববি না বলেই তোকে সাহায্য করতে এসেছি।

আমাকে সাহায্য ? আমাকে কী সাহায্য ?

বৌ-মার ডেডবডি সরাবার ব্যবস্থা করতে হবে না ? তুই একা পারবি ?

আমি হেসে ফেললাম। আমার বাবা, ঠাকরোকানা স্কুলের হেডমাস্টার সাহেব এসেছেন আমাকে সাহায্য করতে। পুরো ব্যাপারটা এক ধরনের হেলুসিনেশন। কিংবা আমি ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছি। মানুষ যখন ভয়াবহ কোনো সমস্যায় পড়ে তখন স্বপ্নে সে রিলিফ পায়। এও এক ধরনের রিলিফ। আমাকে সাময়িক রিলিফ দেওয়াব জন্যে আমার বাবা আজহার উদ্দিন সাহেব চলে এসেছেন। কেমন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলছেন, তোকে সাহায্য করতে এসেছি— হা হা হা।

হাসছিস কেন রে খোকন ? এটা কি হাসির সময় ?

আপনি একা এসেছেন কেন বাবা ? মা'কে নিয়ে এলেন না কেন ?

তাকে আনব কী করে ? তাকে কুকুরে কামড়াল না ? ওর কি চলাফেরার অবস্থা আছে! তুই অকারণে দেরি করছিস। আয় আমরা কাজে নেমে পড়ি।

আচ্ছা বাবা, আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ?

মাথা খারাপ হবে কেন ? আমার তো পাগলের বংশ না। এই বংশে কোনো পাগল নেই। আমাদের অতি উচ্চ বংশ।

বাবা, আপনাকে দেখে ভালো লাগছে। বসুন। কিছু খাবেন বাবা ? গরম চা কিংবা কফি ?

চা হাওয়া যায়। শীতটাও বেজায় নেমেছে— তুই পাতলা একটা শার্ট গায়ে দিয়ে ঠাণ্ডায় বসে আছিস কীভাবে ?

আগি আবারো হো হো করে হাসলাম। নিজের হাসির শব্দে নিজেই চমকলাম। কী আশ্চর্য কণ্ঠ ঘটিছে স্বপ্নে, বাবাকে দেখছি! একেবারে বাস্তবের মতো স্বপ্ন। কিংবা কে জানে সত্যি সত্যি বাবা হয়তো পরলোক থেকে চলে এসেছেন। এখন পিতা-পুত্র মিলে ডেডবডি সরাব— হা হা হা।

হাসছিস কেন রে খোকন ?

এমনি হাসছি।

চা বানাতে তাড়াতাড়ি বানা। আদা থাকলে এক টুকরা আদা দিয়ে দিবি। আমার গলা বসে গেছে।

বাবা হুঁ হুঁ করে গানের কী একটা কলিও যেন বাজলেন। 'সখি হে সখি হে' ধবনের গান। এ তো দেখি ভালো যন্ত্রণা হলো।

আমি বারান্দা থেকে বসার ঘরে ঢুকলাম, বাবা পেছনে পেছনে এলেন। শব্দ করে হাই তুলালেন, আগুলে তুড়ি বাজলেন। আমাকে স্বীকার করতেই হবে, এটা যদি স্বপ্ন হয়ে থাকে ত হলে বেশ কঠিন এবং জটিল স্বপ্ন। Powerful dream.

বাবা আনন্দিত গলায় বললেন, ঘর-দোয়ার তো খুব ঝকঝকে।

আমি বললাম, আপনার বৌমার গুচিবায়ুর মতো আছে।

আ গ বলবি তো— আমি ধুলাপায়ে ঢুকেছি।

কে নো সমস্যা নেই, ও তো আর কিছু বুঝতে পারছে না।

তাও সত্যি। তুই ভালো কথা মনে করেছিস। এখন মূল বিষয়ে আয়— ডেডবডি কীভাবে সরাবি বলে ঠিক করেছিস। পদ্ধতিটা কী ?

ডিসপারসান পদ্ধতি।

সেটা কী ?

সত্যি জানতে চান ?

অবশ্যি জানতে চাই।

ডেডবডিটা, টুকরো টুকরো কবে বড় একটা এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া। খুব ভালো পদ্ধতি। ফুল প্রফ।

আমার কাছে তো খুব ভালো পদ্ধতি বলে মনে হচ্ছে না। নোংরা পদ্ধতি বলে মনে হচ্ছে। কাটাকুটি কে করবে ? তুই ?

হঁ।

পারবি ? এত দিনের চেনা একটা মেয়ে। তার উপর প্রচণ্ড রাগ থাকলে অবশ্যি পারবি। আছে প্রচণ্ড রাগ ?

কিছুটা আছে।

তোর বলার ভঙ্গি থেকে মনে হয় বাগ কমে গেছে। এখন তো কাটাকুটি করতেই পারবি না। তাছাড়া রক্ত টক্ত বের হয়ে বিশ্রী অবস্থা হবে। ডিসপারসান পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি নেই ? তোর মাথা তো বেশ পরিষ্কার। চিন্তা ভাবনা কবে কিছু বের করতে পারিস না ?

বাবা আগ্রহ নিয়ে আমাব দিকে তাকিয়ে আছেন। মোটা চশমার আড়ালে বাবার চোখে আগ্রহ ঝিকমিক করছে। সেই চোখ দেখে আমার পেটে হাসি গুড়গুড়িয়ে উঠছে— কী বিশ্রী ঝামেলা তৈরি হয়ে গেছে। আমি আমার চোখের সামনে আমার নিজের মনেরই একটি অংশকে দেখতে পাচ্ছি। সেই অংশটি বাবাব রূপ ধরে সামনে এসেছে। আমাকে তাকে দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি জানি যথাসময়ে সে নিজ মূর্তি ধরবে।

খোকন!

জি বাবা।

কই চা খাওয়াবি বলেছিলি তার কী বললি!

চা বাবা আপনি খাবেন না— কারণ আপনার আসলে কেনো অস্তিত্ব নেই। আমি যদিও আপনাকে দেখছি, আসলে আপনি আমার সমানে নেই। আমার মাথার নিউবোনে কোনো একটা সমস্যা হয়েছে বলে আমি আজগুবি সব ব্যাপার দেখতে শুরু করেছি।

তোর মাথায় কী হয়েছে ?

কী হয়েছে আমি জানি না। বড় কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গেলে তিনি হয়তো বলতে পারতেন। তা তো সম্ভব না।

বাবা চিন্তিত গলায় বললেন, বৌমার মৃত্যু তোকে খুব এফেক্ট করেছে। নিজের হাতে খুন করেছিস তো, এই জন্যেই বেশি লাগছে। ভাড়া করা লোক পেলি না ? ওরা যা করার

চুপি চুপি করত— তুই টাকা দিয়ে খালাস। মানুষ মারতে আজকাল কত নেয় ? রেট কত ?

চুপ করুন তো বাবা।

তুই নিজ হাতে খুন করেছিস বলে কি তোর কোনো অপরাধ বোধ আছে ?
না।

গুড। না থাকাই উচিত। মৃত্যু হলো কপালের লিখন। যার যেভাবে মৃত্যু লেখা সেভাবেই হবে। তুই নিমিত্ত মাত্র, বৌমার কপালে লেখা ছিল তোর হাতে মৃত্যু। তুই হাজার চেষ্টা করেও সেই লেখা ফেরাতে পারতি না। কাজেই যা হবার হয়েছে। বি হ্যাপি।

বাবা আবার গুন গুন গুরু করলেন— ‘সখি হে! সখি হে।’ বাবার প্রিয় গান। গান থামিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, বি হ্যাপি মাই সান।

আমি হ্যাপিই আছি। আপর্নি চলে যান।

চলে যাব ?

হ্যাঁ চলে যাবেন। অবশ্যই চলে যাবেন।

তোকে এমন ঝামেলায় ফেলে যাব ?

হ্যাঁ যাবেন। আমার ঝামেলা আমিই মেটাব। ঝামেলা কবার সময় তো আব আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করে করি নি।

তবু... তুই আমার ছেলে। তোর কষ্ট দেখে কষ্ট হয়।

বাবা, আমার কোনো কষ্ট নেই। আপনাকে হাতজোড় কবে অনুরোধ করাছি আপর্নি চলে যান।

আচ্ছা বেশ যাচ্ছি — বৌমার ডেডবন্ডি কীভাবে সরাবি একটু বলে দে। তোর মা’কে বলতে হবে তো। গেলেই জিজ্ঞেস করবে।

একটা বস্তায় ভরে কোথাও ফেলে দিয়ে আসব।

কোথায় ফেলবি ?

জানি না কোথায়। এখনো ঠিক করি নি।

আজে বাজে কোনো জায়গায় ফেলিস না। এত ভালো একটা মেয়ে।

ভালো মেয়ে।

অবশ্যই ভালো মেয়ে। সে যে ভালো মেয়ে সেটা আমি যেমন জানি, তুইও জানিস। জানিস না ?

বাবা চোখ থেকে চশমা খুলে ফেলেছেন। তাকাচ্ছেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। বাবার চোখে এই দৃষ্টি সহ্য করা সম্ভব না। কী শীতল, কী ঠাণ্ডা চোখ!

খোকন!

জি বাবা।

তুই অসুস্থ। ভয়ঙ্কর অসুস্থ। জন্ম থেকেই তুই অসুস্থ ছিলি। আমরা বুঝতে পারি

নি। তুই যে কাণ্ডটা করেছিস, অসুস্থ বলেই করেছিস। তোর এই অসুখ আরো বাড়বে—
তুই এমন কাণ্ড আরো করবি। সেটা কি ঠিক হবে ?

ঠিক হবে কি হবে না, তা নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আপনি কেউ
না।

আমি কেউ না তা কী করে বললি রে ব্যাটা ? আমি তোর বাবা না ? মনে নেই
একবার তোর পেটে যন্ত্রণা হলো— সারারাত তোকে কোলে নিয়ে হাঁটলাম। তোর মা
বলল, কতক্ষণ আর তুমি হাঁটবে— আমার কোলে দাও। আমি খানিকক্ষণ হাঁটি। কিন্তু
তুই মা'র কোলে যাবি না, বানরের বাচ্চার মতো আমার গলা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে
রইলি— ভুলে গেছিস ?

না। ভুলি নি।

তোকে কোলে নিয়ে হাঁটতে আমার কোনো কষ্ট হয় নি। তুই পেটের ব্যথায় কষ্ট
পাচ্ছিলি, সেই জন্যে কষ্ট পাচ্ছিলাম। আমি আল্লাহর কাছে মানত করলাম তোর পেটের
ব্যথা সারলে আমি একশ' রাকাত নামাজ পড়ব। মানতটা করার সঙ্গে সঙ্গে তোর পেটের
ব্যথা কমে গেল।

আপনি মানত অ'দায় কবেছিলেন ?

অবশ্যই। তোকে তোর মা'র কাছে দিয়ে জায়নামাজে বসলাম। নামাজ শেষ করে
তারপর উঠলাম।

আপনি এত ভালো মানুষ কিন্তু আপনার ছেলে এত খারাপ হলো কেন ?

সেটা তো বাবা বলতে পারি না। জগৎ বড়ই বিচিত্র। তোর মা'র কথাই ধর। এমন
একজন মহিলা, অথচ কী কুৎসিত মৃত্যু হলো। যে কুকুরটাকে এত আদর করত, তার
মরণ হলো কুকুরের হাতে।

আপনি চলে যান তো বাবা।

আচ্ছা যাচ্ছি। বৌমা'কে একবার দেখে যাব না ?

তাকে দেখাব কিছু নেই।

আহা, একটু দেখে যাই। চোখের দেখা আর কিছু না। মাথা হাত বুলিয়ে আদর
করে চলে যাব। ওর পেটে যে একটা বাচ্চা ছিল সেটা বোধহয় তোকে বলে নি। না- কি
বলেছে ?

আমি কিছু বললাম না। এক দৃষ্টিতে বাবাকে দেখছি। এ কে ? সত্যি কি বাবা
এসেছেন ? না মাথার ভেতরের কোনো ভ্রান্তি উঠে এসেছে ?

বাবা হাই তুলতে তুলতে বললেন, দু'মাসের একটা বাচ্চা ছিল— বৌমা ভেবেছিল
তোর জন্মদিনে বলবে। তোকে অবাক করে দেবে। কবে যেন তোর জন্মদিন ?

আমি চুপ করে রইলাম। বাবা হাসিমুখে বললেন— আমার মনে হয় আজই তোর
জন্মদিন। আমার অবশ্যি দিন তারিখ মনে থাকে না। গুবলেট করে ফেলি। তোর মা ঠিক
ঠাক বলতে পারত। একবার ভেবেছিলাম তোর মা'কেও নিয়ে আসি। কুকুরে কামড়ানোর
পর ওর শরীর ভালো না... এই জন্যেই আনি নি।

বাবা প্রিজ আপনি চলে যান। আমি আপনার পায়ে পড়ছি।

আচ্ছা আচ্ছা, যাচ্ছি। যাচ্ছি। বৌমাকে একবার দেখে যাব না? কখনো দেখি নি।

আচ্ছা যান দেখে যান— ও শুয়ে আছে। ওব সঙ্গে ইচ্ছা করলে কথাও বলতে পারেন। ও এখনো মরে নি, কথা বলে হাঁটে পানি খায়...

গলায় বালিশ চেপে ধরে রাখলে কেউ কি আর বেঁচে থাকে রে বোকা? তুই যা দেখছিস সব মনের কল্পনা। মনের বিকার। তোর স্নায়ু ভয়ঙ্কর উত্তেজিত। এই জন্যেই তোকে নিয়ে এত চিন্তা লাগছে।

আমাকে নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না। আমি ভালো আছি। খুব ভালো আছি। আপনি চলে গেলে আরো ভালো থাকব। যান আপনার বৌমাকে দেখে চলে যান।

ওর গায়ে একটা কাপড় পরিয়ে দে বাবা। সুন্দর একটা শাড়ি পরিয়ে দে। ছেলের বৌ প্রথম দেখছি। ওর বিয়ের শাড়িটা আছে না?

হঁ আছে।

বিয়ের শাড়িটা পবা, আর কিছু গয়না টয়না পর্বায়ে সুন্দর করে সাজিয়ে দে। আমি মা'কে দেখে চলে যাই।

বাবা আমি এইসব কিছুই করব না।

বাবা, তীব্র গলায় বললেন, তুই অবশ্যই কববি। আমি আমার বৌ'মার নগ্ন মূর্তি দেখব?

আমি পুরোপুরি হকচকিয়ে গেলাম। এটা স্বপ্ন হতে পারে না। স্বপ্নে এমন তীব্র গলায় কেউ কথা বলে না। স্বপ্ন এত দীর্ঘও হয় না। এটা উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনাও না। উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা এত গোছানো হয় না। তাহলে কী হচ্ছে?

খোকন!

জি বাবা।

বৌমাকে বস্তায় ভরে রাস্তায় ফেলে দেওয়া ঠিক হবে না। তোব মা মনে কষ্টে পাবে। মা তো বেঁচে নেই বাবা।

বাবা বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসলেন। আমি সেই হাসি দেখে চমকে উঠলাম। তার নিজের মৃত্যুর সময়ও তিনি ঠিক এই ভাবে হেসেছিলেন। মৃত্যুর সময় তিনি আমাদের সবাইকে লাইন বেঁধে দাঁড়া কবালেন। আমাদের প্রত্যেকের মাথায় হাত বেখে খানিকক্ষণ দোয়া করলেন। তারপর বিচিত্র ভঙ্গিতে খানিকক্ষণ হেসে মারা গেলেন।

খোকন।

জি বাবা।

বৌমাকে রাস্তায় ফেলে দেওয়া ঠিক হবে না বাবা।

আপনি কী করতে বলেন?

তুই বৌমার বাবা-মাকে খবর দে। তোর বন্ধু ওসি সাহেবকে টেলিফোন করে সব খুলে বল।

পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে।

বাবা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তা হয়তো দিবে। কী আর করা।

বাবা, ফাঁসিতে ঝুলতে আমার ভয় লাগবে।

ভয়ের কী আছে। ভয়ের কিছু নেই। মানুষের প্রধান কাজ হলো ভয়কে জয় করতে শেখা।

আপনি আমাকে বলছেন পুলিশকে খবর দিতে ?

হ্যাঁ।

আমি যদি তা করি আপনি কি আমাকে আগের মতো ভালোবাসবেন ?

তুই পুলিশকে কিছু না বললেও তোকে আগের মতো ভালোবাসব। ছেলে-মেয়ে ভালো কি মন্দ বাবা-মা'র ভালোবাসা তার ওপর নির্ভর করে না রে বোকা।

আপনি কি সত্যি বলছেন বাবা ?

হ্যাঁ সত্যি বলছি। আরেকটা সত্যি কথা শুনে যা— বৌমা তোকে ভয়ঙ্কর ভালোবাসতো। তোর মা আমাকে যতটা ভালোবাসতো বৌমা তোকে ঠিক ততটাই ভালোবাসতো। তোর মা'র ভালোবাসা অপাত্রে পড়ে নি, কিন্তু আমার বৌমার ভালোবাসা পড়েছিল অপাত্রে।

বাবার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। তিনি তার ময়লা মাফলারে চোখ মুছছেন।

আমি বললাম, বাবা আপনি এখানে দাঁড়ান। আমি আপনার বৌমাকে বিয়ের শাড়ি পরিয়ে আপনাকে খবর দেব।

আচ্ছা।

আব আমি আপনি থাকতে থাকতেই পুলিশকে খবর দেব।

গুড।

আপনি কি সত্যি এসেছেন বাবা ?

বাবা হাসলেন।

আমি সুন্দর করে রুবাকে সাজালাম। শাড়ি পরালাম। গয়না পরালাম। রুবা কোনো নড়াচড়া করল না, কোনো শব্দও কবল না। যে মৃত্যুর জন্যে আমি অপেক্ষা করছিলাম— সেই মৃত্যু তার ঘটেছে। আমি রুবার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম— রুবা, আমার বাবা তোমাকে দেখতে এসেছেন।

রুবা তার উত্তরেও কিছু বলল না।

রুবাকে সাজানো শেষ করে বসাব ঘরে এলাম। বাবা নেই। থাকবে না আমি জানতাম। আমার মাথা যে ভ্রান্তি তৈরি করেছিল সেই ভ্রান্তি দূর হয়েছে।

আমি শোবার ঘরে ঢুকে থানায় টেলিফোন করলাম। শান্ত ভঙ্গিতে ওসি সাহেবকে বললাম, ওস সাহেব আমি ভয়ঙ্কর একটা অপরাধ করেছি। আমি আমার স্ত্রীকে খুন করেছি। আসুন, আপনি আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যান।

রুবার হাত ধরে আমি বসে আছি। কী অসম্ভব কোমল তার হাত।

রুবা কাত হয়ে শুয়ে আছে। বেনারসিতে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে রুবাকে।

ওকে একটু কাজল পরালে হয় না ? কোথায় আছে কাজলদানী ?

দরজার ওপাশ থেকে আমাকে চমকে দিয়ে বাবা বললেন— ড্রয়ারে আছে রে খোকন। ড্রয়ারটা খোল।

তিনি তাহলে এখনো যান নি ? এখনো আছেন ? আনন্দে আমার চোখে পানি এসে গেল।

আমি রুবাকে কাজল পরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িলাম।

আকাশে চাঁদ আছে। বারান্দায় চাঁদের স্ফীণ আলো। এটা কি রুবার সেই বিখ্যাত পঞ্চমীর চাঁদ ? কখন ডুববে পঞ্চমীর চাঁদ ?



বোতল

আমাদের ক্লাসে মুনির ছেলেটা একটু অদ্ভুত ধরনের। কারো সঙ্গে কথা বলে না। সব সময় পেছনের বেঞ্চিতে বসে। ক্লাসের সারাটা সময় জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। স্যার কিছু জিজ্ঞেস করলে চোখ পিটপিট করতে থাকে। তখন তার মুখ দেখে মনে হয়, সে স্যারের একটা কথাও বুঝতে পারছে না।

মুনিরের এই স্বভাব স্কুলের সব স্যাররা জানেন। কাজেই কেউ তাকে কিছু জিজ্ঞেস করেন না। শুধু আমাদের অংক স্যার মাঝে-মাঝে ক্ষেপে গিয়ে বলেন, কথা বলে না। ঢং ধরেছে। চার নম্বর বেত দিয়ে আচ্ছা করে পেটালে ফড়ফড় করে কথা বলবে।

আমাদের স্কুলের কমন রুমে নম্বর দেয়া নানান রকমের বেত আছে। বেত যত চিকন তার নম্বর তত বেশি। চার নম্বর বেত খুব চিকন বেত। এক নম্বর বেত সবচেয়ে মোটা।

কথায় কথায় বেতের কথা তুললেও অংক স্যার কখনো বেত হাতে নেন না। কিন্তু এক-এক দিন মুনিরের উপর অসম্ভব রাগ করেন। যেমন আজ করেছেন। রাগে তাঁর শরীর কাঁপছে। মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে।

স্যাব চৌবাচ্চার একটা অংক করতে দিয়েছেন। জটিল অংক। একটা পাইপ দিয়ে পানি আসছে। একটা ফুটো দিয়ে চলে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর ফুটো বন্ধ কবে দেয়া হলো— এই সব হাবিজাবি। মুনির ফট করে অংকটা করে ফেলল। আমি মুনিরের পাশে বসেছি, কাজেই ওর খাতা দেখে আমিও করে ফেললাম। অংক হয়ে গেলে হাত উঁচু করে বসে থাকতে হয়, কাজেই উঁচু করেছি। আর কেউ হাত তুলছে না। তোলার কথাও না— খুব কঠিন অংক। এখন একটা সমস্যা দেখা দিল। কেউ যদি হাত না তোলে তাহলে অংক স্যার আমাকে বলবেন বোর্ডে এসে অংকটা করে দিতে। বিবাত সমস্যা হবে। আমি চট করে হাত নামিয়ে ফেললাম। অংক স্যার হুংকার দিলেন, হাত তুলে নামিয়ে ফেললি কেন? অংক হয় নাই।

জি না স্যাব।

দেখি খাতা নিয়ে আয়।

খাতা নিয়ে গেলাম। স্যাব খাতা দেখে গম্ভীর গলায় বললেন, এই তো হয়েছে। হাত নামালি কেন? সত্যি কথা বল, নয় তো পাঁচ নম্বর বেত দিয়ে কেরামতি দেখিয়ে দেব।

আমি চুপ করে রইলাম। এই শীতেও ঘাম বেরিয়ে গেল। বুক শুকিয়ে কাঠ।

বশির বলে একটা ছেলে আছে আমাদের ক্লাসে। খুব বজ্জাত। তার জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে বিপদে ফেলা। যদি কোনো স্যার বেত আনতে বলেন— বশির আনন্দে হেসে ফেলে। বিনয়ে 'লে গিয়ে বলে, স্যার আমি নিয়ে আসি?'

যদি কোনো ছেলেকে নীলডাউন করে রাখা হয়, বশিরের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে— সে বড় মজা পায়

আজও তাই হলো। যেই সে দেখল অংক স্যার পাঁচ নম্বরির বেতের কথা বললেন, ওম্মি সে বলল, ও স্যার মুনিরের খাতা থেকে টুকলিফাই করেছে। আমি দেখেছি।

স্যারের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। বশির দাঁত বের করে বলল, বেত নিয়ে আসি স্যার ? যা নিয়ে আয়।

কয় নম্বরির আনব স্যার ?

পাঁচ নম্বরির আন। দেখ আজ কেবামতি কাকে বলে।

বশির লাফাতে লাফাতে বেত আনতে গেল। অংক স্যার মুনিরকে জিজ্ঞেস করলেন, হুমাযুন তোর খাতা থেকে টুকেছে ?

মুনির তার স্বভাবমতো চুপ করে রইল। হ্যাঁ না কিছুই বলল না। মুনির ক্লাসে কখনো কথা বলে না।

কথা বল, নয়তো আজ তোর কেবামতিও বের করব। ব্যাটা মৌন বাবাজি, কথা বলে না। কথা বল! নয়তো তোর একদিন কী আমার একদিন।

মুনির উদাস দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল, ততক্ষণে বশির চলে এসেছে। আনন্দে সে ঝলমল করছে।

অংক স্যার গম্ভীর গলায় বললেন, দু'জনই পঁচিশ ঘা করে বেত খাবি। কত ধানে কত চাল বের হয়ে যাবে। ক্লাস সিন্বে পড়ে, এর মধ্যেই খাতা দেখে লেখা শিখে গেছে! মামদোবাজি! আরেক জন দরবেশ মৌনী বাবা। দেখি হাত পাত। দুই হাত।

আমি হাত পাতলাম। বশির আনন্দে ফিক করে হেসে ফেলল। আমি অবশ্যি খুব ব্যথা পেলাম না। নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখলে আর হাত শক্ত করে রাখলে বেশি ব্যথা পাওয়া যায়। আমি ঘনঘন নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম আর হাত খুব নরম করে ফেললাম।

মুনিরের কোনো শাস্তি হলো না। হবে না আমি জানতাম। কারণ ও খুব ভালো ছেলে। গণ্ডারের ইংরেজি কী তা সে চট করে বলে দিতে পারবে। শুদ্ধ বানানে। অবশ্যি মুখে বলবে না। খাতায় লিখে দেবে। ওর একটাই দোষ— কথা বলে না। এই দোষের জন্যই তার শাস্তি হয় না।

অংক স্যার একটা বক্তৃতা দিলেন, যার সারমর্ম হচ্ছে শারীরিক শাস্তিই তিনি ঘোর বিপক্ষে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে দিলেন, কারণ অপরাধ গুরুতর। ক্ষমাব অযোগ্য। এই বয়সে যে টুকলিফাই করে, বড় হয়ে সে কী করবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি আমার নিজের জায়গায় ফিরে যেতেই বশির চিকন গলায় বলল, পঁচিশ ঘা বেত দেয়ার কথা স্যার, আপনি মাত্র তেরটা দিয়েছেন। বারটা বাকি রইল স্যার।

বশিরটা এমন বজ্রাত! রাগে আমার গা জ্বলতে লাগল। কিন্তু কিছু করার নেই। হজম করতে হবে। সুযোগমতো একটা ব্যবস্থা করতে হবে। ফুটবলের মাঠে বেকায়দা ল্যাং মেরে ফেলে দিতে হবে। কিংবা লাল পিঁপড়ার বাসা মাথায় টুপি মতো পরিয়ে দিতে হবে।

আমাকে শাস্তি দিয়ে অংক স্যারের বোধহয় মনটা খারাপ হয়েছে। কারণ তিনি দোঁখ মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে আছেন। অন্য সময় হলে এতক্ষণে বোর্ডে চলে যেতেন এবং ঝড়ের মতো একটির পর একটি অংক করতে থাকতেন। আমাদেরও নিঃশ্বাস ফেলার সময়

থাকত না। টপাটপ খাতায় তুলতে হতো। আজ সে-রকম কিছু হচ্ছে না।
তাকাচ্ছেন আমার দিকে। চিৎকার, চোঁচামেচি করলেও স্যারের মনটা খুব নরম
ছেলের অসুখ হয়েছে শুনলে তিনি তার বাসায় যাবেন। বাজখাই গলায় বলবেন, কী যে যন্ত্রণা
করিস, আবার অসুখ বাঁধালি। তাড়াতাড়ি ভালো হ। নয়তো চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেব।

মুনির এখনো দাঁড়িয়ে। শান্তির অপেক্ষা করছে। বেশ ভয়ও পেয়েছে। অল্প অল্প
কাঁপছে। অংক স্যার বললেন, তুই দাঁড়িয়ে আছিস কেন, বস।

মুনির বসল। আড়চোখে কয়েকবার তাকাল আমার দিকে। তারপর হঠাৎ আমাকে
অবাক করে দিয়ে বলল, এই হুমায়ুন, ভূত পুষবি ?

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। বলে কী! ভূত পুষব মানে ? ভূত কি কুকুরছানা নাকি ?

মুনির ফিসফিস করে বলল, আমি আজ সন্ধ্যায় একটা ভূতের বাচ্চা আনতে যাব।

ভূতের বাচ্চা আনতে যাবি মানে! ভূতের বাচ্চা পাওয়া যায় নাকি ?

একজন আজ আমাকে একটা ভূতের বাচ্চা দেবে। সন্ধ্যার সময় যেতে বলেছে। তুই
যাবি ?

আমি কী বলব ভেবে পেলাম না। মুনিরটা এমন আগ্রহ করে তাকাচ্ছে। আমার মার
খাওয়া দেখে হয়তো তার মায়া লেগেছে। এখন আমাকে খুশি করতে চায়।

হুমায়ুন যাবি ?

যাব।

খবরদার কাউকে বলবি না।

আচ্ছা বলব না।

কোনো কথা কাউকে না বলে থাকা কষ্টের ব্যাপার। তখন কথাটা পেটের মধ্যে বড়
হতে থাকে। পেট গুড়গুড় করে। খুব অস্বস্তি হয়। এই জন্যে কোনো কথা বেশিক্ষণ রাখতে
নেই। খুব গোপনীয় কথাগুলি বটগাছকে বলে পেট হালকা করতে হয়। বটগাছ সেই কথা
কাউকে বলতে পারে না বলে আর কেউ জানতে পারে না।

স্কুল ছুটির পর আমরা রওনা হলাম। ব্রহ্মপুত্রের পাড় ধরে-ধরে অনেক দূর যেতে
হলো। কেওটখালির কাছাকাছি এসে নদী পার হলাম। শীতকাল, কাজেই পানি বেশি নেই।
খেয়া-নৌকা আছে। দশ পয়সা করে নেয়। মুনির পয়সা দিয়ে দিল। সন্ধ্যা এখনো হয় নি।
এর মধ্যে চারদিক অন্ধকার। গাছপালার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। এক সময় দোতলা একটা
বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। গাছপালায় ঢাকা জঙ্গুলে জায়গায় শ্যাওলা ঢাকা এক বাড়ি।
লোহার গেট। সেই গেটে বাড়ির নাম লেখা—‘শান্তিনিকেতন’। আমি ভয়ে-ভয়ে বললাম,
কোথায় নিয়ে এলি ? এটা কার বাড়ি ?

আমার এক আত্মীয়-বাড়ি। দূর সম্পর্কের নানা হয়।

এই লোকই তোকে ভূতের বাচ্চা দেবে ?

হঁ।

গুল ছেড়েছে।

না, গুল ছাড়ে নি।

কী করে বুঝলি গুল ছাড়ে নি ?

চেহারা দেখলে তুইও বুঝবি। সন্ন্যাসীর মতো চেহারা। সন্ন্যাসীরা কি গুল ছাড়ে ?

অনেকক্ষণ দরজা ধাক্কাবার পর যিনি দরজা খুললেন, তাঁকে দেখে আমি অবাক। অবিকল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঠিক সে-রকম লম্বা দাড়ি। সাদা বাবড়ি চুল। লম্বা একজন মানুষ। পরনে আলখাল্লার মতো লম্বা একটা পোশাক। গলার স্বরও কী গম্ভীর।

দাঁড়িয়ে আছিস কেন, ভেতরে আয়। সঙ্গে এটি কে ?

আমার বন্ধু। এও ভূতের বাচ্চা নেবে।

আমি কি দোকান দিয়ে বসেছি নাকি, যে-ই আসবে একটা করে ভূতের বাচ্চা দিয়ে দেব ? একটা দেব বলেছিলাম, একটা পাবি। ভেতরে এসে বস।

আমরা সিঁড়ি ভেঙে দোতলার একটা ঘরে ঢুকলাম। সেই ঘরে বই ছাড়া আর কিছুই নেই। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত শুধু বই আর বই। মাঝখানে একটা ইজিচেয়ার ছাড়া আর কোনো আসবাব নেই। ইজিচেয়ারের পাশে ছোট্ট একটা টেবিল। টেবিলে একটা অদ্ভুত ধরনের টেবিল ল্যাম্প। উনি বোধহয় এখানে বসেই বই পড়ছিলেন।

তোরা দাঁড়িয়ে আছিস কেন, বস। মেঝেতে পা ছড়িয়ে বস। নাকি মেঝেতে বসলে তোদের মান যাবে ?

আমরা পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসে পড়লাম। আমার একটু ভয়ভয় কবছে।

কিছু খাবি তোরা ?

জি-না।

ভূতের বাচ্চা যে নিবি, কোনো পাত্র এনেছিস ?

মুনির না-সূচক মাথা নাড়ল।

ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন, কিছু নিয়ে আসিস নি, তাহলে নিবি কী করে ? পকেটে করে তো আর নিতে পারবি না। ভূত হচ্ছে হাওয়ার তৈরি। আচ্ছা, দেখি ঘবে কিছু আছে কিনা।

তিনি আমাদের বসিয়ে রেখে চলে গেলেন। বুঝতে পারছি বাড়িটা অনেক বড়। অনেকগুলি ঘর। কিন্তু এই ঘরটি ছাড়া অন্য কোনো ঘরে বাতি জ্বলছে না। লোকজনেরও কোনো সাড়া নেই। আমি ফিসফিস করে বললাম, এই বাড়িতে আব কেউ থাকে না ?

না।

উনার নাম কী ?

আগে অন্য নাম ছিল। এখন উনাকে রবিবাবু বলে ডাকতে হয়। রবি-বাবু না ডাকলে রাগ করেন। আমি ডাকি রবি নানা।

উনি কখনো কী ?

কিছু করেন না। শুধু বই পড়েন আর কবিতা লেখেন।

কবিতা লেখেন কেন ?

নোবেল প্রাইজ দরকার তো, এই জন্যে কবিতা লেখেন। কবিতা না লিখলে নোবেল প্রাইজ পাওয়া যায় না। তুই আর কথা বলিস না তো। চুপ করে থাক। নোশ কথা বললে উনি রাগ করেন।

আমি চুপ করে গেলাম। ভদ্রলোক ঢুকলেন হাতে ছোট্ট একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশি নিয়ে। ভূতের বাচ্চা কি উনি এর মধ্যে ভরে দেবেন? কী সর্বনাশ!

বোতল একটা পাওয়া গেছে, গরম পানিতে ধুতে হবে। সময় লাগবে।

আমি কিছু বলব না বলব না করেও বলে ফেললাম, এত ছোট্ট বোতলের মধ্যে থাকবে?

আমার কথায় ভদ্রলোক অত্যন্ত রেগে গেলেন। চোখ বড়বড় করে বললেন, ছোট্ট একটা কলসির মধ্যে যদি বিশাল দৈত্য থাকতে পারে, হোমিওপ্যাথির শিশির মধ্যে ভূতের বাচ্চা থাকতে পারবে না?

আমি কিছু বললাম না। ভদ্রলোক ধমকের সুরে বললেন, জবাব দাও— পারবে কী পারবে না?

পারবে।

হুঁ, দ্যাটস ওড। কী নাম তোমার?

হুমায়ূন।

ক্লাস সিস্ট্রে পড়?

জি।

বোল নাথার কত?

বত্রিশ।

ক্লাসে ছাত্র কত জন?

বত্রিশ।

তার মানে পড়াশোনা কিছুই পার না?

জি না।

স্কুল ভালো লাগে না?

জি না।

রবি ঠাকুরেরও স্কুল ভালো লাগত না। তাই বলে তুমি মনে করো না যে তুমি রবি ঠাকুর।

আমি মনে কবি না।

ওড। এখন বলো তো আমার চেহারাটা রবি ঠাকুরের মতো না?

জি।

মুশকিল হচ্ছে কী জানো? টাক পড়ে যাচ্ছে। টাকওয়ালা রবীন্দ্রনাথ অসহ্য, তাই না?

আমরা কিছু বললাম না। ভদ্রলোক আমাদের রেখে হোমিওপ্যাথির শিশি হাতে নিয়ে উধাও হয়ে গেলেন। আমি মুনিবকে বললাম তার এই নানা কি পাগল?

না, পাগল হবে কেন?

কেমন কেমন করে যেন তাকাচ্ছে।

মুনির কী একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল, কারণ ভদ্রলোক আবার এসে ঢুকেছেন। হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশিতে হলুদ রঙের ধোঁয়াটে কী একটা জিনিস।

সাবধানে রাখবি। মুখ গালা দিয়ে সিল করে রেখেছি। খবরদার, সিল ভাঙবি না। মাঝে মাঝে চাঁদের আলোতে রাখবি। এরা চাঁদের আলো খায়। ব্রহ্মপুত্রের পাড় দিয়ে বোতল হাতে নিয়ে হাঁটবি। এরা টাটকা বাতাস পছন্দ করে।

আমি বললাম, বোতলের ভেতর তো বাতাস যাবে না।

ভদ্রলোক কড়া গলায় বললেন, এই ছেলে তো বেশি কথা বলে। শোন ছোকরা, কথা কম বলবে।

জি আচ্ছা।

এখন বাড়ি চলে যাও। যাবার আগে একটা কবিতা শুনে যাও। টাটকা কবিতা। আজ বিকেলে লিখেছি। দু'ঘণ্টা মতো হয়েছে। এখনো বাসি হয় নি। ছ'ঘণ্টার আগে কবিতা বাসি হয় না। শুধু গরম কালে তিন ঘণ্টাতেই বাসি হয়।

আমরা চুপচাপ বসে আছি। রবি নানা পকেটে হাত দিয়ে কবিতা লেখা কাগজ বের করলেন। মাথা দু'লিয়ে পড়তে শুরু করলেন—

আমাদের ছোটনদী চলে বাকৈ বাকৈ

বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।

পার হয়ে যায় গরু

পার হয় গাড়ি।

'দুই ধার উঁচু তার।

ঢালু তার পাড়ি।

কবিতাটা আমার বেশ ভালো লাগল। তবে কেন জানি মনে হতে লাগল আগেও পড়েছি।

কবিতাটা কেমন?

খুবই ভালো।

ব্রহ্মপুত্র নিয়ে লেখা। আচ্ছা, যাও এখন, বাড়ি যাও। রাত হয়ে যাচ্ছে।

ভূতের বাচ্চা নিয়ে আমরা চলে এলাম। আমার বারবার মনে হতে লাগল এটা সত্যি নয়। কোথাও মস্ত একটা ফাঁকি আছে। মুনিরের একটা হাত পকেটে। সেই হাতে সে নিশ্চয়ই বোতল ধরে আছে। একবার সে ক্ষীণ গলায় বলল, কেমন জানি গরম-গরম লাগছে।

ব্রহ্মপুত্রের পাশ দিয়ে আসছি। নদীর উপর ক্ষীণ চাঁদের আলো। আমাদের কেন জানি বেশ ভয়ভয় করতে লাগল। মুনির ফিসফিস করে বলল, বোতলটার ভেতর ঐটা নড়াচড়া করছে রে।

ভয় লাগছে?

হঁ।

আমার কাছে দিয়ে দে। সকালবেলা নিয়ে নিবি। দিনের আলোয় আর ভয় লাগবে না।

মুনির সঙ্গে সঙ্গে আমাকে শিশিটা দিয়ে দিল। প্যাক্টের পকেটে রেখে দিলাম। কিছুক্ষণ পর পকেটে হাত দিয়ে দেখি সত্যি সত্যি একটু যেন গরম গরম লাগছে।

বাসায় এসে ভয়াবহ দুঃসংবাদ শুনলাম। অংক স্যার নাকি সন্ধ্যার পর এসেছিলেন। আমি এখনো ফিরি নি শুনে খুব রেগে গেছেন। বলে গেছেন আবার আসবেন।

অংক স্যারের এই হচ্ছে একটা বদ অভ্যাস। হঠাৎ হঠাৎ সন্ধ্যার পর ছাত্রদের বাড়িতে উপস্থিত হন। বাজখাঁই গলায় বলেন, কী, পড়াশোনা হচ্ছে কেমন? দেখি পাটিগণিতটা আন তো।

২

আমাদের বাড়িটা বেশ অদ্ভুত।

এই বাড়িতে দু'দল মানুষ থাকে। ছোট আর বড়। ম্যাট্রিক ক্লাসের নিচে যারা তারা সবাই ছোট। আর ম্যাট্রিক ক্লাসের উপরে হলেই বড়। যত যত্নগা ছোটদের। সন্ধ্যা হতে না হতেই তাদের পড়তে বসতে হবে। পড়তে হবে চোঁচিয়ে, যাতে সবাই শুনতে পায়। পড়ার সময় বড়রা কেউ না কেউ থাকবেই। এদের একটোমাত্র কাজ— একটু পরপর ধমক দেয়া।

এ বাড়ির ছোটদের মধ্যে আছি আমি এবং আমার দুই ছোট ভাই। এরা বেশি ছোট। একজন টুঁতে পড়ে। অন্যজন স্বরে অ স্বরে আ করে আর বইয়েব পাতা ছেঁড়ে। বড়দের দলে আছে বাবা, মা, আমার বড়চাচা এবং বড়চাচার মেয়ে অরু আপা। অরু আপা কিছুদিন আগেও ছোটদের দলে ছিল। ম্যাট্রিক পাস করায় এখন বড়দের দলে চলে গেছে। ফার্স্ট ডিভিশন আর চারটা লেটার পাওয়ায় খুব দেমাগ হয়েছে।

আজ পড়া দেখিয়ে দিচ্ছে অরু আপা। রোজ সন্ধ্যায় সে খানিকক্ষণ আমাদের পড়া দেখিয়ে দেয়। অরু আপা এম্মিতে খুব ভালো মেয়ে— হাসিখুশি, কিন্তু পড়া দেখাতে গেলেই সে কেমন জানি হয়ে যায়। মুখ কঠিন, গলার স্বর থমথমে আর এমনভাবে তাকায়, যেন এক্ষুণি এসে আমাকে কামড় দেবে। আজ পড়ছি জলবায়ু। অরু আপা বলল, মৌসুমী বায়ু কাকে বলে? আমি অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললাম, ঠাণ্ডা এবং মোলায়েম বায়ুকে মৌসুমী বায়ু বলে। এই বায়ু গায়ে লাগলে খুব আরাম। তবে বেশি লাগলে সর্দি হবার সম্ভাবনা। যাদের টনসিলের দোষ আছে তাদের মৌসুমী বায়ু গায়ে লাগান উচিত নয়।

অরু আপা হাত উঁচিয়ে বলল একটা চড় দেব।

আমাকে চড় দিলে তুমিও খামচি খাবে।

ফাজিল।

তুমিও মহিলা ফাজিল।

অরু আপা রাগে কিড়মিড় করতে করতে সত্যি একটা চড় বসিয়ে দিল। আমিও খামচি দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছি, ঠিক তখনই বাবা এসে বললেন, এই হুমাযুন তুই বাইরে আয়। তোর স্যার এসেছে— অংক স্যার।

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। অরু আপাকে খামচি দেয়া গেল না। তার উপর আবার অংক স্যার এসে বসে আছেন। পড়া ধরবেন কিনা কে জানে।

সন্ধ্যাবেলা কোথায় ছিলি?

অংক স্যার মেঘগর্জন করলেন। আমি চুপ করে রইলাম। কোনো কথা না বলাই এখন নিরাপদ।

সত্যি কথা বল। মিথ্যা বললে তাকে পুঁতে ফেলব। বেয়াদবের ঝাড়। সন্ধ্যাবেলা ঘুরে বেড়ানো! বল, কোথায় ছিলি?

আমি আমতা-আমতা করে বললাম, ভূতের বাচ্চা আনতে গিয়েছিলাম স্যার।

কী বললি!

একজনের কাছ থেকে একটা ভূতের বাচ্চা আনতে গিয়েছিলাম।

এনেছিস?

জি।

কোথায়?

আমার পকেটে স্যার।

অংক স্যার হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর নাক ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল। ভীষণ রোগে গেলে স্যারের এবকম হয়। আমি খুব ঘামতে লাগলাম। না জানি কী হয়।

ভূতের বাচ্চা আনতে গিয়েছিলি?

জি স্যার।

কোথায় সেই ভূতের বাচ্চা?

পকেটে স্যার। প্যান্টের পকেটে।

বের কর।

আমি বের করলাম। ছোট্ট হোমিওপ্যাথির শিশি, গালা দিয়ে মুখ বন্ধ করা। ভেতবে ধোঁয়াটে এবটা কিছু।

এই তোর ভূতের বাচ্চা?

জি স্যার।

আজ আর কিছু বললাম না। এইসব আজোবাজে জির্নিস বিশ্বাস করার জন্যে কাল কঠিন শাস্তি হবে। কাল তুই তোর ভূতের বাচ্চা নিয়ে স্কুলে আসবি। দেখবি পাঁচ নম্বরি বেতের কেরামতি।

আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। কাল যা হবাব হোক, আজ রাতটায় তো নিস্তার পাওয়া গেল। এই বা কম কী?

ভূতের কথা শুনে বাড়িতে একটা হৈচৈ পড়ে গেল। সবাই ভূতের বাচ্চা হাতে নিয়ে দেখতে চায়। দেখতে চাইলেই তো হাতে দেয়া যায় না। হয়তো ফট করে হাত থেকে ফেলে দেবে।

একমাত্র অরু আপাই ভূতের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখাল না। অরু আপা সায়েন্স পড়ে। যারা সায়েন্সে পড়ে তাদেরকে সব কিছুই অবিশ্বাস করতে হয়। কাজেই সে ঠোট উল্টে বলল, ভূত না ছাঁই। খানিকটা ধোঁয়া বোতলে ভরে দিয়ে দিয়েছে। নীল রঙের ধোঁয়া।

নীল রঙের ধোঁয়া শুনে আমার খটকা লাগল। ব্যাপারটা কী, নীল রঙের ধোঁয়া বলছে কেন? আঁচি তো একটু আগে দেখলাম হলুদ।

ও মা, কী কাণ্ড! বোতল হাতে নিয়ে একেক জন বলতে লাগল।

বড়চাচাও অবাক হয়ে গেলেন। চোখে চশমা পরে অনেকক্ষণ হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন। গম্ভীর হয়ে বললেন, ব্যাপারটা রহস্যজনক। আমি খয়েরি রঙ দেখতে পাচ্ছি। এর মানেটা কী ?

বড়চাচার কথায় সবার গা ছমছম করতে লাগল। আমার দাদি কেঁদে উঠলেন। কী অলক্ষ্যে কাণ্ড। ভূতের বাচ্চা ধরে নিয়ে এসেছে। এই হুমাযূন, যা সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে আয়। তোমরা দাঁড়িয়ে দেখছ কী ? এই ছেলেকে গরম পানি দিয়ে গোসল করাও। লবণ খাওয়াও।

অনেক রাতে বড়দের একটা মিটিং বসল। আমার বাবা বললেন, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। তবে একেক জন যে একেক রকম রঙ দেখছে এটা সত্যি।

ছোটচাচা বললেন, ঘোড়ার ডিমটা রাস্তায় নিয়ে ফেলে দিলে ঝামেলা চুকে যায়।

বড়চাচা তাতে রাজি না। তিনি আরো পরীক্ষা করতে চান। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো রাতের বেলা বোতলটা সিন্দুকে তালাচাবি দিয়ে রাখা হবে। আগামীকাল যা করার করা হবে। বিশেষ করে স্কুলের অংক স্যার যখন বলেছেন বোতল স্কুলে নিয়ে যেতে— সেটাই করা হোক।

পরদিন আমি বোতলটা স্কুলে নিয়ে গেলাম। ও মা! সবাই দেখি এই খবর জানে। উঁচু ক্লাসের ছেলেরা পর্যন্ত হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে চায়। আমাদের ক্লাস-ক্যাপ্টেন ফিসফিস করে বলল, আমাকে একবার যদি হাতে নিতে দিস তাহলে আব কোনোদিন বোর্ডে নাম লিখব না।

অংক স্যার ক্লাসে ঢুকলেন বেত নিয়ে। তিন নম্বর এবং পাঁচ নম্বর বেত। আনন্দে বশির হেসে ফেলল। কাউকে শাস্তি দেয়া হবে টেন পেলেই বশিরের বড় আনন্দ হয়। সে দাঁত বের করে বলল, আজ যা মজা হবে। হুমাযূনকে স্যার টাইট দেবে। সে মজা দেখার জন্যে আমার পাশে এসে বসল।

অংক স্যার হুংকার দিলেন, হুমাযূন, এসেছিস ?

জি স্যার।

ভূত এনেছিস ?

জি স্যার।

বেব কর, সবাইকে দেখা।

সবাই দেখেছে স্যার।

গুড। এখন এই ক্লাসে কারা কারা বিশ্বাস কবে যে এর ভেতর সত্যি একটা ভূতের বাচ্চা আছে ? হাত তোল।

আমার দেখাদেখি আরো দশ-বার জন হাত তুলল।

স্যার বললেন, কী কারণে বিশ্বাস হয় যে এর ভেতর সত্যি ভূত আছে ?

আমাদের ক্লাস-ক্যাপ্টেন বলল, একেক জন একেক রকম রঙ দেখে স্যার।

তাই নাকি।

জি স্যার। আমি দেখেছি সবুজ রঙ, আর মতিন দেখেছে লাল।

অংক স্যার চোখ কুঁচকে বললেন, আরে গাধার দল, তোরা যে রঙের সার্ট পরেছিস বোতলে সেই রঙ দেখতে পাচ্ছিস। মতিনের গায়ে লাল স্যুয়েটার, এই জন্যে সে দেখেছে লাল। আসলে চিচিং ফাঁক। শুভঙ্করের ফাঁকি। কি, বিশ্বাস হয়?

আমার মন খারাপ হয়ে গেল। ব্যাপারটা আসলেই তাই। আমি হলুদ দেখছি, কারণ আমার স্যুয়েটারের রঙ হলুদ। অংক স্যার মেঘগর্জন করলেন, যত বেকুবের দল, সহজ জিনিস বোঝে না। এখন মন দিয়ে শোন, এই বোতলে যা আছে তা আমি গিলে ফেলব।

আমরা অবাক হয়ে তাকলাম। স্যার বলে কী! গিলে ফেলবে মানে! স্যার গম্ভীর মুখে বললেন, গিলে ফেলে তোদের বোঝাব যে আসলে কিচ্ছু না। হাতেনাতে না দেখালে তোদের জ্ঞান হবে না। গাধার দল। ক্লাস-ক্যান্টেন কোথায়?

এই যে স্যার।

যা এক গ্লাস পানি নিয়ে আয়। পানি দিয়ে গিলব।

ক্লাস-ক্যান্টেন ছুটে গেল পানি আনতে। বশির বলল, হুমায়ুনকে শাস্তি দেবেন না স্যার? ওর শাস্তি পাওয়া দরকার। সবাইকে বোকা বানিয়েছে।

হবে, শাস্তি হবে। আগে ভূতটা গিলে ফেলি, তারপর শাস্তি।

পানি এসে গেল। অংক স্যার ছোট্ট একটা বস্তুটা দিলেন— দেশটা কুসংস্কারে ডুবে আছে। একজন হোমিওপ্যাথির শিশিতে ভূতের বাচ্চা ভরে এনেছে। অন্য সবাই তাই বিশ্বাস করছে। ছিঃ ছিঃ।

বলতে বলতে স্যার বোতলের মুখ খুলে নিজের মুখে উপুড় করে ধবলেন। এক গ্লাস পানি খেয়ে বললেন, গিলে ফেললাম। হলো এখন? ভূতের বাচ্চা হজম।

স্যার একটা ভূক্তির ঢেকুর তুললেন। আমরা অবাক হয়ে স্যারের দিকে তাকিয়ে আছি। স্যার কী একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন এবং আবার একটি ঢেকুর তুললেন। তারপর আবার একটি।

আমার মনে হলো স্যার কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন। খানিকক্ষণ পেটে হাত বোলালেন। বোতলটা ঝুঁকে দেখলেন। এবং আবার বেশ বড় রকমের একটা ঢেকুর তুললেন। মনে হলো তিনি কেমন যেন হতভম্ব হয়ে পড়েছেন।

বশির বলল, স্যার হুমায়ূনের শাস্তি দিলেন না?

স্যার সেই কথা যেন শুনতেও পেলেন না। ঝিম ধরে চেয়ারে বসে রইলেন এবং একটু পরপর ঢেকুর তুলতে লাগলেন। সেদিন আর ক্লাসে কোনো অংক করা হলো না।

৩

সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বই নিয়ে বসার কথা। এটা হচ্ছে বড়চাচার কঠিন নিয়ম। তবে সব নিয়মেরই ফাঁক আছে। এই নিয়মের বেলাতেও তা সত্যি। মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলা বড়চাচা রাজনীতি নিয়ে আলাপ করবার জন্যে পাশের উকিল সাহেবের বাড়ি যান। সেই বাড়িতে যাওয়া মানে পাক্কা তিন ঘণ্টার ধাক্কা। ফিরতে ফিরতে রাত নটা। ঐসব

দিনগুলিতে সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে বই নিয়ে বসার দরকার নেই। কিছুক্ষণ খেলাধুলা করা যায়। আমরা ছোটরা বড়চাচা ছাড়া কাউকে ভয় করি না। আমার ধারণা সব বাড়িতে এরকম এক-আধ জন মানুষ থাকে যাদের সবাই ভয় করে, অন্যদের পাত্তাই দেয় না।

যাই হোক, বড়চাচা বাসায় নেই— উকিল সাহেবের বাসায় গেছেন, আর আমরা নতুন একটা খেলা বের করেছি। এই খেলার নাম— ‘পানি খেলা’। সবাই মগে করে পানি নিয়ে এ ওর গালে ছিটিয়ে দেবার চেষ্টা করছি। খুবই মজার খেলা।

খেলা যখন তুঙ্গে, তখন খবর পেলাম অংক স্যার এসেছেন। সব সময় দেখেছি দারুণ আনন্দের সময়ই খারাপ ব্যাপারগুলি ঘটে। পৃথিবীটা এরকম কেন কে জানে? পৃথিবীর নিয়মকানুনগুলি যখন করা হয়, তখন নিশ্চয়ই শিশুদের কথা কেউ ভাবে নি। আমার ধারণা এই পৃথিবীর সব নিয়মকানুনই হচ্ছে শিশুদের কষ্ট দেবার নিয়ম।

আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বাইরে এসে দাঁড়িলাম। অংক স্যার বললেন, কী করছিলি?

আমি অন্য দিকে তাকিয়ে বললাম, পড়ছিলাম স্যার।

অংক স্যার বললেন, ভেরি গুড। বলেই বিকট একটা ঢেকুর তুলে ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন। মনে হলো বেশ লজ্জাও পেলেন। ঢেকুর কি ভূতের বাচ্চা গিলে ফেলার কারণে নাকি? হতেও পারে। গতকাল স্যার ক্লাসে আসেন নি। অংক স্যার ক্লাসে না আসাব মানুষ না।

অংক স্যারকে কেমন রোগা রোগা লাগছে। মুখ শুকনো। চোখ লাল। মনে হচ্ছে রাতে ঘুমুতে পাবেন নি। গায়ে চান্দব জড়িয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসে আছেন এবং একটু পরপর ঢেকুর তুলছেন। একেক বার ঢেকুর তোলেন আর হতাশ একটা ভঙ্গি করেন। ফ্যাকাশে হাসি হাসেন এবং দীর্ঘনিঃশ্বাসও ফেলেন।

কেমন আছিস হুমাযুন।

জি স্যার ভালো। আপনার শরীরটা কি স্যার ভালো না?

উঁহ্। গত রাতে ঘুম হয় নি।

কেন স্যার?

স্যার ইতস্তত করে বললেন, না— মানে— ঐ দিন তোর বোতলের ঐ জিনিসটা গিলে ফেললাম, তারপর থেকে— মানে—

তারপর থেকে কী স্যার?

না, কিছু না। একটু পরপর ঢেকুর উঠছে। ভূতের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই আমি জানি। শারীরিক কোনো অসুবিধা হয়েছে আর কী।

জি স্যার। ওষুধ খান, সেরে যাবে।

খেয়েছি তো। নাকস ভমিকা এক ডোজ খেয়েছি। দুই শ’ পাওয়ার। কমছে না তো। মনে হচ্ছে, আরো যেন বেড়েছে।

সত্যি নাকি স্যার?

স্যার উত্তর না দিয়ে বড় রকমের একটা ঢেকুর তুললেন। সেই ঢেকুরের সঙ্গে পেটের ভেতরে বিচিএ শব্দ হতে লাগল— ‘টপ টপাটপ! বুম!! গুরু রুরুরুর!!!’ স্যার নিজেই সেই

শব্দে বিচলিত। বিচলিত এবং হতভম্ব। তিনি চিকন গলায় বললেন, হুমায়ূন, যে লোক তোকে ভূতের বাচ্চা দিয়েছে ওর কাছে আমাকে নিয়ে চল তো।

কেন স্যার ?

এমনি। যাই একটু গল্প করে আসি। ভূত-ফুত আমি বিশ্বাস করি না। ভূতের কথা বলে তিনি যে বাচ্চাদের ভয় দেখাচ্ছেন, এটাও ঠিক না। বাসা চিনিস না ? আমাকে নিয়ে চল।

মুনিরকেও সাথে নিয়ে যাই স্যার ? মুনিরের সঙ্গেই তাঁর ভালো চেনা-জানা।

দুনিয়াসুদ্ধ লোক নিয়ে যাওয়ার কোনো দরকার দেখি না। তুই গেলেই হবে।

অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর বুড়ো লোকটি দরজা খুললেন। আমাদের দিকে এক পলক তাকিয়েই বললেন, এক মিনিট। এই বলে পাশের ঘরে চলে গেলেন। খুটখুট শব্দ শোনা যেতে লাগল। যেন হামানদিস্তায় কিছু পিসছেন।

অংক স্যার ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, দেখতে অবিকল রবি ঠাকুরের মতো না ?

জি স্যার।

আমি তো চমকেই গিয়েছিলাম।

প্রথম দিন আমিও চমকে গিয়েছিলাম স্যার।

খুটখুট শব্দ হচ্ছে কীসের রে ?

জানি না স্যার। হয়তো ভূতের ভর্তা বানাচ্ছেন।

ভূতের ভর্তা মানে ? কী সব ছাগলের মতো কথা বলছিস।

বুড়ো ভদ্রলোক ফিরে এলেন। হাতে গ্লাস ভর্তি লালাভ জিনিস। মুখ-ভর্তি হাসি। তিনি দরাজ গলায় বললেন, গ্লাসে কী আছে অনুমান করতে পারবে ? চিরতার পানি। স্বয়ং কবিশুর খেতেন। আমিও খাই। তোমাদের দু'জনকেই তুমি করে বললাম। বয়সে দু'জনই আমার চেয়ে ছোট। ছোটটাকে তো চিনি, আমার কাছ থেকে ভূতের বাচ্চা নিয়ে গিয়েছিল। তুমি কে ?

স্যার কাঁপা গলায় বললেন, আমি হুমায়ূনের শিক্ষক। অংক স্যার।

বাহ্ খুব ভালো তো। অংক ব্যাপারটা আমারও খুব ভালো লাগে। আচ্ছা তুমি মনে মনে দুই সংখ্যার একটা অংক ভাব। ভেবেছ ?

অংক স্যার শুকনো গলায় হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ালেন।

এর সঙ্গে সাত যোগ দাও। দিয়েছ ?

জি।

যোগ দেবার পর যা হয় তা তুমি ১১০ থেকে বাদ দাও। দিয়েছ ?

জি।

খুব ভালো। এর সঙ্গে পনের যোগ দাও।

দিলাম।

যে সংখ্যা মনে মনে ভেবেছ তাও এর সঙ্গে যোগ কর। করেছে ?

জি করেছে।

দুই দিয়ে ভাগ দাও। এর থেকে নয় বাদ দাও। যা থাকল তাকে তিন দিয়ে গুণ দাও।
দিয়েছ ?

জি।

তোমার উত্তর হলো গিয়ে ১৫০। কি, হয়েছে ?

জি, হয়েছে। আশ্চর্য তো!

অংক স্যার হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন। বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, এইসব মজার মজার অংক করে ছাত্রদের কৌতূহল জাগিয়ে তুলতে হয়। তা না, কঠিন কঠিন সব অংক দিয়ে তোমরা ছাত্রদের ভয় পাইয়ে দাও। অংক একটা মজার জিনিস, তোমরা সেই মজাটাই ছাত্রদের দিতে পার না। খুব খারাপ। এখন বলো আমার কাছে কী চাও ?

অংক স্যার বললেন, কিছু চাই না জনাব।

বুড়ো খুব রেগে গেলেন। থমথমে গলায় বললেন, কিছু চাই না মানে ? শুধু শুধু আমার সময় নষ্ট করতে এসেছ। আর একটু পরপর এমন বিশী ঢেকুর তুলছ কেন ? কী হয়েছে ?

অংক স্যারের মুখটা কেমন কালো হয়ে গেল। আমার দিকে একবার করুণ চোখে তাকিয়ে মাথা চুলকাতে লাগলেন।

আমি বললাম, আপনি যে আমাকে ভূতের বাচ্চাটা দিয়েছিলেন, অংক স্যার সেটা গিলে ফেলেছেন। তারপর থেকে শুধু ঢেকুর উঠছে। স্যারের বড় কষ্ট।

বুড়ো অবাক হয়ে বললেন, ভূতের বাচ্চা গিললে কেন! ভূত কি কোনো খাদ্যদ্রব্য ? বলো এটা কি কোনো মজাদার কিছু ?

স্যাব আমতা আমতা করছেন। জবাব দিচ্ছেন না।

কী, চুপ করে আছ কেন ? জবাব দাও। কেন ভূতের বাচ্চা গিললে ?

ভূত বলে যে কিছু নেই এটা ছাত্রদের বোঝাবার জন্যে।

কিছু যদি না থাকত তাহলে তোমার পেটে যে জিনিসটা গজগজ করছে সেটা কী ? বলো কী সেটা ?

না, মানে অসুখ-বিসুখ কিছু হয়েছে বোধহয়।

অসুখ-বিসুখ কিছু না। ভূতের বাচ্চা হজম হচ্ছে না। দাঁড়াও, দেখি কী করা যায়। নাকেব ফুটো দিয়ে বের করে দিচ্ছি। সময় লাগবে। চট করে হবে না। পঞ্চাশটা বৈঠক দিতে হবে। তিন সের গরম পানি খেতে হবে। মুরগির পালক দিয়ে নাকে সুড়সুড়ি দিতে হবে। তখন খুব হাঁচতে থাকবে। সেই হাঁচির সঙ্গে ভূত বেরিয়ে আসবে। অনেক যন্ত্রণা।

আমবা দু'জন বাসায় ফিরে চলেছি। বুড়ো ভদ্রলোক ভূতের বাচ্চাটা বের করে আবার বোতলে ভরে আমাকে দিয়েছেন। অংক স্যারের ঢেকুর তোলা বন্ধ হয়েছে। তবে তিনি খুব গম্ভীর। একবার শুধু বললেন, ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছি না।

আমি বললাম, তাহলে কি স্যার ভূত আছে ?

আরে না, ভূত আবার কী ? ঐ বুড়ো আমাদের বোকা বানিয়েছে। ব্যাটা মনে হচ্ছে বিরাট ফাজিল।

কিন্তু স্যার আপনার ঢেকুর তো বন্ধ হয়েছে।

স্যার কিছু বললেন না। তাঁকে খুব চিন্তিত মনে হলো। যেন কিছুতেই হিসাব মেলাতে পারছেন না।

8

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুরুতে এক দারুণ ব্যাপার হলো।

নাইন-টেনের ছেলেরা মিলে ঠিক করল, আম-কাঁঠালের ছুটি খানিকটা এগিয়ে দেবার জন্যে হেড স্যারের কাছে দরবার করবে। দরবারটা যাতে জোরাল হয় সে জন্যেই সব ক্লাস থেকে দু'জন করে যাবে। যে দু'জন যাবে তারা যেন অবশ্যই খুব ভালো ছাত্র হয়। ফাস্ট-সেকেন্ড হওয়া ছেলে হলে ভালো। স্যাররা ভালো ছাত্রদের ওপর চট করে রাগেন না।

দীপু হচ্ছে আমাদের ক্লাসের ফাস্ট বয়। সে সব শুনে বলল, আগে-ভাগে ছুটি নিয়ে হবেটা কী ? আম-কাঁঠালের ছুটি না হলেই সবচে' ভালো হয়। মন দিয়ে পড়াশোনা করতে পারি।

কথা শুনে রাগে গা জ্বলে যায়। ইচ্ছা করে ঠাস করে মাথায় একটা চটি বসিয়ে দিই। তার উপায় নেই, এরা ভালো ছাত্র। স্যারের কাছে নালিশ করলে সর্বনাশ।

আমাদের ক্লাস থেকে কেউ দেখি যেতে রাজি নয়। আমি একাই গেলাম। বিরাট একটা দরখাস্তও লেখা হলো। ক্লাস টেনের বগা ভাই (আসল নাম বদরুল ইসলাম। খুব লম্বা বলে আমরা তাকে ডাকি বগা ভাই) হেড স্যারের হাতে দরখাস্ত তুলে দিল। হেড স্যার বললেন, ব্যাপার কী ?

বগা ভাই তোতলাতে তোতলাতে বলল, দরখাস্তে সব লে-লে-লে-লেখা আছে স্যার।

বগা ভাইয়ের এই একটা অসুবিধা, ভয় পেলে তোতলাতে শুরু করে। এবং প্রতিটি বাক্য দু'বার করে বলে। সে আবার বলল, দরখাস্তে সব লে-লে-লে-লেখা আছে স্যার।

লেখা যে আছে তা তো দেখতেই পাচ্ছি। ব্যাপারটা কী তোমাদের মুখ থেকে শুনতে চাই।

আম-কাঁঠালের ছুটি দুই সপ্তাহ এগিয়ে দিলে ভালো হয় স্যার।

কেন ?

আমরা সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি। ছুটি এগিয়ে দিলে কেন ভালো হয়, তা নিয়ে আমরা আলোচনা করি নি। হেড স্যার হুংকার দিয়ে বললেন, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? কথা বল।

কেউ নড়াচড়া করছে না দেখে সাহসে ভয় করে আমিই মুখ খুললাম। মিনমিন করে বললাম, এইবার তো স্যার গরম খুব বেশি পড়েছে, আম-কাঁঠাল সব আগে আগে পেকে গেছে। এই জন্যে স্যার ছুটিটা যদি এগিয়ে দেন।

আম-কাঁঠাল পাকানো কাকে বলে জানিস ?

জি-না স্যার ।

এক্ষুণি দেখবি কাকে বলে । কত বড় সাহস । বলে ছুটি এগিয়ে দিতে । যা ক্লাসে যা । ক্লাসে গিয়ে নীলডাউন হয়ে থাক ।

ক্লাসে ফিরে এসে নীলডাউন হয়ে আছি । বশির দাঁত বের করে হাসছে । কাউকে শাস্তি দিতে দেখলে তার ভারি আনন্দ হয় । সে আজ আর আনন্দ চেপে রাখতে পারছে না । কিছুক্ষণ পর পর সব ক'টা দাঁত বের করে দিচ্ছে ।

টিফিন টাইমে দণ্ডুরি কালিপদ নোটিশ নিয়ে এলো । হেড স্যার নোটিশ পাঠিয়েছেন— ছাত্রদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে এই বৎসরের গ্রীষ্মকালীন বন্ধের সময়সীমা দুই সপ্তাহ কমিয়ে দেয়া হলো । নির্ধারিত সময়ের দুই সপ্তাহ পর থেকে বন্ধ শুরু হবে । এই নিয়ে কোনো রকম দেন-দরবার না করবার জন্য ছাত্রদের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে ।

ছুটির পর খুবই মন খারাপ করে বাসায় ফিরলাম । কী করা যায় কিছুই বুঝতে পারছি না । এখন ছুটি এগিয়ে আনবার দরকার নেই; যথাসময় ছুটি আরম্ভ হলেই আমরা খুশি । তেমন কোনো সজ্জাবনা দেখা যাচ্ছে না । আমাদের হেড স্যার খুব কঠিন চিঁজ ।

সন্ধ্যার আগে আগে মূনির এসে উপস্থিত । সেও ছুটি কমে যাওয়ায় মন খারাপ কবেছে । এই ছুটিতে তার মামাবাড়ি যাবার কথা । ছুটি কমে গেলে আর যাওয়া হবে না ।

মূনির বলল, চল তাঁর কাছে যাই । তিনি যদি কোনো বুদ্ধি দেন ।

কার কথা বলছিস ?

আমাদের যিনি ভূতের বাচ্চা দিলেন । ঐ যে রবীন্দ্রনাথের মতো দেখতে ।

উনি বুদ্ধি দেবেন কেন ?

দিতেও তো পাবেন । আমাদের কথা তো উনি শোনেন । শোনেন না ?

চল চাই । আমার কেন জানি মনে হচ্ছে উনি হেড স্যারের মতো রেগে যাবেন । সব বড়রা এক রকম হয় ।

তবু বলে দেখি ।

বুড়ো ভদ্রলোক দাঁড়িতে হাত নুলাতে নুলাতে আমাদের সমস্যা শুনলেন । তারপর বললেন, অন্যায়, খুবই অন্যায় । ছুটি কমাবার কোনো রাইট নেই । বাচ্চা ছেলেগুলোকে সারাদিন স্কুলে আটকে রেখেও শখ মিটছে না, এখন আবার ছুটি কমিয়ে দিচ্ছে । রবি ঠাকুর বেঁচে থাকলে খুব রাগ করতেন ।

আমি বললাম, এখন আমরা কী করব বলুন ।

ভূতের বাচ্চাকে বলা ছাড়া তো কোনো পথ দেখছি না ।

আমি অবাক হয়ে বললাম, ভূতের বাচ্চাকে কী বলব ?

তোমাদের সমস্যার কথা বলবে । কবে থেকে স্কুল বন্ধ করতে চাও এটা বলে দেবে, তাহলেই হবে ।

কী যে আপনি বলেন ।

কী যে আমি বলি মানে ? এক চড় লাগাব, বুঝলে । যা করতে বলছি কর । বোতলটা মুখের কাছে এনে ফিসফিস করে বলবে । বলবে যেন আগামীকাল থেকেই আম-কাঁঠালের ছুটি দেবার ব্যবস্থা করে । খুব ভদ্রভাবে বলবে । আরেকটা কথা, মাসে একবারের বেশি কিছু চাইবে না, ভূত এখনো খুবই বাচ্চা । ক্ষমতা কম । আরেকটু বড় হোক, তখন ঘনঘন চাইতে পারবে ।

আমি বললাম, থ্যাংক ইউ ।

বুড়ো আগুন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার সঙ্গে ইংরেজি ? এর মানে কী ?

ক্ষমা করে দিন স্যার । আর বলব না । আমরা এখন যাই স্যার ?

না । আমি গতকাল একটা কবিতা লিখেছি, এটা শুনে তারপর যাও । তোমাদের নিয়েই লেখা ।

কবিতার নাম 'বীর শিশু' ।

মনে কর যেন বিদেশ ঘুরে
মা'কে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে ।
তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে
দরজা দু'টো একটুকু ফাঁক করে
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার 'পরে
টগ্‌বগিয়ে তোমার পাশে পাশে ।

আমার কেন জানি মনে হলো এই কবিতাটা আগেও শুনেছি । তবে সেই কবিতাটার নাম ছিল বীরপুরুষ, বীরশিশু নয় । তবে এটা নিয়ে ঘাঁটার্ঘাটি এখন না করাই আমার কাছে ভালো মনে হলো । বুড়োকে বাগানো ঠিক হবে না ।

আমরা বাড়ি চলে এলাম । বুড়োর কথা ঠিক বিশ্বাস হলো না । বোতলের ভেতর ভূত যদি থেকেও থাকে সে স্কুল বন্ধ করবে কীভাবে ?

তবু রাতে শোবার আগে ট্রাংক থেকে বোতল বের করে ফিসফিস করে বললাম, ভাই বোতল ভূত, তুমি কেমন আছ ? ভাই তুমি কি আমাদের স্কুলটা আগামীকাল থেকে বন্ধ করে দিতে পারবে ? লক্ষ্মী ভূত, ময়না ভূত । দাও না বন্ধ করে ।

অরু আপা কী কাজে যেন ঘরে ঢুকেছিল । সে অবাক হয়ে বলল, এসব কী হচ্ছে রে ?

আমি বললাম, কিছু হচ্ছে না ।

কার সঙ্গে কথা বলছি ?

বোতলের ভূতের সঙ্গে ।

অরু আপা গম্ভীর হয়ে বলল, বোতলের ভূতের সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল শুনি ।

তোমার শোনার দরকার নেই ।

আহা শুনি না ।

বোতলের ভূতকে বলেছি আগামীকাল থেকে স্কুল বন্ধ করে দিতে । সে বন্ধ করে দেবে ।

তোর মাথাটা খারাপ হয়েছে।

হলে হয়েছে।

বাড়িতে দারুণ হৈচৈ পড়ে গেল। বাবা ডেকে নিয়ে বললেন, এসব কী হচ্ছে রে! তুই নাকি বোতলের ভৃত্যকে বলেছিস স্কুল বন্ধ করতে ?

বড়চাচা বললেন, পাজিটার কানে ধরে চড় দেয়া দরকার। ভূত-প্রেতের কাছে দরবার কবছে। ভূত আবার কী রে ? দশবার কানে ধরে ঠুঠ-বোস কর। আর যা, তোর সেই বিখ্যাত বোতল কুয়োয় ফেলে দিয়ে আয়। এফুণি যা।

বড় চাচাব কথার উপর দ্বিতীয় কথা চলে না।

বোতল ভূত কুয়োয় ফেলে দিতে হলো। পরদিন খুবই মন খারাপ করে স্কুলে গেলাম। অ্যাসেম্বলিতে সবাই দাঁড়িয়ে আছি। 'সোনার বাংলা' গান হয়ে যাবার পর হেড স্যার বললেন, তোমাদের জন্যে একটা সুসংবাদ আছে। স্কুলেব জন্যে সবকার থেকে দুই লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে। এখন তোমরা পাবে পাকা দালান। দালানের কাজ শুরু করতে হবে দূর্য্যার আগেই। কাজেই আজ থেকেই তোমাদের গবমের ছুটি। অন্যবারের চেয়ে এবার তোমরা দু'সপ্তাহ বেশি ছুটি পাবে। তবে ছুটিটা কাজে লাগাবে। শুধু খেলাধুলা করে নষ্ট করবে না।

আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে বইলাম। ব্যাপারটা কি বোতল ভূতের কারণেই ঘটল ?

৫

গবমের ছুটি ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত।

ছুটির আগে কত বকম পবিকল্পনা থাকে— এই কবব, ঐ কবব। যখন সত্যি সত্যি ছুটি শুরু হয়, তখন কিছু কবাব থাকে না। সব কেমন পানসে মনে হয়।

এখন আমাদের তা-ই লাগছে। স্কুল ছুটি। কত আনন্দ হবাব কথা, কিন্তু কোনো আনন্দ হচ্ছে না। এদিকে বড়চাচা কঠিন কঠিন সব নিয়ম-কানুন জারি করছেন। যেমন আজ সকালেই বললেন, ছুটিটা কাজে লাগাবার ব্যবস্থা কব। পাটীগণিতের সব অংক শেষ কবে ফেল।

আমি বললাম, এফুণি সব অংক শেষ কবে ফেললে সারাবছব কী করব ?

বড়চাচা বললেন, চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেব। মুখে মুখে কথা বলে। যা পাটীগণিতের বই নিয়ে আয়। দেখব কত ধানে কত চাল।

কী আব করব, বই নিয়ে এলাম। বড়চাচা চড় দিয়ে সত্যি সত্যি দাঁত ফেলে দিতে পারেন। আমার ছোট ভাই অন্তর একটা দাঁত তিনি এইভাবেই ফেলেছেন। অবশ্য সেটা ছিল নড়া দাঁত। এমনিতেই পড়ত, চড় খেয়ে দু'-এক দিন আগে পড়ে গেল। বড় চাচার নাম ফাটল। তিনি সেই দাঁত ডেটল দিয়ে ধুয়ে হরলিক্সের একটা খালি বোতলে ভরে নিজেব ঘরে রেখে দিলেন। বোতলের গায়ে লিখে দিলেন— 'চড় দিয়ে ফেলা দাঁত। দুষ্ট শিশু সাবধান।'

বড়চাচা হুঁকো টানতে টানতে সারা দুপুর আমাকে লসাগু এবং গসাগু করালেন। কুর্হসিত সব অংক— গুণ দাও, ভাগ দাও, আবার গুণ, আবার ভাগ। কী হয় এসব গুণ-ভাগ করে? পৃথিবী থেকে অংকটা উঠে গেলে কত ভালো হতো।

লসাগু-গসাগু করতে করতে একবার ভাবলাম বোতল ভূতকে বলব— ও ভাই বোতল ভূত, লক্ষ্মী ভাই, ময়না ভাই, তুমি পৃথিবী থেকে অংক নামের এই খারাপ জিনিসটা দূর করে দাও। একদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে সবাই যেন দেখে অংক বইয়ের সব লেখা মুছে গেছে। সব পাতা সাদা। নামতা-টামতাও কারো মনে নেই। তিন দু'গুণে কত কেউ বলতে পারে না। এমনকি অংক স্যাররাও না। এক দুই কী করে লিখতে হয় তাও কেউ বলতে পারে না।

অবশ্য আমি জানি বোতল ভূতকে এসব বলে লাভ নেই। সে কিছু করতে পারবে না। তার উপর বোতলটা ফেলে দেয়া হয়েছে কুয়োয়। বোতল ভেঙে ভূত কোথায় চলে গেছে কে জানে।

বেলা তিনটা বেজে গেল, তবু বড়চাচা আমাকে ছাড়লেন না। যখনই বলি, আজ উঠি চাচা? তখনই তিনি গম্ভীর হয়ে বলেন, কোনো কথা না। একটা কথা বললে চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেব। সেই দাঁত চলে যাবে হরলিক্সের কৌটায়।

বিকেল হয়ে গেল। আমাদের ফুটবল টিমের ছেলেরা আমার জন্যে উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করল। তবু বড়চাচা আমাকে ছাড়বেন না। বড়বা ছোটদের এত কষ্ট কী করে দেয় কে জানে! তারা কি কখনো ছোট ছিল না?

আমি বললাম, বিকেল হয়ে গেছে চাচা, এখন উঠি? বড়চাচা হুংকাব দিয়ে বললেন, শুধু খেলার দিকে মন। কোনো ওঠাউঠি নেই। তোকে দিয়ে আমি বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়াব। খেলাধুলো করে হয় কী? ফুটবল খেলতে গিয়ে হাত-পা ভেঙে ঘরে ফিরবি। তার কোনো প্রয়োজন দেখছি না।

আমি সারাদিন পড়ব?

নিশ্চয়ই সারাদিন পড়বে। জীবনে উন্নতি করতে চাইলে সাবাদিন পড়তে হবে। 'ছাত্র নং অধ্যয়নং তপঃ।'

আমি জীবনে উন্নতি করতে চাই না বড়চাচা।

জীবনে উন্নতি করতে চাস না?

না।

বড়চাচা ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিলেন। খমখমে গলায় বললেন, তোর বেয়াদবির বিচার সন্ধ্যাবেলা হবে।

সন্ধ্যাবেলা সত্যি সত্যি বিচার-সভা বসল। বড়চাচা, বাবা এবং আমাদের প্রাইভেট স্যার— তিন জন বসলেন তিন দিকে। আমি মাঝখানে। বড়চাচা স্যারের দিকে তাকিয়ে বললেন, হুমায়ুন সম্পর্কে তোমার ধারণা কী মাস্টার বলো তো।

স্যার শুকনো গলায় বললেন, ওর মাথায় কিছু নাই।

বড়চাচা ঠাণ্ডা গলায় বললেন, মাথায় কিছু নেই এই কথাটা তো মাস্টার তুমি ঠিক বললে না। মাথায় ওর আছে— গোবর। পচা গোবর।

আমাদের স্যার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, খুবই খাঁটি কথা বলছেন। গোবর দিয়ে মাথা ভর্তি।

বড়চাচা বললেন, তবে সাধনায় অনেক কিছু হয়। কবি কালিদাসেরও মাথাভর্তি ছিল গোবর। মহামূর্খ ছিলেন। সাধনার জন্যে পরবর্তীকালে হলেন— মহাকবি কালিদাস। কী বলো মাস্টার, ঠিক না?

একেবারে খাঁটি কথা।

কাজেই আমরা এখন দেখব সে যেন সাধনা ঠিকমতো করতে পারে। গরমের এই ছুটির মধ্যে হুমায়ুনকে আমরা ঠিকঠাক করে ফেলব। কী বলো মাস্টার?

খুবই ভালো কথা।

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম। বড়চাচা আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবেন।

এখন আমি উঠি সূর্য ওঠার আগে। কিছুক্ষণ বড়চাচার সঙ্গে মর্নিংওয়াক করে পড়তে বসি। সেই পড়া চলে এগারটা পর্যন্ত। দুপুরেব খাওয়ার পর শুরু হয় পাঠাগণিত। বিকেল পাঁচটায় ছুটি। কাঁটায় কাঁটায় এক ঘন্টার ছুটি। ছুটির মধ্যে বাসায় ফিরে বই নিয়ে বসতে হয়। রাত দশটায় ছুটি। কী যে কষ্ট! রোজ একবার কুয়ের সামনে গিয়ে বলি, বোতল ভূত, ও ভাই বোতল ভূত! বড়চাচার হাত থেকে আমাকে নাঁচাও ভাই।

কোনোই লাভ হয় না। ভূত হয়তো আমার কথাই শুনতে পায় না। কত নিচে পড়ে আছে, শোনার কথাও নয়। কিংবা কে জানে হয়তো বোতল ভেঙে গেছে। ভূতের বাচ্চা আর বোতলের ভেতরে নেই। থাকলে সে নিশ্চয়ই আমার কষ্ট দেখে কিছু একটা করত।

এই বকম যখন অবস্থা, তখন এক কাণ্ড হলো। রাতে ঘুমতে গেছি। শুতে গিয়ে দেখি পিঠের নিচে শক্ত কী যেন লাগছে। হাত দিয়ে দেখি— কী আশ্চর্য, ঐ বোতল! এখানে এলো কী কবে! কুয়োয় যে বোতল ফেলে দেয়া হয়েছে সেই বোতল এখানে এলো কী করে!

ব্যাপাবটা কী? ব্যাপার যা-ই হোক, তা নিয়ে পরে ভাবা যাবে। আপাতত বড়চাচার হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে। আমি খুব কক্কণ গলায় কাঁদো কাঁদো স্বরে বললাম, ভাই তুমি কীভাবে এখানে এসেছ জানি না। যে-ভাবেই এসে থাক, তুমি আমাকে বাঁচাও। বড়চাচার হাত থেকে রক্ষা কর। এই বলে আমি খানিকক্ষণ কাঁদলাম। এতে কোনো লাভ হবে ভেবে আমি বলি নি। তবু বলা তো যায় না। হতেও তো পারে।

পরদিন ভোরবেলা বই নিয়ে বসেছি। বড়চাচা ঢুকলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, চিন্তা করে দেখলাম ছুটির সময়টাতে ছুটি থাকা দরকার। রাতদিন বই নিয়ে পড়ে থাকলে ছেলেপুলে গাধা হয়। যখন স্কুল ছুটি থাকবে, তখন তোরও ছুটি। যা বই তুলে রাখ।

আমি অবাক হয়ে বড়চাচার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আমাদের আনন্দের এখন আর সীমা নেই।

বড়চাচার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি। আনন্দের প্রকাশ কী ধরনের হলে ভালো হবে, বুঝতে পারছি না। কী করা যায়? মূনির বলল, আমাদের ফুটবল ক্লাব ঠিকঠাক করে একটা ম্যাচ দিয়ে দিলে কেমন হয়?

আমি বললাম, অতি উত্তম হয়।

আমাদের ফুটবল ক্লাবেব নাম হচ্ছে রয়েল বেঙ্গল ফুটবল ক্লাব। দু'বছর আগে আমরা ফুটবল ক্লাব গঠন করি। প্রথম বৎসর আমাদের কোনো বল ছিল না। কী করব, চাঁদা উঠেছে মাত্র আঠার টাকা। সেই আঠাব টাকায় আমরা একটা ফুটবল পাম্প কিনি। আমাদের কাণ্ড দেখে অরু আপা হেসে বাঁচে না। একটা ছড়া বানিয়ে ফেলল—

বল নেই আছে পাম্পার

সার্ট নেই আছে জাম্পার।।

যাই হোক, পরের বৎসর আমরা দুই নম্বর একটা বল কিনলাম। পাড়াতে আবো তিনটে ফুটবল ক্লাব আছে। ওদের সঙ্গে ম্যাচ দিলাম। এই শুনে অরু আপা ঠোট উল্টে বলল, একেকজন চামচিকার মতো, তোরা ফুটবল খেলবি কী? বাতাস লাগলে উল্টে পড়ে যাস। এক কাজ কর, তোদের ক্লাবের নাম দিয়ে দে—‘দি রয়েল চামচিকা ক্লাব’।

রাগে আমাদের গা জ্বলে গেল। ভাবলাম, এমন খেলা দেখাব যে অরু আপা ট্যারা হসে যাবে। হলো উল্টোটা— আমরা টাবা হয়ে গেলাম। একেকটা খেলা হয়, আমরা দশটা-বারোটা করে গোল খাই।

তবে এবার যাতে এরকম না হয় সে চেষ্টা অবশ্যই করব।

আমাদের কাজকর্ম শুরু হয়ে গেল। ম্যাচ দিয়ে দিলাম। বিরাট উত্তেজনা আমাদের মধ্যে। অরু আপা সব শুনে হাসতে হাসতে বলল, দি রয়েল চামচিকা ক্লাব নাকি ম্যাচ দিয়েছে। তোদের লজ্জা-শরমও নেই নাকি?

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, যখন চ্যাম্পিয়ন হব, তখন বুঝবে কাকে বলে চামচিকা ক্লাব।

তোরা চ্যাম্পিয়ন হবি? খোঁড়া চালাবে বাইসাইকেল?

হ্যাঁ চালাব।

যদি চ্যাম্পিয়ন হতে পাবিস, তাহলে আমি আমার মাথাব চুল কেটে ফেলব। সত্যি বলছি।

এই বলে মাথাভর্তি চুল ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে অরু আপা চলে গেল। আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম। আমাদের দলটা হচ্ছে সবচে’ খারাপ। আমরা যে লাড্ডা-গুড্ডা হব, এটা চোখ বন্ধ করে বলে দেয়া যায়। নান্টু হচ্ছে আমাদের গোলকিপার। এম্মিতে সে চোখে খুব ভালো দেখে, কিন্তু যখন বল গোলের দিকে আসে— তখন নাকি সব অন্ধকার হয়ে যায়। চোখে কিছু দেখে না। আসলেই তাই। বল একদিকে আসে, সে অন্যদিকে ডাইভ দেয়।

আমাদের ব্যাকে খেলে পরিমল। বল তার পায়ে আসতেই সে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। কেন এরকম হয় কে জানে! শুকনো খটখটে মাঠ। পা পিছলানোর কোনো কথা নয়, অথচ পরিমলের কাছে বল যেতেই হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে যাবে।

আমরাও একই রকম, শুধু টগর খুব ভালো খেলে। ও হচ্ছে আমাদের ট্রাইকার। কোনোমতে ওর কাছে বল পৌছে দিলে গোলে বল ঢোকাবেই। একজনের ওপর ভরসা করে কি চ্যাম্পিয়ন হওয়া যায়? যায় না। ফুটবল হলো এগার জনের খেলা। তবু আমরা মন্দ করলাম না। গ্রীন বয়েজ ক্লাবের সঙ্গে এক গোলে জিতলাম। টগর একবার মাত্র বল পেয়েছিল। সেটা দিয়ে গোল করেছে। অরুণিমা ক্লাবের সঙ্গে ড্র হলো চার-চার গোলে। আমাদের দিকের চারটা গোলই করেছে টগর। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, আমরা শেষ পর্যন্ত ফাইনালে উঠে গেলাম। অরু আপার মুখ শুকিয়ে গেল। যদি সত্যি সত্যি জিতে যাই, তাহলে মাথাভর্তি চুল কাটতে হবে।

ফাইনাল খেলার দিন শহরে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। আমাদের পাড়ায় একজন নেতা আছেন। তিনি শুধু ইলেকশন করেন আর ফেল কবেন। তাঁর নাম মতিন সাহেব। তিনি ফাইনাল খেলার দিন ভোরবেলা একটা শিল্প ঘোষণা করে দিলেন— সেই সঙ্গে ফাইনাল খেলা যাতে ঠিকমতো হয় সে জন্য তিন শ'টাকা চাঁদা দিলেন। নিজেই মাইকের ব্যবস্থা করে দিলেন। সকাল থেকে রিকশা করে মাইক বাজতে থাকল—

ভাইসব, অদ্য বৈকাল চার ঘটিকায় আব্দুল মতিন ফুটবল শিল্পের ফাইনাল খেলা। রয়েল বেঙ্গল বয়েজ ক্লাব একাদশ বনাম বুলেট একাদশ। উদ্বোধন করবেন অত্র অঞ্চলের বিশিষ্ট সমাজসেবী, জনগণের নয়নের মণি, দেশদরদী সংগ্রামী জননেতা জনাব আব্দুল মতিন ময়না মিয়া। ভাইসব...

আমাদের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা। শুধু আমাদের না, উত্তেজনা বড়দের মধ্যেও। বড়চাচা আমাকে ডেকে বললেন, কী, তোরা পারবি তো?

আমি হিচ্ছ দলের ক্যাপ্টেন। কাজেই আমাকে বলতে হলো, ইনশাআল্লাহ পারব।

তোরা তো খেলতে জানিস না, তোরা পারবি কী করে? একমাত্র খেলোয়াড় হচ্ছে টগর। সেই বেচারী একা কী করবে?

সে একাই একশ।

মুখে বললাম ঠিকই, কিন্তু ভবসা পেলাম না। কারণ বুলেট ক্লাব বাইরে থেকে হায়ার করে তিনজন প্রেয়ার এনেছে। এক-একজন ইয়া জোয়ান। এদের একজনের নাম ল্যাংচু, কারণ তার কাজই হচ্ছে ল্যাং মেবে ফেলে দেয়া। সেই ল্যাংও এমন ল্যাং যে প্রেয়ারের পা ভেঙে যায়। ল্যাংচু নাকি এইভাবে এর আগে তিন জনের পা ভেঙেছে। টগরের পা ভেঙে সে এক হালি পুরো করবে। কী সর্বনাশের কথা।

চারটার সময় খেলা শুরু হবে। দুটো বাজতেই টগর শুকনো মুখে এসে উপস্থিত। সে নাকি খেলবে না। আমি বললাম, কেন খেলবি না? ল্যাংচুর ভয়ে?

বুলেট ক্লাবের বগা ভাই বলেছে আমি যদি খেলি, তাহলে আমাকে ফর্দাফাই করে দেবে।

বগা! ভাই নিজে বলেছে?

হঁ।

বগা ভাই বলে থাকলে সত্যি ভয়ের কথা। কারণ বগা ভাই বিরাট গুণ্ডা। তার এতদিনে ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে পড়া উচিত। কিন্তু সে ফেল করে করে ক্লাস এইটে আটকে আছে। কাজের মধ্যে কাজ সে যা করে তা হচ্ছে বিড়ি টানে। খারাপ খারাপ কথা বলে আর আমাদের মতো অল্পবয়সী ছেলেপুলে দেখলে বিনা কারণে মারধোর করে। আমাদের ক্লাসের পুতুল একদিন স্কুল ছুটির পর বাড়ি আসছে, হঠাৎ বগা ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। বগা ভাই বললেন, শুনে যা। পুতুল দেখল পালানো অসম্ভব। সে এগিয়ে এলো। বগা ভাই বলল, পিঁপড়ার কামড় কেমন জানিস ?

জানি।

উঁহ, ভালোমতো জানিস না। তবে এখন জানবি।

এই বলেই লাল পিঁপড়ার একটা বাসা ভেঙে পুতুলের মাথায় টুপির মতো পরিয়ে দিল। ভয়াবহ অবস্থা। এই বগা ভাইয়ের কারণে টগর যে খেলবে না, তা তো জানা কথাই।

গুধু টগর না, কিছুক্ষণ পর করিম এসে বলল, সেও খেলবে না। কবির সেন্টার ফরোয়ার্ডে খেলে। খুব খারাপ না। টগরের মতো অবশ্যি না, তবুও ভালো।

আমি বললাম, তুই খেলবি না কেন ? বগা ভাই কিছু বলেছে ?

না।

তাহলে খেলবি না কেন ?

ইচ্ছা হচ্ছে না, তাই খেলব না।

এই বলেই করিম লম্বা একটা ঘাসের ডাঁটা নিয়ে চিবুতে লাগল। তাব ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে বগা ভাই তাকেও ভয় দেখিয়েছে।

আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। ন'জন প্রেয়ার নিয়ে কী খেলব ? অরু আপা বলল, তোরা খেলা বন্ধ করে পালিয়ে যা। আজ মাঠে তোদের তুলোধুনো করবে। কমসে কম দু'জনের পা ভাঙবে। একজনের হবে কম্পাউন্ড ফ্রাকচার।

ম্যাচে নাম দিয়ে পিঁছিয়ে পড়া যায় না। সাড়ে তিনটায় মাঠে গিয়ে উপস্থিত হলাম। লোকে লোকারণ্য। বুলেট ক্লাবেব প্রেয়াববা বল নিয়ে মাঠে ছোট্ট ছুটি কবছে। তাদের সবাই মুখভর্তি হাসি।

মাঠের দক্ষিণ দিকে টেবিলের উপর শিল্প। বিশিষ্ট অতিথিদের জন্যে চেয়ার সাজানো। দেশদরদী জননেতা আব্দুল মতিন সাহেব এসে পড়েছেন। তাঁর গলায় ফুলের মালা। বগা ভাইকেও দেখলাম। খুব ফুর্তি। একটু পবপর হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ছে।

আমরা মুখ শুকনো করে মাঠে নামলাম। পকেটে বোতল ভূতের শিশি। আমি মনে মনে বললাম, ভাই বোতল ভূত। আমাদের বক্ষা কর ভাই।

রয়েল বেঙ্গল ফুটবল ক্লাব বনাম বুলেট ক্লাবের ফাইনাল খেলায় এমন হলস্থল হবে কে ভেবেছিল ? মাঠ লোকে লোকারণ্য। একটা ব্যান্ড পার্টি পর্যন্ত আছে। কিছুক্ষণ পরপর ব্যান্ড পার্টি বাজাচ্ছে— হলুদ বাট, মেসি বাট, বাট ফুলের মৌ। এই একটি মাত্র গানই এরা জানে। সব অনুষ্ঠানে এই গান।

ব্যান্ড পার্টি এনেছেন আব্দুল মতিন সাহেব। তাঁর কাগ্জকারখানা এরকমই। সব সময় চান লোকজনকে চমকে দিতে। যারা ইলেকশন করে তাদের নাকি এরকম করতে হয়। কোথাও লোকজন জড়ো হলে একটা ভাষণ দিতে হয়। আজও নিশ্চয়ই দেবেন।

মাইক এসেছে। রোগা একটা ছেলে কিছুক্ষণ পরপর বলছে— হ্যালো মাইক্রোফোন টেস্টিং। ওয়ান টু থ্রি ফোর। মাইক্রোফোন টেস্টিং। রোগা ছেলেটি চলে যাবার পর তার চেয়েও রোগা আরেকটি ছেলে এসে মাইকের সামনে দাঁড়াল। খুব কায়দা করে বলল, জরুরি ঘোষণা, জরুরি ঘোষণা। ভাইসব, একটি বিশেষ ঘোষণা। অত্র অঞ্চলের বিশিষ্ট সমাজসেবী, জনগণের নয়নের মণি, এ যুগের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর, জনাব আব্দুল মতিন মিয়া এই মাত্র একটি স্বর্ণপদক ঘোষণা করেছেন। আজকের এই ফাইনাল ম্যাচের সেরা ফুটবল খেলোয়াড়ের জন্যে এই স্বর্ণপদক। খেলার শেষে এই স্বর্ণপদক দেয়া হবে। ভাইসব, জরুরি ঘোষণা...

এই ঘোষণায় বুলেট ক্লাবের সবার মুখে হাসি দেখা গেল। কেনই বা হাসি দেখা যাবে না? শিল্ড, স্বর্ণপদক সব তো ওরাই পাবে। আমরা হাত-পা ভেঙে বাড়ি ফিরব।

আমরা মুখ শুকনো করে মাঠে নামলাম। ব্যান্ড পার্টি বিপুল উৎসাহে বাজাতে লাগল— ইলুদ বাট, মেন্দি বাট, বাট ফুলের মউ।

রেফারি হচ্ছেন আমাদের স্কুলের ড্রিল স্যার— অজিত বাবু। খুব রোগা বলে আমরা তাঁর নাম দিয়েছি ‘জীবাণু স্যার’।

জীবাণু স্যার আমাদের দেখে অবাক হয়ে বললেন, তোরা মাত্র ন’জন কেন? বাকি দু’জন কই?

আমি বললাম, ওরা খেলবে না স্যার।

কেন?

বুলেট ক্লাবের বগা ভাই ভয় দেখিয়েছে, খেলতে নামলে পা ভেঙে দেবে।

বলিস কী!

সত্যি কথা স্যার। ওদের দলে একজন আছে— নাম ল্যাংচু। ওর কাজই হচ্ছে ল্যাং মাবা। ল্যাং মেরে পা ভেঙে ফেলা।

বিচিত্র না, ভাঙতেও পাবে। সাবধানে খেলবি। খবরদার, চার্জ-ফার্জ করতে যাবি না।

জীবাণু স্যার বাঁশিতে ফুঁ দিলেন। খেলা শুরু হলো। আমি পকেটে হাত দিয়ে কাঁপা-কাঁপা গলায় বললাম, ও ভাই বোতল ভূত, আমাদের বাঁচাও ভাই।

কথা শেষ হবার আগেই দেখা গেল বগা ভাই বিদ্যুৎগতিতে বল নিয়ে আমাদের গোলপোস্টের দিকে যাচ্ছে। বদরুল তাকে আটকাতে গিয়ে উল্টে পড়ে গেল। কারণ ল্যাংচু তাকে পেছন থেকে ল্যাং মেরেছে। গোলপোস্টে আমাদের গোলকিপার নান্টু চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। এটাই হচ্ছে তার নিয়ম। বল নিয়ে কেউ গোলপোস্টের দিকে আসতে থাকলে আপনাতেই তার চোখ বন্ধ হয়ে যায়।

বগা ভাই গোলপোস্টের প্রায় ছ’গজের ভেতর চলে এসেছে। নান্টু চোখ বন্ধ করে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক তখন একটা অঘটন ঘটল। মনে হলো কেউ একজন যেন প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিয়েছে বগা ভাইয়ের গালে। বগা ভাই থমকে দাঁড়িয়ে অবাক...

চারদিকে তাকাতে লাগল। তার পায়ে বল, অথচ সে শর্ট দিচ্ছে না। মাঠে তুমুল হৈচৈ—কিক দাও। কিক দাও। হাবার মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন, কিক দাও।

বগা ভাই নিজেকে সামলে নিয়ে প্রচণ্ড কিক দিল। আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য। প্রচণ্ড কিকের পরও বলের অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হলো না। বলটা যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় গড়িয়ে যাচ্ছে। এক সময় নান্টুর পায়ের কাছে বলটা ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেই দাঁড়িয়ে থাকা বলের উপর নান্টু বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে এমন ভঙ্গি করতে থাকল, যেন সে বুলেটের মতো গতির বলকে অপূর্ব কায়দায় আটকেছে।

মজা আরো জমল। বুলেট ক্লাবের যে-কোনো প্রেয়ার বল নিয়ে এগিয়ে এলেই অদৃশ্য কে যেন চড় বসিয়ে দেয়।

ল্যাংচু হতভম্ব। কারণ কিছুক্ষণ পরপর সে চড় খাচ্ছে। একবার দেখা গেল সে কোমবে হাত দিয়ে খিলখিল করে হাসছে। হাসি আর থামেই না। মাঠের সবাই হতভম্ব।

ড্রিল স্যার অবাক হয়ে বললেন, এই ছেলে, তুমি এরকম করছ কেন? হাসছ কেন? ল্যাংচু করুণ মুখে বলল, কী করব স্যার বলুন— কে যেন কাতুকুতু দিচ্ছে।

কাতুকুতু দিচ্ছে মানে! কী বলছ তুমি?

সত্যি দিচ্ছে স্যার। হি হি হি। হো হো হো। হি হি হি। হিক হিক হিক।

হাসতে হাসতে ল্যাংচু গড়িয়ে পড়ল। অদ্ভুত কাণ্ড! ওরা বলে কিক করলে বল নাড়ে না। যেন পাথরের বল। বুলেট দলেব ক্যাপ্টেন হচ্ছে মুশতাক। সে একবার বলে কিক কবে 'উফ' করে চোঁচিয়ে উঠল। ড্রিল স্যার বললেন, কী হয়েছে?

স্যার, বল আঙনের মতো গরম। পা পুড়ে গেছে স্যার। পায়ে ফোঁস্কা পড়ে গেছে।

পাগড়ের মতো কথা বলিস না তো। বল গবম মানে!

আর্পা! হাতে নিয়ে দেখুন স্যার।

ড্রিল স্যার বল হাতে নিয়ে বললেন, বল যে রকম, সে রকমই তো আছে। কী বলছিঁস তোরা!

হাফ টাইমের দশ মিনিট আগে আমরা একটা গোল করে ফেললাম। আমরা গোল করলাম বলাটা ঠিক হলো না। বলটা আপনা-আপনি গোলে পড়ল।

ড্রিল স্যার পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে পড়লেন। বাঁশি বাজাবেন কিনা বুঝতে পাবলেন না।

হাফ টাইমের পর বুলেট ক্লাব আর খেলতে রাজি হলো না। আব্দুল মতিন সাহেব মহা চিন্তায় পড়ে গেলেন। সেবা খেলোয়াড়ের স্বর্ণপদক কাকে দেবেন বুঝতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত সেই স্বর্ণপদক নান্টুর কপালে জুটল। সে থেমে থাকা বল আটকানোর জন্যে পেয়ে গেল স্বর্ণপদক।

আব্দুল মতিন সাহেব কাঁপা গলায় একটা ভাষণ দিলেন— রয়েল বেঙ্গল ফুটবল ক্লাবের উজ্জ্বল প্রতিভা, অত্র অঞ্চলের বিশিষ্ট গোলকিপার, নান্টুর অপূর্ব ক্রীড়াশৈলীতে মুগ্ধ হয়ে তাকে দেয় হচ্ছে আব্দুল মতিন স্বর্ণপদক। ভাইসব, হাততালি দিন। হাততালি।

প্রচণ্ড হাততালি পড়ল। সেই সঙ্গে ব্যান্ড বেজে উঠল— হলুদ বাট, মেন্দি বাট, বাট ফুলের মউ ..।

অরু আপা বলেছিল— আমাদের রয়েল বেঙ্গল ফুটবল টিম চ্যাম্পিয়ন হলে সে তার মাথার চুল কেটে ফেলবে। এসব হচ্ছে কথার কথা। আমরা সব সময় বলি। ঐ তো সেদিন আমাদের ক্লাসের মনসুর বলল— সে যদি এক জগ পানি এক চুমুকে খেতে না পারে, তাহলে তার নাম বদলে ফেলবে। আধ জগ খাবার পর চোখটোখ উল্টে এক কাণ্ড। তার জন্যে তো তাব নাম বদলানো হয় নি।

কিন্তু অরু আপা সত্যি সত্যি তার মাথার চুল কেটে ফেলল। আমার মা খুব শান্ত ধরনের মহিলা। সহজে রাগটাগ করেন না। তিনি পর্যন্ত রেগে ভূত। টেচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলে বললেন, কেন চুল কাটলি ?

অরু আপা সহজ গলায় বলল, বাজিতে হেরেছি, তাই চুল কাটলাম।

এত সুন্দর চুল কাটতে একটু মায়াও লাগল না ?

না, লাগল না।

তুই কি পাগল হয়ে গেলি ?

না, হই নি, তবে এখন তোমার চিৎকারে পাগল হব।

চুল কাটায় অরু আপাকে কী যে বিস্মী দেখাছিল বলার নয়। তাকে দেখাছিল ছেলেদের মতো। আমার কাছে মনে হলো অরু আপা চুল না কাটলেও পারত। আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছি ঠিকই, কিন্তু সেটা সম্ভব হয়েছে বোতল ভূতের জন্যে। সে সাহায্য না করলে সবার সাথে ছ'সাত গোলে হারতাম। কাজেই এই জেতায় ফাঁকি আছে। ফাঁকির খেলায় কাবণে বেচারি অরু আপার সব চুল চলে যাবে তা কি ঠিক ?

অরু আপা অবশ্য বোতল ভূতের কথা একেবারেই বিশ্বাস করে না। সে সায়েন্সে পড়ে তো, তাই। সায়েন্সে পড়লে সব কিছু অবিশ্বাস করতে হয়। সেদিন বাসায় মন্টু ভাই এসেছিলেন। তিনি বই-টাই পড়ে হাত দেখা শিখেছেন। সব সময় তাঁর পকেটে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস থাকে। কেউ যদি হাত দেখাতে চায় ওয়ানি উনি গম্বীর মুখে বসে যান। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে কী সব দেখতেখে টেনে টেনে বলেন, বৃহস্পতির ক্ষেত্রটা ভালো মনে হচ্ছে না। তবে মঙ্গলের ক্ষেত্রে যব চিহ্ন আছে। প্রচুর অর্থ লাভ হবে।

মন্টু ভাই এমনভাবে কথা বলেন যে সবাই মুগ্ধ হয়ে যায়। আর মনে হয় তিনি যা বলছেন সবই সত্যি। সেই মন্টু ভাইয়ের ম্যাগনিফাইং গ্লাস অরু আপা একদিন নর্দমায় ফেলে দিয়ে বলল, আপনি এইসব অবৈজ্ঞানিক কথা আর বলবেন না তো মন্টু ভাই। খুব বাগ লাগে।

মন্টু ভাই আহত গলায় বললেন, দুই পাতা বিজ্ঞান পড়ে এই কথা বলছিস ? শেক্সপীয়ার কী বলেছেন জানিস ? তিনি বলেছেন— দেয়ার আর মেনি থিংস ইন হেভেন এ্যান্ড আর্থ।

তিনি বিজ্ঞানী ছিলেন না বলে বলেছেন।

আর তুই বুঝি বিরাট সাইন্টিস্ট ?

দু'জনে বিরাট তর্ক বেঁধে গেল। শেষমেশ রাগ করে মন্টু ভাই চলে গেলেন।

অরু আপার স্বভাবই হচ্ছে এই, সবার সঙ্গে তর্ক করবে। কোনো কিছু বিশ্বাস করবে না। চোখের সামনে বোতল ভূতের কাণ্ডকারখানা দেখেও বলছে ভূত বলে কিছু নেই। এবং সে নাকি তা প্রমাণ করে দিতে পারে। বোতলের ভেতর নাকি আছে শুধু বাতাস।

শেষে রাগ করে একদিন বললাম, বেশ প্রমাণ কর যে বোতলে কিছু নেই। তবে তুমি কিন্তু বোতলের মুখ খুলতে পারবে না।

বেশ খুলব না।

প্রমাণটা করবে কীভাবে ?

অরু আপা গম্ভীর হয়ে বলল, খুব সোজা প্রমাণ। ওজন করে প্রমাণ করব। সব জিনিসেরই ওজন আছে। ভূত বলে যদি কিছু থেকে থাকে, তবে তারও ওজন থাকবে। এবং যত তার বয়স বাড়বে, ততই তার ওজন বাড়বে। কারণ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে বড় হচ্ছে। আমি যা করব তা হচ্ছে কলেজের ল্যাবরেটরির যে ওজনযন্ত্র আছে তা দিয়ে বোতলটার ওজন সাত দিন পরপর মাপব। যদি দেখা যায় বোতলটার ওজন বাড়ছে না, তাহলে বুঝতে হবে ভূত-প্রেত কিছু এই বোতলের মধ্যে নেই।

প্রথম সপ্তাহে ওজন হলো সতের দশমিক চার সাত তিন গ্রাম। পরের সপ্তাহে ওজন বাড়াব বদলে খানিকটা কমে গেল। ওজন হলো সতের দশমিক চার সাত এক গ্রাম। এব পরের সপ্তাহে হলো সতের দশমিক চার শূন্য গ্রাম। অরু আপার মুখ শুকিয়ে গেল। বাড়ার বদলে ওজন কমছে। তা তো হবার নয়। আমি বললাম, ভূতদের বেলায় নিয়ম হয়তো অন্য। তারা যতই বড় হয় ততই তাদের ওজন কমে।

অরু আপা বিরক্ত হয়ে বলল, বাজে বকিস না।

তাহলে তুমিই বলো ওজন কমছে কেন ?

ওজন নেবার যন্ত্রটা হয়তো ভালো না। এবাব অন্য একটা যন্ত্রে ওজন নেব।

বেশ নাও। সাবধান, বোতল যেন না ভাঙে।

আবার ওজন নেয়া শুরু হলো। এবার দেখা গেল ওজন বাড়ছে। অরু আপার খুব মেজাজ খারাপ। আমি বললাম, ভূতদের ওজন হয়তো বাড়ে, আবার কমে। আবার বাড়ে. তারপর আবার কমে।

অরু আপা ঝাঁঝাল গলায় বলল, বোকার মতো কথা বলিস না তো। বোকার মতো কথা শুনে গে যা।

তুমি তাহলে আমাকে বলো, ওজন বাড়ছে কমছে কেন ?

কোথাও কোনো ভুল কবছি, তাই এরকম হচ্ছে।

কী ভুল করছ ?

সেটাই তো বুঝতে পারছি না।

অরু আপা আরো কী সব পরীক্ষা করল। বোতল এক সপ্তাহ অন্ধকারে রেখে তারপর ওজন। আলোতে রেখে ওজন। কোনোটার সঙ্গে কোনোটার মিল নেই। ফ্রীজে রেখে ঠাণ্ডা করে ওজন নিলে এক রকম ওজন হয়, আবার গরম করলে অন্য রকম ওজন হয়। শেষটায় অরু আপা রাগ করে বলল, তোর এই বোতল নিয়ে বিদেয় হ। শুধু শুধু সময় নষ্ট।

অরু আপার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় একটা লাভ হলো। সবাই জেনে গেল বোতল ভূতের ব্যাপারটা। নিতান্ত অপরিচিত লোকও পথের মাঝখানে আমাদের দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করে, এই যে খোকা, তোমার কাছে বোতলের ভেতর নাকি কী আছে। দেখি জিনিসটা।

আমি হাসিমুখে দেখাই। খুব গর্ব বোধ হয়। ভূত পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো তো খুব সহজ ব্যাপার ন'। হেড স্যার পর্যন্ত একদিন বললেন, দেখি জিনিসটা ?

সব ভালো দিকের একটা খারাপ দিকও আছে। একদিন খারাপ দিকটা স্পষ্ট হলো। স্কুল থেকে ফিরছি, কালীতলার মন্দিরটার কাছে বগা ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। বগা ভাই থমথমে গলায় বলল, বের কর।

কী বের করব ?

ভূত বের কর। না বের করলে কাদার মধ্যে পুঁতে ফেলব। তার আগে এমন একটা চড় দেব যে বত্রিশটা দাঁত তো পড়বেই, জিব পর্যন্ত পড়ে যাবে।

আমি বোতল বের করলাম। বগা ভাই সেই বোতল টপ করে নিজের পকেটে রেখে দিয়ে বলল, আর কোনো কথা না, সোজা বাড়ি চলে যা। একটা কথা বলেছিঁস তো ছয় ঈশ্বরী ধোলাই দিয়ে দেব। ছয় নম্বরী ধোলাই কাকে বলে জানিস ?

আমি জানতাম না। ঙ্গনার ইচ্ছাও হলো না। বাড়ির দিকে রওনা হলাম। রাগে-দুঃখে আমার চোখে পানি এসে গেছে। পুরুষ মানুষের চোখে পানি আসা খুব খারাপ, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও পানি সামলাতে পারছি না। টপটপ করে পানি পড়ছে।

৮

বোতল ভূত হাতছাড়া হওয়ায় আমাদের বাড়ির সবাই খুব খুশি। বড়চাচা বললেন, বাঁচা গেল, আপদ বিদায় হয়েছে। আমার বাবা বললেন, এইসব আজীবনে জিনিস বাড়িতে না থাকাই ভালো। অরু আপা মুখ বাঁকা করে বললেন, একটা কুসংস্কার বাড়ি থেকে গেছে, এটা একটা সুসংবাদ।

আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। রাতে ঘুমুতে যাবার আগে রোজ একবার করে বলি, ও ভাই বোতল ভূত, ফিরে এসো। বগা ভাইয়ের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি দয়া করে নিজে নিজেই চলে এসো।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই মনে হয় বোতল ভূত হয়তো নিজে নিজেই চলে এসেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করি, কিছু নেই।

এদিকে বগা ভাইয়ের উপদ্রুপ খুব বেড়েছে। রয়েল বেঙ্গল ক্লাবের যাকেই সে দেখে তার কপালে অনেক যন্ত্রণা। একদিন মুনিরকে ধরে ধোলাই দিয়ে দিল। বেচারি স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল-- বগা ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। বগা ভাই হাত ইশারা করে ডাকল। মুনির না দেখার ভান করে চলে যাচ্ছে-- বগা ভাই দৌড়ে এসে শার্টের কলার চেপে ধরল। কড়া গলায় বলল, কী, চোখে দেখতে পাস না ? চড় খেতে কেমন মজা দেখবি ? এই দেখ।

শুধু শুধু মারছেন কেন ?

ইচ্ছে হচ্ছে মারছি। মেরে ভর্তা বানিয়ে দেব-- আলু ভর্তা।

এই বলে মনিরের হাত থেকে অংক বই টেনে নিয়ে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলল। মুনির কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরল।

আমিও একদিন ধরা পড়লাম। আমার সাথে তোতলা রঞ্জু। আমাদের ক্লাসে তিনজন রঞ্জু। এদের একজন শুধু রঞ্জু, অন্য দু'জনের একজন তোতলা রঞ্জু, অন্যজন মাথামোটা রঞ্জু। মাথামোটা রঞ্জুর মাথাটা শবীরের তুলনায় বড় আর তোতলা রঞ্জু ভয় পেলে তোতলাতে শুরু করে।

বগা ভাইকে দেখে তার তোতলামি শুরু হয়ে গেল। বগা ভাই বলল, তারপর কী খবর ?

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, ভালো খবর।

কী রকম ভালো খবর, এখন টের পাবি। কানে ধরে এক'শ বাব উঠবোস কর।

তোতলা রঞ্জু সঙ্গে সঙ্গে উঠবোস শুরু করল। আমি ক্ষীণ স্ববে বললাম, কেন ?

আবার মুখেমুখে কথা ? সাহস বেশি হয়ে গেছে ? এমন ধোলাই দেব যে দুইয়েব ঘবেব নামতা ভুলে যাবি। এখন আর সঙ্গে বোতল ভূত নেই যে বেঁচে যাবি।

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠবোস শুরু কবলাম। কী দরকাব ঝামেলা কবে। কানে ধরে উঠবোস করতে তো আর খুব কষ্ট হয় না, শুধু একটু লজ্জা।

বগা ভাই বলল, বোতল ভূত ফেরত চাস ? যদি ফেরত চাস তাহলে দু'শ উঠবোস করতে হবে।

দু'শ বার করলে ফেরত দেবে ?

হঁ। সেই সঙ্গে পঞ্চাশটা টাকা দিতে হবে। নশদ কাববাব।

টাকা পাব কোথায় ?

আমি তার কী জ্ঞান ? টাকা নিয়ে আয়, বোতল ফেরত পাবি। এই যন্ত্রণাব বোতল ফেরত দিয়ে দেব। ভূত দিয়ে আমার দরকাব নেই, আমি নিজেই ভূত।

পঞ্চাশ টাকা জোগাড় করতে কী যে কষ্ট হলো। বয়েল বেঙ্গল ফুটবল ক্লাবেব সবাই চাঁদা দিল। বড়চাচার কাছে কান্নাকাটি কবে পেলাম পাঁচ টাকা। বাবা দিলেন দশ টাকা। তবু দু'টাকা কম পড়ল। সেটা অরু আপা দিয়ে দিলেন। টাকা পকেটে নিয়ে বোতল ভূত ফেরত আনতে গেলাম। সঙ্গে নিলাম মুনিরকে।

পোস্টাপিসের সামনের বট গাছেব নিচে বগা ভাই তাব দুই বন্ধুকে নিয়ে আছে। আমি এবং মুনির ভয়ে ভয়ে উপস্থিত হলাম। বগা ভাই বলল, টাকা এনেছিস ?

হঁ।

বের কর।

দিলাম টাকা। বগা ভাই খুব সাবধানে দু'বাব গুণল। টাকাটা পকেটে রেখে থমথমে গলায় বলল, দাঁড়িয়ে আছিস কেন, বাড়ি চলে যা।

বোতল ভূত ফেরত দাও।

কথা বললে চড় খাবি। চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেব।

বোতল ভূত ফেরত দেবে না, তাহলে টাকা নিলে কেন ?

এটা হচ্ছে তোর ভূত পোষার খরচ । যা এখন । একটা কথা বলবি তো শিয়ালের শিং দেখিয়ে দেব । শিয়ালের শিং কখনো দেখেছিস ?

টাকা ফেরত দাও ।

আরে, আবার টাকা ফেরত চায়! শখ তো কম না ।

বগা ভাই উঠে এসে একটা চড় বসিয়ে দিল । আমি চোখে অঙ্ককার দেখলাম । মুনির বলল, আমি স্যারদের বলব ।

যা বলে আয় । দাঁড়িয়ে আছিস কেন, যা ।

বলতে বলতে বগা ভাই মুনিবের পেটে একটা ঘুসি দিল । মুনির কৌক করে একটা শব্দ করে পেটে হাত দিয়ে বসে পড়ল ।

দু'জনে এবার গলা জড়াজড়ি করে কাঁদতে থাক । আমরা চললাম ।

আমি এবং মুনির অনেকক্ষণ বসে রইলাম । তারপর বাড়ির দিকে রওনা হলাম ।

দু'জনই কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরছি, তখনই মজার ব্যাপারটা ঘটল । চোখ মোছার কুমালেব খোজে পকেটে হাত দিতেই হাতে ঠাণ্ডা কী যেন লাগল । বের কবে দেখি বোতল ভূত । সে চলে এসেছে ।

আমি এবং মুনির দু'জনেই গলা জড়াজড়ি করে অনেকক্ষণ কাঁদলাম । এবারের কান্না সুখেব কান্না ।

৯

বছরের মধ্যে সবচেয়ে খাবাপ মাস কোনটা ?

ডিসেম্বর । পরীক্ষার মাস । এই মাসটা না থাকলে কেমন হতো ? সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর তারপর জানুয়ারি । মাঝখানের ডিসেম্বরটা নেই । বোতল ভূতকে বললে হয় না ? নিশ্চয়ই হয় । সে কিছু একটা করে 'ই'— কিন্তু তাকে বলা যাচ্ছে না । কারণ বড়চাচা 'বোতল ভূত' স্টিলেব আলমিরায় বন্দি কবে রেখেছেন । ফাইনাল পরীক্ষার আগে তাকে হাতে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই । পরীক্ষার পবেও যে প' । সে আশাও খুবই ক্ষীণ । এরকম কেন হলো সেটা আগে বলে নিই ।

আমাকে আর অন্তুকে পড়ানোব জন্য নতুন একজন স্যার রাখা হয়েছে, মজিদ স্যার । এই স্যাবের চেহারাটা খুব ভালোমানুষের মতো, কিন্তু মেজাজ আগুনের মতো । বাড়িতে ঢুকেই বিনা কারণে একটা হুংকাব দেন । তারপর বলেন— হোমটাস্কের খাতা আর বেতটা বের কর । কত ধানে কত চাল আগে হিসেব নিয়ে নেই । আমরা ভয়ে ভয়ে হোমটাস্কের খাতা বের করি । পরবর্তী আধ ঘণ্টা আমাদের উপর দিয়ে বড় ধরনের একটা সাইক্লোন বয়ে যায় । আমবা কান্নাকাটিও করি । তাতে লাভ হয় না । বড়চাচা হুটচিতে বলেন, ভালো মাস্টার দিয়েছি । এইবার টাইট হচ্ছে । মাস্টার, আরো টাইট দাও । আরো । উৎসাহ পেয়ে মজিদ স্যাব আরো টাইট দেন । আমবা চোখে অঙ্ককার দেখি ।

শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে অস্ত্র যা করল তা মোটেই দোষের নয়। দু'লাইনের একটা কবিতা লিখল—

মজিদ স্যার মজিদ স্যার
চোখে দেখি অঙ্ককার।

কবিতা লিখেই সে থামল না। আমার কাছ থেকে বোতল ভূত কিছুক্ষণের জন্যে ধার করে নিয়ে চলে গেল ছাদে। তারপব খুব করুণ গলায় বোতল ভূতকে বলল, ও আমার প্রিয় ভূত, ও আমার লক্ষ্মী ভূত, ও আমার ময়না ভূত, তুমি মজিদ স্যারের পা ভাঙার একটা ব্যবস্থা করে দাও ভাই। যাতে সে আর আমাদের পড়াতে আসতে না পারে।

অস্ত্র লক্ষ করে নি যে বড়চাচা ছাদের এক কোণায় সারা গায়ে অলিভ অয়েল মেখে রোদ তাপাচ্ছেন। সেখান থেকে তিনি মেঘগর্জন করলেন, অস্ত্র এদিকে আয়।

অস্ত্র এগিয়ে গেল।

বোতলটা আমার কাছে দে।

অস্ত্র বোতল দিল।

কানে ধর।

অস্ত্র কানে ধরল। বড়চাচা বললেন, শকুনের বদদোয়ায় গরু মবে না, বুঝলি। যদি মরত— দেশের সব গরু মরে সাফ হয়ে যেত। বুঝতে পারলি?

জি বুঝতে পারছি।

কানে ধরে দাঁড়িয়ে থাক। আর আমি মজিদ মাস্টারকে খবর পাঠাচ্ছি সে যেন আজ থেকে দু'বেলা আসে। সকালে একবার, সন্ধ্যায় একবার। যে রোগের যে দাওয়াই।

মজিদ স্যারকে খবর পাঠাতে হলো না। তাঁব বাড়ি থেকে খবর এসে পড়ল— কিছুক্ষণ আগে বাথরুমে পা পিছলে পড়ে তাঁর পা ভেঙে গেছে। বড়চাচা অভ্যস্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন। বোতল ভূতকে স্টীলের আলমিরায় তালাবদ্ধ করে রাখলেন। চাবি সব সময় তাঁর কোমবে কালো সুতোর সঙ্গে বাঁধা। সেই চাবি হাতে পাওয়ার কোনো উপায়ই নেই।

অথচ এই মুহূর্তে বোতল ভূতকে আমাদের খুবই দরকার। না, আমাদের পরীক্ষাব জন্যে নয়। পরীক্ষা যা হবার হবে। হয়তো ফেল করব। সেটাও ভালো। ফেল করলে রবীন্দ্রনাথ হবার একটা সম্ভাবনা থাকে। যারা সব পরীক্ষায় ফাস্ট সেকেণ্ড হয় তাবা কবি-সাহিত্যিক হতে পারে না। নিয়ম নেই।

বোতল ভূতটা আমাদের দরকার পাশ-ফেলের জন্যে নয়, অরু আপার জন্যে। অরু আপার বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে যাচ্ছে।

বড়চাচাই ব্যবস্থা করছেন। তাঁর মতে— মেয়েগুলিকে খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে হয়, আর ছেলেগুলোকে দেরিতে। তাহলেই সংসার সুখের হয়। অরু আপার বিয়ে করার মোটেও ইচ্ছা নেই। সে খুব কান্নাকাটিও করছে। বড়চাচা বলেছেন, কেঁদে লাভ হবে না। আজ হোক কাল হোক বিয়ে তো করতেই হবে। আজ হলেই ক্ষতি কী?

একদিন চার-পাঁচ জন ইয়া মোটা মোটা মহিলা এসে অরু আপাকে দেখে গেল।
তাদের কী সব প্রশ্ন—

গান বাজনা জানো ?

সেলাই জানো ?

রান্না-বান্না কিছু শিখেছ ?

কোরান শরীফ পড়তে পার ?

বেতেরের নামাজ কয় রাকাত বলো তো ?

অরু আপা দিন-রাত কাঁদে। তার কত ইচ্ছা সে পড়াশোনা শেষ করে জাহাজে করে সারা পৃথিবী ঘুরবে। বেচারির জন্যে আমাদেরও খুব মন খারাপ। অরু আপা চলে গেলে বাড়ি অন্ধকার হয়ে যাবে। আমরা ঝগড়া করব কার সাথে ? হাসি তামাশাই-বা করব কার সাথে ?

শেষটায় যেদিন ‘পান-চিনি’ হবে, সেইদিন কোনো উপায় না দেখে স্টীলের আলমিরায় মুখ লাগিয়ে বললাম, বোতল ভূত ভাই, একটা উপায় কর। কোনো কথা শুনব না। উপায় তোমাকে করতেই হবে। এটা যদি করে দাও, তাহলে আগামী তিন মাস তোমাকে আর বিরক্ত করব না। কথা দিচ্ছি। এক সত্যি, দুই সত্যি, তিন সত্যি।

পান-চিনি উপলক্ষে অরু আপাকে সাজানো হচ্ছে। সাজাচ্ছেন আমার মেঝে মামি। আমরা দূরে বসে দেখছি। কাজল পরানোর সময় তিনি হঠাৎ অবাক হয়ে বললেন, তোর চোখগুলি এমন ফোলা ফোলা লাগছে কেন ? মনে হচ্ছে ব্যাণ্ডের চোখ।

অরু আপা উত্তর দিল না। আমরা দেখলাম সত্যি তাই। চোখ দু’টি যেন ঠেলে বের হয়ে আসছে। সাজানো শেষ হবার পর সবার চোখ কপালে উঠে গেল। কী কুৎসিত যে দেখাচ্ছে। তাকানো যাচ্ছে না। আমার মা বিরক্ত হয়ে মেজ মামিকে বললেন— এটা কী রকম সাজ হলো ? মেজ মামি বললেন, কোথায় যেন গুগোল হয়ে গেছে। অসুবিধা নেই, আবার সাজানো হবে। এবাব আরো বিস্তী হলো। মনে হচ্ছে নীল শাড়ি পরে একটা বুড়ো পানদর বসে আছে। অচ্চ অরু আপা পরীর মতো সুন্দর।

তৃতীয়বার সাজানোর সময় ছিল না। পাত্রপক্ষ এসে গেছে। অরু আপাকে তাদের সামনে নিয়ে যাওয়া হলো। তারা ভূত দেখাব মতো চমকে উঠল। একজন মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী ?

অরু আপা অবিকল বানরদের মতো কিঁচকিঁচ করে বলল, জাহানারা। নিজের গলা শুনে সে নিজেই অবাক।

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। বড়চাচা বাবান্দায় গম্ভীর মুখে বসে রইলেন। একবার শুধু বললেন, ব্যাপারটা কী হয়েছে আমি বুঝতে পারছি।

আমরাও খুব ভালোমতো বুঝতে পারছি। আমাদের আনন্দের সীমা নেই। কারণ বিয়ে ভেঙে গেছে। বরপক্ষের লোকজন চলে গেছে। অরু আপা হাসছে। কী সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে!

এক চৈত্র মাসে 'বোতল ভূত' এনেছিলাম— এখন আরেক চৈত্র মাস। দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল। কত কাণ্ড হলো 'বোতল ভূত' নিয়ে। সে হয়ে গেল আমাদের সুখ-দুঃখের বন্ধু। কোনো একটা সমস্যা হলেই 'বোতল ভূতের' কাছে যাই। কাতর গলায় সমস্যার কথা বলি—

ও ভাই বোতল ভূত, লক্ষ্মী সোনা, চাঁদের কণা— ছয় প্রশ্নমালার তিন নম্বর অংকটা পারছি না। একটু দেখবে, কিছু করা যায় কিনা ?

ও ভাই বোতল ভূত, আজ ইংরেজি পড়া শেখা হয় নি। তুমি কি দয়া করে ইংরেজি স্যারের অসুখ বানিয়ে দেবে ?

আজ মগদাপাড়ার বদমাশ ছেলেগুলির সাথে আমাদের একটা মারামারি আছে। তুমি কি দয়া করে আমাদের জিতিয়ে দেবে ?

এই জাতীয় আবেদনে সব সময় যে কাজ হয় তা না, তবে বেশির ভাগ সময়েই হয়। সাধারণত খুব জটিল সমস্যায় 'বোতল ভূত' আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। এই যেমন অরুণ আপার বিয়ে ভাঙার ব্যাপারটাই ধরা যাক না। কেমন চট করে ভেঙে গেল। 'বোতল ভূত' হাতের কাছে ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

আমি ঠিক করলাম এক বছর পার হলেই বোতল ভূতের জন্মদিন করা হবে। বন্ধুবান্ধব সবাইকে বলব। এক টাকা করে চাঁদা ধরা হবে। সারাদিন খুব হৈচৈ করা হবে। আমাদের ক্লাসের মন্টুকে বলা হবে এই উপলক্ষে একটা কবিতা লেখার জন্যে। মন্টু হচ্ছে আমাদের ক্লাসের কবি। সে এ পর্যন্ত তিনশ' এগারটা কবিতা লিখেছে। এর মধ্যে কয়েকটা অতি বিখ্যাত। যেমন আমাদের অংক স্যারকে নিয়ে লেখা কবিতা— 'বিভীষিকা'।

ঐ আসছে অংক স্যার

চক্ষে দেখছি অঙ্ককার

হব আমরা পগারপার।।

গায়কদের গান গাইতে বললে তারা সব সময় বলে— আজ আমার গলা ভেঙে গেছে, মুড নেই, ইচ্ছা করছে না ইত্যাদি। কবিদের বেলায় ভিন্ন ব্যাপার। তাদের কবিতা লিখতে বললেই খাতা-কলম নিয়ে বসে পড়ে। মন্টুও তাই করল। টিফিন টাইমের মধ্যে ছ'পাতার কবিতা লিখে ফেলল। কবিতার শিরোনাম— 'ওগো প্রিয় বন্ধু'।

কবিতা শুনে আমরা মুগ্ধ। আমাদের ধারণা হলো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ছেলেবেলায় এত ভালো কবিতা লেখেন নি। আমরা মন্টুকে 'মহাকবি' টাইটেল দিয়ে দিলাম। ঘোষণা করে দেয়া হলো এখন থেকে মন্টুকে শুধু মন্টু বললে কঠিন শাস্তি হবে। মন্টুকে ডাকতে হবে 'মহাকবি মন্টু'।

বোতল ভূতের জন্মদিনের ব্যাপারেও সবার খুব আগ্রহ দেখা গেল। শুধু আমাদের ক্লাসেরই না, অন্য ক্লাসের ছেলেরাও চাঁদা নিয়ে উপস্থিত। তারাও জন্মদিন করতে চায়। ক্লাশ ফাইভের ছেলেরা এসে বলল, তারা বোতল ভূতকে একটা সংবর্ধনা দিতে চায়। ক্লাশ সিক্সের ছেলেরা এসে বলল, তারাও সংবর্ধনা দিতে চায়। শেষ পর্যন্ত ঠিক কর' হলো স্কুলের তরফ থেকেই তাকে একটা সংবর্ধনা দেয়া হবে। সেই উপলক্ষে কমিটি তৈরি হলো।

মানপত্র লেখা হলো। মানপত্র লিখলেন ক্লাশ টেনের আবু বকর ভাই। চমৎকার মানপত্র—
হে ভূত, হে অশরীরী প্রাণ, হে বোতলবন্দি মুক্তহৃদয়, হে মহাপ্রাণ— এইসব লেখা। পড়লে
রক্ত গরম হয়ে যায়।

আমরা ঠিক করলাম বোতল ভূতের সংবর্ধনায় যার কাছ থেকে ভূত পেয়েছি তাকেই
সভাপতি করা হাব। ঐ যে রবি ঠাকুরের মতো দেখতে বুড়োকে। উনি হয়তো আসতে
চাইবেন না— না চাইলেও তাঁকে হাতে-পায়ে ধরে রাজি করাতেই হবে। একদিন বিকেলে
দলবৈধে গেলাম তাঁর কাছে।

তাঁর বাড়ির কাছে এসে থমকে দাঁড়াতে হলো। সব কেমন যেন অন্য রকম লাগছে।
বাড়ি রঙ করা হয়েছে। ‘শান্তিনিকেতন’ লেখা সাইনবোর্ডটি নেই। সুন্দর একটা বাগান করা
হয়েছে বাড়ির সামনে।

ফর্সামতো একজন বৃদ্ধ গেঞ্জি গায়ে খুরপি হাতে বাগানে কাজ করছেন। আমি এগিয়ে
গিয়ে বললাম, উনি কি আছেন?

বৃদ্ধ হাসি মুখে বললেন, উনিটা কে?

ঐ যে ববীন্দ্রনাথের মতো দেখতে। লম্বা দাড়ি। লম্বা চুল।

বৃদ্ধ হেসে ফেললেন, আর তখনই বুঝলাম উনিই সেই লোক। দাড়ি কেটে ফেলেছেন।
চুল ছোট কবে ফেলেছেন। আমি অবাচ্য হয়ে তাকিয়ে রইলাম। বৃদ্ধ বললেন— কী ব্যাপার
বলো তো?

তাব আগে বলুন - আপনিই কি উনি?

হ্যাঁ, আমিই সেই মানুষ।

আমরা বোতল ভূতের ব্যাপারটা তাঁকে বললাম। বোতল ভূত আমাদের জন্যে কী কী
করেছে তাও বললাম। তাঁর বিস্ময়ের সীমা বইল না। তাকে দেখে মনে হলো এমন অদ্ভুত
কথা তিনি তাব জীবনে শোনেন নি। হতভম্ব হয়ে যাওয়া স্ববে তিনি বললেন, আমিই
তোমাকে বোতল ভূত দিয়েছি!

জি।

কী সর্বনাশের কথা! আমি ভূত পাব কোথায় যে তোমাকে বোতলে ভবে দেন?

এই তো দেখুন না। আমার সঙ্গেই আছে।

আমি শিশিটা তাব হাতে দিলাম। তিনি গভীর আগ্রহে শিশি নেড়ে-চেড়ে দেখে
বললেন, আসলে ব্যাপারটা কী হয়েছে তোমাদের বল। আমার মাথার ঠিক ছিল না।
দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলাম। চিকিৎসা চলছিল। এখন মনে হচ্ছে মাথা খারাপ অবস্থায় ওসব
কর্বেছি।

আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম।

বৃদ্ধ বললেন, তোমরা যে সময়ে জন্মেছ তার অনেক আগেই চাঁদে মানুষ নেমে গেছে।
মঙ্গল গ্রহে নেমেছে ‘মেরিনাব-মহাশূন্যযান’। আর তোমরা কিনা ভূত নিয়ে মাতামাতি
কবছ! আমার না হয় মাথা খারাপ, কিন্তু তোমাদের তো আর মাথা খারাপ হয় নি? তোমরা
কেন এসব বিশ্বাস করবে?

আমি ক্ষীণ গলায় বললাম, বোতল ভূত আমাদের জন্যে অনেক কিছু করেছে।

কী করেছে ?

আমরা একে একে ভূতের কাণ্ডকারখানা বললাম। বৃদ্ধ মিটিমিটি হাসতে হাসতে বললেন, এইসব ঘটনা এম্মিতেও ঘটত। স্বাভাবিক নিয়মে এসব ঘটেছে, আর তোমরা ভেবেছ ভূত এসব করেছে।

আমাদের মন অসম্ভব খাবাপ হয়ে গেল।

বৃদ্ধ বললেন, মানুষের অসীম ক্ষমতা। অসাধ্য কাজের জন্যে মানুষের ভূতের দরকার হয় না। সে নিজেই পারে।

এই বৃদ্ধের কথা শুনে আমাদের এতই মন খারাপ হলো যে প্রায় চোখে পানি এসে পড়ার মতো অবস্থা। আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখেই হয়তোবা বৃদ্ধের মায়া হলো। তিনি বললেন, তোমরা ভূতের সংবর্ধনার আয়োজন করেছে— খুব ভালো কথা। কব। আমি সভাপতি হিসেবে সেখানে যাব। অবশ্যই যাব। কিন্তু কথা দিতে হবে, সভার শেষে বোতলটা আমাকে দিয়ে দেবে। কি, কথা দিচ্ছ ?

আমরা চুপ করে রইলাম।

বৃদ্ধ বললেন, যাও বোতল নিয়ে বাড়ি যাও। সংবর্ধনাব শেষে আমাকে তা দিয়ে দেবে। কোথায় রাখলাম বোতলটা ?

আশ্চর্যের ব্যাপার, বোতলটা খুঁজে পাওয়া গেল না। বৃদ্ধ বিস্মিত হয়ে বললেন, এইখানেই তো ছিল। দেখ তো তোমরা কেউ পকেটে নিয়ে বেখেছ কি না।

আমাদের কারোরই পকেটে বোতল নেই। আমরা তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। নেই নেই নেই। কোথাও নেই।

বৃদ্ধ গম্ভীর গলায় বললেন, ভালোই হলো। আপদ বিদেয় হয়েছে। যাও, এখন তোমরা বাড়ি যাও। এই জাতীয় বাজে বিষয় নিয়ে আর মাথা ঘামাবে না। কেমন ?

আমরা ফিরে এলাম। ফেরার পথে মনে হলো— আমরা ভূতকে বিশ্বাস কবি নি বলে বেচারী বোতল ভূত মনের দুঃখেই চলে গেছে। গভীর বেদনায় আমার চোখে পানি এসে গেল। আমি মনে মনে বললাম, ভূত ভাই, তুমি সত্যি হও আব মিথ্যাই হও, আমি সাব জীবন তোমাকে ভালোবেসে যাব। তুমি যেখানেই থাক— ভালো থাক, সুখে থাক।



আমি এ

মিসির আলি দু' শ' গ্রাম পাইজাম চাল কিনে এনেছেন। চাল রাখা হয়েছে একটা হরলিক্সের কৌটায়। গত চারদিন ধরে তিনি একটা এক্সপেরিমেন্ট করছেন। চায়ের চামচে তিন চামচ চাল তিন জানালার পাশে ছড়িয়ে দেন। তারপর একটু আড়াল থেকে লক্ষ করেন— কী ঘটে। যা ঘটে তা বিচিত্র। অন্তত তাঁর কাছে বিচিত্র বলেই মনে হয়। দু'টা চড়ুই পাখি চাল খেতে আসে। একটি খায়, অন্যটি জানালার রেলিং-এ গম্বীর ভঙ্গিতে বসে থাকে। ব্যাপারটা রোজই ঘটছে। পক্ষীসমাজে পুরুষ স্ত্রী-পাখির চেয়ে সুন্দর হয়, কাজেই ধরে নেয়া যায় যে পাখিটি চাল খাচ্ছে সেটা পুরুষ-পাখি। গম্বীর ভঙ্গিতে যে বসে আছে, সে তার স্ত্রী কিংবা বান্ধবী। পক্ষীসমাজে বিবাহপ্রথা চালু আছে কিনা মিসির আলি জানেন না। একটি পুরুষ-পাখি একজন সঙ্গিনী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, না সঙ্গিনী বদল কবে— এই ব্যাপারটা মিসির আলির জানতে ইচ্ছা করছে। জানেন না। পক্ষীবৈয়্যক প্রচুব বই তিনি জোগাড় করেছেন। বইগুলিতে অনেক কিছুই আছে, কিন্তু এই জরুরি বিষয়টা নেই।

পাবলিক লাইব্রেরিতে পুণ্যে একটি বই পাওয়া গেল— ইবন্স ল্যাংস্টোনের 'The Realm of Birds', সেখানে পাখিদের বিচিত্র স্বভাবের অনেক কিছুই লেখা, কিন্তু কোথাও নেই— একটি পাখি থাকে, অন্যটি দূবে দাঁড়িয়ে দেখবে। রহস্যটা কী? এই পাখিটির কি খিদে নেই? নাকি সে একধরনের উপবাসের ভেতন দিয়ে যাচ্ছে? পক্ষীবিশাবদরী কী বলেন? বিশারদদের ব্যাপাবে মিসির আলির একধরনের অ্যালার্জি আছে। বিশেষজ্ঞদের কিছু জিজ্ঞেস করলেই তাঁরা এমন উত্তরে তাকান, যেন প্রশ্নকর্তার অজ্ঞতায়া খুব বিবক্ত হচ্ছেন। প্রশ্ন পুরোপুরি না শুনেই জবাব দিতে শুরু করেন। সেই জনাব বেদবাক্যের মতো গ্রহণ করতে হবে। বিশেষজ্ঞদের জবাবের উপর প্রশ্ন করা যাবে না। বিনয় নামক সদৃশগণি বিশেষজ্ঞদের নেই। দীর্ঘদিন পড়াশোনা কবে তাঁরা যা শেখেন, তারচে' অনেক বেশি শেখেন— অহঙ্কার প্রকাশের কায়দা-কানুন। পাখির ব্যাপারটাই ধবা যাক। তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের একজন অধ্যাপকের কাছে গিয়েছিলেন। সেই ভদ্রলোক সমস্যা পুরোপুরি না শুনেই বললেন, এটা কোনো ব্যাপার না। খিদে নেই তাই খাচ্ছে না, পশু ও প্রাণিজগতের নিয়ম হলো খিদেয় খাদ্য গ্রহণ করা। একমাত্র মানুষই খিদে না থাকলেও লোভে পড়ে খায়।

মিসির আলি বললেন, প্রতিদিন একটা পাখির খিদে থাকবে না, অন্য একটার থাকবে— এটা কি যুক্তিযুক্ত?

একটা বিশেষ পাখিই যে খাচ্ছে না তাই-বা আপন ধরে নিচ্ছেন কেন? সব পাখি দেখতে একরকম। একদিন একটা খাচ্ছে, অন্যদিন আরেকটা খাচ্ছে।

আমি পাখি দুটাকে চিনি। খুব ভালো করে চিনি। অসংখ্য চড়ুই পাখির মধ্যেও আমি এদের আলাদা করতে পারব।

অধ্যাপক ভদ্রলোক অনেকক্ষণ গা দুলিয়ে হাসলেন। তারপর ছোট শিশুকে বোঝানোর ভঙ্গিতে বললেন— একটা মশা আপনার গায়ে কামড় দিল, তারপর সেটা উড়ে

গিয়ে অন্য মশাদের সঙ্গে মিশল। আপনি কি সেই মশাটা আলাদা করতে পারবেন ?
না।

যদি না পারেন, তাহলে চড়ুই পাখিও আলাদা করতে পারবেন না। পুরুষ-চড়ুই এবং মেয়ে-চড়ুই দেখতে একরকম। ভাই, এখন আপনি যান। এগাবোটোর সময় আমার ক্লাস, আমি কিছুক্ষণ পড়াশোনা করব।

ভদ্রলোক মিসির আলিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ডিকশনারি সাইজের এক বই খুলে পড়তে শুরু করলেন। ভাবটা এরকম যে আজবাজে লোকের সঙ্গে কথা বলে নষ্ট করার মতো সময় তাঁর নেই। দেখা যাচ্ছে, সবাই ব্যস্ত। সবারই সময়ের টানাটানি। একমাত্র তাঁরই অফুরন্ত সময়। সময় কাটানোই তার সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছুই করার নেই। মিসির আলির ডাক্তার তাঁকে বলেছেন— একজন মানুষের শরীরে যত ধরনের সমস্যা থাকা সম্ভব, তার সবই আপনার আছে। লিভারের প্রায় পুরোটাই নষ্ট করে ফেলেছেন। অগ্ন্যাশয় থেকে সিক্রেশন হচ্ছে না। রক্তে ডাবলিউ বিসি-র পরিমাণ খুব বেশি। আপনার হার্টেরও সমস্যা আছে, ড্রপ বিট হচ্ছে। আপনাকে যা করতে হবে তা হলো— দিনের পর দিন বিছানায় শুয়ে থাকা। বুঝতে পারছেন ?

পারছি।

সিগারেট ছেড়েছেন ?

এখনো ছাড়ি নি, তবে শিগগিরই ছাড়ব।

উপদেশ দিতে হয় বলে দিচ্ছি। মনে হয় না আপনি আমার উপদেশেব প্রতি কোনোরকম গুরুত্ব দিচ্ছেন। তাব পরেও বলি— মন থেকে সমস্ত সমস্যা ঝেঁটিয়ে দূর করুন। যা করবেন তা হলো বিশ্রাম। গান শুনবেন, পার্কে বেড়াবেন, হালকা বইপত্র পড়তে পারেন। রাত জাগা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মনে থাকবে ?

জি, থাকবে।

আমি জানি আপনি এর কোনোটাই করবেন না।

মিসির আলি হেসে ফেললেন। হাসতে-হাসতে বললেন, আমি আপনার উপদেশ মেনে চলব। দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার জন্যে যে উপদেশ মানব তা না। শবীরটা সত্যি-সত্যি সারাতে চাচ্ছি। অসুস্থতা অসহ্য বোধ হচ্ছে।

ডাক্তার সাহেব বললেন, আপনি মুখে বলছেন, কিন্তু আসলে কিছুই করবেন না। কিছু-কিছু মানুষ আছে অন্যের উপদেশ সহ্য করতে পারে না। আপনি সেই দলের।

ডাক্তারের কথা ভুল প্রমাণিত করে মিসির আলি ডাক্তারের উপদেশমতোই চলছেন। রাত নটার মধ্যেই ভাত খান, দশটা বাজতেই শুয়ে পড়েন। সমস্যা হলো— ঘুম আসে না। মানুষ কম্পিউটার না। নির্দিষ্ট সময়ে তাকে ঘুম পাড়ানো সম্ভব না। মিসির আলি গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন। এক-এক রাতে এক-এক ধরনের বিষয় নিয়ে ভাবেন। ইচ্ছে করে যে ভাবেন তা না। ভাবনাগুলির যেন প্রাণ আছে, তারা নিজেরাই আসে। মিসির আলিকে বিরক্ত করে তারা যেন একধরনের আনন্দ পায়। ইদানীং তিনি চড়ুই পাখি নিয়ে ভাবেন। পাখি মানুষ চিনতে পারে কি পারে না— এই তাঁর রাতের চিন্তার বিষয়। কোনো মানুষ যদি রোজ-রোজ পাখিকে খাবার দেয় তাহলে সেই পাখিগুলি কি ঐ মানুষটিকে চিনে রাখবে ?

রাতে ঘুমের ঠিক না থাকলেও তাঁর ঘুম ভাঙে খুব ভোরে। ঘুম ভেঙে পার্কে বেড়াতে যান। দুপুরে খাওয়ার পর দরজা-জানালা বন্ধ করে শুয়ে পড়েন। বিকেলে পার্কে গিয়ে বসেন। তাঁর বসার নির্দিষ্ট বেঞ্চ আছে। পা তুলে বেঞ্চিতে বসে তিনি গাছপালার সৌন্দর্য দেখতে চেষ্টা করেন, যদিও গাছপালা তাঁকে কখনোই আকৃষ্ট করে না। ডাক্তার হালকা বই পড়তে বলেছেন। তিনি ‘হাসি হাসি হাসি’ এই নামে একটা তিনশ’ পৃষ্ঠার বই কিনে এনেছেন। বইটিতে দু’ হাজার একটি জোক আছে। হাসি আসে নি। এই বইটির দাম পড়েছে একশ’ টাকা। মনে হচ্ছে একশ’ টাকাই পানিতে গেছে।

আরেকটি বই ফুটপাথ থেকে কিনেছেন দু’ টাকা দিয়ে। বইটির নাম ‘বেহুলার বাসরঘরের ইতিহাস’। এই বইটি বরং ভালো। অনেক চিন্তাভাবনা করার ব্যাপার আছে। যেমন লখিন্দরের বাবার নাম চাঁদ সদাগর। চাঁদ সদাগর সম্পর্কে বলা হচ্ছে—

কালীদহে পড়ে চাঁদ পান করে জল

ক্ষণকাল যায় ভেসে ক্ষণে হয় তল।

সপ্তদিন নবম রাত্রি ভাসিল সাগরে

ইচামাছ বাসা বাঁধে দাড়ির ভিতরে...।

অর্থাৎ চাঁদ সদাগরের দাড়িতে ইচামাছ বাসা বেঁধেছে। সাগরের ইচামাছ হচ্ছে গলদা চিংড়ি। এরা কী করে দাড়ির ভেতর বাসা বাঁধবে? রূপক অর্থে বলা হচ্ছে? রূপকের চিত্রকল্প তো বাস্তব হওয়া উচিত। অবাস্তব চিত্রকল্প দিয়ে রূপক তৈরি করার মানে কী? তা ছাড়া ‘সপ্তদিন নবম রাত্রি ভাসিল সাগরে’ বাক্যটির মানেই—বা কী? সপ্তদিন সাগরে ভাসলে সপ্তরাতও ভাসতে হবে। অবশ্যি গুরুতে এক রাত ভেসেছে এবং শেষে একরাত ভেসেছে এইভাবে ব্যাখ্যা দেয়া যায়। তাতেও শেষরক্ষা হয় না, কারণ চাঁদ সদাগরের নৌকাডুবি রাতে হয় নি, হয়েছে দিনে।

মিসির আলি পার্কে তাঁর নির্দিষ্ট বেঞ্চিতে বসে আছেন। তাঁর পাশে দু’টি বই। একটি হলো বেহুলার বাসরঘরের ইতিহাস, অন্যটি— The Birds, Their Habits। তিনি বই পড়ছেন না। বেশ অগ্রহ নিয়ে খেলা দেখছেন। বাচ্চারা ফুটবল খেলছে। ফুটবল খেলার মতো ফাঁকা জায়গা এই পার্কে নেই। চারদিকে গাছগাছালি। এর মধ্যেই বাচ্চারা খেলছে। কে কোন দলে খেলছে এটা বের করাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছেলেরাও যার যদিকে ইচ্ছা বলে কিক বসাস্কে। নির্ধারিত কোনো গোলপোস্ট আছে বলেও মনে হচ্ছে না। গোলকিপার যে দু’টি গোলপোস্টের মাঝখানে দাঁড়াচ্ছে সেটাই গোলপোস্ট। বলের সঙ্গে-সঙ্গে গোলপোস্টের স্থান বদল হচ্ছে।

স্নামালিকুম স্যার।

মিসির আলি না তাকিয়েই বললেন, ওয়ালাইকুম সালাম।

আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি স্যার?

এখন বলতে পারেন না। এখন আমি খেলা দেখছি।

স্যার, আমি বসি না হয়।

বসুন।

অঙ্ককার না হওয়া পর্যন্ত খেলা চলল। কে জিতল কে হারল কিছু বোঝা গেল না। মনে হচ্ছে দু' দলই জিতেছে। এও এক অসাধারণ ঘটনা। একসঙ্গে দু'টি দলকে জিততে প্রায় কখনোই দেখা যায় না।

স্যাব, আমি অনেকক্ষণ বসে আছি।

মিসির আলি তাকালেন। তাঁর ভুরু কুঞ্চিত হলো। মানুষের সঙ্গ তাঁর কাছে কখনোই বিরক্তিকর ছিল না। অতি সাধারণ যে-মানুষ, তাব চরিত্রেও অবাক হয়ে লক্ষ করার মতো কিছু ব্যাপার থাকে। কিন্তু ইদানীং মানুষ তাঁর কাছে অসহ্য বোধ হচ্ছে। ববং চডুই পাখির ব্যাপার তাঁকে অনেক বেশি আকৃষ্ট করেছে। তাঁর পাশে বসে থাকা চশমাপরা মানুষটি মাঝে-মাঝেই তাঁকে বিরক্ত করেছে। তাকে এই পার্কেই দেখা যায়। সবদিন না, কয়েক দিন পরপরই। এই লোক তাঁকে একটা গল্প বলতে চায়। তাও প্রেমের গল্প। পার্কে বসে প্রেমের গল্প শোনার মতো ধৈর্য এবং ইচ্ছা কোনোটাই তাঁর নেই। এ লোককে সে-কথা অনেকবাবই বলা হয়েছে। মিসির আলি ঠিক করলেন, আজ আরেকবার বলবেন। প্রথমে যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করবেন— তারপর কঠিন এবং রুঢ়ভাবে বলবেন।

মিসির আলি বললেন, হ্যাঁ, এখন বলুন কেমন আছেন?

কঠিন কথা বলার আগে সহজভাবে শুরু কবা। বুদ্ধিমান লোক হলে বুঝে ফেলা উচিত যে প্রস্তাবনা মূল বইয়ের মতো নয়।

জি স্যার, ভালো আছি।

গল্প শোনাতে চাচ্ছেন তো? কিছু মনে কববেন না। গল্প শুনতে ইচ্ছে করছে না।

আপনার চডুই পাখি দু'টি সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলাম।

চডুই পাখি?

জি স্যার, পরশুদিন আপনাব কাছে এসেছিলাম। আপনি বলেছিলেন, আপনি আমার কোনো কথা শুনতে পারবেন না। চডুই পাখি নিয়ে বাস্তব। পাখি দু'টি কি ভালো আছে?

হ্যাঁ, ভালো আছে।

এখনো কি পুরুষ-পাখিটা খাচ্ছে এবং মেয়ে-পাখি দূরে বসে দেখছে?

হ্যাঁ।

স্যার, আমি ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করেছি। আমার মনে হয় পাখি দু'টাকে যদি আমবা খাঁচায় আটকে ফেলতে পারি তাহলে বোঝা যাবে ব্যাপারটা কী। খাঁচায় চাল দেয়া থাকবে— ক্রমাগত চক্ৰিশ ঘণ্টা মনিটর কবা হবে। যদি দেখা যায় খাঁচাব ভেতরও মেয়ে-পাখিটা কিছুই খাচ্ছে না— তখন বুঝতে হবে...

মিসির আলি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, খাঁচায় এদের ঢোকাব কী কবে?

খাঁচায় ঢোকানো সমস্যা হবে না, স্যার। চাল খাইয়ে-খাইয়ে আপনি এদের অভ্যস্ত করে রেখেছেন। খাঁচার দরজা খুলে আপনি যদি এর ভেতর চাল দিয়ে দেন— পাখি দু'টা খাঁচায় ঢুকবে।

মিসির আলি আশ্রয় নিয়ে বললেন, খাঁচা কোথায় পাওয়া যায়?

নীল ক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটি মার্কেট নামে একটা নতুন মার্কেট হয়েছে। রঙিন মাছ, পাখি, পখির খাঁচার অসংখ্য দোকান।

খাঁচার কী-রকম দাম ?

আপনি যদি বেয়াদবি না নেন— আমি আপনার জন্যে বড় একটা খাঁচা কিনেছি। আপনার বাসায় যে কাজের ছেলেটি আছে তাকে দিয়ে এসেছি।

কেন করলেন ?

আপনার ভেতর কৌতূহল জাগানোর জন্যে করেছি। আমি বেশ কিছুদিন ধরে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছি। আপনি কোনোরকম আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। এমনকি আমার নাম পর্যন্ত জানতে চাচ্ছেন না। আমার ধারণা হয়েছে খাঁচাটা পেলে হয়তো-বা আপনি কৌতূহলী হবেন। আমার নাম জানতে চাইবেন।

আপনার নাম কী ?

আমার ডাকনাম তন্ময়। ভালো নাম মুশফেকুর রহমান।

আপনি আমার কাছে কী চান ?

আমি আপনাকে একটা গল্প বলতে চাই।

প্রেমের গল্প ?

প্রেমেব গল্প বলা যেতে পারে।

মিসিবি আলি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমাকে দেখে কি আপনার মনে হয়— আমি প্রেমের গল্প শোনার ব্যাপারে খুব আগ্রহী ?

হ্যাঁ, মনে হয়। আমার মনে হয় গল্প শুরু করলে আপনি খুব আগ্রহ নিয়ে শুনতে শুরু করবেন। আমার দবকাব অসম্ভব মনোযোগী একজন শ্রোতা, যে গল্প শুনে যাবে, একটি প্রশ্নও করবে না ; গল্প শুনে হাসবে না, ব্যথিত হবে না।

এমন শ্রোতা তো প্রচুর আছে। এই পার্কেই আছে।

আপনি কী বলতে চাচ্ছেন আমি বুঝতে পারছি। আপনি বলতে চাচ্ছেন— এই পার্কে প্রচুর গাছ আছে। গাছগুলি আমার গল্পের মনোযোগী শ্রোতা হতে পারে। আপনি কি তাই বোঝাতে চাচ্ছেন না ?

হ্যাঁ।

গাছকে আমি আমার গল্প শুনিয়েছি। গাছরা আমার গল্প মন দিয়ে শুনেছে এবং গল্পের মাঝখানে প্রশ্ন করে আমাকে বিবস্ত্র করে নি। কিন্তু ওরা আমার গল্প বুঝতে পেরেছে কিনা তা আমি জানতে পারছি না।

আপনার গল্প বোঝা কি গাছদের জন্যে জরুরি ?

গাছের জন্যে জরুরি নয়। আমার জন্যে জরুরি। খুবই জরুরি।

প্রেমেব গল্পটি কি দীর্ঘ ?

গল্প বেশ দীর্ঘ। তবে গল্পের মূল লাইনটি, যাকে বটম লাইন বলা হয়, তা ছোট। স্যার, বটম লাইনটি বলব ?

বলুন।

আমি আপনাদের মনোবিদ্যার ভাষায় একজন সাইকোপ্যাথ। আমি এ পর্যন্ত দু'টি খুন করেছি। খুব ঠাণ্ডা মাথায় করেছি। খুব ভেবেচিন্তে করা। এই খুন দু'টি করার জন্যে আমার মনে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই। আমি তৃতীয় খুনটির প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন করেছি।

প্রত্নুতিপর্ব আপনাকে বলতে চাচ্ছি। প্রত্নুতিপর্বে প্রেমের ব্যাপার আছে। এই জন্যেই বলছি প্রেমের গল্প।

দু'টি খুন করেছেন। তৃতীয়টি করবেন। কবে ফেলুন। আমাকে বলার দরকার কী ? আমার অনুমতি নেয়ার ব্যাপার তো নেই।

স্যার, আপনি কি আমার গল্প বিশ্বাস করেছেন ?

হ্যাঁ, করেছি।

আমি তো আপনাকে একটা ভয়াবহ কথা বললাম। আপনি সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্বাস করলেন ?

হ্যাঁ, করলাম।

কেন করেছেন ?

আমি মানুষকে কখনোই অবিশ্বাস করি না। তাছাড়া একজন মানুষ অকারণে কেন আমাকে এসে বলবে আমি দু'টা খুন করেছি, তৃতীয়টি করব ? এখন বলুন কেমন লাগে মানুষ খুন করতে ?

ভালো লাগে স্যার।

লোকটি হেসে ফেলল। সুন্দর হাসি। কিন্তু মিসির আলি শিউবে উঠলেন। লোকটির জিহ্বা কুচকুচে কালো। সে যখন হেসে উঠল মিসির আলি ব্যাপারটা তখনই লক্ষ করলেন।

লোকটি উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বলল, আমি আপনার ভেতর কৌতূহল জাগ্রত করতে পেরেছি। কাজেই আমি জানি, আপনি এখন আমার কথা শুনবেন। আব স্যাব, আপনি আমার জিহ্বা দেখে যেভাবে চমকে উঠেছেন, সেভাবে চমকে ওঠাব কিছু নেই। খুব ছোটবেলায় আমার অসুখ হয়েছিল। কালাজ্বর। ব্রহ্মচারী ইনজেকশন নিতে হয়েছে। সেইসঙ্গে আয়ুবেদী এক ওষুধ খেয়ে জিহ্বা পুড়িয়ে ফেলেছিলাম। স্যার যাই। খুব শিগগিরই আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে। ও ভালো কথা, স্যার, এই বইটিও আমি আপনার জন্যে এনেছি। অস্ট্রেলিয়ান পাখিদের ওপর একটা বই। পাখিদের সম্পর্কে কিছু তথ্য এই বইটিতে পেতে পারেন।

আপনার ভালো নাম কী যেন বললেন ? মুশফেকুর রহমান ?

জি।

আপনার সঙ্গে আমার কোথায় দেখা হবে ? আপনার ঠিকানা কী ?

আমাকে আপনার খুঁজে বের করতে হবে না স্যার। আমি আপনাকে খুঁজে বের করব।

২

মিসির আলির কাজের ছেলেটির নাম বদু। বয়স পনেরো-ষোল। বামন ধাঁচ আছে, লম্বা হচ্ছে না। ছেলেটা বোকা ধরনের, তবে অত্যন্ত অনুগত। রাতে মিসির আলির বাড়ি ফিরতে দেরি হলে চিন্তিত মুখে সদর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুদিন পরপর 'এত কম বেতনে কাম করুম না' বলে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে। মিসির আলি তাকে লেখাপড়া

শেখানোর চেষ্টা করছেন। গত তিন মাসে সে ‘অ’ ‘আ’ এবং ‘ই’ পর্যন্ত শিখেছে। তাও ভালোমতো শিখতে পারে নি। অ এবং আ-তে গণ্ডগোল হচ্ছে। কোনটা অ, কোনটা আ, এখনো ধরতে পারে না। তার পরেও পড়ালেখার কাজটি সে খুব আগ্রহ নিয়ে করে।

মিসির আলি ঘবে ঢুকে দেখলেন বদু পড়ছে। মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে পড়ছে। বই স্নেট পেনসিল চারদিকে ছড়ানো। মিসির আলি বললেন, কেউ কি পাখির খাঁচা দিয়ে গেছে ?

বদু বলল, হ। সুন্দর মতো একটা লোক আইছিল।

লোকটা কী বলল ?

বলছে, বদু, খাঁচাটা রাখ। স্যার এলে তাঁর হাতে দিও। আর এই নাও একটা চিঠি।

বদু কথাগুলি হুবহু বলে গেল। মিসির আলি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। বদু মুশফেকুর রহমানের কথাগুলি যন্ত্রের মতো বলে গেছে। স্মৃতিশক্তির কোনো সমস্যা এখানে হচ্ছে না, অথচ সামান্য অ আ তার মনে থাকছে না। এর কারণটা কী ?

তাকে বলল, বদু! খাঁচাটা বাখ ?

জে, বলছে।

তোর নাম জানল কীভাবে ?

তা ক্যামনে কব ? হে তো আমাবে বলে নাই।

তুই অবাক হোস নি ? অপরিচিত একটা লোক তোর নাম ধরে ডাকছে।

জে-না, অবাক হব ক্যান ? তার ইচ্ছা হইছে ডাকছে। নাম ধইরা ডাকলে দোষের কিছু নাই।

মিসিব আলি ঘবে ঢুকে খাঁচা দেখলেন। বেশ বড় লোহার খাঁচা। সাদা রঙ করা হয়েছে। রঙ এখনো শুকায় নি। হাতে লেগে যাচ্ছে। খামে ভরা নোটটাও তিনি পড়লেন— ‘আপনার পক্ষীবিষয়ক গবেষণাব সাফল্য কামনা করছি।’ বল পয়েন্টের লেখা নয়, কলমেব লেখা। দামি কলম নিশ্চয়ই। মসৃণ লেখা। যে-কাগজে লেখা হয়েছে সে-কাগজও দামি, কোনো প্যাড থেকে ছেঁড়া হয়েছে। ক্রিম কালারের প্যাড। প্যাডের পাতা থেকে হালকা গন্ধ আসছে। মিসিব আলিকে সবচে’ মুগ্ধ করল হাতের লেখা। অনেক দিন তিনি এত সুন্দর হাতের লেখা দেখেন নি। অক্ষরগুলি আলাদা-আলাদাভাবে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছা করে।

বদু।

জে।

লোকটা কি খাঁচা দিয়েই চলে গেল, না কিছুক্ষণ ছিল ?

কিছুক্ষণ ছেল, গল্পসল্প করল।

কী গল্প করল ?

আমার বাড়ি কই, কতদিন আপনার সঙ্গে আছি— এই হাবিজাবি। আমিও দুই-চাইরটা হাবিজাবি কথা বললাম।

হাবিজাবি কথা কী বললে ?

যেমন ধরেন লেহাপড়া কিছু মনে থাকে না। কোনটা স্বরে অ কোনটা স্বরে আ খালি গোলমাল হয়। তখন লোকটা একটা নিয়ম শিখাইয়া দিল। বলছে, এই নিয়মে পড়লে মনে থাকব।

নিয়মটা কী ?

স্বরে অ হইল হাতের মুঠি বন্ধ। স্বরে অ বলনের সময় হাতের মুঠি বন্ধ করন লাগব। স্বরে আ হইল মুঠি খোলা। নিয়মটা ভালো— অখন আর ভুল হয় না।

লোকটার মধ্যে অদ্ভুত কিছু দেখেছিছস বদু ?

জে-না।

ভালো করে মনে করে দেখ। লোকটা কথা বলার সময় হেসেছে ?

জে, হাসছে।

হাসি দেখে অদ্ভুত কিছু মনে হয়েছে ?

জে-না।

মিসির আলি হাত-মুখ ধুয়ে বিছানায় উঠলেন। মুশফেকুর বহমানের দেয়া পাখিবিষয়ক বইটির পাতা ওল্টালেন। নতুন বই। খুব সম্ভব আজই কেনা হয়েছে। বইয়ের দাম পঁচাত্তর পাউন্ড। বইটির প্রথম পাতায় ঠিক আগের মতো লেখা— ‘আপনার পক্ষীবিষয়ক গবেষণার সাফল্য কামনা করছি।’ মিসির আলি আবাবো মনে-মনে বললেন, কী সুন্দর হাতেব লেখা! তিনি সত্যি-সত্যি লেখাগুলির উপর দিয়ে আঙুল বুলিয়ে নিয়ে গেলেন।

লোকটি সম্পর্কে মিসির আলি ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে চেষ্টা করলেন। বিগবান মানুষ— তা ধরে নেয়া যায়। পঁচাত্তর পাউন্ড দামের বই উপহার দেয়া, খাঁচা কিনে আনাব কাজগুলি একজন বিগবান মানুষই করবে।

মুশফেকুর রহমান তাঁকে কৌতূহলী করবার জন্যে খাঁচা উপহার দিয়েছে। এব প্রয়োজন ছিল না। একবার হাঁ করলেই মিসির আলি তার সম্পর্কে কৌতূহলী হতেন। তা করে নি। মিসির আলি যখন কৌতূহলী হয়েছেন, তখনই সে তার ভয়ঙ্কর জিহ্বা দেখিয়েছে, তাব আগে না। সে তার শরীরের এই অস্বাভাবিকতা গোপন রাখতে পারে। এই ক্ষমতা তার আছে। সে বদুর সঙ্গে অনেক গল্প করেছে। বদু তার কালো জিহ্বা দেখতে পায় নি। ইচ্ছা করলে মিসির আলির কাছেও গোপন রাখতে পারত। তা রাখে নি। তার মনে কোনো-একটা উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্যটা কী ? সে কি ভয় দেখাতে চেয়েছে, না চমকে দিতে চেয়েছে ?

চমকে দেয়ার একটি প্রবণতা লোকটির মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে। পাখির খাঁচা কিনে আনায় তাই প্রমাণিত হয়। বদুকেও সে চমকে দিতে চেয়েছে তার নাম ধবে ডেকে। বদুর চমকবার মতো বুদ্ধি নেই বলে চমকায় নি। মুশফেকুর রহমান যে অসম্ভব বুদ্ধিমান এই ব্যাপারটিও সে জানাতে চায়। মনে রাখার একটি কৌশল সে বদুকে শিখিয়েছে। তার মূল লক্ষ্য বদু নয়, মূল লক্ষ্য মিসির আলি। যেন সে বলার চেষ্টা করছে বুদ্ধির খেলায় তুমি আমাকে হারাতে পারবে না। অসম্ভব বুদ্ধিমান মানুষ সব সময় এই ছেলেমানুষিটা করে। তাদের বুদ্ধির ছটায় অন্যকে চমকে দিতে চায়। মিসির আলি নিজেও এই কাজটি করেন— খুব সূক্ষ্মভাবে করেন। এই লোকটিও সূক্ষ্মভাবেই করছে।

সে বলল, আমি একজন সাইকোপ্যাথ। সাইকোপ্যাথ শব্দের মানে সে কি জানে ? পত্র-পত্রিকা এবং সিনেমার কল্যাণে শব্দটি প্রচলিত, যদিও এই শব্দের ব্যাপকতা সম্পর্কে খুব কম মানুষই জানে।

সে দু'টি খুনের কথা বলছে— একজন সাইকোপ্যাথ তা করবে না। উপন্যাসের সাইকোপ্যাথরা বড় গলায় সবাইকে খুনের কথা বলে। বাস্তবের চরিত্র হবে নিভৃতচারী।

লোকটির মধ্যে অনুসন্ধিৎসাও প্রবল। পাখির চাল না-খাওয়ার ব্যাপারটা তাকেও বিস্মিত করেছে। সে রহস্য নিয়ে ভাবছে। কারণ পাখির বইটি সে শুধু কেনে নি, পড়েছেও। বইয়ের বিভিন্ন পাতায় পেজ-মার্ক দেয়া। বইটি পড়তে হলে তাকে অনেকখানি সময় দিতে হবে। আচ্ছা, পাখির কথা তিনি তাকে কবে বললেন ? পরশু না তার আগের দিন ? আচ্ছা, এই বইটিতে কি লোকটির হাতের ছাপ আছে ?

মিসির আলি চিন্তিত বোধ করছেন। তাঁকে আরো ভালোভাবে ভাবতে হবে। আরো ঠাণ্ডা মাথায়। মোটেই উত্তেজিত হওয়া চলবে না। প্রথম, লোকটির সঙ্গে কোথায় দেখা হলো— পার্কে না রাস্তায় ? প্রথম দিন কী কথা হয়েছিল ? আচ্ছা, প্রথম দিন তার গায়ে কী কাপড় ছিল ? মিসির আলি মনে করতে পারলেন না। আজ কী কাপড় ছিল ? কোট না সোয়েটার ? কী রঙের কোট কিংবা কী রঙের সোয়েটার ? অনেক চিন্তা করেও মিসির আলি মনে করতে পারলেন না। তিনি খুবই বিস্মিত হলেন। এরকম কখনো হয় না। তাঁর পর্যবেক্ষণশক্তি ভালো। সারা জীবন তিনি তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণক্ষমতা দেখিয়ে অন্যদের চমৎকৃত করেছেন। নিজেও চমৎকৃত হয়েছেন। আজ পারছেন না কেন ?

বদু।

জি স্যার ?

যে-লোকটা এসেছিল, তাব গায়ে কী ছিল ? কোট ?

খিয়াল নাই।

লোকটার গায়ের রঙ কী ছিল ? ফর্সা না কালো ?

খিয়াল নাই।

মিসির আলি ডবাক হয়ে লক্ষ করলেন— শুধু যে বদুব খেয়াল নেই তা নয়, তাঁর নিজেরও খেয়াল নেই। এব কোনো মানে হয় ? তিনি নিজেব উপরই নিজে বিরক্ত হচ্ছেন।

বাতের খাবাব খেলেন নিঃশব্দে। খাওয়া শেষে সিগারেট ধবালেন। সারা দিনে তিনি এখন একটাই সিগারেট খান। বাতে ঘুমুতে গাবাব আগে বদু এসে তার পড়া বলল। এই প্রথমবার সে স্বরে অ স্বরে আ-তে কোনো ভুল করল না। হাত মুঠিবদ্ধ করে বলল, স্বরে 'অ'। মুঠি খুলে বলল, স্বরে 'আ'। বদু নিজের সাফল্যের আনন্দে হেসে ফেলল। ঠিক দশটায় মিসির আলি দশ মিলিগ্রাম ফ্রিজিয়াম খেয়ে ঘুমুতে গেলেন। মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়ে আছে। স্নায়ুকে ঠাণ্ডা করার প্রয়োজন বোধ করলেন। ঘুম এলো না।

মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল মুশফেকুর রহমান। লোকটার গায়ের রঙ মনে নেই কেন ? কী কাপড় পরে এসেছিল তাও মনে নেই। এর কারণ কী ? যুক্তি দিয়ে এই সমস্যার কাছে কি পৌছা যায় না ? নিশ্চয়ই যায়। সেই চেষ্টাই করা যাক। একজন

মানুষের দিকে যখন আমরা তাকাই, তখন তার চোখের দিকেই প্রথম তাকাই। তারপর তার মুখ দেখি, মাথার চুল দেখি। এক ফাঁকে সে কী কাপড় পরে এসেছে তা দেখি। যদি আমরা তার চোখ থেকেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিই, তাহলে চোখ ছাড়া লোকটির আর কিছুই দেখা হয় না। চোখ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার ব্যাপার কখন ঘটবে? তখনই ঘটবে, যখন লোকটির চোখের তীব্র বিকর্ণণী-ক্ষমতা থাকবে। চোখ কখন বিকর্ণণ করে? যখন চোখে কোনো সূক্ষ্ম অস্বাভাবিকতা থাকে।

মিসির আলি মনে-মনে বললেন, মুশফেকুর রহমান নামের লোকটির চোখের অস্বাভাবিক বিকর্ণণী ক্ষমতার জন্যেই তাকে কখনো ভালোভাবে লক্ষ করা হয় নি। তাকে ভালোভাবে দেখার আগেই আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছি। আমি তার কুণ্ডলিত কালো 'জিহবা' দেখেছি— কারণ সে আমাকে ইচ্ছে করে তা দেখিয়েছে।

মিসির আলি নিশ্চিত বোধ করলেন। সম্ভবত এখন তাঁর ঘুম আসবে। হাই উঠছে। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। রাতে তাঁর সুন্দ্রা হলো। শেষরাতের দিকে পাখি নিয়ে কিছু ছাড়া-ছাড়া স্বপ্ন দেখলেন। একটি স্বপ্নে চড়ুই পাখি দু'টি তাঁর সঙ্গে কথা বলল। মিষ্টি রিনরিনে গলায় বলল, মিসির আলি সাহেব, শরীরের হাল অবস্থা ভালো?

তিনি বললেন, জি-না, ভালো না।

রোজ খানিকটা পাইজাম চাল খাবেন। চা-চামচে এক চামচ। খালি পেটে।

জি আচ্ছা, খাব।

স্বপ্নের মধ্যেই মিসির আলি নিজেকে বোঝালেন— এ জাতীয় স্বপ্ন দেখার পেছনে যুক্তি আছে। তিনি ক্রমাগত পাখি নিয়ে ভাবছেন বলেই এরকম দেখছেন। এ জগতে যুক্তিহীন কিছুই ঘটে না। অযুক্তি হলো অবিদ্যা। এ পৃথিবীতে অবিদ্যার স্থান নেই।

৩

তাঁর পাখিবিষয়ক গবেষণা বেশি দূর এগুচ্ছে না। চড়ুই পাখি দু'টি খাঁচায় ঢুকছে না। মিসির আলি খাঁচাটা জানালার পাশে রেখেছেন। খাঁচার ভেতরে পিঁরিচ ভর্তি চাল। পাখি দুটি মাথা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে চাল দেখছে, তবে সাহস করে এগুচ্ছে না। তাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাদের সাবধান করে দিচ্ছে। বলে দিচ্ছে এই খাঁচার ভেতর না ঢুকতে। একটি চড়ুই পাখির মস্তিষ্কের পরিমাণ কত? খুব বেশি হলে পঞ্চাশ মিলিগ্রাম। মাত্র পঞ্চাশ মিলিগ্রাম মস্তিষ্ক নিয়েও সে বিপদ আঁচ করতে পারে। মানুষ কিন্তু পারে না। সিক্ত্রথ সেক্স মানুষের ক্ষেত্রে তেমন প্রবল নয়।

সারাটা দিন মিসির আলি পাখির পেছনেই কাটালেন। পাখি দু'টির আজ হয়তো কোনো কাজকর্ম নেই। এরা খাঁচার আশেপাশেই রইল, অন্যদিনের মতো চলে গেল না। মিসির আলিও সময় কাটাতে লাগলেন বিছানায় আধশোয়া হয়ে। তিনি এমনভাবে শুয়েছেন, যেন প্রয়োজনে চট করে উঠে খাঁচার দরজা বন্ধ করতে পারেন। মাঝে-মাঝে চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ার ভানও করলেন। পাখি দু'টি তাতে প্রভাবিত হলো না।

সন্ধ্যাবেলা তিনি গেলেন পার্কে। শীতের সময় সন্ধ্যাবেলা পার্কে লোকজন হাওয়া খেতে যায় না। পার্ক থাকে খালি। এই সময় হাঁটতে ভালো লাগে। সন্দেহজনক কিছু

লোকজনকে অবশ্য দেখা যায়। তারা কুটিল চোখে বারবার তাকায়। একবার চাদর গায়ে একজন মধ্যবয়স্ক লোক তাঁর খুব কাছাকাছি এসে গভীর গলায় বলেছিল— সব খবর ভালো ? তিনি তৎক্ষণাৎ বলেছেন, জি, ভালো। লোকটি এক-দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে চলে গিয়েছিল। মিসির আলি পার্কে সেজেগুজে থাকা কিছু মেয়েও দেখেন। সাজ খুবই সামান্য—কড়া লিপটিক, গালে পাউডার এবং রুজ, চোখে কাজল। তারা ঘোরাফেরা করে অন্ধকারে। অন্ধকারে তাদের সাজসজ্জা কারো চোখে পড়ার কথা না। এরা কখনো মিসির আলির কাছে আসে না। তবে তিনি এদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে একধরনের আগ্রহ অনুভব করেন। তিনি ঠিক করে রেখেছেন, এদেব কেউ যদি কখনো তাঁর কাছে আসে, তিনি তাকে নিয়ে পার্কের বেঞ্চিতে বসবেন, তার তীব্র দুঃখ ও বেদনার কথা মন দিয়ে শুনবেন। তাঁর খুব জানতে ইচ্ছা করে— এই মেয়েগুলি জীবনের চব্বতম গ্লানির মুহূর্তগুলি কীভাবে গ্রহণ করেছে। এ সুযোগ এখনো তাঁর হয় নি।

পার্কে তিনি ঘন্টাকানিক হাঁটলেন। কুড়ি মিনিটের মতো তাঁর পরিচিত প্রিয় জায়গায় পা তুলে বসে বইলেন। পার্কটার একটা বড় সমস্যা হলো— গাছগাছালি খুব বেশি, আকাশ দেখা যায় না। তাঁর আজকাল খুব ঘনঘন আকাশ দেখতে ইচ্ছা করে। একটা নির্দিষ্ট বয়সের পব সবারই বোধহয় এরকম হয়— বারবাব আকাশের দিকে দৃষ্টি যায়।

প্রকৃতি মানুষের 'জিনে' অনেক তথ্য ঢুকিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতি মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পাবে না, কিংবা চায় না। তার যা বলার তা সে বলে দিয়েছে, লিখিতভাবেই বলেছে। সেই লেখা আছে 'জিনে'— ডিএনএ এবং আরএনএ অণুতে। মানুষ সেই লেখার বহস্যময়তা জানে, কিন্তু লেখাটা পড়তে পারছে না। একদিন অবশ্যই পারবে।

গাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। মিসিব আলির উঠতে ইচ্ছা করছে না। তিনি অপেক্ষা করছেন মুশফেকুর রহমান নামের লোকটির জন্যে। যদিও তিনি জানেন, সে আজ আসবে না। কারণ মুশফেকুর রহমান জানে, মিসিব আলি গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। বহস্যপ্রিয় মানুষ, নিজেব বহস্য কখনো ভাঙবে না। আবো রহস্য তৈরি করবে। এই লোকটি তখনই তার কাছে আসবে— যখন মিসিব আলি তার জন্যে অপেক্ষা করা বন্ধ করে দেবেন।

লোকটিকে খুঁজে বের করা কি কঠিন ? মিসির আলির কাছে এই মুহূর্তে কাজটা কঠিন বলে মনে হচ্ছে না। বিস্তারিত লোক হলে তাব একটা টেলিফোন থাকার কথা। গাড়ি থাকার কথা। গাড়ি রোজস্ট্রেশন কী নামে হয়েছে তা বের করা কয়েক ঘন্টার ব্যাপার। গাড়ি না থাকলেও তাব টিভি কিংবা বেডিও আছে। এদের জন্যেও লাইসেন্স করতে হয়। ঠিকানা আছে এমন মানুষকে খুঁজে পাওয়া কোনো সমস্যাই নয়। বের করা যায় না শুধু ঠিকানাহীন মানুষদেব।

স্নামালিকুম স্যার।

ওয়ালাইকুম সালাম।

স্যার, আমি মুশফেকুর রহমান। আপনি আজ পার্কে আসবেন ভাবি নি। আমি ভেবেছিলাম আজ আপনি পাখিদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন।

মিসির আলি স্বাভাবিক গলায় বললেন, পাখি দু'টা ধরে পড়ে নি।

ধরা না পড়ারই কথা। খাঁচায় কাঁচা পেইন্টের গন্ধ। এই গন্ধ পাখি সহ্য করতে পারে না। আপনি কয়েক দিন খাঁচাটাকে বাইরে ফেলে রাখুন। রঙের গন্ধ দূর হোক।

মুশফেকুর রহমান মিসির আলির পাশে বসল। মিসির আলি তাকালেন, কিন্তু কিছু দেখতে পেলেন না। জায়গাটা ঘন অন্ধকার। মিসির আলি বললেন, আমি আপনার কথা শোনার জন্যে মানসিকভাবে তৈরি হয়ে এসেছি। শুরু করুন।

গল্প শোনার সময় আপনি কি আমার মুখ দেখতে চান না? অনেকে আবার মুখের দিকে না তাকিয়ে গল্প শুনতে পারে না, আবার বলতেও পারে না।

আপনি কি বলতে পারেন?

তা পারি। আমি আমাব গল্প অন্ধকারেই বলতে চাই। আমার গল্প অন্ধকারের গল্প। কিন্তু স্যার, আপনার কি ঠাণ্ডা লাগছে না?

লাগছে।

আমি একটা চাদর নিয়ে এসেছি। চাদর গাড়িতে রাখা আছে। আমার চাদর ব্যবহার করতে আপনার কি কোনো আপত্তি আছে?

না, আপত্তি নেই।

মুশফেকুর রহমান বেঞ্চ ছেড়ে উঠে গেল। মিসির আলি লক্ষ করলেন সে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটছে। তাব গায়ে চাদর। গায়ে চাদর থাকতেও সে আরেকটি চাদর নিয়ে এলো কী জন্যে? তাঁর জন্যে কি এনেছে? সে কি নিশ্চিত ছিল, মিসির আলি এসে বসে থাকবেন? গল্প শুনতে চাইবেন, এবং সে গল্প শোনাতে শীতের রাতে?

তাই যদি হয়, তাহলে সে শুধু চাদর আনে নি, ফ্লাস্কে করে চা এনেছে। কিছু খাবার এনেছে। মিসির আলি ফাইভ ফিফটি ফাইভ সিগারেট খান। সেই সিগারেটও এক প্যাকেট এনেছে। চাদর যদি তাঁব জন্যে আনা হয়, তাহলে চাদরটি হবে অব্যবহৃত, নতুন।

মুশফেকুর বহমান ফিরে এলো। তার সঙ্গে ফ্লাস্ক। একটা প্যাকেটে পূর্বানী কনফেকশনারির কিছু স্যান্ডউইচ। সে বসতে বসতে বলল, চাদরটি আপনি নিশ্চিত হয়ে গায়ে দিন। এটি যদিও অনেক আগে কেনা, কখনো ব্যবহার করা হয় নি। দু' বছর আগে জয়পুর গিয়েছিলাম, তখন কেনা। রাত বলেই দেখতে পাচ্ছেন না, চাদরবেগ গায়ে বেশমি সুতার কাজ করা আছে। এরা বলে জয়পুরী কাজ। চাদরটা আপনার জন্যে আমাব সামান্য উপহার।

থ্যাংক ইউ। আমার ফাইভ ফিফটি ফাইভ সিগারেট কোথায়?

মুশফেকুর রহমান হাসল। হাসতে-হাসতে বলল, সিগারেটও এনেছি। দেব?

দিন এবং গল্প শুরু করুন।

কোথেকে শুরু করব? প্রথম খুন কীভাবে করলাম, সেখান থেকে?

না, নিজের কথা বলুন। আপনার ছেলেবেলার কথা।

মুশফেকুর রহমান ফ্লাস্কে চা ঢালতে-ঢালতে গল্প শুরু কবল—

আমার ছেলেবেলা মোটেই মজার নয়। গল্প কবে বেড়াবার কিছু নেই। সব মনেও নেই— তবু বলছি।

আমি বড় হয়েছি পুরনো ঢাকায়। অনেকের ধারণা নেই যে পুরনো ঢাকায় অসম্ভব বিস্তারিত বেশকিছু মানুষ থাকেন। বাইরে থেকে তাঁদের অর্থ ও বিস্তারিত পরিমাণ বোঝা

যায় না। আমাদের একেবারেই বোঝা যেত না। জেলখানার মতো উঁচু দেয়াল দেয়া বাড়ি। গেট দিয়ে ঢুকলে ভেতরে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। ফুলের বাগানটাগান নেই। এলোমেলোভাবে কয়েকটা বড়-বড় দেশি ফুলের গাছ। চাঁপা গাছ, শিউলি গাছ, বাড়ির দক্ষিণ দিকে হাসনাহেনার প্রায় জঙ্গলের মতো ঝাড়। এই গাছগুলিতে কখনো ফুল ফোটে না। মাঝে-মাঝে কেটে দেয়া হয়। আবার আপনাতেই গজায়। বাড়ির পেছনে বেশকিছু ফুলের গাছ। একটা আছে কামরাঙা গাছ। এই গাছে কিছু কামরাঙা হয়। অন্যগুলিতে ফল হয় না। একটা পাতকুয়া আছে। মেঝে বাঁধানো। কুয়ার পানি খুব পরিষ্কার, তবে বিশী গন্ধ বলে সেই পানি ব্যবহার করা হয় না। বাড়িটা একতলা, অনেক বড়। মূল বাড়ির উত্তরে কামরাঙা গাছের কাছে চার-কামরার আলাদা একটা দোতলা বাড়ি। নিচে তিন কামরা, উপরে এক কামরা। দোতলাটাকে আমরা বলতাম, উত্তর বাড়ি। দোতলার পুরোটাই বলতে গেলে বারান্দা। ছেলেবেলায় আমার উত্তর বাড়িতে যাওয়া পুরোপুরি নিষেধ ছিল। কারণ উত্তর বাড়িতে থাকতেন বাবা। তিনি বাচ্চাকাচ্চা পছন্দ করতেন না। আমার বাবা পৃথিবীর বেশির ভাগ জিনিসই অপছন্দ করতেন, সবচে' মজার ব্যাপার হলো গাড়ি অপছন্দ করতেন। কারণ গাড়ি স্টার্ট করলে ভটভট শব্দ হয়— যে কারণে আমাদের কোনো গাড়ি ছিল না। আমি স্কুলে যেতাম রিকশায়। আমাকে মাথা কামানো গাট্টাগাট্টা একটা লোক স্কুলে নিয়ে যেতেন। তাঁর নাম ছিল সর্দার। আমি ডাকতাম সর্দার চাচা। তিনি কথায়-কথায় বলতেন— এক টান দিয়া কইলজা ছিড়্যা বাইর কইরা ফেলামু। এমনভাবে বলতেন, যেন তিনি কাজটা এক্ষুণি করবেন।

ধরুন আমরা রিকশা করে যাচ্ছি। অন্য একটা রিকশাব সঙ্গে ধাক্কা লাগল। আমার পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। তিনি চলন্ত রিকশায় উঠে দাঁড়িয়ে বলতেন— এক টান দিয়া কইলজা ছিড়্যা ফেলামু।

সর্দার চাচাকে আমি খুবই পছন্দ করতাম। কিন্তু উনি আমাকে পছন্দ করতেন কি কবতেন না কোনোদিন জানতে পারি নি। সর্দার চাচাকে আমার অপছন্দ করার কোনো কাবণ ছিল না। পছন্দ করতাম, কাবণ আমার আর কেউ ছিল না। বাবার সঙ্গে আমার কোনোবকম যোগাযোগ নেই। মা'র সঙ্গেও নেই। বাবা মা'কে পরিত্যাগ করেছিলেন। মা'ব এই বাড়িতে আসা নিষেধ ছিল।

আমাকে লালনপালন, স্কুলে নিয়ে যাওয়া, স্কুল থেকে আনা সবই সর্দার চাচা কবতেন। আমার জগৎ ছিল স্কুল এবং চার দেয়াল ঘেরা আমাদের বাড়ি। স্কুল আমার ভালো লাগত না। বাড়িও ভালো লাগত না। আমি যখন ক্লাস ফোরে পড়ি তখন স্কুলে যাওয়া আমার বন্ধ হয়ে গেল। কারণ আমার কাছে স্পষ্ট নয়। শুধু শুনলাম— বাবা বলে দিয়েছেন, স্কুলে যেতে হবে না। মাষ্টার এসে আমাকে বাড়িতে পড়াবে। আমাকে স্কুলে যেতে না দেয়ার কারণ আমি তখন যা অনুমান কবেছি তা হচ্ছে— কোনো-একদিন হয়তো স্কুল থেকে আমার মা আমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

মিসির আলি বললেন, এখন আপনার অনুমান কী ?

আমি স্যার আমার অনুমানের কথা আপনাকে বলব না। আমি আমার অনুমানের কথা বলে আপনাকে প্রভাবিত করব না।

বেশ, আপনি বলতে থাকুন।

আমার জীবন কাটতে লাগল বাড়ির পেছনে কুয়োতলায়। বাঁধানো কুয়োতলা আমি চক দিয়ে ছবি ঐকে ভরিয়ে ফেলতাম। সন্ধ্যাবেলা সর্দার চাচা ছবিগুলির দিকে তাকিয়ে বলতেন— ভালো হইছে। সৌন্দর্য হইছে। তারপর কুয়ো থেকে বালতি-বালতি পানি তুলে কুয়োতলা ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখতেন, যাতে পরদিন আমি ছবি আঁকতে পারি।

যে মাষ্টার সাহেব আমাকে পড়াতে এলেন তাঁকে আমার পছন্দ হলো। খুবই পছন্দ হলো। হাসিখুশি। পড়াতেন খুব ভালো। পড়ানোর ফাঁকে-ফাঁকে গল্প করতেন।

মানুষটা খুব রোগা। অনেকখানি লম্বা। অতিরিক্ত লম্বার কারণেই বোধহয় কুঁজে হয়ে থাকতেন। চাইনিজদের মতো তাঁর থুতনিতে দাড়ি ছিল। প্রচুর সিগারেট খেতেন। সস্তা দামের সিগারেট। সিগারেটের কড়া গন্ধে আমার দম বন্ধ হয়ে যেত। বমি আসত। যখন গল্প শুরু করতেন তখন আর কিছু মনে থাকত না। তামাকের গন্ধও পেতাম না।

কী গল্প করতেন ?

নানান ধরনের গল্প। চার্লস ডিকেন্সের অলিভার টুইস্টের পুরো গল্পটা তিনি আমাকে বলেন, কাঁদতে-কাঁদতে আমি এই গল্প শুনি। এত সুন্দর আজ পর্যন্ত আমি কাউকে গল্প বলতে শুনি নি।

অল্প কিছুদিন স্যার আমাকে পড়ালেন। তাবপর তাঁর চাকরি চলে গেল।

কেন ?

আপনাকে পরে বলব। ব্যাখ্যা করে বলব। স্যারের প্রসঙ্গ এখন থাক। যে-কথা বলছিলাম— উনার চাকরি চলে গেলেও উনি কিছু প্রায়ই আসতেন। চুপিচুপি আসতেন, বেছে-বেছে এমন সময় আসতেন যখন বাবা থাকতেন না। গলা নিচু কবে বলতেন, তোমাকে দেখতে আসলাম। ভালো আছ ? তোমার বাবা বাসায় নাই তো ? আমি যদি বলতাম, না। তিনি অসম্ভব আনন্দিত হয়ে তৎক্ষণাৎ সিগারেট ধরাতেন।

একদিন ঠিক দুপুরবেলা এসে গলা নিচু করে বললেন, তন্ময়, বাবা একটা কথা শোন— তোমার মা তোমাকে একটু দেখতে চায়। শুধু একপলক দেখবে। তোমার মা'র খুব শরীর খারাপ। হয়তো বাঁচবে না। তোমাকে খুব দেখার ইচ্ছা। তুমি কি যাবে আমার সঙ্গে ? দুপুরবেলা তো তোমার বাবা বাসায় বেশিক্ষণ থাকেন না। তখন নিয়ে যাব। দেখা করিয়ে আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাব। যাবে ? এই দেখ, তোমার মা একটা চিঠিও দিয়ে দিয়েছেন। চিঠিটা পড়।

আমি চিঠি না পড়েই তৎক্ষণাৎ বললাম, হ্যাঁ।

তিনি চিন্তিত গলায় বললেন, কাউকে কিছু বলবে না। কাউকে কিছু বললে তোমাকে নিতে দেবে না।

আমি কাউকে কিছু বলব না।

আমি তোমাকে নিতে আসব না— বুঝলে ? তুমি করবে কী— দুপুরবেলায় সুযোগ বুঝে গেট দিয়ে বাইরে চলে আসবে। এক দৌড়ে সদর রাস্তায় চলে আসবে। একটা বেবিট্যান্সি স্ট্যান্ড আছে না— ঐখানে আমি থাকব। তুমি আসামাত্র তোমাকে নিয়ে চলে যাব। আসতে পারবে না ?

পারব।

দেখো, কেউ যেন কিছু জানতে না পারে। জানতে পারলে আমার সর্বনশ হয়ে যাবে। তোমার বাবা আমাকে ক্ষমা করবেন না। উনি সেই মানুষই না। আমি একজন দরিদ্র মানুষ...।

আমি যাব।

কবে আসবে ?

আপনি বলুন।

আগামীকাল পারবে ?

হঁ পারব।

উনাকে খুব চিন্তিত মনে হলেও আমি মোটেই চিন্তিত হলাম না। আমার মনে হলো— কেউ কিছু বুঝতে পারার আগেই আমি চলে আসব। তাছাড়া শীতের দুপুরে সর্দার চাচা পাকা বারান্দায় পাটি পেতে রোদে শুয়ে ঘুমায়। বাবা বাসায় থাকেন না। গ্রিনি ফেরেন সন্ধ্যায়। গেটে যে থাকে সেও ঝিমুতে থাকে। এক ফাঁকে ঘর থেকে চলে গেলেই হলো।

তাই করলাম। সবাইকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলাম। গিয়ে দেখি বেবিট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কাছে মাস্টার সাহেব শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতে সিগারেট। তাঁকে দেখে দারুণ চিন্তিত মনে হলো। ভীত চোখে চাবদিকে তাকাচ্ছেন। আমাকে দেখে তাঁর উৎকণ্ঠা আবো বাড়ল। তিনি বললেন, কেউ দেখে নি তো ?

আমি বললাম, না।

তিনি বললেন, চল একটা বেবিট্যাক্সি নিয়ে নি।

উনি যখন বেবিট্যাক্সি দরদাম করছেন তখনই সর্দার চাচা উপস্থিত হলেন। আমাদের দু'জনকেই বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বাবা এগে' সন্ধ্যাবেলা। তিনি আমাকে কিছুই বললেন না, কিন্তু স্যারের শাস্তি ব্যবস্থা কবলেন। সেই শাস্তি ভয়াবহ শাস্তি। একতলার দারোয়ানোর ঘরে দবজা বন্ধ করে মার। সেই ঘরের ভেতর আমিও আছি। বাবা চাচ্ছিলেন যেন শাস্তির ব্যাপারটা আমিও দেখি।

স্যাবকে মাঝি'ল সর্দার চাচা। আমি একটা খাটের উপর দাঁড়িয়ে সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য থবথর করে কাঁপতে কাঁপতে দেখছি। স্যার এক সময় রক্ত-বমি কবতে লাগলেন এবং এক সময় কাতর গলায় বললেন, আমরা জানে মারবেন না। আমার ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে আছে।

সর্দার চাচা হিসহিস কবে বললেন, চুপ। শব্দ কবলে কইলজা টান দিয়া বাইব কইরা ফেলামু। চুপ।

এরপর কী হলো আমার মনে নেই। কারণ, আমার জ্ঞান ছিল না। আমি অজ্ঞান হয়ে বিছানায় পড়ে যাই। জ্ঞান হলে দেখি আমি আমার বিছানায় শুয়ে আছি। সর্দার চাচা আমার মাথায় পানি ঢালছেন।

আমি বললাম, উনি কি মারা গেছেন ?

সর্দার চাচা বললেন, আরে দূর বোকা! মানুষ অত সহজে মরে না। মানুষ মারা বড়ই কঠিন। তারে রিকশায় তুল্যা বাসায় পাঠায়ে দিছি।

রক্তবমি করছিল ?

পেটে আলসার থাকলে অল্প মাইর দিলেই নাকে-মুখে রক্ত ছোটে। ও কিছু না।

উনি তাহলে মরেন নাই ?

না না। আইচ্ছা ঠিক আছে— তোমারে একদিন তাঁর বাসায় নিয়া যাব নে।

আমি উনার বাসায় যাব না।

এইটাই ভালো। কী দরকার ?

সর্দার চাচা আমাকে মিথ্যা কথা বলেছিলেন। স্যারকে ঐ রাতে ভয়ঙ্করভাবে মারা হয়েছিল। অচেতন অবস্থায় তাঁকে গভীর রাতে বাহাদুর শাহ্ পার্কে ফেলে আসা হয়। সেখান থেকে তাঁকে হাসপাতালে নেয়া হয়। তাঁর মৃত্যু হয় হাসপাতালে। মৃত্যুর আগে তাঁর জ্ঞান ফেরে নি। কাজেই তিনি মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কিছু বলে যেতে পারেন নি।

মুশফেকুর রহমান চুপ করল। হাই তুলতে-তুলতে বলল, আজ এই পর্যন্ত থাক। ঠাণ্ডা বেশি লাগছে।

মিসির আলি বললেন, আপনার স্যাবের নাম কী ?

উনার নাম জানি না। খুব অল্পদিন পড়িয়েছিলেন। নাম জানা হয় নি। উনি ছিলেন একজন পেশাদার প্রাইভেট টিউটর। ছাত্র পড়ানো ছাড়া আর কিছু কবতেন না।

উনি আপনাকে কতদিন পড়িয়েছেন ?

সপ্তাহ দুই। কিংবা তাব চেয়েও কম। আমার শৈশবের ঘটনা আপনার কাছে কেমন লাগল ?

মোটামুটি লেগেছে। সাজানো গল্প। যত সুন্দরই হোক সাজানো গল্প ভালো লাগে না।

মুশফেকুর রহমান তীক্ষ্ণ গলায় বলল, সাজানো বলছেন কেন ?

গল্পটা সাজানো মনে করাব পেছনে আমার অনেকগুলি কাবণ মনে আসছে। যে ভদ্রলোক মাত্র দু'সপ্তাহ আপনাকে পড়িয়েছেন তিনি এই সময়ের ভেতর আপনাকে গোপনে নিয়ে আপনার মা'র সঙ্গে দেখা কবিয়ে আনার মতো দুঃসাহসিক পরিকল্পনা হাতে নেবেন, তা বিশ্বাস্য নয়। আমার মনে হয়, ঘটনাটা এরকম— আপনি বাড়ি থেকে পালাচ্ছিলেন। যখন আপনার সর্দার চাচা আপনাকে ধরল তখন শাস্তির হাত থেকে বাঁচার জন্যে মাস্টার সাহেবকে জড়িয়ে গল্প তৈরি করলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময় হয়তো মাস্টার সাহেব সামনে পড়ে গেছেন। যে কারণে আপনাকে আপনার বাবা কোনো শাস্তি দেন নি। আপনার সর্দার চাচা ঐ নিবীহ মানুষটিকে এমন ভয়ঙ্কর শাস্তি কেন দিল তাও পরিষ্কার হচ্ছে না। মাতৃস্নেহ বঞ্চিত একটি শিশুকে মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া কোনো অপরাধ নয়। আর অপরাধ ধরা হলেও মৃত্যুদণ্ড তার শাস্তি হতে পারে না।

মুশফেকুর রহমান সিগারেট ধরাতে-ধবাতে বলল, আমার গল্প আপনার কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না ?

না। কারণ গল্পে ফাঁক আছে।

সুদূর শৈশবের গল্প বলছি। ফাঁক থাকাই তো স্বাভাবিক।

ফাঁকগুলি অনেক বড়।

মুশফেকুর রহমান বলল, স্যার, গুরুত্বই আপনি আমাকে একজন ভয়ঙ্কর মানুষ ধরে নিয়েছেন। আমার কারণেই তা করেছেন। আমি নিজেকে ভয়ঙ্কর মানুষ হিসেবেই আপনার সামনে উপস্থিত করেছি। যে কারণে অতি সামান্য অসামঞ্জস্যও আপনার কাছে অনেক বড় লাগছে। গল্পে ফাঁক আছে বলে যে দাবি আপনি করছেন, আমি সেই ফাঁক সিক ধরতে পারছি না। আমি শুধু বলছি যে— যা ঘটেছে তা আপনাকে আমি বলার চেষ্টা করেছি। স্যার, আপনি একটা ব্যাপার ভুলে যাচ্ছেন। আপনাকে মিথ্যা বলার কোনো প্রয়োজন আমার নেই।

মিসর আলি বললেন, আমাকে সত্যি বলাবও তো প্রয়োজন নেই।

প্রয়োজন আছে। সব ঘটনা আপনাকে ঠিকঠাক মতো জানানো দরকার।

আপনি ঠিকঠাক মতো বলছেন না। কী করে আপনি জানলেন যে মাস্টার সাহেবকে মেরে বাহাদুর শাহ পার্কে ফেলে আসা হয়? যদি ফেলেও আসে আপনাকে কেউ সেই তথ্য দেবে না। ক্লাস ফোরে যে-ছেলেটি উঠেছে, সে পরদিন খবরের কাগজ পড়ে এই তথ্য উদ্ধার করবে তা বিশ্বাস্য নয়। মাস্টার যে মারা গেছে এটিও আপনার জানার কথা না। আপনার সর্দার চাচা কি আপনার কাছে স্বীকার করেছিলেন?

না, স্বীকার করেন নি। তবে পরদিন খুব ভীত ভঙ্গিতে আমাকে বলেছিলেন— বাড়িতে পুলিশ আসতে পারে। পুলিশ এলে আমি যেন বলি— আমি এই মাস্টারকে চিনি না।

পুলিশ কি এসেছিল?

জি এসেছিল, তবে আমার সঙ্গে পুলিশের কোনো কথা হয় নি। বাবার সঙ্গে কথা বলে তারা খুব খুশি মনে চলে যায়।

মাস্টার সাহেব যে বাহাদুর শাহ পার্কে পড়ে ছিলেন এই তথ্য কোথায় পেলেন?

মুশফেকুর রহমান কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। মনে হলো কথাটা বলবে কি বলবে না তা ঠিক কবতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত বলে ফেলল— এই তথ্য আমি মাস্টার সাহেবের কাছ থেকে পেয়েছি।

তার মানে?

যে মাস্টার সাহেবের কথা আপনাকে বললাম, উনি তাঁর মৃত্যুর পর আমার সঙ্গে বাস করতেন।

কী বললেন?

ঐ মৃত ব্যক্তি গত একুশ বছর ধরে আমার সঙ্গে আছেন। তিনি আমাদের বাড়িতে বাস করেন। আমি জানি ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য। হাসকেব। এটা যে বিংশ শতাব্দী তাও আমি জানি। মানুষ চাঁদে নেমেছে, চাঁদের মাটিতে মানুষের পায়ের ছাপ আছে এটি যেমন সত্যি— আমার স্যার আমাদের বাড়িতে বাস করতেন এটিও তেমন সত্যি। আমি চাই আমার ঐ স্যারের সঙ্গে আপনার দেখা হোক, কথা হোক। তিনি আপনার মতোই বুদ্ধিমান। কিংবা কে জানে আপনার চেয়েও হয়তো বুদ্ধিমান। তাঁকে আপনার পছন্দ হবে।

উনি আমাকে চেনেন ?

হ্যাঁ, চেনেন। আমি যে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি তা তিনি জানানেন। তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী।

যে দু'জন খুন হয়েছে, তারা কারা ?

একজন সর্দার চাচা। অন্যজন আমার বাবা।

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। মুশফেকুর রহমান বলল, আপনি কি আমার স্যারের সঙ্গে কথা বলবেন ?

না।

না কেন ?

একজন এসে আমাকে বলবে— তার বাড়িতে একটি প্রেতাছা বাস করছে, সেই প্রেতাছা আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়— আর অমনি আমি কথা বলার জন্যে রওনা হব, তা হয় না। আমি শারীরিকভাবে অসুস্থ, মানসিকভাবে অসুস্থ নই।

আপনি কি কোনো কৌতূহল বোধ করছেন না ?

প্রেতাছা বিষয়ে কোনো কৌতূহল বোধ করছি না। তবে আপনার ব্যাপারে কৌতূহল বোধ করছি। আমার মনে হচ্ছে আপনি খুবই অসুস্থ একজন মানুষ। আপনার মা'র সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। উনি কি জীবিত আছেন ?

জি, জীবিত আছেন। আমি জানতাম আপনি আমার মা'র সঙ্গে কথা বলতে চাইবেন। আমি উনাব ঠিকানা লিখে এনেছি। এই কাগজে লেখা আছে।

মিসির আলি যন্ত্রের মতো ঠিকানা লেখা কাগজ হাতে নিলেন।

8

ভদ্রমহিলার নাম মোমেনা খাতুন।

১৮/২ তল্লাবাগে তাঁর ছোট ভাইয়ের সঙ্গে থাকেন। টেলিফোন নাম্বার দেয়া আছে। মিসির আলি অনেকবার টেলিফোন করলেন। রিং হয় কিন্তু কেউ ধরে না। সেট হয়তো নষ্ট হয়ে আছে। নাম্বার খুঁজে বাড়ি বের করার কাজটা তিনি একেবারেই পারেন না। তিনি জানানেন, তল্লাবাগে উপস্থিত হয়ে যদি বলেন, ১৮/২ বাড়িটা কোথায়, তা হলেও কোনো লাভ হবে না। যাকে জিজ্ঞেস করা হবে সে এমনভাবে তাকাবে, যে, এই নাম্বার শুনে সে বড়ই চমৎকৃত বোধ করছে। এমন অদ্ভুত নাম্বার কোথেকে এসেছে বুঝতে পারছে না। আরেক দল আছে, যারা নাম্বার শুনে বলবে— ও আচ্ছা, আঠারো বাই দুই। নাক বরাবর যান, তারপর লেফটে যাবেন। কাউকে জিজ্ঞেস করলেই বলবে। এরা সবজাতার কাজটা করে কিছু না জেনে। অন্যকে বোকা বানিয়ে আনন্দ পেতে চায়।

এলাকার বাড়িঘরের নাম্বার সম্পর্কে সবচে' ভালো জানে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা, যারা খ্রি-ফোরে পড়ে। মানুষের মতো বাড়ির নাম্বার আছে— এই বিষয়টি তাদের হয়তো আলোড়িত করে। তারা মনে রাখার চেষ্টা করে। বাড়ির নাম্বার নিয়ে বিব্রত মানুষকে সত্যিকার অর্থেই এরা সাহায্য করতে চায়।

এদের একজনের সাহায্য নিয়েই মিসির আলি ১৮/২ তল্লাবাগ খুঁজে বের করলেন। সরু রাস্তার উপর বিরাট বাড়ি। বাড়ির বিশেষত্ব হচ্ছে সবই বড়-বড়। ড্রয়িংরুমে বিশাল আকৃতির সোফা। দেয়ালে কাবা শরিফের প্রকাণ্ড বাঁধাই ছবি। একটি টিভি আছে— একে কত ইঞ্চি টিভি বলে কে জানে? সিনেমার পর্দার মতো বড় স্ক্রিন। শুধু বাড়ির দরজা-জানালা ছোট-ছোট। প্রথম দর্শনেই মিসির আলির মনে হলো— সোফা, টিভি এগুলি এ বাড়িতে ঢোকাল কীভাবে?

ড্রয়িংরুমে বেশকিছু লোকজন। গাদাগাদি করে সোফায় বসে আছে। বাড়িতে কোনো উৎসব হয়তো। সবাই সেজেগুজে আছে। অল্পবয়সী বালিকারাও ঠোঁটে লিপস্টিক দিয়ে গালে রুজ মেখে সেজেছে। সবাইকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে।

মিসির আলির মনে হলো, মোমেনা খাতুন নামের এই বৃদ্ধা মহিলার প্রতি কারো কোনো কৌতূহল নেই, আগ্রহও নেই। একজন অপরিচিত ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন শুনেও কেউ কোনো গা করছে না। মধ্যবয়স্ক এক লোক বিরস মুখে বললেন, বসুন, দেখছি।

বলেই তিনি কর্ডলেস টেলিফোনে কাকে যেন ধমকাতে লাগলেন। লোকটার পরনে হালকা কমলা রঙের সুট। গলায় ছোট-ছোট ফুল আঁকা টাই— তবে তাঁর প্যান্টের জিপার খোলা। সবাই তা দেখছে, কেউ কিছু বলছে না। মনে হয় বলাব সাহস পাচ্ছে না।

মিসির আলি সোফায় বসে রইলেন একা-একা। আঠারো-উনিশ বছরের একটা মেয়ে ঝড়ের গতিতে বসার ঘরে ঢুকে মিসির আলিকে বলল, আপনি কি কার রেন্টাল থেকে এসেছেন? এত দেরি যে? বলেই জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করে ভেতরে চলে গেল। উঁচু গলায় বলল, বাস চলে এসেছে মা।

বোঝা যাচ্ছে এরা দল বেঁধে কোথাও যাচ্ছে। পিকনিক হবার সম্ভাবনা। শীতকালের শুক্রবারে পিকনিক লেগেই থাকে। পিকনিক হলে মোমেনা খাতুনের দলটির সঙ্গে যাবার কথা। ইচ্ছা না থাকলেও বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের পিকনিকে নিয়ে যেতে হয়। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও জীবনের শেষ দিকে এসে পিকনিকজাতীয় ব্যাপারে খুব আগ্রহী হয়ে পড়েন।

টেলিফোন হাতে ভদ্রলোক কথা বলেই যাচ্ছেন, বলেই যাচ্ছেন এবং একটি কথাই ঘুবিয়ে-ফিরিয়ে কিছুক্ষণ পরপর বলছেন। এক সময় লাইন কেটে গেল কিংবা ওপাশের ভদ্রলোক লাইন ছেড়ে দিলেন। ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে টেলিফোন সেটটার দিকে তাকাচ্ছেন। এই সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। মিসির আলি আবার বললেন, আমি একটু মোমেনা খাতুনের সঙ্গে কথা বলব।

আপনাকে অপেক্ষা করতে বললাম না? ব্যস্ততাটা তো দেখতে পাচ্ছেন। না-কি পাচ্ছেন না? সবাই গায়ে-হলুদে যাচ্ছে।

কিছু মনে করবেন না। আপনার প্যান্টের জিপার খোলা।

ভদ্রলোক এমনভাবে মিসির আলির দিকে তাকালেন যেন মিসির আলি নিজেই জিপার খুলেছেন। মিসির আলি বললেন, উনি আছেন তো?

হ্যাঁ, আছেন। কিছুক্ষণ ওয়েট করুন। ভিড় কমুক, তারপর আপনাকে আন্টিব কাছে নিয়ে যাব। জাস্ট দেখা দিয়ে চলে যাবেন। বেশিক্ষণ বিরক্ত করবেন না। কখনো

পুরোপুরি নিষেধ। আন্টির আবার বেশি কথা বলার অভ্যাস। কথা বলে-বলে রোগ বাড়ছে।

বোঝা যাচ্ছে ভদ্রমহিলা অসুস্থ। সম্ভবত হাসপাতালে ছিলেন। সম্প্রতি বাসায় আনা হয়েছে। অনেকেই তাঁকে দেখতে আসছে বলেই মিসির আলিকে এ বাড়ির সবাই স্বাভাবিকভাবে নিয়েছে।

ঘণ্টাখানিক বসে থাকার পর একজন কাজের মেয়ে এসে বলল, ভিতরে আসেন, জুতা খুইল্যা আসেন।

লম্বা বারান্দা পার হয়ে মিসির আলি ছোট একটা ঘরে ঢুকলেন। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ। মেঝে মনে হয় ডেটল দিয়ে ধুয়েছে। ঘরময় ডেটলের গন্ধ। ঘবেব অর্ধেকটা জুড়ে খাট পাতা। মিসির আলি ভেবেছিলেন বৃদ্ধা এক মহিলাকে শুয়ে থাকতে দেখবেন তা দেখলেন না। মোমেনা খাতুন একদিকের দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছেন। তাঁর চোখে চশমা। গায়ের রঙ ধবধবে শাদা। গায়েব কাপড়টিও শাদা, মাথার চুল শাদা। যে-বিছানায় বসেছেন সেই বিছানার চাদরটাও শাদা। সব মিলে সুন্দর একটি ছবি।

মিসির আলি বললেন, আপনি কেমন আছেন ?

ভদ্রমহিলা স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, জি ভালো।

ভদ্রমহিলার কান ঠিক আছে। কথাও জড়ানো নয়, তবে চোখের দৃষ্টির সম্ভবত কিছু সমস্যা আছে। তিনি তাকিয়ে আছেন অন্যদিকে।

আপনি অসুস্থ জানতাম না। অসুস্থ জানলে আসতাম না।

আমি ভালো আছি। বাথরুমে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলাম। হাসপাতালে নিয়ে গেল। ডাক্তাররা বলল, কিছু হয় নাই।

আমি খানিকক্ষণ আপনার সঙ্গে কথা বলব— যদি আপনার আপত্তি না থাকে। আমার পরিচয় আপনাকে দেয়া দরকার। আমার নাম মিসির আলি। আমি...

আপনার পরিচয় দিতে হবে না। আমার ছেলে তার ম্যানেজারকে পাঠিয়েছিল, সে বলেছে আপনি আসবেন।

আপনার ছেলে আপনাকে দেখতে আসে না ?

না, আসে না। এর আগে একবার জরায়ুব টিউমার অপারেশন হয়েছিল— তিন মাস ছিলাম হাসপাতালে। খবর পেয়েও দেখতে এলো না। মরেও যেতে পারতাম। আমি তো তার মা। বলুন আপনি— আমি তাব মা না ?

অবশ্যই আপনি মা। বেশি কথা বলা বোধহয় আপনার নিষেধ। আমি ববং এক কাজ করি— এমনভাবে প্রশ্ন করি যেন হ্যাঁ না বলে জবাব দেয়া যায়।

কথা বলা নিষেধ— এটা আপনাকে কে বলল ? কোনো নিষেধ না। ডাক্তার এমন কিছু বলে নাই। এইসব কথা এই বাড়ির লোকজন বানিয়েছে...। যেই আসে তাকে বলে— কথা বলা নিষেধ। যাক, বাদ দিন। কী যেন বলছিলাম...

আপনি বলছিলেন— আগে একবার আপনার জরায়ুর টিউমার অপারেশন হয়েছিল, তিন মাস হাসপাতালে ছিলেন। আপনার ছেলে খবর পেয়েও আপনাকে দেখতে আসে নি। আপনি আমার কাছে জানতে চাচ্ছিলেন— আপনি তার মা কিনা।

মোমেনা খাতুন মিসির আলির কথায় হুটচিটে বললেন, হ্যাঁ, ঠিক কথা। আমি তো তার মা। সন্তান পেটে ধরেছি। সে-ই আমাকে আমার স্বামী বাড়ি থেকে বের করে দিল। আমার স্বামী সন্ধ্যারাত্রিতে আমাকে এসে বলল— মোমেনা, বাইরে রিকশা আছে। যাও, রিকশায় উঠ। তার রাগ বেশ। ভয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না। সেই যে রিকশায় উঠলাম— উঠলামই। ঐ বাড়িতে আর ঢুকতে পারলাম না। এখন আমি পড়ে আছি আমার ভাইয়ের বাড়িতে। আমি তো থাকতে পারতাম আমার ছেলের সঙ্গে। পারতাম না ?

জি, পাবতেন।

তার উর্চত ছিল না আমাকে তার বাড়িতে রাখা ? আমি তার মা। আমি কেন অন্যের বাড়িতে থাকব ?

জি, তা তো বটেই। তন্মায়ের বাবার মৃত্যুর পর আপনি ঐ বাড়িতে গিয়ে উঠলেন না কেন ?

কেমন করে উঠব। তখন আমার ভাইয়া জোর করে আমার বিয়ে দিয়েছে। লোকটা রেল চাকরি করত। ছোট চাকরি। তবে মানুষ খারাপ ছিল না। সে মারা গেছে কাঁকড়া-বিছান কামড়ে। কাঁকড়া-বিছান কামড়ে মানুষ মারা যায় এমন কথা আগে কখনো শুনেছেন ? শুনে নাই। এটা হলো আমার কপাল...। লোকটা রেলের গুদামঘরে ঢুকেছে। টিন না কী যেন সরাজে— এমন সময় হাতে কামড় দিল। চিৎকার দিয়ে উঠল, সাপ সাপ। সে ভেবেছিল সাপ। লোকজন দৌড়ে এসে দেখে কাঁকড়া-বিছা। কেউ কোনো গুরুত্ব দিল না। কামড়ের জায়গায় চুন মাখিয়ে দিল। রাতে লোকটার জ্বর আসল। খুব জ্বর। আমাকে ডেকে তুলে বলল, মোমেনা, বড় পানির পিয়াস লেগেছে। পানি দাও। আমি বাতি জ্বালিয়ে দিখি— হাত ফুলে ঢোলা হয়েছে। গা আগুনের মতো গরম। আমি বললাম, ডাক্তার ডাক। সে বলল, ভোর হোক। এত রাতে ডাক্তার কোথায় পাবে ? সেই ভাব আপ ভাব দেখা হলো না।

মিসির আলি ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করতেন। ভদ্রমহিলা কথা বলেই যাচ্ছেন। মৃত্যুর বর্ণনা। মৃত্যুর পরের অবস্থার বর্ণনা। কোনোকিছুই বাদ দিলেন না। একবার কিছুক্ষণের জন্যে থামতেই মিসির আলি বললেন, আপনার ঐ পক্ষের কোনো ছেলেমেয়ে নেই ?

থাকবে না কেন, আছে দুই মেয়ে। একজনকে ম্যাট্রিক পাশের সঙ্গে-সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলাম। ও এখন আছে কুমিল্লায়। আমার অসুখের খবর পেয়ে দেখতে এসেছিল। একা এসেছিল, জামাই আসতে পারে নি। ছুটি পায় নি। ছোট মেয়ের বিয়ে হয়েছে গত বছর। নানান কাণ্ড কবে মেয়ে নিজেই দিয়ে করল। ভদ্রসমাজে তা বলা যায় না। বড়ই লজ্জার ব্যাপার। অথচ এঁ মেয়েটাই ভালো ছিল। খুব নরম স্বভাবের মেয়ে। রাতে একা ঘুমাতে পাবত না।...

ভদ্রমহিলা ছোট মেয়ের ঘটনাও পুর্বোটা বর্ণনা করলেন। দাড়ি কমা কিছুই বাদ দিলেন না। মিসির আলি বললেন, আপনার ছেলে তন্মায় সম্পর্কে বলুন। আপনার কাছে ওর কথাই শুনে এসেছি।

ওর কথা আমি কী বলব ? ওকে কি আমি দেখেছি ? শুধু পেটেই ধরেছি। ও যখন কথা বলা শিখল তখন তার বাবা আমাকে দূর করে দিল। সন্ধ্যাবেলা আমার ঘবে এসে বলল, মোমেনা, রিকশায় উঠ।

রিকশায় ওঠার ব্যাপারটা আপনি আগে একবার বলেছেন।

একবার বললে আবারো বলা যায়। দুঃখের কথা বারবার বললে দুঃখ কমে। সুখের কথা বারবার বললে সুখ বাড়ে। এই জন্যে দুঃখের কথা, সুখের কথা দুটাই বারবার বলতে হয়।

আপনার স্বামী আপনাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন কেন ?

সেটা আমি আপনাকে বলব না। সেটা লজ্জার ইতিহাস। আপনি অনুমানে বুঝে নেন। লোকটা পাগল ধরনের ছিল। ছেলেও হয়েছে বাপের মতো। বাপ যদি হয় ছয় আনা, ছেলে হয়েছে দশ আনা।

এই কথা কেন বলছেন ?

কেন বলব না ? একশ'বার বলব। আমার ছেলের মুখের উপর বলব। অবস্থা বিবেচনা করেন। অবস্থা বিবেচনা করলে আপনিও বলবেন। তন্মায়ের তখন বাবা মারা গেছে। সে বলতে গেলে দুধেব শিশু। আমার বিবাহ হয়েছে। আমি চলে গেছি জামালপুর। এই অবস্থায় তন্মায়কে মানুষ করেছে তাদের ম্যানেজার। নিজের সন্তানের মতো মানুষ করেছে। তার সঙ্গে আমার ছেলে কী ব্যবহারটাই করল! সন্ধ্যাবেলা বাড়ি থেকে বের করে দিল। আমাকে যেমন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি থেকে বেব কবে দিল— তাদেরকেও বের করে দিল। ম্যানেজার, আর তার মেয়ে। মেয়েটা বি.এ পড়ে। কী সুন্দর পরীর মতো মেয়ে!

ঐ মেয়েকে আপনি দেখেছেন ?

জি-না দেখি নি। লোকমুখে শোনা। আমার সবই লোকমুখে শোনা।

ওঁরা কি আপনার ছেলের বাড়িতে থাকতেন ?

হ্যাঁ।

কেন বের কবে দিলেন কিছু জানেন ?

কিছুই জানি না। ছেলে শুধু বলেছে— সে এখন থেকে একা থাকতে চায়। মানুষ তাব ভালো লাগে না। কয়েকটা কুকুর নাকি পুষছে। কুকুর নিয়ে থাকে।

ম্যানেজার সাহেব এখন কোথায় থাকেন ?

জানি না কোথায় থাকেন। তবে চাকরি করে না। চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।

আপনার ছেলে এখন ঐ বাড়িতে একাই থাকে ?

কিছুক্ষণ আগে কী বললাম— কতগুলি কুকুর পালে। আগে দারোয়ান ছিল। কাজের লোক ছিল। একে একে সবাই চলে গেছে। এখন শুনি— একলাই থাকে।

চাকরি ছেড়ে চলে গেছে কেন ?

জানি না কেন। সম্ভবত কুকুরের ভয়ে। দৈত্যের মতো একেকটা কুকুর। এখন আপনি বলেন— জীবন বড়, না চাকরি বড় ?

আপনার স্বামী কীভাবে মারা গিয়েছিলেন ?

একটু আগে তো বলেছি— কাঁকড়া-বিছার কামড়ে মারা গেছে। রেলের গুদামে ঢুকেছে...

আপনার প্রথম স্বামীর মৃত্যুর কথা জিজ্ঞেস করছি।

অপঘাতে মৃত্যু। দোতলার সিঁড়ি থেকে পিছলে পড়ে মরে গেল। সিঁড়ি থেকে পড়ে কেউ মরে ? আপনি বলেন। হাত-পা ভাঙে— কিন্তু মরবে কেন ?

মিসির আলির মনে হলো একে কিছু জিজ্ঞেস করা অর্থহীন। অসুখবিসুখ, দুঃখ-কষ্ট এই মহিলাকে পর্যুদস্ত করেছে। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত হতাশার কথাই বলবেন। তাঁর চিন্তা-চেতনা নিজেকে নিয়েই। ইনি কথা বলতে পছন্দ করেন। যারা কথা বলতে পছন্দ করে তারা অধিকাংশ সময়ই অর্থহীন কথা বলে। কথা বলে আরাম পায় বলেই কথা বলা। সেসব কথার অধিকাংশই হয় বানানো। মিসির আলি যা জানতে চান তা ইনি হয়তো বলতে পারবেন না। তবু চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া—

আপনার ছেলের অসুখের কথা কি মনে আছে ? ছোটবেলায় কী অসুখ হয়েছিল ?

কেন মনে থাকবে না ? মনে আছে। কালাজ্বর হয়েছিল। এখন আপনি বলুন— আপনি কি শুনেছেন কারো কালাজ্বর হয় ? শোনেন নি। কারণ কারোর হয় না। এটা হলো আমার কপাল— যে জিনিস কানোর হবে না আমার কপালে সেটা থাকবে। কালাজ্বরে ব্রহ্মচারী ইনজেকশন দিতে হয়। সেই ইনজেকশন পাওয়া যায় না। উল্টাপাল্টা চিকিৎসা। সেই চিকিৎসায় কী হলো দেখেন। জিহ্বা কালো হয়ে গেল। দেখলে ভয় লাগে। ভয় হয় যে কারো সঙ্গে কথা বলে না— এই জন্যেই বলে না। একা-একা থাকে। আপনাকে বল নাখলাম, সে বিয়েও করতে পারবে না। কে বিয়ে করবে এই ছেলেকে ? একবার হা করলে মেয়ে দৌড়ে পালাবে। আমি হলাম মা। আমিই ভয় পেতাম। মুখের দিকে তাকাতাম না। এইবার তার ম্যানেজারকে আমি বলেছি— তোমার সাহেবকে বলো, কত নতুন-নতুন চিকিৎসা বের হয়েছে, এই রোগের চিকিৎসা করাক আগে। তোমার সাহেবের তে টাকা-পয়সা আছে। বিলাত কি আমেরিকা গিয়ে চিকিৎসা যেন করে।

ওঁনার কি অনেক টাকা-পয়সা ?

এক সময় ছিল। এখন নাই। তার বাবার টাকা-পয়সা ছিল। নানান ব্যবসাপাতি ছিল। টঙ্গিতে চামচাব কারখানা ছিল। নারায়ণগঞ্জে ছিল সুতার মিল। শেষে মতিভ্রমও হলো। সব বিক্রি কবে দিল। তন্ময়ই কিছুই নাই। কারখানা সব বিক্রি কবে দিয়েছে। ওয়ারীতে একটা দোতলা বাড়ি আছে। বাড়িটার ভাড়া পায়। এখন শুনছি সেই বাড়িও বিক্রি কবে দেবে।

কোথায় শুনলেন ? সে বলেছে ?

না, সে বলে নাই। এইসব কথা সে বলে না। লোকমুখে শুনি।

তন্ময় কি আপনাকে হাত খরচের টাকা দেয় ?

তা দেয়। মাসের প্রথমে, এক-দুই তারিখে ওর নতুন ম্যানেজার টাকা নিয়ে আসে। ম্যানেজারের নাম রশিদ মোল্লা। আমার হাতে দিয়ে বলে— আশ্চা, এই কাগজটায় সই করে, টাকা শুনে রাখেন। আমি বলি, বাবা, সই করার দরকার কী ? সে বলে, দরকার আছে, আশ্চা, সই কবেন। ম্যানেজার আমাকে খুব সম্মান করে। আশ্চা ডাকে।

রশিদ মোল্লার কাছ থেকেই কি শুনেছেন যে ওয়ারীর বাড়ি বিক্রি হচ্ছে ?

জি।

উনি কোথায় থাকেন ? আপনার ছেলের সঙ্গে ?

না না। কী বললাম আপনাকে ? তন্য তার বাড়িতে কাউকে রাখে না। সে থাকে, দুইটা দারোয়ান থাকে আর বাড়ি ভর্তি কুকুর। আমি তাকে বললাম, বাবা, এত কুকুর কেন ? কুকুর প্রাণীটা ভালো না। তুমি বিড়াল পোষ। বিড়াল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দেখতেও সুন্দর। আমাদের নবিজিও বিড়াল পছন্দ করতেন। তা সে আমার কথা শোনে না। কেন শুনবে ? আমি কে ? কুকুরগুলো সারারাত বাড়ির চারদিকে ছোট্টাছুটি করে। মাঝে-মাঝে একসঙ্গে ডাকে। বড়ই ভয়ঙ্কর।

ভয়ঙ্কর কী করে বলছেন ? আপনি তো ঐ বাড়িতে যানও নি। কুকুরের ডাকও শোনে নি।

রশিদের কাছে শুনলাম। প্রতি মাসে আসে। গল্পটগল করে। যাবার সময় পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে। ম্যানেজার বলল, আশ্চর্য, বড় ভয়ঙ্কর অবস্থা। নয়টা কুকুর। সারারাত বাড়ির চারদিকে ঘোরে। ভয়ঙ্কর স্বরে একসঙ্গে ডাকে। গায়ের রক্ত পানি হয়ে যায়।

রশিদ সাহেব কোথায় থাকেন, আপনি ঠিকানা জানেন ?

কাগজে লেখা আছে। টেলিফোন নাম্বার দেওয়া আছে। সে আমাকে বলল, দরকারে-অদরকারে ডাকবেন, আমি চলে আসব। যত রাতই হোক, খবর পেলে চলে আসব। পরের ছেলে এই কথা বলে, কিন্তু নিজের ছেলে কিছু বলে না। খোঁজও নেয় না। এই ছেলে দিনের বেলা ঘর থেকে বের হয় না। সে ঘর থেকে বের হয় সন্ধ্যার পর।

মিসির আলি ম্যানেজারের ঠিকানা নিলেন। উঠবার সময় বললেন, আমি যে আপনাকে এত কথা জিজ্ঞেস করছি— কেন করছি জানতে চান না ?

না। জেনে কী হবে ? তার উপর তন্য খবর দিয়েছে— আপনার কাছে একজন ভদ্রলোক আসবেন। তাঁর নাম মিসির আলি। উনি আপনাকে অনেক প্রশ্ন করবেন। সব প্রশ্নের জবাব দেবেন। কোনোকিছুই গোপন করবেন না। যা আপনি জানেন তাই শুধু বলবেন। যা জানেন না তা বলবেন না। নিজে অনুমান কবে যদি কিছু বলেন তাহলে সেটাও উনাকে জানাবেন। বলবেন— এটা আমার অনুমান।

আপনাকে ধন্যবাদ। আজ তাহলে উঠি ?

আপনি কি আবার আসবেন ?

জি-না। আর আসব না।

আপনাকে চা পানি কিছুই দিতে পাবলাম না। ঘরে অবশিষ্টা নোক আছে। থাকলে কী হবে— এদের কিছু বললে বিরক্ত হয়। সেদিন জইতরীর মাকে বললাম— পিয়াস লাগছে, লেবু দিয়ে এক গ্লাস সরবত দাও। জইতরীর মা বলল, পাবব না। চুলা বন্ধ। দেখেন অবস্থা! সরবত বানাতে চুলা লাগে ? আবেক দিন কী হয়েছে শোনে—

আজ যাই। আমার একটা কাজ ছিল।

একটু বসেন না। কথা বলার লোক পাই না। কাউকে যে সুখ-দুঃখের একটা কথা বলব সে উপায় নাই। নিজের ভাইয়ের বাসা, এরা এমন ভাব করে যেন আমাকে দয়া করে আশ্রয় দিয়েছে। অথচ নগদ পয়সা দিয়ে থাকি। মাসের প্রথমে গুনে-গুনে দুই

হাজার টাকা দেই। আমার পিছনে কি দুই হাজার টাকা খরচ হয়— আপনি বলেন ? কী খাই আমি ? দুই বেলায় এক পোয়া চালের ভাতও খাই না। মাসে সাত সের চালের ভাতও খাই না। সাত সের চালের দাম কত ? ধরেন নব্বুই। মাছ তরকারি ধরেন তিনশ’— বেশিই ধরলাম। এত খাই না। রাতে এক কাপ দুধ খাই। দুধের দাম কত ধরবেন ? একশ’ ধরেন। এখন পনেরো টাকা লিটার। তাহলে কত হলো ? চারশ’। আচ্ছা পাঁচশ’ই ধরলাম। ঘরটার ভাড়া ধরলাম পাঁচশ’। হলো এক হাজার। তারপরেও বাড়তি দেই এক হাজার। দাঁড়িয়ে আছেন কেন ? বসুন।

মিসব আলি বসলেন। ভদ্রমহিলা গলা নিচু করে বললেন, তন্ময় আমাকে মাসে পাঁচ হাজার দেয়। ওরা সেটা জানে না। জানলে উপায় আছে ? ওরা জানে মাসে দুই হাজার পাই— সবটাই ওদের দিয়ে দেই। তবে আমার ভাইয়ের বউ সন্দেহ করে। আমি যখন হাসপাতালে ছিলাম, তখন আমাব ট্রাংকের তালা খুলে দেখেছে। অতি খারাপ মেয়েছেলে। মুখে মধু। হাসি ছাড়া কথা বলে না।

আজ উঠি ?

আহা, বসেন না! একটু বসেন।

মিসর আলি আনো এক ঘণ্টা বসলেন। বের হয়ে এলেন প্রচণ্ড মাথাব যন্ত্রণা নিয়ে।

ঘর থেকে বেরবার পর মনে পড়ল একটি জরুরি কথা জিজ্ঞেস করা হয় নি। উনি কি মাস্টার সাহেবকে দিয়ে কোনো চিঠি পাঠিয়েছিলেন ? জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে না। কারণ জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ নেই। ভদ্রমহিলা বলবেন না। তিনি কিছু গোপন জিনিস জানেন। এগুলি আড়াল করবাব জন্যেই এত অপ্রাসঙ্গিক কথা বলছেন। এত দীর্ঘ সময় কথা বলে একটি মাত্র জিনিস জানা গেল— নিজের ছেলের প্রসঙ্গে ভদ্রমহিলার কোনো আগ্রহ নেই।

তাবচে’ বরং রশিদ মোল্লাব কাছে যাওয়া যাক।

৫

বশিদ মোল্লার বয়স পঞ্চাশের। ছাঁকাখি।

মোটাসোটা মানুষ। শরীরেব তুলনায় মাথা ছোট। ধূর্ত চোখ। চোখ দেখেই মনে হয়— পৃথিবীর কাউকে তিনি বিশ্বাস করেন না। সম্ভবত নিজেকেও করেন না। কলিৎবেল টেপাব পব ভদ্রলোক নিজেই দবজা খুলে দিলেন। তবে হাত দিয়ে দরজা ধরে থাকলেন। মনে হচ্ছে তিনি চান না যবে কেউ ঢুকুক।

মিসর আলি বললেন, আপনি কি রশিদ মোল্লা ?

জি।

একটু কথা ছিল আপনার সঙ্গে।

বলুন।

দরজায় দাঁড়িয়ে তো কথা বলা যাবে না। বসতে হবে। মিনিট দশেক সময় আমি নেব।

এখন আমি নাতনিকে পড়াচ্ছি। ওর এসএসসি পরীক্ষা।

আমি না হয় অপেক্ষা করি। নাতনির পড়া শেষ করে আসুন।

রশিদ মোল্লা বিরস মুখে দবজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন। বসার ঘর ছোট হলেও সুন্দর করে সাজানো। সবচে' যা আশ্চর্যের ব্যাপার তা হচ্ছে— ফুলদানি ভর্তি টাটকা গোলাপ। মনে হচ্ছে এইমাত্র গাছ থেকে ছিঁড়ে আনা হয়েছে।

রশিদ মোল্লা বিরক্ত গলায় বললেন, কী বলবেন বলুন। আপনার নাম কী? কোথেকে এসেছেন?

আমার নাম মিসির আলি।

রশিদ মোল্লা চমকালেন না। এই নাম আগে শুনেছেন তেমন কোনো লক্ষণও দেখালেন না। অথচ তাঁর নাম এই লোক শুনেছেন। তাঁর খবর দিয়ে এসেছেন মুশফেকুর রহমানের মা'র কাছে।

বশিদ মোল্লা কঠিন গলায় বললেন, আমার কাছে কী ব্যাপার?

কয়েকটা ব্যাপার জানতে চাচ্ছিলাম। ইচ্ছা হলে জবাব দেবেন। ইচ্ছা না হলে জবাব দেবেন না।

আপনি কে, কেন প্রশ্ন করছেন তা তো বলবেন। আপনি কি পুলিশের লোক?

জি-না।

প্রশ্নটা কী?

মুশফেকুর রহমানের ম্যানেজার হিসেবে আপনি কত দিন ধবে কাজ করছেন?

তা দিয়ে আপনার দবকার কী?

আমার জানা দরকার।

আপনার দরকার কেন?

আমি একটা বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান করছি।

কী বিষয়?

মুশফেকুর রহমান প্রতি মাসে আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দেন তাঁর মা'কে দেয়াব জন্যে। তাঁর মা দু'হাজার টাকা রাখেন। আমার ধারণা— বাকি তিন হাজার টাকা তিনি জমা রাখেন আপনার কাছে। বছরে হয় ছত্রিশ হাজার টাকা। দশ বছরে হবে তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা। আপনি কত দিন ধরে টাকা দিচ্ছেন?

আপনাকে কে পাঠিয়েছে?

কেউ পাঠায় নি। নিজেই এসেছি। আমি যে আপনার কাছে একেবারেই অপরিচিত, তাও কিন্তু না। আপনার স্যার নিশ্চয়ই আমার কথা আপনাকে বলেছেন। কতদিন ধবে আপনি টাকা দিচ্ছেন?

আমার মনে নাই।

আপনি তো রসিদ রাখেন। পুরনো রসিদ কি আপনার কাছে আছে, নাকি অফিসে জমা দিয়েছেন?

রশিদ মোল্লা ক্লান্ত গলায় বললেন, স্যার, আপনি বসুন।

মিসিৰ আলি বসলেন। বশিদ মোল্লা বললেন, চায়েৰ কথা বলে আসি। আপনি চা খান তো ?

খাই।

ভদ্রলোক চায়েৰ কথা বলে মিসিৰ আলিৰ সামনে বসলেন। তাঁৰ চোখে ভীত ভাব। মনে হ'ল্ছে অসম্ভব ভয় পেয়েছেন। এতটা ভয় পাবাৰ কাৰণও মিসিৰ আলিৰ কাছে স্পষ্ট নয়।

বশিদ সাহেব।

জি ?

ঐ মহিলাৰ কত টাকা আপনাৰ কাছে আছে তা নিয়ে আমাৰ মাথাব্যথা নেই। আমি অন্য কিছু আপনাৰ কাছ থেকে জানতে চাই। যা জানতে চাই দয়া কৰে বলবেন। মিথ্যা বলাৰ চেষ্টা কৰবেন না। কাৰণ থাক, কাৰণটা এখন আপনাকে না বললেও চলবে।

কী জানতে চান, স্যাব ?

মুশফেকুব বহমান সাহেব সম্পকে বলুন।

কী বলব ?

যা জানেন বলুন উনি লোক কেমন ?

খুবই ভালো লোক। এটা আমাৰ একাৰ কথা না – যাকে ইচ্ছা আপনি জিজ্ঞেস কৰুন। যাকে জিজ্ঞেস কৰবেন সে-ই বলবে। উনাৰ জিহ্বাৰ একটা সমস্যা আছে। তাকে নিয়ে এই জন্যে লোকজন নানা আজোবাজে কথা ছড়ায়।

কী ধৰনেৰ আজোবাজে কথা ?

যেমন ধৰেন উনাৰ মাথা খাবাপ— এইসব আৰু কী।

আপনাৰ ধারণা উনাৰ মাথা ঠিক আছে ?

অবশ্যই ঠিক আছে।

আমি তো শুনেছি— উনি বিবাট এক বাড়িতে একা থাকেন।

একা থাকলেই তো মানুষ পাণ্ডল হয়ে যায় না স্যাব। বিয়েৰ আগে আমিও একা থাকতাম।

উনি শুধু যে একা থাকেন তাই না, ন'টা ভয়ঙ্কৰ কুকুব পোষেন। এটা কি ঠিক ?

জি, ঠিক। উনাৰ বাবা পুষতেন, এইজন্যে উনিও পুষেন। কুকুব পোষা তো স্যাব অপবাদ না।

বাড়িতে দাবোয়ান, মালী, কাজেৰ লোক কেউই নেই ?

জি না।

উনি কি নিজেই বেঁধে খান ?

জানি না স্যাব। কখনো জিজ্ঞেস কৰি নি।

আপনি কি ঐ বাড়িতে কোনো মহিলা দেখেছেন ?

আমি ঐ বাড়িতে কখনো যাই নি।

মিসির আলি খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে আন্দাজে ঢিল ছুড়লেন, স্বাভাবিক গলায় বললেন— রূপবতী একটি মেয়ে যে মুশফেকুর রহমান সাহেবের কাছে মাঝে-মধ্যে আসে, তার নাম কী ?

রশিদ মোল্লা দৃঢ় গলায় বললেন, উনার কাছে কোনো মহিলা কখনো আসে না স্যার ।

আপনি কি নিশ্চিত ?

জি স্যাব ।

মিসির আলি বললেন, আগের ম্যানেজাব সাহেবের মেয়ের নাম কী ?

স্যাব, আমি জানি না ।

মেয়েটি দেখতে কেমন ?

উনাকে আমি কোনোদিন দেখি নাই । কী করে বলব দেখতে কেমন ?

কোনোদিন দেখেন নি, তা হলে মুশফেকুর রহমানের মা'কে কী করে বললেন, খুব সুন্দর মেয়ে ?

রশিদ মোল্লা হতভয় গলায় বলল, স্যার, আপনি কি আইবি-র লোক ?

মিসির আলি হাসলেন । হ্যাঁ-না কিছু বললেন না । লক্ষ করলেন, রশিদ মোল্লা ভীত ভয়ে অস্থির হয়ে গেছেন । চা এসেছে । তিনি চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে মুখ পুড়িয়ে ফেলেছেন । কিছুটা চা ছলকে তাঁর শার্টে পড়েছে ।

আগের ম্যানেজার সাহেব কোথায় থাকেন আপনি জানেন ?

জি-না, স্যার, জানি না । বিশ্বাস করুন জানি না । আমার কথা বিশ্বাস না করলে আমি কোরান শরিফে হাত দিয়ে বলতে পারি ।

আপনার কথা বিশ্বাস করছি । আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন ?

ভয় পাচ্ছি না তো! কেন শুধু শুধু ভয় পাব! আমি কোনো পাপ করলে ভয় পেতাম । আমি কোনো পাপ করি নি ।

কোনো পাপ করেন নি ?

ছোটখাট পাপ করেছি । সে তো স্যার সবাই করে । মানুষমাত্রই পাপ করে ।

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললেন, মেয়েটার সঙ্গে শেষ করে আপনার কথা হয় ?

রশিদ মোল্লা ভয়ঙ্কর চমকে উঠে বললেন, আমার সঙ্গে কোনো কথা হয় নি ।

মিসির আলি কিছু বললেন না । নিঃশব্দে সিগারেট টানতে লাগলেন । রশিদ মোল্লা রীতিমতো ঘামতে শুরু করলেন ।

রশিদ সাহেব ।

জি স্যার ?

আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই । আপনি সত্য গোপন করে ভয়ের কারণ ঘটাতে পারেন । কী কথা হলো মেয়েটার সঙ্গে ?

আমার সঙ্গে স্যার কোনো কথা হয় নি। একবারই আমি উনাকে দেখেছি। তাও বছরখানিক আগে। অফিসে আসলেন। পরিচয় দিলেন। আমি খাতির করে বসলাম। তখন লক্ষ করলাম খুবই সুন্দর মেয়ে। উনি বললেন, স্যারের সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন। আমি বললাম, স্যারের সঙ্গে কথা হবে না। উনি কারোর সঙ্গে কথা বলেন না। যা বলার আমাকে বলতে হবে। উনি তখন স্যারের একটা চিঠি দেখালেন। স্যার চিঠি লিখে উনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি এই কথা স্যারকে বললাম। স্যার খুবই অবাক হলেন। স্যাব বললেন, চিঠিটা নিয়ে এস, মেয়েটাকে বলো চলে যেতে।

আপনি তাই করলেন ?

তাই করলাম। তবে মেয়ে স্যার চিঠি দিল না। চিঠি নিয়েই চলে গেল। খুব কাঁদছিল। আমার স্যার এমন মায়া লাগল!

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। হালকা গলায় বললেন, উঠি। রশিদ মোল্লা তাঁকে বাড়ির গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন। মিসির আলি বললেন, আমি আপনাকে আর কোনো প্রশ্ন করব না। আপনি নিজ থেকে যদি কিছু বলতে চান— বলতে পারেন।

রশিদ মোল্লা প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, আমি আপনাকে যা বললাম, এর বেশি আমি কিছুই জানি না। বিশ্বাস করুন। কোবান শরিফে হাত দিয়ে বলতে বললে আমি কোরান শরিফে হাত দিয়ে বলব।

আপনি তা হলে আব কিছু বলতে চান না ?

জি-না।

আব একটিমাত্র প্রশ্ন— আপনার বসাব ঘরে টাটকা গোলাপ ফুল দেখলাম— আপনার গাছের গোলাপ ?

জি স্যাব। আমার মেয়ের টবে হয়েছে। এই গোলাপগুলির নাম তাজমহল। স্যার দাঁড়ান, আপনার জন্যে কয়েকটা ফুল নিয়ে আসি।

মিসিব আলি গোলাপের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

৬

বাড়ি ফিবে মিসির আলি দেখলেন, খাঁচায় দু'টি চডুই পাখি। বদু পাখির খাঁচার সামনে বাসে মুঞ্চ হয়ে পাখি দেখছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে এর আগে সে চডুই পাখি দেখে নি, এই প্রথম দেখছে এবং পাখির সৌন্দর্যে সে অভিভূত। মিসিব আলি গায়ের কোট খুলতে-খুলতে বললেন, কেউ এসেছিল ?

জে-না।

মিসিব আলি আশাহত হলেন। তিনি ভেবেছিলেন, মুশফেকুর রহমান হয়তো এসেছিল। চডুই পাখি দুটিকে সে-ই খাঁচায় ঢোকার ব্যবস্থা করেছে। এখন বোঝা যাচ্ছে, এই জটিল কাণ্ডটি করেছে বদু। খাঁচা এবং চডুই পাখির প্রতি বদুর এই অতি আগ্রহের কারণ এখন পরিষ্কার হলো।

পাখি দুইটা আপনে-আপনে হান্ধাইছে।

তাই নাকি ?

হ। আমি ঘর বাঁট দিতেছিলাম, দেখি ভিতরে বইয়া কুটুরকুটুর চায়। আমি দৌড় দিয়া ঝপাং কইরা খাঁচার দরজা বন্ধ করলাম।

গুড।

বাটিত কইরা পানি দিলাম। পানি খাইছে। চুমুক দিয়া খাইছে।

আচ্ছা।

মিসির আলি পাখি দু'টির প্রতি তেমন আগ্রহ বোধ করছেন না। তিনি হাত-মুখ ধুয়ে বিছানায় গেলেন। কয়েকটা জরুরি বিষয় লিখে ফেলা দরকার। বদু বলল, ভাত দিমু স্যার ?

দাও।

বদু ভাত বাড়তে গেল না। উবু হয়ে খাঁচার সামনে বসে রইল। মিসির আলি নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলেন, পাখি দু'টি যদি বদু নিজে খাঁচায় না ঢোকাত, তা হলে কি সে এতটা আগ্রহ বোধ করত ? মুরগি ডিম পেড়ে চেষ্টায়ে পাড়া মাথায় তোলে। যেসব মুরগি ডিম পাড়ার দৃশ্য দেখে, তারা চূপ করে থাকে। সম্ভবত বিরক্তই হয়।

মিসির আলি খাতায় বড়-বড় করে লিখলেন— মুশফেকুর রহমান। এটি হচ্ছে শিরোনাম। শিরোনাম বড় করেই লিখতে হয়। মূল অংশ থাকে ছোট হরফে লেখা। তিনি দ্রুত লিখতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে অবাক হয়ে দেখলেন তিনি যা লিখেছেন তা হচ্ছে—

মুশফেকুর রহমান

মুশফেকুর রহমান। মুশফেকুর রহমান। মুশফেকুর রহমান।

মুশফেকুর রহমান মুশফেকুর রহমান। মুশফেকুর রহমান।

মুশফেকুর রহমান মুশফেকুর রহমান...

মিসির আলি নিজের লেখার দিকে খুবই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। ব্যাপার বুঝতে পারছেন না। তাঁর নিজের চিন্তা-ভাবনা কি এলোমেলো হয়ে গেছে ? এরকম কাণ্ড তো আগে কখনো ঘটে নি। তিনি বড় ধবনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। তবে এ-জাতীয় সমস্যার মুখোমুখি তো তিনি আগেও হয়েছেন, কখনো এমন বিচলিত বোধ করেনি। এবার করছেন কেন ?

মুশফেকুর রহমান নামের মানুষটি তাঁকে কি ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে ? মানুষটি কি একজন মানসিক রোগী ? নাকি সে ভান করছে ? সে মানসিক রোগী হলে সমস্যা সহজ, সে যদি ভান করে তাহলে সমস্যা মোটেই সহজ নয়।

লোকটি তার কাছে কী চাচ্ছে তাও স্পষ্ট নয়। গুরুত্রে সে বলেছে— সে একটি প্রেমের গল্প শোনাতে চায়। এখনো প্রেমের গল্পের অংশে আসা হয় নি। প্রেমের গল্পটি ভালোভাবে শোনা দরকার।

আগের ম্যানেজার সাহেবের মেয়ে ব্যাপারটিকে জটিল করে তুলেছে। তৃতীয় যে খুনটির কথা বলা হচ্ছে তার সঙ্গে কি এই মেয়েটি যুক্ত ? হবার সম্ভাবনাই বেশি। মুশফেকুর রহমানের পরিচিত লোকের সংখ্যা সীমাবদ্ধ। এই মেয়ে তার পরিচিতদের

একজন। তবে যাকে হত্যা করা হবে, তাকে কি কেউ চিঠি দিয়ে ডেকে আনবে ? তাও অফিসে ? এত বড় ভুল কি মুশফেকুর রহমান করবে ? করার কথা নয়।

তবে ভয়ঙ্কর বুদ্ধিমান কিছু মানুষও মাঝে-মাঝে হাস্যকর বোকামি করে বসে। নিউ ইংল্যান্ডে জনি ম্যান নামের এক সাইকোপ্যাথের গল্প— ক্রিমিনোলজির বিখ্যাত গল্পের একটি। সে অসম্ভব ধূর্ততার সঙ্গে এগারোটি খুন করল। নিখুঁত পরিকল্পনা, নিখুঁত কাজ। পুলিশের মাথা-খারাপ হয়ে যাবার জোগাড়। কিন্তু বার নাশ্বার খুনটি সে করল নিতান্ত বোকার মতো। যে-মেয়েটিকে খুন করবে, তাকে এক পার্টি থেকে বের করে আনল। বের করে আনার আগে মেয়েটির সঙ্গে নাচল। ছবি তুলল। রাস্তায় এসে আইসক্রিমের দোকানে আইনক্রিম খেল। খুনের আধ ঘণ্টার মধ্যে সে ধরা পড়ল। পুলিশ যখন তাকে জিজ্ঞেস করল, এত বড় বোকামি তুমি কী করে করলে ? সে হাই তুলতে তুলতে বলল, আমার ধারণা ছিল শেষ খুনটি আমি খুব বুদ্ধি খাটিয়ে করেছি। আগের কাজগুলি ছিল বোকাব মতো।

এরকম কোনো ব্যাপার তো মুশফেকুর রহমানের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে।

আচ্ছা, তিনি নিজেও কি খুব বোকার মতো একটা কাজ করেন নি ? তাঁর কি উচিত ছিল না ম্যানেজারের কাছ থেকে রানুর ঠিকানা নিয়ে আসা ? ম্যানেজার নিশ্চয়ই জানে। রানুর ঠিকানা ছাড়াও মুশফেকুর রহমানের টেলিফোন নাশ্বার আনা দরকার ছিল। এখন চলে গেলে কেমন হয় ? বশিদ মোল্লাকে হকচকিয়ে দেয়ার জন্যেও গভীর রাতে তার বাসায় উপস্থিত হওয়া দরকার।

স্যার, ভাত দিচ্ছি।

মিসির আলি বিছানা থেকে নামতে-নামতে বললেন, ভাত পরে খাব রে বদু। আমি একটা কাজ সেবে আসি।

কই যাইবেন ?

একটা কাজ সেরে আসি। খুব জরুরি।

ভাত খাইয়া যান। ভাত খাইতে কয় মিনিট লাগব।

এসে খাব।

মিসির আলি রশিদ মোল্লার শাসায় বাত সাড়ে এগারোটায় উপস্থিত হলেন। এত দেরি হবার কারণ, তিনি বাসা ভুলে গেছেন। দু'ঘণ্টা আগে যে-বাড়িতে এসেছেন, সেই বাড়ির ঠিকানা ভুলে যাওয়া একটা বিশ্বয়কর ঘটনা। এই বিশ্বয়কর ঘটনাই তাঁর জীবনে ঘটল।

বশিদ মোল্লা বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। কলিংবেল শুনে দরজা খুললেন। আঁতকে উঠে শুকনো গলায় বললেন, কী ব্যাপার স্যার ?

মিসির আলি কোমল গলায় বললেন, ভালো আছেন ?

রশিদ মোল্লা এই সামাজিক সৌজন্যমূলক প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তাকিয়ে রইলেন। মিসির আলি বললেন, আপনার বাসায় কি টেলিফোন আছে ?

জি, আছে।

একটা টেলিফোন করব।

আসুন, ভেতরে আসুন। বসুন আপনি। টেলিফোন সেটটা শোবার ঘরে। আমি নিয়ে আসছি।

রশিদ মোল্লার সঙ্গে-সঙ্গে তার পরিবারের অন্য সবাইও জেগে উঠেছে। অল্পবয়েসী একটি মেয়ে পর্দার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে গেল। মনে হচ্ছে— এই মেয়েটিই গোলাপের চাষ করে। তিনি রশিদ মোল্লাকে হকচকিয়ে দিতে এসে পরিবারের সবাইকে হকচকিয়ে দিয়েছেন।

নিন স্যার, টেলিফোন করুন। কত নাম্বারে করবেন?

মিসির আলি বললেন, আপনি নাম্বারটা বলুন।

রশিদ মোল্লা বললেন, কী নাম্বারের কথা বলছেন?

মুশফেকুর রহমানের টেলিফোন নাম্বারটা বলুন। নিশ্চয়ই তাঁর বাড়িতে টেলিফোন আছে। আপনি তার নাম্বারও জানেন।

এখন টেলিফোন করে লাভ হবে না স্যাব। উনি এখন টেলিফোন ধরবেন না। সন্ধ্যার পর উনি টেলিফোন ধরেন না।

তবু চেষ্টা করে দেখি। নাম্বারটা বলুন।

উনি যদি জানেন আমি নাম্বার দিয়েছি, তা হলে খুব রাগ করবেন।

উনি জানবেন না।

রশিদ মোল্লা শুকনো গলায় নাম্বার বললেন, দু'বাব বিং হতেই ওপাশ থেকে টেলিফোন ওঠানো হলো। কেউ কোনো কথা বলছে না। মিসির আলি কুকুরের ক্রুদ্ধ গর্জন শুনতে পাচ্ছেন। কেউ-একজন খুব হালকাভাবে টেলিফোন সেটের উপর নিঃশ্বাস ফেলল। মিসির আলি বললেন, হ্যালো!

ওপাশ থেকে কেউ ভারী গম্ভীর গলায় বলল, মিসিব আলি সাহেব?

জি।

আপনার টেলিফোন কলেব জনোই অপেক্ষা কবছিলাম।

গলার স্বর সম্পূর্ণ অচেনা। শুদ্ধ ভাষায় কেউ কথা বলছে— কিন্তু এব মध्येই গ্রাম্য টান আছে। পুরুষকণ্ঠ, তবে এই কণ্ঠের সঙ্গে মুশফেকুর বহমানের কণ্ঠস্বরের কোনো মিল নেই। গলার স্বর মানুষ বদলাতে পারে, কিন্তু এতটা পারে না। মিসির আলি বললেন, আপনি কে বলছেন?

আমাকে আপনি চিনবেন না। আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় হয় নি। আমি তন্ময়ের টিচার ছিলাম। ওকে অন্ধ শেখাতাম। তন্ময় সম্ভবত আমার কথা বলেছে আপনাকে।

হ্যাঁ, বলেছে।

শুনুন মিসির আলি সাহেব, আমি আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি। কবে আসবেন?

বুঝতে পারছি না কবে আসব। প্রেতাত্মাদের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। ভালোও লাগে না।

ভালো লাগে না, কী করে বললেন ? আগে কি কখনো প্রেতাত্মার সঙ্গে কথা বলেছেন ?

আপনার সঙ্গে বলছি।

বাহু, আপনি মানুষ হিসেবেও তো রসিক। একবার আসুন। আসবেন ?

আসতেও পারি।

দেরি না করে চলে আসুন। আজ বাতেই চলে আসুন।

আপনার বাড়ির ঠিকানা কী ?

রশিদ মোল্লাকে জিজ্ঞেস করুন। ও আপনাকে ঠিকানা বলে দেবে। আপনি ওর বাসা থেকেই তো টেলিফোন করছেন। তাই না ?

জি।

কিংবা এক কাজ করতে পারেন। ওকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসতে পারেন। ও দারুণ ভীতু। ওকে একটা ধমক দিলেই ও আপনার সঙ্গে আসবে এবং দূর থেকে বাসা দেখিয়ে দেবে। কাছে আসবে না। সন্ধ্যার পর বাসার কাছে আসতে সে ভয় পায়।

আজ আসতে পারছি না। তবে হয়তো শিগগিরই আসব।

শুনুন মিসব আলি সাহেব, আজ আসাই ভালো। জোছনা রাত আছে। জোছনা আপনাব ভালো লাগে নিশ্চয়ই।

ভালো লাগে না। জোছনা অনেক বহস্য তৈরি করে। রহস্য আমি পছন্দ করি না বলেই দিনেও আলো জোছনাব চেয়ে বেশি ভালো লাগে।

বহস্য আপনি পছন্দ করেন না ?

জি-না।

এই জন্যই আপনাব সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছি। চলে আসুন।

আসব আসব, এত ব্যস্ত হবেন না।

আমি মোটেই ব্যস্ত নই। আপনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন এই জন্যই বলছি। ও, আরেকটা কথা আগের ম্যানেজার মেয়েটির ঠিকানা রশিদ মোল্লা জানে না। বের করার চেষ্টা করেছে। পাবে নি। তবে আমি আপনাকে ঠিকানা দিতে পারি। ওরা নাবায়ণগঞ্জে থাকে। আপনার কাছে কি কাগজ-কলম আছে ? থাকলে লিখে নিন...

মিসর আলি বললেন, থাক, ঠিকানাব প্রয়োজন নেই।

আমি যে এতকিছু জানি আপনি কি এতে অবাক হচ্ছেন না ?

আমি এত সহজে অবাক হই না। আপনাব নাম তো জানা হলো না ?

দেখা হলেই নাম বলব। এত তাড়া কীসেব ?

মিসর আলি টেলিফোন নামিয়ে রেখে রশিদ মোল্লাকে বললেন, চলি রশিদ সাহেব। অনেক রাতে আপনাকে বিরক্ত করছি। কিছু মনে কববেন না।

রশিদ মোল্লা কিছু বললেন না। জবুথবু হয়ে বসে রইলেন। এই শীতের রাতেও তাঁর কপালে ঘাম। তিনি খুব ভয় পেয়েছেন।

আগের বার রশিদ মোল্লা গेट পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছিলেন। এবার এলেন না। দরজা বন্ধ করতেও উঠলেন না। রশিদ মোল্লার মেয়েটি দরজা বন্ধ করার জন্যে উঠে এসেছে। সে খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে মিসির আলির দিকে। তার বাবার মতো মেয়েটিও ভয় পেয়েছে।

অসম্ভব ঠাণ্ডা পড়েছে। বৃদ্ধি করে মাফলার এনেছেন বলে রক্ষা। মাফলার ভেদ করে শীতল হাওয়া ঢুকছে। নাক জ্বালা করা শুরু হয়েছে। ঠাণ্ডা মনে হয় লেগে যাবে। নিউমোনিয়ায় না ধরলে হয়। শরীর দুর্বল। শরীরের রোগ-প্রতিরোধক্ষমতা পুরোপুরি গেছে। ছোট অসুখই দেখতে-দেখতে ভয়াবহ হয়ে যায়।

আজকের রাতের ঘটনায় তিনি তেমন বিস্মিত বোধ করছেন না। বড় ধরনের রহস্যময় ঘটনায় তিনি তেমন বিস্মিত হন না। ছোটখাট ঘটনাগুলি বরং তাঁকে অনেক বেশি অভিভূত করে। একবার এক রিকশাওয়ালার সঙ্গে ছ'টাকা ভাড়া ঠিক করে রিকশায় উঠলেন। নামার সময় তাকে একটা পাঁচ টাকা এবং একটা দু'টাকার নোট দিলেন। দু'টাকার নোটটা ছিল পাঁচ টাকার নোটের ভেতর। রিকশাওয়ালার তা দেখার কোনো সুযোগ ছিল না। সে টাকাটা নিয়ে পকেটে রেখে দিল এবং লুঙ্গির খুঁট থেকে একটা এক টাকার নোট ফেরত দিল। মিসির আলি বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। একবার ভাবলেন, রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করেন, সে কী করে বুঝল পাঁচ টাকার নোটের ভাঁজে একটা দু'টাকার নোট আছে? তিনি শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেন নি। থাক না কিছু রহস্য। সব রহস্য ভেঙে দেয়ার দরকার কী?

পৃথিবীতে কিছু কিছু রহস্য আছে, যা ভাঙতে ইচ্ছা করে, আবার কিছু রহস্য আছে, ভাঙতে ইচ্ছা করে না। তন্ময় নামের ছেলেটির রহস্য ভেদ করার ইচ্ছা তাঁর আছে। ব্যাপারটা খুব সহজ হবে কিনা তা তিনি এখনো জানেন না।

রশিদ মোল্লার বাসা থেকে তিনি টেলিফোন করলেন। অন্য একজন ধরল। তা ধরতেই পারে। হয়তো তন্ময়ের বাড়িতে আরো একজন থাকে। যে নিজেকে পরিচয় দিচ্ছে মাস্টার সাহেব হিসেবে। সে চট করে বলে দিল, আপনি রশিদ মোল্লার বাড়ি থেকে টেলিফোন করছেন? আপাতদৃষ্টিতে খুব আশ্চর্যজনক ঘটনা মনে হলেও হয়তো তেমন আশ্চর্যজনক নয়। রশিদ মোল্লাই আগেভাগে জানিয়েছে। মিসির আলি অপেক্ষা করছিলেন—রশিদ মোল্লা টেলিফোন সেট আনতে গেল। চট করে আনল না। দেরি হলো। এই ফাঁকে রশিদ মোল্লা হয়তো জানিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া ঐ লোকটি প্রাণপণ চেষ্টা করছিল মিসির আলিকে বিস্মিত করতে। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল, 'আমি যে এতকিছু জানি আপনি এতে অবাক হচ্ছেন না?' একজন প্রেতাত্মা মানুষকে বিস্মিত করার এত চেষ্টা করবে না। মানুষই করবে। তন্ময়ের মৃত শিক্ষক টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে কথা বলবে, এই হাস্যকর ধারণা নিয়ে মাথা ঘামাবার মানুষ মিসির আলি নন। তিনি মাথা ঘামাচ্ছেন না। তবে চিন্তিত বোধ করছেন। কেন চিন্তিত বোধ করছেন তাও তাঁর কাছে স্পষ্ট নয়।

তিনি বিপদ আঁচ করছেন। তাঁর মনের একটি অংশ ভয় পাচ্ছে। ভয় পাবার পেছনের কারণটি তাঁর কাছে স্পষ্ট নয়। শুধু যে ভয় পাচ্ছেন তা না—পূরে ব্যাপারটা

তাঁর মনের উপর একধরনের চাপ সৃষ্টি করেছে। কে যেন খুব অস্পষ্টভাবে তাঁকে বলছে— তুমি সরে এসো। তুমি দূরে সরে এসো।

টুং-টুং ঘণ্টা বাজিয়ে রিকশা আসছে। ভিড়ের সময় রিকশাওয়ালারা কখনো ঘণ্টা বাজায় না। ফাঁকা রাস্তা বলেই হয়তো ঘণ্টা বাজিয়ে-বাজিয়ে আসছে। এই রিকশা ভাড়া যাবে বলে মনে হয় না। যাচ্ছে উল্টো দিকে। তবু মিসির আলি বললেন, ভাড়া যাবে ?

মিসির আলিকে বিস্মিত করে দিয়ে রিকশাওয়ালা বলল, যামু। এই শীতের রাইতে খামাখা রিকশা বাইর করছি ? টাইট হইয়া বহেন। পঞ্জীরাজের মতো লইয়া যামু।

মিসির আলি টাইট হয়ে বসলেন। এই রিকশায় বসাই তাঁর কাল হলো। রিকশাওয়ালা ঝড়ের মতো উড়িয়ে নিয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু ক্ষতি যা করাব করে ফেলল। ভয়াবহ ঠাণ্ডা লেগে গেল। মিসির আলি ঘরে ঢুকেই বিছানায় পড়লেন। প্রবল জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। বুক পাথরের মতো ভারী, শ্বাস নিতে পারেন না। আচ্ছন্নের মতো মাঝে-মাঝে তাকান, তখন মনে হয়, মাথার উপর সিলিং ফ্যানটা তাঁর কাছে নেমে আসছে। এক সময় মনে হলো, ফ্যানের রেড ঘুরতে শুরু করেছে। ঠাণ্ডা বাতাস এসে গায়ে লাগছে। হেলুসিনেশন। তাঁর হেলুসিনেশন হচ্ছে। তিনি বুঝতে পাবেন বদু তাঁর মাথায় পানি ঢালছে। সেই পানি তাঁর কাছে উষ্ণ মনে হয়। বদু কি তাঁর মাথায় ফুটন্ত পানি ঢালছে ? বিছানার এক পাশে চড়ুই পাখির খাঁচা। খাঁচার ভেতর পাখি দুটিকে ঘুঘু পাখির মতো বড় দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে তারাও একদৃষ্টিতে মিসির আলিকে দেখছে। শেষবাতের দিকে তিনি অচেতনের মতো হয়ে গেলেন। জ্বরের প্রচণ্ড ঘোর, আধো-চেতন আধো-জাগ্রত অবস্থায় তিনি নীলুকে দেখলেন।

নীলু যেন এসেছে তাঁর কাছে। বসেছে বিছানার পাশে। কী স্পষ্টই না তাকে দেখাচ্ছে। কানেব দু'পাশের চুল যে বাতাসে কাঁপছে তাও দেখা যাচ্ছে। নীলু বলল, আবাব অসুখ বাঁধিয়েছেন ? মিসির আলি হাসার চেষ্টা করলেন।

আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন ?

হঁ।

বলুন আমি কে ?

নীলু।

কতদিন পর আপনাকে দেখতে এলাম বলুন তো ?

তুমি আমাকে দেখতে আস নি। সবই আমার কল্পনা। প্রচণ্ড জ্বরের জন্যে আমি একধরনের ঘোরের মধ্যে আছি। ঘোরের কারণে মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণে সঞ্চিত স্মৃতি ওলটপালট হয়েছে। সে তোমাকে তৈরি করেছে। বাস্তবে তোমার অস্তিত্ব নেই। আমি হাত বাড়ালে তোমাকে ছুঁয়ে দেখতে পারব না।

এখনো লজিক ?

হ্যাঁ, এখনো লজিক।

দেখুন ন, একটু হাত বাড়িয়ে আমাকে ছুঁতে পারেন কিনা।

পারছি না নীলু। আমার হাত-পা পাথরের মতো ভারী হয়ে এসেছে।

আমি কেন এসেছি বলুন তো ?

আমাকে সঙ্গ দেবার জন্যে এসেছ। কেউ যখন ভয়ঙ্কর অসুস্থ হয় তখন তার চারপাশের জগতও শূন্য হয়ে পড়ে। তার মস্তিষ্ক তখন তার জন্যে একজন সঙ্গী তৈরি করে।

আপনার লজিক ঠিক আছে। আপনি অসুস্থ নন।

তুমি চলে যাও নীলু। আমি কথা বলতে পারছি না। আমার কথা বলতে ভালো লাগছে না।

অমি চলে যেতে পারছি না। আমি তো নিজ থেকে আসি নি— আপনি আমাকে এনেছেন।

ঘোরের মধ্যে মিসির আলি ছটফট করতে লাগলেন। নীলু তাঁর দিকে ঝুঁকে এলো। মিসির আলি অস্বস্তি বোধ করছেন। মেয়েটা এত কাছে এগিয়ে আসছে কেন? এটা ঠিক হচ্ছে না। নীলু এখন ফিসফিস করে বলল, আমি আপনাকে সাবধান করতে এসেছি। আপনি ভয়াবহ বিপদের দিকে যাচ্ছেন। পুরনো ঢাকার ঐ বাড়িতে আপনি কখনো যাবেন না। মাস্টার সাহেবের সঙ্গে আপনার দেখা না করলেও চলবে। প্লিজ, আপনি আমার কথা শুনুন।

মিসির আলির জ্বর আরো বাড়ল। মনে হচ্ছে মাথার ভেতরে একটা রেলগাড়ি চলছে। চাকার ঘর্ষের শব্দ হচ্ছে। সেই শব্দ বারবার বলছে— আপনি আমার কথা শুনুন। আপনি আমার কথা শুনুন।

৭

মিসির আলির জ্ঞান কতদিন পর ফিবল, তা তিনি জানেন না। চোখ মেলে দেখলেন প্রশস্ত একটি ঘরে তিনি শুয়ে আছেন। বিছানা অপরিচ্ছন্ন। চারপাশের পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন। পায়ের কাছে মস্ত কাচের জানালা। জানালা বন্ধ। কাচের ভেতর দিয়ে রোদ এসে তাঁর পায়ের পড়েছে। খুব আরাম লাগছে। তাঁর গায়ে সুন্দর একটা কম্বল। কম্বল থেকে ওষুধের গন্ধ আসছে। তিনি প্রচণ্ড ক্ষুধাও বোধ করছেন। মনে হচ্ছে দীর্ঘদিন কিছু খাচ্ছেন না। মিসির আলি চোখ বন্ধ করলেন। ঘরে প্রচুর আলো। এত কড়া আলোতে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না।

কেমন আছেন মিসির আলি সাহেব?

জি, ভালো।

আপনার জ্বর পুরোপুরি বেমিশন হয়েছে। আপনি আমাদের ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।

মিসির আলি চোখ খুললেন। আলো এখন আর আগের মতো চোখে লাগছে না। তাঁর বিছানার পাশে যে-মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি একজন ডাক্তার। গলায় স্টেথিসকোপ ঝোলানো দেখে তাই মনে হয়। নার্সরাও স্টেথিসকোপ ব্যবহার করে, তবে তারা কখনো গলায় পরে না।

মিসির আলি বললেন, আমি প্রচণ্ড খিদে বোধ করছি।

আপনি খিদে বোধ করছেন। এটা খুবই সুলক্ষণ। হালকা কিছু খাবার দিতে বলছি।

এটা কি হাসপাতাল ?

হাসপাতাল তো বটেই। তবে প্রাইভেট হাসপাতাল।

আমি কতদিন ধরে আছি ?

আজ হচ্ছে ফিফথ ডে। আপনার অবস্থা এমন ছিল যে আমরা ধরেই নিয়েছিলাম আপনি 'কমা'য় চলে যাচ্ছেন।

মিসির আলি সহজ গলায় বললেন, কমা-সেমিকোলনে আমি যাব না। যদি যেতে হয় সরাসরি ফুলস্টপে চলে যাব।

ডাক্তার হাসলেন। মিসির আলির মনে হলো বেশির ভাগ ডাক্তার হাসেন না। তবে যারা হাসেন, তাঁরা খুব সুন্দর করে হাসেন।

মিসির আলি সাহেব।

জি ?

আপনি বিশ্রাম করুন। চোখ বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে থাকুন। আমি আপনার খাবারের ব্যবস্থা করছি।

আজকেব একটা খবরের কাগজ কি পেতে পারি ?

অবশ্যই পেতে পারেন। তবে আমার মনে হয় খবরের কাগজ পড়ার চেয়ে বিশ্রাম আপনার জন্যে অনেক জরুরি। নাশতা খেয়ে লম্বা একটা ঘুম দিন। চোখ বন্ধ করে ফেলুন।

মিসিব আলি চোখ বন্ধ করলেন। তাঁর অনেক কিছু জানাব ছিল। কে তাঁকে এমন এক আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিল ? ঘরের যা সাজসজ্জা, তাতে মনে হয় হাজার খানিক টাকা হবে দৈনিক ভাড়া। দেয়ালে ছোট্ট বার ইঞ্চি টিভি দেখা যাচ্ছে। বোগীব বিনোদনের ব্যবস্থা। ঘরের দেয়াল, মেঝে সবই ঝকঝক করছে। কোথাও কোনো ঘড়ি নেই। টিভির চেয়েও ঘড়ির প্রয়োজন ছিল বেশি। কোনো-এক বিচিত্র কাবণে অসুস্থ হলেই ঘড়ি দেখতে ইচ্ছে করে।

নার্স নাশতা নিয়ে এলো। এক স্লাইস রুটি। ডিম পোচ, একটা কমলা। গরম এক কাপ চা।

মিসির আলি বললেন, সিগারেট কি খাওয়া যাবে সিষ্টার ?

না, সিগারেট খাওয়া যাবে না। এটা হাসপাতাল, ধূমপানমুক্ত এলাকা।

গবম চায়ের সঙ্গে একটা সিগারেট খেতে পারলে, আমার অসুখ পুরোপুরি সেবে যেত বলে আমার ধারণা।

এখানকার ডাক্তারদের সেরকম ধারণা না। কাজেই সিগারেট খেতে পাবেন না। নাশতা খেয়ে নিন। আপনার গা আমি স্পঞ্জ করে দেব।

এই রুমটা ব ভাড়া কত ?

প্রতিদিন পনের শ' টাকা।

মিসির আলির মুখ শুকিয়ে গেল। তিন হাজার টাকায় তিনি এবং বড় সারা মাস চালান। তার মধ্যে বাড়িভাড়া ধরা আছে।

নার্স কঠিন মুখ করে বলল, বড়লোকদের চিকিৎসার খুব ভালো ব্যবস্থা বাংলাদেশে আছে।

মিসির আলি বললেন, অবশ্যই আছে। তবে মজার ব্যাপার কী জানেন সিস্টার— এত করেও বড়লোকরা কিন্তু মৃত্যুর হাত থেকে বেহাই পান না। গরিবরা যেভাবে মরে তাদেরও ঠিক একইভাবে মরতে হয়।

এখন হয়, একদিন হয়তো হবে না। দেখা যাবে অমর হবার ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে। ত্রিশ লক্ষ চল্লিশ লক্ষ টাকা দাম। শুধু বড়লোকেরা সেই ওষুধ কিনতে পারছে।

মিসিব আলি তার গোছানো কথায় চমৎকৃত হলেন। অধিকাংশ মানুষই আজকাল গুছিয়ে কথা বলতে পারে না। চিন্তা এলোমেলো থাকে বলে কথাবার্তাও থাকে এলোমেলো।

সিস্টার, আপনার সঙ্গে খুব জরুরি কিছু কথা আছে। আমি আপনার পবামর্শ ও সাহায্য চাচ্ছি। আমার পক্ষে প্রতিদিন পনের শ' টাকা ভাড়া দিয়ে এখানে থাকা সম্ভব নয়। আমি দরিদ্র মানুষ। এ ক'দিনের ভাড়া কী করে দেব তাই বুঝতে পারছি না। আমি আজই এখান থেকে বিদেয় হতে চাই। সেটা কী করে সম্ভব তা আপনি দয়া করে বলে দেবেন। যে-টাকা আপনারা পান, তাও একসঙ্গে আমাব পক্ষে দেয়া সম্ভব না। আমাকে ভাগে-ভাগে দিতে হবে। তার একটা অ্যাবেঞ্জমেন্টও করতে হবে।

স্যার, আপনাকে এসব নিয়ে মোটেই ভাবতে হবে না। আমাদের হাসপাতালের নিয়ম হচ্ছে— ভর্তি হবার সময়ই পুরো টাকা দিতে হয়। আপনার বেলাতেও তাই হয়েছে। কেউ-একজন নিশ্চয়ই পুরো টাকা দিয়েছেন।

সেই কেউ-একজনটা কে?

আমি তো স্যার বলতে পারব না। আপনি চাইলে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি।

দয়া করে খোঁজ নিয়ে দেখুন।

নার্স কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলো। তার হাতে একটি বই, একটি মুখবন্ধ খাম।

স্যার, যিনি আপনাকে এখানে ভর্তি করিয়ে গেছেন, তাঁর নাম মুশফেকুর রহমান। তিনি আপনার জন্যে বইটা রেখে গেছেন। চিঠিও রেখে গেছেন। আর স্যার, আমি খোঁজ নিয়েছি— আপনার জন্যে পনেরো দিনের রুম পেমেন্ট কবা আছে। তার আগেই যদি আপনি চলে যান তা হলে টাকাটা রিফান্ড করা হবে।

মিসিব আলি চিঠি পড়লেন। সুন্দর হাতেব লেখা। এই লেখা দেখে আগেও একবার মুগ্ধ হয়েছিলেন, আজো হলেন।

শ্রদ্ধেয় স্যার,

আপনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আমি আপনাকে এই প্রাইভেট ক্লিনিকে নিয়ে এসেছি। আপনার বিনা অনুমতিতেই এটা করতে হলো। কারণ, অনুমতি দেয়ার মতো অবস্থা আপনার ছিল না।

আপনার পাখি দু'টি আমি আমার নিজের কাছে নিয়ে রেখেছি। আপনার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা আমি চালিয়ে নিতে চেষ্টা

করছি। ফলাফল এখন পর্যন্ত শূন্য। দুটি পাখিই খাচ্ছে। আমি আরো কয়েকদিন দেখব।

আপনি অসুস্থ অবস্থায় নীলু-নীলু বলে ডাকছিলেন। ভদ্রমহিলার ঠিকানা জানার জন্যে আমি আপনার কিছু কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। এর পেছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। আপনার অবস্থা দেখে আমি খুবই শঙ্কিত বোধ করছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল ঐ মহিলাকে যে-ভাবেই হোক খুঁজে বের করা দরকার।

আমি তাঁকে খুঁজে পেয়েছি। তবে এখনো আপনার কোনো খবর তাঁকে দেয়া হয় নি। আপনি চাইলেই দেয়া হবে। পাখিবিষয়ক আরেকটি গ্রন্থ আপনাকে পাঠালাম— *Mysteries of Migratory Birds*. আমি বইটি পড়ে আনন্দ পেয়েছি— আপনিও পাবেন বলেই আমার ধারণা।

বিনীত

ম. রহমান

মিসিবি আলি পরপর তিনবার চিঠি পড়লেন। সব দীর্ঘ চিঠিতেই অপ্রকাশ্য কিছু কথা থাকে। যে-কথা পত্রলেখকের মনে আছে, কিন্তু তা তিনি জানাতে চান না, সেই অপ্রকাশ্য কথা পত্রলেখকের অজান্তে ধরা পড়ে। এখানেও কি ধরা পড়েছে? না, পড়ে নি। এই চিঠি খুব সাবধানে লেখা হয়েছে।

পাখির উপর লেখা বইটিতে মিসিবি আলিকে উদ্দেশ করে দু'টা লাইন লেখা—

দ্রুত সেরে উঠুন। এই শুভ কামনা।

তন্ময়।

একটি বিষয় লক্ষণীয়-- সে দুটি নাম ব্যবহার করেছে। এর থেকে কি কিছু দাঁড় কবানো যায়? না, যায় না। এত সহজে কিছু দাঁড় কবানো সম্ভব নয়। তথ্যের পাহাড় জোগাড় করতে হয়। সেই অসংখ্য তথ্যের ভেতর থেকে বেছে-বেছে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি নিয়ে ঘন বানাতে হয়। একটা নয়-- বেশ কয়েকটা। তার থেকে বেছে নিতে হয় মূল প্রাসাদ... কঠিন কাজ।

নার্স মেয়েটি গামলাভর্তি গরম পানি এবং একটা তোয়ালে নিয়ে এসেছে। গা স্পঞ্জ করবে। মিসিবি আলি বললেন, আমি কি আরেক পেয়الا চা খেতে পারি?

জি-না স্যাব। চা একটা উত্তেজক পানীয়। ডাক্তার সাহেবকে জিজ্ঞেস না করে আপনাকে দেয়া যাবে না।

আপনার নাম কী?

আমার নাম জাহেদা।

শুনুন জাহেদা, আপনি যদি আমাকে খুব গরম এক কাপ চা না খাওয়ান, তা হলে আমি আপনাকে গা স্পঞ্জ করতে দেব না।

জাহেদা চলে গেল। মিসিবি আলি খুশি মনে অপেক্ষা করছেন। মেয়েটির ঔরালিটি ভেঙে দেয়া হয়েছে। এখন ফিরে আসবে তখন তাকে বলা হবে— শুনুন জাহেদা, আপনি

আমাকে একটা সিগারেট এনে দিন। আমাকে একটা সিগারেট না খাওয়ালে আমি ওষুধ খাব না। গোপনে এনে দিন। আমি বাথরুমে বসে খেয়ে নেব। কেউ কিছুই বুঝতে পারবে না।

জাহেদা ফিরে এলো। কঠিন গলায় বলল, ডাক্তার সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি নিষেধ করেছেন। কাজেই চা হবে না। আপনি শাট খুলুন।

মিসির আলি লক্ষ করলেন, তাঁর নিজের মোরালিটিই ভেঙে যাচ্ছে। শাট খুলে ফেলাই ভালো।

মিসির আলি ভেবেছিলেন তিনি পুরোপুরি সেরে গেছেন। দুপুরে শুয়ে-শুয়ে পার্শ্ববিষয়ক বইটি পড়তে-পড়তেই তাঁর মাথা ধরল। সন্ধ্যাবেলা আবার জ্বর এলো। দেখতে-দেখতে জ্বর বেড়ে গেল। পুরো রাত কাটল জ্বরের ঘোরে। সকালে আবার ভালো। ডাক্তার যখন দেখতে এলেন তখন গায়ে জ্বর নেই। শরীর ঝরঝরে লাগছে। পরপর তিনদিন একই ব্যাপার। মিসির আলি ডাক্তারকে বললেন, কী ব্যাপার ডাক্তার সাহেব? আমার হয়েছে কী?

ডাক্তার সাহেব বললেন, এখনো বলতে পারছি না। টেস্ট করা হচ্ছে।

ক'দিন থাকতে হবে?

তাও বলা যাচ্ছে না।

মিসির আলি শঙ্কিত বোধ কবছেন। হাসপাতালের আকাশছোঁয়া বিল অন্য একজন দিয়ে দেবে, তা হয় না। পুরো বিল তিনিই দেবেন। কিছু টাকা তিনি আলাদা করে রেখেছিলেন— ভয়াবহ দুঃসময়ের জন্যে। সেই টাকায় হাত দিতে হবে। বাজকীয় চিকিৎসা তাঁর জন্যে না। সরকারি হাসপাতালে যাওয়া দনকাব। এই হাসপাতাল ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না। প্রতিদিন ভোরবেলা অনেকখানি বোদ এসে তাঁর পায়ে পড়ে। এই দৃশ্যটি তাঁর অসাধারণ লাগে। অন্য কোনো হাসপাতালে এরকম হবে না। রোদে পা মেলে দিয়ে চোখ বন্ধ কবে পড়ে থাকার এই আনন্দ থেকে তিনি নিজেকে বঞ্চিত করতে চান না। একজন মানুষের জীবন হচ্ছে ক্ষুদ্র আনন্দের সঞ্চয়। একেকজন মানুষের আনন্দ একেক রকম। তাঁরটা হয়তো-বা কিছুটা অদ্ভুত।

তিনি আজো রোদে পা মেলে শুয়ে আছেন। চোখ বন্ধ। হাসপাতালের নার্স তাঁকে জানিয়েছে— আজ তাঁকে বাড়তি এক কাপ চা দেয়া হবে। শুধু তাই না, সিগারেটও দেয়া হবে। তবে সিগারেট খেতে পারবেন না। হাতে নিয়ে বসে থাকবেন। তাইবা কম কী? তামাকের গন্ধ নেয়া হবে।

কেমন আছেন স্যার?

মিসির আলি চোখ না মেলেই বললেন, ভালো।

আমাকে চিনতে পেরেছেন?

পেরেছি। আপনি মুশফেকুর রহমান। বসুন।

চেয়ার টানার শব্দ হলো। মিসির আলি ফুলের গন্ধ পেলেন। মুশফেকুর বহমান তাঁব জন্যে ফুল নিয়ে এসেছে। টেবিলে ভারী কিছু রাখার শব্দ হলো। ফুল নয়— অন্যকিছু। ফল হতে পারে। কী ফল?

কমলা হবে না। কমলার ঘ্রাণ তীব্র। তিনি গন্ধ পাচ্ছেন না। সম্ভবত আপেল এবং কলা। না, কলা হবে না। আপেল এবং কলা এক ঠোঙায় আনা হবে না। তিনি একটি ঠোঙা রাখার শব্দ শুনেছেন। হয়তো আপেল। না, আপেলও হবে না। তিনি যে শব্দ শুনেছেন তাতে মনে হয়েছে শব্দ কিছু রাখা হয়েছে, যেমন ডাব। তবে ডাব হবে না। ডাব কেউ টেবিলে রাখবে না। মেঝেতে রাখবে— তা হলে কী ?

মিসির আলি চোখ মেললেন, তবে টেবিলের দিকে তাকালেন না। তাকালেন মুশফেকুর রহমানের দিকে। তিনি একধরনের বিস্ময়বোধে আক্রান্ত হলেন। কোলের উপর হাত রেখে শান্ত, ভদ্র ও বিনয়ী একটা ছেলে বসে আছে।

তিনি মুশফেকুর রহমানকে দিনের আলোয় কখনো দেখেন নি। একজন মানুষকে দিনের আলোয় এক রকম দেখাবে, রাতে অন্যরকম, তা তো হয় না। ছেলেটির মধ্যে মেয়েলি ভাব অত্যন্ত প্রবল। এ ব্যাপারটি তিনি আগে কেন লক্ষ করেন নি ? ধবধবে ফর্সা গায়ের রঙ। লাল ঠোঁট, বেশ লাল, চোখের মণি ঘন কালো এবং ছলোছলো। ইংরেজি উপন্যাসে চোখের বর্ণনা পাওয়া যায়— Liquid eyes এরও তাই। চোখের পল্লবও মেয়েদের চোখের পল্লবের মতো দীর্ঘ। বয়সও খুব বেশি নয়। পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে হবে। তাঁর ধারণা ছিল মুশফেকুর রহমানের বয়স চল্লিশের বেশি।

মিসির আলি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। ছেলেটি কথা বলছে এমনভাবে যে জিহ্বা দেখা যাচ্ছে না। তবু মিসির আলি লক্ষ করলেন ছেলেটির জিহ্বা কালো নয়, অন্য দশজনের মতোই।

মুশফেকুর রহমান বলল, স্যার, আপনি হেডমাস্টারদের মতো আমাকে দেখছেন। কঠিন চোখে তাকিয়ে আছেন।

আপনার জিহ্বাব রঙ কালো, না।

দিনের বেলা রঙ ঠিক থাকে।

কেন ?

আপনি বলুন কেন ?

আপনি কি কোনো রঙ মা'ন ?

জি স্যার, মাথি। একধরনের 'এজো ডাই'— নাইট্রোজেনঘটিত জৈব রঙ। দিনের বেলা লোকজনের সামনে কালো জিহ্বা না। বেড়াতে ইচ্ছা করে না।

আপনার বয়স কত ?

তেরিশ। স্যার, আপনি আমাকে তুমি কবে বলবেন।

বেশ, বলব।

আপনাকে আজ আব বিবর্ত করব না। শরীর সার্বক্ষণিক। আমি সব সময় খোঁজ রাখছি।

থ্যাংক ইউ।

পাথিবীষয়ক বইটি কি নেড়েচেড়ে দেখেছেন ?

আমি গোড়া থেকেই পড়ছি— পঞ্চাশ পৃষ্ঠার মতো পড়া হয়েছে।

বই পড়তে কষ্ট হয় না ?

না। তবে সন্ধ্যার পর কিছু পড়তে পারি না। তখন চোখ জ্বালা করে, মাথায় যন্ত্রণা হয়।

মুশফেকুর রহমান উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বলল, স্যার, আমি আমার কিছু ঘটনা লিখে এনেছি। পড়তে যাতে আপনার কষ্ট না হয় সে জন্যে ভাগ-ভাগ করে লিখেছি। প্রতিটি চ্যাপ্টারের শেষে আমি আমার নিজস্ব ব্যাখ্যা দেয়াব চেষ্টাও করেছি। আপনার ইচ্ছা না হলে ব্যাখ্যাগুলি পড়ার দরকার নেই।

মিসির আলি বললেন, কী ধরনের ব্যাখ্যা ?

একজন মনোবিজ্ঞানীর ব্যাখ্যা।

মনোবিজ্ঞানে তোমার কি কিছু পড়াশোনা আছে ?

মুশফেকুর রহমান বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, সামান্য আছে। আমি মনোবিজ্ঞানের ছাত্র। এই বিষয়ে এম.এ করেছি।

কোন সনের ছাত্র ?

বলতে চাচ্ছি না, স্যার।

মিসির আলি বললেন, তুমি কি কখনো আমার ছাত্র ছিলে ?

জি, ছিলাম। গোড়া থেকে এই কাবণেই আপনাকে স্যাব ডাকছি। আপনার কাছে আসার আমার কারণও এইটিই। স্যাব, আজ আমি উঠি ?

তোমার ঐ ঠোঙায় কী আছে ?

কিছু বেদানা নিয়ে এসেছি। টাইম পত্রিকায় পড়েছিলাম— বেদানায় আছে ভিটামিন K, রোগপ্রতিরোধী ক্ষমতা তৈরিতে ভিটামিন 'কে' খুব কাজ করে। নার্সকে বলে দিয়েছি ও বেদানার রস তৈরি করে আপনাকে দেবে। স্যাব, যাই।

মিসির আলি তাকিয়ে বইলেন। হালকা নীল শার্ট পরা, মাথাভর্তি কুচকুচে কালো চুলের এই যুবকটিকে কী সুন্দর লাগছে! কিন্তু সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। আগেও একবার খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখেছেন। সেবার বাঁদিকে বুঁকে হাঁটছিল। এখন হাঁটছে ডানদিকে বুঁকে।

৮

শ্রদ্ধেয় স্যার,

স্যারদের নামের আগে শ্রদ্ধেয় ব্যবহার কবা আমাদের প্রাচীন রীতি। যদিও এই সমাজের বেশির ভাগ শিক্ষকই শ্রদ্ধেয় বিশেষণ দাবি করেন না। স্কুলে আমাদের একজন অঙ্ক স্যার ছিলেন। তিনি খুব ভালো অঙ্ক জানতেন। ছাত্রদের বোঝাতেনও খুব সুন্দর করে। তিনি আমাকে ডাকতেন— সর্প-শিশু। মাঝে মাঝেই মজা করার জন্যে আমাকে বলতেন, এই, হাঁ কব তো। হাঁ করে তোর কুচকুচে কালো জিহ্বাটা নাড়াচাড়া কব। দেখি কেমন লাগে।

আমি তাই করতাম। তিনি মজা পেয়ে হো-হো করে হাসতেন। এই শিক্ষককে কি শ্রদ্ধেয় বলা ঠিক হবে ?

আমি আপনার নামের আগে বহুব্যবহৃত বিশেষণ ব্যবহার করেছি। এরচে' সুন্দর কিছু ব্যবহার করতে পারলে আমার ভালো লাগত। আপনি অল্প কিছুদিন আমাদের ক্লাস নিয়েছেন। পড়াতেন অ্যাবনরমাল বিহেভিয়ার। প্রথম দিন ক্লাসে ঢুকেই বললেন, আমি তোমাদের অ্যাবনরমাল বিহেভিয়ার পড়াতে এসেছি। পড়ানোর সময় কী করলে আমার আচরণকে তোমরা অ্যাবনরমাল বলবে ?

আমরা কেউ কোনো কথা বললাম না। ছাত্র হিসেবে আমরা আপনাকে যাচাই করে নিতে চাচ্ছিলাম। আপনি বললেন, আচ্ছা, আমি যদি এই টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিই— তা হলে কি তোমরা আমার আচরণকে অ্যাবনরমাল বলবে ?

একজন ছাত্র বলল, হ্যাঁ।

আপনি বললেন, প্রাচীন গ্রীসে কিন্তু ক্লাসরুমে টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবার প্রচলন ছিল। তাঁরা মনে করত শিক্ষক সবচে' সম্মানিত। তাঁকে দিতে হবে সবচে' সম্মানের স্থান। তাদের কাছে টেবিলে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেয়াটাকে অস্বাভাবিক আচরণ মনে হতো না। কোনো শিক্ষক যদি মেঝেতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতেন সেইটা হতো অস্বাভাবিক। কাজেই অস্বাভাবিকের সংজ্ঞা কী ? সংজ্ঞা হলো— আমরা যা দেখে অভ্যস্ত তাব বাইরে কিছু করাটাই অস্বাভাবিক।

মজার ব্যাপার হলো মানুষ খুব অস্বাভাবিক একটি প্রাণী, অথচ আমরা মানুষের কাছে স্বাভাবিক আচরণ আশা করি। আচ্ছা, তোমরা একজন কেউ বলো তো, মানুষ অস্বাভাবিক প্রাণী কেন ?

ক্লাসের কেউ কথা বলল না। আপনি হাসিমুখে বললেন, মানুষ অস্বাভাবিক, তার কাবণ মানুষের মস্তিষ্ক। এই মস্তিষ্ক একই সঙ্গে লজিক এবং অ্যান্টি-লজিক নিয়ে কাজ করে। প্রতিটি প্রশ্নের দু'টি উত্তর সে সমান গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে— একটি হ্যাঁ, অন্যটি না। সে মনে করে দু'টি উত্তরই সত্য। তা হয় না। উদাহরণ দিই—

প্রশ্ন : ঈশ্বর বলে কি কিছু আছেন ?

উত্তর : হ্যাঁ এবং না।

প্রশ্ন : আমরা কি শূন্য থেকে এসেছি ?

উত্তর : হ্যাঁ এবং না।

প্রশ্ন : আমরা কি শূন্যতে মিশে য়. ব ?

উত্তর : হ্যাঁ এবং না।

স্যার, আপনি ঝড়ের গতিতে একেব পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছেন এবং নিজেই উত্তর দিচ্ছেন— 'হ্যাঁ এবং না।' আমরা মুগ্ধ ও বিস্মিত। ক্লাসের শেষে আপনার নাম হয়ে গেল 'হ্যাঁ-না' স্যার। বিশ্বাস করুন স্যার, এই নাম আমরা কখনো ব্যঙ্গার্থে ব্যবহার করি নি। এই নাম উচ্চারণ করেছি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়।

লজিক ব্যবহার করার আপনার অস্বাভাবিক ক্ষমতার সঙ্গে আমাদের অল্প সময়ের ভেতর পরিচয় হলো। শার্লক হোমস-এর সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে কোনান ডায়ালের উপন্যাসের মাধ্যমে। শার্লক হোমস কল্পনাব চরিত্র। আমরা বাস্তবের একজন সাধারণ মানুষকে দেখলাম যার চিন্তাশক্তি এবং বিশ্লেষণী ক্ষমতা অতিমানব পর্যায়ে।

আপনার নিশ্চয়ই মনে নেই ক্লাসে আপনি একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছিলেন। আমরা সবাই অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিলাম। আপনি আমার খাতা দেখে খানিকটা অবাক হয়ে বললেন, তুমি ক্লাসের পরে আমার সঙ্গে দেখা করো। আমি দেখা করতে গেলাম। আপনি বললেন, এত সুন্দর হাতের লেখা কেন? আপনার প্রশ্নের ভঙ্গি এমন যেন সুন্দর হাতের লেখা হওয়া দৃশ্যীয়। আমি বললাম, স্যার, সুন্দর হাতের লেখা কি অপরাধ?

আপনি হাসতে-হাসতে বললেন, না, অপরাধ হবে কেন? তবে হাতের লেখার দিকে তুমি অস্বাভাবিক নজর দিচ্ছ। এটাই আমাকে বিস্মিত কবছে। যাদের মনের ভেতরের অবস্থাটা থাকে বিশৃঙ্খল, এবং হয়তো-বা অসুন্দর, তারা বাইরের পৃথিবীটাকে সুন্দর এবং সুশৃঙ্খল দেখতে চায়, যে-কারণে হাতের লেখার মতো তুচ্ছ একটি বিষয়েও তাদের অপরিসীম মনোযোগী হতে দেখা যায়। তোমার কি কোনো সমস্যা আছে?

আমি বললাম, না।

আমি যে মিথ্যা বলছি আপনি তা সঙ্গে-সঙ্গে ধরে ফেললেন। সেটা আমি আপনাব হাসি দেখেই বুঝলাম। তবে আপনি আমাকে মিথ্যা বলার জন্যে অভিযুক্ত করলেন না। শান্ত গলায় বললেন, তোমার রিপোর্টটি পড়ে আমি আনন্দ পেয়েছি। সবাই বইপত্র ঘেঁটে বিপোর্ট তৈরি করার চেষ্টা করেছে। একমাত্র তুমিই— নিজে যা ভেবেছ তাই লিখেছ।

বিপোর্টের বিষয়বস্তু ছিল— Strange dreams বা অদ্ভুত স্বপ্ন। আমি আমার নিজের দেখা একটি অদ্ভুত স্বপ্ন লিখে তার ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছিলাম।

আমি বললাম, স্যার, আমার ব্যাখ্যা কেমন হয়েছে? আপনি বললেন, বায়াসড ব্যাখ্যা হয়েছে। যেহেতু তুমি স্বপ্নটি দেখেছ, সেহেতু তুমি তা ব্যাখ্যা করেছ নিজের দিকে পক্ষপাতিত্ব করে। আমি অন্য ব্যাখ্যা করব।

আপনার ব্যাখ্যা কী স্যার?

আপনি বললেন, আমাব ব্যাখ্যা দেয়ার আগে আমাকে জানতে হবে তুমি আসলেই এ-জাতীয় স্বপ্ন দেখেছ কি না। মানুষ কখনো তাব অভিজ্ঞতাব বাইবে স্বপ্ন দেখে না, মানুষের কল্পনা অভিজ্ঞতার ভেতর সীমাবদ্ধ। একজন শিল্পীকে তুমি যদি দৈত্যের ছবি আঁকতে দাও— সে একচোখ এক দৈত্যের ছবি আঁকবে— যার দু'টি শিং আছে। তুমি খুব মন দিয়ে লক্ষ করলে দেখবে— দৈত্যের হাত-পা দেখাচ্ছে মানুষের মতো। কপালে চোখটা বিড়ালের মতো, মাথায় শিং দু'টি গরুর মতো; অর্থাৎ শিল্পী তাঁর অভিজ্ঞতাই কল্পনায় ব্যবহার করেছেন। দৈত্যের ছবিতে তুমি এক শিং-এর দৈত্য পাবে, দু'শিং-এর দৈত্য পাবে, কিন্তু তিন শিং-এর দৈত্য সচরাচর পাবে না। কারণ মানুষ এক শিং-এর প্রাণী দেখেছে— যেমন গজর, দু'শিং-এর প্রাণী দেখেছে গরু, ছাগল, কিন্তু তিন শিং-এর প্রাণী দেখে নি। বুঝতে পারছ কী বলছি?

পারছি স্যার।

কিন্তু তুমি যে-স্বপ্ন দেখেছ বলে লিখেছ এই স্বপ্ন তুমি দেখতে পার না। এই স্বপ্ন মানুষের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়।

আমি বললাম, আমি এই স্বপ্ন দেখেছি স্যার।

আপনি অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, আচ্ছা, তুমি যাও। যদি কখনো বড় ধরনের সমস্যায় পড় আমার কাছে এসো।

আপনার কি মনে পড়ে, আপনি এ জাতীয় একটি আশ্বাস বাণী আপনার একজন ছাত্রকে দিয়েছিলেন ? হয়তো আপনার মনে নেই। আমি কিন্তু মনে করে রেখেছি। এবং সব সময় আপনার খোঁজ রেখেছি। গত সাত বছরে আপনি কোন কোন বাসায় ছিলেন, কতদিন ছিলেন— সব আমি একের পর এক বলে দিতে পারব। এর পরেও আমাকে আপনার অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।

স্যার, সমস্যায় আমি এখন পড়ি নি। সমস্যায় পড়েছিলাম ছেলেবেলাতেই। সেই সমস্যা আমি আমার নিজের মতো করে সমাধান করার চেষ্টা করেছি। আমাকে সাহায্য করেছেন আমার একজন গৃহশিক্ষক, যিনি জীবিত নন। মৃত। মৃত মানুষটি এখনো আমাকে সাহায্য করে যাচ্ছেন। আপনার মতো যুক্তিবাদী মানুষের কাছে নিতান্তই অযৌক্তিক একটি বিষয় উপাধি করলাম। করলাম, কারণ, আপনি বলেছেন, মানুষ যে-কোনো প্রশ্নের উত্তর হিসেবে হ্যাঁ এবং না দুটিই গ্রহণ করে। আমি আমার গৃহশিক্ষকের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব। তার আগে আমার কিছু কথা জেনে নিতে হবে।

আমি নিজে আমার কথা ছাড়া-ছাড়া ভাবে আপনাকে কিছু বলেছি। আপনি নিজেও মনুসন্ধান করে কিছু-কিছু বের করা চেষ্টা করেছেন। এতে লাভ তেমন হয় নি। আপনি বিভ্রান্ত হয়েছেন। আপনি আমার মা'র সঙ্গে কথা বলেছেন— তাঁকে আপনার নিশ্চয়ই সরল সাদাসিধে মহিলা মনে হয়েছে। তিনি মোটেই সেরকম নন। আমার বাবা মা'কে পরিত্যাগ করেছিলেন, কারণ তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন— আমার মা গণ্য টিপে আমাকে হত্যা করা চেষ্টা করছেন। এতে আমার শ্বাসনালী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দীর্ঘদিন হাসপাতালে রেখে আমার চিকিৎসা করাতে হয়। ঘটনাটা যখন ঘটে তখন আমার বয়স চার। চার বছরের স্মৃতি শিশুর মনে থাকে। আমার স্পষ্ট মনে আছে।

স্যার, আপনি অনেকক্ষণ একনাগাড়ে আমার লেখা পড়লেন। এখন আপনি বিশ্রাম করুন। বাকিটা কাল পড়বেন।

৯

মিসিবি আলি মুশফেকুর বহমানের খাতা নিয়ে বসেছেন। এখন পড়ছেন শৈশবস্মৃতি। খুবই গোছানো লেখা। একটিও বানান ভুল নেই। কাটাকুটি নেই। বোঝাই যাচ্ছে এই অংশ অনেক দিন আগে লেখা। কাগজ পুরনো হয়ে গেছে। লেখার কালি বিবর্ণ। তবে তাকে উদ্দেশ্য করেই লেখা।

কিছু-কিছু জায়গা নতুন লেখা হয়েছে। সেগুলি পেন্সিলে লেখা এবং তারিখ দেয়া।

“মানুষের অনেক বৈচিত্র্যময় ছেলেবেলা থাকে। ম্যাক্সিম গোর্কীর ছেলেবেলা কেটেছে তাঁর দাদিমার সঙ্গে পথে-পথে ভিক্ষা করে। আমার ছেলেবেলার শুরুটা ছিল সরল ঘটনাবিহীন।

আমি ছিলাম সঙ্গীহীন, বন্ধুহীন। বিরাট কম্পাউন্ডের বাড়ি। জেলখানার দেয়ালের মতো উঁচু দেয়াল। খেলার জন্যে অনেক জায়গা, তবুও আমাকে বন্দি থাকতে হতো আমার নিজের ঘরে। বারান্দায় বা উঠোনে কিংবা বাড়ির পেছনে খেলতে গেলেই দোতলা

থেকে আমার বাবা দেখে ফেলতেন এবং চিৎকার করে বলতেন, ভেতরে যাও, ভেতরে যাও। আমি দৌড়ে নিজের ঘরে চলে যেতাম।

নিঃসঙ্গ শিশু নিজের খেলার সঙ্গী নিজেই তৈরি করে নেয়। আমার অনেক কাল্পনিক সঙ্গীসাথী ছিল। এদের সঙ্গেই খেলতাম। গল্প করতাম। আমার সবচে' প্রিয় জায়গা ছিল খাটের নিচের অন্ধকার কোণ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি খাটের নিচে বসে কাটিয়েছি। মাঝে-মাঝে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়তাম।

আমাকে দেখাশোনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল সর্দার চাচার। আপনাকে আগেই তাঁর কথা বলেছি। তিনি সারাক্ষণ আমাকে চোখে-চোখে রাখতেন। বাড়িতে সর্দার চাচা ছাড়াও, আরো কিছু মানুষজন ছিল, মালী ছিল। দারোয়ান ছিল। রান্নার লোক ছিল। তাদের কেউ আমার কাছে আসতে পারত না। সর্দার চাচা বাঘের মতো লাফিয়ে উঠতেন।

বাবা সর্দার চাচাকে খানিকটা সমীহ করতেন। মাঝে-মাঝে সর্দার চাচা আমাকে বাগানে খেলার জন্যে নিয়ে যেতেন। কুয়োতলায় নিয়ে যেতেন ছবি আঁকার জন্যে। দোতলা থেকে বাবা আমাকে দেখতে পেতেন, কিন্তু ভেতরে যাও ভেতরে যাও বলে চোঁচাতেন না।

যে জন্য থেকেই নিঃসঙ্গ, সে নিঃসঙ্গতার কষ্ট জানে না। আমিও জানতাম না। মা'র জন্যে আমার কোনো আকর্ষণ ছিল না। তিনি আমার ভেতর কোনো সুখস্বৃতি তৈরি করে যেতে পারেন নি। মা'র কথা মনে হলেই ভয়ঙ্কর এক স্মৃতি ধক কবে মনে হতো। পরিষ্কার দেখতে পেতাম মা আমার গলা চেপে ধবে আছেন। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার ছোট্ট বুক ধক করে ফেটে যাবে। এই অবস্থা থেকে আমাকে আমার বাবা উদ্ধার করেন। তিনিই আমাকে কোলে নিয়ে দৌড়ে ডাক্তারের কাছে যান।

আমি যে-ক'দিন হাসপাতালে ছিলাম, সে-ক'দিন আমার বাবা আমার পাশেই ছিলেন। যতবার আমি চোখ মেলেছি ততবারই আমি দেখেছি বাবা ব্যথিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। হাসপাতালের ঐ ক'টি দিনই ছিল আমার শৈশবের শ্রেষ্ঠতম সময়।

পারিবারিক অবস্থার কথা বলি— আমরা কয়েক পুরুষের বর্নোদ ধনী। মুসলমানরা তিন পুরুষের বেশি তাঁদের ধন ধরে রাখতে পারে না। আমার বাবা হলেন তৃতীয় পুরুষ। যৌবনে তিনি ব্যবসাপাতি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। বেশির ভাগ ব্যবসাই বিক্রি করে নগদ টাকা করলেন। টাকা ব্যাংকে জমা করলেন। কয়েকটা বড়-বড় বাড়ি কিনলেন। শহরে জমি কিনলেন। তাঁর দূরদৃষ্টি ছিল— তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এইসব জমি হীরের দামে বিক্রি হবে।

আমার বাবাও আমার মতোই নিঃসঙ্গ ছিলেন। তিনি কারো সঙ্গে মিশতেন না। আমি আমাদের কোনো আত্মীয়স্বজনকে এ বাড়িতে আসতে দেখি নি। আত্মীয়দের বাড়িতে বাবার যাবার তো প্রশ্নই ওঠে না। বাবা খানিকটা অসুস্থও ছিলেন। আপনাকে হয়তো ইতোমধ্যেই বলা হয়েছে— উনি শব্দ সহ্য করতে পারতেন না। শব্দ শুনলেই তাঁর মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হতো। তাছাড়া তাঁর ধারণা হয়ে গিয়েছিল সবাই তাঁকে খুন করার

জন্যে ষড়যন্ত্র করছে। চার দেয়ালের বাইরে বের হলেই তাঁকে খুন করা হবে। তিনি ঘরের বাইরে বের হওয়া পুরোপুরি ছেড়ে দিলেন। কাউকে তিনি বিশ্বাস করতেন না। দু'দিন পরপর দারোয়ান বদলাতেন, মালী বদলাতেন। এক সময় কুকুর পুষতে শুরু করলেন। প্রথমে এলো সরাইলের দু'টি কুকুর। শ্রে হাউন্ডজাতীয় কুকুর— ভয়ঙ্কর রাগী। মালী এবং দারোয়ানের সংখ্যা কমতে লাগল, কুকুরের সংখ্যা বাড়তে লাগল।

বাবার সঙ্গে আমার কোনোরকম যোগাযোগ ছিল না, তবে কালেভদ্রে তিনি আমাকে তাঁর দোতলার ঘরে ডেকে নিয়ে যেতেন। সর্দার চাচা আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। বাবা আমার সঙ্গে কথা বলতেন নিচু গলায় এবং কিছুটা আদুরে স্বরে; তবে কখনো আমার দিকে তাকাতেন না। কথাবার্তার একটা নমুনা দিচ্ছি—

বাবা বললেন, কেমন আছিস ?

আমি বললাম, ভালো।

বোস।

আমি কোথায় বসব বুঝতে পারছি না। ঘরে একটামাত্র খাট। সেখানে বসার প্রশ্ন ওঠে না। কারণ বাবা বসে আছেন। তাছাড়া খাটের এক মাথায় দোনলা বন্দুক। বাবা সব সময় গুলিভরা বন্দুক মাথার কাছে রাখতেন। আমি ইতস্তত করছি— বাবা খাটের এক অংশ দেখিয়ে বসার জন্যে ইশারা করলেন। আমি বসলাম।

পড়াশোনা হচ্ছে ?

জি।

বাড়িতে মাস্টার আসে ?

জি।

(সেই সময় আমার জন্যে প্রাইভেট মাস্টার রাখা হয়েছে। তিনি বাসায় এসে আমাকে পড়িয়ে যান। তাঁর কথা আপনাকে বলেছি। এবং টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে।)

মাস্টারটা কেমন ?

ভালো।

মোটেই ভালো না। অতি বদ লোক। সাবধানে থাকবি। বদ মতলবে ঢুকেছে। খুনখারাবি করবে।

এটা হচ্ছে বাবার সাধারণ কথার একটি। পৃথিবীর সব মানুষই তাঁর কাছে বদ মানুষ। পৃথিবীর সবাই খুনখারাবির মতলব নিয়ে ঘুরছে। আমি বাবার কথার কোনো জবাব দিলাম না। মাথা নিচু করে শুনে গেলাম।

বাবা বললেন, তোকে সাবধান করার জন্যেই ডেকেছি। খুব সাবধান থাকবি। খুব সাবধান।

জি আচ্ছা।

তোর মাস্টারের দরকারই বা কী ? নিজে-নিজে পড়তে পারবি না ?

আপনি বললে পারব।

এই ভালো। নিজে-নিজে পড়। আর তোর যদি পড়াশোনা না হয়, তা হলেও ক্ষতি নেই। টাকা-পয়সা আমি যা রেখে যাব দু'হাতে খরচ করেও শেষ করতে পারবি না। আমার মৃত্যুর পর দু'হাতে খরচ করবি। জায়গাজমি সব বিক্রি করে দিবি। তোর কোনো টাকা-পয়সা জমিয়ে রাখার দরকার নেই। বুঝতে পারছিস ?

পারছি।

আচ্ছা যা। আমি সর্দারকে বলে দেব সে যেন মাস্টারকে আসতে নিষেধ করে।

আচ্ছা।

আরেকটা কথা— রাতে-বিরাতে দরজা খুলে বের হবি না। কুকুরগুলি ভয়ঙ্কর— এরা তোকে খেয়ে ফেলবে।

কুকুরগুলি ছিল সত্যি ভয়ঙ্কর। রাতে যতবার ঘুম ভাঙত, শুনতাম, এরা চাপা গর্জন করছে। একটা কুকুর রোজ রাতে আমার দরজা আঁচড়াত। রাতে একবার ঘুম ভাঙলে আর ঘুমুতে পারতাম না।

আমি কি এখন চলে যাব ?

আচ্ছা যা।

বাবা বালিশ উঁচু করে বালিশের নিচ থেকে চকচকে একটা দশ টাকার নোট বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন— বাদাম কিনে খাস।

যতবার বাবার কাছে গিয়েছি ততবারই বাদাম কিনে খাবার জন্যে একটা কবে চকচকে দশ টাকার নোট পেয়েছি। বাদাম অবশ্যি খাওয়া হয় নি। আমাকে দোকানে নিয়ে যাওয়া নিষেধ ছিল। টাকাগুলি আমি একটা কৌটায় জমা করে রেখেছি। যতবার টাকাগুলি দেখি ততবারই ভালো লাগে।

বাবার হুকুমে সর্দার চাচা মাস্টার সাহেবকে এ বাড়িতে আসতে নিষেধ করে দেন। তারপরও তিনি মাঝেমধ্যে আসতেন। অনেকক্ষণ থাকতেন। এর মধ্যে একদিন এসে আমার হাতে একটি চিঠি দিলেন। সেই চিঠি আমার মা'র লেখা। মা আমার সঙ্গে দু'টা কথা বলতে চান। আমি কি তাঁর কাছে যেতে পারব ?

আমি মাস্টার সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে পরদিন বাড়ি থেকে বের হলাম। ধরা পড়লাম সর্দার চাচার হাতে। বাকি ঘটনা আপনি জানেন। ঐ অংশটি দ্বিতীয়বার বলতে চাই না। যে কথাটা আপনাকে আগে বলা হয় নি তা হচ্ছে— ঐ চিঠি আমার মা'র লেখা ছিল না। ঐ চিঠি মাস্টার সাহেবের লেখা।

মিসির আলি লক্ষ করলেন, শেষ পাতাটি দু'দিন আগে লেখা হয়েছে, এবং প্রচুর কাটাকুটি করা হয়েছে। যেন মুশফেকুর রহমান বুঝতে পারছে না— কী লিখবে। বাংলা ভাষাটিও মনে হচ্ছে ভাব প্রকাশের জন্যে সে উপযুক্ত মনে করছে না। কারণ শেষ পাতাটা ইংরেজিতে লেখা। শেষ পাতার বক্তব্য হলো— আমি ভয় পাচ্ছি, বাবা সম্পর্কে আমি আমার মনেব ভাব ঠিকমতো প্রকাশ করতে পারি নি। আমি তাঁকে অসম্ভব ভালোবাসি।

মিসির আলি তৃতীয় চ্যান্টার পড়ছেন। এই অংশটি নতুন লেখা হয়েছে। তারিখ দেখে মিসির আলি বুঝতে পারছেন— পার্কে তাঁর সঙ্গে দেখা হবার পর— এই লেখা শেষ করা হয়েছে। পুরো লেখাটা ইংরেজিতে লেখা। শিরোনাম— I and We. বাংলা করলে হয়তো হবে— আমি এবং আমরা।

আমাকে দেখে কি আপনার মনে হয়েছে আমি ভীতু? একজন মানুষকে দেখেই বলে দেয়া সম্ভব না— সে সাহসী না ভীতু। তাছাড়া একজন ভীতু মানুষকেও ক্ষেত্র-বিশেষে খুব সাহসী হতে দেখা যায়।

আমি ভীতু না। কখনোই ছিলাম না। বাবাকে ভয় করতাম, বাবার কুকুরগুলিকে ভয় করতাম। বাবা যে-বন্দুক নিয়ে মাঝে মাঝে দোতলায় বের হতেন সেই বন্দুকটাকে ভয় করতাম। আমার ভয় এই তিনটিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। ও, না, আরেকটি ভয়ের ব্যাপার আমার মধ্যে ছিল। আমাদের পুরো বাড়ি মাঝেমধ্যে একধরনের বিচিত্র শব্দ করে নড়ে উঠত। সর্দার চাচা বলতেন, বাড়ি মাঝে মধ্যে কাঁদে, হাসে। এতে ভয়ের কিছু নাই।

অন্ধকারকে ভয় পাওয়া আমার মধ্যে ছিল না। পুরনো ঢাকায় প্রায়ই ইলেকট্রিসিটি চলে যায়। হয়তো বাতে একা ঘবে বসে আছি— হঠাৎ পুরো অঞ্চলের কারেন্ট চলে গেল। গাঢ় অন্ধকারে আমি একা বসে আছি। নিজেব হাতও দেখা যাচ্ছে না— এই অবস্থাতেও আমি কখনো ভয় পাই নি।

ভূত-প্রেতে ভয় পাওয়ার ব্যাপারও আমার মধ্যে ছিল না। কারণ ভয়ের গল্প আমাকে কেউ শোনায় নি। কেউ আমাকে বলে নি ঘবের কোণায় বাস করে কোণী ভূত। খাটের নিচে উবু হয়ে বসে থাকে কন্দকাটা। গভীর রাতে সে তার সরু বরফের মতো ঠাণ্ডা হাত খাটের নিচ থেকে বের করে শুয়ে থাকা মানুষটাকে খুঁজে দেখতে চেষ্টা করে। শিশুরা সচবাচর যেসব কারণে ভয়ে কাতর হয়ে থাকে, সেসব আমার ছিল না। তাছাড়া অল্প বয়সেই যুক্তি ব্যবহার করতে শিখি। ভয়কে পরাজিত করতে যুক্তির মতো বড় অস্ত্র আর কী হতে পারে? ধরুন— গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেল। আমি শুনলাম, বাথরুমে খটখট শব্দ হচ্ছে। কেউ যেন হাঁটছে। আতঙ্কে অস্থির না হয়ে আমি যুক্তি দাড় করলাম, নিশ্চয়-নিশ্চয়ই ইঁদুর। কিছুক্ষণ কান পেতে রইলাম। ইঁদুরের কিচকিচ শব্দ শোনা গেল। যুক্তির উপর নির্ভর করার ফল হাতে-হাতে পেলাম। নিশ্চিত হয়ে ঘুমুতে গেলাম। ভয়ে অস্থির হয়ে চোঁচামেচি করলাম না। চোঁচামেচি করে অবশি, কোনো লাভও হতো না। দশ বছর বয়স হবার পরই আমি থাকতাম একা। সর্দার চাচা থাকতেন গেটের কাছে। দারোয়ান এবং মালীদের জন্যে যে-ঘবগুলি আছে— তার একটিতে।

মাস্টার সাহেবের মৃত্যুর প্রায় মাস দুই পরের ঘটনা। খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমুতে গেছি। সর্দার চাচা বললেন, ছিটকিনি লাগাও।

আমি ছিটকিনি লাগালাম। সর্দার চাচা তাঁর অভ্যাস মতো বললেন, ভালো কইরা দেখ ঠিকমতো লাগছে কিনা।

আমি আরেক বার দেখলাম। ঠিকমতোই লেগেছে।

এখন বাতি নিভাও। বাতি নিভাইয়া ঘুমাও।

আমি বাতি নিভিয়ে চারদিক অন্ধকার করে ঘুমুতে গেলাম। আপনাকে বলা হয় নি, আমার বাবা শব্দ যেমন সহ্য করতে পারতেন না, তেমনি আলোও সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর ধারণা, আলোতে কুকুর ভালো দেখতে পায় না। অন্ধকারে ভালো দেখে। কাজেই রাত এগারোটার পর এ বাড়ির সব বাতি নেভানো থাকতে হবে। একটি বাতিও জ্বলবে না।

রাত এগারোটাই হয়েছে। সব বাতি নিভে গেছে। আমি মশারির ভেতর শুয়ে আছি। আমার বালিশের কাছে দু'ব্যাটারির একটা টর্চলাইট। অন্য সময় বিছানায় যাওয়ামাত্র ঘুম এসে যায়। আজ ঘুম আসছে না। জেগে আছি। হঠাৎ পুরো বাড়ি কেঁপে উঠল। বিচিত্র শব্দ হলো। বাড়ি কেঁদে উঠল কিংবা হেসে উঠল। বুকের ভেতর ধক করে উঠল। আর তখন লক্ষ করলাম, কুকুরগুলি একে-একে আমার ঘরের দরজার বাইরে জড়ো হচ্ছে। এরা চাপা গর্জন করছে। দরজা আঁচড়াচ্ছে। এরা এরকম করছে কেন?

আমার মনে হলো খাটের নিচে কী যেন নড়ে উঠল। কেউ যেন নিঃশ্বাস ফেলল। আমি টর্চলাইট জ্বালিয়ে খাট থেকে নেমে এলাম। বসলাম খাটের পাশে— টর্চলাইট ধরলাম।

প্রথমে দেখলাম দু'টা চকচকে চোখ। পশুদের চোখে হঠাৎ আলো ফেললে যেমন চকচক করতে থাকে, এই চোখ দুটিও ঠিক সেরকমই চকচক করছে। তারপর মানুষটাকে দেখলাম। নগ্ন একজন মানুষ। খাটের নিচে কুঁজো হয়ে বসে আছে। তাব মুখ হাসি-হাসি। যেন টর্চ ফেলে তাকে দেখায় সে আনন্দিত।

আমি হতভম্ব গলায় বললাম, কে?

লোকটা জবাব দিল না। নিঃশব্দে হাসল। তখন আমি তাকে চিনলাম। আমার প্রাইভেট স্যার।

তখনো আমার এই বোধ হয় নি যে আমি ভয়ঙ্কর একটি দৃশ্য দেখছি। যাকে দেখছি সে মানুষটি জীবিত নয়— মৃত। একজন মৃত মানুষ খাটের নিচে কুঁজো হয়ে বসে থাকতে পারে না। আমি একটি ভয়াবহ অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখছি।

আমি শান্ত ভঙ্গিতে বিছানায় উঠে পড়লাম, যেন কিছুই হয় নি। বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়লাম। টর্চের আলো নিভিয়ে দিলাম। আর তখন সীমাহীন ভয় আমাকে আচ্ছন্ন করল। এই ভয়ের সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় ছিল না। এ ভয়ের জন্য পৃথিবীতে নয়— অন্য কোথাও।

ত্রিভয়ের পরপরই এক ধরনের অবসাদ আসে। ভয়ঙ্কর সত্যকে সহজভাবে নিতে ইচ্ছা করে। ফাঁসির আসামি মৃত্যুদণ্ডদেশ পাবার পর আতঙ্কে অস্থির হয়। সেই আতঙ্ক দ্রুত কমে যায়। মৃত্যুর ক্ষণ যখন উপস্থিত হয়, তখন সে সহজ এবং স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেঁটে যায় ফাঁসিমঞ্চের দিকে। এমন কোনো ফাঁসির আসামির কথা জানা নেই— যাকে কোলে করে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যেতে হয়েছে।

আমি মাস্টার সাহেবকে গ্রহণ করলাম সহজ সত্য হিসেবে। এছাড়া আমার উপায়ও ছিল না। মাস্টার সাহেব বাস করতে শুরু করলেন আমার খাটের নিচে। দিনের বেলা কখনো তাঁকে দেখা যায় না। সন্ধ্যাবেলা না। রাতে শোবার সময় খাটের নিচে তাকাই।

তখনো কেউ নেই। শুধু গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলেই তীব্র তামাকের গন্ধ পাই। বুঝতে পারি খাটের নিচে তিনি আছেন। কুকুরগুলি দরজা আঁচড়াতে থাকে। তিনি কিছু-কিছু কথাও বলেন। এবং আশ্চর্যের কথা— আমি জবাব দিই। যেমন—

তুমি জেগেছ ?

হঁ।

ক'টা বাজে ?

জানি না।

ভয় লাগছে ?

না।

পড়াশোনা হচ্ছে ঠিক মতো ?

হচ্ছে।

তোমাব সর্দার চাচাকে আমার কথা বলেছ ?

না।

কাউকেই বলো নি ?

না।

ইচ্ছে করলে বলতে পার। অসুবিধা নেই।

ইচ্ছে করে না।

আমি কেন তোমার খাটের নিচে থাকি জান ?

না।

জানতে চাও ?

না।

জানতে না চাইলে জানতে হবে না। সবকিছু জানতে চাওয়া ভালো না। না-জানার মধ্যেও আনন্দ আছে। আছে না ?

জি, আছে।

ইংরেজি একটা প্রবাদ আছে। তোমাকে একবার পড়িয়েছিলাম, মনে আছে ?

আছে।

বলো তো দেখি!

মনে পড়ছে না।

মনে করার চেষ্টা কর। ইংরেজি বেশি-বেশি করে পড়বে। অর্থের মানে বুঝতে না পারলে ডিকশনারি দেখবে।

আচ্ছা।

তুমি আমাকে আশ্রয় দিয়েছ— কাজেই আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না। আমি তোমাকে সাহায্য করব। পরামর্শ দেব।

আচ্ছা।

আমার সম্বন্ধে তোমার কি কিছু জানতে ইচ্ছে করে ?

না ।

জানতে ইচ্ছে করলে জিজ্ঞেস কর । আমি বলব । আমি এমন সব বিষয় জানি, যা জীবিত মানুষ জানে না ।

আমি কিছু জানতে চাই না ।

ঘুম পাচ্ছে ?

হঁ ।

ঘুমিয়ে পড় । মশার ঠিকমতো গোঁজা হয়েছে ?

হঁ ।

বড্ড মশা । তুমি ঘুমাও । টর্চলাইটটা কি হাতের কাছে আছে ?

আছে ।

একবার জ্বালিয়ে দেখে নাও ব্যাটারি ঠিক আছে কিনা ।

ঠিক আছে ।

তোমার সর্দার চাচাকে বলে আরেক জোড়া ব্যাটারি এনে রাখবে ।

জি আচ্ছা ।

ঘুমিয়ে পড় ।

জি আচ্ছা ।

গায়ে চাদর দিয়েছ কেন ? চাদর সরিয়ে ফেল । গরমে চাদর-গায়ে ঘুমুলে গায়ে ঘামাচি হবে ।

তামি চাদর সরিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ি । আবার ঘুম ভাঙে । তীব্র তামাকের গন্ধ পাই । আমার ঘুম ভাঙার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি বুঝতে পারেন । ভরাট গলায় বলেন, ঘুম ভেঙেছে ?

হঁ ।

অসহ্য গরম পড়েছে । ঘনঘন ঘুম ভাঙাবই কথা । পানির পিপাসা হয়েছে ?

না ।

বাথরুমে যাবে ?

না ।

গল্প শুনতে চাও ?

না ।

গ্রামি তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব চিন্তা করছি । এই সংসারে তুমি খুব শিগগিরই একা হয়ে যাবে । তোমার বাবা বেশিদিন বাঁচবেন না । সর্দার চাচাও থাকবেন না । তুমি হবে একা বুঝতে পারছ ?

পারছি ।

তোমার বাবা যে মারা যাবেন এতে তোমার কষ্ট হচ্ছে না ?

হচ্ছে।

কষ্ট হওয়ারই কথা। তবে মৃত্যু তাঁর জন্যে মঙ্গলজনক হবে। কিছু মানুষের জন্যে মৃত্যু মঙ্গলময়। উনি অসুস্থ। অসুস্থতা ক্রমেই বাড়ছে। উনার যে-অসুখ, সেটা আরো বেড়ে গেলে— চারদিকে বিকট সব জিনিস দেখতে পান। সেইসব ভয়ঙ্কর জিনিস দেখার কষ্ট মৃত্যুযন্ত্রণার চেয়েও শতগুণে বেশি। মৃত্যুযন্ত্রণা একবার হয়। কিন্তু এই যন্ত্রণা হতেই থাকে। শেষ হয় না। ধাপে-ধাপে বাড়ে। তোমার মনে হয় না মৃত্যু তাঁর জন্যে ভালো ?

জি, মনে হয়।

তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে আমাদের সামান্য হলেও সাহায্য করা উচিত বলে আমি মনে করি। সাহায্য করা উচিত না ?

জি, উচিত।

কীভাবে সাহায্য করা যায় তুমি বলো তো ?

আমি জানি না।

আমার তেমন কোনো ক্ষমতা নেই। আমি ছায়ামাত্র। আমি শুধু বুদ্ধি দিতে পারি, কিছু করতে পারি না। তবে আমার ক্ষমতা বাড়ছে। ছায়াজগতের ছায়াদের ক্ষমতা বাড়ে এবং কমে। যতই তুমি আমার উপর বিশ্বাস করবে ততই আমার ক্ষমতা বাড়বে। তোমার সর্দার চাচা যদি আমাকে বিশ্বাস করতে শুরু করে তাহলে আমার ক্ষমতা অনেক গুণে বেড়ে যাবে। তখন আমি ছোটখাট কাজ করতে পাব। তুমি কি মনে কব না আমার ক্ষমতা বাড়ার উচিত ?

মনে করি।

বুঝেছ তন্ময়, আমি তোমাকে সাহায্য করব। তোমার ক্ষতির চেষ্টা কখনো করব না। প্রচুর ক্ষমতা হবাব পরও কবব না। এখন ঘুমাও।

আচ্ছা।

ঘুম কি আসছে না ?

না।

তাহলে এসো আবে কিছু ক্রণ গল্প করি। তোমার বাবাব মৃত্যুর ব্যাপারে কী করা যায় তা নিয়ে ভাবি।

ভাবতে ইচ্ছা করছে না।

ভাবলে কোনো দোষ নেই। ভাবলেই যে কবতে হবে তা তো না। আমরা কত-কিছু ভাবি। ভাবলেই যে করতে হবে তা তো না। আমরা সবসময় যা ভাবি তা কি করি ?

না।

বেশ এসো, তা হলে ভাবি। তুমি কি কলা খাও তন্ময় ?

খাই।

রাতে শোবার আগে এই কলার খোসাগুলি তুমি নিশ্চয়ই দোতলার সিঁড়ির মাথায় রেখে আসতে পার। পাব না ?

হুঁ।

এটা তো তেমন কোনো অন্যায় না। ঝুড়িতে না ফেলে সিঁড়ির মাথায় ফেলেছ। মনের ভুলেও তো ফেলতে পারতে। পারতে না ?

হঁ।

তোমার বাবা তো রাতে বারান্দায় হাঁটেন। অঙ্ককার বারান্দা। মনের ভুলে তিনি কলার খোসায় পা ফেলতে পারেন। পারেন না ?

হঁ, পারেন।

কলার খোসায় পা পড়লে অনেককিছুই হতে পাবে। তিনি সামান্য হোঁচট খেতে পারেন। বারান্দায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে পারেন। আবার সিঁড়ির একেবারে নিচে পড়ে যেতে পারেন। পারেন না ?

হঁ, পারেন।

কোনটা ঘটবে আমরা জানি না। কবে ঘটবে তাও জানি না। প্রথম দিনেই যে ঘটবে তা তো না। প্রথম দিনে কিছু নাও ঘটতে পারে। দিনের পর দিন হয়তো আমাদের কলার খোসা রাখতে হবে। পারবে না ? কথা বলছ না কেন ? পাববে না ?

পারব।

বাহ, ভালো। ভেরি গুড। এখন ঘুমাও। আবাম করে ঘুমাও। ঠাণ্ডা বাতাস ছেড়েছে। ঘুম ভালো হবে।

আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমার বাবা মারা গেলেন কলার খোসায় পা হড়কে। তিনি সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ে যান। মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা পান। দু'দিন হাসপাতালে অচেতন অবস্থায় থেকে তৃতীয় দিনের দিন তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে কিছুক্ষণেব জন্যে তাঁর জ্ঞান ফেবে। তিনি ব্যাকুল হয়ে কঁাদতে-কঁাদতে বলেন— আমার ছোট্ট বাচ্চাটাকে কে দেখবে ?

বাবার মৃত্যুর পর অনেক দিন আমার খাটের নিচে কেউ ছিল না। কতদিন তা বলতে পারব না। আমি একধরনের আচ্ছন্ন অবস্থার ভেতব ছিলাম। সময়ের হিসাব ছিল না। সাবাদিন কুয়োতলায় ছবি আঁকতাম। সর্দার চাচা কুয়ার উপর বসে বিষণ্ণ চোখে আমার ছবি আঁকা দেখতেন। এক সময় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলতেন, সৌন্দর্য হইছে। এখন ধুইয়া ফেলি।

আমার দায়িত্ব গ্রহণ কবার জন্যে দীর্ঘদিন পর আমার মা উপস্থিত হলেন। সর্দার চাচা কঠিন গলায় তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। আমি শুনলাম তিনি আমার মা'কে বলছেন— খবরদার, এই দিকে পাও বাড়াইবেন না। পাও বাড়াইলে কুস্তা দিয়া খাওয়াইয়া দিমু।

বাবা কাগজপত্রে আমার জন্যে অভিভাবক নিযুক্ত করে রেখে গিয়েছিলেন। তিনি হলেন বাবার ম্যানেজার— ইসমাইল চাচা। পৃথিবীতে কঠিন মানুষ যে-ক'জনকে আমি চিনি, তিনি তাঁর একজন। তিনি কাজ ছাড়া অন্য কিছু কখনো ভালোবেসেছেন বলে আমি জানি না। বাবার মৃত্যুর পর একদিন আমাদের এ বাড়িতে তিনি এলেন। আমাকে একটিও সান্ত্বনার কথা বললেন না। যন্ত্রের মতো গলায় বললেন, তুমি কোনোরকম দৃষ্টিস্তা করবে না। স্কুলে যাওয়া শুরু কর। পড়াশোনা কর। অন্য কোনো বিষয় নিয়ে

চিন্তার কিছু নাই। সেই চিন্তা আমি করব। তোমার মা তোমার অভিভাবকত্বের জন্যে কোর্টে মামলা করেছেন। মামলায় লাভ হবে না। আমাদের কাছে প্রমাণ আছে ছোটবেলায় তিনি তোমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। তারপরেও আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি— তুমি কি চাও তোমার মা তোমার অভিভাবক হোক ?

আমি বললাম, না।

বেশ। আমি তা হলে যাই। কোর্টে তোমাকে যেতে হতে পারে। তবে আমার ধারণা, তোমার মা মামলা তুলে নেবেন। উনাকে মোটা টাকার লোভ দেখানো হয়েছে। সেই লোভ তিনি সামলাতে পারবেন না। তুমি কি টাকার পরিমাণ জানতে চাও ?

আমি বললাম, না।

সে-ই ভালো। টাকা-পয়সা থেকে দূরে থাকাই ভালো। তোমার বাবা আমাকে দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই দায়িত্ব আমি পালন করব। বাকি আল্লাহর ইচ্ছা।

যখন সব মোটামুটি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, যখন আমি ভাবতে শুরু করেছি খাটের নিচে আর কখনোই কাউকে দেখব না, আমার ভেতর একধরনের অসুখ তৈরি হয়েছিল, অসুখ সেরে গেছে, তখন এক রাতে খাটের নিচ থেকে তীব্র তামাকের গন্ধ পেলাম। আমি ফিসফিস করে বললাম, কে ?

মাষ্টার সাহেবের শ্লেষাজড়িত ভাবী গলার আওয়াজ পাওয়া গেল— আমি তন্ময়, আমি। তুমি কেমন আছ ?

ভালো।

আমি বুঝতে পারছি— ভালো আছ। ভালো আছ বলেই তোমাকে বিরক্ত করছি না। আমি কেমন আছি তা তো জিজ্ঞেস করলে না ? জিজ্ঞেস কর।

আপনি কেমন আছেন ?

আনন্দে আছি। আমার ক্ষমতা অনেক বেড়েছে। ছায়াজগতের এই এক মজা। ক্ষমতা যখন বাড়ে, দ্রুত বাড়ে। আমি এখন তোমার বাবার দোতলার ঘরটায় থাকি। আরামে থাকি। নির্জনতা ভালো লাগে। একা থাকার মজাই অন্যরকম। মাঝে-মাঝে তোমার বাবার টেলিফোন বেজে ওঠে। টেলিফোনের রিসিভার তুলে কথা বলতে ইচ্ছে করে। বলতে পারি না। এত ক্ষমতা আমার এখনো হয় নি। তবে দেরি নেই, হবে। খুব শিগগিরই হবে। তন্ময়!

জি।

তুমি একবার আমাকে সাহায্য করেছ— আরেকবার একটু সাহায্য করবে না ? সামান্য সাহায্য। তাহলে তোমার সঙ্গে আমি একটা চুক্তিতে যাব। আমি তোমাকে বিরক্ত করব না। তুমি তোমার মতো থাকবে। আমি থাকব আমার মতো। আর সাহায্য যদি না কর তাহলে বাধ্য হয়ে তোমাকে বিরক্ত কবতে হবে। তুমি কি চাও আমি তোমাকে বিরক্ত করি ?

না।

তাহলে তুমি সাহায্য কর। কাজটা খুব সহজ। তুমি যখন কুয়োতলার ছবি আঁক, তখন তোমার সর্দার চাচা কুয়ার পাড়ে বসে থাকেন। থাকেন না ?

হু।

বসে বসে ঝিমাতে থাকেন। মাঝে-মাঝে তাঁর চোখও বন্ধ হয়ে যায়। যায় না ?

হ্যাঁ, যায়।

এই সময় সামান্য ধাক্কা দিলেই কিন্তু উনি কুয়ার ভেতর পড়ে যাবেন। অনেক দিনের পুরনো কুয়া। বিষাক্ত গ্যাস জমে আছে— একবার কুয়ার ভেতর পড়ে গেলে বাঁচার কোনো উপায় নেই। পারবে না ?

না।

দেখ তন্ময়, এটা না পারলে কী করে হবে ? না পারলে আমি তোমাকে ক্রমাগত বিরক্ত করতে থাকব। রাতে ঘুম ভাঙলে দেখবে আমি তোমার পাশেই নগ্ন হয়ে শুয়ে আছি। সেটা কি তোমার ভালো লাগবে ?

না।

তা হলে আমি যা বলছি তাই তুমি করবে। ঠিক না তন্ময় ?

হ্যাঁ।

গুড বয়। ভেরি গুড বয়।

তার দু'দিন পরই কুয়ার ভেতর পড়ে সর্দার চাচা মারা যান। বাবাব ম্যানেজার ইসমাইল চাচা তখন থাকতে আসেন আমাব সঙ্গে। তিনি তাঁর মেয়েটিকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে আসেন।

ইসমাইল চাচা বিপত্নীক ছিলেন। তাঁর একটিমাত্র মেয়ে, মেয়েটির নাম রানু। তিনি রানুকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে উঠে এলেন। দু'টা ঠেলাগাড়িতে কবে তাঁদের মালপত্র চলে এলো। বাড়ির এক অংশের পরপব তিনটি ঘর তিনি বেছে নিলেন। একটি তাঁর শোবার ঘর। একটি বসার। একটিতে আমার থাকার ব্যবস্থা হলো। যে ব্যবস্থাগুলি তিনি করছেন, সে সম্পর্কে আমাকে কিছুই বললেন না। তিনি বাড়িতে এসে উঠলেন সকাল দশটার দিকে, দুপুরের মধ্যে বড় ধরনের কিছু পরিবর্তন হলো। যেমন, তিনি সবক'টি কুকুর বিদেয় করে দিলেন। তিনি বললেন, কুকুরের দবকার নেই। কুকুর দেখলে ভয় লাগে। বাড়ির পেছনের কুয়া বন্ধ করে দিলেন। কয়েক ট্রাক মাটি চলে এলো। সন্ধ্যার মধ্যে কুয়া বুজিয়ে দেয়া হলো। সন্ধ্যার পব এই বাড়ির বাইরের বাতিগুলি আবার জ্বলল। তিনি অনেকক্ষণ একা-একা মোড়া পেতে বাগানে রইলেন।

আমার সঙ্গে কথা হলো রাতে ভাত খাবার সময়। আমাকে বললেন, তোমার নাবালক অবস্থায় আমি তোমার অভিভাবক। কাজেই তোমার আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত আমি তোমার জন্যে যা ভালো মনে করি তা কবব। তোমার যেদিন আঠারো বছর বয়স হবে সেদিন এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। নারায়ণগঞ্জ আমার একটা ছোট্ট বাড়ি আছে। ঐ বাড়িতে গিয়ে উঠব। আমি বললাম, জি আচ্ছা।

তিনি বললেন, রানুকে আমি নিয়ে এসেছি, তোমার একজন কথা বলার লোক হলো। তোমার কোনো কথা যদি আমাকে সরাসরি বলতে ইচ্ছা না করে— রানুকে বললেই আমি শুনব।

আমি বললাম, জি আচ্ছা ।

শীত এসে যাচ্ছে— বাড়ির চারদিকে এত খালি জায়গা, আমি চাই তুমি ফুলের বাগান কর । কীভাবে মাটি তৈরি করতে হয়, কীভাবে বীজ পুঁততে হয়— রানু তোমাকে দেখিয়ে দেবে । ও জানে । নারায়ণগঞ্জের বাড়িতে আমাদের খুব সুন্দর ফুলের বাগান ছিল ।

আমি বললাম, জি আচ্ছা ।

রানু হেসে ফেলে বলল, বাবা, এই ছেলেটা জি আচ্ছা ছাড়া আর কিছু বলতে পারে না । তুমি যাই বলবে, সে বলবে— জি আচ্ছা । তুমি যদি তাকে বলো, তুমি সকালে উঠে তোমার মাথাটা কামিয়ে ফেলবে, তাহলে সে বলবে, জি আচ্ছা ।

ইসমাইল সাহেব বললেন, মা রানু, এই ছেলে এখন থেকে তোমার ভাই । বোনরা ভাইকে যেভাবে আগলে বাখে তুমি তাকে সেইভাবে আগলে রাখবে ।

বানু অবিকল আমার গলার স্বর নকল করে বলল, ‘জি আচ্ছা ।’ ইসমাইল চাচা হাসতে গিয়েও হাসলেন না । কিন্তু আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম । এমন প্রাণ খুলে আমি অনেক দিন হাসি নি ।

আমার নতুন জীবন শুরু হলো । আনন্দময় জীবন । সেই শীতে আমি এবং রানু মিলে সুন্দর বাগান কবলাম । কসমস, ডালিয়া, গাঁদা ফুলের গাছ । ইসমাইল চাচা নিজে শুরু করলেন গোলাপের চাষ । তিনি একজন মালী রাখলেন । খুব নাকি এক্সপার্ট মালী— নাম বংশন মিয়া । সেই এক্সপার্ট মালীকে দেখা গেল খুরাপ হাতে ঘুরে বেড়ায় । কাছে গেলেই ফুল বিষয়ে একটি গল্প বলে— বুঝলেন ভাইডি, আল্লাহতালা তো বেহেশতো বানাইলেন— সেই বেহেশতে কিন্তু কোনো ফুলগাছ নাই । তিনি বললেন, আমার বেহেশতে আমি ফুল দেব না । ফুল দিলে ফুল হবে মানুষের চেয়ে সুন্দর । এটা ঠিক না । মানুষের চেয়ে সুন্দর কিছু আমি বেহেশতে রাখব না । বুঝলেন ভাইডি, এই জন্যে বেহেশতে ফুলগাছ নাই, ফুল নাই ।

বানু বলল, চুপ কর মিথ্যুক ।

রওশন কিছু বলতে গেলেই রানু তাকে থামিয়ে দিয়ে বলত, চুপ কর মিথ্যুক । আমি হো-হো করে হাসতাম ।

আমি হাসি ভুলে গিয়েছিলাম । হাসি পেলেও কখনো হাসতাম না । সব সময় মনের ভেতর থাকত, হাসলেই ওরা আমাব কালো জিহ্বা দেখে ফেলবে ।

বানু নামের এই অদ্ভুত মেয়েটি কখনো আমাকে আমার কালো জিহ্বা নিয়ে কিছু বলে নি । ভালোবাসা কী আমি আমাব জীবনে কখনো বুঝি নি । এই কিশোরী ভালোবাসার গভীর সমুদ্রে আমাকে ছুড়ে ফেলে দিল । রোজ রাতে ঘুমুতে যাবার সময় আমি কাঁদতাম । কাঁদতে-কাঁদতে বলতাম— আমি এত সুখী কেন ? জীবনের প্রথম অংশ দুঃখে-দুঃখে কেটেছে বলেই কি এই অংশে এত সুখ ?

মাস্টার সাহেব নামে একটি বিভীষিকা আমার জীবনে আছে, তা মনে রইল না । শুধু মাঝে-মাঝে বাবার দোতলা ঘরের দিকে তাকালে গা কাঁটা দিয়ে উঠত । কখনো ঐ ঘরের

কাছে যেতাম না। আমি একা না, অন্য কেউও যেত না। কারণ ইসমাইল চাচা কী জন্যে যেন একবার দোতলায় উঠেছিলেন— ফিরে এসে আমাকে এবং রানুকে বললেন, তোমরা কেউ ওদিকে যাবে না। কখনো না, ভুলেও না।

রানু বিস্মিত হয়ে বলল, কেন বাবা ?

তিনি কঠিন গলায় বললেন— আমি নিষেধ করেছি এই জন্যে। তিনি কাঠের মিশ্রি ডাকিয়ে দোতলা ঘরের দু'টি দরজাতেই আড়াআড়ি পাল্লা লাগিয়ে দিলেন। দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে কাঁটাতারের গেট করে দিলেন। আমার জীবনের একটি অন্ধকার অংশকে তিনি পুরোপুরি বন্ধ করে দিলেন। পুরোপুরি বোধহয় পারলেন না। মাঝে-মাঝে গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো খাট থেকে নেমে আসি। খাটের নিচে টেবের আলো ফেলি। না, কেউ সেখানে নেই। ভৃগুর নিঃশ্বাস ফেলে আবার ঘুমুতে যাই।

আমি ম্যাট্রিক পাস করলাম।

খুব ভালোভাবে পাস করলাম। পত্রিকায় আমার নাম ছাপা হলো। আইএসসি পরীক্ষায় আরো ভালো ফল করলাম। এবার পত্রিকায় ছবি ছাপা হলো। আমার কৌতূহল ছিল মনোবিজ্ঞানে, সায়েন্স ছেড়ে আর্টস নিলাম। ভর্তি হলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

রানুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল সহজ। এই সম্পর্কে কোনোরকম জটিলতা ছিল না। মেয়েদের সঙ্গে মেশার আমার পূর্ব-অভিজ্ঞতা নেই। কারো সঙ্গেই আমি কখনো মিশি নি। কাছ থেকে দেখিও নি। এই প্রথম একজনকে দেখলাম। অন্য মেয়েবা কেমন জানি না— এই মেয়েটিকেই জানি। সহজ একটা মেয়ে, কিন্তু রহস্যময়।

আমি রাত জেগে পড়ি, সে রাত জাগতে পাবে না। ঘুম-ঘুম চোখে পাশে বসে থাকে। আমি বলি, তুমি ঘুমিয়ে পড়। তুমি জেগে আছ কেন ?

সে বিস্মিত হয়ে বলে, তাই তো, আমি কেন জেগে আছি! আমি ঘুমাতে গেলাম। তুমি কতক্ষণ পড়বে ?

অনেকক্ষণ।

রাত একটা না রাত দু'টা ?

দু'টা।

আজ একটা পর্যন্ত পড়লে কেমন হয় ?

একটা পর্যন্ত পড়লে তোমার কী লাভ ?

তুমি রাত জেগে পড়। আমার দেখতে কষ্ট হয়।

কষ্ট হয় কেন ?

জানি না কেন হয়। তবে হয়।

আমি রানুর ভেতর অনেক অদ্ভুত-অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করতে লাগলাম। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, সারাক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার প্রবণতা। যতক্ষণ বাড়িতে থাকব ততক্ষণই সে আমার পাশে থাকবে।

বাড়ির রান্নাবান্না তাকে করতে হয়। রান্না করতে যাবে, কিছুক্ষণ পরপর উঠে আসবে। আমি যদি বলি— কী ? সে তৎক্ষণাৎ বলবে, কিছু না।

মাঝে-মাঝে সে ভয়াবহ অস্থিরতার ভেতর দিয়ে যায়। দেখেই মনে হয় তার উপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। যে ঝড়ের কারণ সে জানে না। আমিও জানি না।

ইসমাইল চাচা তাঁবু নারায়ণগঞ্জের বাড়িতে চলে যাওয়া ঠিক করলেন। রানু বলল, অসম্ভব, আমি যাব না। ও বেচারী একা থাকবে? এত বড় বাড়িতে একা থাকলে ভয় পাবে না? এমনিতেই সে ঘুমের মধ্যে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখে কাঁদে। যদি যেতে হয় তাকে নিয়ে যেতে হবে। বাবার সঙ্গে সে চাপা গলায় ঝগড়া করে এবং এক সময় আমাকে এসে বলে, তুমি কি চাও আমরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাই?

আমি বলি, না না। কখনো চাই না।

তুমি চাইলেও আমি যাব না। তুমি কখনো, কোনোভাবেই এ বাড়ি থেকে আমাকে তাড়াতে পারবে না।

কী আশ্চর্য! তাড়ানোর প্রশ্ন আসছে কেন?

আমি জানি না কেন আসছে। মাঝে-মাঝে আমার মাথা এলোমেলো হয়ে যায়। আমি কী করি না করি নিজেই বুঝি না। সরি। কীসব অদ্ভুত ব্যাপার যে আমার হচ্ছে! তুমি যখন বাত জেগে পড়, আমিও বাত জাগতে চেষ্টা করি। ঘুমে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসে। বাধ্য হয়ে ঘুমতে যাই। তখন আব ঘুম আসে না। রাতের পব রাত আমি না ঘুমিয়ে কাটাই। তুমি কি সেটা জান?

না। এখন জানলাম।

আমাব কী করা উচিত?

ঘুমের ওষুধ খাওয়া উচিত।

ঘুমের ওষুধ আমার আছে। কিন্তু আমি খাই না। রাত জেগে আমি নানান কথা ভাবি। আমার ভালোই লাগে।

আমাদের দিনগুলি এইভাবেই কাটছিল। তাবপব একদিন একটা ঘটনা ঘটল।

তখন আমি এমএ ক্লাসের ছাত্র। বর্ষাকাল। ক'দিন ধরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। সেদিন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। ক্লাস থেকে ফিবেছি বিকেলে। গেট দিয়ে বাড়িতে ঢোকায় সময় দেখি, বানু এই বৃষ্টির মধ্যে বাগানে দাঁড়িয়ে ভিজছে। কী যে সুন্দর তাকে লাগছে! আমি চৌঁচিয়ে বললাম— এই রানু, এই!

রানু ছুটে এলো। হাসতে-হাসতে বলল, এই যে ভাই ভালো ছাত্র— তুমি কি আমার সঙ্গে একটু বৃষ্টিতে ভিজবে? নাকি খারাপ ছাত্রীর সঙ্গে বৃষ্টিতে ভেজা নিষেধ?

আমি বললাম, না, নিষেধ না— চল বৃষ্টিতে ভিজি।

অসুখে পড়লে আমাকে কিন্তু দোষ দিতে পারবে না।

না, দোষ দেব না। দাঁড়াও, খাতাটা রেখে আসি।

বানু বলল, না না। খাতা রাখতে যেতে পারবে না। খাতা ছুড়ে ফেলে দাও।

আমি খাতা ছুড়ে ফেললাম। রানু চৌঁচিয়ে বলল, স্যান্ডেল খুলে ফেল। আজ আমরা গায়ে কাদা মাখব। পানিতে গড়াগড়ি খাব। দেখ বাগানে পানি জমেছে।

আমি স্যান্ডেল ছুড়ে ফেললাম। রানু বলল— আজ বাসায় কেউ নেই। পুরো বাড়িতে শুধু আমরা দু'জন।

রানু কথাগুলি কি অন্যভাবে বলল? কেমন যেন শোনাল। যেন সে প্রবল জ্বরের ঘোরে কথা বলছে। কী বলছে সে নিজেও জানে না।

আমি বললাম, তোমার কী হয়েছে রানু?

রানু থেমে-থেমে বলল, আমার কী হয়েছে আমি জানি না। আমার খুব অস্থির-অস্থির লাগছে। আমি আজ ভয়ঙ্কর একটা অন্যায় করব। তুমি রাগ করতে পারবে না। আমাকে খারাপ মেয়ে ভাবতে পারবে না।

রানু ঘোবলাগা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সে অদ্ভুত গলায় বলল, তুমি আমাকে খারাপ মেয়ে ভাব আর যা-ই ভাব— আমি এই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে একটা অন্যায় করব। প্লিজ, চোখ বন্ধ কর। তুমি তাকিয়ে থাকলে অন্যায়টা আমি করতে পারব না।

চোখ বন্ধ করতে গিয়েও চোখ বন্ধ করতে পারলাম না। আমি বুঝতে পারছি রানু কী করতে যাচ্ছে। আমি কেন, যে-কোনো মানুষই তা বুঝবে। আমার নিজেরও যেন কেমন লাগছে। হঠাৎ দোতলার দিকে তাকালাম, আমার সমস্ত শরীর বেয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। আমি দেখলাম, আমার উলঙ্গ মাষ্টার সাহেব বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। তিনি কী চান আমি সঙ্গে-সঙ্গে বুঝলাম। তিনি আমার সব প্রিয়জনদের একে-একে সরিয়ে দিচ্ছেন— প্রথমে বাবা, তারপর সর্দার চাচা। এখন রানু। তা সম্ভব না। কিছুতেই সম্ভব না।

আমি রানুকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলাম। সে মাটিতে পড়ে গেল।

সে অবাক হয়ে বলল, কী হয়েছে?

আমি কঠিন গলায় বললাম, তোমাকে এক্ষুণি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। এক্ষুণি। এই মুহূর্তে। যেভাবে আছ সেইভাবে।

বানু কোনো প্রশ্ন করল না। উঠে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে লাগল। ইসমাইল চাচা চুকলেন তার কিছুক্ষণের মধ্যেই। তিনি বললেন— কী ব্যাপার?

আমি কঠিন গলায় বললাম, চাচা, আপনি আপনার মেয়েকে নিয়ে এক্ষুণি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন।

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, কী হয়েছে?

আমি তার জবাব দিলাম না। রানু মাথা নিচু করে ঘবে ঢুকে গেল। তার এক ঘণ্টাব ভেতরই বাবা মেয়েকে নিয়ে চলে গেলেন।

অনেক অনেক দিন পর আমি আবার একা হয়ে গেলাম। সন্ধ্যার পর থেকে ঘন হয়ে বৃষ্টি নামল। রীতিমতো ঝড় শুরু হলো। ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। আমি অন্ধকার বারান্দায় বসে রইলাম। আমার দৃষ্টি দোতলার বারান্দার দিকে। জায়গাটা গাড় অন্ধকারে ডুবে আছে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবে মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎ চমকে উঠছে— সেই আলোয় আমি উলঙ্গ মাষ্টার সাহেবকে রেলিঙে ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছি।

বাতাসের এক-একটা ঝাপ্টা আসছে। সেই ঝাপ্টায় ভেসে আসছে সিগারেটের কড়া গন্ধ। আবার সেই গন্ধ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে হাসনাহেনার গন্ধে। সেবার আমাদের হাসনাহেনার গাছে প্রথমবারের মতো ফুল ফুটেছিল। মানুষের সঙ্গে গাছের হয়তো কোনো সম্পর্ক আছে। নয়তো কখনো যে-গাছে ফুল ফোটে না— হঠাৎ সেখানে কেন ফুল ফুটল ?

রাত বাড়তে লাগল। বৃষ্টি বাড়তে লাগল। কামরাঙা গাছের ডাল বাতাসে নড়তে লাগল। আমি এগিয়ে গেলাম দোতলার দিকে। সিঁড়ির মুখ কাঁটাতার দিয়ে বন্ধ। মাষ্টার সাহেব বললেন, কাঁটাতারের বেড়া খুলে রেখেছি, তুমি উঠে এস।

আমি উঠে গেলাম। কঠিন গলায় বললাম, আপনি কী চান ?

তিনি বললেন, আমি কিছু চাই না তনুয়। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।

আপনার সাহায্যের আমার প্রয়োজন নেই।

তুমি তো ভুল কথা বলছ তনুয়। এখন আমার সাহায্যের তোমার সবচে' বেশি প্রয়োজন। আমি কথা দিয়েছিলাম তোমাকে সাহায্য করব। আমি আমার কথা রাখি।

আপনি কেউ না। আপনি আমার অসুস্থ মনকে কল্পনা।

কে বলল তোমাকে ?

আমি মনোবিদ্যার ছাত্র। আমি জানি। আমি সিজোফ্রেনিয়ার রোগী। সিজোফ্রেনিয়ার বোগীদের হেলুসিনেশন হয়। তারা চোখের সামনে অনেক কিছু দেখতে পায়। আমি তাই দেখছি।

তোমাদের ইসমাইল সাহেব কি সিজোফ্রেনিয়ার রোগী ?

না।

তিনি কিন্তু আমাকে দেখেছেন। কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছেন। এ-ঘরে তোমাদের আসতে নিষেধ করেছেন। নিষেধ করেন নি ?

হ্যাঁ, করেছেন।

তোমার বাস্কবী বানু মেয়েটিও কিন্তু আমাকে দেখেছে। ঘটনাটা তোমাকে বলি। এক দুপুরবেলায় সে হাঁটতে-হাঁটতে আমার ঘরের দিকে চলে এলো। তাকাল বারান্দার দিকে। আমি তখন বারান্দায় এসে দাঁড়িলাম। নগ্ন অবস্থায় দাঁড়িলাম বলাই বাহুল্য। মেয়েটা হতভম্ব হয়ে গেল। আমি তখন কুৎসিত একটা কথা বললাম... বললাম...

চুপ করুন।

রেগে যাচ্ছ কেন ? রেগে যাবার কী আছে— তোমার কথা যদি ঠিক হয় তাহলে আমার সন্তিত্ব নেই। আমি তোমার মনের কল্পনা। কাজেই আমি মেয়েটিকে কী বলেছি তা শুনতে তোমার আপত্তি হবে কেন ? আমি মেয়েটিকে...

Stop.

হা-হা-হা। মেয়েটি এতই ভয় পেয়েছিল যে নড়তেচড়তে পারছিল না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। এই ফাঁকে আমি কিছু কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করলাম। কে জানে এগুলি হয়তো তার পছন্দ হয়েছে।

আমি আপনার পায়ে পড়ছি, থামুন।

বেশ, থামলাম। রানু তোমাকে এই ঘটনার কিছুই বলে নি?

না।

আমার কথায় তোমার যদি সন্দেহ থাকে, তুমি তাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার।

জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি না। আমি আপনার কথা বিশ্বাস করলাম।

ভেরি শুভ। এখন মনোবিজ্ঞানীর ছাত্র, তুমি আমাকে বলো, তোমার ইসমাইল চাচা কিংবা তোমার বান্ধবী— ওরা সিজোফ্রেনিয়ার রোগী না হয়েও আমাকে দেখছে কী করে? এর ব্যাখ্যা কী?

আমি এর ব্যাখ্যা জানি না।

শুধু তুমি কেন, কেউই জানে না। এই পৃথিবীতে ব্যাখ্যা করা যায় না এমন জিনিসের সংখ্যাই বেশি।

আমি ব্যাখ্যা করতে পারছি না। কিন্তু একজন পারবেন।

তাই নাকি! সেই একজনটা কে?

তিনি আমার স্যাব। তাঁর নাম মিসির আলি।

নিয়ে এসো তোমার স্যারকে।

তাকে আনার আমি কোনো প্রয়োজন দেখছি না। আমার সমস্যা আমিই সমাধান করব।

এবং যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করবে আমার কোনো অস্তিত্ব নেই?

হ্যাঁ।

ভালো, খুব ভালো। আমি তোমাকে সময় দিচ্ছি।

আপনাকে একটা কথা দিতে হবে। আপনি রানুর কোনো ক্ষতি করতে পারবেন না।

তুমি অদ্ভুত কথা বলছ তন্নয়। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না, আবার তুমি বলছ— আমি রানুর কোনো ক্ষতি করতে পারব না। এরকম করছ কেন?

এরকম করছি, কারণ মানুষ একই সঙ্গে বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাস করে না।

কে বলেছে, তোমার স্যার?

হ্যাঁ।

ইন্টারেক্টিং মানুষ। তাঁর সঙ্গে আমার কথা বলা দবকাব। উনি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করবেন আমার অস্তিত্ব নেই। আমি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করব উনাব অস্তিত্ব নেই। হা-হা-হা। কবে তুমি তাঁকে আমার কাছে নিয়ে আসবে?

আনব। তাঁকে আমি আনব। আপনাকে কথা দিতে হবে, আপনি রানুর কোনো ক্ষতি করবেন না।

দেখ তন্নয়, আমি তোমার স্বার্থ দেখব। তোমাব ভালো দেখব। যদি আমার কখনো মনে হয় এই মেয়ের কারণে তোমার ক্ষতি হচ্ছে, তখনি আমি তাকে সরিয়ে দেব। এখন আমার অনেক ক্ষমতা। তবে এ-জাতীয় সিদ্ধান্ত যখন নেব, তোমাকে জানিয়েই নেব।

আপনাকে ধন্যবাদ।

যাও, ঘুমুতে যাও। সমস্ত দিনে তোমার উপর দিয়ে অনেক ধকল গিয়েছে। তোমার ঘুম দরকার। রানুর টেবিলের ড্রয়ার ভরতি ঘুমের ওষুধ। তুমি দু'টা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমিয়ে পড়। শুভ রাত্রি। ভালো কথা, ঘুমুতে যাবার আগে ভেজা কাপড় বদলে নিও।

১১

মিসির আলি হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছেন। জ্বর সারলেও শরীর খুব দুর্বল। রিকশায় বাসায় আসতে গিয়েই ক্লান্ত হয়েছেন। রীতিমতো হাঁপ ধরে গেছে। বিকেলে এসেছেন। এসেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। খুব ক্লান্ত অবস্থায় ঘুম ভালো হয় না। ঘুমের তৃপ্তি পাওয়া যায় না। তার উপর বদু কিছুক্ষণ পরপর এসে মাথায় হাত দিয়ে জ্বর এলো কিনা দেখে যাচ্ছে। সন্ধ্যাবেলা সে ডেকে তুলে ফেলল। তার বিখ্যাত দার্শনিক উক্তির একটি শোনাল, সইক্ষ্যাকালে ঘুমাইলে আয়ু কমে। সইক্ষ্যাকালে মাইনষের বাড়িতে-বাড়িতে আজরাইল উঁকি দেয়। এই জন্যে সইক্ষ্যাকালে জাগনা থাকা লাগে। উঠেন, চা-পার্নি খান।

আজবাইল এসে তাকে যেন ঘুমন্ত অবস্থায় না পায়, সে জন্যেই মিসির আলি উঠে হাত-মুখ ধুলেন। চা খেলেন। সিগারেট খেতে এখন আর বাধা নেই। ডাক্তার নার্স ছুটে আসবে এই আশঙ্কা থেকে তিনি মুক্ত, তবু সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করছে না। পার্কের দিকে বেড়াতে যেতে ইচ্ছা কবছে। শরীরে বোধহয় কুলাবে না।

বদু।

জে স্যাব ?

আমি হাসপাতালে থাকাকালীন সময়ে কেউ আমার খোঁজ করেছিল ?

জে-না। আপনারে কে খুঁজবে ?

মিসির আলি ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন। তাই তো, কে তাঁকে খুঁজবে ? তিনি হালকা গলায় বললেন, I have no friends, nor a toy.

স্যার, রাইতে কী খাইবেন ?

যা খাওয়াবি তাই খাব।

শিং মাছ আনছি। অসুখ অবস্থায় স্বাস্থ্যের জন্যে ভালো।

আচ্ছা।

অতি অখাদ্য শিং মাছের ঝোল দিয়ে মিসির আলিকে রাতের খাবার শেষ করতে হলো। রোগীর খাদ্য, এ জন্যেই কোনোরকম মসলা ছাড়া বদু শিং মাছ রান্না করেছে। মিসির আলি বললেন, মুখে দিতে পারছি না তো রে বদু।

অসুখ অবস্থায় মুখে রুচি থাকে না।

রুচি আসবে কোথেকে ? তুই তো মাছগুলি শুধু লবণ পানিতে সেদ্ধ করেছিস!

এই খাওয়া লাগব স্যার। অসুখ অবস্থায় মসলা হইল বিষ।

খাওয়ার পর বদু তার পড়া নিয়ে এলো। মিসির আলি বললেন, আজ থাক বদু। খুব টায়ার্ড লাগছে। আজ শুয়ে পড়ি।

বদু বলল, দুই মিনিটের মামলা।

বদু মিসির আলিকে চমৎকৃত করল— বাংলা বর্ণমালার প্রতিটি অক্ষর নির্ভুল বলে গেল। মিসির আলি বললেন, ব্যাপার কী ?

শিখলাম।

তাইতো দেখছি। শিখলি কীভাবে ?

তনুয় ভাইজান একবার আইস্যা বলল, শোন বদি, তুমি যদি অক্ষরগুলি শিখে ফেলতে পার, তা হলে তোমার স্যার হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে তোমার কাণ্ড দেখে খুব খুশি হবেন।

বদু তনুয়ের কথাগুলি শুধু যে শুদ্ধ ভাষায় বলল, তাই না, তনুয়ের মতো করেছে বলল।

মিসির আলি বললেন, আমি খুশি হয়েছি। শিখলি কীভাবে ? কে দেখিয়ে দিয়েছে ?

তনুয় ভাইজান দেখাইয়া দিছে। বোজ রাইত কইরা একবার আসত। বুঝছেন স্যার, ভালো লোক। আপনাব মতোই ভালো। ভালো লোকের কপালে দুঃখ থাকে। এই জন্যেই আফসোস।

তনুয় কি রোজই আসত ?

জি, রোজই একবার আসছেন।

আজ আসবে ?

জি, আসব। বইল্যা গেছে আসব।

মিসিব আলি তনুয়েব জন্যে অপেক্ষা কবতে লাগলেন। সে এলো ঠিক দশটায়। ঘবে ঢুকতে-ঢুকতে বলল, স্যাব, আপনাব শরীব এখন কেমন ?

মিসিব আলি বললেন, খুব খাবাপ। শুধু ঘুম পায়। কিন্তু ঠিকমতো ঘুম আসে না।

আমি আজ বরং উঠি।

না না, তুমি বসো। তোমাব সঙ্গে আমাব কথা আছে।

আপনি কি আমাব লেখাগুলি পড়ে শেষ করেছেন ?

হ্যাঁ, শেষ করেছি। এই নিয়েই তোমাব সঙ্গে কথা বলব।

আজ না হয় থাক স্যাব। আপনাকে দেখাচ্ছেও খুব ক্লান্ত।

ক্লান্ত দেখালেও আমার যা বলাব আজই বলতে চাই। এবং তোমাব আমাকে যা বলাব তা আজই বলা শেষ কববে। ব্যাপাবটা তোমাব উপব যেমন চাপ ফেলছে, আমাব উপরও চাপ ফেলছে। তোমাব সঙ্গে কি গাড়ি আছে ?

আছে।

চল তা হলে পার্কে চলে যাই। যেখানে গল্পের শুরু হয়েছে, সেখানেই শেষ হোক।

এই ঠাণ্ডায় পার্কে যাবেন ?

হুঁ।

মিসির আলি চাদর গায়ে দিলেন। বদুকে দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়তে বললেন। মিসির আলিকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে। ঘর থেকে বেরুবার সময় দরজায় ধাক্কা খেলেন।

পার্কের বাইরে রাস্তায় আলো আছে। পার্কের ভেতর আলো নেই। মিসির আলি এবং তন্ময় বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে আছেন। আজ শীত কম। তারপরেও চাদরে সারা শরীর ঢেকে মিসির আলি জবুজবু হয়ে বসে আছেন। মিসির আলির শীত লাগছে। পার্ক পুরোপুরি ফাঁকা। আকাশে চাঁদ আছে, তবে গাছপালার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো আসতে পারছে না। জোছনা খেলছে গাছের পাতায়। মিসির আলি জোছনা দেখছেন।

তন্ময়।

জি ?

তোমার লেখা আমি মন দিয়ে পড়েছি। খুব মন দিয়ে পড়েছি। আমার মনে হয় না, আমার সাহায্যের তোমার প্রয়োজন আছে। তুমি ঠিক পথেই এগুচ্ছ। একজন মনোবিজ্ঞানীর যেভাবে এগুনো উচিত, তুমি সেইভাবেই এগুচ্ছ।

স্যাব, আমি পারছি না।

আমার তো মনে হয় পারছ। খুব ভালোভাবেই পারছ।

না, পারছি না। বানু খুব শিগর্গরই বিপদে পড়বে। মাস্টার সাহেব তাঁকে সরিয়ে দেবেন। বানু একটি চিঠি পেয়েছে। তাঁকে আমাদের বাড়িতে আসতে বলা হয়েছে। কিন্তু আমি তাকে কোনো চিঠি লিখি নি, চিঠি পাঠিয়েছেন মাস্টার সাহেব।

মিসির আলি বললেন, মাস্টার সাহেব বলে কেউ নেই। তুমি তা খুব ভালো করে জান। জান না ?

তন্ময় চুপ করে বইল।

তোমার মনে কি সন্দেহ আছে ?

হ্যাঁ।

কেন ?

আপনি এক সময় বলেছেন, সব প্রশ্নের দুটি উত্তর— হ্যাঁ এবং না। মাস্টার সাহেব বলে কি কিছু আছে ? এই প্রশ্নেরও দুটি উত্তর হবে— হ্যাঁ এবং না।

তুমি সামান্য ভুল করেছ তন্ময়। আমি যা বলেছিলাম, তা হলো, প্রশ্নের একটিই উত্তর। হয় হ্যাঁ কিংবা না। কিন্তু মানুষ যেহেতু অস্বাভাবিক একটি প্রাণী, সে দুটি উত্তরই একই সঙ্গে গ্রহণ করে, যদিও সে জানে উত্তর হবে একটি।

তন্ময় নিঃশ্বাস ফেলল। মিসির আলি বললেন, এসো এক কাজ করা যাক। তোমার সমস্যাটা আমরা একসঙ্গে সমাধান করাব চেষ্টা করি। আমরা ধাপে-ধাপে অগ্রসর হব। আমরা ব্যবহার করব লজিক। লজিক হচ্ছে বিগুপ্ত বিজ্ঞান। লজিকের বাইরে কিছুই থাকতে পারে না।

মিসির আলি সিগারেট ধরালেন। একটু ঝাঁকে এলেন তন্ময়ের দিকে—

তন্ময়, তোমার মা খুব ছোটবেলায় তোমাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন। তোমার বাবা তোমাকে সহ্য করতে পারতেন না। তোমাকে বাইরের কারো সঙ্গে মিশতে দেয়া হতো না। সর্দার নামের একজন লোক রাখা হয়েছিল শুধুমাত্র তোমাকে অন্যদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে, এমনকি স্কুল থেকেও তোমাকে

ছাড়িয়ে নিয়ে আসা হলো। একজন মাস্টার দেয়া হয়েছিল, সেও রইল না। তোমাকে সবার কাছ থেকে আলাদা করে দেয়ার কারণটা কী তন্নয় ? এমন কী তোমার আছে, যে, তোমাকে সবার কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে হবে ?

আমি জানি না স্যার।

মিসর আলি শীতল গলায় বললেন, তন্নয়, তুমি জান।

না, আমি জানি না।

তুমি জান, কিন্তু তুমি তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নও। প্রস্তুত নও বলেই তোমার মস্তিষ্কের একটি অংশ ন্যাপারটা জানে না। তোমার অবচেতন মন কারণটা জানে— কিন্তু তোমাকে জানাতে চাচ্ছে না। সমস্যাটা এখানেই। তোমার মস্তিষ্ক ধরে নিয়েছে, কারণ জানলে তোমার প্রচুর ক্ষতি হবে। সে ক্ষতি হতে দেবে না। কাজেই সে তোমাকে রক্ষা করার চেষ্টা শুরু করল। সে ঠিক করল, কোনোদিনই তোমাকে কিছু জানাবে না। বুঝতে পারছ ?

পারছি।

পারার কথা— মনোবিজ্ঞানের সহজ কিছু প্রিন্সিপালই বলা হচ্ছে। জটিল কিছু নয়। তাই না ?

হ্যাঁ তাই। Conflict between conscious and sub-conscious

এখন এস দ্বিতীয় ধাপে। এখানে আমরা কী দেখছি ? এখানে দেখছি তোমাকে ঘিরে যাঁবা আছেন, তাঁরা সরে যাচ্ছেন। প্রথম সবলেন তোমার মা। তিনি দূবে চলে গেলেন। তাবপর গেলেন তোমার বাবা, তাবপর সর্দার চাচা। এঁবা কাবা ? এঁবা তোমাব খুব কাছাকাছির মানুষ। তোমার ভেতরে যে-অস্বাভাবিকতা আছে, যে-অস্বাভাবিকতাব জন্যে তোমাকে আলাদা রাখা হচ্ছে— এঁরা তা জানেন। তোমার মস্তিষ্ক ঠিক কবল, এদেবও সর্বিযে দেয়া দরকার। এঁদেব সে সরিয়ে দিল। সরিয়ে দেবাব জন্যে একটি ভয়াবহ ব্যাপারের অবতারণা কবতে হলো— সেই ভয়াবহ ব্যাপার হলো মাস্টার সাহেব। তোমাব মস্তিষ্ক সেই মাস্টার তৈরি করল। যে কারণে মাস্টার বারবার বলছে— আমি তোমাকে রক্ষা করব, তোমাকে সাহায্য কবব। তোমার মঙ্গল দেখব।

তন্নয় শীতল গলায় বলল, আমাব অস্বাভাবিকতাটা কী ?

মিসর আলি বললেন, সেই অস্বাভাবিকতাটা কী আমি নিজে তা ধরতে পারছিলাম না। যখন রানু প্রসঙ্গ এলো তখন ধরতে পারলাম— তুমি হচ্ছে একজন অপূর্ণ মানুষ। তুমি পুরুষ নও, নাবীও নও। তুমি হলে— Hermaphrodite, বৃহন্নলা। কথ্য বাংলায় আমরা বলি হিজড়া। দেখ তন্নয়, কঠিন সত্য তুমি প্রথম জানলে তোমার বয়োসন্ধিকালে। নিজে-নিজেই জানলে, কেউ তোমাকে জানায় নি। এই সত্য তুমি গ্রহণ করলে না। তোমার মস্তিষ্ক এই কঠিন সত্য পাঠিয়ে দিল অবচেতন মনে। সেই অবচেতন মনই তৈরি করল মাস্টার, যে-মাস্টারের প্রধান কাজ এই সত্য গোপন রাখা। গোপন রাখার জন্যেই সে এই সত্য যারা জানে, তাদের একে-একে সরিয়ে দিতে শুরু করল। যখন তারা সরে গেল— তোমার অবচেতন মন নিশ্চিন্ত হলো। মাস্টার সাহেবের তখন আর প্রয়োজন হলো না। দীর্ঘদিন তুমি আর তার দেখা পেলে না। বুঝতে পারছ ?

তন্ময় জবাব দিল না।

আমাব লজিকে কি কোনো ভুল আছে ?

তন্ময় তাবও জবাব দিল না। মিসিব আলি বললেন, আবাব সেই মাস্টাবেব প্রয়োজন পডল, যখন বানু নামেব অসাধাৰণ একটি মেয়ে তোমাকে জড়িয়ে ধবতে চাইল। সে তোমাকে কামনা কবছে পুৰুষ হিসেবে। তুমি পুৰুষ হিসেবে তাব কাছে যেতে পাবছ না। তুমি কঠিন সত্য তাকে বলতে পাবছ না, অন্য একজন পুৰুষ এই মেয়েটিব কাছে যাক তাও তুমি হতে দিতে পাব না, কাৰণ তুমি এই মেয়েটিকে অসম্ভব ভালোবাস। কাজেই আবাব মাস্টাব জেগে উঠল। তুমিই তাকে জাগালে। তুমিই ঠিক কবলে মেয়েটিকে সবে যেতে হবে। তন্ময়।

জি ?

তুমি কি এই দৈত্যটাকে বাঁচিয়ে বাখবে, না নষ্ট কবে দেবে ? খুব সহজেই তাকে তুমি ধ্বংস কবতে পাব। সেই মুহূর্তে তুমি বানুকে গিয়ে তোমাব জীবনেব গল্প বলবে— সেই মুহূর্ত থেকে মাস্টাবেব কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। বানুব সঙ্গে কি তোমাব যোগাযোগ আছে ?

না। তবে মাঝে মাঝে দূৰ থেকে আমি তাকে দেখি।

সে কি নিয়ে কবেছে ?

না।

শোন তন্ময়, গভীৰ ভালোবাসায় এক বৰ্ষাব দিনে সে তোমাকে জড়িয়ে ধবতে চেষ্টাছিল — তখন তুমি তাকে কঠিন অপমান কৰিছিলে। এই অপমান তাব প্রাপ্য নয়। তোমাব কি উচিত না সেই দিনেব ঘটনাৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰা ?

হা। উচিত।

প্রকৃত তোমাব উপৰ কঠিন অবিচাৰ কবেছে। তোমাকে অপূৰ্ণ মানুষ কবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। সেই প্রতিশোধ তো তুমি মেয়েটিব উপৰ নিতে পাব না। আমি কি ঠিক বলছি ?

হ্যা, ঠিক বলছেন। আমি গানুশে সব বলব।

তন্ময় ক'দেছে। মিসিব আলি বানুৰ শব্দ শুনছেন না, কিন্তু বুঝতে পাবছেন। তিনি নিজে অসহায় বোধ কবতে শুরু কবেছেন

তন্ময় বলল, স্যাব, চলুন, আপনাকে বাসায়ে দিয়ে আসি।

মিসিব আলি বললেন, তুমি আমাকে তোমাব বাড়িতে নিয়ে চল। তোমাব মাস্টাব সাহেব যে দোতলায় থাকেন তোমাকে নিয়ে আমি সেখানে যাব। তুমি দেখবে সেখানে কেউ নেই।

স্যাব, আমি আপনাকে নিয়ে যেতে চাই না।

কেন চাই না ?

আমাব জীবনেব কঠিন এবং ঘৃণ্য সত্য যাব জানে— তাবা কেউ বেঁচে নেই। এই সত্য আপনি জানেন। মাস্টাব আপনাৰ ক্ষতি কবতে পাবে।

মিসিব আলি বললেন, মাষ্টাব বলে যে কিছু নেই, তা-ই আমি তোমাকে দেখাব।
তুমি আমাকে নিয়ে চল।

১২

গেটেব ভেতর পা দিয়ে মিসিব আলি চমকে উঠলেন। তাঁর মন বলতে লাগল — কিছু-একটা আছে এখানে, কিছু-একটা আছে। এখানকাব পরিবেশ অন্যবকম। বাতাস পর্যন্ত যেন অন্যবকম। বাগানেব জোছনাও একধবনেব ভয় তৈবি কবছে। ন'টা বিকটাকাব কুকুর চেন দিয়ে বাঁধা। তাবা একসঙ্গে চাপা গর্জন কবছে। সেই গর্জনও কেমন অন্যবকম শোনাচ্ছে।

তন্ময় বলল, মাষ্টাব সাহেব এখনো আছেন। তিনি দোতলাব বাবান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন, আমি বুঝতে পারছি।

তোমাব মাষ্টাবেব নাম কী তন্ময় ?

নাম জানি না।

নাম জান না, তাব কাবণ তাব কোনো নাম নেই— কাবণ সে নিজেই নেই। তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি একা যাব। তাবপরে ফিবে এসে তোমাকে নিয়ে যাব।

স্যাব, আপনি যাবেন না।

আমাক যেতেই হবে।

স্যাব মাষ্টাব সাহেবেব অনেক ক্ষমতা।

এই ক্ষমতা তুমি তাঁকে দিয়েছ। ক্ষমতা কেড়ে নেবা সব সময় হয়েছে। তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক।

মিসিব আলি এগিয়ে গেলেন। চাঁদেব আলোয় দোতলা বাবান্দা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মিসিব আলি বেলিং-এ তেলান দিয়ে একজন নগ্ন মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। সঙ্গে-সঙ্গে তামাকেব কটু গন্ধও পেলেন। মিসিব আলি দাঁড়িয়ে পড়লেন। ছায়ামূর্তি শীতল গলায় বলল, কেমন আছেন মিসিব আলি সাহেব ?

ভালে।

আমাকে দেখতে পাচ্ছেন ?

পাচ্ছি।

আমি আছি না নেই ?

আপনি নেই।

তাহাশে দেখছেন কী কবে ?

আমাব দৃষ্টিবিভ্রম হচ্ছে। শারীরিক দিক থেকে আমি খুবই অসুস্থ। তাব উপব তন্ময়েব গল্প আমাব উপব প্রভাব ফেলেছে বলেই হেলুসিনেশন হচ্ছে।

বাহ, যুক্তি সাজিয়েই এসেছেন।

আমি খুবই যুক্তিবাদী মানুষ মাষ্টাব সাহেব।

আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবার খুব শখ ছিল— আপনি আমার ছাত্রের সমস্যা এত দ্রুত এবং এত সহজে ধরবেন তা আমি বুঝতে পারি নি। আমি আপনার চিন্তাশক্তির প্রশংসা করছি।

আপনাকে ধন্যবাদ।

একটা মজার জিনিস কী আপনি লক্ষ্য করছেন মিসির আলি সাহেব? আপনি তন্ময় শিক্ষক। আমিও তাই শিক্ষক। আমি তাকে তাই সমস্যা থেকে রক্ষা করার জন্যে আছি। আপনারও একই ব্যাপার।

তাই তো দেখছি।

আমি প্রচুর সিগারেট খাই। আপনিও খান। খান না?

হ্যাঁ।

আপনি সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন কেন? উঠে আসুন না। নাকি আমাকে ভয় পাচ্ছেন?

মিসির আলি বললেন, আমি যদি আপনাকে ভয় পাই, তাহলে লজিক বলছে— আপনিও আমাকে ভয় পাবেন।

হ্যাঁ, লজিক অবশ্য তাই বলে। হ্যাঁ মিসির আলি সাহেব, আমি আপনাকে ভয় পাচ্ছি।

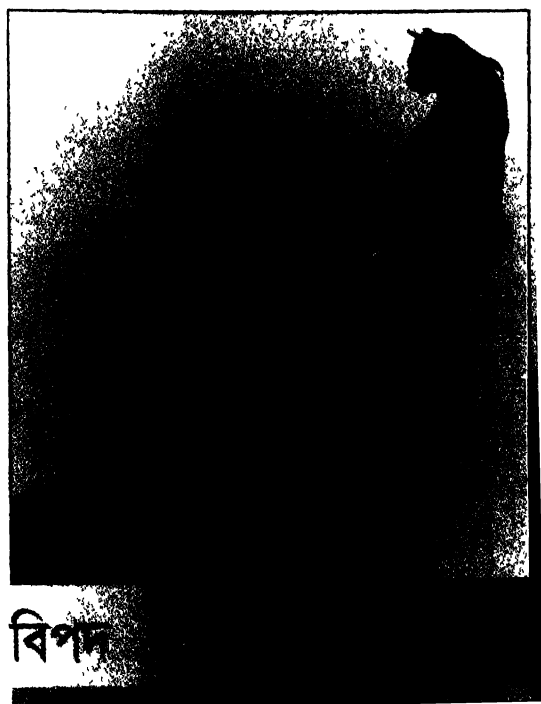
মিসির আলি সিঁড়ির গোড়ার কাঁটাভাবের গেটে হাত দিলেন এবং মনে-মনে বললেন, তুমিই কোনো অস্তিত্ব নেই। You do not exist তিন আবারো তাকালেন। বাবান্দায় কেউ নেই। ফাকা বাবান্দায় সুন্দর জোছনা হয়েছে। হাসনাহেনা ফুলের সুবাস আসছে। তিন উঁচু গলায় ডাকলেন, ওয়াশ, এসো।

ওয়াশ আসছে। সে আগে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটত। এখন আর হাঁটছে না। সে দোতলায় উঠে এলো। সে দাঁড়িয়ে আছে মিসির আলির কাছে। দেবশিশুর মতো কী সুন্দর মুখ। ঘন কালো চোখ, দীর্ঘ পল্লব।

মিসির আলি মনে মনে বললেন, প্রকৃতি অসুন্দর সহ্য করে না। তাই পবেও অসুন্দর তৈরি করে অসুন্দর লালন করে। কন করে?

ওয়াশ কদাচিৎ। তাই চোখ ভেজা। মিসির আলির ইচ্ছা করছে ছেলেটিকে বলেন, তুমি কাছে এসো, আমি মাথায় হাত বেঁচে তোমাকে একটু শাদব বরি।

তিন বলতে পেরলেন না। গভীর আবেগের কথা তিন কখনো বলতে পারেন না। মিসির আলি তাকালেন উঠানের দিকে – কামবাড়া গাছের পাণ্ডা ফাঁক দিয়ে জোছনা গলে গলে পড়ছে। কী অসহ্য সুন্দর।



আফসাব উদ্দিন খুব গম্ভীর ধবনের মানুষ। একটা দেশী জাহাজ কোম্পানির বড় অফিসার। বড় অফিসারবা এমনিতেই গম্ভীর হয়ে থাকেন। ইচ্ছে না কবলেও তাঁদের গম্ভীর থাকতে হয়। আফসাব সাহেবেব ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সেবকম নয়। তিনি এই পৃথিবীতে গাম্ভীর্য নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছেন। কঠিন হয়ে থাকতেই তাঁর ভালো লাগ। হাসি-তামাশা, ঠাট্টা, ফাজলামি তাঁর একেবারে সহ্য হয় না। তাঁর কথা হলো— হাসি-তামাশাই যদি লোকজন করবে তাহলে কাজ করবে কখন? পৃথিবীটা কোনো নাট্যশালা না যে হাসি-তামাশা করে লোক হাসাতে হবে।

আফসাব সাহেবেব দুর্ভাগ্য তাঁর আশপাশের মানুষজনের স্বভাব তাঁর স্বভাবের একেবারে উল্টো, তার স্ত্রী মীরা সর্বক্ষণই হাসছেন। কাবণে-অকাবণে হাসছেন। এই তো সেদিন তাদের কাজের ছেলে কুদ্দুস হাত থেকে ফেলে টি পট ভেঙে ফেলল। এই দেখে মীরা ফিক বসে হেসে ফেললেন। আফসাব সাহেব বললেন, একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। হাত থেকে ফেলে একটা দাম টিনিস ভেঙেছে। এত হাসির কী হলো?

মাঝে বললেন টি-পট ভেঙেছে দেখে হাসি নি। টি পট ভাঙার পর কুদ্দুস কেমন হতভম্ব হয়ে ভাঙা পটটার দিকে তাকিয়েছিল তাই দেখে হেসে ফেললাম।

তার মুখেও ভাঁসি দেখে তুমি হেসে ফেললে?

হ্যাঁ

দয়া করে আমার সামনে এই কাজটা করবে না। হাসতে ইচ্ছা করলে বাথরুমে ঢুকে দাঁড়া। এক করে হাসবে।

মাঝে অব্যবহাসে ফেললেন। অফসাব সাহেব বললেন, হাসলে যে?

তুমি কেমন মাঝে মুখে কথা বলছ তাই দেখে

দয়া করে আমার সামনে হাসক য় ও।

মাঝে ভেঙে চলে যান, তার হাসতে হাসতে যান। তা দেখেও আফসাব সাহেবেব পা জালা করে

তার দুই মেয়ে মীরা ও কমলাও অদিকল মাঝে মতো। দিনবাত হাসছে। তারা মাঝে মামা স্বপ্নের মতো মজার সব ঘটনা বাবাকে বলতে আসে, ঘটনা বললে কী, বলার আগেই হাসি

আফসাব সাহেব শীতল গলায় বলেন, কী বলতে চাচ্ছে ঠিকমতো বলো। এত হাসলে বলবে কী করে?

না হাসলে এই ঘটনা বলা যাবে না বাবা। হি-হি-হি— হয়েছে কী, আমাদের ক্লাসের একটা মেয়ে অকণা— হি হি-হি— সে কবল কী— হি-হি-হি।

চুপ কর।

ঘটনাটা শোন বাবা । ভারি মজার... তারপর অরুণা— হি-হি-হি ।

স্টপ । স্টপ ।

অরুণার গল্প বলা হয় না । মেয়ে দুটি দুঃখিত হয় । তবে সেই দুঃখও খুব সাময়িক । আবার কোনো একটা মজার ঘটনা ঘটে । এক বোন অন্য বোনের গায়ে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে ।

আজ সোমবার ।

আফসার সাহেব নাশতা খেতে বসেছেন । তাঁর দুই মেয়ে সুমী ও রুমী বসেছে দুপাশে । রুমী কী একটা হাসির কথা বলতে যাচ্ছিল । বাবা কড়া করে তাব দিকে তাকানোর কারণে সে চুপ করে গেল । সুমী তখন কী একটা বলতে গেল । মীরা চোখেব ইশাবায় তাকে থামিয়ে দিলেন । নাশতার টেবিলে হাসাহাসি না হওয়াই ভালো । মীরা টিপট থেকে কাপে চা ঢালছেন । হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটল । মেঝে থেকে লাফ দিয়ে একটা বেড়াল আফসার সাহেবের কোলে এসে বসল । আফসার সাহেব লাফ দিয়ে তিন হাত উপরে উঠে গেলেন । যে পিরিচে ডিম, রুটি, মাখন এবং পনিরের টুকরো সাজানো ছিল তা ছিটকে পড়ল মেঝেতে । পুরো ঘটনাটা ঘটল দু' সেকেন্ডের ভেতর ।

সুমী-রুমী খিলখিল করে হেসে ফেলল । তাবা জানে এখন হাসা মানেই বিপদ । ভয়ঙ্কর বিপদ । বাবা প্রচণ্ড রাগ কববেন । কিন্তু কিছুতেই তারা হাসি থামাতে পাবল না । মীরা খুব চেষ্টা কবছেন না হাসতে । দাঁত দিয়ে নিচেব ঠোঁট কামড়ে ধবেছেন । লাভ হচ্ছে না । হাসি এসে যাচ্ছে । আর বুঝি আটকানো গেল না ।

আফসার সাহেব মেঘ-গর্জন করলেন, রুমী-সুমী, তোমরা আমার সামনে থেকে উঠে গেলে আমি খুশি হব ।

মেয়ে দুজন তৎক্ষণাৎ ছুটে ঘবে চলে গেল । ঘবের ভেতর থেকে তাদের হাসি শোনা যাচ্ছে— হা-হা-হা— হি-হি-হি ।

এবাব মীরাও হেসে ফেললেন । তবে শব্দ কবে নয়, নিঃশব্দে । হাসিব কাবণে তাঁর হাত কাঁপছে । চায়েব কাপে ঠিকমতো চা ঢালতে পাবছেন না ।

মীরা ।

কী ?

হাসছ কেন জানতে পাবি ?

হাসি এসে গেল তাই হাসছি । বিশেষ কোনো কাবণে নয় ।

কেন হাসি এসে গেল তা জানতে পারি ?

সবি ।

সবির কোনো ব্যাপার না । তুমি বলো কেন হাসলে ?

মীরা গম্ভীর গলায় বললেন, তুমি কেমন চমৎকার শূন্যে উঠে গেলে । হঠাৎ মনে হলো পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বলে কিছু নেই । দৃশ্যটা দেখতে ভালো লাগল, তাই হাসলাম ।

তুমি যদি আমাৰ সামনে থেকে চলে যাও আমি খুশি হব।

সত্যি চলে যেতে বলছ ?

যদি হাসি বন্ধ কৰতে না পাব তাহলে অবশ্যই চলে যাবে।

তোমাৰ নাশতা তো বিডাল ফেলে দিয়েছে। নাশতা নিয়ে আসি ?

না।

চা দেই, নাকি চাও খাবে না ? ভালো কৰে তাকিয়ে দেখ আমি কিছু হাসাছি না।
গম্ভীৰ হয়ে আছি

বলতে বলতে মীৰা ফিক কৰে হেসে ফেললেন। খানিকটা চা ছলকে টোঁবলে পড়ে
গেল। তিন টি-পট নামিয়ে বেখে প্ৰায় ছুটে শোবাৰ ঘৰে ঢুকে দবজা বন্ধ কৰে দিলেন।
দুই মেয়েৰ হাসিৰ সঙ্গে যুক্ত হলো তাঁৰ হাসি।

চায়েৰ কাপ হাতে আফসাৰ সাহেব একা একা বসে আছেন। তাঁৰ মন বিষণ্ণ।
শোবাৰ ঘৰ থেকে মা এবং দুই মেয়েৰ হাসিৰ শব্দ ভেসে আসছে। হাসিৰ জোয়াৰ
নেমে'ল। বাণে আফসাৰ সাহেবেৰ গা জ্বলে গেল। যে বেডালেৰ জন্যে এত কাণ্ড সে
নিশ্চিও এবং আনন্দিত ভাজিতে মেয়ে'ত পড়ে থাকা ডিম, পনিৰ এবং মাখন কুটি আছে।
সে একা আছে না, তাৰ সঙ্গে দুটা ব'চ্চাও আছে। তাবাও আছে এবং মাৰে মাৰে চোখ
ভুলে আফসাৰ সাহেবকে দেখছে। আফসাৰ সাহেবেৰ ইচ্ছা কৰছে প্ৰচণ্ড লাথি দিয়ে
বিডালটাকে ফুটবলৰ মতো দৰে ছুড়ে দেন।

মোৰ পৰীক্ষাৰ কৰাৰ জন্যে কাজেৰ ছেলে কুদ্দুস এসেছিল। আফসাৰ সাহেব তাৰ
দিকে বাণ' চোখে তাৰ'তেই সে ভয় পেয়ে বাল্ল'ঘৰে ঢুকে গেল। তাবও কি হাসি বোগ
আছে ? বাল্ল'ঘৰ থেকে হাসিৰ মাত্ৰা আগুয়াঙা আসছে। হাঁ, কুদ্দুস ব্যাটাও হাসছে।

বিডাল পৰিবৰাৰ মহানন্দে খেয়ে যাচ্ছে। আফসাৰ সাহেবেৰ বাগ ক্ৰমেই বাডছে।
'তিনি কিক কৰ ফেললেন। এনে পায়ে বিডালটাব গায়ে একটা দুৰ্দান্ত কিক বসাবেন
যা'ত সে ভবিষ্য'ত কখনো এইভাবে তাকে অপদস্ত না কৰে। কিক বসাতে যাবেন তখন
একটা ব্যাপাৰ ঘটল। তিনি পৰীক্ষা শুনলে, মা বিডালটা যেসব কথা বলছে তা তিনি
বুঝতে পাবছেন। ম্যাও ম্যাও কৰাই নিচু গলায় কথা বলছে কিন্তু তিনি প্ৰতিটি শব্দ
বুঝতে পাবছেন। এ কী অদ্ভুত কাণ্ড।

মা বিডালটা বলছে, খোকাখুক মাৰধান। লোকটা আমাদেৰ দিকে তাকাচ্ছে।
মতলব ভালো না। মনে হচ্ছে উঠে দাঁড়াবে।

একটা বাচ্চা বিডাল বলল, উঠে দাঁড়াল কী হয় মা ?

লাথি মাৰতে পাবে। তোমবা একটু দূৰে সৰে যাও।

কতটা দূৰে যাব ?

খুব বেশি দূৰ যেতে হবে না। লাথি মাৰলেও সে তোমাদেৰ মাৰবে না। আশাকে
মাৰবে। মানুষ কখনো বিডালেৰ বাচ্চাব গায়ে হাত তোলে না।

কেন মা ?

মানুষের মনে মায়া বেশি এই জন্যে। তবু সাবধানের মার নেই। এই লোক খুব রেগে আছে। রেগে গেলে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না। কী করতে কী করে বসবে। কী দরকার রিস্ক নিয়ে ?

রিস্ক কী মা ?

রিস্ক হচ্ছে একটা ইংরেজি শব্দ। এর বাংলাটা ঠিক জানি না।

বিড়ালের বাচ্চা দুটি অনেকটা দূরে চলে গেল। সেখান থেকে তাকিয়ে রইল আফসার সাহেবের দিকে। আফসার সাহেব পাথরের মূর্তির মতো বসে রইলেন। ব্যাপারটা কী ? বিড়ালের মানুষের মতো কথা বলার কোনোই কারণ নেই। শুধুমাত্র রূপকথার বইতে পশুপাখি মানুষের মতো কথা বলে। এটা কোনো রূপকথা নয়। তিনি বিংশ শতাব্দীতে বাস করছেন। বাবর রোডের দোতলা বাসার ডাইনিং রুমে বসে আছেন। অফিসের গাড়ি চলে এসেছে, এখন অফিসে যাবেন। এই সময় বিড়ালের ভাষা তিনি বুঝতে পারছেন তা হতেই পারে না। বিড়াল একটিমাত্র শব্দ জানে— ‘মিয়াও’। এই শব্দের কোনো মানে নেই। আর থাকলেও মানুষের তা বোঝার কথা না।

আফসার সাহেব সিগারেট ধবালেন। একটা বিড়ালের বাচ্চা তখন কথা বলে উঠল— মা, লোকটা সিগারেট ধরিয়েছে। এখন বোধহয় আর আমাদের মাঝবে না।

বিড়ালের মা বলল, আমারও তাই ধারণা। তবে খোঁকাখুক এখন একটু সাবধানে থাক। কারণ লোকটা জ্বলন্ত সিগারেটের টুকবা ছুড়ে ফেলবে। গায়ে লাগলে তোমাদের পশমে আগুন ধরে যাবে। মনে নেই একবার জ্বলন্ত সিগারেটের টুকবায় পা দিয়ে পা পুড়ে ফেললে, মনে আছে ?

আছে। আচ্ছা মা তোমার এত বুদ্ধি কেন ?

দূব বেটি! আমার কোনো বুদ্ধি নেই।

তোমার অনেক বুদ্ধি। তুমি লাফ দিয়ে ওই লোকটার কোলে বসলে— এই ভ্রমোই তো সে নাশতার প্রেট মেঝেতে ফেলে দিল। তার নাশতা এখন আমবা খাচ্ছি। আচ্ছা মা, তুমি রোজ এইরকম কব না কেন ?

এরকম রোজ করা যায় না। পবপব দুদিন করলেই এবা খুব বাগ করবে। আমাদের বাড়ি থেকে বের করে দেবে। একদিন করেছি তো, সবাই ভাবছে অ্যাকসিডেন্ট।

অ্যাকসিডেন্ট কী মা ?

অ্যাকসিডেন্ট হচ্ছে একটা ইংরেজি শব্দ। এব মানে দুর্ঘটনা।

ভূমি ইংরেজিও জানো ?

অল্প অল্প জ্ঞান, শুনে শুনে শিখেছি। বাটার মানে মাখন, চিজ হলো পনির, নবমাল ওয়াটার মানে পানি তবে ফ্রিজের পানি না।...

ইস মা, তোমার যে কী বুদ্ধি!

আফসার সাহেবের মাথা ঘুরছে। গা-হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। এসব কী ? তাঁর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ? এসব তো মাথা খারাপের লক্ষণ। তিনি দ্রুত ভাবতে চেষ্টা

কবলেন তাঁব বংশে কোনো পাগল আছে কি না। মনে পড়ল না। তিনি তাকালেন বিড়ালগুলিব দিকে। ছোট বিড়ালটা বলল মা, লোকটা আমাব দিকে তাকাচ্ছে।

বিড়ালের মা বলল, লোকটা লোকটা বলছ কেন ? এইসব অসভ্যতা। আমবা উনাব বাড়িতে থাকি। সম্মান কবে কথা বলা উচিত।

কী বলব মা ?

স্যাব বলো। স্যাব বলাই ভালো। কিংবা ভদ্রলোক বলতে পাব।

ভদ্রলোক বলা কি ঠিক মা ? উনি একবাব আমাদেব বস্তায় ভবে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন।

ফেলে তো দেয নি।

উনাব মেয়েগুলিব জন্যে ফেলেন নি। মেয়েগুলি কাঁদতে লাগল। লোকটা ভালো না মা। খাবাপ লোক। সব সময় বকাঝকা কবে।

সাবাদিন অফিস কবে ক্লান্ত হয়ে আসে। বকাঝকা কববে না তো কী। এইসব ছোটখাটো দোষ ধবতে হয় না।

একবাব তোমাব গায়ে লাথি দিয়েছিল মা।

মনেব ভলে দিয়েছে। বোজ তো আব দেয না।

আফসাব সাহেব আব সহ্য কববে পাবলেন না। কী সবশাশ, এসব কা হুজ্জ ? ক্লান্ত গলায় ডাকলেন, মীবা মীবা। প্রিজ, তাড়াতাড়ি আস।

মীবা ছুটে লেব হয়ে এলেন। কম্মা-সুম্মাও এলো। তাঁবা অগাক হয়ে তাকালো। বদুসও বান্ধাঘব থেকে মাথা লেব কবেছে। মীবা বললেন, কা ব্যাপাব।

আফসাব সাহেব কিছু বলতে পাবলেন ন। তাঁগিন বিড়ালসব কথা বুঝতে পাবছেন এই হাস্যকব কথা তাঁব পক্ষে বলা সম্ভব না। নিশ্চয়ই তাঁব শবাব খাবাপ কবেছে। মাথায় বস্ত ভেঙে গেছে কিংবা এই জাঠায় কিছু।

মীবা বললেন, তোমাব মুখ এমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন ? শবাব খাবাপ কবেছে ? হুঁ। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠল।

নিশ্চয়ই প্রেসাব। মহসিনকে খবব দেব ? ও এসে তোমাব প্রেসাব মেপে দেবে।

কাউকে খবব দেবাব দবকাব নেই।

প্রেসাব মাপবে ক্ষতি তে। কিছু নেই। মাপ শোন, আজ আফসে যাবাবও দবকাব নেই। প্রচুব ছুটি তোমাব পাওনা। অতিবিত্ত কাজেব চাপে তোমাব এই অবস্থা হয়েছে। সুম্মা যা তো নিচে গিয়ে ড্রাইভাবকে বলে আয আজ তোব বাবা অফিসে যাবে না।

মীবা তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। জানালাব পবদা টেনে ঘব খানিকটা অন্ধকাব কবে দিলেন।

তুমি চুপচাপ শুয়ে বিশ্রাম নাও। আমি মহাসিনকে খবব দিচ্ছি। ও বিকেলে এসে তোমাব প্রেসাব মাপবে। আফসাব সাহেব কিছু বললেন না। মহসিন এসে তাঁব প্রেসাব মাপবে এই খববও তাঁব শলো লাগল না। মহসিন মীবাব সবচে' ছোটভাই। কিছুদিন

হলো ডাক্তারি পাস করে বের হয়েছে। এমনিতে ছেলে খুব ভালো, তবে ঠাট্টা-তামাশা বড় বেশি করে। সহ্য করা যায় না।

মীরা!

কী ?

মহসিনকে খবর দেবার দরকার নেই।

আচ্ছা যাও খবর দেব না।

তুমি একটু বসো তো আমার পাশে।

মীরা বসলেন। কপালে হাত দিয়ে স্বামীর গায়ের উত্তাপ দেখলেন। গা ঠাণ্ডা, জ্বর নেই। কিন্তু চোখমুখ যেন কেমন দেখাচ্ছে। যে-কোনো কারণেই হোক মানুষটা খুব ভয় পেয়েছে। গলার স্বরও জড়ানো।

মীরা।

কী ?

আফসার সাহেব ইতস্তত করে বললেন, তুমি কি বিড়ালের কথা বুঝতে পার ?

মীরা হতভম্ব হয়ে বললেন, বিড়ালের কথা বুঝতে পারি মানে ? এসব কী বলছ ?

আফসার সাহেব অত্যন্ত বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, আমার ধারণা বিড়াল মাঝে মাঝে মানুষের মতো কথা বলে। মন দিয়ে শুনলে ওদের সব কথা বোঝা যায়।

মীরা বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি ওদের কথা বুঝতে পারছ ?

হ্যাঁ।

বুঝতে পারলে ভালো। এখন ঘুমাতে চেষ্টা কর।

আফসার সাহেব চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইলেন। রুমী-সুমী স্কুলে গেল না। মাঝে মাঝে পা টিপে টিপে এসে বাবাকে দেখে গেল। সুমী বাবার কানে কানে বলল, তোমাব কী হয়েছে বাবা ? তিনি জবাব দিলেন না। তাঁর কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না। মা বিড়ালটা একবার এসে ঘুরে গেল। সে দুঃখিত গলায় তার বাচ্চাদের বলল, বেচাবা আজ অফিসে গেল না কেন বুঝতে পারছি না। অসুখবিসুখ করল কি না কে জানে ? চাবদিকে ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে।

একটা বাচ্চা বলল, ইনফ্লুয়েঞ্জা কী মা ?

একটা রোগের নাম। এইসব তুমি বুঝবে না। সব সময় প্রশ্ন কবে বিবক্ত করবে না।

প্রশ্ন না করলে জানব কী করে ?

মা বিড়াল বলল, এখন এ ঘর থেকে চলে যাও। বেচারী ঘুমানোর চেষ্টা করছে। তাকে ঘুমাতে দাও।

ইনফ্লুয়েঞ্জা কী তা তো তুমি বললে না ?

বললাম তো ইনফ্লুয়েঞ্জা একটা অসুখের নাম। তখন জ্বর হয়, মাথায় পানি ঢালতে হয়।

আমাদের কী ইনফ্লুয়েঞ্জা হয় ?

না, আমাদের হয় না ।

আমাদের কী কী অসুখ হয় মা ?

আহ্ চুপ কর তো । বেচারাকে কি তোমরা ঘুমাতে দেবে না ?

আমাদের কী কী অসুখ হয় সেটা যদি তুমি আমাদের না বলো তাহলে আমরা শিখব কী করে ?

বারান্দায় চল । বারান্দায় বলব ।

বেড়াল তার দু' বাচ্চাকে নিয়ে বের হয়ে গেল । বাচ্চা দুটির যাবার তেমন আগ্রহ নেই । বারবার ফিরে তাকাচ্ছে ।

আফসার সাহেব সারাদিন বিছানায় শুয়ে রইলেন । তাঁর বুক ধক্ধক্ করছে, মাথা ঘুরছে । এ কী সমস্যা! এ কী সমস্যা!

সন্ধ্যাবেলা তাঁর ছোট শ্যালক মহসিন এসে উপস্থিত । সঙ্গে প্রেসার মাপার যন্ত্র । মীরা বলেছিল তাকে খবর দেবে না । কিন্তু খবর দিয়েছে । মীরা কথা রাখে নি । আফসার সাহেব মহসিনকে সহ্যই করতে পারেন না, দেখামাত্র তাঁর মাথায় রক্ত উঠে যায় । আজও উঠে গেল । মহসিন দাঁত বের করে বলল, কেমন আছেন দুলাভাই ?

তিনি শুকনো গলায় বললেন, ভালো ।

শুনলাম আজ অফিসে যান নি ।

শরীরটা ভালো লাগছে না ।

শুয়ে শুয়ে কী করছেন ?

কিছু করছি না ।

বুঝে বলছিলেন, আপনি নাকি এখন এনিমেল ল্যাংগুয়েজে এক্সপার্ট হয়ে গেছেন! হা-হা-হা ।

আফসাব সাহেবের ইচ্ছা করল ফাজিলটার গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিতে । অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালেন ।

বিড়ালের সব কথা নাকি বুঝে ফেলছেন ?

আফসার সাহেব চুপ করে রইলেন । মহসিন বলল, বিড়াল কোন ভাষায় কথা বলে দুলাভাই ? সাধু না চলিত ?

আমার শরীরটা ভালো লাগছে না, তুমি অন্য ঘরে যাও ।

রাগ করছেন নাকি ?

না, রাগ করছি না । তুমি আমাকে একটু একা থাকতে দাও ।

আগে প্রেসারটা মাপি, তারপর যত ইচ্ছা একা থাকবেন ।

প্রেসার মাপা হলো । দেখা গেল প্রেসার স্বাভাবিক । মহসিন বলল, আপনার সমস্যা কী জানেন দুলাভাই ? আপনার সমস্যা হচ্ছে— গাষ্ঠীর্ষ । একটু সহজ হোন ।

স্বাভাবিকভাবে হাসি-ভাষায় জীবন পার করার চেষ্টা করুন। দেখবেন বিড়ালের কথা আর শুনতে পাচ্ছেন না।

তুমি যাও তো এ ঘর থেকে।

যাচ্ছি। কয়েকটা ঘুমের ট্যাবলেট দিয়ে যাচ্ছি। রাতে দুটা খেয়ে ঘুমাবেন। আপনার ঘুম দরকার।

আফসার সাহেব মীরার উপর খুবই রাগ করলেন। মীরা কাজটি ঠিক করে নি। কেন সে এই ব্যাপারটা জানাচ্ছে? বিড়ালের কথা বুঝতে পারার পুরো ব্যাপারটা যে হাস্যকর তা কি তিনি বোঝেন না? খুব ভালো বোঝেন। তিনি জানেন তাঁর কোনো সমস্যা হয়েছে... হয়তো মাথা গরম হয়ে আছে কিংবা কানে কোনো সমস্যা হয়েছে। এটা কি লোকজনকে বলে বেড়ানোর মতো ঘটনা? সবকিছু সগাইকে বলতে নেই— এই সাধারণ বুদ্ধি কি মীরাব নেই?

দেখা গেল সন্ধ্যা নাগাদ লোকজনে বাড়ি ভরে গেল। ঢাকার আত্মীয়স্বজনরা অনেকেই এসে গেছেন। সবার মুখে রহস্যময় হাসি। রাগে-দুঃখে আফসার সাহেবের চোখে পানি এসে গেল।

এমন অবস্থা হবে জানলে তিনি কিছুতেই মীরাকে ব্যাপারটা বলতেন না।

আফসার সাহেব সারাবাত জেগে কাটালেন। এক ফোঁটা ঘুম হলো না। তন্দ্রামতো আসে আর মনে হয় কী ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে গেছে— তিনি বিড়ালের কথা বুঝতে পারছেন। তখনই ঘুম ভেঙে যায়। তিনি ধড়মড় কবে উঠে বসেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মীরাও বাত জেগেই কাটালেন। মীরা এক সময় বললেন, এত অস্থির হচ্ছ কেন? যদি বিড়ালের কথা বুঝতে পাব— পারলে। এতে অসুবিধা তো কিছু হচ্ছে না।

আফসার সাহেব বললেন, আমি যে বিড়ালের কথা বুঝতে পারি তা কি তুমি বিশ্বাস কর?

মীরা বললেন, হ্যাঁ করি।

না। তুমি বিশ্বাস কর না। আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলছ।

তুমি ঘুমাবার চেষ্টা কর।

চেষ্টা করছি— লাভ হচ্ছে না। আমার এ কী সর্বনাশ হলো বলো তো?

কোনো সর্বনাশ হয় নি। দেখবে কাল ভোবেই সব ঠিক হয়ে গেছে।

কীভাবে ঠিক হবে?

আমি ব্যবস্থা করব?

কী ব্যবস্থা করবে?

ভোর হোক তখন দেখবে।

শেষরাতের ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় আফসার সাহেব ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম ভাঙল সকাল দশটায়। বাসা খালি। বাচ্চারা স্কুলে চলে গেছে। মীরা নাশতা বানিয়ে অপেক্ষা করছেন। আফসার সাহেব হাতমুখ ধুয়ে নাশতার টেবিলে বসলেন। আশপাশে বিড়ালগুলিকে

দেখতে পেলেন না। খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। মীরা বললেন, আজ অফিসে গিয়ে লাভ নেই। রাতে ভালো ঘুম হয় নি। বাসায় থাক, রেষ্ট নাও।

আরে না। পরপর দুদিন কামাই দেয়ার কোনো মানে হয় না। ভালো কথা—বিড়ালটা কোথায়?

জানি না। আছে নিশ্চয়ই কোথাও। বাদ দাও তো।

আফসার সাহেব অফিসে চলে গেলেন। অফিসে নানান কাজে সময় কেটে গেল। একটা মিটিং ছিল। মিটিং শেষ করে বাসায় ফিরতে ফিবতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

বাসায় ফিরে স্বস্তি বোধ করলেন। বিড়াল নেই। তিনি কিছু জিজ্ঞেস করলেন না, তবে বুঝলেন—কুদ্দুস এদের বাসা থেকে তাড়িয়েছে। ভালোই করেছে। অনেকদিন পর আফসার সাহেব সুখী-রুমীকে সঙ্গে নিয়ে টিভি দেখলেন। কী একটা ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান হচ্ছে। ভয়ঙ্কর রোগা একটা লোক নানা ধরনের আবোল-তাবোল কথা বলে হাসাবার চেষ্টা করছে। আফসার সাহেবেব ক্ষমতা থাকলে চড় দিয়ে বদমাশটার সব ক'টা দাঁত ফেলে দিতেন। ক্ষমতা নেই বলে কিছু কবতে পারলেন না। রুমী বলল, লোকটা কী রকম মজা করতে পারে দেখলে বাবা? এমন হাসাতে পাবে।

তিনি হুঁ-জাতীয় শব্দ করলেন এবং ভাব করলেন যেন মজা পাচ্ছেন। রাতে দুই মেয়ে গখন স্কুলে কী-সব ঘটনা ঘটেছে বলতে শুরু করল সেসবও তিনি মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করলেন। রাত দশটায় মহসিন টেলিফোন করল।

দুলাভাই ভালো?

হ্যাঁ ভালো।

বিড়ালের কথা নিশ্চয়ই আব শোনেন নি?

না।

ভেরি গুড। রাতে ঘুমাতে যাবাব আগে ঘুমের ট্যাবলেট দুটা মনে করে খাবেন।

আচ্ছা।

এইসঙ্গে আপনাকে একটা ছোট্ট অ্যাডভাইস দিচ্ছি। সব সময় এমন কঠিন ভাব কবে থাকবেন না। রিলাক্স করুন। হাসুন, গল্প করুন। সবাইকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যান।

কোথায় যাব?

কক্সবাজার চলে যান। আসলে আপনার যা হয়েছে তা হলো—নার্স উত্তেজিত হয়েছে। নার্স একসাইটেড হলে এসব হতে পাবে। রাখি দুলাভাই?

আচ্ছা।

রাত এগারটার দিকে হাতমুখ ধুয়ে এক গ্রাস গবম দুধ খেয়ে আফসার সাহেব ঘুমাতে গেলেন। ঘুমের ট্যাবলেট খাবাব ইচ্ছা ছিল না—এমনিতেই ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, তবু দুটা ট্যাবলেট খেলেন। ভালো ঘুম হলো। একটানা ঘুম। ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। তিনি শোবার ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় এসে বেতের চেয়ারে বসলেন।

রাতে ভালো ঘুম হওয়ায় শরীরটা ঝরঝরে লাগছে। বারান্দায় বসে সকাল হওয়া দেখতে তাঁর সব সময়ই ভালো লাগে। এক কাপ চা পেলে হতো। চা বানানোর কেউ নেই। সবাই ঘুমাচ্ছে। তিনি নিজেই রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন। চা বানানো এমন কোনো কঠিন কর্ম না। পানি গরম করতে পারলেই হলো।

চায়ের কাপ হাতে আফসার সাহেব চেয়ারে এসে বসলেন। তখনই মা বেড়ালটাকে দেখতে পেলেন। পিলারের আড়ালে চুপচাপ বসে আছে। বাচ্চা দুটিও আছে। হ্যাঁ, তারা কথা বলছে। আফসার সাহেব তাদের প্রতিটি কথা বুঝতে পারছেন।

ছোট বিড়াল : মা দেখ, ভদ্রলোক চা খাচ্ছেন।

মা : বললাম না চুপ থাকতে। কথা বলছিস কেন ?

ছোট বিড়াল : মা উনাকে জিজ্ঞেস কর তো কেন আমাদের বস্তায় ভরে ফেলে দিয়ে এলো ?

মা : আহ্ কী যে বোকার মতো কথা বলিস। মানুষ কি আমাদের কথা বোঝে ? বুঝলে তো সব সমস্যার সমাধানই হতো। মানুষ যদি একবার পশুদের কথা বুঝত তাহলে পশুদের আব কোনো দুঃখ থাকত না।

ছোট বিড়াল : যদি আমাদের কথা বুঝতে পারত তাহলে আমি উনাকে কী বলতাম জানো ?

মা : কী বলতে ?

ছোট বিড়াল : বলতাম— কেন আপনারা আমাদের এমন কষ্ট দিলেন ? সারারাত হেঁটে হেঁটে এসেছি। আমরা তো ছোট, আমাদের বুঝি কষ্ট হয় না ?

ছোট বিড়াল দুটির একটি শুধু কথা বলছে। অন্যটি শুয়ে আছে। মা বিড়ালটা একটু পরপর জিব দিয়ে শুয়ে থাকা বাচ্চাটাকে চেটে দিচ্ছে। এই বিড়ালটা খুবই অসুস্থ। দীর্ঘ পথ হেঁটে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মা বিড়াল তার কানে কানে কথা বলছে।

মা বিড়াল : খুব খারাপ লাগছে মা ?

অসুস্থ বিড়াল : হ্যাঁ।

মা : ক্ষিধে লেগেছে ?

অসুস্থ বিড়াল : হ্যাঁ।

মা : আমার লক্ষ্মী সোনা। চুপ করে শুয়ে থাক। দেখি কিছু পাওয়া যায় কি না।

অসুস্থ বিড়াল : মা, আমরা কি লুকিয়ে থাকব ?

মা : লুকিয়ে থাকাই ভালো। দেখতে পেলে ওরা হয়তো আবার আমাদের বস্তায় ভরে দূরে কোথায়ও ফেলে দিয়ে আসবে।

- অসুস্থ বিড়াল : মানুষরা এমন কেন ?
- মা : পৃথিবীটা তো মা মানুষরাই দখল করে নিয়েছে। পৃথিবী এখন চলছে ওদের ইচ্ছামতো।
- অসুস্থ বিড়াল : পৃথিবী ওরা দখল করে নিয়েছে কেন মা ?
- মা : ওদের বুদ্ধি বেশি।
- অসুস্থ বিড়াল : আমাদেরও তো মা বুদ্ধি বেশি। তোমার মতো বুদ্ধি তো কারোই নেই।
- মা : আমাদের বুদ্ধি কোনো কাজে লাগে না রে মা। আর কথা বলিস না। তোর শরীর দুর্বল।
- অসুস্থ বিড়াল : মা ঐ ভদ্রলোক কী যাচ্ছেন ?
- মা : চা যাচ্ছেন।
- অসুস্থ বিড়াল : আমার একটু চা খেতে ইচ্ছা করছে মা।
- মা : ইচ্ছা করলেই তো খাওয়া যায় না সোনা।

আফসার সাহেব উঠে পড়লেন। ফ্রিজ খুলে দুধ বের করলেন। বাটিতে দুধ ঢাললেন। কয়েক টুকরা পাউরুটি নিলেন। খানিকটা জেলিও পিরিচের এক কোনায় দিলেন। খাবারগুলি পিলারের কাছে রাখলেন। চায়ের কাপে সামান্য চা ছিল। একটা পিরিচে তাও ঢেলে এগিয়ে দিলেন।

- ছোট বিড়াল : মা উনি এসব করছেন কেন ?
- মা : বুঝতে পারছি না।
- ছোট বিড়াল : উনি কি আমাদের খেতে দিচ্ছেন ?
- মা : তাই তো মনে হচ্ছে।
- ছোট বিড়াল : আমরা কি খাব ?
- মা : একটু অপেক্ষা কবে দেখি।
- ছোট বিড়াল : আমার ভয় ভয় লাগছে মা। আমার মনে হচ্ছে খেতে যাব আর অমনি উনি আমাদের ধরে বস্তায় ভরবেন।
- মা : অন্যের সম্পর্কে এত ছোট ধারণা করতে নেই মা। এতে মন ছোট হয়। উনি ভালোবেসে খেতে দিয়েছেন, এসো আমরা খাই।

তারা তিনজনই এগিয়ে গেল। ছোট বিড়াল দুটি একসঙ্গে দুধের বাটিতে জিব ভেজাতে লাগল। মা বিড়াল বিরক্ত হয়ে বলল, তোমরা দেখি ভদ্রতা কিছুই শিখলে না। উনাকে ধন্যবাদ দেবে না ? ধন্যবাদ দাও। ছোট বিড়াল দুটি একসঙ্গে বলল, ধন্যবাদ।

খাওয়া শেষ করে আর একবার ধন্যবাদ দেবে।

আচ্ছা ।

ছোট বিড়ালটা বলল, পিবিচেব গায়ে লাল বঙের এই জিনিসটা কী মা ?

এব নাম জেলি, রুটি দিয়ে খায় । তোমাদেব জেলি খাওয়া ঠিক হবে না ।

কেন মা ?

এতে দাঁত খাবাপ হয় ।

এই পর্যায়ে মীবা শোবাব ঘব থেকে বেব হলেন । অবাক হয়ে তাকিয়ে বইলেন ।
আফসাব সাহেব থমথমে গলায় বললেন, তুমি কি বিড়ালগুলিকে বস্তায় ভবে ফেলে দিতে
বলেছিলে ?

মীবা বললেন, তোমাকে কে বলল ?

ফেলে দিতে বলেছিলে কি বলো নি ?

হ্যাঁ বলেছিলাম ।

খুব অন্যায় কবেছ ।

অন্যায় কবব কেন ? এব আগেও তো একবাব বস্তায় ভবে বিড়াল ফেলা হয়েছে ।
সেবাব তো তুমিই ফেলতে বলেছিলে । বলো নি ?

আব ফেলবে না ।

এদে য়কে কি তুমিই খাবাব দিয়েছ ?

হ্যাঁ ।

এখনো কি তুমি এদেব কথা বুঝতে পাবছ ?

পার্বাহ ।

মীবা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন । তাঁব মনে হলো ব্যাপাবটাকে আব অবহেলা বব্বা ঠিক
হবে না । কোনো একজন ডাক্তাবেব কাছে তাঁকে নিতে হবে । কোনো বড় মনোবিজ্ঞানা
যিনি ব্যাপাবটা বুঝবেন ।

নাশতাব টেবিলে মীবা বললেন, আজ সন্ধ্যায় তোমাকে যদি কোনো ডাক্তাবেব
কাছে নিয়ে যেতে চাই তুমি যাবে ?

সাইকিয়াট্রিস্টেব কাছে ?

হ্যাঁ ।

সাইকিয়াট্রিস্টেব কাছে কেন যাব ? তোমাব কি ধাবণা আমি পাগল ?

না, তুমি পাগল না । আবাব ঠিক সুস্থও না । কোনো সুস্থ মানুষ কখনো বলবে না
সে বিভাণেব কথা বুঝতে পাবছে ।

আহ সাব সাহেব কোনো উত্তব দিলেন না ।

মীব বললেন, তুমি অফিসে চলে যাও । ঘবে বসে বসে বিড়ালেব কথা শুনলে হবে
না । এই ব নিয়ে একেবাবেই চিন্তা কববে না । সন্ধ্যাবেলা আমবা একজন বড় ডাক্তাবেব
কাছে যাব ।

ঠিক আছে যাব। কিন্তু বিড়ালগুলিকে তুমি তাড়াবে না। দুপুরে আলাদা করে খেতে দেবে। রাতেও খেতে দেবে। মনে থাকে যেন।

তোমার কি মনে হয় না তুমি বাড়াবাড়ি করছ ?

আফসার সাহেব শীতল গলায় বললেন, না আমি বাড়াবাড়ি করছি না। বলেই মনে হলো হয়তো তিনি ঠিক বলছেন না। কিছুটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এখন তাঁর আচরণ নিশ্চয়ই সহজ স্বাভাবিক মানুষের আচরণ নয়। অস্বাভাবিক একজন মানুষের আচরণ। তাঁকে যদি কেউ সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যেতে চায় তাহলে তাকে দোষ দেয়া যাবে না। তিনি ক্লান্ত গলায় বললেন, মীরা এ কী সমস্যায় পড়া গেল বলো তো।

মীরা বললেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

আফসার সাহেব ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর কেন জানি মনে হচ্ছে, কিছুই ঠিক হবে না। যতই দিন যাবে ততই সব এলোমেলো হয়ে যাবে।

২

পাগলের ডাক্তারদের চেহায়ায় না হোক চোখে খানিকটা পাগল পাগল ভাব থাকে। তারা সহজভাবে আলাপ-আলোচনা করতে করতে দুম করে কঠিন কোনো কথা বলে সুরু চোখে বোগীর দিকে তাকিয়ে থাকে। কথাবার্তা বলতে হয় বিছানায় শুয়ে। একটা ছবি চোখের সামনে ধরে জিজ্ঞাসা কবে— ছবি দেখে আপনার মনে যা আসছে বলুন তো। কী দেখছেন ছবিতে ? পাগলের ডাক্তার বা সাইকিয়াট্রিস্ট সম্পর্কে আফসার সাহেবের এই ছিল ধারণা। তিনি এমন একজন লোকের সঙ্গে দেখা করবেন। এ জাতীয় মানসিক প্রত্নতি নিয়ে ঘব থেকে বেরুলেন। যার সঙ্গে দেখা হলো তাকে দেখে মোটামুটি হতাশই হলেন। লুঙ্গি-পরা আধবুড়ো একজন লোক যে দরজা খুলেছে খালি গায়ে এবং তাঁদের দেখেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে শার্ট খুঁজতে শুরু করেছে। আলনায় বেশ কয়েকটা শার্ট এক জায়গায় রাখা। একটা নিতে গিয়ে ভদ্রলোক সব কটা ফেলে দিলেন। যে শার্ট গায়ে দিলেন তাব সবগুলি বোতাম সাদা রঙের কিন্তু মাঝখানের একটা বোতাম কালো।

ভদ্রলোক বিব্রত গলায় বলেন, আসুন আসুন। আপনাদের সাতটার সময় আসার কথা ছিল না ?

মীরা বললেন, একটু আগে এসে পড়েছি। বাসা খুঁজে পাব কি না বুঝতে পারছিলাম না। এই জন্যে সকাল সকাল রওনা হয়েছিলাম। আগে এসে আপনাকে অসুবিধায় ফেলি নি তো ?

জি না। কোনো অসুবিধা নেই। বসুন আমি চায়ের ব্যবস্থা করি।

ভদ্রলোক তাঁদের কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ছোট্ট একটা কেতলি হাতে বের হয়ে গেলেন। পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেল, পরনে লুঙ্গি। সেই লুঙ্গিও যে খুব ভদ্রভাবে পবা তা না। মনে হচ্ছে যে-কোনো সময় কোমর থেকে খুলে আসবে।

আফসার সাহেব বললেন, এই তোমার সাইকিয়াট্রিস্ট ?

মীরা বললেন, হ্যাঁ। তাঁর পোশাকআশাক দেখে বিভ্রান্ত হলো না। উনি বিখ্যাত ব্যক্তি। নাম বললেই চিনবে— উনি মিসির আলি।

মিসির আলি আবার কে ?

মানসিক সমস্যার বিশ্লেষণের ব্যাপারে তাঁর মতো মানুষ এখনো জন্মায় নি। অতি বিখ্যাত ব্যক্তি।

অতি বিখ্যাত ব্যক্তির হাল তো দেখছি ফকিরের মতো। ঘরের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে— খেতে পান না।

উনি কখনো কারো কাছে থেকে কোনো টাকা-পয়সা নেন না।

চলে কী করে ?

আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্যারা সাইকোলজি পড়াতেন। এখন চাকরি চলে গেছে। শুনেছি টিউসনি করেন।

আফসার সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, তুমি কিছু মনে করো না। যত বিখ্যাত ব্যক্তিই হোক আমার কিন্তু তাঁর উপর বিন্দুমাত্র ভক্তি-শ্রদ্ধা হচ্ছে না।

ভক্তি-শ্রদ্ধার তো কোনো ব্যাপার নেই। তুমি তোমার সমস্যার কথা বলবে— ফুরিয়ে গেল।

আমি এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কোনো কথাই বলব না। উনি চা আনতে গেছেন। চা এলে চা খাব। চলে যাব।

আচ্ছা এখন বসো।

কোথায় বসব ? বসার জায়গা কোথায় ?

ঘরে বসার জায়গা আসলেই নেই। দু'টি চেয়ারের একটার উপর কেরোসিন কুকার। অন্যটির উপর গাদাখানিক বই। বিছানায় বসা যায়। তবে সেই বিছানায় চাদরের উপর কী কারণে জানি খবরের কাগজ বিছানো। বসতে হলে খবরের কাগজের উপর বসতে হয়।

আফসার সাহেব বিরক্ত মুখে খবরের কাগজের উপর বসলেন। মীরা বসলেন স্বামীর পাশে। মিসির আলির নামের সঙ্গে মীরার পরিচয় আছে। মুখোমুখি এই প্রথম দেখলেন। মীরার ভাই মহসিন ঠিকানা দিয়েছে। এবং বলেছে— এই লোকের চেহারায় বিভ্রান্ত না হতে। মীরা নিজেও এখন খানিকটা বিভ্রান্ত বোধ করছেন। প্রফেশনাল কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাওয়াই ভালো ছিল। অ্যামেচারদের উপর খুব ভরসা করা যায় না।

মিসির আলি চায়ের কেতলি এবং তিনটা কাপ হাতে ঢুকলেন। কাপে চা ঢালতে ঢালতে বললেন, আফসার সাহেব, আপনি কেমন আছেন ?

ভালো। আমার নাম জানলেন কী করে ?

আপনার শ্যালক মহসিন সাহেব, উনিই আপনার নাম বলেছেন। আপনার সমস্যা কী তার আভাসও দিয়েছেন। এখন আপনি বলুন, সমস্যাটা আপনার মুখ থেকে শুনি।

ও যা বলেছে তাই। নতুন করে আমার কিছু বলার নেই।

আপনি কি কিছু বলতে চাচ্ছেন না ?

জি না।

কেন বলুন তো ?

আফসার সাহেব উত্তর দিলেন না।

মিসির আলি হাসিমুখে বললেন— যে-কোনো কারণেই হোক, আপনি আমাকে পছন্দ করছেন না। সাইকিয়াট্রিস্ট হিসেবে আমি সম্ভবত আপনাকে ইমপ্রেস করতে পারি নি। এটা নতুন কিছু না। সবার ক্ষেত্রে ঘটে। তখন আমি কী করি জানেন ? এমন কিছু করি যাতে আমার উপর বিশ্বাস ফিরে আসে। কারণ পুরোপুরি বিশ্বাস না আসা পর্যন্ত আমি কোনো সাহায্য করতে পারি না। যেই মুহূর্তে আমার উপর আপনার পরিপূর্ণ আস্থা আসবে সেই মুহূর্ত থেকে আপনি আমার কথা মন দিয়ে শুনবেন। আমার যুক্তি গ্রহণ করবেন।

আফসার সাহেব বললেন, তাহলে বিশ্বাস অর্জনের জন্য কিছু করুন।

পারছি না। সব সময় পারি না।

আফসার সাহেব চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, মীরা চল যাই।

মীরা দুঃখিত গলায় বললেন, তুমি উনাকে কিছুই বলবে না ?

না।

সমস্যাটা নিজের মুখে বলতে অসুবিধা কী ?

আফসার সাহেব কঠিন দৃষ্টিতে স্ট্রার দিকে তাকিয়ে বললেন, চল যাই। আমার শরীর ভালো লাগছে না। বাসায় গিয়ে শুয়ে থাকব। তাছাড়া আমার কোনো সমস্যাও নেই।

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। সহজ গলায় বললেন চলুন আপনাদের রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

তার প্রয়োজন হবে না।

অনেক অপ্রয়োজনীয় কাজ আমি করি। আপনাদের জন্যে চা আনার কোনো প্রয়োজন ছিল না, তবু এনেছি। চা অনেক দূর থেকে আনতে হয়েছে। চা-টা যেন গরম থাকে এজন্যে ছুটতে ছুটতে এসেছি। চা গরম ছিল না ?

আফসার সাহেব একটু নিব্রত বোধ করলেন। মীরা আবার বললেন, বসো না। কিছু বলতে না চাইলে বলবে না। দু'মিনিটের জন্য বসো।

আফসার সাহেব বসলেন।

মিসির আলি বললেন, আমার ধারণা অফিসে চাকরি সম্পর্কিত বড় রকমের সমস্যা আপনি আছেন। সম্ভবত আপনার চাকরি চলে গেছে। এটা কি ঠিক ?

মীরা ভয়ঙ্করভাবে চমকে উঠলেন।

আফসার সাহেব চমকালেন না। স্থির দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ মিসির আলির দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, আপনি ঠিকই ধরেছেন। তবে চাকরি এখনো যায় নি। হয়তো শিগগিরই চলে যাবে। অফিসের মালিকপক্ষের সঙ্গে অনেক দিন থেকেই বিনিবনা হচ্ছিল না। গত দু'মাসে তা চরম আকার নিয়েছে। এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে হয় ওরা আমাকে ছাড়িয়ে দেবে নয়তো আমি রিজাইন করব।

মীরা ক্ষীণ গলায় বললেন, এইসব কিছুই তো তুমি আমাকে বলো নি।

আফসার সাহেব বললেন, তোমাকে বলার সময় হয় নি বলেই বলি নি। সময় হলে নিশ্চয়ই বলতাম।

এত বড় একটা ব্যাপার তুমি গোপন করে রাখবে ?

হ্যাঁ রাখব।

আফসার সাহেব পকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে মিসির আলির দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার এই ব্যাপার আপনি কী করে অনুমান করলেন ?

খুব সহজেই অনুমান করেছি। যখন কোনো মানসিক সমস্যা হয় তখন তার পেছনে কিছু-না-কিছু কারণ থাকে। পারিবারিক অশান্তি, চাকরির ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা ইত্যাদি। একটা ছোট বাচ্চা যখন পরিবারের কারো সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পায় না, যখন সে দেখে বাবা-মা সারাক্ষণ ঝগড়া করছে তখন সে কথা বলা শুরু করে টবের ফুলগাছের সঙ্গে। এমনভাবে কথা বলে যেন ফুলগাছটা তার কথা শুনছে, কথাব জবাব দিচ্ছে। আসলে এরকম কিছু ঘটছে না।

আপনার ধারণা আমি বিড়ালের কথা বুঝতে পারি না ? আমি যা বলছি বানিয়ে বানিয়ে বলছি ?

না, আমি তেমন কিছু ধারণা করছি না। আপনি যা বলেছেন তাই বিশ্বাস করছি। সেই বিশ্বাস থেকেই আমি এগোব।

এবং এক সময় আপনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করবেন যে আমি যা বলছি তা ভুল।

তা-ও না। আমি সত্য যা তাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করব। আপনি সহজ হয়ে বসুন। সহজভাবে আমার কথার জবাব দিন। সত্য প্রতিষ্ঠায় আমাকে সাহায্য করুন। আমি আপনার ব্যাপারে খুবই আগ্রহ বোধ করছি।

কেন ?

কারণ আপনি যা বলেছেন তা আগে কেউ বলে নি। কিছু কিছু পীর-দরবেশের কথা আমরা বইপত্রে পাই যাঁরা দাবি করতেন পশুপাখির কথা বুঝতে পারেন, কিন্তু সেই দাবির পক্ষে তেমন কোনো প্রমাণ পাই না। একজন অতি বিখ্যাত ভারতীয় চিকিৎসকের কাহিনী আছে যিনি গাছপালা থেকে ওষুধ তৈরি করতেন। তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত গল্প হচ্ছে— তিনি গাছের কথা বুঝতে পারতেন। তিনি পথ দিয়ে যখন হেঁটে যেতেন, গাছ তাঁকে ডেকে বলত— তুমি আমার পাতা ছিড়ে নিয়ে যাও। পাতার রস বের করে শ্বাসকষ্টের রোগীকে মধু মাখিয়ে খেতে দাও। রোগ আবোগা হবে। প্রাচীন ভারতের ঐ চিকিৎসকের নামে গল্প আছে— মহাদেব একবার রাগে অন্ধ হয়ে ব্রহ্মার মাথা কেটে ফেলেছিলেন। কোনো উপায় না দেখে পৃথিবী থেকে অশ্বিনীকুমারকে দেবলোকে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি সেই ছিন্ন মস্তক জোড়া লাগান।

আফসার সাহেব বললেন, আমি কি একটা সিগারেট খেতে পারি ?

অবশ্যই পারেন। ইচ্ছা করলে আমাকে একটা দিতেও পারেন।

আফসার সাহেব সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন। তবে মিসির আলিকে সিগারেট দিলেন না। একজন সিগারেট চেয়েছে, তারপরেও তাকে দেয়া হচ্ছে না। ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু।

মিসির আলি বললেন, কী ব্যাপার। সিগারেট দেবেন না? কেড়ে নিতে হবে?

আফসার সাহেব বললেন, সরি! এই নিন। বলেই হেসে ফেললেন।

মীরা লক্ষ করলেন আফসার সাহেব অনেকটা সহজ হয়ে এসেছেন। মুখের কাঠিন্য কমে গেছে। মীরা মিসির আলি নামের লোকটির প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করলেন। এই লোক আর কিছু না পারুক না-পারুক তার স্বামীর প্রাথমিক কাঠিন্য ভেঙে দিয়েছেন। এটি কম কথা না। তাছাড়া লোকটির কথা বলার ভঙ্গিও তাঁর ভালো লাগল। কথাবার্তায় কোনো সবজাস্তা ভঙ্গি নেই। পা উঠিয়ে ছেলেমানুষের মতো বসে আছেন। কথা বলার সময় হাত নাড়ছেন। তাঁর সামনে বাখা চায়ের কাপে এক ফোঁটা চা নেই। অনেক আগেই চায়ের শেষ বিন্দুটিও তিনি শেষ করেছেন। অথচ বেচারার সেটা খেয়াল নেই। খালি চায়েব কাপেই ক্রমাগত চুমুক দিচ্ছেন। মাঝে মাঝে চুমুক দেবার আগে চায়ের কাপে ফুঁ দিচ্ছেন। ভাবটা এমন যে গরম চা ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে খেতে হচ্ছে।

মিসির আলি খাট থেকে নামতে নামতে বললেন, আফসার সাহেব, আমি ছোট একটা ক্যাসেট প্লেয়ার যোগাড় করেছি। সেখানে বিড়ালের কথা টেপ করা আছে। আপনাকে তা শোনাও এবং আপনি বলবেন—বিড়াল কী বলছে। পারবেন না?

অবশ্যই পারব।

আজ শুধু এই পরীক্ষাটাই করব, তারপর অন্য পরীক্ষা অন্য সময়ে করা হবে।

আফসার সাহেব বললেন, আমি টেপ শুনে যদি বাঁল বিড়াল এই কথা বলছে তাহলে তো আপনার বোঝার উপায় নেই আমি ভুল বলছি না সত্যি বলছি।

বোঝার উপায় আছে।

কী উপায়? আপনি নিশ্চয়ই বিড়ালের কথা বোঝেন না।

তা বুঝি না। তারপরেও উপায় আছে—আচ্ছা এখন মন দিয়ে শুনুন—

টেপ খানিকক্ষণ বাজানো হলো। একটা বিড়ালের ম্যাঁয়াও ম্যাঁয়াও শোনা যাচ্ছে। আফসার সাহেব তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ করে শুনলেন। টেপ বাজানো শেষ হলো। মিসির আলি বললেন—বলুন, বিড়ালটা কী বলল।

বুঝতে পারি নি।

কিছুই বুঝতে পারেন নি?

জি না।

ভালো কথা—এখন অন্য একটা শুনুন। খুব মন দিয়ে শুনুন। একই বিড়ালের কথা। ভিন্ন সময়ে ভিন্ন পরিস্থিতিতে।

আফসার সাহেব শুনলেন। তার মুখে হতাশার ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কারণ এবারো তিনি কিছু বুঝতে পারছেন না। কিছুই না। বিড়ালের সাধারণ ম্যাঁয়াও।

কিছু বুঝলেন ?

জি না ।

কিছুই না ?

না ।

আরো একটি অংশ শুনাচ্ছি । দেখুন এটা বুঝতে পারেন কি না । এবার অন্য বিড়াল, আগেরটা না ।

আফসার সাহেব হতাশ গলায় বললেন, আমার মনে হয় না কিছু বুঝতে পারব । এরকম হচ্ছে কেন কে জানে ।

খুব মন দিয়ে শুনুন ।

মন দিয়েই শুনছি ।

আরো মন দিন । চোখ বন্ধ কবে শুনুন ।

তিনি শুনলেন । কিছুই বুঝলেন না । মিসির আলি বললেন, তিনটি ভিন্ন পরিস্থিতিতে বিড়ালের কথা টেপ করা হয়েছে । প্রথমবার বিড়ালকে দুধ খেতে দিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলানো হয়েছে । সে যখন শব্দ করছে তা টেপ করা হলো । দ্বিতীয়বার তাকে একটা সুচালো কাঠি দিয়ে খোঁচা দেয়া হচ্ছিল । তৃতীয়বারে অন্য একটা বিড়ালকে ভয় দেখানো হচ্ছিল ।

আফসার সাহেব বিষণ্ণ গলায় বললেন, আপনি নিশ্চয়ই আমার কথা পুৰোপুৰি অবিশ্বাস করছেন । ধরেই নিয়েছেন আমি মিথ্যা করে বলেছি— বিড়ালের কথা বুঝতে পারি ।

আমি এত দ্রুত এবং এত সহজে কোনো সিদ্ধান্তে আসি না । আমি এখনো ধবে নিচ্ছি আপনি বিড়ালের সব কথা বুঝতে পারেন । এই মুহূর্তে হয়তো পারছেন না । আপনাকে আমি যা করতে বলব তা হচ্ছে সহজ স্বাভাবিক জীবন যাপনের চেষ্টা করবেন । বিড়াল নিয়ে খুব বেশি ভাববেন না, আবার খুব কমও ভাববেন না । খাওয়াদাওয়া করবেন । নিয়মিত অফিসে যাবেন । অফিসের সমস্যা মেটাতে চেষ্টা করবেন । যদি না মেটে তাতেও ক্ষতি নেই । সব পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে চলার চেষ্টা আপনাকে করতে হবে ।

মীবা বললেন, ওকে নিয়ে বাইবে কোথাও বেড়াতে গেলে কেমন হয় ? যেমন ধরুন, কল্লবাজারে কিছুদিন কাটিয়ে এলাম ।

মিসির আলি বললেন, আমি তার প্রয়োজন দেখছি না । সমস্যা থেকে দূবে সরে যাওয়া সমস্যা সমাধানের কোনো পথ না । সমস্যাকে মোকাবিলা করতে হয় সমস্যার ভেতরে থেকে ।

আফসার সাহেব বললেন, আমরা কি এখন উঠব ?

জি, নিশ্চয়ই উঠবেন । আর শুনুন আফসার সাহেব, আপনি এখন এক ধরনের ঘোরের মধ্যে আছেন । এই ঘোর ঘোর ব্যাপারটা আমার ভালো লাগছে না ।

আমি ঘোরের মধ্যে আছি— এটা কেন বলছেন ?

এটা বলছি কারণ আপনার চারপাশে কী ঘটছে তা আপনি দেখছেন না। তাকিয়ে আছেন কিন্তু কিছুই আপনার চোখে পড়ছে না। আমি দীর্ঘ সময় ধরে একটা খালি কাপে চুমুক দিচ্ছি। মাঝে মাঝে এমন ভাব করছি যে গরম চা ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে নিচ্ছি। ব্যাপারটা আপনার চোখেও পড়ে নি। অথচ আপনার স্ত্রী ঠিকই ধরেছেন। খালি কাপে চুমুক দেয়ার ব্যাপারটা ছিল ইচ্ছাকৃত। আপনার বর্তমান মানসিক অবস্থা বোঝার জন্য এটা করতে হয়েছে।

এই প্রথমবারের মতো আফসার সাহেবের মনে হলো— তাঁর সামনে বসে থাকা রোগা এবং মোটামুটি কুদর্শন মানুষটি অসম্ভব বুদ্ধিমান। এই মানুষটা খুব ঠাণ্ডা মাথায় পুরো পরিস্থিতি হাতের মুঠোয় নিয়ে নিতে পারে। এ জাতীয় মানুষের সঙ্গে এর আগে তাঁর পরিচয় হয় নি। তিনি বললেন, উঠি মিসির আলি সাহেব ?

মিসির আলি বললেন, চলুন আমিও আপনাদের সঙ্গে যাই— এগিয়ে দিয়ে আসি। এগিয়ে দিতে হবে না।

আমি এমনিতেও বেরুব। বিসমিল্লাহ হোটেল বলে একটা রেস্টুরেন্ট আছে— আমি রাত ন'টায় সেখানে ভাত খেতে যাই।

মীরা বললেন, আপনি কি একা থাকেন ?

হ্যাঁ।

আপনাকে কি কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে পারি ?

মিসিব আলি সহজ গলায় বললেন, না। বিখ্যাত মানুষদের লোকজন ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে বিরক্ত করে। আমি বিখ্যাত কেউ নই। আমার ব্যক্তিগত জীবন এতই সাধারণ যে, প্রশ্ন করার কিছুই নেই।

আফসার সাহেব হঠাৎ করে সবাইকে চমকে দিয়ে বললেন, আমাকে একটু সাহায্য করুন। প্রিজ। আমি জানি আপনি পাববেন।

৩

আফসাব সাহেব তিন দিন পর অফিসে এসেছেন। এই তিনদিনে অনেক কাগজপত্র তাঁর টেবিলে জমা থাকার কথা। তিনি টেবিলে কোনো কাগজপত্র দেখলেন না। এটাকে মোটামুটি অস্বাভাবিক ব্যাপার বলা যেতে পারে। তাঁর মনে একটা ক্ষীণ সন্দেহ হলো। সেই সন্দেহ নিজের মনেই চেপে রাখলেন।

অফিসে তাঁর চেয়ারে বসার পরপর তিনি দুধছাড়া এক কাপ চা খান। এই চা তাঁর বেয়ারা নাজিম বানিয়ে দেয়। পানি গরম করাই থাকে। তিনি অফিসে ঢোকামাত্র কাপে টিবিয়োগ দিয়ে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হয়।

অপ্রয়োজনীয় কোনো কথা তিনি নাজিমের সঙ্গে বলেন না। শুধু নাজিম কেন, কারো সঙ্গেই বলেন না। তাঁর মতে, অফিস হচ্ছে কাজকর্মের জায়গা, গল্পগুজবের আখড়া না। আজ আফসার সাহেব নিয়মের ব্যতিক্রম করলেন। নাজিম চায়ের কাপ নামিয়ে রাখামাত্র

হাসিমুখে বললেন, কেমন আছ নাজিম ?

নাজিম বিস্মিত হয়ে বলল, ভালো আছি স্যার।

ভালো থাকলেই ভালো। তুমি থাক কোথায় ?

পুরানা পল্টন।

বাসায় কে কে আছে ?

স্ত্রী, দুই ছেলে, এক মেয়ে আর আমাব মা।

তোমাদের বাসায় কোনো বিড়াল আছে নাকি ?

নাজিম এই প্রশ্নের কোনো মানে বুঝতে পারল না। তার বাসায় বিড়াল আছে কি না এটা স্যার কেন জিজ্ঞেস করলেন ? আফসার সাহেব দ্বিতীয়বার প্রশ্নটি করলেন, কি, আছে বিড়াল ?

জি স্যার, একটা আছে ?

কত বড়।

নাজিম এই প্রশ্নেরও কোনো মানে বুঝল না। বিড়াল কত বড় তাব মানে আবার কী ? বিড়াল তো বিড়ালের মতোই বড় হবে। একটা বিড়াল তো আব বাঘের মতো বড় হবে না, কিংবা ইঁদুরের মতো ছোটও হবে না। নাজিম ক্ষীণ স্ববে বলল, বিড়ালের কথা জিজ্ঞাস কবতেছেন কেন স্যাব ?

আফসার সাহেব অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, এমনি জিজ্ঞেস করছি। বিড়াল সম্পর্কে একটা বই পড়ছিলাম তো। পড়তে পড়তে হঠাৎ... আচ্ছা এখন যাও।

বিড়াল সম্পর্কে তিনি যে বই পড়েছেন এই ঘটনা সত্য। তিনি ভেবে বেখেছিলেন বিড়াল বিষয়ে যেখানে যত বই পাবেন, পড়বেন। সমস্ত নিউ মার্কেট ঘেঁটে একটামাত্র বই পেয়েছেন। উইলিয়াম বেলফোর্ডের 'ক্যাট ফ্যার্মেল : বিহেভিয়ারেল স্টাডিজ'। সে বইয়ে বিড়াল সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই নেই। বাঘ, চিতাবাঘের কথায় পাতা ভর্তি। সুন্দর সুন্দর বঙ্কিন ছবি। আসল ব্যাপার কিছু নেই।

নাজিম এসে ঢুকল। ক্ষীণ গলায় বলল, স্যাব।

বই থেকে মুখ তুলে আফসার সাহেব বললেন, কী ব্যাপার ?

বড় সাহেব আপনেনে সালাম দিছেন।

বই বন্ধ করে আফসাব সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

ডেল্টা শিপিং কনপোরেশনের বড় সাহেবের নাম ইসহাক জোয়াবদার। ছোটখাটো মানুষ। মেজাজ অত্যন্ত খারাপ। আফসাব সাহেবকে তিনি দুচোখে দেখতে পাবেন না।

স্যার ডেকেছেন ?

জি।

তিনদিন অফিসে আসেন নি, তাই ভাবলাম কোনো সমস্যা কি না।

জি না স্যার, কোনো সমস্যা নেই।

আপনার এক আত্মীয়ের সঙ্গে পার্টিতে দেখা। তাঁকে আপনার ব্যাপারে খুব উদ্বিগ্ন মনে হলো।

কেন ?

বলছিল— আপনার মাথায় কোনো সমস্যা হয়েছে। আপনি নাকি বলে বেড়াচ্ছেন বিড়ালের কথা বুঝতে পারেন ?

আফসার সাহেব চূপ করে রইলেন। ভেবে পেলেন না ঘটনা এত দ্রুত ছড়াচ্ছে কীভাবে ? মনে হচ্ছে সপ্তাহখানেকের ভেতর ঢাকা শহরের সব লোক জেনে যাবে। পত্রিকার লোক আসবে ইন্টারভিউ নেয়ার জন্য। বলা যায় না টিভির কোনো ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানেও তাঁর ডাক পড়তে পারে। টিভি উপস্থাপক একটা বিড়াল নিয়ে স্টুডিওতে উপস্থিত হবেন। চিকন গলায় বলবেন— সুপ্রিয় দর্শকমণ্ডলী, এবার আপনাদের জন্যে বয়েছে এক বিশেষ ধরনের বিনোদনের ব্যবস্থা। আজ আমরা স্টুডিওতে এমন এক ব্যক্তিত্বকে এনেছি যিনি বিড়ালের কথা বুঝতে পারেন বলে দাবি করেন। সেই বিশেষ ব্যক্তিত্বকে হাততালি দিয়ে অভ্যর্থনা কববার জন্যে আপনাদের অনুরোধ করছি। তালি পড়ছে। হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে...

আফসার সাহেবের চিন্তার সুতা ছিড়ে গেল। ইসহাক সাহেব বললেন, বিড়ালের কথা বুঝতে পারেন বলে যা শুনছি তা কি সত্যি ?

জি স্যাব সত্যি।

আই সি, ভেরি ইন্টারেস্টিং। শুধু কি বিড়ালের কথাই বুঝতে পারেন ? না কুকুর, গরু, গাধা, ভেড়া, ছাগল সবার কথাই বুঝতে পারেন ?

বিড়ালের ব্যাপারটা জানি। অন্যগুলি পরীক্ষা করে দেখি নি।

আপনি একটা কাজ করুন না কেন ? খাতা এবং পেন্সিল নিয়ে চাঁড়িয়াখানায় চলে যান। যেসব প্রাণীর কথা আপনি বুঝতে পারেন তাদের নামের বিপরীতে একটা করে টিক চিহ্ন দিন। আমার ধারণা, বিড়ালের কথা যখন বুঝতে পারছেন অন্যদেরটাও ইনশাল্লাহ পাববেন।

আফসার সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, স্যাব, আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা কবছেন ?

সরি, তা একটু ঠাট্টা অবশ্যি করেছি। ক্ষমা করবেন। আমি যদি বলতাম বিড়ালের কথা বুঝতে পারছি তাহলে আপনিও আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করতেন।

না, আমি করতাম না।

হয়তো-না করতেন না। যাই হোক, আমি করে ফেলেছি। তার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি। আপনি এক কাজ করুন— অফিস থেকে দিন দশেকের ছুটি নিন।

আমার ছুটির প্রয়োজন নেই।

আমার মনে হয় আছে। আপনি ছুটি নিন। সাইকিয়াট্রিস্টকে দিয়ে ভালোমতো চিকিৎসা করান। নয়তো কিছুদিন পর বলা শুরু করবেন— আপনি পিঁপড়ার কথাও বুঝতে পারছেন। আমি ছুটির ব্যবস্থা করে রেখেছি। যদি চান আমি কয়েকজন সাইকিয়াট্রিস্টের ঠিকানাও আপনাকে দিতে পারি।

আমি স্যার তার কোনো প্রয়োজন মনে করছি না।

আপনি হয়তো করছেন না। আমি করছি—। আমি এমন কাউকে অফিসের গুরুত্বপূর্ণ কাজ দিতে পারি না যে পশুদের কথা বুঝতে পারে। আমার এমন অফিসার দরকার যে মানুষের কথা বুঝতে পারবে। আমি লক্ষ্য করেছি আমাদের মধ্যে বেশিরভাগই মানুষের কথা বুঝতে পারি না।

আফসার সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

ইসহাক সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, চলে যাচ্ছেন নাকি ?

জি চলে যাচ্ছি। আপনার অত্যন্ত অপমানসূচক কথা শুনতে ইচ্ছা করছে না।

কী করবেন বলুন, আমি তো আর বিড়াল না। বিড়াল হলে হয়তো আমার কথাগুলি খুব অপমানসূচক মনে হতো না।

আফসার সাহেব নিজের ঘরে ঢুকলেন। অসহ্য বাগে শরীর কাঁপছে। রাগ সামলাতে কষ্ট হচ্ছে। রীতিমতো বমি এসে যাচ্ছে। এই মানুষটি তাঁকে এ জাতীয় অপমান আগেও করেছে। ভবিষ্যতেও করবে। এত অপমানের ভেতর চাকরি করার কোনো মানে হয় না। কোনো মানে হয় না। তাঁর কিছু সঞ্চয় আছে। মিরপুরে জায়গা কিনে রেখেছেন। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে লাখ তিনেক টাকা পাবার কথা। বয়স এমন কিছু হয় নি। চেষ্টা-চরিত্র করলে আরেকটা চাকরি কি যোগাড় করতে পারবেন না ? তিনি কাজ জানেন। জাহাজ চলাচল জাতীয় যে-কোনো প্রতিষ্ঠানে ভালো চাকরি পাবার কথা।

তিনি পি.এ-কে ডেকে রেজিগনেশন লেটার ডিকটেট করলেন। ড্রাফট দেখে দুটা বানান ঠিক করলেন। চিঠি টাইপ করে আনতে পাঠালেন। পি.এ সাধারণত কোনো কাজই দ্রুত করে না। এই কাজটা সে অত্যন্ত দ্রুত করল। তিনি চিঠিতে সই করলেন। সই করার পর তাঁর গায়ের জ্বালা খানিকটা কমল। মন শান্ত হলো। নাজিমকে চা বানাতে বললেন। নাজিম চা বানিয়ে আনল।

নাজিম!

জি স্যার।

চাকরি ছেড়ে দিযোঁছ নাজিম।

স্যার শুনেছি।

কার কাছে শুনলে ?

পি.এ স্যার চিঠি টাইপ করছিলেন। সবাইকে বলেছেন।

ও সবাই তাহলে জানে। ভালো, জানলেই ভালো।

আফসার সাহেব বিস্মিত হলেন। সবাই জানে অথচ কেউ এসে তাকে বলল না রেজিগনেশন লেটার না দেবার জন্যে। এরা কেউ কি তাঁকে পছন্দ করে না ? মানুষ হিসেবে তিনি কি এই সামান্য সহানুভূতিটুকুও পেতে পারেন না ? দীর্ঘ পনের বছর তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেছেন। কাজে ফাঁকি দেন নি। দশটায় অফিসে আসার কথা, দশটায় এসেছেন। পাঁচটা পর্যন্ত অফিস। কোনোদিন পাঁচটা বাজার দশ মিনিট আগে অফিস ছেড়ে যান নি।

নাজিম!

জি স্যার।

চা ভালো হয়েছে, তুমি এখন যাও।

আফসার সাহেব রেজিগনেশন লেটার পি.এ-র হাতে জমা দিয়ে অফিস ছেড়ে বের হলেন। তখনো লাঞ্চের সময় হয় নি। তার মনে স্কীণ আশা ছিল শেষ মুহূর্তে হয়তো সবাই এসে ভিড় করবে। তাও কেউ করল না।

তিনি দুপুরে কিছু খেলেন না। বাসায়ও ফিরে গেলেন না। দীর্ঘ সময় রাস্তায় রাস্তায় হাঁটলেন। এক সময় ক্লান্ত হয়ে পার্কে ঢুকলেন বিশ্রামের জন্যে। দীর্ঘ আট বছর পর পার্কে এলেন। ঢাকা শহরবব পার্কগুলি যে এখনো এত সুন্দর আছে তা তিনি ভাবেন নি। পার্কে বসে থাকতে তাঁব ভালোই লাগল। কিছুক্ষণ আগে ভালো একটা চাকরি ছেড়ে এসেছেন এই নিয়ে তাঁর মনে কোনো অনুশোচনা বোধ হলো না। বরং এক ধরনের শান্তি অনুভব কবলেন। পার্কে বসেই ঠিক করলেন আজ অন্যদিনের মতো সাড়ে পাঁচটায় বাসায় উপস্থিত হবেন না। নিয়মের ব্যতিক্রম করবেন। একটা ছবি দেখলে কেমন হয়? ছাত্রজীবনে প্রচুর সিনেমা দেখতেন। গত দশ বছরে একটাও দেখেন নি। সিনেমা হলে ঢুকে ছবি দেখতে কেমন লাগে কে জানে।

তিনি বাড়ি ফিরলেন বাত এগাবটায়। শীতেব দিনে বাত এগাবটা মানে অনেক বাত। মীবা উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় এতটুকু হয়ে গেছে। চাবদিকে খোঁজখবব করছেন। কেউ কিছু বলতে পাবছে না। মীবা ভেবে বেখেছেন সাড়ে এগাবটা পর্যন্ত দেখবেন। তারপর হাসপাতালে হাসপাতালে খোঁজ নেয়া শুরু কববেন।

আফসাৰ সাহেবকে দেখে আনন্দে তাঁব চোখে প্রায় পানি এসে গেল। সুমী, কুমী ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল বাবাকে। সুমী কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, কোথায় ছিলে বাবা?

আফসাৰ সাহেব হাসিমুখে বললেন, একটা ছবি দেখলাম।

কী দেখলে?

বলাকা সিনেমা, হলে একটা সিনেমা দেখলাম।

সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি।

কী নাম ছবির?

ভাবিব সংসার।

কী আছে ছবিতে?

মারামারি, কাটাকাটি, গান-বাজনা, নাচ — সবই আছে। কিছুই বাদ নেই।

মীরা দীর্ঘ সময় স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে নরম গলায় বললেন, হাতমুখ ধুয়ে খেতে আস। তোমার জন্যে আমবা সবাই না খেয়ে বসে আছি।

খাবার টেবিলে বসেই আফসাৰ সাহেব বললেন, বিড়ালকে খেতে দিয়েছ?

মীরা শীতল গলায় বললেন, ঐ সব নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।

বিড়ালকে কি খাবার দিয়েছ ?

হ্যাঁ ।

ভালোমতো দিয়েছ ?

হ্যাঁ, ভালোমতোই দেয়া হয়েছে । তুমি ভাত খাও তো ।

কেন জানি খেতে ইচ্ছা কবছে না । এক গ্লাস দুধ দাও । দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ি ।

ভাত সত্যি খাবে না ?

না ।

মীরা গ্লাসে করে দুধ নিয়ে এলেন । দুধেব গ্লাস রাখতে রাখতে ইংরেজিতে বললেন— শুনলাম তুমি নাকি চাকরি ছেড়ে দিয়েছে ?

হ্যাঁ । কার কাছে শুনলে ?

অফিস থেকে টেলিফোন করে জানিয়েছে ।

ও ।

এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নেবাব আগে আমাকে জিজ্ঞেস করাবও প্রয়োজন মনে করলে না ?

জিজ্ঞেস কবা তো অর্থহীন । সিদ্ধান্ত নেব আমি । এই সিদ্ধান্ত তুমি তো নিতে পাববে না ।

সংসার চলবে কীভাবে ?

অসুবিধা হবে না, চলবে ।

এই বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে । এখন তো আব আট হাজার টাকা বাড়ি ভাড়া পাবে না ? দু' কামরার একটা ঘুপসি ঘর নিতে হবে ।

নেব । মানুষেব দিন তো সব সময় সমান যায় না । এখন আমার দিন খাবাপ যাচ্ছে ।

আফসাব সাহেব দুধেব গ্লাস হাতে উঠে দাঁড়ালেন । মীরা বললেন, কোথায় যাচ্ছ ?

তোমাব খাওয়া শেষ কব । আমি বারান্দায় বসি ।

আমাদেব সঙ্গে বসো না ।

এখন বসতে ইচ্ছা করছে না । একটু একা একা থাকি ।

বারান্দায় বসার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিড়ালটাকে তাব বাচ্চা দু'টি নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখা গেল । আফসাব সাহেব কান পেতে বইলেন । হ্যাঁ, বুঝতে পাবছেন । কথা বুঝতে তাব কোনোই অসুবিধা হচ্ছে না ।

বাচ্চা বিড়াল : মা, স্যাব আজ এত দেরি কবে বাসায় এসেছেন কেন ?

মা : বুঝতে পারছি না । ভদ্রলোকেব কোনো একটা সমস্যা হয়েছে ।

বাচ্চা : কী সমস্যা ?

মা : উনার স্ত্রী টেলিফোনে কথাবার্তা যা বলছিলেন তাতে মনে হচ্ছে চাকরি নিয়ে সমস্যা । উনি বোধহয় চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন । আমাদের সামনে ভয়াবহ বিপদ ।

- বান্ধা : বিপদ কেন ?
- মা : চাকরি ছেড়ে দিলে তাদের টাকা-পয়সার সমস্যা হবে। রাতদিন ঝগড়াঝাঁটি হবে। এখন তাও মাঝে মাঝে খাবারটাবার দেয়— তখন তাও দেবে না।
- বান্ধা : মা, আজ তো এখন পর্যন্ত আমাদের কোনো খাবার দিল না।
- মা : রাতের খাবার শেষ হোক, তখন দিলে দিতেও পারে।
- বান্ধা : মা তোমার কী মনে হয়, দিবে ?
- মা : বুঝতে পারছি না— দিলেও দিতে পারে।
- বান্ধা : খুব ক্ষিধে লেগেছে মা।
- মা : একটা ইঁদুর মেরে খাওয়াতে পারি— খাবি ?
- বান্ধা : না, রান্না করা খাবার খাব। মা, ওরা আজ কী বান্না করেছে ?
- মা : শিম দিয়ে কৈ মাছ! মাছের সঙ্গে একটু শিম দিলে ভালো হতো— ভেজিটেবল একেবারেই খাওয়া হচ্ছে না।
- বান্ধা : শিম দিলেও কিন্তু আমি খাব না মা।
- মা : এমনিতেই খাওয়া পাওয়া যাচ্ছে না। তার উপর যদি এই যন্ত্রণা তোমরা কর তাহলে তো মুশকিল। শিম যদি দেয় তাহলে খেতে হবে। শিমে অনেক ভিটামিন।
- বান্ধা : ভিটামিন কী মা ?
- মা : এইসব তোমরা বুঝবে না। ভিটামিন খুব প্রয়োজনীয় একটা জিনিস।

আফসার সাহেব উঠে পড়লেন। খাবার ঘরে উঁকি দিলেন। বান্ধাদের খাওয়া হয়ে গেছে। তারা হাত ধুচ্ছে। মীরার খাওয়া এখনো শেষ হয় নি। আফসার সাহেব বললেন, মীরা তুমি তো আমাকে মিথ্যা কথা বলেছ।

মীরা বলল, কী মিথ্যা বললাম ?

তুমি বলেছ বিড়ালদের খাবার দিয়েছ। আসলে দাও নি।

এটা এমন কোনো মিথ্যা না যার জন্যে তুমি এমন কঠিনভাবে বান্ধাদের সামনে আমার কাছে কৈফিয়ত তলব করবে।

আমাকে মিথ্যা কথা কেন বললে, কেন বললে বিড়ালদের খাবার দেয়া হয়েছে ?

তুমি হঠাৎ করে যাতে আপসেট না হও সেজন্যেই সামান্য মিথ্যাটা বললাম।

তোমার দুশ্চিন্তার কারণ নেই— এক্ষুণি খাবার দিচ্ছি। যদি চাও চেয়ার-টেবিলে দেব। কাটা চামচ দেব। সালাদও বানিয়ে দেব।

আফসার সাহেব কঠিন কিছু বলতে গিয়েও বললেন না। মীরা বললেন, তুমি যে অসুস্থ হয়ে পড়ছ তা কি তুমি বুঝতে পারছ ? জীবনে কোনোদিন তুমি নিজের মেয়েদের খাবারের ব্যাপারে কোনো খোঁজ নাও নি— আজ ব্যস্ত হয়ে পড়েছ বিড়াল নিয়ে।

অকারণেই হইচই করছ। তোমার স্বভাব-চরিত্র বদলে যাচ্ছে। একা একা সিনেমা দেখে ফিরলে। আমরা দৃষ্টিস্তা করতে পারি এটা একবারও তোমার মনে এলো না।

সরি।

থাক, সরি বলতে হবে না।

মীরার রাগ বেশিক্ষণ থাকল না। কিছুক্ষণ পরই নরম গলায় বললেন, কিছু মনে করো না। অনেক কড়া কথা বলে ফেলেছি। আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি এক ধরনের সমস্যার ভেতর দিয়ে যাচ্ছ। তোমার সঙ্গে আরো শান্ত ব্যবহার করা উচিত ছিল, তা করি নি। আমি লজ্জিত। এসো, ঘুমাতে এসো। ভয় নেই, তোমার বিড়ালকে খেতে দিয়েছি। দুটো আন্ত কৈ মাছ দিয়েছি।

আফসার সাহেব বললেন, সঙ্গে শিম দিয়েছ তো?

শিম?

হ্যাঁ শিম। বিড়ালের বাচ্চা দুটা গ্রিন ভেজিটেবল একেবারেই খেতে চায় না। অথচ ওদের দরকার।

মীরা অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে রইলেন। খানিকক্ষণ পর স্বামীর হাত ধরে বললেন, এসো, ঘুমাতে এসো।

সেই রাতে আফসার সাহেব ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্ন দেখলেন। ঘুমের মধ্যেই বিকট চিৎকার করতে লাগলেন। মীরা তাঁর পা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ব্যাকুল হয়ে ডাকতে লাগলেন— কী হয়েছে? অ্যাই অ্যাই, কী হয়েছে? রুমী-সুমীও ঘুম ভেঙে বাবার ঘরে ছুটে এলো।

আফসার সাহেব চোখ মেলতেই মীরা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, কী স্বপ্ন দেখেছ? কী স্বপ্ন?

আফসার সাহেব হতচকিত চোখে তাকাচ্ছেন। কিছু বলতে পারছেন না। তাঁর সারা গা ঘামে ভিজে গেছে। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে।

মীরা বললেন, কী স্বপ্ন দেখলে?

আফসার সাহেব বসে ক্ষীণ গলায় বললেন, পানি খাব। এক গ্লাস খুব ঠাণ্ডা পানি দিতে বলো।

সুমী পানি আনতে ছুটে গেল।

আফসার সাহেব তৃষ্ণার্তের মতো পানি পান করলেন। পানির গ্লাস এত উঁচু করে ধরলেন যে কিছু পানি গলা বেয়ে নেমে শার্ট ভিজে গেল। কুন্ডুস, যে থাকে ঘরের অন্য প্রান্তে, সে-ও উঠে এসেছে। ঘুমের মধ্যে আফসার সাহেব যে ভয়ঙ্কর চিৎকার দিয়েছেন তা ঘরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গিয়েছে।

মীরা স্বামীর গায়ে হাত রেখে কোমল গলায় বললেন, কী স্বপ্ন দেখেছ?

আফসার সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন— স্বপ্নে দেখেছি আমি একটা বিড়াল হয়ে গেছি। বিড়াল হয়ে মাঠে ছোটাছুটি করছি। জ্যেৎশ্রা রাত— আবহাভাবে সবকিছু দেখা

যাচ্ছে। আমি অসম্ভব ক্ষুধার্ত। আমি বসে আছি ইঁদুরের গর্তের কাছে। এক সময় একটা ইঁদুর বের হলো— আমি লাফ দিয়ে ইঁদুরের উপর পড়লাম। ইঁদুরটাকে ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করলাম। আমার সমস্ত মুখে ইঁদুরের রক্ত লেগে গেল।

মীরা নরম গলায় বললেন, স্বপ্ন হচ্ছে স্বপ্ন। স্বপ্ন নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনোই কারণ নেই। ভোর হোক, আমরা মিসির আলি সাহেবের কাছে যাব। উনাকে সব বলব।

আমি কোথাও যাব না।

আচ্ছা বেশ, যেতে না চাইলে যাবে না।

আমাকে আর এক গ্রাস পানি দাও।

মীরা পানি নিয়ে এলেন। আফসার সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন— মীরা দেখ আমার হাত দুটায় ইঁদুরের গন্ধ। বিশ্রী পচা গন্ধ।

কী বলছ তুমি ?

হ্যাঁ সত্যি তাই। এই হাতে আমি ইঁদুর ধরেছি। গন্ধ তো হবেই— তুমি গুঁকে দেখ।

পাগলার্মি করো না তো। ঘুমাতে যাও। তুমি বলছ মনগড়া কথা। তুমি কি ইঁদুর কখনো চোখে দেখেছ যে ইঁদুরের গন্ধ কেমন তা জানে ? আরাম করে ঘুমাও তো।

আফসার সাহেব ঘুমাতে গেলেন না। বাথরুমে ঢুকে অনেকক্ষণ সাবান দিয়ে হাত ধুলেন। তাতেও তার মন শান্ত হলো না। শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে দীর্ঘ সময় গোসল কবলেন। যখন বেরিয়ে এলেন তখন তাঁর চোখ লাল হয়ে আছে। গা ঈষৎ গরম। সম্ভবত জ্বর আসছে। তোয়ালে হাতে মীরা দাঁড়িয়ে আছেন। রুমী-সুমীও আছে। তারা যথেষ্ট পবিমাণে ভয় পেয়েছে। তবে চুপ হয়ে আছে, কিছু বলছে না। আফসার সাহেব লক্ষ্য কবলেন— খাবার টেবিলের নিচে দুটা বাচ্চা নিয়ে মা বিড়ালটা বসে আছে। তারা কথা বলছে ফিসফিস করে। তবে তাদের ফিসফিসানি বুঝতে আফসার সাহেবের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

বাচ্চা বিড়াল : মা, উনার কী হয়েছে ?

মা বিড়াল : বুঝতে পারাছ না।

বাচ্চা : শীতের সময়, এত ভোরে কেউ গোসল করলে ঠাণ্ডা লাগবে না ?

মা বিড়াল : তা তো লাগবেই। দেখছিস না শীতে কেমন করছে। ভদ্রলোকের কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। সমস্যাটা আমি বুঝতে পারছি না।

বাচ্চা : বোঝার চেষ্টা কর না কেন মা ? তোমার তো কত বুদ্ধি।

মা বিড়াল : বুঝে লাভ কিছু নেই। উনাকে সাহায্য করতে পারব না। আমরা হচ্ছি পশু। পশু কখনো মানুষকে সাহায্য করতে পারে না।

বাচ্চা : ভদ্রলোক এত কষ্ট পাচ্ছেন, আমরা কিছুই করব না ?

মা বিড়াল : প্রার্থনা করতে পারি ।
 বাচ্চা : প্রার্থনা কী ?
 মা বিড়াল : প্রার্থনা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার কাছে কিছু চাওয়া ।
 বাচ্চা : সৃষ্টিকর্তা কে মা ?
 মা বিড়াল : যিনি আমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন ।
 বাচ্চা : আমাদের সবাইকে কে সৃষ্টি করেছেন ?
 ম : আহ্ চুপ কর তো । দিনরাত এত প্রশ্নের জবাব দিতে ভালো লাগে না ।

আফসার সাহেব তোয়ালে দিয়ে গা জড়িয়ে শোবার ঘরে ঢুকলেন । মীরা বললেন, গরম এক কাপ চা এনে দিই ?

দাও ।

মীরা চা বানিয়ে এনে দেখলেন আফসার সাহেব আবার সাবান দিয়ে হাত ধুচ্ছেন । মীরাকে দেখে ফ্যাকাসেভাবে তাকালেন । ক্লান্ত গলায় বললেন, মীরা, আর্ম মনে হয় পাগল হয়ে যাচ্ছি ।

মিসির আলিকে আজ অনেক ভদ্র দেখাচ্ছে । আগের দিন খোঁচা খোঁচা দাড়ি ছিল, আজ ক্রিন শেভড্ । ঘরও বেশ গোছানো । বিছানায় খবরের কাগজ ছড়ানো নেই । চেয়াবে বই গাদা করে রাখা হয় নি । কেরোসিন কুকারটিও অদৃশ্য । টেবিলে সুন্দর টেবিলল্যাম্প জ্বলছে । মিসির আলি চেয়ারে বসে টেবিলল্যাম্পের আলোয় গভীর মনোযোগে পড়ছেন সবীস্‌ শবিস্যক একটি বই । গত কিছুদিন ধরেই তিনি ক্রমাগত জীবজন্তু সম্পর্কিত বই পড়ে যাচ্ছেন । গুরু করেছিলেন বিড়াল দিয়ে, এখন চলে এসেছেন সবীস্‌পে । পড়তে অড্ডত লাগছে । আগে তাঁর ধাবণা ছিল সাপ ডিম দেয় । সেই ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে নেব হয় । এখন দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু সাপ ডিম দেয় না, সরাসরি বাচ্চা দেয় । চন্দ্রবোড়া এরকম একটা সাপ ।

দরজায় শব্দ হচ্ছে । ভিক্ষার জন্য ভিখরি এসেছে । মিসির আলিকে দরজা খুলতে হলো না । মোলো-সতের বছরের এক ছেলে ভেতর থেকে বের হয়ে দরজা খুলে দিল এবং কাটা কাটা গলায় বলল— কাম কইরা ভাত খান । বিনা কামে ভাত নাই । এই ছেলেটির নাম মজনু । তাকে ঘরের কাজকর্মের জন্যে মাসে দেড় শ' টাকা বেতনে রাখা হয়েছে । এই বাড়িতে মজনুর আজ সপ্তম দিন । সপ্তম দিনে সে দেখিয়ে দিয়েছে যে সে কাজ জানে । শুধু যে জানে তা না— খুব ভালো জানে । মিসির আলিকে এখন আর বিসমিল্লাহ হোটеле ভাত খেতে হয় না । ঘরেই রান্না হয় । সেই রান্নাও অসাধারণ । খাওয়ার ব্যাপারটায় যে আনন্দ আছে তা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন । আজ দুপুরে মজনু পাবদা মাছের ঝোল রান্না করেছে টমেটো এবং মটরগুঁটি দিয়ে । সেই রান্না খেয়ে মিসির আলি মজনুর বেতন দেড় শ' টাকা বাড়িয়ে এক শ' পঁচাত্তর করে দিয়েছেন ।

মজনু ।

জি স্যার।

চা বানাও তো দেখি।

মজনু গম্ভীর গলায় বলল, দুধ, লেবু না আদা?

যা ইচ্ছা বানাও।

আপনাব ঠাণ্ড লাগছে। আদা-চা খান, শরীরের জন্যে ভালো।

দাও আদা-চা দাও।

মজনুব আদা-চা খেয়ে মিসির আলিব মন ভালো হয়ে গেল। অসাধারণ ব্যাপাব। চা যতটুকু গরম হওয়া দরকার ততটুকুই গরম। ঠাণ্ডাও না, বেশি গরমও না। আদার পরিমাণও যেন মাপা। কাঁজ আছে আবার চায়ের স্বাদ নষ্ট হয় নি।

মজনু।

জি স্যাব।

আগে কি কোনো হোটেলে কাজটাজ করতে?

জে না।

বান্নাবান্না এত চমৎকাব শিখলে কীভাবে?

মজনু জবাব না দিয়ে ভেতরে চলে গেল। সে রাতের বান্না বসিয়েছে। দুপুরের খাবার সে বাত দেয় না। বাত অলাদা বান্না হয়। চায়ে চুমুক দিতে দিতে মিসিব আলি ভাবতে লাগলেন— মজনুব বেতন এক শ' পঁচাত্তর না করে পুরোপুরি দু শ' করে দেয়াই ভালো। যে-কোনোভাবেই হোক এই ছেলেকে আটকে রাখতে হবে। তাঁর নিজের অর্থনৈতিক সমস্যাব কিছুটা সমাধান হয়েছে। বিলেতে থাকাকালীন তিনি প্রফেসর বেইজেনবার্গের সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদনায় 'এবনরমাল বিহেভিয়ার ইন ফেজ ট্রানজিশন' বইটি লিখেছিলেন। সেই বই এবছর কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছে। প্রকাশক ভালো টাকা দিচ্ছেন। প্রথম দফায় তিনি পাঁচ হাজার ডলারের একটি চেক পেয়েছেন। সেই চেক ভাঙানো হয়েছে। মার্বেল স্টোনেব অসম্ভব সুন্দর টেবিলল্যাম্প এবং একটি ডেকসেট ঐ টাকায় কেনা। মিসিব আলি এখন রোজই কিছু না কিছু কিনছেন। জিনিসপত্র কেনাব ভেতবে য়ে আনন্দ আছে তাও তিনি জানতেন না।

আবাব দরজাব কড়া নড়ছে।

মিসিব আলিব মনে পড়ল সাড়ে চার শ' টাকায় তিনি একটা কলিং বেল কিনেছেন। বেলাটা এখনো লাগানো হয় নি। মজনুকে পাঠিয়ে ইলেকট্রিক মিস্ত্র নিয়ে আসতে হবে। রান্না শেষ হলে ওকে পাঠাবেন।

মিসিব আলি নিজেই দরজা খুললেন। মীরা এবং আফসার সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। আফসাব সাহেবের দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত। মনে হয় গত তিন-চার দিন দাড়ি কাটেন নি। মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। শরীরও মনে হয় ভেঙে পড়েছে।

আনুন, ভেতরে আসুন।

দু'জন ঘবে ঢুকলেন। মীরা ক্ষীণ স্বরে বললেন, আপনাকে আবাব বিরক্ত কবতে এলাম।

মিসির আলি বললেন, আপনাদের আবো আগেই আসা উচিত ছিল। আপনারা দেবি করে ফেলেছেন বলে মনে হচ্ছে। আফসার সাহেব বসুন।

আফসার সাহেব বসলেন।

মিসির আলি বললেন, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে— আপনার সমস্যা মোটেই কমে নি, বরং বেড়েছে। আমি কি ঠিক বলছি?

আফসার সাহেব কিছু বললেন না। মীরা বললেন, জি ঠিক বলছেন।

প্রাথমিকভাবে আপনার যা বলার আছে বলুন। তারপর আমি কিছু প্রশ্ন করব।

আফসার সাহেব কিছুই বললেন না। পাথরের মতো মুখ করে বসে রইলেন। মীরা বললেন, গত দু'রাত ধরে সে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখছে। ভয়াবহ স্বপ্ন।

কী রকম স্বপ্ন?

সে বিড়াল হয়ে গেছে। ধরে ধরে ইঁদুর খাচ্ছে— এইসব স্বপ্ন।

মিসির আলি হাসতে হাসতে বললেন, আমার কাছে স্বপ্নটা খুব ভয়াবহ মনে হচ্ছে না। যদি উল্টোটা স্বপ্ন দেখতেন অর্থাৎ আপনি ইঁদুর এবং বিড়াল আপনাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে তাহলে ভয়াবহ হতো।

আফসার সাহেব কঠিন গলায় বললেন, আমি যা দেখছি তা যথেষ্টই ভয়াবহ। আমার পরিস্থিতিতে আপনি নন বলেই বুঝতে পারছেন না।

আমি খুব ভালো বুঝতে পারছি। পরিবেশ হালকা কবার জন্যেই হাসতে হাসতে কথাগুলি বলেছি। সমস্যা যত বড় হবে তাকে তত সহজভাবে গ্রহণ করা উচিত।

আপনি কি তা করেন?

হ্যাঁ করি। একবার ভয়ঙ্কর জটিল একটা সমস্যাকে হাসিমুখে গ্রহণ করেছিলাম। সেই গল্প অন্য এক সময় বলব, আজ আপনার সঙ্গে কথা বলি। আমি প্রশ্ন কবছি, প্রশ্নগুলির জবাব দিন।

তারও আগে আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি— কেন আমি এরকম ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখছি?

মস্তিষ্ক নানান কারণে উত্তেজিত হয়ে আছে। একটা বিষয় নিয়ে ক্রমাগত ভাবছেন— তাই স্বপ্নে দেখছেন। জেলেদের স্ত্রীরা সব সময় স্বপ্নে দেখে তাদের স্বামীরা নৌকাডুবিতে মারা গেছে, কখনো স্বপ্নে দেখে না তারা মারা গেছে রোড অ্যাকসিডেন্টে। আপনার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটছে। ভালো কথা, ফ্রানজ কাফকার মেটামরফোসিস গল্প কি আপনি পড়েছেন? গল্পে একটা মানুষ আন্তে আন্তে কুৎসিত একটা পোকা হয়ে যায়।

না আমি পড়ি নি। গল্প-উপন্যাস আমি খুব কম পড়ি।

আচ্ছা এখন প্রশ্ন-উত্তর পর্বে চলে আসছি। আমি প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেবেন। ভাবার জন্যে সময় নেবেন না। ভেবে উত্তর দেবেন এমন প্রশ্নও আমি করব না। বিড়ালের কথা এখনো বুঝতে পারছেন?

পারছি।

আপনি কি এদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন ?

না।

যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছেন ?

হ্যাঁ। আমি একবার কথা বলার চেষ্টা করেছি।

বিড়াল বুঝতে পাবে নি ?

না।

কিন্তু বিড়াল তো আপনাদের কথা বুঝতে পারে। অন্তত তাদের কথাবার্তা থেকে নিশ্চয়ই তা বোঝা যায়।

হ্যাঁ বোঝা যায়।

তাহলে আপনার কথা সে বুঝল না কেন ?

জানি না।

আপনি নিজে কি বিশ্বাস করেন যে আপনি বিড়ালের কথা বুঝতে পারেন ?

হ্যাঁ বিশ্বাস করি।

মিসির আলি সিগারেট ধরতে ধবাতে বললেন, না, আপনি বিশ্বাস করেন না। অন্য প্রশ্নগুলির জবাব আপনি সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছেন। এই প্রশ্নটির জবাব দিতে বেশ দেরি করেছেন। আপনি যদি পূর্বোপরি বিশ্বাস করতেন যে বিড়ালের কথা আপনি বুঝতে পারেন তাহলে আজ যে-মানসিক সমস্যা আপনার হচ্ছে সেই-সমস্যা হতো না। আপনি একই সঙ্গে ব্যাপারটা বিশ্বাস করছেন এবং করছেন না। আমি কি ঠিক বলছি ?

হ্যাঁ ঠিক বলছেন। আমি বিড়ালের কথা বুঝি। তারপরেও আমার মনে সন্দেহ আছে।

কেন আছে ?

বিড়াল এমন সব কথা বলে যা একটি বিড়াল বলবে বলে আমার মনে হয় না।

উদাহরণ দিন।

যেমন ধরুন— মা বিড়াল তার বাচ্চাদের জেলি খেতে নিষেধ করছে কারণ জেলি খেলে দাঁত নষ্ট হবে। কিংবা সে বাচ্চাদের গ্রিন ভেজিটেবল খাওয়াতে চাচ্ছে— কারণ তাতে ভিটামিন আছে।

এছাড়াও অন্য কোনো কারণ কি ঘটেছে যার জন্যে আপনার মনে সন্দেহ হচ্ছে বিড়ালের কথা আসলে বোঝা যায় না ?

হ্যাঁ, এরকম ব্যাপারও ঘটেছে। আমি ইদানীং রাস্তায় প্রচুর হাঁটাহাঁটি করি। বেশ কয়েকবার বিড়ালের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ওরা ম্যাঁও ম্যাঁও করেছে কিন্তু ওদের কোনো কথা আমি বুঝতে পারি নি।

মিসির আলি বললেন, আপনাদের যদি সময় থাকে আমার সঙ্গে একটা বাড়িতে চলুন। ওদের গোটা তিনেক বিড়াল আছে। আমি দেখতে চাই ওদের কথা আপনি বুঝতে পারেন কি না।

মীরা বললেন, সেটা কি ঠিক হবে ? তাঁরা কী না কী মনে করবেন ?

তাঁরা কিছুই মনে করবেন না। আমরা কী জন্যে যাচ্ছি তাও তাঁদের বলা হবে না।

আফসার সাহেব বললেন, আমার বাসায় চলুন। সেখানে তো বিড়াল আছে।

সেই বিড়ালের কথা যে আপনি বুঝতে পারেন তা তো বলেছেন, আমি নতুন বিড়াল নিয়ে পরীক্ষা করতে চাই। অবশ্যি অস্বস্তি বোধ করলে থাক।

না, অস্বস্তি বোধ করছি না। চলুন।

মিসির আলি মজনুর কাছে বাড়ি বুঝিয়ে দিয়ে রওনা হলেন। মজনু ব্যাপাবটা ঠিক পছন্দ করল না। বিরক্ত মুখে বলল, ফিরতে কি দেরি হইব ?

হ্যাঁ, একটু দেরি হবে।

রান্না হইছে। ভাত খাইয়া যান।

না, ভাত এখন খাব না। তুমি একটা ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ডেকে কলিংবেল লাগিয়ে নিও।

মিসির আলি তার পরিচিত ঐ ভদ্রলোকের বাসায় এক ঘণ্টা কাটালেন। তাঁদের বিড়াল তিনটা না, দুটা। একটি অতি বুদ্ধ। নড়াচড়ার শক্তি নেই। অন্যটি টম কেট। বেশ উগ্র স্বভাবের। এরা অনেকবারই ম্যায়াও ম্যায়াও করল। আফসাব সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিড়াল দুটিকে দেখলেন। ওদের কথা শুনলেন কিন্তু ওরা কী বলছে কিছুই বুঝলেন না।

বাড়ি থেকে বের হয়ে মিসির আলি বললেন, আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে বিড়ালগুলির কথা কিছুই বুঝতে পারেন নি। তাই না ?

হ্যাঁ। আমি কিছুই বুঝি নি। কিন্তু আপনি বিশ্বাস কব্বন— আমি আমাদের বাসাব বিড়ালগুলির কথা বুঝি। খুব ভালো বুঝি।

মিসির আলি বললেন, আপনি নিজে কি ধরতে পারছেন — আপনার কথায় যুক্তি নেই ? আপনি একটিমাত্র বিড়ালের কথা বুঝতে পাবছেন, অন্য কোনো বিড়ালের কথা বুঝতে পারছেন না— তা কী করে হয় ?

জানি না কী করে হয়। মিসির আলি সাহেব, আমি খুব কষ্টে আছি। আপনি আমার কষ্ট দূর করুন। এইভাবে কিছুদিন গেলে আমি পাগল হয়ে যাব। আমার ধারণা, ইতিমধ্যে খানিকটা পাগল হয়েছি।

মিসির আলি বললেন, আমি আপনার ব্যাপারটা নিয়ে ক্রমাগত ভাবছি। আমি এখনো তেমন কিছু বুঝতে পারছি না। তবে মনে হচ্ছে বুঝতে পাবব। রহস্য উদ্ধার হবে।

কী জন্যে মনে হচ্ছে রহস্য উদ্ধার হবে ? তেমন কোনো কারণ কি ধটেছে ?

না, তেমন কোনো কাবণ ঘটে নি। তার পরেও মনে হচ্ছে। আমার প্রায়ই এবকম হয়। এক ধরনের ইনটুশন কাজ কবে।

মিসির আলি হেঁটে হেঁটে বাসায় ফিরলেন। বাসার সদর দরজা খোলা। মজনু কলিংবেলও লাগায় নি। মিসির আলি ঘরে ঢুকে বড় ধরনের চমক খেলেন— তাঁর ঘব

খালি। মজনু সবকিছু নিয়ে ভেগে গেছে। ডলার ভাঙিয়ে সাত হাজার টাকা রেখেছিলেন ফটো অ্যালবামের ভেতর। সেই অ্যালবামও নেই। এত ভারি যে মিউজিক সেন্টার তাও নেই। টেবিলল্যাম্প, কলিংবেল— তাও নেই। শীতবস্ত্রের মধ্যে তাঁর একটা ভালো শাল ছিল— সেটিও নিয়ে গেছে। তবে রান্না করে গেছে। টেবিলে সুন্দর করে খাবারদাবার সাজিয়ে রাখা। পানির গ্লাস, একটা পিরিচে লবণ, কাঁচা মরিচ এবং কাটা শশা। রান্না হয়েছে কৈ মাছের দোপিয়াজি, একটা ভাজা এবং ডাল।

মিসির আলি হাত ধুয়ে খেতে বসে গেলেন। প্রতিটি আইটেম অসাধারণ হয়েছে। খেতে খেতেই মনে হলো অতি ভদ্র, নিপুণ রাঁধুনি এই ছেলেটির সন্ধান বের করা খুব কঠিন না। এই ছেলে কোনো বিদেশীর বাড়িতে আগে কাজ করত। কথাবার্তায় প্রচুর ইংরেজি শব্দ তাই বলে দেয়। ইংরেজি শব্দগুলি খাবারদাবার সংক্রান্ত। কাজেই ধরে নেয়া যায় সে বাবুর্চি ছিল। চুরিব দায়ে তার চাকরি চলে যায়— কিংবা পুলিশ হয়তো তাকে খুঁজছে। সে সাময়িক আশ্রয় নিতে এসেছিল তার কাছে। ছেলেটি যে বাড়িতে কাজ করত সেই বাড়ি গুলশান এলাকায়। কারণ কথাবার্তায় সে গুলশান মার্কেটের কথা প্রায়ই বলত। সে বলছিল একটা প্রেসার কুকার হলে অনেক রকম রান্না সে বাঁধতে পারবে। গুলশান মার্কেটে প্রেসার কুকার পাওয়া যায়।

মজনু এতসব ভাবি জিনিস নিজের কাছে রাখবে না। যেহেতু বুদ্ধিমান সে চেষ্টা করবে অতি দ্রুত জিনিসগুলো বিক্রি করে দিতে।

কোথায় বিক্রি করবে? তার পরিচিত জায়গায়। অবশ্যই গুলশান মার্কেটে। কাজেই এখন একটা বেবিট্যান্সি নিয়ে তিনি যদি গুলশান মার্কেটে চলে যান তাহলে মজনুকে পাওয়া যাবে।

মিসির আলি খাওয়া শেষ করে হাত ধুয়ে বিছানায় এসে বসলেন। বিস্মিত হয়ে দেখলেন তার বালিশের কাছে একটা পিরিচে দুটা খিঁচি পান, একটা সিগারেট এবং ম্যাচ বাখা। তিনি পান মুখে দিয়ে সিগারেট ধরালেন এবং মজনুকে ক্ষমা করে দিলেন। এবং তাব প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার কাছে মনে হলো তিনি আফসার সাহেবের রহস্যভেদের কাছাকাছি চলে গেছেন। বি' জিনিস এখনো জট পাকানো আছে। তবে তা হয়তো বা খুলে ফেলা যাবে। কয়েকটা ছোটখাটো ব্যাপার পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আরো কয়েকটা দিন লাগবে।

বিছানায় ওয়ে শুয়ে গান শুনতে ইচ্ছা করছে। মিউজিক সেন্টারটা খুব শখ করে কিনেছিলেন। একটা গানও শোনা হলো না। মন খারাপ লাগছে। মন-খারাপ ভাব কাটানোর জন্যেই আবার সরীসৃপের দইটা হাতে নিলেন।

ভয়ঙ্কর বিষয়ব এবং একই সঙ্গে অপরূপ সুন্দর সাপের নাম ল্যাকসিস মিউটা। এই ল্যাটিন নামের বঙ্গানুবাদ হলো— নিঃশব্দ নিয়তি। বাহু, কী সুন্দর নাম! মানুষ যেমন এসেছে বান্দব থেকে, পাখিবা এসেছে সরীসৃপ থেকে। পাখিদের আদি পিতামাতা হচ্ছে সরীসৃপ— ভাবতেও যেন কেমন লাগে।

মিসির আলি বইয়ের পাতা উল্টে যাচ্ছেন। তাঁর মন-খারাপ ভাব কেটে যাচ্ছে। গান শুনতে ইচ্ছে করছে। গানের কথা মনে পড়তেই আবার খানিকটা মন খারাপ হলো।

পূর্বাদামের একটা লং প্লেয়িং রেকর্ড কিনে এনেছিলেন। রেকর্ডটা পড়ে আছে। শোনা হয় নি। এই মুহূর্তে তাঁর গুনতে ইচ্ছা করছে— ‘আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে’। পূর্বাদাম এই গানটি কেমন গেয়েছেন কে জানে।

8

আফসার সাহেব গত দু’দিন ধরে নিজের ঘর থেকে বের হচ্ছেন না। ঘরের সব ক’টা জানালা বন্ধ, পরদা ফেলে। দিনের বেলাতেও ঘর অন্ধকার হয়ে আছে। তিনি খাবার খেতে খাবার টেবিলেও যাচ্ছেন না। খাবার নিয়ে মীরা তাঁর ঘরে যাচ্ছেন। আফসার সাহেব ঠিকমতো খাচ্ছেনও না। অল্পকিছু মুখে দিয়েই বলছেন, ক্ষিধে নেই। মীরা বিরাট বিপদে পড়ছেন। কী করবেন বুঝতে পারছেন না। বাচ্চাসহ বিড়ালটাকে বস্তায় ভরে আবার ফেলে দিয়ে আসা হয়েছে। এবার কাছে কোথাও নয়, গাড়ি করে একেবারে জয়দেবপুরে।

মীরা অবশিষ্ট আফসার সাহেবকে বলেছেন বিড়ালগুলিকে বাসার বাইরে রাখা হয়েছে। মীরা ভেবেছিলেন এটা শুনে আফসার সাহেব রেগে যেতে পারেন। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার— রাগেন নি। বরং এই প্রসঙ্গে কোনো কথাও বলেন নি। মনে হচ্ছে বস্তায় ভরে ফেলে দিয়ে আসার ব্যাপারটা তিনিও আন্দাজ করেছিলেন।

আত্মীয়স্বজনরা ক্রমাগত আসছে। কেউ কেউ দিনেব মধ্যে দু’বার-তিনবার আসছে। মীরার বেশিরভাগ সময় এবং শক্তি ব্যয় হচ্ছে যেন তারা আফসার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে না পারেন। আত্মীয়স্বজনরা খুব বিরক্ত হচ্ছেন। কেউ কেউ রাগও করছেন। আফসার সাহেবের এক মামা কঠিন গলায় মীরাকে বললেন, তুমি ওকে লুকিয়ে রাখলে তো লাভ হবে না। ওর চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন।

মীরা বললেন, চিকিৎসা হচ্ছে। আপনি তো চিকিৎসক না। আপনি যাবেন— ঐসব কথা মনে করিয়ে দেন। আমি চাই না সে বিড়াল নিয়ে ভাবুক।

আমি বিড়াল নিয়েই যে কথা বলব তা তোমাকে কে বলল ?

আপনি কী নিয়ে কথা বলবেন ?

কথা বলার বিষয়ের কি অভাব আছে ? আমি পলিটিক্স নিয়ে কথা বলব। বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ধান নিয়ে কথা বলব। এতে ওর উপকার হবে। পুরো ব্যাপারটা ভুলে থাকতে পারবে। ঘরে তালাবন্ধ করে রাখা তো কোনো সমাধান না।

মীরা তাঁকে ঘরে ঢুকতে দিয়েছে। তিনি চেয়ারে বসতে বসতে প্রথম যে কথাটা বললেন তা হচ্ছে— আচ্ছা বাবা, বিড়ালের সঙ্গে কী কী কথা তোমার হয়েছে শুঁছিয়ে বলো। কোনো কিছু বাদ দেবে না। দরকার আছে।

শুধু যে আত্মীয়রা আসছে তা না। আত্মীয়দের আত্মীয়, তাদের আত্মীয়। মুখচেনা মানুষ, পাড়ার মানুষ, পাড়ার মানুষদের পরিচিত মানুষ। টেলিফোন সারাক্ষণই বাজছে। মীরা টেলিফোন ধরেন— এমন সব কথাবার্তা তিনি শোনেন যে তাঁর চোখে সত্যি পানি এসে যায়।

পত্রিকার অফিস থেকেও টেলিফোন এলো। সাপ্তাহিক চক্রবাকের প্রতিবেদক টেলিফোন করেছেন। মীরা টেলিফোন ধরলেন।

আপনি কি আফসার সাহেবের স্ত্রী ?

জি।

আমি সাপ্তাহিক চক্রবাক থেকে বলছি।

কী ব্যাপার, বলুন।

আমরা খবর পেয়েছি আপনাদের বাড়িতে একজন মানুষ বিড়ালে রূপান্তরিত হয়েছেন। তাঁর সারা গায়ে সাদা সাদা লোম বেরিয়েছে। লেজ গজিয়ে গেছে। কথাটা কি সত্যি ?

আপনার কি ধারণা এরকম খবর সত্যি হতে পারে ?

জগতে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা তো ঘটে।

ঘটলেও আমাদের এখানে ঘটে নি।

যদি না ঘটে তাহলে এরকম একটা গুজব কী করে বটল ?

আমি জানি না কী করে রটল।

আচ্ছা ঠিক আছে— আমি ক্যামেবাম্যান নিয়ে আসছি— আপনার এবং যার সম্পর্কে এই গুজব রটেছে তার একটা ইন্টারভিউ নিতে চাই।

কেন ?

গুজবের ওপর একটা নিউজ করব।

মীরা টেলিফোন নামিয়ে বেখে খানিকক্ষণ কাদলেন। সবচে' ভালো হতো এই বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও আশ্রয় নেয়া— তা সম্ভব হচ্ছে না। আফসার সাহেব বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে রাজি নন। তাঁকে এখান থেকে সরাতে হলে জোর করে সরাতে হবে।

মীরাব ডাক্তার ভাই সার্বক্ষণিকভাবেই এ বাড়িতে আছে। সে আফসার সাহেবের সঙ্গে বেশ ক'বার কথা বলাব চেষ্টা করেছে। কোনো লাভ হয় নি।

আফসার সাহেব কড়া চোখে তাকিয়েছেন— কোনো জবাব দেন নি। মীরার কথাবার্তার জবাব দেয়াও তাঁর ইদানীং বন্ধ করে দিয়েছেন। শুধু রুমী-সুমী কিছু জিজ্ঞেস করলে জবাব দেন।

রুমী বাবার ঘরের দবজায় টাকা দিয়ে বলল, বাবা আসব ?

আফসার সাহেব বললেন, আয়।

রুমী ভয়ে ভয়ে ভেতরে ঢুকল।

কেমন আছ বাবা ?

ভালো আছি।

তোমাকে এমন বিশ্রী দেখাচ্ছে কেন ?

দাড়ি-গোফ কামাচ্ছি না, কাজেই বিশ্রী দেখাচ্ছে।

কামাচ্ছ না কেন বাবা ?

ইচ্ছা করছে না।

কেন ইচ্ছা করছে না ?

জানি না। সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে।

বাবা, আমি কি তোমার পাশে বসব ?

বস।

রুমী ভয়ে ভয়ে বসল। বাবার হাতের উপর হাত রাখল।

বাবা।

কী মা ?

সবাই বলছে তুমি নাকি বিড়াল হয়ে গেছ ? তুমি কি বিড়াল হয়েছ ?

না, মা।

তাহলে সবাই এবকম মিথ্যা কথা বলছে কেন ?

তা তো জানি না।

তোমাব চোখ লাল কেন ?

ঘুম হচ্ছে না। এই জন্যে চোখ লাল।

ঘুম হচ্ছে না কেন বাবা ?

ঘুমালেই দুঃস্বপ্ন দেখি— এই জন্যে ঘুমাতে ইচ্ছা করে না। ঘুম আসেও না।

তুমি কি পাগল হয়ে গেছ ?

এখনো হই নি তবে খুব শিগগিরই হয়ে যাব বলে মনে হচ্ছে।

না, হবে না। মামা তোমার জন্যে খুব বড় বড় ডাক্তার এনেছেন। তাঁরা তোমাব চিকিৎসা করবেন।

চিকিৎসা করে আমার কিছুই করতে পারবে না। কারণ আমার কোনো অসুখ হয় নি।

তুমি কি আপনাআপনি সেরে উঠবে ?

তাও তো মা জানি না।

মহসিন বেশ ক'জন ডাক্তার এনেছে। ডাক্তাররা নানানভাবে আফসাব সাহেবকে পরীক্ষা করেছেন। তেমন কিছুই পান নি। প্রেসার স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি। সেটা তেমন কিছু না। আচার-আচরণেও তেমন কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। ঘুম খুব কম হলে রিক্সেস অ্যাকশান শ্রুত হয়ে যায়— তা হয়েছে। এব বেশি কিছু না। ডাক্তারদের সবাবই খারণা ভালোমতো রেষ্ট হলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

মহসিন মীবাকে বলল, যে করে হোক এই বাড়ি থেকে দুলাভাইকে বের করতে হবে। এখানে থাকলে তাঁর রেষ্ট হবে না। মাছির মতো লোকজন ভনভন করছে।

মীবা বললেন, আমি বললে কিছু হবে না। আমি অনেক বলেছি।

মুখে বললে যদি না হয় তাঁকে জোর করে উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বাড়ির আবহাওয়া যা তাতে যে-কোনো অসুস্থ লোকও পাগল হয়ে যাবে।

মহসিন খুব ভুল বলে নি। বাড়ির সামনে একদল দুষ্ট ছেলে জটলা পাকাচ্ছে। তারা মাঝে মাঝে বিড়ালের মতো ম্যায়াও ম্যায়াও করে চিৎকার করছে। মানুষ মাঝে মাঝে খুব হৃদয়হীনের মতো আচরণ করে।

মহসিন বলল, আপা, তুমি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সব গুছিয়ে রাখ। আমি রাত দশটার পর মাইক্রোবাস নিয়ে আসব। এর মধ্যে একটা ফ্ল্যাটবাড়ি ঠিক করে রাখব। তোমাদের সেখানে নিয়ে তুলব। আমি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ জানবে না তোমরা কোথায় আছ। আমি আমার স্ত্রীকে পর্যন্ত বলব না।

কিন্তু তোর দুলাভাই। সে তো যেতে রাজি হবে না।

আমি রাজি করাচ্ছি।

মহসিন শোবার ঘরের দরজায় টোকা দিয়ে বলল, আসব দুলাভাই ?

আফসাব সাহেব বললেন, না।

মহসিন দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। আফসার সাহেব বললেন— আমি তো নিষেধ করেছিলাম ভেতরে আসতে।

ইমার্জেন্সি সময় বাধা-নিষেধ কাজে লাগে না। এখন হচ্ছে সুপার ইমার্জেন্সি। দুলাভাই, আমি জানি আপনি আমাকে পছন্দ করেন না। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে আমি আপনাকে পছন্দ করি। আপনি অতি সৎ, শাস্ত্রনীতি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা একজন মানুষ। আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন না যে এখন আপনার চরম দুঃসময় যাচ্ছে। এরকম কিছুদিন চললে আপনি পাগল হয়ে যাবেন। আপনাকে বাসা ছেড়ে গোপন কোনো জায়গায় যেতে হবে।

আমি তো কোনো অপরাধ করি নি যে পালিয়ে থাকব।

আপনার যুক্তি এক শ' ভাগ সত্যি— আপনি কোনো অপরাধ করেন নি। আমাদের এই সমাজটা এমন যে বেশিরভাগ শাস্তিই আমাদের বিনা অপরাধে পেতে হবে। এখানে শুধু যে আপনি একা শাস্তি পাচ্ছেন তাই না— আপনার মেয়ে দুটাও শাস্তি পাচ্ছে। ওরা স্কুলে যেতে পারছে না। বাইরে গিয়ে খেলতে পারছে না। মুখ কালো করে ঘুরছে এবং কাঁদছে। ওদেরকে এই ঝামেলা থেকে মুক্ত করার জন্যে হলেও বাড়ি ছাড়তে আপনার রাজি হওয়া উচিত।

ভেবে দেখি।

হ্যাঁ, ভেবে দেখুন। খুব ভালো করে ভাবুন। বাড়ি ছাড়াব পক্ষে আরেকটি বড় যুক্তি আপনাকে দিচ্ছি। আপনার চাকরি নেই। এত বড় বাড়িতে আপনি এখন আর থাকতে পারেন না। ছোট বাড়ি নিতে হবে। আমি তের্ম। ছোটখাটো একটা বাড়ি আপনার জন্যে দেখব।

আফসার সাহেব চুপ করে রইলেন।

মহসিন বলল, আমি এখন চলে যাচ্ছি। রাত দশটায় এসে সবাইকে নিয়ে যাব। দ্বিতীয় কোনো কথা শুনব না। যদি আপত্তি করেন জোর করে নিয়ে যাব।

রাত দশটায় মহসিন মাইক্রোবাস নিয়ে এলো। আফসার সাহেব নিঃশব্দে গাড়িতে গিয়ে বসলেন। কোনো আপত্তি করলেন না। তাঁরা গিয়ে উঠলেন গেগারিয়ার এক ফ্ল্যাটবাড়িতে। মহসিন করিতকর্মা লোক। কিছু আসবাবপত্র এনে বাড়ি আগেই সাজিয়ে রেখেছে। এগার-বার বছরের একটা কাজের মেয়ে ঘর ঝাঁট দিচ্ছে।

নতুন বাসা খুব ছোট না— তিনটা রুম। বারান্দাটা ছোট হলেও শোবার ঘরটা বেশ বড়। অনেক উঁচু ছাদ। খোলামেলা ভাব আছে।

মহসিন বলল, দুলাভাই, আপনার বাসা পছন্দ হয়েছে?

আফসার সাহেব বললেন, হ্যাঁ হয়েছে?

এই বাড়ির সবচে' বড় সুবিধা কী জানেন?

না।

এই বাড়ির সবচে' বড় সুবিধা হচ্ছে বাতাস। দখিনদুয়ারী বাড়ি। শীতকাল বলে টের পাচ্ছেন না। গরমকাল আসুক, দেখবেন হু-হু করে বাড়িতে হাওয়া খেলবে। আমাব এক বন্ধু আগে এই বাড়িতে থাকত। তার কাছে শুনেছি।

আফসার সাহেব তেমন কোনো উৎসাহ দেখালেন না। আবার অনুৎসাহও দেখালেন না। মহসিন টিফিন ক্যারিয়ারে করে খাবার নিয়ে এসেছিল। রাতে তাই খাওয়া হলো। আফসার সাহেব অনেকদিন পর ভালোমতো খাওয়াদাওয়া করলেন।

মহসিন মীরাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলল, আপা, এই বাড়ির আসল সুবিধার কথা এখন তোমাকে গোপনে বলে যাচ্ছি। এই বাড়ির আসল এবং একমাত্র সুবিধা হচ্ছে— তিনতলা ফ্ল্যাটের কোনো ফ্ল্যাটে বিড়াল নেই। তোমার ঐ বিড়ালও পথ খুঁজে খুঁজে এ বাড়িতে আসবে না। বুঝতে পারছ?

পারছি।

এখন তোমাকে যা করতে হবে তা হচ্ছে দুলাভাইকে ভালোমতো ঘুমানোর সুযোগ করে দেয়া। ঠিকমতো ঘুমালেই নার্ভ শান্ত হয়ে যাবে। নার্ভ শান্ত হলেই সব সমস্যার সমাধান হবে।

মীরা বললেন, আজ রাতটা তুই থেকে যা মহসিন, নতুন জায়গা, ভয় ভয় লাগছে।

আমি থাকব। দুলাভাইকে ঘুম পাড়ানোর দায়িত্বও আমার। আজ রাত নিয়ে তুমি চিন্তা করবে না।

মহসিন শোবার ঘরে গিয়ে বসল। আফসার সাহেব চূপচাপ সিগারেট টানছেন। তাঁকে আজ তেমন অস্থির বোধ হচ্ছে না। রুমী-সুমী তাঁব পাশেই কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমাচ্ছে।

মহসিন বলল, দুটা ফ্রিজিয়াম খেয়ে আজ সারারাত আপনি মরার মতো ঘুমাবেন, বুঝতে পারছেন?

আফসার সাহেব বললেন, ওষুধ খেয়ে কোনো লাভ নেই। ঘুম আসবে না। ঘুমালেই দুঃস্বপ্ন দেখব এই টেনশানে আমার ঘুম আসে না।

আজ টেনশান করতে হবে না। আমি সারারাত আপনার বিছানার পাশে জেগে বসে থাকব। যখনই আপনি স্বপ্ন দেখতে শুরু করবেন আমি আপনাকে ডেকে তুলব।

বুঝবে কী করে আমি স্বপ্ন দেখছি কি না ?

স্বপ্ন দেখার সময় মানুষের চোখের পাতা কাঁপতে থাকে। একে বলে Rapid eye movement. সংক্ষেপে REM। যখনই দেখব আপনার চোখের পাতা কাঁপছে আমি আপনাকে ডেকে তুলব। আমার উপর আপনি বিশ্বাস রাখুন। আমি আপনার খাটের পাশে একটা চেয়ার টেনে বসব।

মহসিন আসলেই তাই করল।

আফসার সাহেব ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমাতে গেলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার মাথা বালিশে ছোঁয়ানোমাত্র ঘুমিয়ে পড়লেন। এবং চমৎকার একটা স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নেও তিনি ঘুমাম্ছিলেন। ঘুম ভাঙলে তিনি চোখ মেললেন। লক্ষ করলেন, তিনি একটা বেতের ভাঙা সুটকেসেব ভেতর শুয়ে আছেন। তাঁর শীত লাগছে। বেশ শীত লাগছে। তিনি মানুষ নন—বিড়াল। সুটকেসেব ভেতর থেকে উঠে এলেন। ক্ষিধে পেয়েছে। খাবারের সন্ধানে যাওয়া উচিত। নানান রকম খাবারের ঘ্রাণ পাচ্ছেন। একটা পাউরুটির টুকরার ঘ্রাণ আসছে। পাউরুটিতে মাখন লাগানো। মাখনের ঘ্রাণও পাওয়া যাচ্ছে। বেশকিছু পিঁপড়া পাউরুটিতে আছে। তিনি পিঁপড়ার ঘ্রাণও পাচ্ছেন। কোথায় যেন চা ফেলে দিয়েছে। সেই চা শুকিয়ে মোঝেতে সরের মতো পড়েছে। তার গন্ধও নাকে আসছে। মেঝের ঐ অংশ চেটে দেখা যেতে পারে। রান্নাঘরের ডাস্টবিনে কিছু ভাত আছে। তবে ভাত নষ্ট হয়ে গেছে। টক গন্ধ আসছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, এক জায়গায় বসে তিনি সারা বাড়িতে কোথায় কী খাবার আছে তার গন্ধ পাচ্ছেন। তিনি হাই তুললেন। কোন কোন খাবার খাবেন তা গুছিয়ে নিলেন। এইবার ইঁদুরের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। একটা মা ইঁদুর বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে বেব হয়েছে। শুধু গন্ধ দিয়ে তিনি প্রতিটি ইঁদুরকে আলাদা আলাদা করে চিনতে পারছেন। মা-টা ভয়ঙ্কর বদ। একে মারার চেষ্টা করবেন। না থাক। ছোট ছোট বাচ্চা আছে। কী দরকার। ক্ষিধেও চলে গেছে। ঘুম পাচ্ছে। তিনি আবার বেতের সুটকেসে ঢুকে পড়লেন। স্বপ্নের মধ্যেই আবার ঘুম এসে গেল। ঘুম ভাঙল রাত তিনটায়। আফসার সাহেব বিছানায় উঠে বসলেন। বিস্থিত হয়ে দেখলেন মহসিন চেয়ারের হাতলে মাথা রেখে অকাতরে ঘুমাচ্ছে। তার নাকও ডাকছে।

আফসার সাহেব সাবধানে বিছানা থেকে নামলেন। বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। অবাধ হয়ে লক্ষ করলেন, বারান্দার শেষ প্রান্তে বিড়াল একটামাত্র বাচ্চা নিয়ে চুপচাপ বসে আছে। আফসার সাহেব ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন। আর ঠিক তখন বিড়ালের কথা শুনতে পেলেন।

বাচ্চা : মা দেখ দেখ, উনি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন।

মা : দেখাছ।

- বাচ্চা : আমরা যে বাসা খুঁজে খুঁজে এখানে চলে এসেছি তা দেখে উনি কি খুশি হয়েছেন ?
- মা : না ।
- বাচ্চা : আমার ভাইটা যে মারা গেছে তা কি উনি বুঝতে পারছেন না ?
- মা : মানুষ অসম্ভব বুদ্ধিমান, আমরা দু'জন মাত্র এসেছি । তাই দেখে তো বোঝা উচিত ।
- বাচ্চা : আমাদের মনে যে খুব কষ্ট তা কি উনি বুঝবেন না ?
- মা : না । পশুদের কষ্ট মানুষ বোঝে না ।
- বাচ্চা : এখন তাঁরা কি আমাদের আবার বস্তায় ভরে ফেলে দেবে ?
- মা : দিতে পারে । আবার না-ও দিতে পারে । যখন দেখবে আমরা এত কষ্ট করে পুরনো বাসায় গিয়েছি, সেখানে তাঁদের না পেয়ে গন্ধ ঝুঁকে ঝুঁকে এই জায়গায় এসেছি তখন অবাক হয়ে আমাদের রাখতেও পারে ।
- বাচ্চা : ক্ষিধে পেয়েছে মা ।
- মা : ঘুমিয়ে পড় । ঘুমিয়ে পড়লে ক্ষিধে লাগবে না ।
- বাচ্চা : মা ।
- মা : কী ?
- বাচ্চা : ভাইটাব জন্য খুব কষ্ট হচ্ছে মা । কাঁদতে ইচ্ছা কবছে ।
- মা : কাঁদতে ইচ্ছা করলে কাঁদো ।

আফসার সাহেব শুনলেন বিড়ালের বাচ্চাটা কাঁদছে । এই কান্না অবিকল মানবশিশুর কান্নার মতো । আফসার সাহেবের চোখে পানি এসে গেল ।

৫

মিসির আলি বড় একটা খাতায় বিড়ালের ব্যাপারটা লিখেছেন । খাতাটা নিয়ে আফসাব সাহেবের বাসায় যাবেন । যাবার আগে লেখাটা আরেকবার দেখে নিচ্ছেন । মিসির আলি লিখেছেন—

(১, আফসার সাহেব একজন বুদ্ধিমান মানুষ । তবে গম্ভীর প্রকৃতির । ঠাট্টা-তামাশা পছন্দ করেন না । সবকিছু খুব সিরিয়াসভাবে নেন । কাজেই তিনি যখন বলেন বিড়ালের কথা বুঝতে পারছেন তখন ধরে নেয়া স্বাভাবিক যে তিনি ঠাট্টা-তামাশা করছেন না । একজন বুদ্ধিমান মানুষ কোনো কারণ ছাড়া হঠাৎ বলা শুরু করবেন না যে তিনি বিড়ালের কথা বুঝতে পারছেন । এটা বলায় তাঁর কোনো লাভ হচ্ছে না । বরং সামাজিকভাবে তিনি হাসির পাত্রে পরিণত হচ্ছেন । আমিও ধরেই নিচ্ছি তিনি বিড়ালের কথা বুঝতে পারছেন । এটা ধরে নিয়ে অন্য যুক্তিগুলি পরীক্ষা করছি ।

(২) ক্যাসেট প্লেয়ারে বিড়ালের কথা টেপ করা ছিল। তাঁকে শোনানো হলো। তিনি কিছু বুঝতে পারলেন না। এতে দু'টি জিনিস প্রমাণিত হচ্ছে— (ক) তিনি সত্যি কথা বলছেন। মিথ্যা করে বলতে পারতেন যে কথা বুঝতে পারছেন। মিথ্যা বললেও আমাদের তা ধরার ক্ষমতা ছিল না। (খ) বিড়াল হয়তো টেলিপ্যাথিক নিয়মে কথা বলে। যদি তার কথা হয় টেলিপ্যাথিক তবে ক্যাসেট প্লেয়ারে ধরে রাখা বিড়ালের কথা হবে অর্থহীন। টেলিপ্যাথিক কথা বলার সম্ভাবনাই বেশি কারণ বিড়ালের ভোকাল কর্ড মিয়াও ছাড়া অন্য কোনো শব্দ করতে পারে না, একটিমাত্র শব্দে দীর্ঘ বাক্য তৈরি করা বা কথোপকথন চালানো অসম্ভব।

(৩) আফসার সাহেব বাস্তায় হাঁটার সময় কিছু বিড়ালের দেখা পেতেন। তিনি তাদের কোনো কথা বুঝতে পারেন নি; বিড়ালের কথা যদি টেলিপ্যাথিক হয় তাহলে তাদের কথাও বোঝা উচিত ছিল। আফসার সাহেবকে আমি একটি বাসায় নিয়ে গিয়েছিলাম। তাদের দুটি বিড়াল ছিল। আফসার সাহেব সেই দু'টি বিড়ালের কথাও শুনতে পান নি।

তাহলে ব্যাপার এই দাঁড়াচ্ছে আমরা যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানেই ফিরে গিয়েছি। এক কথায় আমরা এখন সহজ সিদ্ধান্তে চলে আসতে পারি— আফসার সাহেব বিড়ালের কথা বুঝতে পারেন না। তিনি মনগড়া কথা বলছেন।

কিন্তু ইচ্ছা কবলে এই সহজ সিদ্ধান্তে আমরা নাও যেতে পারি। আমার সিদ্ধান্ত এককম— আফসার সাহেব বিড়ালের কথা বুঝতে পারেন তবে সেই বিড়ালকে হতে হবে মা বিড়াল এবং তার কিছু বাচ্চা থাকতে হবে। মা বিড়াল বাচ্চাদের ট্রেনিং দেবার জন্যে ক্রমাগত তাদের নানান জিনিস শেখাবে। এই শেখানোর ব্যাপারটা সে করবে টেলিপ্যাথিকেলি। বাচ্চাবাও একইভাবে মা'র সঙ্গে যে গায়োগ করবে। শিক্ষার প্রাথমিক অংশ শেষ হবার পবপব বেড়ালদের এই ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে। আফসার সাহেবের মস্তিষ্কের একটি অংশ কোনো এক বিচিত্র কাবণে বিড়ালের টেলিপ্যাথিক কথোপকথন ধবংস পাবছে। আমার ধারণা ছোট ছোট শিশু আছে এমন যে-কোনো বিড়ালের কথাই তিনি বুঝতে পারবেন।

এই অস্বাভাবিক ক্ষমতার সঙ্গে মানুষের পরিচয় নেই বলেই মানুষ এই ক্ষমতা দেখবে ভয়ে এবং বিস্ময়ে। মানুষটা সহজে গ্রহণ করতে পারবে না। শেষটায় এই ক্ষমতা আফসার সাহেবকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। মানুষ কখনোই অস্বাভাবিক কিছু সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। কোনো মানুষ যদি কপালে তৃতীয় একটি চোখ নিয়ে জন্মায় তাহলে আমাদের সমাজ তাকে ডাষ্টবিনে ছুড়ে দেবে। তৃতীয় চোখের জন্যে সেই মানুষটিকে কঠিন মূল্য দিতে হবে। যদিও সেই তৃতীয় চোখের কাবণে মানুষটির পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বেড়েছে। তার লাভই হয়েছে। কিন্তু আমাদের সমাজ ব্যাপারটা সেভাবে দেখবে না। মানুষকে উদার ভাবা হলেও মানুষ মোটেই উদার নয়। সে সব সময় দেখে তার গোষ্ঠীস্বার্থ। কাজেই আফসার সাহেবের সামনে খুব খারাপ দিন।

মিসির আলি অনেক খুঁজে খুঁজে আফসার সাহেবের বাসায় এসেছেন। বাসা থমথম করছে। কোনো সাড়াশব্দ নেই। বাড়িতে পা দিয়েই তাঁর মনে হলো অশুভ কিছু যেন এই বাড়িতে ছায়া ফেলে আছে। ভয়াবহ কিছু ঘটে গেছে। কলিৎবেল টিপতেই মীরা এসে দরজা খুললেন। তিনি এমনভাবে তাকালেন যেন মিসির আলিকে চিনতে পারছেন না। মীরার চোখ লাল, হয়তো কাঁদছিলেন।

মিসির আলি বললেন, কেমন আছেন ?

মীরা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, ভালো নেই।

ভেতরে আসব ?

আসুন।

আফসার সাহেব কোথায় ?

মীরা চুপ করে রইলেন। মিসির আলি বললেন, আমি বুঝতে পারছি বড় রকমের কোনো ঘটনা ঘটেছে। আপনি কি আমাকে দয়া করে বলবেন কী ব্যাপার।

মীরা চাপা গলায় বললেন, আমাদের ঐ বিড়ালটা একটা বাচ্চা নিয়ে খুঁজে খুঁজে এই বাড়িতে চলে এসেছিল। কী করে গেণ্ডারিয়ার এই বাড়ি খুঁজে পেল আমি জানি না। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি বিড়ালটা তার বাচ্চা নিয়ে চুপচাপ বসে আছে। সুমীর আক্কা একগাদা খাবার খেতে দিয়েছে। আমার প্রচণ্ড রাগ হলো। বাগে প্রায় অন্ধ হয়ে গেলাম। আমাদের সমস্ত যন্ত্রণার মূলে এই বিড়াল। আমার মনে হলো এদের শেষ না করতে পারলে আমাদের মুক্তি নেই। তখন আমি খুব একটা খারাপ কাজ কবলাম।

কী করলেন ?

খুব নোংরা, খুব কুৎসিত একটা কাজ— বলতে গিয়েও আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি। আমি রান্নাঘরে ঢুকলাম। রান্নাঘরের চুলায় চায়ের পানি ফুটছিল। আমি সেই ফুটন্ত পানি এনে এদের গায়ে ঢেলে দিলাম। এত বড় অন্যায় যে আমি করতে পারি তা কখনো কল্পনা করি নি। কিন্তু করেছি, নিজের হাতে ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়েছি।

তারপর ?

পানি ঢালার পরই মনে হলো আমি এ কী করলাম, আমি এ কী করলাম। তখন আমি নিজেই এদের নিয়ে হাসপাতালে ছুটে গেছি। হাসপাতালে নিয়ে যাবাব পরপরই দুটা বিড়ালই মারা যায়।

আফসার সাহেব কোথায় ? উনি ঘটনাটা কীভাবে নিয়েছেন ?

আমার মনে হয় সহজভাবেই নিয়েছেন। বাসায় ফিরে আমি খুব কান্নাকাটি করছিলাম। উনি আমাকে সাবুনা দিচ্ছিলেন। আমার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলছিলেন— মানুষমাএই ভুল করে। তুমিও করেছ।

ঘটনাটা কবে ঘটেছে ?

গতকাল।

মীরার চোখ দিয়ে ক্রমাগত পানি পড়ছে। তিনি নিজেকে সামলাতে পারছেন না। রুমী-সুমী দরজার পরদা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে আছে।

মিসির আলি বললেন, আফসার সাহেব কোথায় ?

মীরা বললেন, ও গিয়েছে ট্রেনের টিকিট কাটতে। সবাইকে নিয়ে সে ঢাকার বাইরে কোথাও বেড়াতে যেতে চায়।

সেটা ভালো হবে। যান, ঘুরে আসুন।

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর কাছে মনে হচ্ছে এই পরিবারটি এখন সামলে উঠতে পাববে। বড় ধরনের দুর্ঘটনা এখন এদের কাছাকাছি নিয়ে আসবে। তাছাড়া বিড়াল দু'টিও এখন নেই। এটাও এক ধরনের মুক্তি।

মিসির আলি বললেন, আমি আজ যাই। আপনারা বাইরে থেকে ঘুরে আসুন। তারপর একদিন এসে চা খেয়ে যাব।

মীরা চোখ মুছতে মুছতে নিচু গলায় বললেন, আপনাকে একটা ব্যাপার বলতে চাচ্ছি। আমি যখন বিড়াল দুটাকে নিয়ে রিকশা করে হাসপাতালে যাচ্ছি তখন হঠাৎ স্পষ্ট শুনলাম মা বিড়ালটা বলছে— আমি আপনার পায়ে পড়ছি। আপনি আমার বাচ্চাটাকে বাঁচান। এই বেচার সুন্দর পৃথিবী কিছুই দেখল না। আমি কথাগুলো স্পষ্ট শুনলাম— যেন বিড়ালটা আমার মাথাব ভেতর ঢুকে আমাকে কথাগুলি বলল। এইবকম কেন শুনলাম বলুন তো ?

মিসির আলি কখনো মিথ্যা বলেন না, আজ বললেন। কোমল গলায় বললেন— এটা আপনার কল্পনা। অপরাধবোধে কাতর হয়েছিলেন বলেই কল্পনায় শুনেছেন। বিড়াল কি আর কথা বলতে পারে ?

মীরা বললেন, আমার তাই ধারণা।

বলতে বলতে মীরা আবারও চোখ মুছলেন।

মিসির আলি বাসার দিকে ফিরে চলছেন। শীতের সন্ধ্যা। আকাশ লাল হয়ে আছে। আকাশের লাল ভালোয় কী অপূর্ণই না দেখাচ্ছে শহরটাকে। হাঁটতে হাঁটতে তাঁর মনে হলো— প্রকৃতি এত সুন্দর কবে নিজেকে শুধু মানুষের জন্যেই সাজায় না, তার সমস্ত জীবজগতের জন্যেই সাজায়। মানুষ মনে কবে, শুধু তাব জন্যেই বুঝি সাজিয়েছে, পাখি মনে করে তার জন্যে। বাবান্দায় বসে থাকা মা বিড়াল মনে করে তাদের জন্যে। সে হয়তো তাব শিশুটিকে ডেকে বলে— মা দেখ দেখ, কী সুন্দর! কী সুন্দর!